শ্রীভারতী

(ভারতীয় শাস্ত্র-জ্ঞান প্রচারের মুখ্য মাসিক পত্রিকা)

২য় বর্ষ

(ভাদ্র ১৩৪৬—শ্রাবণ ১৩৪৭)

প্রধান সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(চৈত্র, ১৩৪৬ পর্যন্ত)

প্রধান সম্পাদক—রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্. এ.

(বৈশাখ, ১৩৪৭ হইতে)

পরিচালক—শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম. এ., বি. এল.

প্রকাশ-কার্যালয়—

ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্

১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শীল কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীভারতী প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীগৌরচন্দ্র সেন, বি. কম্.
১৭০, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিবিধ সংবাদ

সমালোচিত পুস্তক-সূচী

নূতন প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

প্রাজাপত্য-সূত্রম্—কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত—ভাদ্র ও আশ্বিন (দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত)।

পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ—পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ, কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত—আশ্বিন মাস হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | ভাদ্র ১৩৪৬ সাল | প্রথম সংখ্যা

গণেশ

অধ্যাপক **শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ**

স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডের কেদারখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে মহেশের উক্তিতে গণেশ-পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ নিম্নোক্তরূপ---

উভয়পক্ষের চতুর্থী তিথিতে গণেশের অর্চনা করিতে হয়। শুক্লপক্ষে বিশুদ্ধ শুক্ল তিল দ্বারা স্নান করিয়া অন্যান্য আবশ্যক সমস্ত কার্য-নির্বাহের পর গন্ধ, মাল্য ও অক্ষতাদি দ্বারা সযত্নে গণেশ-পূজা করিবার বিধি আছে। পূজা আরম্ভ করিয়া যথাবিধি গণেশের ধ্যান করিতে হয়। মহাদেবের ন্যায় গণেশেরও বহু আগম আছে; সেইজন্য সত্ত্বরজস্তমোগুণ ভেদে বহুবিধ উপাসক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। গণভেদেও বহুবিধ নাম নিরুক্ত হইয়া থাকে ; যথা--পঞ্চবক্ত্র, গণাধ্যক্ষ, দশবাহু, ত্রিলোচন, কমনীয়, স্ফটিকনিভ, নীলকণ্ঠ এবং গজানন। গণেশের মুখ পঞ্চবিধ। তাঁহার মধ্যম মুখ গৌরবর্ণ। উহা চতুর্দণ্ড ও ত্রিলোচন। ঐ মুখের শুণ্ডাদণ্ড মনোজ্ঞ এবং পুষ্কর ও মোদকান্বিত। তাঁহার অন্য মুখ পীতবর্ণ এবং অন্যান্য মুখ যথাক্রমে নীল, পিঙ্গল ও শুভ্রবর্ণ। এই সকল মুখই শুভ লক্ষণান্বিত। তাঁহার দশভুজে পাশ, পরশু, পদ্ম, অঙ্কুশ, দন্ত, অক্ষমালা, লাঙ্গল, মুষল, বরদ ও মোদকপূর্ণ পাত্র আছে। এইরূপেই তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়। তিনি লম্বোদর, বিরূপাক্ষ, মেখলান্বিত, যোগাসনে উপবিষ্ট ও মস্তকে চন্দ্রলেখাধর। তাঁহার সাত্ত্বিক ধ্যান নরগণকে এইরূপেই করিতে হয়। তদীয় রাজস ধ্যান নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে : তিনি বিশুদ্ধ সুবর্ণসন্নিভ, গজবক্ত্র, অলৌকিক রূপসম্পন্ন, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, একদন্ত, মহোদর, পাশাঙ্কুশধারী এবং দন্তে তাঁহার মোদকপাত্র। তাঁহার তামসধ্যান নীলবর্ণ। এইরূপে গুণভেদে তাঁহার ত্রিবিধ ধ্যান উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ধ্যানের পর তাঁহার পূজা করিবার বিধি আছে। প্রথমে একবিংশতি গাছি দূর্বা লইয়া তাহার দুই দুই গাছি দূর্বা গণেশের বিভিন্ন দুই দুইটী নাম যথারীতি উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে হয়। পরে সকল নাম উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট একগাছি দূর্বা প্রদান করিতে হয়। এইরূপ গণেশ নাম উচ্চারণ

করিয়া একবিংশতিতে মোদক দানও করিবার নিয়ম আছে। গণপতিপূজার পৃথক্ পৃথক্ দশ নাম এইরূপ কীর্তন করিতে হয় ; যথা---হে গণাধিপ, উমাপুত্র, অঘনাশন, বিনায়ক, ঈশপুত্র, সর্বসিদ্ধি-প্রদায়ক, একদন্ত, ইভবক্ত্র ও মুষিকবাহন, তোমাকে নমস্কার। তুমি কুমার গুরু, তুমি সর্বত্র সযত্নে পূজনীয়।

চীনদেশে গণেশ*

চীনদেশেও গণেশ-পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু কতদিন পূর্বে চীনদেশে গণেশপূজা প্রবর্তিত হয় তাহা নিরূপণ করা যায় না। ভারতবর্ষ হইতেই ইহা চীনদেশে গিয়াছে, তবে কোন্ পথ দিয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারা যায় নাই।

দুইটী পথ দিয়া চীনদেশে গণেশ-পূজার প্রবেশ-লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রথমটী হইতেছে চীন-তুর্কস্তানের মধ্যবর্তী স্থলপথ দিয়া অথবা নেপাল এবং তিব্বতের মধ্য দিয়া। এই পথ দিয়াই বোধ হয় সর্বপ্রথম চীনে গণেশ-পূজার সূচনা হয়। গণেশের পূজা হয় ভারতীয় পণ্ডিতগণ[১] চীনদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, অথবা চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ভারতে তীর্থভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে বর্তমান চীনদেশে প্রচলিত রহস্যময় গণেশ-পূজার উপযোগী যোগাচার অথবা তান্ত্রিক-বিদ্যা এদেশ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পথটী সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারত হইতে সমুদ্রপথে চীনদেশে যাতায়াত করিতেন এরূপ বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাঁহারাই তন্ত্রশাস্ত্র ও ও তন্ত্রাচার এবং বজ্রধাতু ও গর্ভধাতু নামক মহাযান-সাধনার দুইটী মণ্ডল—সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রহস্যচিত্রমূলক মণ্ডল চীনদেশে প্রবর্তন করেন ; এই রহস্যচিত্রাবলীর মধ্যে গণেশেরও স্থান ছিল।

চীন ও জাপান দেশে দুই প্রকারের গণেশ দেখিতে পাওয়া যায় ; বিনায়ক এবং কুয়ন-শি-তিয়েন বা কঙ্গি-তেন। বিনায়কের মূর্তি একক। তাহার সঙ্গে আর কিছু থাকিত না। সমস্ত বৌদ্ধ-প্রধান দেশে যেরূপ গণেশ দেখা যায় এই গণেশও তদনুরূপ। এই গণেশ হস্তি-মুণ্ড, দ্বি-বাহুযুক্ত এবং ব্যত্যস্ত-পাদ (অর্থাৎ পায়ের উপর পা রাখিয়া উপবিষ্ট)। কঙ্গি-তেন যুগ্ম-গণেশ। চীন ও জাপান ব্যতীত অন্য কোন দেশেই এরূপ মূর্তি দেখা যায় না। পরস্পর সংগ্রথিত দুইটী হস্তি-মুণ্ড দেবতার দণ্ডায়মানা মূর্তি দ্বিতীয় প্রকার গণেশের প্রতীক বলিয়া গৃহীত।

চীনদেশে গণেশের প্রাচীন প্রতীকের মাত্র দুইটী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একটী মূর্তি তুনহুয়ঙের গুহা-মন্দিরের প্রাচীরে অঙ্কিত। কুঙ্-সিএন নামক স্থানে পাহাড় কাটিয়া একটী মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। অপরটী এই মন্দিরের প্রস্তর-মূর্তি। ইহা প্রকৃত পক্ষে অল্পমাত্র

---

* চীনদেশের গণেশ সম্বন্ধে বহু উপাদান অ্যামিস গেটি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমান নিবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ তাঁহার সুদুর্লভ বিবরণ ব্যতীত পাইবার উপায় ছিল না। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

১। V. P. 73.

উদ্গাত ভাস্কর্য (bas-relief)। Paul Pelliot এর মতে দেওয়ালে অঙ্কিত গণেশগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল। এইগুলি কুঙ্-সিয়েনের প্রস্তর ভাস্কর্যের সমসাময়িক। Rene Groussetএর মতে তুন্ হুয়ঙের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্যে, গান্ধার, গুপ্ত এবং ইরানীয়া ছাঁচ বেশ সুস্পষ্ট[১] ; সুতরাং আমাদের দেখিতে হইবে যে এইগুলি চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ কর্তৃক অথবা ভারতীয় চিত্রকরগণ অথবা উভয়ের দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছিল কিনা।

এই সময়েই অজণ্টার নিখুঁত চিত্রাদি অঙ্কিত হইতেছিল। যে সমস্ত বৌদ্ধ চীনদেশ হইতে ভারতে এই সময়ে তীর্থভ্রমণে আসিয়াছিলেন বিখ্যাত ভ্রমণকারী য়ুয়ন্ সঙের মত কয়েক-জন চিত্রশিল্পীও যে তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইঁহারা অজণ্টায় আসিয়াছিলেন ; এবং তুন-হুয়ঙ্ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অজণ্টার প্রাচীর-গাত্রাঙ্কিত চিত্র-গুলির ক্রমোন্নতি চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তুন্-হুয়ঙের ১নং গুহাচিত্রগুলির মধ্যে। এই চিত্রগুলি যে খুব দক্ষ শিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এইগুলি দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি হিন্দু চিত্রকলার নকল। অবশ্য এই জাতীয় হিন্দুচিত্র বর্তমানে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে।

ওয়াই (Wei) রাজবংশীয়গণের বৌদ্ধ মূর্তিগুলির উপরে এবং উভয়পার্শ্বে হিন্দু দেবতা-গণের যে চিত্র প্রাচীর-গাত্রাঙ্কিত আছে, তাহাদের মধ্যে অশ্বচালিত রথে সূর্য, হংসচালিত রথে চন্দ্র এবং একটী কপোতের (frieze) মধ্যে নবগ্রহকে দেখা যায়। বৌদ্ধমূর্তির নীচে কামদেব। কামদেবের পার্শ্বে এবং একটু নিম্নদেশে মহারাজলীল ভঙ্গীতে উপবিষ্ট গণেশের চিত্র অঙ্কিত। এইরূপ চিত্র বিশেষভাবে ১২০ নং N গুহায় দেখা যায়।

গণেশের এই চিত্রগুলি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া গণেশের অন্যান্য প্রতিকৃতি গুলিকে পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝা যায় যে ওয়াইবংশীয় রাজগণের পরবর্তী যুগে এই প্রতিকৃতির অভ্যুদয়। তুন্-হুয়ঙের বিনায়ক-প্রতিকৃতি সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষভাবে খাটে।

চীন-তুর্কস্তানের এন্‌ডেয়ারে নামক স্থানে (Enderet) একটা প্যানেলের (panel) উপর একটী বিনায়ক গণেশের চিত্র দেখা যায়। ইহা অষ্টম শতাব্দীর। এই চিত্রটীর সহিত তুন-হুয়ঙের বিনায়ক প্রতিকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় চিত্রের মাথার তিন ভাগ চিত্রিত হইয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় ও নাসিকাদণ্ডের যে স্থান হইতে শুণ্ড উত্থিত হইয়াছে শিল্প-চাতুর্য উভয়ক্ষেত্রেই এমনই সাদৃশ্যপূর্ণ যে হয় একই ব্যক্তি কর্তৃক উহারা অঙ্কিত, নতুবা একই সম্প্রদায়ের চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। তুন-হুয়ঙের গণেশ কক্ষের উপরে লম্বা, সরু, শ্বেত শুণ্ডটী বাম হস্তে যে ভাবে ধরিয়া আছেন এন্‌ডেয়ারের গণেশও ঠিক সেইভাবে একটী লম্বা সরু মূলা ধরিয়া আছেন। মাথার পাগড়ীতে ইরানীয় প্রভাব বিদ্যমান। পাগড়ীটী সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া উভয় গণেশের কপালের উপর বাঁধা হইয়াছে। ইহা চীন-তুর্কস্তানের দন্দান-উইলিগের (Dandan Uilig) বিখ্যাত অঙ্কিত চিত্র বজ্রপানির পাগড়ীর অনুরূপ। এন্‌ডেয়ারের গণেশের পায়জামা পারস্যবাসী-

1. H. de e'E O tome 1 p. 316.

দের ন্যায় টান করিয়া বাঁধা। তুন-হুয়ঙের গণেশের পায়জামা এইভাবে নাই। তাহা মধ্য-এশিয়ার পায়জামার অনুরূপ। তুন্-হুয়ঙে শুঁড়টী দক্ষিণে ফেরান আর এন্‌ডেয়ারে বামে ফেরান; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একই ভাবে অঙ্কিত। প্রথমে শুঁড়ের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বভাবে ঝুলান এবং পরে পার্শ্বে ফেরান ও উপরদিকে স্কন্ধ পর্যন্ত প্রথমাধ'র সহিত সমান্তরাল ভাবে টানা। তুন্-হুয়ঙের চিত্রে দক্ষিণ হস্তটী স্কন্ধের সহিত এক সমরেখায় অবস্থিত। এই হস্ত হইতে শুঁড়টী একটী পিষ্টক লইতে উদ্যত। বাম-হস্ত ও শুঁড়ের ভঙ্গিটী বক্ষের নিকট একটু স্বতন্ত্র রকমের। এপর্যন্ত এইরূপ ভঙ্গিমা আর কোথাও দেখা যায় নাই।

তুন-হুয়ঙের প্রাচীন-চিত্র ও কুঙ্-সিয়েনের ভাস্কর্য দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি সম-সাময়িক। অবশ্য একই কারণে ইহাদের উৎপত্তি হয় নাই। ভারত ও চীনদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গণেশের স্তর-মূর্তি কুঙ্-সিয়েনের বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরের অল্পমাত্র উদ্গত ভাস্করমূর্তিটী।[১] একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ৫৩১ খ্রীস্টাব্দে ইহার জন্ম। এই মূর্তিটী ব্যত্যস্ত-পাদ। দক্ষিণ হস্তটী উর্ধে উত্তোলিত হইয়া একটী পদ্ম ধরিয়া আছে এবং বাম হস্তটী একটী চিন্তামণি ধরিয়া ক্রোড়ের উপর ন্যস্ত। শিলালিপিতে ইঁহাকে 'হস্তি-প্রেতাধিদেব' বলা হইয়াছে। ইঁহার সহিত অন্যান্য নয়টী নিকৃষ্টতর 'প্রেতাধিদেব' রহিয়াছে। ঠিক এই দলটীর প্রতীক ৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটী বৌদ্ধ স্মৃতি ফলকের নীচে রহিয়াছে।[১] এই স্মৃতিফলকটী পূর্বে M. Victor Golutewর অধিকারে ছিল। বর্তমানে ইহা Bostonএ রক্ষিত আছে।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ নবগ্রহ ও সপ্তমাতৃকের মধ্যে গণেশের মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু চীন-দেশে অন্যান্য নয়টী দেবতা-(প্রেতাধিদেব) র সহিত তাঁহাকে দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই সমষ্টির মাঝে গণেশকে কখনও দেখা যায় না। এই দেবতাগণ নাগ, বায়ু, মুক্তা, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্বত, মৎস্য, সিংহ, পক্ষী এবং হস্তী প্রেতাধিদেব। ইহাদের মধ্যে সিংহ, পক্ষী এবং হস্তীর প্রাধান্য চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্মে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সিংহ এবং হস্তীর বিশেষ প্রাধান্য। সিংহ সমন্তভদ্রের এবং হস্তী জ্ঞানের দেবতা মঞ্জুশ্রীর বাহন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষ হইতে একটী গণেশের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি চীন দেশে আনা হইয়াছিল। কুঙ্ সিয়েনের মূর্তি তাহা হইতেই উদ্ভূত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে যুগে চীনদেশে হস্তী একেবারে ছিল না বলিলেই হয়, সুতরাং চীন ভাস্করের পক্ষে তখন হিন্দু-ধারণার অনুরূপ গণেশকে মৌলিকভাবে নির্মাণ করা অসম্ভব ছিল বলিলেই হয়।

চীনাগণের মধ্যে তাহাদের দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি পূজা করিবার প্রথা ছিল না। সম্ভবতঃ চীন হইতে আগত তীর্থযাত্রীরা ভারত হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গণেশের মূর্তিপূজা তাঁহাদের পক্ষে গ্রহণ করা স্বাভাবিক ছিল, কারণ হস্তিমূর্তিকে তাঁহারা বুদ্ধের বলিয়া মনে করিতেন। (ক্রমশঃ)

1. v. Ars Asiatica, vo.l. II. p.15.

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

বেদান্ত দর্শনের পূর্বোক্ত প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থূল ভাগে ভাগ করিতে পারি—(১) অনুবন্ধচতুষ্টয় (২) প্রমাণ (৩) অধ্যাত্ম বিদ্যা (৪) ব্রহ্মবাদ (৫) জগৎবাদ (৬) মনস্তত্ত্ববাদ (৭) সাধনা ও (৮) মুক্তি। বেদান্ত দর্শনের প্রত্যেক ভাষ্যকারই এই ৮টী বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং এইগুলির প্রসঙ্গ ক্রমে অন্যান্য বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন। এইগুলির সম্বন্ধে সূত্রকার বাদরায়ণের মতবাদ কি তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিব। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে এ বিষয়ে কত রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে। তারপর সর্বশেষে সূত্রকার বাদরায়ণের মত নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইবে। পূর্বেই বেদান্ত দর্শনের ১২টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যেক সম্প্রদায়, তাহার মতবাদ, ও আচার্যদিগের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(ক) কেবলাদ্বৈতবাদ

(১) গৌড়পাদ

প্রকৃতপক্ষে আচার্য গৌড়পাদকেই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে, কারণ প্রাচীন আচার্যদিগের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থগুলি বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্যের মধ্যে আমরা বার্তিককার উপবর্ষের নাম দেখিতে পাই। ইনি পাণিনির গুরু ছিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর একখানি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। তদ্ব্যতীত সুন্দর-পাণ্ড্য নামধেয় অন্য এক প্রাচীন আচার্যের কথাও শঙ্করভাষ্যের মধ্যে আছে (ব্রঃ সূঃ ভাঃ ১.৪) কিন্তু তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থের উল্লেখ নাই এবং পাওয়া যায় না। সুতরাং গৌড়পাদকেই আমরা এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য বলিয়া গণনা করিতে পারি। মাণ্ডুক্য-কারিকা হইতে তাঁহার মতবাদকে ৫টী বিষয়ের উপর স্থাপিত বলা যাইতে পারে—(১) ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব স্থাপন (২) মায়াবাদ (৩) পরমসত্তা কারণাতীত (৪) জ্ঞানই মুক্তির প্রধান সহায় (৫) বিজ্ঞানবাদীদের শূন্যবাদ অপ্রামাণিক। "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহাই এককথায় অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব। ব্রহ্মই পরমসত্তা, আত্মা অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ নহে, বিকার নহে বা পৃথক নহে।

গৌড়পাদের মতবাদে বৌদ্ধদর্শনের বিশেষতঃ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের প্রভাব বিশেষ-রূপে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার আবির্ভাব কাল যদি ৫৫০ খৃঃ ধরা যায় তবে তাহা বৌদ্ধদিগের বিশেষ প্রতিপত্তির সময়, সুতরাং তাঁহার মতবাদে এই প্রকার বৌদ্ধপ্রভাব অস্বাভাবিক নহে।

যাহা হউক, মনস্তত্ত্বই তাঁহার দর্শনের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। জীবাত্মাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ ইহার তিনটী অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। দৃশ্যত্ব সামান্যে তাঁহার নিকট জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয় দৃশ্যই সমান, তবে উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে স্বপ্নের দৃশ্য জাগরণ মাত্রে বিলীন হইয়া যায় এবং উহা কেবল একজন দ্রষ্টারই নিজস্ব, পরন্তু জাগরণের দৃশ্য সাধারণ। কিন্তু সেকারণ স্বপ্নের দৃশ্য দৃশ্য নহে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহাও দেখা যায় যে জাগরণের দৃশ্যও আত্মার অন্য একটী অসাধারণ অবস্থায় (তুরীয়াবস্থায়) মিথ্যা হইয়া যায়। তাহা ছাড়া সুষুপ্তি অবস্থাও জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয় অবস্থারই বাধক (negation) হয়। আরও একটা কথা এই যে আমরা যে জাগ্রৎ দৃশ্যকে সর্বসাধারণ বলিতেছি তাহা কি অপর লোকের মনের অবস্থাগুলি নিজে অনুভব করিয়া বলিতেছি? তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের কথায় বিশাস করিয়া ধারণা করিয়া লইতেছি। সুতরাং জাগ্রৎ এবং স্বপ্নদৃশ্য স্ব স্ব সীমার মধ্যে উভয়েই সত্য এবং অসংলগ্ন নহে, কারণ স্বপ্নের পিপাসাও স্বপ্নের জলের দ্বারা নিবারিত হয়। আবার তুরীয়াবস্থার তুলনায় উভয় দৃশ্যই মিথ্যা। সুতরাং তাঁহার মতে জীবন একটী জাগ্রৎ স্বপ্নমাত্র। যাহা ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই সত্য তাহাকেই সত্য বলা যাইতে পারে। "আদাবন্তে যন্নাস্তিবর্তমানেঽপি তত্তথা" অর্থাৎ যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে সত্য নহে, বর্তমানেও তাহা সত্য নহে। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে সমুদয় দৃশ্য আমাদের মন বহির্জগৎ হইতে গ্রহণ করে তাহা কি আলম্বন বিহীন? তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন আত্মা বা ব্রহ্মই এই সমুদয় দৃশ্যের আলম্বন। স্বকল্পিত মায়া দ্বারা আত্মা এই বিভিন্ন নামরূপধেয় জগতের সৃষ্টি বা কল্পনা করিতেছেন। "কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া" এস্থলে দেখা যাইতেছে তিনি জীবজগতের মিথ্যাত্ব স্বীকারসত্বেও বৌদ্ধদের শূন্যবাদ গ্রহণ করিতেছেন না। এক্ষণে প্রশ্ন—এই মায়া কি? তাহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন, ইহা সৎ নহে, অসৎও নহে, এবং সদসৎও নহে অর্থাৎ অনির্বচনীয়া এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেই উহা বিনষ্ট হয়—তচ্চ ন সৎ নাসৎ, নাপি সদসৎ, ন ভিন্নম্ নাভিন্নম্, নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ; ন নিরবয়বম্ ন সাবয়বম্ নোভয়ম্, কেবলব্রহ্মাত্মৈক্যত্বজ্ঞানাপনোদ্যম্। অবশ্য একটা জিনিষ সৎও নহে অসৎও নহে ইহা পরস্পরবিরুদ্ধ এই প্রকার মনে হইতে পারে, কিন্তু যখন পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ আমাদের নিকট তাহাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে, তখন তাহাকে অসৎ বলা যাইতে পারে না। আবার যখন পূর্ণজ্ঞানে ইহা বিলীন হইয়া যায় তখন তাহাদিগকে সৎও বলা যাইতে পারে না, সুতরাং ইহা অনির্বচনীয়া। বেদান্তের যে মায়াবাদ শঙ্কর দর্শনের মধ্যে মহীরুহাকারে পরিণত হইয়াছে. তাহার অঙ্কুর আমরা গৌড়পাদের মতবাদে দেখিতে পাইতেছি।

সৎ বস্তু তাহা হইলে কি? তাঁহার মতে যে বস্তু অজ, যাহা স্বরাট্ অর্থাৎ যাহার সত্তা অনন্যসাপেক্ষ এবং যাহার সত্তা কখন ধ্বংস বা বিকারপ্রাপ্ত হয় না, তাহাই সৎ। একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই এই প্রকার সৎবস্তু হইতে পারে।·তবে আত্মার প্রকৃতস্বরূপ সৎ, কিন্তু ব্যক্তিগত বা জীবাত্মভাবে সৎ নহে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যদি একই আত্মা সমুদয় জীবের মধ্যে বর্তমান,

তবে একের সুখ দুঃখে অন্যের তাহা অনুভব হয় না কেন? তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন যেমন আকাশ যদিও এক এবং অবিচ্ছিন্ন, তথাপি এক ঘটাকাশাস্থিত ধূম বা মলিনতা অন্য ঘটাকাশে বর্তমান থাকে না, ইহাও তদ্বৎ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ কি প্রকারের? ইহা অংশাংশী বা কার্যকারণ সম্বন্ধ নহে; অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার বা ব্রহ্মের অংশ নহে, ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত নহে বা ব্রহ্মের বিকার নহে। অন্তঃকরণাদি উপাধি জন্য ইহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

তাঁহার মতে পরমাত্মা কারণাতীত। কার্যকারণবাদ (Theory of Causality) তাঁহার নিকট একটা হেঁয়ালী মাত্র। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের দৃশ্যাদির নিয়ম এবং পরস্পর সম্বন্ধ দেখিতে পাই বটে কিন্তু যদি সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করা যায়, দেখা যাইবে কার্য-কারণ-বাদ অসম্ভব। কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ কি? তাহারা সমসাময়িক হইতে পারে না। কার্য অবশ্য কারণের অনুগমন করিবে কিন্তু বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে আমরা এ বিষয়ে ঠিক্ ধারণা করিতে পারি না। কোন বস্তুকে আমরা কার্য বলিতে পারি না যদি তাহার কারণ না জানি; আবার যাহা কোন একটী বস্তুর কারণ তাহা নিজে অপর বস্তুর কার্য। তাহা হইলে হয় আমাদিগকে বলিতে হইবে যে এ ধারার অন্ত নাই কিংবা একটী আদি কারণ ধরিয়া লইতে হইবে যাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না অর্থাৎ যাহা চিরন্তন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যাহা চিরন্তন এবং অনাদি তাহা কি প্রকারে নিজের স্বভাবের ব্যতিক্রম না করিয়া কার্যে পরিণত হইতে পারে? তাহা অসম্ভব। সুতরাং এই কার্যকারণবাদ কেবল ব্যবহারিক জগৎ সাপেক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কোন সদ্‌বস্তু হইতে সৃষ্টি অসম্ভব এবং অসৎ বস্তু হইতেও সৃষ্টি হইতে পারে না; সুতরাং সৃষ্টিই অসম্ভব (স্বতো বা পরতোবাপি নকিঞ্চিৎ বস্তু জায়তে)। আমরা যাহা সৃষ্টি দেখিতেছি, তাহা গন্ধর্বনগরবৎ মিথ্যা (স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা। তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ) আমরা যে নিত্য নানাত্বের অনুভব করিতেছি তাহা মায়ানিমিত্ত। গৌড়পাদের দর্শনে মায়া শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া"

"মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ম্"

আবার কখনও মিথ্যা এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ("স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টং" অলাতশান্তি দৃষ্টান্ত ইত্যাদি) আবার কখনও ইহা অনির্বচনীয়া এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন (তচ্চ ন সৎ নাসৎ, নাপি সদসৎ ইত্যাদি)। আচার্য শঙ্কর পরবর্তিকালে মায়াকে অনির্বচনীয়া এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন এবং মায়াবাদকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন। গৌড়পাদ জগতের সত্তা সম্বন্ধে অনেকটা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতাবলম্বী, কিন্তু শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক সত্তা এবং পারমার্থিক সত্তা স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন। ইহাই সংক্ষেপে গৌড়পাদের মতবাদ।

(ক্রমশঃ)

উন্নতির সমাজ-শাস্ত্র

ডক্টর **শ্রীবিনয়কুমার সরকার** এম্. এ., বিদ্যাবৈভব

১৯০৫ সালের গৌরবময় বাঙালী বিপ্লবের পর আজ তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর চলিতেছে। পশ্চিমা হিসাবে ইহা এক পুরুষ কাল। এই এক পুরুষে গোটা ভারত, ভারতশ্রী আর শ্রীভারতী সবই অনেকখানি বাড়িয়াছে। আমাদের বাংলাদেশ আর বাঙালী জাতিও বেশ-কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু বাড়িয়াছে [illegible]টা, বাড়িয়াছে কোন্-কোন্‌দিকে, জীবনের গতিভঙ্গী কিরূপ, গতির হার কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় অথবা বাংলার বহির্ভূত ভারতে বেশী আলোচনা হয় নাই। এই সকল দিকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। বাড়্‌তি-বিজ্ঞান বা উন্নতি-তত্ত্ব সমাজ-শাস্ত্রের এক বড় আলোচ্য বিষয়।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা "আঙ্গুল ফুলে' কলাগাছ" হইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের মেজাজ অল্পেই, নেহাৎ অল্পেই,—সন্তুষ্ট। অধিকন্তু, যেসকল বাড়তি বা উন্নতি তাঁহাদের নিজ জীবনের সঙ্গে জড়িত অথবা যে সকল বাড়তির ধাপগুলা তাঁহাদের পরিবারের কোনো-না-কোনো লোকের কৃতিত্ব বা কীর্ত্তির পরিপোষক, সেই সকল উন্নতি-বাড়তির আলোচনা কিম্বা সমালোচনা এই ধরণের লোকের মেজাজে ঠাঁই পায় না। পাইতে পারে না।

কিন্তু পাঁচ কোটি বাঙালীর কথা অথবা পঁয়ত্রিশ কোটী ভারতীয় নরনারীর বর্ত্তমান ও আগামী ভবিষ্যৎ যাহাদের চিন্তায় ঠাঁই পায় তাহাদের পক্ষে এইরূপ "আঙ্গুল ফুলে কলা-গাছ"—হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভবপর নয়। তাহারা বরং কলাগাছগুলাকে বাঁশের কঞ্চি মাত্র অথবা এমন কি মামুলি দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না। ষাঁড়ের ঘাড়ে মশাটা যে মশামাত্র এই সামান্য কথাটা মশা মশায়ের মনে থাকে না। কিন্তু তার আশে-পাশে ইঁদুর-টিকটিকি, গরু-বলদ, কুকুর-বিড়াল সকলেই মশার হাঁমবড়ামি দেখিয়া পরস্পর হাসাহাসি করে।

বাঙালীর যৌবনশক্তিকে আজ আত্ম-সমালোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে। আত্ম-সমালোচনার জন্য স্বতন্ত্র আত্মিক আন্দোলন যুবক ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সমা-লোচনার কষ্টিপাথর সম্বন্ধেও একাধিক আলোচনা-সমালোচনা চাই। ১৯০৫ এর পূর্ব্বেকার যুবক ভারত আর যুবক বাংলা কি ছিল, ১৯৩৯ সনের যুবক ভারত আর যুবক বাংলা কোথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, এই সকল বিষয়ে মগজ খেলাইবার জন্য চাই গণ্ডা-গণ্ডা গবেষক, লেখক, বক্তা। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতন উন্নতি-বিজ্ঞান বা বাড়তি-বিজ্ঞানের জন্যও যুবক বাংলায় আর যুবক ভারতে বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি, আর মতামত পুষ্ট হইতে থাকিলে আমাদের একটা মস্ত অভাব পূরণ হইবে।

উন্নতি-বাড়তি মাপা সম্ভব আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে। এই জরীপ চালানো যাইতে পারে রাষ্ট্রীক আন্দোলনের কর্ম্ম ও চিন্তা সম্বন্ধে। তাহা ছাড়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি নানাপ্রকার বিদ্যা কলার ক্ষেত্রে ভারতসন্তান, আর বঙ্গসন্তান এই এক পুরুষে কতখানি

আগাইয়া আসিয়াছে তাহাও মাপাজোকা চলিতে পারে। জরীপ করিবার জন্য লোক চাই বহুবিধ, বহু সংখ্যক এবং বহু মেজাজের। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের আসল জিজ্ঞাস্য,—এ কালের ভারত-সন্তানেরা কলাগাছ না কঞ্চি, না দেশলাইয়ের কাঠি। বলা বাহুল্য, কতকগুলা নির্লজ্জ, বেহায়া, খাতির-নদারৎ, ঠোঁটকাটা সমজদার চাই। এই ধরণের নয়া-নয়া নির্লজ্জ বেহায়া সমালোচকের উপর আগামী তিন পাঁচ-সাত বৎসরের বঙ্গজীবন ও ভারত-জীবন নির্ভর করিতেছে। বাড়তি বা উন্নতির চাবী এই সব বেহায়াদের হাতে। সমাজ বিজ্ঞানের আসরে বেহায়াদের ঠাঁই খুব উঁচু।

আত্ম-সমালোচনা, বেপরোয়া, নিরপেক্ষ, ঠোঁটকাটা, খোলা-মাঠের বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো লোক কেনোদিন একটা বড়-কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। একটা দল, সঙ্ঘ, সমাজ, দেশ ইত্যাদি বৃহত্তর সত্তাকে ঠেলিয়া তুলিবার জন্যও জরুরী ঠিক এই ধরণের খোলা মাঠের সমালোচনা। প্রতি মুহূর্তেই চাই প্রত্যেক ব্যক্তি ও সঙ্ঘের জন্য ব্যক্তি-নিরপক্ষ, সঙ্ঘ-নিরপেক্ষ পরিদর্শন ও পর্যালোচন। সর্বদাই প্রত্যেক আত্মিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন এই ধরণের সংশোধন ও সংমার্জনের জন্য বসিয়া আছে। নিজকে শুধরাইবার জন্য ও মেরামৎ করিবার জন্য যে লোকটা, যে দলটা, যে প্রতিষ্ঠানটা সর্বদা প্রস্তুত নয় তাহার কপালে উন্নতির বরাদ্দ শূন্য।

এই ধরণের সংশোধন, সংমার্জন ও শুধরাণো ইত্যাদি কাজের জন্য ওস্তাদ কাহারা হইতে পারে? আমার বিশ্বাস, দুই ধরণের অথবা দুই বয়সের লোক এই সকল ঠোঁটকাটা সমালোচনা ও খাতির-নদারৎ প্রশ্নাপ্রশ্নি করিতে অধিকারী। প্রথমতঃ যাহারা মোটের উপর ১৬ হইতে ২০ বয়সের তরুণ-তরুণী, এক কথায় যাহারা ইস্কুল-কলেজের আওতা এখনো পার হয় নাই, বস্তুতঃ যাহারা এখনো ইস্কুল-কলেজের খানিকটা নীচের সিঁড়িতেই পায়চারি করিয়া থাকে। বর্তমান দুনিয়াটা যে নেহাৎ অপদার্থ একথা চিন্তা করার এবং বিশ্বাস করার ক্ষমতা একমাত্র তাহাদের। সংসারের অধিকাংশ লোকগুলা যে স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, ম্যাড়াকান্ত, "আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ" এইরূপ মত প্রচার করিবার মতন বুকের পাটা তাহাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। কোনো নামজাদা লোকের দিকে তাকাইয়া তাহারা মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হয় না। কোনো নামজাদা লোকের হাসির উপর তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না। তাহারা ভাবিতে সমর্থ যে, দুনিয়াটা যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাদের হাতে আসিলে দুনিয়া সে ভাবে চলিবে না। তাহারা নামজাদাগুলাকে কলা দেখাইয়া একদম অজানা পথে দুনিয়াটাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তা করা আহাম্মুকি হইতে পারে, অলীক কল্পনা হইতে পারে, চরম বেআদুবি হইতে পারে। কুছ পরোয়া নাই। কিন্তু দুনিয়ার সকল দেশে সকল যুগে ১৬-২০ বৎসরের তরুণ-তরুণীরা সংসারের দিকে তাকাইয়াছে আর বলিয়াছে,—"সবুর কর্ দুনিয়া, আমরা তোকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িব"। পৃথিবীর উন্নতির গোড়ার কথা এইখানে। এই আহাম্মুকি-বেআদুবির ভিতরই আধ্যাত্মিক দম্ভল কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। ১৯০৫ সনের যুবক বাঙলায় আর যুবক ভারতে যাহারা ১৬-২০ বৎসরের

লোক ছিল তাহাদের মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বিগত সাড়ে তিন দশকের কর্ম-বীর ও চিন্তাবীরগণ। এই সকল কর্মবীর ও চিন্তাবীরের কিম্মৎ যাহাই হোক না কেন, তাহারা ১৬-২০ বৎসর বয়সে অন্ততঃ একবার স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, দুনিয়াটাকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দুরস্ত করিবার একতিয়ার একমাত্র তাহাদের।

আজ ১৯৩৯ সনের ষোল হইতে বিশ বৎসর বয়সের তরুণ-তরুণীদের ভিতর যাহারা কল্পনা করিতেছে, যে ১৯০৫ সনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার কিম্মৎ এক দামড়িও নয়, একমাত্র তাহারাই আগামী তিন-পাঁচ-সাত বৎসরের বাঙালী ও অ-বাঙালী ভারতীয় সমাজকে চাবকাইয়া বড় করিতে পারিবে।

এইবার বলিব দ্বিতীয় ধরণের বা বয়সের লোকের কথা। যাহাদের বয়স বৎসর ছাব্বিশেক পার হইয়াছে অথচ যাহারা এখনো ত্রিশকে জবাব দেয় নাই তাহাদের কথা বলিতে চাই। এই লোকগুলা ইস্কুল-কলেজ জাতীয় পাঠশালার লেখাপড়া খতম করিয়াছে। তাহাদের চোখের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে দুনিয়া। এই সকল লোকের ভিতর যদি মানুষের মতন মানুষ থাকে তাহা হইলে তাহারা কি করিবে? তাহারা কোনো নামজাদা জন-নায়কের, কর্ম্মবীরের বা চিন্তাবীরের পেছন-পেছন ছুটিয়া নিজের বা দেশের ভবিষ্যৎ গড়িবার চেষ্টা করিবে না। তাহারা বসিবে সকল প্রকার হোমরা-চোমরাগুলাকে জরীপ করিতে,—দেখিবে রামা কিঞ্চিৎ-কিছু করিয়াছে বটে তবে বেশী কিছু নয়। তাহারা বলিবে, আবদুলের কিম্মৎ নেহাৎ মন্দ নয় তবে হাতী-ঘোড়াও নয়, ইত্যাদি। নাক্ সিঁট্‌কানো তাহাদের ব্যবসা হইবে না। তাহাদের ব্যবসা হইবে "কত ধানে কত চাল" বস্তুনিষ্ঠরূপে বুঝিয়া লওয়া। তাহাদের লক্ষ্য থাকিবে বিগত ৩৩।৩৪ বৎসরের সকল প্রকার ভারতীয় ও বাঙালী কাজ এবং চিন্তাগুলাকে বাজাইয়া দেখা। বাজাইতে বাজাইতেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে, আজ পর্যন্ত বেশী-কিছু সাধিত হয় নাই। লাফালাফি করিবার কিছু নাই। চাই নতুন লোক, চাই নতুন উন্মাদনা, চাই নতুন স্বার্থত্যাগ, চাই স্বাধীনতার নতুন আকাঙ্ক্ষা, চাই স্বদেশসেবার নতুন অধ্যাত্মিকতা।

যে কয়টা লোক কাজ বা চিন্তা করিয়াছে তাহাদিগকে স্বর্গে তোলাও বেআকুবি আবার নরকে পাঠানোও আহাম্মুকি। কঞ্চিকে কঞ্চি বলা উচিৎ। কঞ্চিটা কলাগাছও নয়, দেশালাইয়ের কাঠিও নয়। আজ চাই গণ্ডা-গণ্ডা, ডজন-ডজন ২৬-৩০ বৎসরের লোক যাহারা নতুন-নতুন জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে নয়া-নয়া দুনিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িবে, আর ভাবিবে যে, ১৯০৫-৩৯ এর লোকেরা যেখানে পাইয়াছে শতকরা ১৫-২৫ মাত্র সেখানে তাহারা পাইয়া ছাড়িবে, কমসে-কম ২৫-৩৫। বৎসর বার-তের হইল একপ্রস্থ "ত্যাঁদড়ের দর্শন" ঝাড়িয়াছিলাম ("নয়াবাংলার গোড়াপত্তন" প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য)। ত্যাঁদড়ের দর্শনেরই এক কাঁচ্চা আজ আবার পরিবেষণ করা গেল। সুরু হউক একালের তাজা বাংলার আবার এক নয়া জীবনের ধারা। দেখা যাউক ভারতশ্রী, শ্রীভারতী আর বঙ্গ-গৌরব কোথায় গিয়া ঠেকে।

জৈন-তীর্থংকর

শ্রীঅজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য এম্. এ.

মানুষ দুঃখের বাঁধন হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য অবিরত চেষ্টা করে, সে ভাবে এই বাঁধন কখনও স্বাভাবিক নয়, যদি ইহা স্বাভাবিক হয় "তবে তাহা হইতে কখনও তাহার ছাড়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ স্বভাব, ইহা কখনও অন্যরূপ হইতে পারে না, আগুন আগুনই, ইহা গরম, সবসময় ইহা গরমই থাকিবে, তাই সে স্থির করিল, তাঁহার বাঁধনটী হইয়াছে আগন্তুক, কোন বাহিরের কারণে ইহা ঘটিয়াছে, আয়না স্বভাবতঃ পরিষ্কার, বাহিরের ধূলায় ময়লা হয়, ঘষিলে মাজিলে আবার পূর্বের মত পরিষ্কার হইয়া উঠে। ১

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই আগন্তুক ধর্ম ছাড়া আমাদের আত্মার স্বভাবগত ও ধর্ম আছে, জৈনদার্শনিকগণের মতে তাহা চারিটী—অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তবীর্য ও অনন্তসুখ। কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা আত্মা যখন কর্মপুদ্গল হইতে সম্যগ্‌ভাবে মুক্ত হয়, তখন সহজেই আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায় ও মোক্ষাবস্থার প্রাপ্তি হয়। ২ আত্মার এইরূপ উৎকর্ষ লাভ হইলে সে তীর্থংকর নামে অভিহিত হয়। ৩ কর্মক্ষয়ের দ্বারা যে আত্মা উৎকর্ষ লাভ করে তাহা দুইভাগে বিভক্ত, সশরীর এবং অশরীর; যে সমস্ত অশরীরী আত্মা নির্বাণ লাভ করিয়া অলোকাশে অনন্ত সুখ উপভোগ করে তাহাদিগকে সিদ্ধ বলে। ৪ এখানে মনে রাখিতে হইবে যে জৈনমতে আত্মা ঊর্দ্ধগতি কিন্তু অলোকাশ লাভের পর গতিরহিত হইয়া যায়, সিদ্ধগণকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, তীর্থংকর সিদ্ধ ও সামান্য সিদ্ধ। তীর্থংকরসিদ্ধেরা সশরীরাবস্থায় ধর্মোপদেশ ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়া থাকেন এবং শরীর ত্যাগের পর সিদ্ধের সমপর্যায়ভুক্ত হন। সামান্যসিদ্ধগণ কোনরূপ উপদেশাদি দেন না, পরন্তু দেহত্যাগের পর সিদ্ধরূপ লাভ করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কর্মক্ষয়োপশম হইলে আত্মা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মা সশরীরী ও অশরীরী এই দুইভাগে বিভক্ত। সশরীরীগণকে অর্হৎ বলা বলা হয়, এবং তাঁহাদিগকেই জৈনগণ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন; তাহা ছাড়া ন্যায় ও যোগদর্শনের মত তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করিতে চান না। এ ছাড়া জৈনগণের আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু আছেন। আচার্যদের বত্রিশটী, উপাধ্যায়ের পঁচিশটী ও সাধুদের আটাশটী গুণ থাকে।

সিদ্ধ, অর্হৎ আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই পাঁচজনকে সম্মিলিতভাবে জৈনগণ পঞ্চ-

(১) মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে (কুমিল্লা) দর্শন-শাখার পঠিত অভিভাষণের ষষ্ঠ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) কর্মফলবিপ্পমুক্কো উড্‌ঢং লোকস্স অন্তমধিগংতা। সো সব্‌বণাণ্‌ দরিসী লহদি সুহমণিংদিয়মণংতম্‌॥-পঞ্চাস্তিকায়গাথা ২৮।

(৩) কেবলদংসনণাণসুহবিরিউ জো জিঅণংতু।
স জিনদেউঙ্গী পরমমুণি পরমপকাসু মুণংতু॥—যোগেন্দ্রাচার্যকৃত পরমাত্মপ্রকাশগাথা, ৩৩০ জিন দেউ = জৈনদেব = তীর্থংকর

(৪) জেসিং জীবসহাবোণত্থি অভাবো য সব্বহা তস্স।
তে হোংতি ভিন্নদেহা সিদ্ধা বচিগোয়রমদীদা॥—কুন্দকুন্দাচার্যকৃত পঞ্চাস্তিকায়গাথা ৩৫।

(৪) সর্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোর্হন্‌ পরমেশ্বরঃ॥—সর্বদর্শনসংগ্রহে আর্হত মতে উদ্ধৃত।

পরমেষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করেন, এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রতিদিন লক্ষাধিকবার ভক্ত্যঞ্জলি প্রদান করেন। ১

পাপপঙ্কে নিমগ্ন মানবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য জৈন তীর্থংকরদের আবির্ভাব হয়, অবসর্পিণী ২ কালে চব্বিশ জন তীর্থংকরের আবির্ভাব হইয়াছে। তীর্থংকর শব্দের অর্থ দুইটী তীর্থকে যিনি করেন তিনি তীর্থংকর। তীর্থ শব্দের অর্থ ঘাট; ঘাট দিয়া যেমন লোক অতি সহজেই নদী পার হইয়া যায়, সেইরূপ তীর্থংকর-প্রচারিত উপদেশবাণী অনুসরণ করিয়া অতি সহজেই ভবনদী পার হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদিগকে তীর্থংকর বলা হয়, ৩, অথবা তীর্থ শব্দের অর্থ সঙ্ঘ, সাধু, সাধ্বী, ও শ্রাবক। এই চারিজনকে লইয়া এক একটী সঙ্ঘ হয়, সেই সঙ্ঘের যাঁহারা কর্তা তাঁহাদিগকেও তীর্থংকর বলা হইয়া থাকে। ৪

জৈনদের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেব বা আদিনাথ—নাভিরাজ তাঁহার পিতা ও মরুদেবী তাঁহার মাতা; ইক্ষ্বাকুবংশে অযোধ্যার অন্তর্গত বিনীত নামক স্থানে জন্ম, কাহারও মতে উত্তর কাশ্মীরে জন্ম। সে সময়ের রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁহার ভগিনী সুমঙ্গলাকে প্রথম বিবাহ করেন, দ্বিতীয়বার তিনি সুনন্দাকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ভরত ও ব্রাহ্মী এবং দ্বিতীয়স্ত্রীর গর্ভে বহুবল ও সুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। ভরত ও বহুবলের বংশই সূর্য-ও চন্দ্রবংশ বলিয়া খ্যাত--- এইরূপ চরিতাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। ভরতের নাম অনুসারেই তাঁহার রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ হয়। ঋষভদেব পুত্রদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন, এবং জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন। তাঁহার দেহের পরিমাণ ছিল পাঁচ শত ধনু, রং ছিল সোনার মত। আয়ুষ্কাল ছিল ৮,৪০০,০০০ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান কৈলাস পর্বত—মতান্তরে অষ্টপদ পর্বত। বাহন ছিল বৃষভ।

দ্বিতীয় তীর্থংকরের নাম অজিতনাথ। রাজা জিতশত্রু তাঁহার পিতা, রাণী বিজয়াদেবী তাঁহার মাতা, আদিনাথের জন্মের পঞ্চাশ লক্ষ কোটী সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে, অযোধ্যায় রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম হয়, দেহের পরিমাণ ৪৫০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৭২ লক্ষ পূর্ব, নির্বাণ-লাভের স্থান বঙ্গদেশের পরেশনাথ পর্বত, বাহন হস্তী।

তৃতীয় তীর্থংকরের নাম সম্ভব নাথ। তাঁহার পিতা রাজা জিতারি, মাতা সেনা দেবী,

ঘণঘাইকম্মরহিয়া এবং কেবলণাণা য পরমগুণসহিয়া,
চৌতিসঅতিসয়জুত্তা অরিহংতা এরিসা হোংতি ॥—কুন্দকুন্দাচার্যের নিয়মসার ৭১।

(১) অঞ্জলি-মন্ত্র "নমো অরহংতারং, নমো সিদ্ধাণং। নমো আয়ারিয়াণং, নমো উবঝায়াণং নমো লোয়ে সব্বসাহুণম্"

(২) অবসর্পিণী কালে অধর্মের প্রভাব খুব বেশী থাকে, উৎসর্পিণী কালে ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। জৈনগণ সময়কে একটী কুণ্ডলীকৃত সর্পের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন, পৃথিবী যখন সর্পের মুখ হইতে লাঙ্গুলের দিগে আসিতে থাকে তখন তাহাকে অবসর্পিণী কাল বলা হইয়া থাকে, আবার লাঙ্গুল হইতে মুখের দিগে গেলে তাহাকে উৎসর্পিণী বলা হইয়া থাকে।

(৩) "যেন প্রণীতং পৃথু ধর্মতীর্থং জ্যেষ্ঠং জনাঃ প্রাপ্য জয়ন্তি দুঃখম্"। —বৃহৎস্বয়ম্ভুস্তোত্র ৫।

(৪) অভিধানরাজেন্দ্র ও মিস্ সিনক্লেয়ারের "Heart of Jainism" দ্রষ্টব্য।

অজিত নাথের জন্মের ত্রিশ লক্ষ কোটী সাগর পরে ঈক্ষ্বাকুবংশে শ্রাবস্তী নগরে ১ পূর্বাষাঢ় নক্ষত্রে জন্ম হয়, দেহের পরিমাণ ছিল ৪০০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ছিল ৬০ লক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেতাশিখর (বর্তমান পার্শ্বনাথ পর্বত) তাঁহার বাহন অশ্ব।

চতুর্থ তীর্থংকরের নাম অভিনন্দননাথ। রাজা সম্বর তাঁহার পিতা রাণী সিদ্ধার্থা। তাঁহার মাতা, সম্ভবনাথের জন্মের ত্রিশ লক্ষ কোটী সাগর পরে, অযোধ্যায় ঈক্ষ্বাকুবংশে পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন, উচ্চতা ৩৫০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৫০ লক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেত শিখর, তাঁহার বাহন বানর।

পঞ্চম তীর্থংকরের নাম সুমতিনাথ—তাঁহার পিতা ছিলেন রাজা মেঘপ্রভ, মাতা ছিলেন মঙ্গলা, অভিনন্দন নাথের জন্মের নয় লক্ষ কোটী সাগর পরে, অযোধ্যাতে ঈক্ষ্বাকু বংশে মঘা নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম, দেহের পরিমাণ ছিল ৩০০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ আয়ুষ্কাল ৪০ লক্ষ পূর্ব, নির্বাণ-লাভের স্থান সমেতাশিখর, বাহন ক্রৌঞ্চ।

ষষ্ঠ তীর্থংকরের নাম পদ্মপ্রভ। তাঁহার পিতা ছিলেন রাজা প্রতিষ্ঠ, মাতা ছিলেন রাণী সুসীমা, সুমতিনাথের জন্মের নব্বই হাজার কোটী সাগর পরে কৌশাম্বীতে ঈক্ষ্বাকুবংশে চিত্রা-নক্ষত্রে জন্ম লাভ করেন। দেহের পরিমাণ ছিল ২৫০ ধনু, রক্তবর্ণ, আয়ুষ্কাল ত্রিশলক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেত শিখর, তাঁহার লাঞ্ছন ছিল রক্তপদ্ম।

সপ্তম তীর্থংকরের নাম সুপার্শ্বনাথ। রাজা প্রতিষ্ঠ পিতা, রাণী পৃথিবী মাতা, পদ্মপ্রভের জন্মের ৯০০০ কোটী সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে কাশীধামে বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ২০০ শত ধনু, স্বর্ণবর্ণ (দিগম্বরদিগের মতে হরিদ্বর্ণ) আয়ুষ্কাল বিশলক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন স্বস্তিক।

অষ্টম তীর্থংকরের নাম চন্দ্রপ্রভ। রাজা মহাসেন পিতা, রাণী লক্ষ্মণা মাতা, সুপার্শ্বনাথের জন্মের ৯০০ কোটী সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে চন্দ্রপুরীতে অনুরাধা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ১৫০ ধনু, শুভ্রকান্তি, আয়ুষ্কাল দশ লক্ষ পূর্ব। নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন চন্দ্র।

নবম তীর্থংকরের নাম পুষ্পদন্ত বা সুবিধিনাথ। রাজা সুগ্রিয় পিতা, রাণী রামা মাতা, চন্দ্রপ্রভের জন্মের ৯০কোটী সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে কাকন্দীতে মূলা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ১০০ ধনু, শুভ্রকান্তি, আয়ুষ্কাল দুইলক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, মকর লাঞ্ছন।

দশম তীর্থংকরের নাম শীতলনাথ। রাজা দৃঢ়রথ পিতা, রাণী নন্দা মাতা, পুষ্পদন্তের জন্মের ৯ কোটী, সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে ভদিলা পুরীতে পূর্বাষাঢ় নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৯০ ধনু, স্বর্ণকান্তি আয়ুষ্কাল ১লক্ষ পূর্ব, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, শ্রীবৎস লাঞ্ছন।

একাদশ তীর্থংকরের নাম শ্রেয়াংসনাথ। রাজা বিষ্ণুসেন পিতা, রাণী বিষ্ণা মাতা, শীতলনাথের জন্মের এক কোটী সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে কাশীধামের নিকট সিংহপুরে, শ্রবণা-

১। "সংযুক্তপ্রদেশের বলরাম পুরের সন্নিহিত বর্তমান "সমেত কা কিলা" নামক স্থান, —Epitome of Jainism.

নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৮০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৮৪ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেত-শিখর, বাহন গরুড়।

দ্বাদশ তীর্থংকরের নাম বাসুপূজ্য। রাজা বসুপূজ্য পিতা, রাণী জয়া মাতা, শ্রেয়াংসনাথের জন্মের ৫৪ সাগরপরে ইক্ষ্বাকুবংশে চম্পাপুরীতে [১] শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৭০ ধনু, রক্তবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৭২ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান চম্পাপুরী, বাহন মহিষ।

ত্রয়োদশ তীর্থংকরের নাম বিমলনাথ। রাজা কৃতবর্মা পিতা, রাণী শ্যামা মাতা, বাসুপূজ্যের জন্মের ত্রিশ সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে কাম্পিল্যপুরে উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৬০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৬০ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান পরেশনাথ বাহন, বরাহ।

চতুর্দশ তীর্থংকরের নাম অনন্তনাথ। রাজা সিংহসেন পিতা, রাণী সুযশা মাতা, বিমলনাথের জন্মের ৯ সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে অযোধ্যাতে রেবতী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৫০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ত্রিশ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, বাহন শ্যেন পক্ষী।

পঞ্চদশ তীর্থংকরের নাম ধর্মনাথ। রাজা ভানু পিতা ও রাণী সুব্রতা মাতা, অনন্তনাথের জন্মের ৪ সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে অযোধ্যার নিকট রত্নপুরীতে পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ, ৪৫ ধনু, স্বর্ণবর্ণআয়ুষ্কাল ১০ লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন বজ্রদণ্ড।

ষোড়শ তীর্থংকরের নাম শান্তিনাথ। রাজা বিশ্বসেন পিতা ও রাণী অচিরা মাতার ধর্মনাথে, জন্মের তিন সাগর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে হস্তিনাপুরে ভরণী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৪০ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল এক লক্ষ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, বাহন মৃগ।

সপ্তদশ তীর্থংকরের নাম কুথনাথ। রাজা শূর পিতা, রাণী শ্রীদেবী মাতা, শান্তিনাথের জন্মের অর্ধ পল্য পরে ইক্ষ্বাকুবংশে হস্তিনাপুরে কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ৩৫ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৯৫,০০০ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখয়, বাহন ছাগ।

অষ্টাদশ তীর্থংকরের নাম অরনাথ। রাজা সুদর্শন পিতা, রাণী দেবী মাতা, কুথনাথের জন্মের $\frac{১}{৪}$ পল্য পরে, ইক্ষ্বাকুবংশে, হস্তিনাপুরে, রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ত্রিশ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৮৪০০০ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন নন্দ্যাবর্ত। [২]

ঊনবিংশ তীর্থংকরের নাম মল্লিনাথ। রাজা কুম্ভের কন্যা, প্রভাবতী মাতা, অরনাথের জন্মের ১,০০০ কোটী বৎসর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে মথুরাতে অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ধনু, নীলবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৫৫,০০০ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন কুম্ভ।

বিংশ তীর্থংকরের নাম মুনিসুব্রত। রাজা সুমিত্র পিতা, রাণী পদ্মাবতী মাতা, মল্লিনাথের জন্মের ৫৪ লক্ষ বৎসর পরে হরিবংশে রাজগৃহে শ্রবণানক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ২০ ধনু, কৃষ্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ৩০,০০০ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, বাহন কূর্ম।

১। ভাগলপুরের নিকট বর্তমান নাথপুর—It is beyond doubt the Champa stood at or about Bhagalpur. A Booroah's Ancient Geography of India, Preface Vol. III দ্রষ্টব্য।

২। "স্বস্তিকঃ সর্বতোভদ্রঃ নন্দ্যাবর্তাদয়োঽপি চ"—অমরকোষ।

একবিংশ তীর্থংকরের নাম নমিনাথ। রাজা বিজয় পিতা ও রাণী বিপ্রা মাতা, মুনিসুব্রতের জন্মের ৯ লক্ষ বৎসর পরে ইক্ষ্বাকুবংশে মথুরাতে অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ১৫ ধনু, স্বর্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ১০,০০০ বৎসর নির্বাণলাভের স্থান সমেতশিখর, লাঞ্ছন নীলোৎপল।

দ্বাবিংশ তীর্থংকরের নাম নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি। রাজা সমুদ্রবিজয় পিতা ও দেবী শিবা মাতা, নমিনাথের জন্মের ৫ লক্ষ বৎসর পরে, হরিবংশে দ্বারকাতে চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম, দেহের পরিমাণ ১০ ধনু, কৃষ্ণবর্ণ, আয়ুষ্কাল ১,০০০ বৎসর, নির্বাণলাভের স্থান গীর্ণার পর্বত, লাঞ্ছন শঙ্খ।

এই পর্যন্ত যে সমস্ত তীর্থংকারের নাম করা গেল তন্মধ্যে একমাত্র আদিনাথ ছাড়া অন্ত কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা নাই। সেইজন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে কিছু জানিবারও উপায় নাই, তবে পার্শ্বনাথ ও মহাবীর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক আকর গ্রন্থ[১] হইতে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। স্থানাভাবে মোটামুটি এখানে কিছু দেওয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ তীর্থংকরের নাম পার্শ্বনাথ। নেমিনাথের জন্মের ৮৪,০০০ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ৮১৭ অব্দে[২] রাজা অশ্বনাথের ঔরসে ও বাগ্‌দেবীর গর্ভে ঈক্ষ্বাকু বংশে পার্শ্বনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তপশ্চর্যার সময় ফণাযুক্ত সর্প তাঁহার রক্ষী ছিলেন বলিয়া তিনি সর্পলাঞ্ছন বলিয়া পরিচিত। এই সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যায়, পার্শ্বনাথের সমসাময়িক কামাথ নামক একজন সোমযাজী ছিলেন। তিনি একদিন যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আহুতি দিতে বসিয়াছেন এমন সময় পার্শ্বনাথ আসিয়া উপস্থিত। তিনি দেখিতে পাইলেন যে একখণ্ড যজ্ঞকাষ্ঠের ভিতর একটী সর্প আছে, তৎক্ষণাৎ তিনি কাষ্ঠখণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সর্পটীকে নিষ্কৃতি দিলেন, যাজ্ঞিকদিগের এই বিধান আছে যে বিতস্তি, অরত্নি প্রভৃতি পরিমিত ইন্ধন না হইলে তাহা যাগকার্যে অনুপযুক্ত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ইন্ধন আহুতি না দিলেও যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়, তাই ইষ্টকর্মে ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহার মনে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তিনি এইবার কারীরেষ্টি সম্পাদনের জন্য আয়োজন করিতে থাকেন এবং কারীরেষ্টি সম্পাদন করেন। তারপর অনবরত তুমুলভাবে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। তাহাতে পার্শ্বনাথের তপস্যায় ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় শেষদেব তাহার শতফণা বিস্তার করিয়া এই বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন, এই জন্য তিনি সর্পলাঞ্ছন বলিয়া পরিচিত হন। বোধিবৃক্ষের,[৩] নীচে ৮৩ দিন ব্যাপিয়া ধ্যান করার পর সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি জৈন ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার সময় হইতেই "গচ্ছ" নামক সম্প্রদায়ভেদ জৈনদের মধ্যে প্রথম প্রবর্তিত হয়। তাঁহার আটজন বিশিষ্ট গণধর ছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে (১) শুভদত্ত, (২) আর্যঘোষ, (৩) বিশিষ্ট,

১। ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত, দশম পর্ব, আচারাঙ্গ, সূত্রকৃদাঙ্গ ও কল্পসূত্র, ইংরেজীতেও কতকগুলি উপাদেয় গ্রন্থ আছে, যথা—Mrs. Sinclair-এর "Heart of Janism" ও ডাঃ লাহার "Life of Mahavira."

২। ঘাল্লোডিয়ার History and Litrature of Jainism" দ্রষ্টব্য।

৩। প্রত্যেক তীর্থংকরের ভিন্ন ভিন্ন বোধিবৃক্ষ ছিল।

(৪) ব্রহ্মধারী, (৫) সোম, (৬) শিবধর, (৭) বীরভদ্র, (৮) যশস্বী,। তাঁহার নির্বাণলাভের স্থান বঙ্গদেশের পরেশনাথ পর্বত।

চতুর্বিংশ তীর্থংকরের নাম মহাবীর—পার্শ্বনাথের নির্বাণলাভের ২৫০ বৎসর পরে মহাবীরের আবির্ভাব হয়। রাজা সিদ্ধার্থ তাঁহার পিতা ও রাণী ত্রিশলা তাঁহার মাতা, তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্পের উল্লেখ কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। দেবনন্দা নামক একজন ব্রাহ্মণ-পত্নী বৈশালীর[১] নিকট কুণ্ডগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার স্বামীর নাম ছিল ঋষভদত্ত। একদিন রাত্রে দেবনন্দা চৌদ্দটী স্বপ্ন দেখিতে পান, তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহার স্বামী ঋষভদত্তের নিকট বলেন, শুনিয়া ঋষভদত্ত অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং গণনা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে তাঁহার ঔরসে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। এই মহাপুরুষ আর কেহ নহে। ইনিই মহাবীর। এদিকে ইন্দ্রাদিদেবতা তাঁহাদের অবধিজ্ঞানের[২] সাহায্যে দরিদ্র ঋষভদত্তের গৃহে মহাবীরের জন্ম হইবে, ইহা কোন-রূপেই সমীচীন নয়, কারণ পূর্বোক্ত তীর্থকরগণ সবই কোটীপতি নৃপতিদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবিয়া একজন দেবদূতের সাহায্যে ভ্রুণটী সরাইয়া ফেলেন। কালক্রমে কুন্দগ্রামের রাজা সিদ্ধার্থের মহিষী ত্রিশলার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সিদ্ধার্থ ছিলেন পার্শ্বনাথের অনুচর এবং জ্ঞাত্রিকবংশের। তাই মহাবীরকে "নাতপুত্তনিগ্গন্থ" বলিয়া অভিহিত করা হইত। এইরূপ উল্লেখ পালিগ্রন্থের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

তীর্থংকরগণের জন্মস্থানাদি সম্বন্ধে উপরোক্ত যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহার সহিত দিগম্বরদিগের সহিত কিছু মতভেদ আছে। দিগম্বরগণ ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, ও দশম তীর্থংকরের পিতার নাম যথাক্রমে ধরণ, সুপ্রতিষ্ঠ, সুগ্রীব ও সূর্য বলিয়া স্বীকার করেন, এবং পঞ্চম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ অষ্টাদশ উনবিংশ, একবিংশ ও চতুর্বিংশ তীর্থংকরগণের মাতার নাম যথাক্রমে সুমঙ্গলা, সুনন্দা, বিষ্ণুদ্রি, বিজয়া, সুরম্যা, সর্বযশা, মিত্রা, রক্ষিতা, বজ্রা ও প্রিয়কারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তীর্থংকরগণের জন্মস্থান সম্বন্ধেও দিগম্বরগণ অন্যমত পোষণ করেন। দশম, উনবিংশ ও একবিংশ তীর্থংকরগণ যথাক্রমে, তাঁহাদের মতে ভদ্রিকাপুরী, মিথিলাপুরী ও মিথিলাপুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ তীর্থংকর মল্লিনাথের বর্ণ দিগম্বর-গণের মতে স্বর্ণবর্ণ। তীর্থংকরদিগের লাঞ্ছন সম্বন্ধেও শ্বেতাম্বরদিগের সঙ্গে দিগম্বরগণ একমত নহেন, দিগম্বরগণ, দশম, একাদশ, চতুর্দশ ও অষ্টাদশ তীর্থংকরগণের চিহ্ন যথাক্রমে কল্পবৃক্ষ, খড়্গা, ভল্লুক ও মীন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই রকম অনেক মতভেদ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব[৩] ... সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মতভেদ এই যে দিগম্বরগণ মল্লিকুমারীকে পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধকরেন নাই[৪]।

১। প্রাচীন বিদেহের রাজধানী, পাটনা হইতে ২৭ মাইল দূরে বেসরা নামক স্থানকে অনেকে প্রাচীন বৈশালী নগর বলিয়া সনাক্ত করেন।

২। নৈয়ায়িকদিগের অলৌকিক যোগজ প্রত্যক্ষের অনুরূপ "মতিশ্রুতাবিধিমনঃপর্যায়কেবলানি জ্ঞানম্" তত্ত্বার্থসূত্র ১।৯ ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩। চতুঃষষ্টি বিষয়ে মতভেদ উভয় সম্প্রদায়ে বিদ্যমান।

৪। পূর্বোক্ত সাগর, পল্য প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ জৈনধর্ম গ্রন্থে প্রায়ই দেখা যায়। ইহারা অত্যধিক পরিমাণের জ্ঞাপক, ধনু=চতুর্হস্ত পরিমাণের জ্ঞাপক। এই পরিমাণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত আলোচনা সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা আছে।

আচার্য ভট্ট কুমারিলের পরিণাম

(খ্রী° ৫৯০-৬৫০ অব্দের ঘটনা)

শ্রীহরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে, লোক-সংগ্রহ করিবার জন্ম নিজেদের মতবাদই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা যথাসাধ্য সদসদ্ উপায়ে প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিরুদ্ধ মতবাদীদের অভিমতগুলি চাপা দিয়া স্ব-মত যে শ্রেষ্ঠ ইহাই তাঁহারা বিবিধ উপায়ে প্রচার করেন। এই কারণে সত্যকে গোপন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস লোপ পায়। সাধারণের নিকট মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা হয়।

ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত অতিশয় প্রবল হইলে, বৈদিক যাজ্ঞিকদের ধর্মাদি মতবাদ ও কর্মকাণ্ডের উপর লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। বিশেষ যাজ্ঞিকগণের কর্মকাণ্ডের নিন্দা যে বৌদ্ধগণই করিতেন তাহা নয়। বৈদিক সমাজ তখন কয়েক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ায়, মূল সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দেখা যায় একবৈদিক সমাজ,—ব্রহ্মবাদী, উপনিষদ্ সমাজের সৃষ্টি করে। এই সামাজিকগণ শিক্ষিত ও চিন্তাবীর ছিলেন এবং যাজ্ঞিকগণের কর্মকাণ্ডের ভূয়িষ্ঠ নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—ইহারা অন্ধ ও মূঢ়, * ইহার অধিক আর কি বলা চলে ; উপনিষদ্-বিশেষে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। অথচ উপনিষদ্ বৈদিক শাস্ত্র। বৌদ্ধেরা উপনিষদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। অশোকের সময়ে যাজ্ঞিক সমাজের চরম অবনতি ঘটে। সে অবনতির আর উত্থান হয় নাই। দীর্ঘকাল বৌদ্ধ ও জৈন রাজন্য-শাসনে শাসিত হইয়া, প্রকৃতিপুঞ্জ বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। তৎকালে বৌদ্ধাদি সমাজে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তর্কজ্বালায় বৈদিক পণ্ডিতগণ উত্যক্ত হইয়া পড়েন। বৌদ্ধরাজারা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সে প্রকার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না।

বৈদিক সামাজিকগণের মধ্যে, যাঁহারা প্রবল নৈয়ায়িক ছিলেন, তাঁহারা যাজ্ঞিকদের কর্মকাণ্ডের অতি প্রবল বিরোধী মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন,—তাঁহাদের মতবাদ মনোহর ও সুন্দর হওয়ায়, তাঁহাদিগকে 'চারুবাক্' ঋষি বলা হইত, বৈদিকগণ তাঁহাদিগকে—'চার্বাক্' এবং নাস্তিক বলিয়াছেন। নাস্তিক (নাস্তি-কন্। ন—অস্তি= নাস্তি। অস্তি,—অব্যয় শব্দ, 'অস—ভাবে —তিপ্'—বিদমানতা, বিদ্যমান; যাহার বিদ্যমানতা নাই), চার্বাক—চারুবাক্; চারু বলিতে সুন্দর, সম্যক্, অসাধারণ, মনোহর, বুঝায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয় সম্প্রদায়বিশেষের নাম,

---

* মুণ্ডকোপনিষৎ—১ম মুণ্ডকে ২য় খণ্ড—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা, অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া, জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥"

বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপর বীতশ্রদ্ধ পণ্ডিতগণের সমাজ। "দুর্যোধনপ্রিয়সখা চার্বকঃ নাম রাক্ষসঃ চার্বক কাহারও নাম নহে, যেমন 'যাজ্ঞিক' কাহার নাম নয়। ব্রহ্ম-উপাসক, ও চার্বক্-সম্প্রদায় —এক্ বৈদিক সমাজ হইতে পৃথক্ দল হইয়াছেন। তৃতীয় দল—প্রকৃতি-পুরুষ বিচারক কপিল-প্রচারিত সাংখ্য মতাবলম্বী—এ সম্প্রদায়গণ 'পঞ্চশিখ' নামক অতি প্রবল নৈয়ায়িক পণ্ডিতের দল। এই প্রকারে বৈদিক সমাজ পণ্ডিত লোকবল হীন হইয়া যায়। ভগবান্ কনাদ্ প্রবর্তিত বিজ্ঞান মতটীকে—বৈশেষিক দার্শনিক মত বলে, এ মতে পরমাণু নিত্য বস্তু, জগৎ পরমাণু-গঠিত। বিশ্বের স্রষ্টা স্বীকৃত হয় নাই—নির্মাতা স্বীকার করা হইয়াছে। কুম্ভকার যেরূপে মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি নির্মাণ করে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য বৈশেষিক দর্শনকে নাস্তিক মতবাদ বলিয়া স্ব-সম্প্রদায় হইতে পরিত্যাগ করেন। গোতমের ন্যায়-দর্শন, বৈশেষিক দর্শনের সমর্থক। এই প্রকারে চিন্তাশীল উদার নিরপেক্ষ নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায়, বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় মত—ভারতে উপেক্ষিত হইতে থাকে। যাজ্ঞিকেরা জীব-হিংসাপ্রবল, জৈনেরা ইহার ঘোরতর বিরোধী, বৌদ্ধরা অহিংসাবাদী হইলেও জৈনদের মত অত কঠোর ব্রতী ছিলেন না। এই সকল বিভিন্ন মতবাদীরা বৈদিক (যাজ্ঞিক) সমাজেরই—বিভাগ মাত্র। হীনপ্রভ বৈদিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধাদি মতবাদের অনশন-ব্যাপারে কঠোর পন্থা অবলম্বী হইয়াছিলেন। এই বৌদ্ধাদি বিরোধী মতবাদীদের মধ্যে—ভগবান্ শঙ্করাচার্য এবং ভট্ট কুমারিল যে সকল অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্তী শঙ্কর ও ভট্টবাদিগণ বিবিধ উপায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু একাধিক স্থলে সত্য গোপনও করিয়া, স্ব-সামাজিক মতকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া গিয়াছেন।

এই প্রকারে বৈদিক (হিন্দু) মত পুনরুদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিলেন। উক্ত দুই বিখ্যাত পণ্ডিতের মধ্যে কুমারিল ছিলেন ঘোরতর বৌদ্ধাদিধর্মমতের বিরোধী। বৈদিক পণ্ডিতেরা, তর্কে জয়লাভের জন্য ভবিষ্যতে বৌদ্ধাদি মত-খণ্ডন করিবার জন্য, বিরুদ্ধ-বাদীদের ব্যাকরণ, ন্যায় ও দর্শনাদি শাস্ত্রের বৈদিক অনুকূলে প্রয়োগের অনুকূল বচনাদি, আপনাদের শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিপক্ষদের গ্রন্থ নষ্ট করিয়া গিয়াছেন; দীর্ঘকালের সমবেত চেষ্টায়, বহু মূল্যবান্ বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থ একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্তমানে সেই সকল প্রনষ্ট গ্রন্থ—তিব্বতাদিদেশে পৃথক্ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়ায়, মূল গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সত্য ব্যাপার ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতেছে, ইহাতে বৈদিক পণ্ডিতগণের সত্য-পরিচয় লাভও হইতেছে। কুমারিল-ঘটিত যে সকল সত্য-ব্যাপার ধামাচাপা দিয়া রাখা হইয়াছে এবং যে সকল অঘটন-উপাখ্যান দ্বারা, সাধারণ লোককে ভ্রম-অন্ধকারে রাখা হইয়াছিল, তাহা উন্মুক্ত দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া দেখা দিতেছে। কুমারিলের পরিণাম, তথা উক্ত বিবরণাদি হইতে সংগৃহীত করিয়া,—সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থে যে সকল অসত্যের আলোচনা দ্বারা স্বসমাজের অপবাদ চাপা দেওয়া হইয়াছে, ঐতিহাসিক হিসাবে যাহা সত্য তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-বিরোধী বৈদিকগণ স্ব-সমাজের ক্রমাগত যশঃকীর্তনই করিয়াছেন—সত্য ঘটনা গোপন করিয়া। পরধর্মের নিন্দা, কুৎসা ও পরাজয়ের কাহিনী-বর্ণনায় তাঁহারা সত্যের

অপলাপ করিয়াছেন এবং অলীক উপাখ্যান দ্বারা, সাম্প্রদায়িক ধর্ম-কর্মের প্রাধান্যই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক গ্রন্থাদিতে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কোন কোন বিবরণ কপোল-কল্পিত এবং একেবারেই পরিত্যাগযোগ্য। বৈদিক-পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্যে সত্য-নির্ধারণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। স্ব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনার্থ যাহা কিছু করা আবশ্যক, তাহা করা হইয়াছে—সত্য-মিথ্যার প্রভেদ ধরা যায় না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য কেবল যে বৌদ্ধধর্মের অবসান-চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নয়—শৈব-মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নার্থে তিনি বৈষ্ণব মতেরও বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, তৎকাল-প্রচলিত পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব-মতের উচ্ছেদই করিয়াছিলেন। "ভাগবত" বলিতে তাঁহার সময় পাঞ্চরাত্রিক (তন্ত্র) শাস্ত্রকেই বুঝাইত। বর্তমান শ্রীমদ্ভাগবত তখন ছিল না। থাকিলে তিনি যেমন চতুর্ব্যূহ-মতের খণ্ডন করিয়া, পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব-মতের অবসান করেন, তদ্রূপ ভাগবত-মতেরও খণ্ডন করিতেন। ব্যূহবাদ-খণ্ডন করায় তাঁহার পরে কয়েক শত বৎসর আর বৈষ্ণব-শাস্ত্র রচিত হয় নাই। তাঁহার পরলোক-গমনের কয়েকশত বৎসর পরে বেঙ্কটাদ্রির শৈব মন্দিরে—প্রাচীন শিব-লিঙ্গাদি তুলিয়া তথায় বিষ্ণুমূর্তি স্থাপিত হয়। রামানুজ এবং আচার্য শঙ্কর-কৃত ব্যূহ-মতবাদের খণ্ডন করিয়া পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ব্যূহ বলিতে চতুর্ব্যূহ মাত্রেই শারীরী নহেন এবং চিদাত্মক ব্যাপার। বর্তমানে ইহা ভগবান্ বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়াই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে। ইহার ভাষ্য পণ্ডিতগণের উপভোগ্য নির্ভুল অলঙ্কারাদিতে মণ্ডিত এবং বৈষ্ণব ভক্ত মাত্রেরই মনোমোহকর। এ প্রকারের সুন্দর সংস্কৃতগ্রন্থ, ভট্ট কুমারিল বা আচার্য শঙ্কর লিখিয়া যান নাই। তাঁহারা উভয়েই ছিলেন তার্কিক, ভাগবত-রচয়িতা একজন পরম প্রেমিক। তখন দ্রবিড়ে আলবারি প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে বিভোর হইয়া জনগণ তর্ক ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। এই মতই বাঙলায় পণ্ডিত ভক্ত কবি জয়দেব মধুর ছন্দে গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি সংস্কৃতে হইলেও প্রায় বাঙলা ভাষার মত। এই আলবারী প্রেম-কীর্তন করিয়াছেন তান্ত্রিক ভক্ত কবি চণ্ডীদাস এবং ভাগবত-অবলম্বনে কুলিনগ্রামী মালাধর বসু তাঁহার গোবিন্দ-বিজয়ে (শ্রীকৃষ্ণ বিজয়)। তাহার পর প্রেম অবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব সাধারণ জনগণমধ্যে প্রেমের প্লাবন আনিয়া, অধিকাংশ বাঙালীকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমে আকুল করিয়া দিয়াছেন। কুমারিল ছিলেন অপ্রেমিক হিংসামূলক তার্কিক, তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র প্রেম ছিল না, সে গুলির লক্ষণই ছিল—অপ্রেম তর্ক। তিনি বা তাঁহারা ভাষ্যকার পর্যায়ের অন্তর্গত কেবল নীরসতর্ক লইয়াই মহামূল্য জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার মতাবলম্বীরা তাঁহার কেবল গুণ-কীর্তনই করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া, শিষ্যদল সমেত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া চিতানলে দেহপাত করিয়াছিলেন, একথা বৈদেশিক অনুবাদ-গ্রন্থে আবিষ্কৃত না হইলে, ধামা চাপা পড়িয়াই থাকিত। সত্য কখন চিরকাল গোপন থাকে না।

স্ব-সমাজের প্রাধান্য প্রচারে মিথ্যা বলায় দোষ না থাকা সম্ভব নয়। মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা, সাম্প্রদায়িক হিসাবে যে মিথ্যা বলা হয় ইহা সত্য ব্যাপার। অতএব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে মিথ্যা যে থাকে না ইহাও বলা যায় না। এক্ষণে আমরা ভট্ট কুমারিল সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ভগবান্ ভট্টাচার্য শ্রীমান্ কুমারিল শর্ম্মা-সম্বন্ধে অবগত হওয়া গিয়াছে যে,—তিনি খ্রীস্টীয় ৫৯০-৬৫০ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য ভট্টাচার্য ভবভূতি শর্ম্মা এবং ভট্টাচার্য বাক্‌পতি শর্ম্মা,—ইঁহারা উভয়েই গুরুদেবের যশঃকীর্ত্তনকারীর প্রধান। শ্রীমান্ বাক্‌পতির সময় খুব সম্ভব খ্রী° ৬৬০-৭২০ অব্দের মধ্যে। কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্মা দেব, তিনি খ্রী° ৬৭৫-৭১০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কনৌজরাজ শ্রীহর্ষ বর্ম্মা খ্রী° ৬০৬ হইতে ৬৪৭ অব্দ পর্যন্ত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত হন। কুমারিল খ্রী° ৫৯০ হইতে ৬৫০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। *

যে বৎসর রাজ্যবর্দ্ধন, বাঙালী রাজা শশাঙ্কগুপ্তের দ্বারা হত হন সেই সময়টী খ্রীস্টীয় ৬০৬ অব্দ। সেই সময়ে শ্রীহর্ষবর্দ্ধন কনৌজের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন কনৌজে রাজা ছিলেন সম্ভবতঃ গ্রহবর্ম্মা—ইনি ৬০৬ খ্রী° অব্দে মৃত হন। থানেশ্বর-রাজ হর্ষবর্দ্ধন এবং মালবরাজ মাধবগুপ্ত ও ৬৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আদিত্যসেন (মালবরাজ) বিদ্যমান ছিলেন। কর্ণ-সুবর্ণরাজ শশাঙ্কগুপ্ত জীবিত ছিলেন। শশাঙ্কগুপ্তের কন্যার সহিত শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের বিবাহ হয়। দেবগুপ্তের মৃত্যুর পর, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাধবগুপ্ত মগধরাজ্যের সিংহাসন-প্রাপ্ত হন। ইনি রাজা শ্রীহর্ষের সহচর ছিলেন (খ্রী° ৬৭২ অব্দ)। † মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেন অপসদলেখমালার দাতা। মাধবগুপ্ত শ্রীহর্ষ বন্ধু (খ্রী° ৬৭২)।

কনৌজরাজ যশোবর্ম্মা গৌড় আক্রমণ করিয়া সম্ভব দেবগুপ্ত নামক রাজাকে নিহত করেন। এই যশোবর্ম্মা ৭ম খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য-কর্তৃক পরাজিত হন। দেবগুপ্তের পুত্র বিষ্ণুগুপ্তকে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য অধীন-নৃপতিরূপে গণ্য করেন। বিষ্ণুগুপ্ত খ্রী° ৭০০ অব্দে বিদ্রোহী হইলে, ললিতাদিত্য-কর্তৃক নিহত হন, তাঁহার পুত্র জীবিতগুপ্ত গৌড়বংশের রাজা হন। ‡ প্রকৃত ঘটনা বিষ্ণুগুপ্ত নিহত হন নাই (এ ঘটনা উপাখ্যান মাত্র) জীবিতগুপ্ত (খ্রী° ৭৩২) প্রায় কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন, হয়ত ইনিই কনৌজরাজ যশোবর্ম্মা-কর্তৃক নিহত হইয়া থাকিবেন (অসম্ভব কি ?)।

মাধব, আদিত্য (খ্রী° ৬৭২), দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত, জীবিতগুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন, খুব সম্ভব যশোবর্ম্মা, গৌড়রাজ জীবিতগুপ্তকে হত্যা করেন নাই, যদি সত্যই কোন গৌড়-রাজকে নিহত করিয়া থাকেন তবে তিনি দেবগুপ্ত। "গউড়বহো" নাটকের লেখক গৌড়-

---

* S. P. Pandit; Introduction Gauḍavaho, P—CCIX.

† Sub Barnak Inscription.

‡ The Aphsad inscription describes—Aditya Sena the donor as son of Madhab Gupta—a friend of Harsa in 66 H. F. or 672 A. D. See Appendix—Mediaeval Hindu India, vol 1. by C. V. Vaidya, 1920 A. D.

রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় যশোবর্মার কীর্তি-ঘোষণা করিবার জন্যই নাটকখানি রচিত হইয়া থাকিবে।

বিষ্ণু-উপাসক রাজা আদিত্যসেন ছিলেন পরম ভাগবত, কৈলদেবী ছিলেন তাঁহার পত্নী, এই স্ত্রীর গর্ভে দেবগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন,—ইনি ছিলেন শৈব। দেবগুপ্তের মহিষী ইয্যদেবীর গর্ভে জীবিতগুপ্তের জন্ম হয়। এই সেন-গুপ্তদের মধ্যে কেহই বৌদ্ধ ছিলেন না। সম্ভব এই বংশই সেন-গুপ্ত ধারা।

গৌড়বঙ্গ (হিরণ্য—পর্বত মুঙ্গের, চাম্পা—ভাগলপুর, কচ্ছগল-(কাকজোল ?)—রাজমহল, পৌণ্ড্রবর্ধন—রংপুর পরে পাণ্ডুনগর, কর্ণসুবর্ণ—মুরসিদাবাদ (গৌড় উপকণ্ঠে কাঞ্চনসোনা নামক গঙ্গাতীরে এক প্রাচীন ধ্বংস নগরচিহ্ন আছে) এবং তাম্রলিপি—মেদিনীপুর ইত্যাদি জনপদ—গৌড় অন্তর্গত ভূভাগ জীবিতগুপ্তের অধিকারে ছিল। ইহা সে সময়ের গৌড়মণ্ডল (বঙ্গদেশ) নামে প্রখ্যাত ছিল। গৌড় নগরের রাষ্ট্রীয় সীমা, নিয়ত পরিবর্তিত হইত,—কখন পরিবর্ধিত হইত। সম্ভবতঃ এই সেনগুপ্তদের গৌড় রাজধানী 'গৌড়হণ্ড' (সামসি রেলস্টেশনের অনতিসন্নিকটে) নামক নগর গঙ্গাতীরে ছিল।

কাশ্মীররাজ যখন গৌড়ে ছদ্মবেশে আগমন করেন—তখন তিনি গঙ্গাতীরে নৌকা হইতে নামিয়া সান্ধ্য ভ্রমণব্যপদেশেই গৌড়নগরে প্রবেশ করেন, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে ইহা আছে (জয়াপীড় খ্রী° ৭৫১-৭৮২ অঃ) কামরূপরাজ শ্রীহর্ষদেব (কুমার) তখন তথাকার প্রবলরাজা। এই হর্ষদেব তাঁহার এক কন্যাকে দান করিয়াছিলেন নেপালের রাজা জয়দেব*কে (কন্যা ভগদত্ত রাজকুলজা) চেনিক মতে এই হর্ষ ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া কন্যা দান করিয়াছিলেন ক্ষত্রিয়কে (প্রকৃত কথা কুমার হর্ষ ব্রাহ্মণ ছিলেন না)।

শ্রীহর্ষ উড়িষ্যাবিজয় করিয়াছিলেন। কেশরিবংশের (খ্রী° ৪৭৪ অব্দ) রাজত্ব আরম্ভ হয়। ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির ৬২৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। হিউএন সঙ্ উড়িষ্যা দর্শন করিয়াছিলেন, তখন কেশরী-বংশের প্রবর্তন হইলেও প্রাধান্য লাভে সমর্থ হয় নাই। এই বংশের কুণ্ডল কেশরী (খ্রী° ৮১১-৮২৯ অব্দ) মার্কণ্ডেশ্বর মন্দির-নির্মাণ করেন। ভুবনেশ্বর কেশরীবংশের পুরাতন রাজধানী ছিল।

কলিঙ্গ দেশ (পূর্ব চালুক্য ?) খ্রী° ৬০৫-১০৭৮ অব্দ। কলিঙ্গের পূর্বনাম—'বঙ্গী'। মহারাষ্ট্রাদিসহ-ত্রিকলিঙ্গ নাম হয়। চোল-রাজারা কলিঙ্গের রাজা হন—তখনও নাম ছিল 'বঙ্গী'। বিজয়াদিত্যের দানপত্রে 'ত্রিকলিঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। তখন তিনি চালুক্যরাজ ভীমের অধীন ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

---

* **Inscription of Jayadeva of Nepal dated 769 A. D.**

"গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশলপতি" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। নেপালী জয়দেবের গৌড়-বিজয় ঐতিহাসিক ব্যাপার নয়।
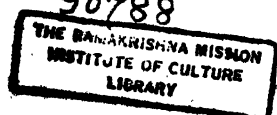
বীরশৈব ধর্ম

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

হিন্দুধর্মের শৈবশাখা দক্ষিণ ভারতে সমধিক প্রচলিত। শৈবধর্ম এই অঞ্চল হইতে ভারতের বাহিরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, শ্যামদেশ, জাভা ও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের তামিল হিন্দুগণ ভারতবহির্ভূত যে সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন সেই সকল দেশে শৈবধর্ম প্রবল প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে। ইহা বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু উপনিবেশগুলির প্রধান ধর্ম। এই ধর্ম এত প্রাচীন যে প্রাগ্বৈদিক যুগের মহেঞ্জোদোরের সভ্যতায় ইহার স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

ইংরেজ মিশনরি বিখ্যাত তামিল ভাষাবিৎ ডাঃ পোপ শৈবধর্মের প্রসিদ্ধ তামিল-গ্রন্থ "তিরুবাচকম্" ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া তাহার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, এই ধর্ম ভারতীয় সকল ধর্মের মধ্যে অধিকতম বিস্তৃত ও প্রভাবশালী এবং নিঃসন্দেহে অতিশয় সারবান্ ও মূল্যবান্। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ বার্নেট সাহেব তাঁহার "The Heart of India" নামক পুস্তকে (৮২ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, এই ধর্মের ভক্ত ও মহাপুরুষগণ যে বিশাল ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভক্তি-ভাব সম্পদে এত সমৃদ্ধ এবং উজ্জ্বল কল্পনায় এত অনুপ্রাণিত এবং ভাব-ভঙ্গী ও আধ্যাত্মিক রসে এত পরিপূর্ণ যে, পৃথিবীর কোন ধর্ম-সাহিত্য এই বিষয়ে ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। স্যার জর্জ ইলিয়ট্ তাঁহার "Hidusim and Buddhisim" (তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ) নামক বিরাট্ গ্রন্থে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "আমি এমন কোন ধর্ম-সাহিত্যের সহিত পরিচিত নহি, যাহাতে ব্যক্তিগত ধর্ম জীবনের সংগ্রাম ও নৈরাশ্য, আশা ও আশঙ্কা এবং বিশ্বাস ও সিদ্ধি এরূপ বিস্তৃত-ভাবে বিবৃত হইয়াছে।"

উত্তরে হিমালয়ে কেদারনাথ তীর্থ, দক্ষিণে উজ্জয়িনী, পূর্বে শ্রীশৈলম্, পশ্চিমে রম্ভাপুরী ও উত্তরে কাশীধাম—শৈব-ধর্মের এই পাঁচটী প্রধান কেন্দ্র বা পীঠস্থান। ভারতের হিন্দু রাজা ও মহারাজগণ এবং এমনকি মুসলমান নবাব ও সম্রাট্গণও এই শৈবপীঠগুলির জন্য বিস্তর অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়াছেন। একটী শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় যে, সম্রাট্ হুমায়ুন কাশীধামস্থিত শৈবপীঠের জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সম্রাট অক্‌বর ও জাহাঙ্গীর হুমায়ুনের এই দান শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার ও রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী সম্রাট্ সাজাহান ও আলমগীর এবং প্রভৃত সম্পত্তি এই পীঠস্থানের জন্য দান করিয়াছিলেন। সেই সকল দান পত্রও অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয়।

শৈবধর্মের মূলসূত্রগুলি শৈবাগমে পাওয়া যায়। কামিক ও বাতুল প্রভৃতি আটাইশ (২৮) খানি শৈবাগম আছে। শৈবগণ শৈবাগমগুলিকে বেদের ন্যায় সমানভাবে প্রামাণিক (authoritative) মনে করেন। একখানি 'বীরাগমে' আছে 'সর্ববেদেষু যদ্দৃষ্টং তৎ সর্বং তু শিবাগমে' অর্থাৎ বেদসমূহে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা শৈবাগমেও আছে।

দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্মের দুইটী প্রধান শাখা প্রচলিত। একটী শৈব সিদ্ধান্ত এবং অপরটী শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত বা বীরশৈব ধর্ম। মাদ্রাজ প্রদেশের তামিলগণ শৈবসিদ্ধান্তবাদী এবং মহীশূর প্রদেশের কানাড়ীগণ বীরশৈব ধর্মাবলম্বী। বীরশৈবগণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তাহারা সকলেই মহীশূরবাসী। শিব-সূত্রগুলিই এই ধর্মের প্রধান শাস্ত্র। এই মতে শিবের পঞ্চভাবের পঞ্চ মূর্তি আছে, যথা সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। রেণুক, দারুক, ঘণ্টাকর্ণ, ধেনুকর্ণ ও বিশ্বকর্ণ এই পঞ্চ শৈবাবতার পূর্বোক্ত পঞ্চ শৈবমূর্তির ঐহিক প্রকাশ। 'স্বয়ম্ভুব আগম' বলেন যে কলিযুগে এই পঞ্চাবতারই 'রেবণ সিদ্ধ' মারুল সিদ্ধ, ত্রকোরামারাধ্য, পণ্ডিতারাধ্য ও বিশ্বারাধ্য এই পঞ্চাচার্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া বীরশৈব ধর্ম-প্রচার করিয়াছেন।

এই ধর্মের আনুষ্ঠানিক (religious) নাম বীর শৈবধর্ম এবং দার্শনিক (philosophical) নাম শক্তি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। বীর শৈবগণ পরাশিব বা লিঙ্গ পূজা করেন এবং লিঙ্গের চিহ্ন শরীরের নানাস্থানে ধারণ করেন বলিয়া তাহাদিগকে 'লিঙ্গাইত'ও বলে। শক্তি-বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই শক্তিবিশিষ্ট কিন্তু জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন নহে, উভয়ে অভিন্ন। শক্তিশ্চ শক্তিশ্চ শক্তী, তাভ্যাং বিশিষ্টো জীবেশৌ, তয়োঃ অদ্বৈতং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতম্। জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য বা অদ্বৈত এবং উভয়ের শক্তিবৈশিষ্ট্য—বীরশৈবতন্ত্রের এই দুইটী প্রধান সূত্র।

জীবের স্থূল-চিৎ-শক্তি কিঞ্চিৎজ্ঞতারূপ এবং স্থূল-অচিৎ-শক্তি কিঞ্চিৎকর্তৃতারূপ। ব্রহ্মের সূক্ষ্ম-চিৎ-শক্তি সর্বজ্ঞতারূপ এবং সূক্ষ্ম-অচিৎ-শক্তি সর্ব-কর্তৃতা-রূপ।

শক্তি নিত্যা, স্বাভাবিকী ও পুরাণী। **সিদ্ধান্তাগমের** মতে "মায়েতি প্রোচ্যতে লোকে ব্রহ্মনিষ্ঠা সনাতনী" অর্থাৎ শক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠা সনাতনী মায়া। **সিদ্ধান্ত শিখামণি** অনুসারে "গুণত্রয়াত্মিকা শক্তিঃ ব্রহ্মনিষ্ঠা সনাতনী" (৫।৩৫) অর্থাৎ শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সনাতনী। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে শব্দ ও অর্থের ন্যায় শিব ও শক্তিকে অভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

'বাগর্থাবি সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥'

অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের ন্যায় সংপৃক্ত (সংযুক্ত) জগতের মাতা পিতা পার্বতীও পরমেশ্বরকে বাক্য ও বাক্যার্থ প্রতিপত্তির (অববোধের) জন্য বন্দনা করি। শিব ও শক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টারক এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

সা মদেচ্ছা পরাশক্তিরবিযুক্তা স্বভাবজা।
বহ্নেরুষ্মেব বিজ্ঞেয়া রশ্মিরূপা রবোরিব ॥
সর্বস্থ জগতো বাপি সা শক্তি কারণাত্মিকা ॥

অর্থাৎ সেই পরাশক্তি স্বভাবজা ও অবিযুক্তা আমার ইচ্ছা এবং সমগ্র জগতের হেতুরূপা। যেমন উত্তাপকে অগ্নি হইতে এবং রশ্মিকে সূর্য হইতে পৃথক করা যায় না, সেইরূপ শক্তিকে শিব হইতে বিযুক্ত করা যায় না। বীরশৈব ধর্মের অপর নাম বিশেষাদ্বৈত এবং ইহা ভেদাভেদবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধান্ত শিখামণি (২.১২) বলেন, শিবের এই শক্তি সচ্চিদানন্দ লক্ষণা ব্রহ্মশক্তি এবং সমস্তলোকনির্মাণসমবায়স্বরূপিনী এবং শিবস্বরূপানুকারিণী।

শক্তি যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাকে 'বিমর্শ' বলা হয়। সূক্ষ্ম চিদাচিদাত্মক শক্তিই বিমর্শ। সিদ্ধান্তশিখামনি বিমর্শাখ্য পরাশক্তিকে 'বিশ্ববৈচিত্র্যকারিণী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ময়ূরাস্ত-রস ন্যায়ে এই শক্তির মধ্যে জগৎ সূক্ষ্মরূপে বীজাকারে অবস্থিত। যেমন ময়ূরের অন্তরসের মধ্যে ভাবী ময়ূরের বিভিন্ন ও বিচিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবস্থিত সেইরূপ এই বিচিত্র জগৎ এই শক্তির মধ্যে বীজাকারে অবস্থিত।

বিমর্শের সংজ্ঞা সিদ্ধান্তশিখামনিতে এইভাবে আছে :—

'যথা চন্দ্রে স্থিরা জ্যোৎস্না বিশ্ববস্তু প্রকাশিনী।
তথা শক্তিঃ বিমর্শাখ্যা প্রকাশে ব্রহ্মণি স্থিরা ॥
অন্তঃকরণরূপেণ জগদঙ্কুররূপতঃ।
যস্মিন্ বিভাতি চিৎশক্তিঃ ব্রহ্মভূতঃ স উচ্যতে।' (২০.৩১-৩২)

অথাৎ যেমন জ্যোৎস্না চন্দ্রে স্থির থাকে, সেইরূপ বিমর্শাখ্য শক্তি ব্রহ্মে স্থির থাকিয়া বিশ্ববস্তু প্রকাশ করেন। চিৎশক্তি অন্তঃকরণরূপে এবং জগদঙ্কুররূপে বিমর্শে প্রকাশিত হন। সেইজন্য উহাকে ব্রহ্মভূত বলা হয়। বীরশৈব মতে জীব শিবাংশ। যথা:—"অনাগুবিগুা সম্বন্ধাৎ তদংশো জীবনামক:"—সিদ্ধান্তশিখামণি (৫.৩৪) অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যার সম্বন্ধ হেতু তাঁহার (শিবের) অংশই জীব নাম ধারণ করে।

শ্রীপতি বেদান্তসূত্রের বীরশৈবভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীপতির মতে পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক শ্রুতি সমূহের সমন্বয় বীরশৈব মতেই সম্ভব। তিনি বলেন :—

'দ্বৈতাদ্বৈত মতে শুদ্ধে বিশেষাদ্বৈত সংজ্ঞকে।
বীর শৈবৈক সিদ্ধান্তে সর্বশ্রুতি সমন্বয়: ॥'

অর্থাৎ বিশেষাদ্বৈত নামক বিশুদ্ধ দ্বৈতাদ্বৈত মতে একমাত্র বীরশৈব-সিদ্ধান্তে সর্বশ্রুতির সমন্বয় সাধিত হয়। বৈষ্ণব মতে যেমন যোগমায়া জীবকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে এবং মায়া জীবকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ বীরশৈবমতে ঊর্ধমায়া শিবের অলঙ্কার স্বরূপ, উহা শিবের বন্ধন স্বরূপ নহে এবং অধোমায়া বা অবিদ্যা জীবকে আবদ্ধ করে। আনব কর্ম ও মায়া এই মলত্রয়রূপে অবিদ্যা জীবকে সংসারে বদ্ধ করে। আনব মল প্রভাবে মানুষ মনে করে

সে সসীম দেহের অধীন। কর্ম মল -প্রভাবে মানুষ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া নব নব দেহধারণ করে এবং মায়ামলপ্রভাবে মানুষের বাসনা ও আসক্তি উৎপন্ন হয় এবং মানুষ ইহার ফলে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে।

রেণুকাচার্যের সিদ্ধান্ত-শিখামণি গ্রন্থে বীরশৈবমতে সৃষ্টিতত্ত্ব এইভাবে বর্ণিত আছে। যথা :—

'আত্মশক্তি বিকাশেন শিবো বিশ্বাত্মনা স্থিতঃ।
কুটীভাবাৎ যথা ভাতি পটঃ স্বস্ত প্রসারণাৎ ॥
পত্রশাখাদিরূপেণ যথা তিষ্ঠতি পাদপঃ।
তথা ভূম্যাদিরূপেণ শিব একো বিরাজতে ॥
বৃক্ষাস্থং পত্র-পুষ্পাদি বটবীজস্থিতং যথা।
তথা হৃদয়বীজস্থং বিশ্বমেতৎ পরাত্মনঃ ॥' (১০।৩৫-৩৭)

যেমন সঙ্কুচিত বস্ত্র প্রসারিত হইলে তাঁবু হয়, সেইরূপ স্বীয় শক্তি প্রকাশ দ্বারা শিব বিশ্বরূপে বিকসিত হন। বীজ হইতে বৃক্ষ যেমন পত্র-শাখাদিরূপে বিকসিত হয়, সেইরূপ ভূমি আদি স্থূলভূতরূপে এক মাত্র শিবই বিরাজিত। বৃক্ষস্থিত পত্র-পুষ্পাদি যেমন বট বীজের মধ্যে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ পরাশিব ব্রহ্মের হৃদয়ে এই বিশ্ব বীজাকারে বিদ্যমান থাকে। 'শিবসূত্র'-মতে "স্বশক্তি প্রচয়োঽস্য বিশ্বম্' (৩।৩০) অর্থাৎ শিবের স্বীয় শক্তির প্রকাশই এই জগৎ। 'সিদ্ধান্ত-শিখামণি' গ্রন্থে সৃষ্টিকে স্রষ্টা হইতে অভিন্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা :—

'যস্মাৎ এতৎ সমুৎপন্নং মহাদেবাৎ চরাচরম্
তস্মাৎ এতৎ ন ভিদ্যেত যথা কুম্ভাদিকং মৃদঃ ॥
শিবতত্ত্বাৎ সমুৎপন্নং জগদস্মাৎ ন ভিদ্যতে।
ফেনোর্মিবুদ্বুদাকারো যথা সিন্ধোর্ন ভিদ্যতে ॥
যথা পুষ্পপলাশাদি বৃক্ষরূপান্ন ভিদ্যতে।
তথা শিবাৎ পরাকাশাৎ জগতো নাস্তি ভিন্নতা॥' (১০।৫৩-৫৫)

অর্থাৎ কুম্ভাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ এই চরাচর জগৎ স্রষ্টা মহাদেব হইতে ভিন্ন হয়। যেমন ফেনা, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ এই জগৎ উৎপাদক শিব হইতে ভিন্ন নয়। পুষ্প পলাশাদি যেমন বৃক্ষ হইতে ভিন্ন নয়, সেইরূপ পরাকাশরূপ শিব হইতে এই জগৎ ভিন্ন নয়। 'শিবাগম' গ্রন্থ শিব হইতে জগতের ক্রমবিকাশ এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন। যথা :—

'অনাদিনিধনাৎ শাস্তাৎ শিবাৎ পরমকারণাৎ।
ইচ্ছাশক্তির্বিনিক্রান্তা ততো জ্ঞানং ততঃ ক্রিয়া ॥
তত্রোৎপন্নানি ভূতানি ভুবনানি চতুর্দশ ॥'

অর্থাৎ আদি ও অন্তহীন পরম কারণ শান্ত শিব হইতে প্রথম ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়, ইচ্ছা হইতে জ্ঞানশক্তি এবং জ্ঞান হইতে ক্রিয়াশক্তি জাত হয়। এই ক্রিয়াশক্তি হইতে সর্বভূত ও

চতুর্দশ ভুবন সমুদ্ভূত হয়। সাংখ্যের সৎকার্যবাদের ন্যায় এই বীরশৈববাদ সৃষ্টির পরিবর্তে ক্রমবিকাশ স্বীকার করে। সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ন্যায় এই দর্শন ছত্রিশটী (৩৬) তত্ত্ব গ্রহণ করে। যথা :—

শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধ বিদ্যা, মায়া, কল, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী। মায়ার উর্ধে পাঁচটী শিবতত্ত্ব এবং মায়ার নিম্নে সবগুলি আত্মতত্ত্ব। মায়া শিবতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের সংযোগসূত্র। প্রকৃতির পরে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যবৎ। ইহার মধ্যে অন্তরেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, তন্মাত্রা ও ভুত আছে।

বীরশৈব ধর্মমতে মুক্তিকে লিঙ্গাঙ্গসামরস্য বলে। লিঙ্গ = শিব, অঙ্গ = জীব, সামরস্য = সমরস ভক্তি। পরাশিব ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যপ্রাপ্তিই মোক্ষ। সদ্ভাব ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি, অবধান ভক্তি, অনুভব ভক্তি ও আনন্দ ভক্তি—ভক্তির এই পঞ্চাবস্থা অতিক্রম করিলে সমরস ভক্তি বা পরামুক্তি লাভ হয়। এই ধর্মে পরম শিবকে 'স্থল' বলে। 'অনুভবসূত্রে' আছে। যথা :—

'স্থীয়তে লীয়তে যত্র জগদেতৎ চরাচরম্।
তদ্‌ব্রহ্ম স্থলমিত্যুক্তং স্থলতত্ত্ববিশারদৈঃ॥
স্বশক্তিক্ষোভমাত্রেণ স্থলং তদ্ দ্বিবিধং ভবেৎ।
একং লিঙ্গস্থলং প্রোক্তম্ অন্যৎ অঙ্গস্থলং স্মৃতম্॥
লীয়তে গম্যতে যত্র জগৎ সর্বং চরাচরম্।
তদেতৎ লিঙ্গমিত্যুক্তং লিঙ্গতত্ত্বপরায়ণৈঃ॥'

অর্থাৎ যে ব্রহ্মে এই চরাচর জগৎ অবস্থান করে ও লয়প্রাপ্ত হয় তাঁহাকে স্থলতত্ত্বজ্ঞগণ 'স্থল' বলেন। স্বীয় শক্তির ক্ষোভ মাত্রেই এই ব্রহ্মরূপস্থল দ্বিবিধ হন। একটী লিঙ্গস্থল (শিব) ও অপরটী অঙ্গস্থল (জীব)। এই চরাচর বিশ্ব যাহাতে গত ও লীন হয়, তাহাকে লিঙ্গতত্ত্ব-বিশারদগণ 'লিঙ্গ' বলেন। ব্রহ্মই মানুষের চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থল। অন্য সকল প্রকার আশ্রয় অস্থায়ী। অস্থায়ী ভেলার আশ্রয়ে নদী পার হওয়া যেমন বিপজ্জনক সেইরূপ এই ভবসাগর পার হইবার জন্য ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধিও আত্মীয়স্বজনাদি নশ্বর আশ্রয় করিলে দুঃখই লাভ হয় এবং সনাতন আশ্রয়স্থল ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে কর্ম, নিয়তি. সংস্কারাদি দ্বারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। অথচ ঐহিক আশ্রয়কে মানুষ পারমার্থিক আশ্রয় অপেক্ষা কত বেশী দৃঢ় মনে করে।

৪৪ প্রকার অঙ্গ ও ৫৭ প্রকার লিঙ্গ অর্থাৎ ১০১ প্রকার স্থল আছে। এই সকলের পূর্ণজ্ঞান হইলে মুক্তি লাভ হয়। স্থূল, (বাহ্য) সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে লিঙ্গস্থল তিন প্রকার, যথা :—ইষ্টলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, তৃপ্তিলিঙ্গ বা ভাবলিঙ্গ। স্থুল ইষ্টলিঙ্গের চিহ্নই বীরশিবভক্ত অঙ্গে ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যবহু প্রকার লিঙ্গ আছে, যথা :—গন্ধগ্রহণ সাধন ঘ্রাণাখ্য আচার-লিঙ্গ, রসগ্রহণ সাধন জিহ্বাখ্য গুরুলিঙ্গ, রূপগ্রহণ সাধন নেত্রাখ্য শিবলিঙ্গ, স্পর্শগ্রহণ সাধন ত্বগাখ্য

জঙ্গমলিঙ্গ, শব্দগ্রহণ সাধন শ্রোত্রাখ্য প্রসাদলিঙ্গ ও সর্বগ্রহণ সাধন মানস মহালিঙ্গ। অঙ্গস্থলও ত্রিবিধ। যথা—

'অঙ্গস্থলং তথা প্রোক্তম্ আচার্যৈঃ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।
যোগাঙ্গং প্রথমং প্রোক্তং ভোগাঙ্গং চ দ্বিতীয়কং॥
ত্যাগাঙ্গং চ তৃতীয়ং স্যাৎ ইত্যেবং ত্রিবিধং স্মৃতং॥'

অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শী আচার্যগণ অঙ্গস্থলকে যোগাঙ্গ, ভোগাঙ্গ ও ত্যাগাঙ্গ—এই তিন প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তির প্রথম, মধ্যম ও চরমাবস্থা ভেদে অঙ্গ স্থল ত্রিবিধ।

ভক্তির ছয়টী অবস্থায় ভক্তের যে ছয়প্রকার অবস্থা হয় তাহা বীরশৈবশাস্ত্রে নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তির প্রথমাবস্থায় ভক্তের নাম **জঙ্গম**। ভক্ত এই অবস্থায় সদাচার সম্পন্ন হন এবং ইষ্টশিবে তাঁহার একনিষ্ঠা ভক্তি হয়। ভক্তির দ্বিতীয়াবস্থায় ভক্ত যখন শিবনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মাদি স্থান বিমুখ হইয়া নিঃস্বার্থভাবে দান ও সেবায় তৎপর হন তখন তাঁহাকে **মাহেশ্বর** বলা হয়। মনের শান্তিলাভ এবং নির্মলজ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য ভক্ত শিবের কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাহাকে **প্রসাদী** ভক্ত বলে। চিদাত্মক ব্রহ্মই প্রাণরূপিণী শক্তিযুক্ত লিঙ্গ। এইরূপ লিঙ্গ-বিজ্ঞানীকে **প্রাণলিঙ্গী** ভক্ত বলা হয়। যখন ভক্ত শিবরূপ লিঙ্গকে স্বীয় পতি (স্বামী) এবং নিজেকে সতী (পত্নী) মনে করিয়া শিবধ্যানে মগ্ন হন এবং প্রাপঞ্চিক (জাগতিক) সুখ উপেক্ষা করেন, তখন তাহাকে **শরণভক্ত** বলে।

বীরশিব ভক্তের ভক্তির পরা কাষ্ঠা 'অনুভবসূত্রে' এইভাবে বর্ণিত আছে। যথা :—

'প্রাণলিঙ্গাদিযোগেন সুখাতিশয়মেয়িবান্।
শরণাখ্যশিবেনৈক্যভাবনাৎ ঐক্যবান্ ভবেৎ॥'

অর্থাৎ ভক্তির চরমাবস্থায় শরণাখ্য ভক্ত শাশ্বতী শান্তিলাভ করেন এবং শিবের সহিত ঐক্যভাবনা দ্বারা শিবের সহিত পরম ঐক্য লাভ করেন। ইহাই সামরস্য। 'সিদ্ধান্তশিখামণি' (২০।২) গ্রন্থে রেণুকাচার্য এই সামরস্য বা পরমমুক্তির এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, যথা :---

'জলে জলমিব ন্যস্তং বহ্নৌ বহ্নেরিবার্পিতঃ।
পরে ব্রহ্মণি লীনাত্মা বিভাগেন ন দৃশ্যতে।'

অর্থাৎ যেমন জলে জল ন্যস্ত হইলে এবং অগ্নি অগ্নিতে অর্পিত হইলে মিলিত বা একীভূত হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মে পরাশিবে আত্মা লীন হইলে তখন শিবের ও জীবের মধ্যে কোন বিভাগ (ব্যবধান) দৃষ্ট হয় না।

বীরশৈবশাস্ত্রে শিবপদ-প্রাপ্তির যেরূপ বর্ণনা আছে মুণ্ডক ও কঠোপনিষদ্ প্রভৃতিতেও ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তির সেইরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়। ইষ্টের সহিত অদ্বৈতানুভূতিই ভক্তির চরমলক্ষ্য ও প্রকৃত আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলিতেন শ্রদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান এক। সিদ্ধির অবস্থায় জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। ভক্তিসমূহকে এই আলোকে ব্যাখ্যা করিলে দেশে ভক্ত ও জ্ঞানীর শোচনীয় বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

যাস্কের সমাজ

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র, এম্‌. এ.

বিষয়টী আলোচনা করিবার পূর্বে নিরুক্ত এবং যাস্কের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা সমীচীন মনে করি।

ব্রাহ্মণযুগে সংহিতার অনেক মন্ত্রেরই অর্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ সাধনের জন্য মন্ত্রগুলিকে সেই সেই যজ্ঞের অনুকূল করিয়া ব্যাখ্যা করা হইত। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এমন ভূরি ভূরি নির্বচনের উল্লেখ আছে, যেগুলি পাঠ করা মাত্রই মনে হয়, মূল সংহিতার সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল না। অনেকটা জোর করিয়া অর্থ করার প্রয়োজনও যে ছিল না, এমন নহে। তখন যজ্ঞের যুগ এবং সংহিতার প্রামাণ্য ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ধর্মজগতের সকল কিছুই ঋক্, যজুঃ ও সামমূলক—ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য যাজ্ঞিকগণের অদম্য প্রয়াস চলিতেছিল। কাজেই মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলেই এই ব্যাপারটীর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইবে। এই প্রকার নির্বাচনের রীতি আরণ্যক ও প্রাচীন উপনিষদ্ সমূহেও অক্ষুণ্ণ রহিল। ক্রমে ক্রমে সংহিতাযুগ এতদূর অতীতের বস্তু হইয়া পড়িল যে, পরবর্তী কালের ভাবধারার সহিত ইহার সামান্যমাত্রই সাদৃশ্য রহিল। তখন সংহিতায় যাহাতে মূল অর্থের ব্যত্যয় না হয়, সেই অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন পদ্ধতিতে মন্ত্র ব্যাখ্যা করা। এই নিবন্ধেই যথাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং আচার্যদিগের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে যে সকল সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়, তাহাদের মধ্যে নিঘণ্টুকারগণ অন্যতম। তাঁহাদের কার্য ছিল বাছিয়া বাছিয়া বেদোক্ত দুরূহ শব্দসমূহের সঙ্কলন করা এবং দেবতাদিগের উল্লেখ করা। যাস্ক প্রথমেই বলিয়াছেন—"সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ।" ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে নিরুক্ত এই নিঘণ্টু নামক সমাম্নায় অর্থাৎ সংগ্রহের ব্যাখ্যা। এই সমাম্নায় যে কত প্রাচীন তাহা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। যাস্ক নিঘণ্টু শব্দের তিন রকম অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ আসল অর্থ কি ছিল তাহা তাঁহাকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে হইয়াছে। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া বহু নিরুক্তকার তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন। যাস্ক বিখ্যাত নিরুক্তকারগণের মধ্যে সর্বশেষ। ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাস্কের পরেও অনেক নৈরুক্ত জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু যাস্ককে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের অবদান জাতির পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া উঠে নাই বলিয়া জাতি তাঁহাদিগকে কালে কালে ভুলিয়া গিয়াছে। সমগ্রভাবে যাস্ক ভিন্ন আর কাহারও ব্যাখ্যা টিকে নাই। প্লেটোর ক্রেটাইলাসের (Cratylus) মত যাস্কের নিরুক্ত পূর্বাচার্যদেরই মতের সারসঙ্কলন। "যাস্ক যদি নিজে নৈরুক্ত হইতেন, তবে কোন কোন স্থলে 'ইতি নৈরুক্তাঃ'

এইরূপ বলিবেন কেন ?"—এই অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়া হান্নেস্ স্কোল্ড্ (Hannes Skold) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি নৈরুক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় আচার্যদিগের বর্ণনপদ্ধতি সম্বন্ধে যদি তাঁহার সামান্য মাত্রও জ্ঞান থাকিত, তবে তিনি এরূপ বলিতেন না। আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদাসীন অনেক আচার্যই কোন মতের সহিত নিজের নাম যুক্ত করিতেন না, সম্প্রদায়ের উক্তি বলিয়াই চালাইতেন।

অন্যান্য সুপ্রাচীন পণ্ডিতগণের ন্যায় যাস্ক সম্বন্ধেও সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। নিরুক্ত পরিশিষ্টের সমাপ্তিতে "নমঃ পারস্করায় নমো যাস্কায়"—এইরূপ পাঠ আছে। "পারস্কর—প্রভৃতীনি চ সংজ্ঞায়াম্"—এই পাণিনি সূত্রের (৬।১।১৫৭) মহাভাষ্যে পারস্পর একটী দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই যাস্ক পারস্কর দেশীয় ছিলেন এই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তবুও সন্দেহ রহিয়া যায়। কারণ দ্বাদশাধ্যায়ী নিরুক্ত রচনার অনেক পরে নিরুক্ত পরিশিষ্টের রচনাকাল, ইহা উভয়ের ব্যাখ্যাপ্রণালীর পার্থক্য হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই এই উক্তিতে নিঃসন্দেহ-নির্ভরতা চলে না। শতপথ-ব্রাহ্মণের বংশপ্রক্রমে আছে—"ভারদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চাসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চ।" আবার পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে "উরোবৃহতী যাস্কস্য" (৫।১০)। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে যাস্ক নামটী পাওয়া যাইতেছে। অতএব আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, যাস্ক বলিতে কেবলমাত্র নিরুক্তকার যাস্ককেই বুঝায় না। যাস্ক নামে বহু আচার্যই ছিলেন, কেহ ছন্দঃশাস্ত্রকার, কেহ বেদপ্রবক্তা, কেহ বা ব্যাখ্যাতা। অবশ্য কতজন যাস্ক ছিলেন, ইহা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা না করিলেও চলে। তবুও যাস্কের ব্যক্তিত্বের আলোচনায় ইহা অপরিহার্য। শতপথ-ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের বংশপ্রক্রম হইতে বেশ বুঝা যায়, বেদব্যাখ্যাতা যাস্ক কোন স্ত্রীপ্রধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বৃহদারণ্যকের কথিত অংশের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"স্ত্রীবিশেষণেনৈব পুত্র-বিশেষণাদাচার্যপরম্পরা কীর্ত্যতে।"—আচার্যদিগকে 'অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র,' এই বলিয়া বিশেষিত করিতে হইবে। কিন্তু শঙ্কর এখানে অনৈতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'অমুকের (পিতার) সন্তান' বলিয়াও আচার্যগণ অভিহিত হইয়াছেন, ইহারও প্রমাণ আছে। ফলতঃ দাক্ষিণাত্যে মাতৃপরম্পরায় বংশপ্রসিদ্ধি (matriarchal system) ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইতিহাসে একজন অন্ধ্র-নরপতিকে গৌতমীপুত্র বলা হইয়াছে। যাস্ক যে দাক্ষিণাত্যেরই লোক তাহা প্রমাণিত হয় "গর্তারোহিণীব ধনলাভায় দাক্ষিণাদী" (নিরুক্ত ৩।৫), যাস্কের এই উক্তি হইতে। দুর্গাচার্য বোধ হয় ইহার অর্থ সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারেন নাই। একজায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"তত্র গতা সতী-অপুত্রা রিক্থং লভতে কিতবা দাপয়ন্তি রিক্থম্।" পাশানিক্ষেপার্থ আসনকে সভাস্থাণু বা গর্ত বলা হয়। ইহার উপর পুত্রহীনা আরোহণ করে এবং অক্ষক্রীড়কগণ তাহার জন্য ধন সংগ্রহ করে। অন্যত্র তিনিই লিখিয়াছেন "তং সভাস্থাণুম্ তত্র কিতবমধ্যে অবস্থিতং, যা অপুত্রা স্ত্রী যা অপতিকা সা আরোহতি, তস্মিন্ পবিশতীত্যর্থঃ। ততঃ সা ভর্তৃবন্ধুভ্যঃ সকাশাৎ রিক্থং লভতে যস্তস্যা ভর্তৃসক্তো

ধনাংশস্তম্।"—সেই সভাস্থাণুতে দ্যূতকর-পরিবেষ্টিত হইয়া অপুত্রা অপতিকা স্ত্রী উপবেশন করে। তারপর স্বামীর আত্মীয়গণের নিকট হইতে মৃত স্বামীর অংশ লাভ করে। এখন প্রশ্ন হইল, কাহারা স্ত্রীলোকটীকে ধনদান করে, কিতবগণ অথবা স্বামীর আত্মীয় বন্ধুগণ? অধ্যাপক লক্ষ্মণ স্বরূপ উত্তর-ভারতে বর্তমান 'ঝোলিভরণা' নামে প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার পিতৃবংশের পরিজনবর্গ মুদ্রা দ্বারা তাহার ক্রোড়দেশ পূর্ণ করিয়া দেয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই প্রথায় দ্যূতকারগণ বা স্বামীর আত্মীয়গণের প্রসঙ্গ বিন্দুমাত্রও নাই। যাস্কের উক্তি—"তাং তত্রাক্ষৈরাঘ্নন্তি সা রিকৃথং লভতে।" এখানে পরিষ্কার ভাষায় অক্ষের কথা রহিয়াছে। কাজেই দুর্গাচার্যের অর্থে গোলমাল হইলেও আমাদের কিছু ক্ষতি হইবে না। যাস্ক 'গর্ত'শব্দের অর্থ করেন (১) সভাস্থাণু এবং (২) শ্মশানসঞ্চয়। প্রথমোক্ত অর্থই তাঁহার অভিমত বলিয়া মনে হয়। দেশাচার প্রমাণে তিনি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন। সুতরাং দেখা গেল, যাস্ক দাক্ষিণাত্য-নিবাসী না হইয়া পারেন না। দুর্গাচার্য এই দেশাচার অবলম্বনে ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করেন নাই। কাজেই এই অংশটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক। ৯০৭৪৪

নিরুক্তকার যাস্ক কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাঁহার নির্বচনরীতি, দর্শনের আলোচনা, ভাষা, পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার সময় আমরা অনুমান করিতে পারি, এইমাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, নিরুক্তকারগণের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনভাবে সংহিতাগুলির বিশেষ করিয়া মূল অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা করা। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগ ভারতীয় আর্যগণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা কাটাইতে না পারিয়া তাঁহারা প্রায়ই ব্রাহ্মণের নিরুক্তি অবলম্বন করিতেন এবং নিজেদের মত-সমর্থনের জন্য কৌষীতকি, ঐতরেয়, শতপথ প্রভৃতি নানা ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতেও বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিতেন। নিরুক্তের ভাষা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি সুপ্রাচীন উপনিষদের ঠিক পরবর্তী। ইহাতে ব্রাহ্মণ আরণ্যকের ভাষার নিদর্শন অনেকাংশেই রহিয়া গিয়াছে। বৈদিক সূত্রসাহিত্যের ভাষার আভাসও ইহাতে পাওয়া যায়। যাস্ক সংহিতার দুইপ্রকার সংজ্ঞা দিয়াছেন,—"পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা", এবং "পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা" (১।১৭)। প্রথমটী পাণিনি গ্রহণ করিয়াছেন (১।৪।১০৯), এবং দ্বিতীয়টী অনুসৃত হইয়াছে ঋক্প্রাতিশাখ্যে (২।১)। প্রশ্ন উঠিতে পারে, পাণিনি ও ঋক্-প্রাতিশাখ্যকার যে যাস্কের নিকট ঋণী, ইহা কিরূপে প্রমাণিত হইল? একই কথার বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ হইতে তাহাদের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা অযৌক্তিক। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা পাণিনি এবং বর্তমান ঋক্প্রাতিশাখ্যকে যাস্কের পরবর্তী বলিতে বাধ্য হইতেছি। যাস্কের ভাষায় ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন সূত্রযুগের চিহ্ন দেখিতে পাই; পক্ষান্তরে ঋক্প্রাতিশাখ্যের প্রথম দশটী পটলের ভাষা ও ছন্দ কঠ-মুণ্ডকাদি উপনিষদের ন্যায় লৌকিক সংস্কৃতের প্রাচীন রূপ। শেষের আটটী পটল লৌকিক ছন্দেই উপনিবদ্ধ। যাস্ক যে তাঁহার

সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন সংহিতার প্রাতিশাখ্যের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। "পদ প্রকৃতীনি সর্বচরণানাং পার্ষদানি" (১।১৭)—এই বাক্যে যাস্ক 'পার্ষদ' কথা দ্বারা প্রাতিশাখ্যকেই বুঝিয়াছেন। বর্তমান ঋক্‌প্রাতিশাখ্য তখন অন্য আকারেই ছিল। 'মাসকৃৎ' (৫।২১), ও 'বায়ঃ' (৬'২৮)—এই দুইটী স্থল ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাস্ক পদকার শাকল্যকে পরিহার করিয়াছেন। সামবেদের প্রাতিশাখ্যকার গার্গ্যের নাম তিনি প্রত্যক্ষভাবে না করিলেও তাঁহার মতের উল্লেখ করিয়াছেন (৪।৪) এবং শাকল্যের বিরুদ্ধে তাঁহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। যাস্ক দেখাইয়াছেন যে, তখনও পদপাঠ সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নাই।

আবার পাণিনি হইতে যে যাস্ক বহু প্রাচীন, তাহার অবিসংবাদি প্রমাণ যাস্কের পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে।

পাণিনি		যাস্ক
প্রত্যয়	স্থলে	উপজন (৪।৮)
ণিজন্ত	"	কারিত (১।১৩)
যঙন্ত	"	চর্করীত (২।২৮)
সনন্ত	"	চিকীর্ষিত (৬।১)
পদ	"	পর্বন্ (২।২)
স্বার্থ (ণিজন্তের বিপরীত)	"	শুদ্ধ (১।১৩)

এই সকল ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দ হইতে প্রমাণিত হয়, যাস্ক পাণিনির বহু পূর্ববর্তী, অন্যথা তিনি পাণিনির প্রয়োগগুলিকেই উল্লেখ করিতেন। পাণিনির প্রয়োগ অবিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে; যাস্কের প্রয়োগ পরবর্তী ব্যাকরণশাস্ত্রে অজ্ঞাত। উণাদি প্রত্যয়গুলির প্রবর্তক শাকটায়ন হইলেও পাণিনির ব্যক্তিগত প্রতিভা দ্বারা অনুরঞ্জিত। পাণিনি কতকগুলি উণাদিপ্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (৬।৪।৯৭), কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে তাহাদের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। উণাদিপ্রত্যেয়ের প্রয়োগ-প্রণালী পাণিনি হইতে এত বিভিন্ন এবং নৈরুক্তগণের রীতির সহিত ইহার বহুলাংশে এমন সাদৃশ্য আছে যে উণাদিপ্রত্যয়গুলি নৈরুক্ত সম্প্রদায়েরই অনুবৃত্তি বলিয়া অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই পাণিনির পূর্বেই উণাদিগণের অস্তিত্ব ছিল।

"পৃথক্ প্রায়ন্"—এই ঋকের (১০।৪৪।৬) ব্যাখ্যায় যাস্ক (৫।২৫) 'কেপয়' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'কপূয়'। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫।১০।৭) 'কপূয়' কথার উল্লেখ আছে। দুর্গাচার্য টীকায় বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। দৈবতকাণ্ডে আত্মবাদিগণের মত যাস্ক এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—"মহাভাগ্যাদেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।" একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি: (৭।৪) ইত্যাদি। উপনিষদের কথাগুলি যথাযথভাবে বলা এখানে সম্ভব হয় নাই, কারণ নিরুক্তকার যাস্ক এখানে উপনিষদ্ প্রচার করিতে বসেন নাই। প্রয়োজন অনুসারেই তাঁহাকে এইভাবে মত ব্যক্ত করিতে হইয়াছে।

তখনকার সমাজে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করিতে হইলে ব্রাহ্মণযুগের শেষ এবং উপনিষদ্ যুগের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত আর্যসংস্কৃতি সম্বন্ধে আগে মোটা-মুটি ধারণা রাখিতে হইবে। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু নিরুক্ত হইতে সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কতটা ধারণা করা যাইতে পারে, তাহার কিছু আভাস দেওয়া। যাস্ক সতেরো জন আচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—আগ্রয়ণ (১০।৮), আগ্রায়ণ (১।৯; ৬।১৩), ঔদুম্বরায়ণ (১।১), ঔপমন্যব (১।১; ২।২, ৬; ৩।৮, ১১, ১৮, ১৯; ৫।৭; ৬।১১, ৩০; ১০।৮) ঔর্ণবাভ (২।১৬; ৬।১৩; ৭।১৫; ১২।১, ১৯), কৌৎস (১।১৫), ক্রৌষ্টুকি (৮।২), গার্গ্য (১।৩, ১২; ৩।১৩), গালব (৪।৩), চর্মশিরস্ (৩।১৫), তৈটিকি (৪।৩, ৫।২৭); বার্ষ্যায়ণি (১।২, শতবলাক্ষ (১১।৬), শাকটায়ন (১।৩, ১২, ১৩), শাকপূণি (২।৮; ৩।১১, ১৩, ১৯; ৪।৩, ১৫; ৫।৩, ১৩, ২৮; ৭।১৪, ২৩, ২৮; ৮।২, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯; ১২।১৯, ৪০) শাকল্য (৬।২৮), স্থৌলাষ্ঠীবি (৭।১৪; ১০।১)।

ইঁহাদের অনেকেই নৈরুক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাস্কের সময়ে বৈয়াকরণগণ তাঁহাদের ব্যাখ্যাপ্রণালীতে দেশে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। প্রায়ই নৈরুক্তগণের সহিত ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে তাঁহারা একমত হইতেন। শাকটায়নের সহিত নৈরুক্তগণের বিরোধ খুব অল্পই ছিল; আবার গার্গ্য নৈরুক্ত হইলেও ব্যাকরণের পদ্ধতিতে সমধিক আস্থাবান্ ছিলেন। * যাস্ক ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা এতই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ ছাত্রকে তিনি শিষ্যত্বের অধিকার দেন নাই ("নাবৈয়াকরণায়", ২।৩)। আবার বৈয়াকরণগণের মত উপেক্ষাও করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে। শাকটায়ন তখনকার দিনে সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ-বেত্তা ছিলেন। ঋক্প্রাতিশাখ্য (১।১১, ১৭; ১৩।১৬), বাজসনেয়ি-প্রাতিশাখ্য (৩।৮, ১১; ৪।৪, ১২৬, ইত্যাদি), অথর্ব-প্রাতিশাখ্য (২।২৪), পাণিনি (৩।৪।১১১; ৮।৩।১৮ ইত্যাদি) এবং নিরুক্তে ইঁহার মত আলোচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইঁহার কোন গ্রন্থ সংরক্ষিত হয় নাই। কৌৎস অতিমাত্রায় বেদবিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে মন্ত্র নিরর্থক। যাস্ক এই মত নিরসন করিয়াছেন। সায়ণাচার্যও ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকায় যাস্কের অনুবর্তী হইয়াছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতার যুগ হইতেই বেদনিন্দকদের কথা জানিতে পারা যায়। কৌৎস সম্ভবতঃ এই উগ্রপন্থী শ্রেণীরই একজন। যেমন করিয়াই হউক বেদবাদিগণকে পর্যুদস্ত করিতেই হইবে ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্যই তাঁহারা সকল সময়ে যুক্তির আশ্রয় লইতেন না। কৌৎসের বিচারপ্রণালী (১।১৫) ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। (ক্রমশঃ)

* নিরুক্ত (১।১২)। সমস্ত নামই আখ্যাতজ কিনা, সেই বিষয়ে গার্গ্য-মতের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ গার্গ্য নামে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন—একজন ছিলেন একাধারে নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ, অপরজন প্রাতিশাখ্যকার।

ভারতযুদ্ধ কালনির্ণয়

৩

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক **শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত** এম্. এ.

পরীক্ষিন্নন্দান্তরশ্লোক * যাহা পুরাণ হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ব্যাখ্যা ভাষ্যকার মহাবিদ্বান্ এবং বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী নিম্নলিখিতরূপে করিয়াছেন :—

"যাবদিতি। পঞ্চশতোত্তরং বর্ষসহস্রম্। পাঠান্তরে পরীক্ষিৎসমকালং মাগধসোমমারভ্য রিপুঞ্জয়ান্তং মাগধানাং সহস্রাব্দত্বস্যোক্তত্বাৎ। অনন্তরং প্রদ্যোত শিশুনাগানাং পঞ্চশতাব্দস্যোক্তত্বাৎ সার্দ্ধসহস্রস্যোক্তস্য ব্যাখ্যাতম্। বায়ুক্তেঽপি পরীক্ষিন্নন্দান্তরং সার্দ্ধসহস্রমেবেত্যুক্তম্।"

শ্রীধর, পরীক্ষিন্নন্দান্তর পঞ্চশতাধিক সহস্র বৎসরই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের সমকালিক মাগধ-রাজাসোমাধি হইতে রিপুঞ্জয় পর্যন্ত ১০০০ বৎসর, অনন্তর প্রদ্যোত ও শিশুনাগদিগের রাজ্যকাল ৫০০ বৎসর বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; অতএব সার্দ্ধসহস্র পাঠই গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তারপর বায়ুপুরাণেও এই অন্তর ১৫০০ বৎসরই উক্ত, ইহাও পাইয়াছিলেন। অতএব মৎস্য এবং বায়ুপুরাণে পরীক্ষিন্নন্দান্তর কাল ১৫০০ বৎসর রাজবংশাবলী হইতে শুদ্ধরূপে "যোগ" করিয়াই লিখিত হইয়াছিল। তারপর বিষ্ণুপুরাণের লেখক এই পাটীগণিতের সংকলন ক্রিয়াতে ভুল করিলেন এবং ভাগবত পুরাণের লেখকও তাহাই গ্রহণ করিলেন। এইজন্যই এই দুই পুরাণের পরীক্ষিন্নন্দান্তর কিঞ্চিদধিক ১০০০ বৎসর বলিয়া লিখিত হইল। এই বাক্য নিতান্ত অসমঞ্জস, ইহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। তবে এই পুরাণদ্বয়ের উক্তরূপ উপসংহর্তা মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া যে একাদশ নক্ষত্র তাহা গণিতে জানিতেন, কেননা এই উভয় পুরাণে আছে যে—

প্রয়াস্যন্তি যদা চৈতে পূর্বাষাঢ়াংমহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষঃ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ †

পুরাণ মতে এবং প্রাচীনকালীয় গণনামতে সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর থাকেন। পরীক্ষিৎকালে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। যদি পরীক্ষিন্নন্দান্তর ১০০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ উর্ধ্ব হয় তবে অবশ্যই সপ্তর্ষি পূর্বাষাঢ়ায় পৌছিবেন—মহাপদ্মনন্দের সময়ে। বলাবাহুল্য উদ্ধৃত উক্তি কেবলমাত্র বিষ্ণু ও ভাগবতেই আছে অন্যত্র নাই। সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরাণের ভ্রান্তি ভাগবতকার

---

* শ্রীভারতী, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃষ্ঠা ৭৪০।

† বিষ্ণুপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪ অংশ, ২৪ অধ্যায়, ২৯৪ পৃষ্ঠা। ভাগবত পুরাণ, হিতবাদী অনুবাদ, দ্বাদশ স্কন্ধ, কলিধর্ম কথন, ১২১৭ পৃষ্ঠা, শেষ চারি পংক্তি। এস্থলে শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী শ্লোকের শেষার্দ্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"যদা পূর্বাষাঢ়ায়াং মহর্ষয়ঃ গমিষ্যন্তি তদা প্রদ্যোতাৎ প্রভৃতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীত্যর্থঃ।"

অনুকরণ করিয়াছেন। নতুবা পরীক্ষিন্নন্দান্তর কাল বিষয়ে এরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তির অস্তিত্ব অননুমেয়। অপরপক্ষে মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে—

সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তা কালে পরীক্ষিতে শতম্।
অন্ধ্রান্তে তু চতুর্বিংশে ভবিষ্যন্তি শতং সমাঃ॥ *

"পরীক্ষিতকালে সপ্তর্ষি ১০০ বৎসর মঘাযুক্ত ছিলেন, অন্ধ্রান্তে চতুর্বিংশে (মঘা হইতে) অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্রে ১০০ বৎসর থাকিবেন।

এই উক্তির পরীক্ষাও আমাদিগকে বংশাবলী হইতে করিতে হইয়াছে।

	মৎস্য মতে বৎসর সংখ্যা	বিষ্ণুমতে বৎসর সংখ্যা	ভাগবত মতে বৎসর সংখ্যা
পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক	১৫০০	১৪৯৮	১৪৯৮
নন্দবংশ	১০০	১০০	১০০
মৌর্যবংশ	১৩৭	১৩৭	১৩৭
শুঙ্গবংশ	১১২	১১২	১১২
কন্ববংশ	৪৫	৪৫	৪৫
অন্ধ্রবংশ	৪৬০	৪৫৬	৪৫৬
কালান্তর	২৩৫৪ বৎসর	২৩৪৮ বৎসর	২৩৪৮ বৎসর

সুতরাং মোটামুটিভাবে সমস্ত পুরাণই একমত যে পরীক্ষিজ্জন্ম হইতে অন্ধ্রান্ত পর্যন্ত কালান্তর ২৩৫০ বৎসর। অতএব সপ্তর্ষিচারের যেরূপ গণনা প্রচলিত ছিল তাহাতে এইকালে সপ্তর্ষি ২৩ নক্ষত্র পার হইয়া ২৪ নক্ষত্রে পৌঁছিবেন এই অনুমান আইসে। মৎস্যপুরাণে আবার পাওয়া যাইতেছে—

"পুলোমান্ত তথান্ধ্রান্ত মহাপদ্মান্তরে পুনঃ।
অন্তরং চ শতান্যষ্টৌ ষট্‌ত্রিংশত্তু সমাস্তথা।
তাবৎ কালান্তরং ভাব্যম্ অন্ধ্রান্তাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ মহাপদ্ম হইতে অন্ধ্রান্ত পর্যন্ত কালান্তর ৮৩৬ বৎসর। আমরা উপরে পুরাণ হইতে যে তালিকা দিয়াছি তাহা হইতে এই অন্তর ৮৫৪ বা ৮৫০ বৎসর আসিতেছে। বিশেষ অনৈক্য এস্থলে হইতেছে না। সুতরাং পুরাণের উপসংহর্তার মতে পরীক্ষিন্নন্দান্তর ১৫০০ বৎসরই ছিল। বিষ্ণু ও ভাগবতের লেখকের পাটীগণিতের সংকলন প্রক্রিয়ার ভ্রান্তি জন্য উহা ১০৫০ বা ১০১৫ বৎসর ভাবে দেখা দিয়াছে।

* Pargiter's Kali Age, page 59.

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যদি পুরাণ কথিত পরীক্ষিন্নন্দান্তর ১৫০০ বৎসর গ্রহণ করা যায়, তবে ভারতযুদ্ধকাল বা পরীক্ষিতের জন্মকাল কোথায় আসিয়া পড়ে।

পরীক্ষিন্নন্দান্তর	১৫০০ বৎসর
নন্দবংশ	১০০ বৎসর
চন্দ্রগুপ্তাভিষেক	৩২১ খ্রীঃ পূর্বাব্দ

সুতরাং ভারতযুদ্ধকাল ১৯২১ খ্রীঃ পূঃ অব্দের আসন্ন হয়। কিন্তু পুরাণ বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমাদের মতে কি হয় তাহাই নিম্নে দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি যে বৃহদ্রথ বংশতালিকা অসম্পূর্ণ, কারণ উহাতে কেবলমাত্র প্রধান প্রধান রাজগণের নাম দেওয়া আছে। পৌরাণিক উপসংহর্তা বলিতেছেন ভবিষ্য বৃহদ্রথগণ ৩২ জন হইবেন এবং তাহাদের রাজ্যকাল পূর্ণ ১০০০ বৎসর হইবে।

তারপর যদি "অতীত" বৃহদ্রথগণের রাজ্যকাল আনুমানিক ৩০০ বৎসর গ্রহণ করি, এবং মগধের বৃহদ্রথগণের বিলোপ এবং অবন্তীর প্রদ্যোতগণের অভ্যুত্থানের মধ্যে ১০০ বৎসর কালান্তর স্বীকার করি তবে পরীক্ষিন্নন্দান্তর ৩০০+১০০০+১০০+৫০০=১৯০০ বৎসর হয়। নন্দাভিষেক ৪২১ খ্রী° পূঃ গ্রহণ করিলে পরীক্ষিতের জন্মকাল বা ভারতযুদ্ধকাল ২৩২১ খ্রী° পূঃ অব্দের আসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা মহাভারতোক্তি হইতে জ্যোতিষিক পদ্ধতি মতে ভারতযুদ্ধ কাল ২৪৪৯ খ্রী° পূঃ অব্দ পাইয়াছি এবং এই নিরূপণ সর্বথা বরাহ-লিখিত বৃদ্ধ গর্গ হইতে প্রাপ্ত কিম্বদন্তীর সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করিয়াছে। এইরূপ ঐক্য ভারতযুদ্ধকাল বিষয়ে আরও কোনও অনুসন্ধিৎসু দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা পাই নাই। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, পৌরাণিক বাক্যাবলীর যথাযথ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতযুদ্ধকালের উর্ধসীমা যে ২৩২১ খ্রী° পূঃ অব্দ পাওয়া গেল তাহা আমাদিগকর্তৃক নিরূপিত কালের সঙ্গে বিশেষ বিভিন্ন হয় না। ভারত যুদ্ধ যদি বাস্তবিকই একটী অতীত ঘটনা হইয়া থাকে, তবে তাহার ঠিক্ একটীমাত্র কাল হইবে।

এই ভারতযুদ্ধকাল সম্বন্ধে Sir Wm. Jones, Wilford, Davis, Pratt প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসুগণ পরাশরসিদ্ধান্তের উক্তিতে যে "অশ্লেষার্দ্ধে সূর্যের দক্ষিণায়ন এবং ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ" তাহা অবলম্বন করিয়া ১২০০-১৪০০ খ্রী° পূঃ অব্দ ভারতযুদ্ধ কালে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের এই অবলম্বন পাণ্ডবকালের জন্য শুদ্ধ ছিল না। এই পরাশর সিদ্ধান্তের লেখক ব্যাসের পিতা পরাশর ছিলেন না। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের স্বকৃতটীকায় ভট্টোৎপল পরাশরতন্ত্রের বাক্য অনেক স্থলেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত অয়নস্থিতি উৎপল আদিত্যচারাধ্যায়ের টীকায় দিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের মত এই :—প্রথমতঃ এইরূপ অয়নস্থিতির উক্তি হইতে কোনও অতীত ঘটনার কাল সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ স্থিতি কোনও পূর্বকালের জন্য পরিশুদ্ধ হইলেও লেখকের কালের জন্য পরিশুদ্ধ নাও হইতে পারে এবং উহা কেবলমাত্র পূর্বামতানুসরণ হইতে পারে। তৃতীয়তঃ এই যে পরাশর সিদ্ধান্তের পরিচয়

উৎপলকৃত টীকায় পাওয়া যাইতেছে, তাহার কাল কখনও খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্বের ত নহেই অনেক পরবর্তী কালেরও হইতে পারে। আমাদের এই মত প্রত্যেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করিবেন। উৎপলোদ্ধৃত সমস্ত পরাশর সিদ্ধান্তের বাক্যাবলী পাঠ করিলেই এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং উক্ত অয়নস্থিতি আশ্রয় পূর্বক Sir Wm. Jones প্রভৃতির কাল নির্ণয় ভারতযুদ্ধ কালের ত নহেই, উহা একটী জ্যোতিষিক ঘটনার স্থুল কাল মাত্র।

এবিষয়ে Pargiter তৎকৃত Ancient Indian Historical Traditions নামক গ্রন্থের Date of the Bharata Battle নামক অংশে পৌরাণিক রাজবংশাবলীর কালের যথেচ্ছ কর্তনাদি করিয়া এবং অসম্পূর্ণ রাজবংশাবলীকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া ভারতযুদ্ধ-কালকে টানিয়া ৯৫০ খ্রী° পূঃ অব্দে নামাইয়াছেন। পরলোকগত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুত হারীতকৃষ্ণদেব, শ্রীযুত গিরীন্দ্রশেখর বসু * প্রভৃতি অনেক অনুসন্ধিৎসুগণের মতে ভারতযুদ্ধকাল ১৪০০ খ্রী° পূঃ অব্দের আসন্ন। এই সকল লেখকদিগের নির্ভর স্থল :—(১) বিষ্ণুপুরাণোক্তি যে পরীক্ষিন্নন্দান্তর ১০০০ বৎসরের আসন্ন এবং (২) ভারতযুদ্ধকালীয় অয়ন রেখা পুলহ ও ক্রতু (Alpha and Beta Ursae Majoris) এই দুই তারার যোজকের মধ্যবিন্দুগামী ছিল। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে বিষ্ণু পুরাণোক্ত পরীক্ষিন্নন্দান্তরের নির্দেশ অশুদ্ধ, এক্ষণে প্রদর্শন করিতেছি যে পুলহ ও ক্রতুতারাদ্বয়ের সমদূরবর্তী অয়নরেখা মঘা তারাকে স্পর্শ করে না। এই রেখার পাণ্ডব বা পরীক্ষিতের কালে মঘাতারায় প্রায় ভেদ করিয়া যাওয়া উচিত ছিল. পুরাণ বাক্যের এইরূপই অভিপ্রায় বুঝা যায়।

ইরেজী ১৯৩১ সালের পুলহ এবং ক্রতুতারাদ্বয়ের যোজক চাপের মধ্যবিন্দুর, এবং মঘা তারার (Regulus) ক্রান্তিবৃত্তীয় স্থান ছিল যথাক্রমে—

১৩৬° ২৮´ এবং ১৪৮° ৫২´।

এতদুভয়ের অন্তর ১২° ২৪´ দেখা যাইতেছে, এই অন্তর চিরকালই প্রায় স্থির থাকে। অতএব অয়ন রেখা মঘাগামী হয় না। অপর পক্ষে ১৪০০ খ্রী° পূঃ অব্দ হইতে ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত অয়ন চলন ৪৫° ৪৪´ পরিমিত হয়, সুতরাং যে অয়নরেখার ক্রান্তিবৃত্তীয় স্থান ৯০° ১৪০০ খ্রী° পূঃ অব্দে ছিল, তাহার ১৯৩১ খ্রী° অব্দের স্থান ছিল ১৩৫° ৪৪´ এবং মঘা তারার স্থান ছিল ১৪৮° ৫২´। এস্থলে অন্তর ১৩° ৮´, পূর্বলব্ধ অন্তর ১২° ২৪´ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। অতএব ইহাই প্রতীয়মান হয় যে পূর্বকথিত এইরূপ ভারতযুদ্ধকাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির অবলম্বন নিতান্তই দুর্বল এবং অপরিশুদ্ধ। আমাদের এক্ষণে আলোচ্য :—

* (ক) Pargiter's Date of Bharata Battle (খ) ১৩৪০ সনের ভারতবর্ষ ৩—৫ সংখ্যা (গ) J. A. S. B., 1925 (ঘ) পুরাণ প্রবেশ নামক প্রকাশিত গ্রন্থ।

২। পুরাণ কথিত সপ্তর্ষিচার এবং পরীক্ষিত কালে সপ্তর্ষির অবস্থান।

এ বিষয়ে পুরাণ বাক্য এই—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌপূর্বৌ দৃশ্যেতে হ্যুদিতৌ নিশি।
তয়োর্মধ্যেতু নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং দিবি॥
তেন সপ্তর্ষয়োর্যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
নক্ষত্রাণামৃষীণাঞ্চ যোগস্থৈতন্নিদর্শনম্॥
সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃকালে পরীক্ষিতেশতম্।*

"সপ্তর্ষিদিগের (Great Bear or Ursae Majoris) প্রথমে যে দুইটী তারা (Poniters) রাত্রিকালে উদিত হইলে দেখা যায় সেই দুই তারার মধ্যে যে নক্ষত্র আকাশে সমভাবে দৃশ্য হয়, সেই নক্ষত্রের সঙ্গে সপ্তর্ষিকে যুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, মানুষ মানের ১০০ বৎসর পর্যন্ত। ইহা নক্ষত্র এবং সপ্তর্ষির যোগের নিদর্শন। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতকালে ১০০ বৎসর মঘাযুক্ত ছিলেন।"

আমাদের এস্থলে বিচার করিতে হইবে যে এই সপ্তর্ষিচারের ব্যাখ্যাকর্তা কোন্ সময়ের লোক এবং তিনি কোথায় ছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই সপ্তর্ষিপুঞ্জের সাতটী তারাই সদোদিত বা circumpolar ছিল। অতএব ইনি কুরুক্ষেত্রের লোক হইলেও পাণ্ডব কালীয় লোক নহেন এবং তাহার কাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী ছিল না। এই পৌরাণিক উক্তির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হইতে পারে।

সপ্তর্ষির প্রথমোদিত তারাদ্বয় হইল পুলহ ও ক্রতু (Alpha and Beta Ursae Majoris)। এই তারাদ্বয়-গামী দুইটি ধ্রুবীয় দক্ষিণোত্তর রেখা করিতে হইবে। এই দুই রেখা ক্রান্তিবৃত্তকে (Ecliptic) যে দুইটী বিন্দুতে ছেদ করিবে, সেই দুই বিন্দুর মধ্যে যে নক্ষত্র (১৩° ২০´ কলা পরিমিত) সমভাবে, অর্থাৎ যাহার দুই প্রান্ত ঐ দুই বিন্দু হইতে সমদূরবর্তী হইবে, সপ্তর্ষি সেই নক্ষত্রের সঙ্গে ১০০ বৎসর যুক্ত থাকিবেন। ইহাই সপ্তর্ষিচারের পৌরাণিক নিদর্শন বা ব্যাখ্যা। ধ্রুব বা বিষুবের মস্তক (celestial Pole), কদম্ব বা ক্রান্তিবৃত্তের মস্তকের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৩° ৩০´ পরিমিত দূরে অবস্থিত থাকিয়া একটী ক্ষুদ্র বৃত্তপথে ভ্রমণ করে। সুতরাং পুলহ এবং ক্রতুগামী দক্ষিণোত্তর রেখাদ্বয়ের একটী পরিদোলকের মত গতি (Oscillatory motion) হইবে যেহেতু সপ্তর্ষি ধ্রুব পথের নীচে অবস্থিত। এস্থলে "ঋষিরেখা" অর্থে, ধ্রুব একটী বিন্দু, এবং পুলহ ও ক্রতু তারাদ্বয়ের যোজকচাপের মধ্যবিন্দু অপর বিন্দু, এই দুই বিন্দুর সংযোগরেখা বুঝাইবে। এই রেখার কোনও সময়ে স্থূল ভাবেও ১০০ বৎসরে এক নক্ষত্রগতি আংশিকভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। ইহা একজন দ্রষ্টার ভ্রমজনিত উক্তিমাত্র। এই গতি অপ্রাকৃত বা অবাস্তব। কিন্তু এই কথার সত্যতা প্রমাণ করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

* Pargiter's Kali Age, page 59.

তারপর পুরাণ বলিতেছেন সপ্তর্ষি মঘাযুক্ত পারীক্ষিতকালে ছিলেন ; আমরা এই বাক্যেরই প্রকৃত অর্থ নিরূপণে সচেষ্ট হইতেছি। এই যে "ঋষিরেখার" সংজ্ঞা আমরা গ্রহণ করিয়াছি, এই রেখা কথিত পারীক্ষিতকালে মঘাতারা ভেদ করিয়া যাইত। কারণ মঘাতারাই প্রাচীনকালে মঘানক্ষত্রের মধ্য বিন্দু বলিয়া গৃহীত হইত। নক্ষত্রাবস্থান ১৩° ২০´ কলা পরিমিত ক্রান্তিবৃত্তের অংশ, এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকামতে (বরাহকৃত) মঘাতারার স্থান স্বক্ষেত্রের ৬ অংশে অর্থাৎ এই নক্ষত্রের মধ্য বিন্দু মঘাতারার ৪০´ পূর্ববর্তী। তারপর নক্ষত্র অর্থে তারাপুঞ্জ বুঝানও অসম্ভব নহে। মঘা নক্ষত্রের ৬টী তারা যথাক্রমে Alpha, Eta Gamma, Zeta, Mu এবং Epsilon Leonis সবই সিংহরাশিতে স্থিত। সুতরাং পৌরাণিক লেখকের প্রভিপ্রায় এই—আমরা যে 'ঋষিরেখার" কল্পনা করিয়াছি ঐ রেখা মঘাতারা ভেদ করিয়াই যাইত পারীক্ষিত-কালে। তাহা হইলে তৎকালে যে রেখা পুলহ ও ক্রতুতারাদ্বয়ের মধ্য বিন্দু এবং মঘাতারা দিয়া গমন করিত, উহা ধ্রুবের ক্ষুদ্র বৃত্তপথকে যে বিন্দুতে ছেদ করিত, সেই বিন্দুই পারীক্ষিত কালে ধ্রুব ছিল। এই সিদ্ধান্তে গণিতকাল আমাদের মতে ৩৭১ খ্রী° পূ° আইসে।

পৌরাণিক ব্যাখ্যাতার অভিপ্রায়ে এই অর্থ আইসে যে, পারীক্ষিতকালে মঘাতারার বিষুবাংশ এবং পুলহ ও ক্রতুতারাদ্বয়ের বিষুবাংশদ্বয়ের মধ্যমফল তুল্য ছিল, অর্থাৎ পারীক্ষিতকালে যে সময়ে মঘাতারা দক্ষিণোত্তর রেখায় বা বৃত্তে উপনীত হইত সেই সময়ে পুলহ ও ক্রতুতারাদ্বয়ও দক্ষিণোত্তর রেখার পূর্ব ও পশ্চিমে সমদূরবর্তীভাবে উপস্থিত হইত। আমরা Dr. Neugebauer's Sterntafelen নামক গ্রন্থালোচনা দ্বারা জানিতে পারিতেছি যে এইরূপ ঘটনার কাল ৩০০ খ্রী° পূ° কালের আসন্ন। আমাদের গণিত ক্রিয়ালব্ধফলের সহিত এই ফলের ৭১ বৎসরের অন্তর অতি সামান্যই বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব পৌরাণিক লেখকের সপ্তর্ষিচারের ব্যাখ্যা এবং পারীক্ষিতকালে সপ্তর্ষির স্থিতি উভয়েই নিতান্ত অসার। এই উক্তি দ্বারা পারীক্ষিতকাল বা ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণ সম্ভব নহে।

কেহ কেহ বলেন যে, সপ্তর্ষি অর্থে এস্থলে অয়ন রেখা বুঝায় ; পারীক্ষিতকালে অয়নরেখা পুলহ ও ক্রতু এই দুই তারার মধ্যবিন্দু দিয়া যাইত ইহাই পুরাণকারের অভিপ্রায়—এই অর্থে পারীক্ষিতকাল ১৪০০ খ্রী° পূ° অব্দের আসন্ন দাঁড়ায়। কিন্তু পুরাণ বাক্যে সপ্তর্ষিস্থিতি সুধু পুলহ ও ক্রতুতারার মধ্যগামী ছিল এরূপ নহে, উহা মঘাগামীও ছিল—পারীক্ষিতকালে। সুতরাং মঘানক্ষত্র বা মঘাতারাকে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পুলহ ও ক্রতুতারাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া কাল গণনা পুরাণ লেখকের মতানুযায়ী হইতে পারে না। অপর পক্ষে আমরা কেবল মঘানক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়াও গণনা করিতে পারি। অনেকেই ইহা বিদিত আছেন যে খ্রী° পূ° ২৩৫০ অব্দে অয়ন রেখা মঘাতারা ভেদ করিয়া যাইত ; মঘানক্ষত্রের মধ্যবিন্দু মঘাতারার ৪০ কলা পূর্ববর্তী বলিয়া যে সময় অয়নরেখা ঠিক্ মঘানক্ষত্রকে সমদ্বিখণ্ডিত করিত তাহার কাল ২৩৯৮ খ্রী° পূ° অব্দ আসিতেছে ; ইহা আমাদের নিরূপণ যে ভারতযুদ্ধ বর্ষ ২৪৪৯ খ্রী° পূ° অব্দ তাহার আসন্নই হইতেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই পদ্ধতিতে কোনও অতীত ঘটনার সূক্ষ্মকাল নিরূপণ

হইতে পারে না। সুতরাং পুরাণবাক্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শুধু এক অংশের অবলম্বন করিলে কেবল বিতণ্ডার সৃষ্টি হইবে, প্রকৃত বিষয়ের কোনও নির্ণয় সম্ভবপর নহে। আমরা সপ্তর্ষিস্থিতি বিষয়ক পুরাণ বাক্যের অসারতা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা যে ৩৫০ খ্রী° পূ° অব্দের আসন্ন কাল পাইয়াছি তাহা হয়তো মৎস্য এবং বায়ু পুরাণের সংকলনারম্ভকাল যাহার সঙ্গে পারীক্ষিত কালের কোনও সম্বন্ধ হইতে পারে না।

অতএব পৌরাণিক কিম্বদন্তী বা প্রমাণ ভারতযুদ্ধকাল বিষয়ে নিতান্তই ভিত্তিহীন। পৌরাণিক বৃহদ্রথবংশ বর্ণন অসম্পূর্ণ, যাহা আছে তাহা পৌরাণিকের অনুমান মাত্র; বর্তমান মৎস্য পুরাণের আরম্ভকালেই সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণদ্বয়ের উক্তি সকল পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ইহা সবিস্তার প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীও তাহা দেখাইয়াছেন। যদি আমরা মৎস্য পুরাণস্থিত মাগধরাজ তালিকার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারে, তবে ঐ পুরাণ হইতেই ভারতযুদ্ধ কাল ২৩২১ খ্রী° পূ° অব্দের আসন্ন হয়। ইহা অপেক্ষা মহাভারতোক্তি হইতে পরিশুদ্ধ গণিত দ্বারা প্রাপ্ত এবং বরাহ-লিখিত বৃদ্ধগর্গ কিম্বদন্তী কর্তৃক সমর্থিত ২৪৪৯ খ্রী° পূ° অব্দরূপ ভারতযুদ্ধ কালই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য। আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে[১], ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[২] জন্মেজয় পারীক্ষিতের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা পাইয়া থাকি। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে বা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকী-পুত্র কৃষ্ণের[৩] উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলে[৪] কৃষ্ণ একজন বৈদিক ঋষি ও কবি। আমরা গোপথ ব্রাহ্মণেও জনমেজয়-পারীক্ষিতের উল্লেখ পাইয়াছি। মহাভারতে[৫] চন্দ্রবংশের বর্ণনায় "জনমেজয়" "পরীক্ষিৎ", এই দুই নামের রাজার নামোল্লেখ পাইয়াছি, প্রথমোক্ত রাজা পুরুর পুত্র এবং দ্বিতীয় জন অনশ্বার পুত্র; কিন্তু "জনমেজয়-পারীক্ষিত" একজন মাত্র ছিলেন বলিয়াই পাইতেছি। যাঁহারা পাণ্ডবকালকে টানিয়া ১৪০০ খ্রী°পূ° অব্দে নামাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা বেদ ও ব্রাহ্মণ কালকে তাহার নিশ্চয় প্রকৃত কাল হইতে অনেক পরবর্তী করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবেন। আমরা 'শ্রীভারতী' পত্রিকাতেই বঙ্গভাষায় বেদকাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীও প্রকাশ করিতে অবসর মত চেষ্টা করিব।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধাবলীতে প্রমাণিত করিয়াছি যে লিখিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থাবলী হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা অবলম্বনে আমাদিগের কর্তৃক নিরূপিত ভারতযুদ্ধকাল ২৪৪৯ খ্রী° পূ° অব্দ ভিন্ন অন্য কোনও শুদ্ধতর ফল লাভ অসম্ভব। আমরা পৌরাণিক কিম্বা অন্য কোনও বংশাবলী বা গুরু পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাবান নহি। যদি ভবিষ্যৎকাল পাণ্ডবকালের শিলালিপি, কর্দমফলক বা অন্যবিধ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় তবেই আমাদের নিরূপিত ভারতযুদ্ধকালের শেষ পরীক্ষা হইতে পারে।

১। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩, ৫, ৪, ২। ২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪, পঞ্চিকা ৭, ২১। ৩। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩, ১৭। ৪। ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৪১ – ৪৩ সূক্ত। ৫। মহাভারতানুবাদ সিংহ কৃত, হিতবাদী সংস্করণ, ৯৫ অধ্যায়, ৮৬ – ৮৭ পৃষ্ঠা, জনমেজয়পারীক্ষিতের ইন্দ্রোতপৌরোহিত্যে অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদন শান্তি পর্বে ১৫০—১৫২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

আমাদের আলোচনায় বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণদ্বয়ের কাল ৫০০ হইতে ৭০০ খ্রীঃ অব্দ আসিয়াছে। আমরা সত্যকেই অনুসন্ধান করিতেছি। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণদ্বয় তাঁহাদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কালকে ১৪০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দের আসন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের গণনায় শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ কাল ২৪১৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ হইয়াছে। আমরা সত্যান্বেষী এবং যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি এবং লিখিতেছি। আশা করি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন না। জগতের ইতিহাসে সত্যান্বেষীর বিপদের উদাহরণ বিরল নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধাবলীতে অনেক পূর্ব লেখকদিগের মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে, সুতরাং আমরা ভাস্করের ভাষায় সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি---

যে বৃদ্ধা লঘবোঽপি যেঽত্র গণকা বধ্বাঞ্জলিংবচ্মিতান্
ক্ষন্তব্যং মম তৈর্ম্ময়া যদধুনা পূর্বোক্তয়ো দূষিতাঃ।
কর্ত্তব্যে স্ফুটকাল নির্ণয়বিধৌ পূর্বোক্তিবিশ্বাসিনাং
তত্তদ্দূষণমন্তরেণ নিতরাং নাস্তি প্রতীতির্যতঃ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম্. এ.

[২]

১৮৩৩ খ্রীঃ

হেলিবরি কলেজের বাঙলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক স্যর জি. সি. হটন-সঙ্কলিত একখানি অভিধান ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে মুদ্রিত, ফর্স্টারের অভিধান ব্যতীত, অন্য তিনখানি শ্রেষ্ঠ অভিধানের নাম করিতে হইলে এই গ্রন্থ খানির উল্লেখ করিতে হয়। এই গ্রন্থ তিন খানির প্রথম খানির রচয়িতা ডাঃ কেরী, দ্বিতীয় খানি রামকমল সেন রচনা করেন এবং তৃতীয় খানি হটনের রচিত। হটন তাঁহার অভিধান সঙ্কলনের পূর্বে বাঙলা ব্যাকরণ, বাঙলা সিলেক্‌শন ও বাঙলা গ্লসারি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই তিন গ্রন্থের প্রথম দুই খানির পরিশিষ্টে বাঙলা শব্দ-স্থচী মুদ্রিত হইয়াছে; তৃতীয় খানিতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শব্দ-স্থচী দেওয়া আছে। উক্ত গ্রন্থত্রয়ে প্রদত্ত শব্দ-স্থচী হটনের পরবর্তী কালে রচিত বৃহৎ অভিধানের প্রাক্‌চেষ্টারূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

আলোচ্য অভিধানে আখ্যাপত্রের পরে যথাক্রমে উৎসর্গ-পত্র, ভূমিকা, গ্রন্থ-পঞ্জী অর্থাৎ এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহাদের তালিকা, দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, বাঙলা ও সংস্কৃত বর্ণমালা (বাঙলা, দেবনাগর ও রোমান অক্ষরে), ও গ্রন্থে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন-নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরেই ১ হইতে ২৭৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া অকারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শব্দাভিধান অংশের প্রত্যেক কলমের জন্য বিভিন্ন পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। বাঙলা ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত সকল ফার্সী, আরবী, হিন্দুস্থানী, পর্তুগীস ও ইংরেজী শব্দ বাঙলা লিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ফার্সী, আরবী ও হিন্দুস্থানী শব্দের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ফার্সী লিপিতে এবং ইংরেজী পর্তুগীস্ শব্দের পাশে রোমান লিপিতে মূল শব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি "কোর্ট অব্ ডাইরেক্‌টারস্"-এর নামে উৎসর্গীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থ-সঙ্কলনে হটন যে সকল বাঙলা ও সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। সেই তালিকায় ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত ডাঃ কেরীর অভিধান, মার্শম্যান-সঙ্কলিত কেরীর অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ফর্স্টার, মোহন প্রসাদ ঠাকুর, মর্টন, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর এবং ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত "শব্দ-সিন্ধু" অভিধানের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, বিভিন্ন অভিধানে প্রদত্ত যে সকল শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না বলিয়া গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, অথবা যে সকল শব্দের প্রয়োগ এক খানি অভিধান ব্যতীত অন্য

অভিধানে নাই, সেই সকল শব্দ উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যেক শব্দের পাশে বিভিন্ন অভিধানে সেই সেই শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা যথাযথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই জাতীয় শব্দের অর্থ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি কখনও নিজে কোন ব্যাখ্যা সংযোগ করেন নাই। এই রীতি তাঁহার অভিধানের পূর্ববর্তী কোন বাঙলা অভিধানে দেখা যায় না।

হটন তাঁহার অভিধানের ভূমিকায় ইহা রচনার কারণ ও ইহাতে অনুসৃত রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই যে, এই অভিধান খানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রাচ্যদেশপ্রবাসী উক্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য সঙ্কলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থ এদেশবাসীদের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছে, এরূপ উক্তি কোথাও নাই। এই গ্রন্থ সঙ্কলনকালে বাঙলা-শিক্ষার্থী ইউরোপীয়দের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ইতঃপূর্বে মুদ্রিত অন্যান্য বাঙলা অভিধান অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও নির্ভুল। বাঙলা ভাষার অভিধানে শুধু প্রচলিত বাঙলা শব্দ অথবা সংস্কৃত-মূলক শব্দ থাকিলে চলে না; ইহাতে দুই জাতীয় শব্দ থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া হটন উভয় জাতীয় শব্দই সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে এই অভিধান হইতে প্রচলিত বাঙলা শব্দ সমূহ পরিত্যাগ করিলে ইহা খাঁটি সংস্কৃত অভিধানে পরিণত হইবে।

হটন প্রথমতঃ অমরকোষের সকল শব্দ সংগ্রহ করেন ও নিজে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু শব্দ সঙ্কলন করেন। এতদ্ব্যতীত "এশিয়াটিক রিসার্চেস্," "ট্রান্‌জাকশন্‌স অফ্ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী," কোল-ব্রুকের গ্রন্থ, বার্লিনের অধ্যাপক বপ্-এর গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে নির্বাচিত প্রায় ৪০ হাজার শব্দ ও তাহাদের অর্থ সংগ্রহ করেন। উইলসনের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধানে নাই এরূপ বহু বিজ্ঞান-ও ধর্ম-সংক্রান্ত শব্দ এই অভিধানে আছে। প্রত্যেক স্থলে সেই সেই শব্দ কোন্ অভিধানে কি অর্থে ব্যবহৃত তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিধানে প্রত্যেক সংস্কৃত-মূলক শব্দে তাহার লিঙ্গ ও ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রায় ৩০,০০০ শব্দের এক শব্দ-সূচী সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাও এই অভিধানের এক প্রধান অংশ সন্দেহ নাই। এই শব্দ-সূচী বাঙলা-শিক্ষার্থীদের নিকট একখানি ইংরেজী বাঙলা অভিধান বলিয়াই মনে হইবে। সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রেরা এই শব্দ-সূচী হইতে বাঙলা ভাষায় কত অসংস্কৃত মূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার এক সম্পূর্ণ তালিকা পাইবেন। এই শব্দ-সূচী প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ কলম করিয়া মুদ্রিত। এই অভিধানে উদ্ভিদ্-বিদ্যা, দর্শন-শাস্ত্র, অঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক শব্দ থাকায় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিকটেও উহা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। উক্ত অভিধানে এই রূপ বহু শব্দ আছে যাহা বাঙলা ও হিন্দুস্থানী উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। হটন এই সকল শব্দ স্থলে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী রূপই প্রথম প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের পরিশেষে একটী শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইয়াছে। এই অভিধানে এদেশীয় শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করিতে গিয়া প্রায় সর্বত্র উইলিয়ম জোন্‌সের ব্যবহৃত রীতি অনুসৃত হইয়াছে। নিম্নে এই অভিধান হইতে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

১। জানালা s. (from Portug. Janella) A window. p. 1189.

২। চাবী s. (from Portug. Chave) A key. p. 1075.

৩। চামচা s. (P...) A spoon, a ladle. p. 1076.

৪। ছাপ s. (H...) A stamp, a press, a die, an engraved block for printing calico. p. 1135.

৫। জাব্দা s. (from A...) A waste-book. p. 1190.

৬। ডেগ্‌ s. (P...) A caldron, a pot. p. 1276.

৭। ঠাণ্ডা a. (from H...) Cold, cool, fresh, comfortable, agreeable, happy, tranquil. p. 1258.

৮। ঠসা a. Deaf. (Only used in the northern parts of Benga'l.) Carey. p. 1256.

৯। টুঁটী s. 1. The throat. 2. A fish (Silurus acutus. Buchanan's Mss.) Carey. p. 1250

১০। টিমক s. (A. . .) 1. The brain. 2. Pride, haughtiness, boast. p. 1248.

১১। চোয়ালি s. The Jaws. Ta'ra'chand Ch. p. 1118.

১২। চাঁদ s. (corrupt. of চন্দ্র) The Moon. p. 1066.

১৩। চলিষ্ণু a. (mfn. R. চল্‌+ইষ্ণু) Moving about, unsteady, moveable, fluid. p. 1063.

১৪। আপিল্‌ s. (from the English appeal) An appeal. p. 341.

১৫। ঈক্ষণ s. (n. R. ঈক্ষ্‌+অন) 1. Sight, the power or act of seeing 2. An eye. p. 425'*

* এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা :—

"A/Dictionary,/Bengali and Sanskrit/Explained in English/and/Adapted for students of either language;/to which is added/an Index,/Serving as a Reversed Dictionary/By/Sir Graves C. Haughton, KNT, K.H./M.A., F.R.S., M.R.A.S, R.T.A., etc./London./Printed for the use of the Honourable the East India Company's Servants./By J. L. Cox and Son, Great Queen Street,/and sold by Parbury, Allen, & Co., Leadenhall Street./MDCCCXXXIII."/pp. XXXIV+2+2851+1, গ্রন্থের আকার ১০½" × ৭¾" ইঞ্চি।

লং-এর তালিকায় এই অভিধানের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে যথা—"Haughton's Bengali Dictionary, explained in English, 1833, pp 1,461, Rs. 80, London. Roz, & Co. Published at the charge of the E. I. Company, it serves as a Sanskrit Dictionary also, and has an Index of 80pp., serving as a reversed Anglo Bengali Dictionary, it is rich in Scientific and Technical terms, gives 40,000 Bengali words, with their derivations from Persian, Urdu, or Sanskrit; a cheap edition of this Dictionary

১৮৩৪ খ্রীঃ

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে রামকমল সেন সঙ্কলিত ইংরেজী বাঙলা অভিধান দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী শব্দ সমূহ রোমান বর্ণমালানুসারে মুদ্রিত। উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "A" হইতে "I" ও দ্বিতীয় খণ্ডে "J" হইতে "Z" যুক্ত ইংরেজী শব্দ সমূহ ও তাহাদের বাঙলা অর্থ স্থান পাইয়াছে। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রের পরেই উৎসর্গ-পত্র, তৎপরে ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী (পৃঃ ৫-২০) দীর্ঘ ভূমিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকার পরে আলোচ্য গ্রন্থে ব্যবহৃত ধাতু ও তাহার অর্থ-সূচী বিন্যস্ত হইয়াছে। এই ধাতু-সূচী বর্ণানুক্রমে সাজান হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের পর স্বরবর্ণযুক্ত ধাতু স্থান পাইয়াছে। এই সূচীতে প্রায় ১৫০০টী ধাতু আছে। এই ধাতুর তালিকা ও অভিধান অংশের শব্দ সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া মুদ্রিত। ধাতু-সূচীর পরে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই অভিধানখানি লর্ড বেণ্টিঙ্কের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহার শব্দ সংখ্যা ৬০০০০ মাত্র। রামকমল সেন তাঁহার অভিধানের ভূমিকার প্রারম্ভে এই অভিধান-সঙ্কলনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বাঙলাদেশ ব্রিটিশ রাজত্বের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এবং এই অঞ্চলে বহু ইউরোপীয় বসবাস করায় ইংরেজদের এদেশীয় ভাষা এবং এদেশীয়দের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশের আইন আদালতে তখন পর্যন্ত ফার্সী ভাষা প্রচলিত ছিল কিন্তু তিনি প্রসঙ্গতঃ এরূপ ভাষা ব্যবহারের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। একখানি ভাল ইংরেজী বাঙলা অভিধানের অভাব অনেক দিন হইতেই রামকমল অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার মতে যে কয়েকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল তাহাদিগকে অভিধান না বলিয়া শব্দ-সূচী বলা চলে। এই সকল অভিধান প্রধানতঃ স্কুলের ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল। রামকমল একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া আলোচ্য অভিধান রচনা করেন। ইহাতে প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের পাশে সেই শব্দ বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি কোন্ শ্রেণীর তাহা প্রথম নির্দেশ করিয়া বাঙলা অর্থ ও অধিকাংশ স্থলে বাঙলা অর্থের একাধিক বাঙলা প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে।

স্কুলবুকসোসাইটী ও হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে পর এই জাতীয় একখানি অভিধান সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। রামকমল এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে জন্‌সনের ইংরেজী অভিধানকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এক ইংরেজী বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার মুদ্রণকার্য ফোর্ট উইলিয়ম

would be invaluable,—*it might be reprinted for 10 Rs. Sir C. Haughton was an able critical scholar and* a Professor of Sanskrit at Haileybury for ten years."—এই অভিধান কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ও কোচবেহার স্টেট লাইব্রেরীতে এবং ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ও স্বর্গত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগ্রহে আছে।

কলেজের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আরম্ভ হইয়াছিল। এই অভিধানের ১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে প্রেসের গোলযোগের জন্য মুদ্রণকার্য স্থগিত থাকে। উক্ত ১১৬ পৃষ্ঠায় যে সকল বাঙলা টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার পরে রামকমল তাঁহার অভিধান শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। ফেলিক্স কেরী ঐ সময় এই অভিধান-সঙ্কলনের ব্যাপারে তাঁহার সহকর্মী হন এবং ডাঃ কেরী ও মার্শম্যান উক্ত অভিধানের প্রুফকপি সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কলিকাতা প্রেসে ব্যবহৃত কাগজ ও টাইপের সহিত শ্রীরামপুরের প্রেসে ব্যবহৃত কাগজ ও টাইপের বিশেষ পার্থক্য থাকায় ইতঃপূর্বে যে ১১৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া আবার প্রথম হইতে অভিধানের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়। ঐ সময় টড্ সম্পাদিত জন্‌সনের অভিধান এদেশে আসিয়া পৌঁছে। এই অভিধান হইতেও রামকমল তাঁহার অভিধানের জন্য বহু নূতন শব্দ সঙ্কলন করেন এবং এই সকল নব নির্বাচিত শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করেন। ইতোমধ্যে শ্রীরামপুর মিলে প্রস্তুত কাগজে পূর্বোক্ত ১১৬ পৃষ্ঠার পুনর্মুদ্রণ হয়। কিন্তু ঐ সময় ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু হওয়ায় এই কার্য আবার কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইয়া পড়ে। ইহার কিছুদিন পর মিঃ ওয়ার্ডের উপর এই অভিধান-মুদ্রণের ভার অর্পিত হয়, কিন্তু তিনি এই কার্য আরম্ভ করার অত্যল্প কাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। যাহা হউক ৯ বৎসর পরিশ্রমের ফলে এই অভিধানের ৩৫০ পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হয়। মার্শম্যান ঐ সময় পুরাতন বাঙলা টাইপে ও শ্রীরামপুর মিলের কাগজে এই অভিধান ছাপিতে অস্বীকার করেন। এই কাগজ ও টাইপ দুই-ই তাঁহার নিকট অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে কাগজের রং মলিন ও টাইপ অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইতোমধ্যে দুই খানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি অভিধান প্রকাশিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যাহা হউক রামকমল আবার নূতন করিয়া এই অভিধান-মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ১৪ মাসে ও দ্বিতীয় খণ্ড দুই বৎসরে মুদ্রিত হয়। সমগ্র অভিধান ১৭ বৎসরের পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়।

এই অভিধানের ভূমিকায় রামকমল সংক্ষেপে বাঙলা দেশের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙালী-লিখিত বাঙলা ভাষাও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শনস্বরূপ সম্ভবতঃ রামকমলের ভূমিকাই উল্লেখ করিতে হয়। ইহাতে সংক্ষেপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।

এই অভিধানের উল্লেখ লংএর তালিকায় আছে।[১]

(১) "Ramcomul Sen gave a work of great research, the result of 15 years' labour, in 1834, a

নিম্নে এই অভিধানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :—

১। Agast, a. শঙ্কাযুক্ত, ভয়ান্বিত, বিস্ময়াপন্ন, ভয়ানক। পৃঃ ১৭

২। Beachy, a. তটবিশিষ্ট, তীরযুক্ত, কূলময়। পৃঃ ৭৯

৩। Circuitously, ad. বেষ্টন, বা ঘেরণপূর্ব্বক। পৃঃ ১৫২

৪। Decorament, n. s. অলঙ্কার, শোভা, সাজ। পৃঃ ২৩৮

৫। Edifying, n. s. শিক্ষা, উপদেশ। পৃঃ ৩১৩

৬। Fawn, n. s. Fr. মৃগশাবক, হরিণবৎস। পৃঃ ৩৭৩

৭। Gelid, a. Lat, অত্যন্ত শীতল বা হিম। পৃঃ ৪২১

৮। Handstaff, n. s. যষ্টিবিশেষ, বর্শা। পৃঃ ৪৫২

৯। Hell-hag, n. s. নরকের ডাইন। পৃ ৪৬৩

১০। Instep, n, s. পাদাঙ্গ, পদোপরি ভাগ। পৃঃ ৫২৪

নিম্নে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"A/Dictionary/in/English and Bengalee; /Translated/from/Todd's Edition of Johnson's English Dictionary./In two volumes./By/Ram Comul Sen,/Native secretary to the Asiatick, and Agricultural and Horticultural Societies,/ Member. A.S.A. & H.S. and M. & P.S. of Bengal./Vol. 1./From the Serampore Press./1834./"pp 10 + xviii + i + 538. Size 10″ × 12½″ inches.

"A /Dictionary /in /English and Bengalee ; /Translated /from /Todd's Edition of Johnson s English Dictionary./ In two volumes./ By/ Ram Comul Sen,/ Native Secretary to the Asiatick, and Agricultural and Horticultural Societies,/ Member A. S. A. & H. S. and M. & P. S. of Bengal./ Vol. II./ From the Serampore Press./1834./" pp. 523, Size 10″ × 12½″ inches.

১৮৫৪ খ্রীঃ

জে, রবিনসন্-সঙ্কলিত "Dictionary of Law and other terms" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

translation of Todd and Johnson, containing the meaning in Bengali of 58,000 English words, it cost Rs. 50 a copy, "a perfect chaos of materials for future lexicographers", and an example of equal industry, with Radhakant's famous Sanskrit Dictionary."—Long.

এই অভিধান উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, গোলাব কুমারী লাইব্রেরী ও শোভাবাজার রাজলাইব্রেরীতে আছে।

রবিনসন্ বাঙলা গভর্ণমেণ্টের অনুবাদ-বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। এই বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা দেশের আইন আদালতে ফার্সী ভাষা ও লিপির পরিবর্তে বাঙলা ভাষা ও লিপির প্রচলন হওয়ায় কয়েকটী নূতন ইংরেজী ও বাঙলা শব্দ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তখনকার মুদ্রিত কোন অভিধানে এই সকল নবাগত শব্দের অর্থ নির্দেশ না থাকায়, অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। এই জন্য তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত কার্যের সুবিধা হইবে মনে করিয়া আইন-আদালত-সংক্রান্ত শব্দ-সংগ্রহে ব্রতী হন। ক্রমে বহু শব্দ সংগৃহীত হইলে তিনি ভাবিলেন এরূপ একখানি গ্রন্থ অনেকের প্রয়োজনে আসিতে পারে; তজ্জন্য তিনি তাঁহার সংগৃহীত শব্দ-স্বচী সত্বর মুদ্রণের উদ্দেশ্যে সদর কোর্টের প্রধান অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও মুদ্রণের আদেশ দেন, এবং মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মন্তব্য লিখনের উদ্দেশ্যে শব্দ সমূহের পাশে অধিক মার্জিন বা ফাঁক রাখিতে নির্দেশ করেন। এই অভিধান শ্রীরামপুর প্রেসে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৬ ও শব্দ-সংখ্যা আনুমানিক ৪৫০০। এই অভিধানের উল্লেখ লংএর তালিকা ও বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ২২ নম্বর সংগ্রহে আছে।*

অভিমত ও নূতন শব্দ সংগ্রহের জন্য বাঙলাদেশের বিভিন্ন বিচারকর্তা ও শাসক-বর্গের নিকট এই মুদ্রিত শব্দ-স্বচী প্রেরিত হয়। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা এই শব্দ-স্বচী মুদ্রণ ও বিভিন্ন রাজকর্মচারীদিগের নিকট প্রেরণের ব্যাপারে জে, সী, মার্শম্যানের নিকট বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনতিকাল মধ্যে বিভিন্ন রাজকর্মচারী ও বিচারকের অভিমত ও নূতন শব্দের সংযোজন প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে রবিনসন্ তাঁহার শব্দস্বচীর সংস্কারে মনোনিবেশ করেন; এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহার গ্রন্থের উপযোগী বহু শব্দ সংগ্রহ করেন। এই অভিধান খানিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় শব্দই সংগৃহীত হয়।

রবিনসন্ তাঁহার অভিধানের এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে, আইন আদালতের সহিত মুখ্যভাবে সংশ্লিষ্ট নহে এমন বহু শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ শব্দ থাকার ফলে প্রস্তাবিত সংস্করণ জনসাধারণের নিকট অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত

---

* লংএর তালিকায়এই গ্রন্থের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে। যথা :—"Law Terms – Robinson's Dictionary of ; pp. 46. Ser, P., 1854. Proposes the Bengali Explanations of 4, 500 terms used in the courts and law books of the lower provinces ; the object is to aim at fixing an uniform legal terminology, now so various and puzzling, some words are derived from Persian, but the greater part are Bengali." এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী গ্রন্থাগারে ও শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার মজুমদার মহাশয়ের সংগ্রহে আছে।

হইবে। এই গ্রন্থ নূতন করিয়া লিখিয়া পুনর্বার মুদ্রণের জন্য সদর কোর্টের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করা হইলে অধ্যক্ষ মহাশয় পুনরায় এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থের মুদ্রণ সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদান করেন এবং বাঙলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উক্ত গ্রন্থের ৪০০ খণ্ড ক্রয়ের অভিমত জ্ঞাপন করেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে স্কুলবুক সোসাইটীর তদানীন্তন সেক্রেটারী জে. সাইক্স্ মহোদয় গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। রবিনসন্ এই সংস্করণের ভূমিকায় তাঁহার এই বন্ধুর সহায়তার কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। নিম্নে এই অভিধান হইতে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। Accountable, a. দায়ী। জওয়াব দিহি। খাতক। পৃঃ ৭

২। Branch,n. শাখা। ডাল। a—School, শাখা বিদ্যালয়। —of a department, সিরিশতা। দফ্তর। পৃঃ ৪৬

৩। Concur, v. সম্মত হ। ঐক্য হ। একবাক্য হ। মিল। পৃঃ ৭১

৪। Demarcation, n. সীমা। সীমার রেখা। পৃঃ ৯৬

৫। Equitably,ad. ন্যায্য রূপে। বিনাপক্ষপাতে। পৃঃ ১১৯

৬। Friend, n. মিত্র। অন্তরঙ্গ। বন্ধু। দোস্ত। পৃঃ ১৩৫

৭। Gazette,n. গেজেট। আখবার। সম্বাদ পত্র। পৃঃ ১৩৮

৮। Hoard, v. সঞ্চয় কৃ। সংগ্রহ কৃ। পৃ ১৪৫

৯। Individually, ad. একেং। জনেং। জনাজাৎ। পঃ ১৫৩

১০। Jointly, a. একযোগে। সহযোগে। যৌতায়। একত্রে।—and severally, একত্রে ও স্বতন্ত্রে। একছেয়া রূপে। পৃঃ ১৬১

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র এই:—

"Dictionary/of/Law and other terms./ commonly emyloyed/in the Court of Bengal ; / including many/commercial words and idiomatic Phrases,/ in English and Bengalee./By/John Robinson./Bengalee Translator to Government./ Calcutta Thacker, Spink and Co., St. Andrew's Library./1860./" pp. iv. + 296.

গ্রন্থের আকার ৮″×৫″ ইঞ্চি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে এই শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে ভগবানের পূর্ণ অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হ'ন। ভারতের সেই দুর্দিনে—যখন সামন্ত নৃপতিগণ পরস্পর কলহে ও যুদ্ধে ব্যাপৃত, যখন অধর্মের গ্লানি ভারতের ধর্মগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন কংসরাজের অত্যাচারে প্রজাগণ নিপীড়িত, বিব্রত, ও সন্ত্রস্ত, তখন অধর্মের বিনাশ সাধনের জন্য, ভারতে একচ্ছত্র সম্রাটের অধীনে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, ও জগতে জ্ঞান, প্রেম, যোগ, ভক্তি ও ধর্মযোগের আদর্শ দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যভূমি ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতিথিতে যখন রোহিণী নক্ষত্র উদিত হইল তখন কংসরাজ দেবকীর গর্ভ হইতে ঘোরান্ধকার-সমাচ্ছন্ন অর্ধরাত্র সময়ে বর্তমান মথুরানগরে প্রাকৃত জন্ম-রহিত শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই মনোরম শরৎকালে প্রকৃতিদেবী অপূর্ব শোভায় শোভিতা ছিলেন—নদীসকল স্বচ্ছজলা, হ্রদগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভায় শোভিত, বনশ্রেণী পুষ্পগুচ্ছ শোভিত ও পক্ষিকুলের মধুর গুঞ্জনে মুখরিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময় লইয়া অনেক মতভেদ আছে। আর প্রকৃত বৎসর নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপরও নহে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় 'শ্রীভারতীতে' প্রকাশিত তাঁহার "ভারত-যুদ্ধকাল-নির্ণয়" প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ২৪৪৮-৪৯ খ্রী° পূ° অব্দ। তিনি জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা তাঁহার এই মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও জ্যোতিষিক গণনাদ্বারা ভারতযুদ্ধ কাল ৩১০২ খ্রী° পূ° অব্দ ধরিয়াছেন। পঞ্জিকাকারগণের মতেও এই বর্ষ সমর্থিত হয়। আর ইহাই কল্যব্দের আরম্ভ। পুরাণমতে যেদিন শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন সেই দিন হইতে কলিযুগ আরম্ভ। কিন্তু মহাভারতে আছে ভারত-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয়। এখন ভারত যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স কত তাহা জানা যায় না। যদি অন্ততঃ ৩০ বৎসর ধরা যায় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময় আনুমানিক ৩১৩২ খ্রীঃ পূ° অব্দ হয়। এবং তাঁহার দেহত্যাগের সময় আনুমানিক ৩০৭০ খ্রী° পূ° অব্দ হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে আমরা বাল্যকাল, কৈশোরকাল, যৌবনকাল ও প্রৌঢ়কাল এই ৪ ভাগে ভাগ করিতে পারি। বাল্যকালে দেখি বাৎসল্য ও সখ্যভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি, কৈশোর কালে দেখি যমুনাপুলিনে ও বৃন্দাবনের রম্য কাননে মধুর প্রেমের অপরূপলীলা, যৌবনকালে দেখি

ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগের অপূর্ব সমন্বয়বাণী গীতাজ্ঞান দান, আর তারপর প্রৌঢ়াবস্থায় দেখি এক মহাযোগিরূপে। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানবরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং বাল্যকালে তাঁহার পুতনা-রাক্ষসীবধ প্রভৃতি অমানুষিক কার্যের অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সমস্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করি বা না করি ইহা বলিতে পারি যে মানব-জাতিকে পূর্ণ মানবত্বের একটা আদর্শ দেখাইবার জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হ'ন। নচেৎ যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা তাঁহার কয়েকটী রাক্ষস-রাক্ষসী বধ বা যুদ্ধে যোগদানের জন্য অবতীর্ণ হওয়ার কোন মানে হয় না। আরও তিনি এমন একটী আদর্শ দেখাইতে পারেন না যাহা মানব-প্রযত্নের অতীত। অন্যান্য অবতারে আমরা কোন একটী বা ততোধিক বিষয়ের আদর্শ দেখি, যেমন রামচন্দ্রে আদর্শ পুত্র ও আদর্শ নৃপতিরূপে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে আমরা জ্ঞান, কর্ম ও যোগের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখি। আর তাঁহার গীতায় দেখিতে পাই সকল স্তরের মানবেরই ক্রমাভিব্যক্তির বিভিন্ন পন্থার সন্ধান। আর কোন গ্রন্থেই সর্ববিধ মার্গের এরূপ সমন্বয় দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ছিলেন গীতাধর্মের মূর্তিমান্ প্রতীক---আদর্শ কর্মযোগী, আদর্শ প্রেমিক, আদর্শ মহাযোগী ও জ্ঞানী। তাঁহার চরিত্রের ও ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে এবং ইহা সম্ভবপরও নহে। আজ এই শুভ তিথিতে সেই বিরাট্ পুরুষের উদ্দেশ্যে আমরা বারবার নমস্কার করি ও প্রার্থনা করি যেন ভারতের ও জগতের এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুর্দিন শীঘ্রই অপসারিত হইয়া নবীন ভারত, নবীন জগতের অভ্যুত্থান হয়—যেন তাঁহার করুণার অমৃত ধারায় দুঃখ, দৈন্য, মালিন্য, দ্বেষ, হিংসা দূরীভূত হইয়া জগৎ আবার শান্তির স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হয়---মানব প্রেমের, জ্ঞানের সন্ধানে মগ্ন হইয়া অমৃতত্বের অধিকারী হয়।

(২)

ইংরেজী মাসগণনা-পদ্ধতির সংস্কার

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, এম্. এ

বর্তমানে ইংরেজী বৎসরের মাসগুলিতে যে প্রকার দিন-সংখ্যা রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে বৈষম্যমূলক। ২৮ হইতে ৩১ পর্যন্ত মাসের দিন-সংখ্যা থাকায় এক মাসের সহিত অন্য মাসের তুলনা চলিতে পারে না। সেইজন্য প্রচলিত মাসকে ভিত্তি করিয়া কোন বিষয়ের সংখ্যা-পঞ্জী প্রস্তুত করিলে তাহা প্রকৃত সংখ্যা-বিজ্ঞানের (Statistics) নিয়মানুসারে তুলনা-যোগ্য হয় না। ইহা ব্যতীত মাসের দিন সংখ্যায় বৈষম্য থাকাতে লৌকিক ব্যবহারেও বহু প্রকার

অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বর্তমানের নিয়মানুসারে মাসের সহিত বারের কোন সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ নাই। অবশ্য ইহা থাকিতেও পারে না, কেননা ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয় এবং ৩৬৫ দিনেতে ৫২ সপ্তাহ হইয়া একদিন অধিক রহিয়া যায়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য বর্তমানের প্রচলিত ইংরাজী মাস গণনা পদ্ধতির সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে অনেকদিন হইতে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথমে এক প্রস্তাব হয় যে ১৩ মাসে বৎসর করা হউক। ১৩ মাসে বৎসর করিলে প্রতি মাস ২৮ দিনে হইবে এবং ১লা জানুয়ারী যে বার, প্রতি মাসের ১লা তারিখে সেই বারই হইবে। ইহা এক পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া অনেকে এ প্রস্তাবকে বিশেষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে ত্রয়োদশ সংখ্যাটীকে অশুভবাচক বলিয়া সাধারণে ধরিয়া থাকে। সেইজন্য ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য কারণে প্রস্তাবটী শেষ পর্যন্ত লোকের সহানুভূতি হারাইতে থাকে। বর্তমানে জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) সম্মুখে যে প্রস্তাব রহিয়াছে তাহা ১৩ মাসের নহে, ১২টী মাসের দিন-সংখ্যাকেই নূতনভাবে ভাগ করিয়া প্রস্তাবটী রচনা করা হইয়াছিল।

এই প্রস্তাবানুসারে মাসের দিন-সংখ্যাগুলি এইভাবে ধরা হইয়াছে :—

জানুয়ারী	৩১	এপ্রিল	৩১	জুলাই	৩১	অক্টোবর	৩১
ফেব্রুয়ারী	৩০	মে	৩০	আগষ্ট	৩০	নভেম্বর	৩০
মার্চ	৩০	জুন	৩০	সেপ্টেম্বর	৩০	ডিসেম্বর	৩০
	৯১		৯১		৯১		৯১

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি তিন মাসের দিন-সংখ্যা যোগফল ৯১ দিন অর্থাৎ ১৩ সপ্তাহ। সুতরাং বৎসরের প্রতি চতুরাংশ পরস্পরের সহিত তুলনাযোগ্য, এবং তিন মাস পরে বারগুলিন্ ঠিক ঠিক ফিরিয়া আসিতেছে। অতএব ১লা জানুয়ারী যদি রবিবার হয়, তবে ১লা ফেব্রুয়ারী বুধবার, ১লা মার্চ শুক্রবার এবং পুনরায় ১লা এপ্রিল রবিবার। ইহাতে আর একটী সুবিধা হইতেছে এই যে, জানুয়ারী মাসে ৫টী রবিবার থাকায় কাজের দিন ২৬টী হইল এবং অন্য দুইমাসে ৫টী রবিবার হওয়ায় ঐ একই সংখ্যক (অর্থাৎ ২৬টী) কাজের দিন প্রতি মাসেই থাকিয়া গেল। সুতরাং সংখ্যা-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে প্রতিমাসই পরস্পরের সহিত তুলনাযোগ্য। যে সকল পরিবর্তনের কথা বলা হইল, ইহা সকলেই সুবিধাজনক মনে করেন এবং সমর্থনও করেন, কিন্তু এই প্রস্তাবে বার বিষয়ে যে পরিবর্তনের কথা রহিয়াছে, তাহাই বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

বৎসরের মান ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার আসন্ন রাখিতে হইলে সাধারণ বৎসর

৩৬৫ দিনে ধরিয়া লিপ্-ইয়ার ৩৬৬ দিন গ্রহণ করিতে হয়। ৩৬৫ দিনে ৫২ সপ্তাহ ১ দিন; সুতরাং এক বৎসর যদি রবিবারে আরম্ভ হয়, তবে পরবর্তী বৎসর সোমবারে আরম্ভ হইবে। কাজে কাজেই প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী রবিবার হইতেছে না। এই অসামঞ্জস্য নিরাকরণ উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে প্রতি বৎসর ৩০ ডিসেম্বর শনিবার হইবে এবং তাহার পরে একটি দিন থাকিবে যাহার নাম হইবে 'বর্ষশেষ-দিন'। তাহাকে কোন বারের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইবে না। পূর্বে মাসের দিন-সংখ্যায় সমষ্টি ৩৬৪ দিন হইয়াছে, তাহার সহিত এই এক দিন যোগ করিয়া ৩৬৫ দিন হইল। লিপ-ইয়ারে এইরূপ তারিখহীন বার-হীন, কোন মাসের অন্তর্ভুক্ত নহে, এমন আর একটী দিন জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে স্থাপিত করা হইবে—যাহার নাম হইবে 'অতিবর্ষ-দিন।' এইভাবে নূতন ক্যালেণ্ডারের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রস্তাবের প্রথমাংশ আমরা বিশেষভাবে সমর্থন করি। কিন্তু দ্বিতীয়াংশে বার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে সমর্থনের অযোগ্য। তারিখ, মাস, বার, তিথি, প্রভৃতি যত প্রকার দিন নির্দেশক বিষয়াবলি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে বারই একমাত্র বিষয় যাহা সরল ও নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। বারের পৌর্বাপর্য বার গণনার প্রারম্ভ হইতে সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় মতে কোন তারিখ গণনা করিয়া বার দ্বারা তাহা মিলাইয়া দেখিতে হয় যে গণনা ঠিক হইল কিনা। তাহা ব্যতীত বারের সহিত বহু জাতির ধর্ম-ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলিত জ্যোতিষের সহিত বারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং শনিবারে বর্ষশেষ করিয়া তাহার পরের দিনকে বারহীন বলিয়া তৎপরদিবসকে। (যাহা প্রকৃতপক্ষে সোমবার) রবিবার বলিলে তাহা কি করিয়া জনসাধারণের সহানুভূতি পাইতে পারে? অন্য দেশে কি হইবে বলিতে পারি না, ভারতে তাহা হইলে দুই প্রকার বারের প্রচলন হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, এই প্রস্তাবের পরিণতি কি হয় জানিবার জন্য আমরা সকলে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকিব। অবশ্য বার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিলে মূল প্রস্তাবের আর কোন প্রকার মাধুর্যই থাকে না।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাথ সাহা Science and Cultureএর মে (১৯৩৯) সংখ্যায় ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে উপসংহারে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষভাবে সমর্থন করি। তাঁহার মতে বর্ষারম্ভ শীতকালে না হইয়া ৭ই চৈত্র বিষুবসংক্রান্তি দিবসে অর্থাৎ যেদিন দিনরাত্রি সমান হয়, সেইদিন হইতে বৎসরের আরম্ভ হওয়া উচিত। এ প্রস্তাব সকলেরই সমর্থনযোগ্য।

---

(৩)

জরথুস্ত্রের কথা

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ এম্. এ., বি. এল্

পারসীক জাতির ধর্ম-প্রবর্তক জরথুস্ত্রের জন্মকাল লইয়া বহুমতবাদ আছে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে জে, হার্টেল প্রভৃতি কেহ কেহ ৬৬০-৫৮৩ পূঃ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম সময় নির্ধারণ করেন। আবার কেহ কেহ খ্রীঃ পূঃ ১৪শ—১১শ শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার আবির্ভাবকাল স্থির করেন। পারসীকদিগের ধর্মপুস্তকের নাম অবেস্তা। ইহার অন্তর্গত গাথাগুলি পদ্যাত্মক এবং এই গুলিই জরথুস্ত্রের রচিত। অবেস্তার অন্যান্য অংশের ভাষার সহিত গাথার ভাষার একটু পার্থক্য আছে। ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি স্পিতম পরিবারের অন্তর্গত পৌরুশস্পের পুত্র। প্রথমে মৈধ্যইমাত্তংহা তাঁহার এক ভাই (cousin) তাঁহার শিষ্য হন। তারপর একটী স্থানীয় রাজপুত্র বীশ্‌তাস্‌প তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহাদের মধ্যে ও তাঁহাদের বিপরীতপক্ষের অন্তর্ভুক্ত লোকদিগের সহিত প্রায়ই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ হইতে থাকে; এইরূপ একটী যুদ্ধে জরথুস্ত্র নিহত হন। জরথুস্ত্রের পুত্রের নাম ছিল সোশিয়স্। পারসীকদিগের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে সোশিয়স্ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া জগতের দুর্নীতি দমন ও শান্তি স্থাপন করিবেন। জরথুস্ত্রের মতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা যায়। জগতে অহর্নিশ সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব হইতেছে। এই সতের নাম অহুর্মজ্‌দা ও অসতের নাম অহ্রীমন্ বা অংগ্রমৈন্যুস্। সৎ-কর্তৃক অসৎ পরাস্ত হইবে। এই অসতের অন্য নাম অহুর। ইহা অনুধাবনের বিষয় যে পারসীকদিগের অবেস্তা ও হিন্দুদিগের ঋগ্বেদ প্রায় একই রকম। ঋগ্বেদে যদি উচ্চারণের একটু তারতম্য করিয়া পড়া যায় (যেমন 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করিয়া) তাহা হইলে মনে হইবে যেন অবেস্তা পড়া হইতেছে। ইহার কারণ কি? ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস তাঁহার গ্রন্থে (Rig Vedic India) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বৈদিক-যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ও বর্তমান পারসীক জাতির পূর্বপুরুষেরা একই আর্যজাতির বংশ-ধররূপে উত্তর-ভারতে বসবাস করিতেন, তারপর গোঁড়াপন্থী সনাতনদল ও উদারপন্থীদল এই দুই দলের সৃষ্টি হয়। ক্রমে দুই দলে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং উদারপন্থীদল সপ্তসিন্ধু (উত্তর-ভারত) ত্যাগ করিল। ইহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া একেবারে ইরানদেশে উপস্থিত হইল না—পরন্তু কাবুল, কান্দাহার, সমরখন্দ, বাল্‌খ্ প্রভৃতি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পারস্য দেশে উপস্থিত হয় ও উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে ইহাদের বংশধরেরা বাণিজ্য-ব্যপদেশে গ্রীস প্রভৃতি বহু দূর দেশে গমন করে ও নিজেদের 'অগ্নি-উপাসনা' ধর্ম প্রচার করে। অবেস্তার বেন্দিদাদে এই প্রকার ১৬টী বিভিন্ন প্রদেশের নাম আছে। পরবর্তী যুগে পারস্যের

তদানীন্তন রাজ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বহু পারসীক পুনরায় ৭১৭ খ্রী° অব্দে ভারতে আগমন করে ও গুজরাটের হিন্দুরাজা ইহাদিগকে আশ্রয় দেন। ৩টী সর্তে তিনি আশ্রয় দেন---(ক) গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিতে হইবে (খ) হিন্দু মতে বিবাহাদি কার্য দিতে হইবে (গ) গুজরাটী ভাষা ইহাদের মাতৃভাষা হইবে। বোম্বাই হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে সঞ্জান্ নামক একটী ক্ষুদ্র বন্দরে ইহারা ঔপনিবেশ স্থাপন করে ; এবং ক্রমে বাণিজ্য-ব্যপদেশে বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বসবাস করে। বর্তমানে পারস্যেও অনেক পারসীক আছে।

পারসীকদিগের আদিম অধিবাস যে ভারতবর্ষে ছিল ইহা অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ডক্টর মার্টিন হোগ্ প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। (মোক্ষমূলরের Science of Language Vol. II. p. no. 170 5th ed. ; Chips from a German Workshop vol, p. 83 , ডক্টর হোগের Religion of the Parsees প্রভৃতি পুস্তক দেখুন), আর এই পারসীকজাতি এখনও বৈদিকযুগের অনেক ক্রিয়াকলাপ পালন করেন। বৈদিক ঋষিদের সোমরস-পানের ন্যায় ইঁহারা হওমরস পান করেন ; ইঁহাদের স্ত্রীপুরুষদিগের উপনয়ন হয় (নওজে অর্থাৎ নবজীবন সংস্কার)। বৈদিক যুগে স্ত্রীজাতিরও উপনয়ন হইত। তদানীন্তন যুগে পরস্পর বিবাদের কারণ বৈদিক ঋষিরা সদাত্মাকে 'দেব' ও অসদাত্মাকে 'অসুর' বলিত। ইহারা ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সৎকে অসুর (অহুর) ও অসৎকে দেব বলিত। ইহা কেবল নামের প্রভেদ মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—পারসীক ধর্ম ও বৈদিক-ধর্মের অগ্নি উপাসনা একই ও হোম যজ্ঞ এক। আর জরথুস্ত্র ছিলেন জরৎ ত্বষ্ত্র-(অগ্নির ৭টী অম্‌শস্পন্দ-এর ১ম অম্‌শস্পন্দ)এর অবতার। ঋগ্বেদ এবং অবেস্তা উভয় গ্রন্থেই ত্বষ্টা---অগ্নিদেবতা ও সৃষ্টিকর্তার নামান্তর মাত্র।

আমাদের কথা

এক বৎসর পূর্বে আজিকার এই শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে, যে তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—'শ্রীভারতী' ভারতের জ্ঞান, শিক্ষা ও দীক্ষার মন্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই এক বৎসরের ইহার দ্বাদশ সংখ্যায় এই কার্যে যে ইহা কতকটা অগ্রসর হইয়াছে গ্রাহকবর্গের ও সাধারণ পাঠকবর্গের আগ্রহ, শুভেচ্ছা ও সমানুভূতি হইতে তাহার পরিচয় পাই। আজ ইহা দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রথম বর্ষে অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সুধীবর্গ তাঁহাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধের দ্বারা ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আর ইহার মধ্যে কয়েকখানি অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থও মূল ও অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রবন্ধের ভাষাকে সাধারণের উপযোগী করিয়া আরও সহজ ও সরল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা এবিষয়ে যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিব।

আশা করি আমরা দ্বিতীয় বর্ষে সুধীবর্গ ও পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিশেষরূপে অনুগ্রহ ও সহযোগ লাভ করিব।

*　　*　　*　　*

রামকৃষ্ণ মিশন ইহার কেন্দ্রস্থল বেলুড়ে একটী প্রাচীন ভারতের গুরুকুল বিদ্যালয়ের ন্যায় আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইতেছি। বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম যে জাগতিক ধর্মে পরিণত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ নালন্দা, তক্ষশীলা, রাজগৃহ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন ভারত যে আদর্শ ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা, কর্মবীর প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল, গুরুকুল বিদ্যালয়গুলি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমান যুগে আর্য-সমাজের বিস্তৃতিলাভের অন্যতম প্রধান কারণ ইহার প্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতের বহুস্থানের গুরুকুল বিদ্যালয়গুলি। স্বামী বিবেকানন্দও নবীন ভারতের জন্য এই প্রকার গুরুকুল বিদ্যালয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক দোষ দৃষ্ট হয়। এই পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে কি প্রকার শিক্ষাপদ্ধতি ও নিয়মাদি প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন তাহার জন্য ইহার কর্তৃপক্ষ যদি এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের মত গ্রহণ করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

*　　*　　*　　*

গত আগস্ট মাসের Science and Culture পত্রিকায় স্যর এম্, বিশ্বেশরায়ের পরিকল্পিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য শিল্প বিস্তার ও অর্থনীতি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বর্তমানে ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইতেছে ইহার পরিণাম যে কতদূর ভয়াবহ তাহার স্থিরতা নাই। নৃশংস মানব-হত্যা তো আছেই তা ছাড়া কত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও মানবের শিক্ষা ও সভ্যতার ফল ইহাতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আশ্চর্যের বিষয় দেশের এত ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা সত্ত্বেও মানবমন এখনও কত পাশবিক ভাবাপন্ন। প্রার্থনা করি যে যেন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী হইতে সমরাশঙ্কা একেবারে দূরীভূত হয়।

ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতেও কিন্তু ভারতীয় নেতারা পরস্পর কলহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সুভাষ বসু মহাশয়ের ন্যায় ত্যাগী ও কর্মীকে তাঁহারা কংগ্রেস হইতে সম্পর্কশূন্য করিতেছেন। কংগ্রেস নেতাদের বর্তমান মনোভাব একান্ত নিন্দার্হ।

* * * *

গত ১৯শে আগস্ট তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কলিকাতা নগরীতে মহাজাতিসদনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার প্রদত্ত ও সুভাষ বাবুর প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠের জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি। যাহাতে এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলক সর্বপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া প্রকৃত পক্ষে ইহা মহাজাতি সদননাম সার্থক করে তাহার জন্য ইহার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

* * * *

গত ২৭শে আগস্ট তারিখে কলিকাতায় All India Anti-Communal Award-এর ৪র্থ অধিবেশন হইয়াছে। যে সব সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা আইনবদ্ধ করিয়া বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে শতধা ছিন্ন করা হইতেছে ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষহিংসা ও কলহের বীজ বপন করা হইতেছে তাহাদের আশু উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই আন্দোলন যাহাতে ফলপ্রসূ হয় তাহার চেষ্টার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে অনুরোধ করি।

পুস্তক-সমালোচনা

The Memoirs of Ramkrishna—XIII+৪৩৭, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠ হইতে স্বামী সৎস্বরূপানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩॥০ টাকা মাত্র।

যাঁহারা শ্রীম-লিখিত রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন ধর্মপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় বঙ্গভাষায় আর নাই। ঠাকুরের বাণী যেমন সরল সহজ ও মধুর কথামৃতের ভাষাও সেইরূপ প্রাণস্পর্শী। কথামৃতের অধিকাংশ কথাই শ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত বলিয়া হাজার হাজার নরনারী উক্ত কথামৃত পাঠ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিও সেই কথামৃতের অনেকাংশের অনুবাদ। অনুবাদক স্বয়ং মাষ্টার মহাশয় এবং সম্পাদক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম নেতা প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। গ্রন্থখানি Gospel of Ramkrishna নামে New York বেদান্ত-সমিতি হইতে ১৯০৭ খ্রী° প্রথম প্রকাশিত হয়। উহা বর্তমানে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় বর্তমান সংস্করণটী কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। Gospel of Ramkrishna অপেক্ষা গ্রন্থ খানিতে অনেক নূতন তথ্য এবং অনেকগুলি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। মূলই হউক আর অনুবাদই হউক কথামৃতের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা। আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। যাঁহাদিগের আকরগ্রন্থ বেদান্তাদির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছে তাঁহারাই জানেন ঠাকুর অতি সহজ ভাষায় সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বৈদান্তিক দুরূহ তত্ত্বগুলির কি সুন্দর সমাধান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থখানিকে ইংরেজী পাঠকের ও পাশ্চাত্ত্য জগতের উপযোগী করিবার নিমিত্ত সুনির্বাচিত করা হইয়াছে। এই হিসাবে গ্রন্থখানি অমূল্য। যাঁহাদের আগ্রহ আছে আমরা তাঁহাদিগকে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সকল প্রকার মতেরই ধ্বনি বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায়। গৃহী ও ভক্তের নিমিত্ত উহার সুষ্ঠু সমাধানও গ্রন্থে বিদ্যমান। গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। গ্রন্থের শেষে একটী নির্ঘণ্ট থাকায় ইহা আরও সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ

আমরা বাঙালী—অধ্যাপক শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ., প্রণীত। এইচ, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ, (১৯, নং শ্যামাচরণ দে স্টাট্ কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাঙ্ক ১০+২৩০+৩২। মূল্য—৸০ আনা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়া গিয়াছেন "আমার বিশ্বাস বাঙালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি।" বাঙলার প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে ইহার বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বাস্তবিকই আমাদের বিশ্বাস হয় না যে এক কালে আমাদেরই পূর্বপুরুষগণ জগতের মধ্যে এক

গৌরবান্বিত জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লেখক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এ পুস্তকের উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা নহে। সাধারণ লোকের ভিতর বাঙালীর প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা নিরাকরণ করিতে, এবং বাঙালী ও ইংরেজের প্রাথমিক সম্বন্ধ বিষয়ে যে অযৌক্তিক মতামত প্রচারিত আছে, তাহার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ইহা প্রমাণ করিতে চাহি নাই যে বাঙালী একটী সর্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠতম জাতি।" গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে তাঁহার এই মহোদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে বাঙলার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙালী-জাতির প্রাচীনত্ব, বাঙালীর ভাষা ও লিপি, বাঙালীর বল, বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙালীর নৌ-শিল্প, বাঙালীর উপনিবেশ, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ও ভাস্কর্য-স্থাপত্য-শিল্প-সঙ্গীত চিত্রকলা-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার দশম পরিচ্ছেদে বাঙলার প্রাচীন ও বর্তমান মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকের শেষে একটী পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে বাঙলার প্রচীন রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ আলোচনা পুস্তকখানিকে অধিকতর সুন্দর ও মূল্যবান্ করিয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে পুস্তকখানি তাঁহার প্রথম বাঙলা রচনা। প্রথম রচনা হিসাবে ইহার মধ্যে দুই একটী ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও ইহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি প্রত্যেক বিদ্যালয় ও সাধারণ পাঠাগারে রাখিবার যোগ্য। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

গীতা-তত্ত্বাঙ্ক—হনুমান প্রসাদ পোদ্দার কর্তৃক সম্পাদিত। গোরখপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ডবলক্রাউন ১০৭২। মূল্য ৪৲

ত্রিবর্ণরঞ্জিত ও একবর্ণের বহুচিত্র সম্বলিত এই বিরাট্ গ্রন্থখানিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে হিন্দুধর্ম, দর্শন, সাধনা ও শিক্ষাদির যতপ্রকার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া সেই সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই প্রকার ৭৫টী প্রবন্ধ আছে। তারপর মূল শ্লোকগুলি বিস্তৃত হিন্দী টীকা সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে গীতার ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তারপর পুনরায় গীতার তত্ত্ব, সাধনা ও ফল-সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিশেষে গীতা-সম্বন্ধীয় গান, ইহার গৌরব গান প্রভৃতিও সন্নিবিষ্ট আছে। এক কথায় গীতাসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় বিশিষ্ট লেখকের দ্বারা গ্রথিত হইয়া ইহাকে এক অভিনব গ্রন্থ করিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধগুলিই সরল হিন্দী ভাষায় সাধারণের উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতা ভারতের এক অমূল্য সম্পদ এবং সমগ্র জগতের ধর্ম ও দার্শনিক গ্রন্থের শিরোমণি স্বরূপ। ইতিপূর্বে পোদ্দার মহাশয় তাঁহার পরিচালিত হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'কল্যাণে'র বিশিষ্ট সংখ্যারূপে ঈশ্বরাঙ্ক, শ্রীশিবাঙ্ক, যোগাঙ্ক, রামায়ণাঙ্ক, বেদান্তাঙ্ক,

কল্যাণ সংঘাঙ্ক ও মানসাঙ্ক নামক কয়েকটী বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রকাশ দ্বারা হিন্দুধর্মের বহুল প্রচার করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থও কল্যাণেরই একটী বিশিষ্ট সংখ্যা। অতি অল্প মূল্যে এই সকল মনোরম গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া তিনি হিন্দু জনসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পরিচালিত ধর্মমূলক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা Kalyan Kalpataruরও এই প্রকার কয়েকটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সমালোচনায় প্রত্যেক প্রবন্ধের বিষয় সামান্যভাবে উল্লেখ করাও অসম্ভব। তবে একটী বিষয়ে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিতেছি যে তিনি গীতার উপরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সকল ভাষ্য ও টীকা আছে সেইগুলি যদি ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ সমেত খণ্ডাকারে প্রকাশিত করেন তবে জ্ঞানপিপাসু ও গীতানুরাগী ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা হয়। এক একটী খণ্ডে এক একটী ভাষ্য বা টীকা ও তাহার অনুবাদ থাকিবে। মূল প্রত্যেক খণ্ডেই থাকিবার প্রয়োজন নাই। কিছুকাল পূর্বে পণ্ডিত রামদয়াল মজুমদার ও দামোদর শর্মাও কতকগুলি ভাষ্য, টীকা ও অনুবাদ সমেত গীতা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু একত্র এরূপভাবে সকল টীকার সন্নিবেশে অসুবিধা হয়, সেইজন্য খণ্ডাকারে প্রকাশই বাঞ্ছনীয়।

যাহাতে এই প্রকার গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর ও সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যে প্রচারিত হয় তাহার কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

প্রত্নতত্ত্ব

১। Survey of Persian Art—প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত। ৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ। Arthur Upham Pope কর্তৃক সম্পাদিত।

২। Art Musulmans Extreme-Orient par S. Elisseev, R. Grousset, J. Hackin, G. Salles and Ph. Stern, Paris.

ধর্ম ও দর্শন

৩। Buddhism, its Doctrines and Methods—A. David Neel. London.

৪। Probleme der Buddhischen Logik in der Darstellung des Tattva-Sangraha—Arnold Kunst. Krakow.

৫। Buddhist Bibliography—compiled by A. C. March.

৬। Le Bouddhisme---J. Przyluski,

৭। The Meaning of Vedic Bhūsati—J. Gonda.

৮। বেদান্ত পরিভাষা সংগ্রহঃ—রাম বর্মা

৯। কল্যাণ-গীতাতত্ত্বাংক।

১০। Concordance Dictionary to Yogasūtras of Patañjali and the Bhāsya of Vyāsa—Bhagāvan Das.

১১। Oriental Mysticism—E. H. Palmer.

ইতিহাস

১২। Maharaja Ranajit Singh—published by the Khalsa College, Amritsar.

১৩। Ancient India. History of Ancient India for 1,000 years (from 900 B. C. to A. D. 100)—Tribhuvandas L. Shah.

১৪। Tarikh Badshah Begam—A Persian Manuscript on the History of Oudh. Translated by Muhammad Taqi Ahmad, M.A. with a foreword by Sir Jadunath Sarkar.

ভাষা ও সাহিত্য

১৫। শ্রীনারায়ণ ভট্ট কৃত প্রক্রিয়াসর্বস্ব (কে, শাম্বশিব শাস্ত্রীর টীকা সমেত)—দ্বিতীয় ভাগ। ইংরেজী ভূমিকা সমেত। (Trivandrum Sanskrit Ser. No. CXXXIX.) (Sri Citrodayamanjari. No XXVIII.)

১৬। Raja Rammohun Roy—Selections from Official letters and documents relating to Raja Rammohun Roy. Vol I 1791-1830. Edited by Rai Bahadur Ramaprasad Chanda and Jatindra Kumar Mazumdar.

১৭। সূক্তি-রত্নহার :—মূলসংস্কৃত। কে, শাম্বশিব শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত। (Trivandrum Sanskrit Ser. No. CXLI) (Sri Citrodayamanjari No XXX)

বিবিধ

১৮। Indian Tales—Elizabeth Sharp.

১৯। The Sociology of Races, Cultures and Human progress—Dr. B. K. Sarkar M. A.

২০। Iranian & Indian Analogues of the Legend of the Holy Grail—Sir J. C. Coyajee.

২১। Early Buddhist Jurisprudence—Miss Durga N. Bhagvat, M. A.

সাময়িক-সাহিত্য শ্রাবণ—১৩৪৬

সাহিত্য

প্রবাসী—হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব।

„ —পুঁথির কথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

„ —কবিতার মূল্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভারতবর্ষ—প্রাচীন ভারত—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্. এ., বি. এল্. পি-এচ্. ডি.

„ —অপরাধতত্ত্বে নারীর স্থান—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ., বি. এল্.

„ —জাপানের শিক্ষানীতি—শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

মাসিক বসুমতী—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব (৩)—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

„ —ভারতে জাতীয় আন্দোলনে বাঙালী—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

„ —প্রাচীন ভারতীয় ছায়া-নাট্য—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

প্রবর্তক—চৈনিক নাট্যরীতি—শ্রীবিনয় সরকার এম্. এ.

„ —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল—শ্রীফণিভূষণ দত্ত।

„ —মধুসূদন ও তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্য—শ্রীপ্রিয়লাল দাস।

„ —শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী।

„ —"পুরুষোত্তম-তীর্থ"—শ্রীরমণ

বঙ্গশ্রী—বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত।

„ —কৃষিঋণ ও দেশীয় মহাজন—শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

„ —অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্মণ।

বিচিত্রা—নলরাজার দৈত্য—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্. এ., ভাষাতত্ত্ব-রত্ন।

„ —প্রাচীন বাংলার মঙ্গলকাব্য—ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এম্. এ., পি-এচ্. ডি' কাব্যতীর্থ।

„ —মেঘনাদবধ কাব্যে শিল্পকৌশল (২)—শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার এম্-এ

„ —বৈষ্ণব সাহিত্যের গোড়ার কথা—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

অলকা—ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী।

„ ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

„ অতীতের ঈজিপ্ট—শ্রীচিত্রগুপ্ত।

উদ্বোধন—মানব-প্রাণের গৌরব—অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

„ হরিদ্বার—স্বামী চিন্ময়ানন্দ।

„ সুখ ও দুঃখ—স্বামী শঙ্করতীর্থ

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম—শ্রীঅরবিন্দ।

মাসিক বসুমতী—গীতা বিচার (১৬)—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

" পতঞ্জলি ও মহাভাষ্য—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

" বৈষ্ণব মতবিবেক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম, এ., বি. এল.

প্রবর্তক—পূজা-পদ্ধতিতে মুদ্রা রচনা ; বলিদ্বীপ—স্বামী সদানন্দ

" মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি—স্বামী সদানন্দ ও শ্রীতারাকিশোর বর্ধন।

উদ্বোধন—গতিশীল ধর্ম ও সমাজ—স্বামী সুন্দরানন্দ।

" রাশিয়ার জড়বাদ বনাম ভারতের আধ্যাত্মিকবাদ—

শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন, বি-এ. বি-টি।

উদ্বোধন—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রক্ষেপ—স্বামী তপানন্দ।

ইতিহাস

প্রবাসী—দারাশুকোর কান্দাহার অভিযান, যোগী ও হাজীর কেরামতী—

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এন-এ, পি-এইচ-ডি।

" মহারাজ রণজিৎ সিংহ শতবার্ষিকী—আর্যকুমার সেন।

মাসিক বসুমতী—বঙ্গীয় ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠা—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন।

বিচিত্রা—গোয়ালিয়রের ফিলোজ বংশ—

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস।

বঙ্গশ্রী—ঔরংজীবের আমলে কয়েকটি বিদ্রোহ—শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্মা।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা

১। ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ ডি-লিট

২। বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়—

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এম-এ।

৩। চোরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম-এ।

৪। কাশীনাথ তর্ক পঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। ভারতের মানব ও মানব সমাজ—শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল।

৬। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ (৪)—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

৭। কৃষ্ণ-কীর্তনের সুর ও তাল (আলোচনা)—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৮। ঐ প্রত্যুত্তর—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ।

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি. এল্. কর্তৃক সঙ্কলিত

বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়)

১৩১৬ সাল

বৈশাখ—অগ্রহায়ণ ও চৈত্র—বিস্মৃত জনপদ—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য—বিজয়নগর রাজ্য সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলিতে বিজয়নগরের অতীত সৌন্দর্য-গৌরব ও ধনরাশির কথা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পৌষ—চৈত্র — শ্রীমূর্তি-বিবৃতি — শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — Iconography সম্বন্ধীয় কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে শারীরিক অঙ্গ-সংস্থানের উপর গ্রীক শিল্পিকারগণ বিশেষ জোর দিলেও ভারতীয় রীতিতে আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইয়া তুলাই শিল্পীগণের একমাত্র কর্তব্য ছিল। ইহাই ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পকে অমর করিয়াছে।

বৈশাখ—আষাঢ়—শ্রাবণ—ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য—প্রবন্ধ-লেখক সংস্কৃত ও পালিশাস্ত্র মন্থন করিয়া নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত নাস্তিক মতবাদ সমূহ একত্র করিয়া তাহার সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।

বৈশাখ—প্রাচীন ভারতে কলাবিদ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন—শাস্ত্রে উল্লিখিত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যার নাম ও তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

মাঘ ও চৈত্র—লক্ষ্মণ সেন ও বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়—শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধে লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে সাধারণের যে বিশ্বাস আছে লক্ষ্মণ সেন বঙ্গবিজয়-কালে পলায়ন করিয়াছিলেন তাহা ভ্রান্ত। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের সময়-নির্ণয়েরও চেষ্টা হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কয়েকটী স্ত্রী-চরিত্রের সমালোচনা আছে। সমালোচনাগুলি অতি উৎকৃষ্ট।

The Indian Antiquary Vol, II. 1873.

Chaitanya and the Vaishnava Poets of Bengal.
Studies in Bengali Poetry of the fifteenth and sixteenth Centuries.
by John Beames, B.C.S., M.R.A.S. etc.

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয়ে এবং বাঙলার বৈষ্ণব কবি ও তাঁহাদের কবিতা সকলের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

Papers on Satrunjoya, lc.—by Jas. Burgess, M.R,A.S., F.R.G.S,

শত্রুঞ্জয় পর্বত অতি প্রাচীনকাল হইতেই জৈনগণের একটী প্রধান তীর্থ। এই প্রবন্ধে জৈন-ধর্মের উৎপত্তি, বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সাদৃশ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

The Desisabdasamgraha of Hemchandra.
by G. Bühler, Ph. D., Educational Insspector. Gujrat.

খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা জৈন ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য-লিখিত দেশী শব্দসংগ্রহ নামক হস্তলিখিত পুঁথির সম্বন্ধে আলোচনা। এই পুঁথিতে প্রায় ৪০০০ প্রাকৃত শব্দ আছে।

সাময়িক সংবাদ

তুরস্কে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস—

বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপীয় তুরস্কের প্রধান সহর ইস্তাম্বুলে নৃতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হইবে। তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এই অধিবেশনের পৃষ্ঠপোষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ইহাতে প্রতিনিধিরূপে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা-প্রকাশের আয়োজন—

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির অধ্যক্ষেরা রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন-ক্রমে, তাঁহার সমস্ত বাঙলা রচনা একত্র করিয়া ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটী সাধারণ ও একটী শোভন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটী ভাগ থাকিবে যথা (১) কবিতা ও গান (২) উপন্যাস ও গল্প (৩) নাটক ও প্রহসন (৪) বিবিধ প্রবন্ধ। রচনাগুলি মোটামুটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে।

নূতনবিধ নারীশিক্ষা-কলেজ – বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের উদ্যোগে পূজার ছুটীর পর আগামী নভেম্বর মাসে নারীদের শিক্ষার জন্য একটী নূতন প্রকার কলেজ খোলা হইবে। ইহাতে তাঁহাদিগকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অধিকন্তু গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Domestic science) সমাজহিত-সাধন (Social service) প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালা শিক্ষা—যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে প্রকারান্তরে হিন্দী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ঐ প্রদেশের ইণ্টার-মিডিয়েট বোর্ড সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইংরেজী ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ের হাইস্কুল পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর হিন্দী ও উর্দুভাষায় দিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির বিচারে সুভাষ বাবুর শাস্তি—ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে,, গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ হেতু ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে ৩ বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের এবং কোন কংগ্রেস কমিটির নির্বাচিত সদস্য-পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কবি ভবভূতির জন্মস্থান—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভাণ্ডারা জেলায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের আমগাঁ স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে পদমপুর গ্রামে কবিবর ভবভূতির জন্মস্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কবিবর অষ্টদশ শতাব্দীতে কণোজের রাজা যশোধর্মদেবের সভাকবি ছিলেন। পদমপুর গ্রামে যে ভগ্নস্তূপ আছে, তাহা **"প্রাচীন মনুমেণ্ট সংরক্ষণ"** অইনানুসারে সংরক্ষিত হইবে।

মহাজাতি সদনের ভিত্তিস্থাপন—গত ২রা ভাদ্র শনিবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ১৬৬ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভবন **"মহাজাতির সদনের"** ভিত্তি স্থাপন করেন।

ডাঃ ম্যারিলা ফ্যাল্ক ও শ্লাভোনিক সংস্কৃতি—গত ২৮শে আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যায় নবাগতা পোল্যাণ্ড বিদুষী ডক্টর ম্যারিলা ফ্যাল্ক কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউট হলে ভারতীয় ও শ্লাভোনিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটী গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইনসচিব স্যর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কে. সি. এস্. আই. ব্যার-এ্যাট্-ল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | আশ্বিন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বলদেবের প্রমেয় *

প্রথম প্রমেয়

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

আমি যাঁহার কৃপায় সূক্ষ্ম—স্থূল-দৃষ্টির অগোচর প্রমেয়-রত্নসকল বর্ণনা করিব, সেই শ্রীগোবিন্দদেব জয়যুক্ত হইতেছেন—সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। তিনি গোপীনাথ--গোপীজনবল্লভ। মদন-গোপাল—ভক্তের মন মাতাইয়া তুলেন বলিয়া মদন এবং গো-পালন লীলা করেন বলিয়া গোপাল। অথবা, শ্রীবৃন্দাবনধামে অধিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বা মদন-মোহনের সহিত শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথ জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

যিনি ভক্তের আভাসেও সন্তোষ লাভ করেন, যিনি ধর্মের অধ্যক্ষ—প্রবর্তক, যাঁহার নাম বিশ্ববাসীকে নিস্তার করিয়া থাকেন, সেই নিত্য আনন্দ ও অদ্বয় জ্ঞান-স্বরূপ তত্ত্বে—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে আমাদের রতি প্রতিনিয়ত অবস্থান করুক। অথবা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুরূপ তত্ত্বে ॥ ২ ॥

যাঁহার নাম—আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্যের নামান্তর), পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সংসার-সাগরের পারে যাইবার নৌকা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, সেই সাক্ষাৎ সুখময়-বিগ্রহ যতি (সন্ন্যাসী) জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

নির্দোষ গুরু-পরম্পরার নিত্য চিন্তা বা ধ্যান—বিদ্বদ্‌বৃন্দের একান্ত কর্তব্য হইতেছে। কেন না, ঐরূপ গুরুপরম্পরা ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানকারীর একান্তিত্ব—শ্রীভগবানে একনিষ্ঠভাব সঞ্জাত হয়। আর ঐরূপ ঐকান্তিক ভাব হইতে ভগবান্‌ শ্রীহরির সন্তোষ সমুদিত হইয়া থাকে ॥৪

যথা, পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যে সকল মন্ত্র সম্প্রদায়-শূন্য, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে বিফল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণে কলিযুগে চারিটী সম্প্রদায়ী বা সম্প্রদায়-প্রবর্তক হইবেন।

* শ্রীমদ্‌ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রমেয়-রত্নাবলীর বঙ্গানুবাদ।

শ্রীজগন্নাথের প্রেরণায় উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তম ধাম হইতে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক এই চারিজন পৃথিবীপাবন বৈষ্ণব, কলিযুগের প্রারম্ভেই সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন ॥ ৫ ॥

ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রী—লক্ষ্মীদেবী রামানুজাচার্যকে, চতুর্মুখ—ব্রহ্মা মধ্বাচার্যকে, রুদ্র—মহাদেব বিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন—সনক সনাতন সনন্দ ও সনৎকুমার নিম্বাদিত্যকে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়-প্রবর্তনের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন—তাঁহাদের উপর নিজ নিজ সম্প্রদায়-প্রবর্তনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীপ্রভৃতি পূর্বোক্ত চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের গুরুপরম্পরা যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবর্ষি—নারদ, বাদরায়ণ—বেদব্যাস, মধ্বাচার্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম, পুরুষোত্তম. ব্রহ্মণ্য নামক গুরুজনগণকে আমরা ক্রমানুসারে বন্দনা করিতেছি। তদনন্তর লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁহার শিষ্যত্রয়—শ্রীঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য প্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে এবং ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—যিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদান দ্বারা নিখিল জগৎ নিস্তার করিয়াছেন সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তিসহকারে ভজনা করিতেছি।

ইহাই হইল আমাদের গুরুপরম্পরা ॥ ৭ ॥

অতঃপর তাঁহাদের নির্ণীত প্রমেয়সমূহের নাম অভিহিত হইতেছে,—

আমাদিগের পূর্বাচার্য শ্রীমধ্বমুনি বলিয়াছেন,—শ্রীবিষ্ণুই পরতম তত্ত্ব এবং অখিলাম্নায়-বেদ্য—সমগ্র বেদ তাঁহাকেই প্রতিপাদন করে বা সমস্ত বেদ অনুশীলন করিয়া তাঁহাকেই জানা যায়। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার সত্য, তাহার ভেদও সত্য। জীবসমূহ শ্রীহরির চরণসেবক দাস। তাহাদিগের মধ্যে সাধনজনিত তারতম্য—ছোট বড় ভাব আছে। শ্রীবিষ্ণুপদ-প্রাপ্তিই প্রকৃত মুক্তি। শ্রীবিষ্ণুর বিমল (কামনাহীন) ভজনই ঐ মুক্তির হেতু। আর প্রত্যক্ষাদি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটীই—প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র হরি ইহাই উপদেশ প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

ইহার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর পরতমত্ব যথা শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদে—"পূর্বোক্ত হেতু-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান বা স্মরণ করিবে, তাঁহাকে আস্বাদন বা জপ করিবে, তাঁহাকে ভজনা বা পরিচর্যা করিবে এবং তাঁহাকে যজন বা অর্চনা করিবে।" ইতি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও—

"শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুমুখে সেই পরম দেবতাকে অবগত হইয়া অবস্থিত ব্যক্তির দেহ দৈহিক সর্ববিধ মমতা-পাশ বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই পাশজনিত ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বারংবার জন্ম মৃত্যুরও গতিরোধ (অথবা, জন্ম মরণাদি-জনিত দুঃখের বিনাশ) হইয়া যায়। অনন্তর উত্তরোত্তর সেই দেবতার ধ্যান করিতে করিতে দেহভেদ অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীরের বিনাশ হইলে, সেই ধ্যানকারী তৃতীয় ভাগবত-পদ লাভ করিয়া থাকে—মুক্ত হইয়া থাকে। তখন তাহার সকল কামনাই প্রপূরিত হইয়া যায়। কেননা ঐ ভাগবত-পদ—"বিশ্বৈশ্বর্য-সকল" বিভূতিতে ভরা এবং 'কেবল' প্রকৃতির স্পর্শশূন্য-অপ্রাকৃত।" ইতি।

"আম্নায়—বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত প্রকাশমান এই দেবতাকেই অবগত হইবে, তিনি ভিন্ন প্রকৃত জানিবার বিষয় আর কিছুই নাই।" ইতি ॥ ৯ ॥

শ্রীগীতাতেও—

"হে ধনঞ্জয়! আমা ছাড়া অপর কিছুই নাই,—আমাকেই সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে।" ইতি।

শ্রীকৃষ্ণ যে পরতম, তাহা পণ্ডিতগণেরও অভিপ্রেত। কেননা, তিনি এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ হেতু (কারণ)। বিভুত্ব, চৈতন্যত্ব ও আনন্দত্ব প্রভৃতি গুণের একমাত্র তিনিই আশ্রয়; এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি নিত্যই তাঁহার সহিত সমবেতভাবে অবস্থিত। ॥১০॥

ইহার মধ্যে সকলের হেতুত্ব, যথা শ্বেতাশ্বতরগণ বলিয়া থাকেন—

"সেই দেব—ভগবান্, এক—সর্বোত্তম, সুতরাং বরেণ্য পূজ্য। তিনি একাকী—সহায়রহিত হইয়া (অথবা, তাহাদিগের সহিত অস্পৃষ্ট রহিয়া) যোনি বা প্রধান মহত্তত্ত্বাদি কারণসমূহের, স্বভাব বা স্বরূপ সকলকে, বশে স্থাপন করেন।" ইতি।

"যে দেবতা, সেই প্রধানাদির স্বভাব বা স্বরূপসকলকে পাক করেন—আপন আপন কার্যের আবির্ভাব-বিষয়ে উন্মুখ করিয়া তুলেন, এবং যিনি সেই পাচ্য প্রধানাদিকে মহত্তত্ত্বাদি অবস্থায় পরিণত করেন; এই প্রকারে যিনি বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, তিনিই আবার বিশ্বযোনি—এই বিশ্বের উপাদান কারণ।" ইতি।

বিভুচৈতন্যানন্দত্ব যথা কঠ-উপনিষদে—

"ধীর ব্যক্তি মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া শোক প্রকাশ করেন না।" ইতি।

আত্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন,—অত্যতে—লভ্যতে মুক্তৈরয়মিতি—আত্মা, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ যাঁহাকে লাভ করেন, তিনিই আত্মা। এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা, এস্থলে এই "আত্মা" শব্দে, বিজ্ঞানসুখরূপ অর্থ অবগত হওয়া যায়। কেননা, মুক্তগণ এইরূপ আত্মারই ধ্যান করেন; এইরূপ আত্মাকেই লাভ করিয়া থাকেন।

বাজসনেয়িগণও বলেন,—

"ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তিনি—দাতার যজমানের, রাতি অর্থাৎ ফলপ্রদাতা এবং পরম আশ্রয়।" ইতি।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদেও—

"সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ একমাত্র গোবিন্দকে।" ইতি।

ভৈরবাদি রাগের মূর্তত্ব যেরূপ সঙ্গীত-বিদ্যা-সুনিপুণ কর্ণে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ, ভক্তিভাবিত অন্তঃকরণে সেই চিৎ-সুখ বস্তুর শ্রীমূর্তির স্ফূর্তি হইয়া থাকে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বেদে 'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন' প্রভৃতি কীর্তন করাতেও চিৎ-সুখবস্তুর মূর্তত্ব স্বীকার করিতে হয়। কেননা ব্যাকরণ অনুসারে মূর্তি বা কাঠিন্য অর্থেই 'ঘন আদেশ হইয়া থাকে, যেমন 'সৈন্ধবঘন'। ইহা দ্বারা—চিৎসুখবস্তুর মূর্তত্ব সমর্থন দ্বারা—সেই পরমেশ্বরে যে দেহ-দেহি-ভেদ নহে. ইহাও অভিহিত হইল ॥১২॥

মূর্তিমানেরই বিভুত্ব যথা মুণ্ডক-উপনিষদে—

"দিবি—জ্যোতির্ময় পরব্যোমধামে, সেই এক—সর্বাধ্যক্ষ পুরুষ শ্রীহরি, বিরাজ করিতেছেন। তিনি বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ অর্থাৎ সকলেরই নমস্য বলিয়া কাহারও প্রতি বিনম্র নহেন। সেই একমাত্র পুরুষ কর্তৃকই এই সমগ্র সংসার পরিপূরিত।"

পরব্যোমে বিরাজমান হইয়াও তিনি নিখিলব্যাপী—ইহা বলায়, তিনি যে যুগপৎ মূর্তিমান্ এবং বিভু তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সাধক তাঁহার ধ্যান করিতেছেন, একই সময়ে তাঁহাদিগকে দর্শন দান করাতেও তাঁহার মূর্তত্ব ও বিভুত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ॥১৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধে ও "যাঁহার অন্তর নাই বাহির নাই, পূর্ব পশ্চিম প্রান্ত বলিয়া কোন পরিচ্ছেদ নাই; যিনি জগতের পূর্ব পশ্চিম সীমায় ও অন্তরে বাহিরে যুগপৎ বিদ্যমান, অধিক কি আপন শক্তিতে জগৎস্বরূপই যিনি, গোপী যশোদা সেই মানব-বিগ্রহ অব্যক্ত অধোক্ষজ আত্মজকে অপরাধী মনে করিয়া সাধারণ বালকের মত উদুখলে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন।"

শ্রীগীতাতেও—"অব্যক্ত মূর্তি—অপ্রকাশিত মূর্তি আমা কর্তৃক এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সমস্ত ভূত (প্রাণী) আমাতেই অবস্থিত, আমিই তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি। কিন্তু আমি সেই সকলভূতে অবস্থিত নহি, তাহাদিগের কর্তৃক ধৃত নহি। আবার, ভূত সমূহ আমাতে অবস্থিতও নহে,—কলসে জলের মত ধৃতও নহে। অর্থাৎ সংকল্প মাত্রেই আমাকর্তৃক ধৃত রহিয়াছে। ঈশ্বর-আমার এই অসাধারণ যোগ—অচিন্ত্য শক্তি দর্শন কর।" ইতি।

ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য শক্তি আছে; যাহা 'যোগ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; সেই শক্তিই [ঈশ্বরের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মরূপ] বিরোধের ভঞ্জন করিয়া দেয়। তত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই মত ॥ ১৪ ॥

'আদি,' পদ দ্বারা—সর্বজ্ঞত্ব বুঝিতে হইবে। যথা মুণ্ডক উপনিষদে,—তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ সকল লাভ করিয়াছেন।" ইতি।

'আনন্দিত্ব' ও যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে,—"ব্রহ্মের আনন্দ যিনি অবগত হন, তিনি কালকর্মাদি কিছু হইতেই ভীত হন না।" ইতি।

প্রভুত্ব, সুহৃত্ত্ব, জ্ঞানদত্ব ও মোচকত্ব যথা শ্বেতাশ্বতদর উপনিষদে,—"যিনি সকলের প্রভু, ঈশ্বর, শরণ (দুঃখহরণ আশ্রয়) এবং সুহৃৎ।" ইতি

"সেই সম্পূজিত জগদীশ্বর হইতে জীবের 'পুরাণী' সনাতন প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্টজ্ঞান) প্রসৃত বা প্রকট হইয়া থাকে।" ইতি।

"আর তিনি সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষের হেতু।" ইহাও মাধুর্য (মনুষ্যভাবেই পরমেশ্বর সাধ্য কার্যকারিত্ব) যথা—

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে,—

"যাঁহার নয়ন প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, আভা (কান্তি) মেঘের ন্যায়, পীতবর্ণ বস্ত্র বিদ্যুতের

ন্যায়, গলদেশে বনমালা, সেই দ্বিভুজ মুরলীধারী (১) ঈশ্বরকে [ধ্যান করিবে]।" ইতি ।। ১৫ ।।

যাঁহার ধর্ম তিনি হইতেছেন ধর্মী। বিভুত্বাদিধর্ম ধর্মী শ্রীহরি হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু 'বিশেষ' বশতঃ ভেদের প্রতীতি হইয়া থাকে। যাহাতে ভেদ নাই, তাহাতে ভেদ-প্রতীতির জনক একরূপ ধর্মবিশেষই হইতেছে—বিশেষ। যেমন কাল সর্বদা রহিয়াছে ইত্যাদি স্থলে বিদ্বান্‌দিগেরও অভেদে ভেদবুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় ।। ১৬ ।।

নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"সেই ভগবান্ বিষ্ণু 'আত্মতন্ত্র' স্বাধীন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সর্ববিধ দোষশূন্য এবং নানা গুণে পরিপূর্ণ। অচেতনাত্মক (জড়স্বভাব) শরীরগুণ তাঁহাতে নাই। তাঁহার কর, চরণ, বদন, উদর প্রভৃতি সমস্তই আনন্দময় ; এবং তাঁহার আত্মা বা স্বরূপ, দেহ-দেহী গুণ-গুণী প্রভৃতি সর্বত্র স্বগতভেদশূন্য অর্থাৎ তাঁহাতে সাধারণ জীবসুলভ দেহ-দেহী প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদই নাই ।।" ইতি ১৭ ।।

অনন্তর নিত্যলক্ষ্মী বিশিষ্টত্ব যথা—

বিষ্ণু পুরাণে,—

"হে দ্বিজোত্তম ! সেই সনাতনী জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুর সহিত নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্টা। শ্রীবিষ্ণু যেরূপ সর্বগত, ইনিও সেইপ্রকার ।।" ইতি ।।

শ্রীবিষ্ণুর তিনটী শক্তি আছেন, তাহার মধ্যে যিনি পরাশক্তি বলিয়া কীর্তিতা, লক্ষ্মীদেবী এবং (শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই বলিয়া) তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্না একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু আপন শিষ্যবৃন্দকে বলিয়াছেন।

ইঁহার মধ্যে ত্রিশক্তি বিষ্ণুর কথা যথা—

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে,—

"ইঁহার নানা প্রকার পরা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল শক্তি স্বাভাবিকী তাঁহার স্বরূপভূতা। জ্ঞানবান্ ও ক্রিয়া ইঁহারাই সেই বিবিধ শক্তি। (ইঁহাদের অপর নাম সংবিৎ, সন্ধিনী, হ্লাদিনী) ।।" ইতি।

"ইনি প্রধান (প্রকৃতি) এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মার) পতি ও সকল গুণের অধিপতি। ইতি ।। ১৮ ।।

শ্রীবিষ্ণু পুরাণেও,—

"বিষ্ণুশক্তি ('পরা') বলিয়া, তথা ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি 'অপরা' বলিয়া কথিত হইয়াছে। অবিদ্যা এবং কর্ম যাহার সংজ্ঞা বা নাম, তাহা অন্যা তৃতীয়া শক্তি-ত্রিগুণা মায়া বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ।।" ইতি।

পরাশক্তিই যে বিষ্ণু হইতে অভিন্না লক্ষ্মী, ইহা সেই বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে,—

১ মূখ্য শ্লোকস্থিত 'মৌনমুদ্রাত্য' শব্দের ভাবার্থই মুরলীধারী। একখানি প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে,—মৌনমুদ্র ওষ্ঠদ্বয় সংকোচরূপাবস্থা, তয়া বেণুবাদনং লক্ষ্যতে। তথা গৌতমীয়ে—'বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতম্' ইতি।"

'পরমশুদ্ধ যাঁহার পরা শক্তি কলা কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ কালসূত্রের বন্ধনে অবস্থান করেন না, সেই শ্রীহরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

"সর্বজনপ্রসিদ্ধ শুদ্ধ যিনি পরাশক্তির সহিত ভেদরহিত হইয়াও, গৌণভাবে আবার 'পরমেশ' (পরা যে মা-লক্ষ্মী, তাঁহার ঈশ অর্থাৎ স্বামী) বলিয়া কথিত হন, সেই সকল দেহীর আত্মা বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥" ইতি ২১॥ ॥

এই পরশক্তিই আবার 'ত্রিবৃহৎ'-তিনরূপে প্রকাশমানা, একথাও ঐ বিষ্ণুপুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে,—

"হে ভগবান্, তুমি সকলেরই আশ্রয়স্থল। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি তোমাতে অভেদভাবেই অবস্থান করে। মায়িকগুণের স্পর্শশূন্য তোমাতে হ্লাদকরী তাপকরী মিশ্রা-শক্তির অস্তিত্ব নাই।" ইতি॥ ১৯॥

বিষ্ণু এক হইয়াও এবং তাঁহার সহিত নিত্যসম্বদ্ধা লক্ষ্মী এক হইয়াও স্বতঃসিদ্ধ বহুবিধ বেশ বা সংস্থানবশতঃ বহু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

তাহার মধ্যে বিষ্ণুর একত্বেও বহুত্ব যথা—শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে,—

শ্রীকৃষ্ণ এক (অদ্বিতীয়)। তিনি সকলকে বশীভূত করেন। সর্বত্র গমন করিতে পারেন। সকলে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। তিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। যে সকল ধীরব্যক্তি পীঠস্থিত সেই কৃষ্ণকে ভজনা করেন, তাঁহারাই শাশ্বত-সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন; অপরে নহে॥" ইতি॥

অনন্তর শ্রীলক্ষ্মীর সেই একত্বেও বহুত্ব যথা,—

"এই ভগবানের পরাশক্তি বিবিধা (জোনকী) রুক্মিণী আদিরূপ প্রকট করা নিবন্ধন নানারূপ বলিয়াই শুনিতে পাওয়া যায়। ইত্যাদি॥ ২০॥

কি বিষ্ণু কি লক্ষ্মী উভয়েরই সমস্ত অবতার-বিগ্রহে অবস্থিতা পূর্ণতা যদিও তুল্যা, তথাপি তাঁহাদের শক্তি বা গুণের প্রকাশ ও অপ্রকাশ-জনিত তারতম্য ছোট বড় ভাব বা অংশ অংশি-ভাব হইয়া থাকে॥

তন্মধ্যে বিষ্ণুর সার্বত্রিকী পূর্তি বা পূর্ণতা যথা বাজসনের উপনিষদে,—

"এই অবতারিরূপ পূর্ণ, ঐ অবতার রূপও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। লীলাবসানে পূর্ণ অবতারিরূপ পূর্ণ অবতারের পূর্ণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আপনাতে মিলাইয়া লইয়া স্বয়ং অন্যত্র অবিলীনভাবে অবস্থান করেন।" ইতি।

মহাবরাহ পুরাণেও,—

"সেই পরমাত্মার সমস্ত দেহই নিত্য শাশ্বত এবং জন্মমৃত্যুরহিত। সেই সকল দেহ কখনও প্রকৃতির উপাদানে গঠিত নহে। তাহা সর্বতোভাবে পুঞ্জীভূত পরমানন্দ দিয়া গঠিত। সেই সকল দেহ সর্বগুণে পরিপূর্ণ এবং সর্ববিধ দোষশূন্য॥" ইতি॥ ২১॥

অনন্তর লক্ষ্মীর তাহা (সর্বতোভাবে পূর্ণতা) যথা—

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—

"এই জগন্নাথ জনার্দন যখন যে ভাবে অবতার অঙ্গীকার করেন, লক্ষ্মী দেবীও তখন সেই ভাবেই তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন। যখন শ্রীহরি অদিতি-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন লক্ষ্মীও পুনর্বার পদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। আবার যখন বিষ্ণু ভৃগুবংশাবতংস পরশু-রামরূপে অবতার অঙ্গীকার করিলেন, তখন এই লক্ষ্মীদেবীও ধরণীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। বিষ্ণু রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র হইলে লক্ষ্মী সীতা হন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে আবার লক্ষ্মী রুক্মিণী হইলেন। বিষ্ণুর অন্যান্য যত কিছু অবতার, সকল অবতারেই এই লক্ষ্মী তাঁহার সহকারিণী। বিষ্ণু দেবদেহ প্রকট করিলে এই লক্ষ্মীও দেবদেহা হইয়া থাকেন, আর বিষ্ণু মানুষ দেহ প্রকাশ করিলে ইনি মানুষী হইয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে ইনি বিষ্ণুর দেহের অনুরূপই আপন দেহ প্রকট করেন। ইতি।

এই সকল শাস্ত্রবাক্যে বিষ্ণুর সকল অবতারেই লক্ষ্মীদেবীর অভেদভাবে অবস্থানবশতঃ তাঁহার যে স্বরূপানুবন্ধিনী পূর্ণতা আছেই, ইহা শাস্ত্র-যুক্তি-বিদ্‌গণের অভিপ্রেত ॥ ২২ ॥

অনন্তর সর্বতোভাবে পূর্ণতা সত্ত্বে তারতম্য।

তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর তারতম্য যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

ইহারা (পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি অবতার) গর্ভোদশায়ী পুরুষের অংশ বা কলা (অংশাংশ) বলিয়া কথিত, কিন্তু তন্মধ্যে-পঠিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।" ইতি।

"সেই দেবকী বসুদেবের অষ্টম তনয় স্বয়ং শ্রীহরিই হইয়াছিলেন ॥" ইতি ২৩ ॥

অনন্তর শ্রীলক্ষ্মীদেবীর তারতম্য যথা পুরুষবোধিনী অথর্বোপনিষদে,—

"গোকুল নামক মথুরামণ্ডলে" "ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া" উভয় পার্শ্বে চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা ইহা বলিয়া তারপর "যাঁহার অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদি শক্তি ॥" ইতি।

যাস্কের সমাজ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র এম্. এ.

এই সময়ে ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের ভিত্তিতে বেদব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ইঁহা-দিগকে যথার্থ ঐতিহাসিক বলা চলে না, কিন্তু এইটুকু বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, তাঁহারা এইদিক্ দিয়া মন্ত্রালোচনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। নিরুক্তে (২।১৬ ; ১২।১, ১০) ইঁহাদের উল্লেখ আছে নৈদানগণ নৈরুক্তদিগেরই অনুরূপ একটী সম্প্রদায়। নিরুক্তে ইঁহাদের নাম পাওয়া যায় (৬।৯ ; ৭।১২)। দুর্গাচার্য 'নৈদান' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'নিদানবিদঃ, (নিদান ∠নি—√দৈপ শোধনে) ; ‡ অর্থাৎ বেদের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেন। এই অর্থে বৈয়াকরণ, নৈরুক্ত প্রভৃতি সকলেই নৈদান, তথাপি শব্দটী রূঢ়ি অর্থে প্রচলিত হইয়া যায়। নিদান অর্থে মূল কারণ—ইহা একজন টীকাকারের (মহেশ্বর) মত। বৈদিক শব্দ-সমূহের মূলকারণ অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। স্থানান্তরে (৫।২১) দুর্গাচার্য লিখিয়াছেন—"এতস্মিন্নর্থে বেদয়ন্তে নিদানবিদো বহ্বৃচাঃ।" অতএব নৈদানগণকে ঋগ্বেদীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। যাজ্ঞিকাঃ (৫।১১ ; ৭।৪ ; ১১।২৯, ৩১, ৪২, ৪৩) এবং পূর্বে যাজ্ঞিকাঃ (৭।২৩)—ইঁহাদের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়, যাগযজ্ঞের ব্যাপারে তখন বিশেষ পরিবর্তন আসিয়াছিল। যাস্কের পূর্বেই স্ফোটবাদের সূচনা হইয়াছে। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে যাস্ক 'স্ফোট' কথার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার সময়ে ইহা লইয়া বিদ্বৎসমাজে তর্কবিতর্কও হইত (১।২)। ষড়্ভাববিকার নিরূপণ প্রসঙ্গে কর্ষ্যাণির নাম পাওয়া যায় (১।২)। তখন দার্শনিক আলোচনা একেবারে শৈশব অবস্থায় ছিল না, এই সকল ব্যাপারে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এক স্থলে (৭।২২) 'আচার্যাঃ' এবং কয়েকটী স্থলে (১।৭ ; ৩।৪, ৬ ; ৫।৩ ; ৭।১৩ ; ৮।২১) 'একে' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ আছে। 'আচার্যা' না বলিয়া যাস্ক 'একে' বলিয়াছেন।

এইরূপ বহুব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের নাম হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে তখন সমাজ বিদ্যাচর্চায় উদাসীন ছিল না। তখন বিদ্যার্থীদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল 'বেদ' ও 'বেদাঙ্গ'। বেদাঙ্গ বলিতে এখনকার মত পূর্ণাবয়ব ছয়টী বেদাঙ্গকেই বুঝাইত, এমন প্রমাণ নাই। মুণ্ডকোপনিষদে আছে,—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি" (১।১।৫)। ব্রাহ্মণগুলিতেই এই ছয়টী বেদাঙ্গের বীজ রহিয়াছে। বিশেষতঃ অর্থবাদাংশেই ইহাদের আলোচনা বেশী পরিমাণে দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে যখন সংহিতার অর্থ দুর্বোধ্য হইয়া পড়িতে লাগিল, তখনই বিষয়গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অধ্যয়নের সূত্রপাত

হইল। এখন যে যে গ্রন্থগুলি বেদাঙ্গ বলিয়া পরিচিত,—অর্থাৎ পাণিনির ব্যাকরণ, যাস্কের নিরুক্ত প্রভৃতি,—সেইগুলিকেই যাস্ক বেদাঙ্গ বলেন নাই। আমরা দেখিয়াছি পাণিনির পূর্বে অনেক বৈয়াকরণ ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহাদের গ্রন্থও ছিল, এবং সেগুলি সমাজে বিশেষ আদরও পাইত। যাস্কের পূর্বেও অনেক নিরুক্তকার ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলিও নিরুক্ত নামে পরিচিত ছিল। যাস্ক একস্থানে বলিয়াছেন—"তদিদং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকং চ" (১।১৫)। নিরুক্ত ও ব্যাকরণকে পাশাপাশি চলিতেই হইবে, তবেই মন্ত্রের অর্থনির্ণয় সহজসাধ্য হইবে, ইহাই তাঁহার অভিমত। যাজ্ঞিকদিগকেও আচার্য যাস্ক নির্বচনসূত্রে টানিয়া আনিয়াছেন,—ইঁহারা 'কল্প'শাস্ত্রের জনক। 'শিক্ষা' বিষয়ে পার্ষদ বা প্রতিশাখ্যের উল্লেখ করিতেও তিনি বিরত হন নাই। তবে তখনও যে প্রাতিশাখ্য নির্ভুল বলিয়া বিবেচিত হইত না, তাহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। ব্রাহ্মণযুগের শেষেও ছন্দঃশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে নাই, এবং যাস্কের সময়েও যে বিদ্যার্থীমহলে ইহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কথাই আমরা জানি। ইহার রচনাকালের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও মতভেদ বর্তমান। সুতরাং বেদাঙ্গসমূহ যাস্কের কালে এখনকার মত এমন পূর্ণতা লাভ করে নাই, এই অনুমান ভিত্তিহীন নহে।

বেদাঙ্গাধ্যয়নের প্রয়োজন অনেকখানিই ছিল। তখন বৈদিক ভাষা হইতে লৌকিক ভাষা বেশ পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। কাজেই 'নিঘণ্টু' নামে বৈদিক শব্দকোষ ছাত্রগণকে আয়ত্ত করিতে হইত। বেদমন্ত্র মুখস্থ করিয়াই তাহাদের শিক্ষার সমাপ্তি হইত না, মন্ত্রার্থ তাহাদের জানিতে হইত। যাহারা মন্ত্র কণ্ঠস্থই করে, অথচ অর্থ শিক্ষা করে নাই, তাহাদের যাস্ক উপহাস করিয়াছেন এবং মন্ত্র ও তাহার অর্থ উভয়ই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রশংসা করিয়াছেন,—

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥

—যে বেদ কেবলমাত্র অধ্যয়নই করিয়াছে, অর্থে অজ্ঞ, সে পুষ্প ফলপল্লবের ভারবাহী বৃক্ষের ন্যায়। কিন্তু অর্থজ্ঞ হইলে সে ইহলোকে সমস্ত কল্যাণের আস্পদ হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে স্বর্গে গমন করে। আবার সংহতিপোনিষদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে যাস্ক এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—[মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন]:—

যদ্‌গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥

যাহা গুরুমুখ হইতে অর্থনিরূপণ না করিয়াই গৃহীত হইয়াছে, তাহা চিরদিন উচ্চারণই করা যায়, তাহার অর্থবিচার সম্ভব নহে। শুষ্ক ইন্ধনে অগ্নি সংযোগ না করিলে যেমন তাহা জ্বলে না, সেইরূপ এই প্রকার বিদ্যাও ফলোন্মুখ হয় না, ব্যর্থ হইয়া যায়।

যে কোন ব্যক্তি শিষ্যত্বের অধিকারী ছিল না। নৈতিক দৌর্বল্য ও বুদ্ধিবৃত্তির খর্বতা বর্জ্যশিষ্যের লক্ষণ ছিল (২।৪)। অবশ্য মন্দমতিত্ব গুরুগৃহে অধ্যয়নের পক্ষে তেমন বিশেষ বাধা

বলিয়া বিবেচিত হইত না। সমাজে যাহাতে জ্ঞানের জন্য সকলেই উৎসাহী হয়, মূর্খ যাহাতে সর্বত্র নিন্দার্হ হয়, আচার্যগণ সর্বদা তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, 'ঋষিঋণ' পরিশোধ না করিলে অত্যন্ত অধর্ম হইবে, এই অনর্থ সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা কর্তব্য।

উপোদ্‌ঘাতে (২।২) নির্বচনরীতি-প্রসঙ্গে যাস্ক বলিয়াছেন, দেশভেদে ভাষারও ভেদ হইয়া থাকে। এই বিষয়টী স্মরণ রাখিয়া নির্বচন করা উচিত। তিনি ক্রিয়ারূপে এবং নামীভূত-রূপে শব্দের প্রয়োগ অনুসারে দেশবাসীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন--"তথাপি প্রকৃতয় এবৈকেষ ভাষ্যন্তে বিকৃতয় একেষু। "উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, 'কম্বোজ' ও 'প্রাচ্য'গণ 'প্রকৃতির' এবং 'আর্য' ও 'উদীচ্য'গণ 'বিকৃতি'র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "শবতির্গতিকর্মা কম্বোজেম্বেব ভাষ্যতে। বিকারমস্যার্যেষু ভাষ্যন্তে শব ইতি॥ দাতির্লবনার্থে প্রাচ্যেষু দাত্রমুদীচ্যেষু॥" তাহা হইলে ভাষাগত বিভেদ অনুসারে কম্বোজ, আর্য, প্রাচ্য ও উদীচ্য—এই চারি অংশে জনগণকে বিভক্ত করা হইল। অর্থাৎ কম্বোজ* (হিন্দুকুশপর্বতের অধিবাসী,) প্রাচ্য ও উদীচ্যগণ আর্য ছিলেন না, অন্ততঃ যাস্কের দৃষ্টিতে তাঁহারা আর্যধর্মবহির্ভূত ছিলেন, যদিও আর্যধর্ম গ্রহণের ফলে তাঁহারা আর্যভাষা এমন দ্রুতগতিতে নিজেদের মধ্যে প্রসারিত করিতেছিলেন যে, কালক্রমে তাঁহাদিগকে পাণিনির মত বৈয়াকরণেরও উপেক্ষার পাত্র হইতে হয় নাই। ধীরে ধীরে আপনাদের ভাষা তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। এখনও দেখা যায়, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের কোলভাষাভাষীরা হিন্দী প্রভৃতি শিখিয়া মাতৃভাষার সত্বর উচ্ছেদ সাধন করিতেছে।

"কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু"—এই ঋকের (৩।৫৩।১৪) ব্যাখ্যায় যাস্ক আনার্যদেশকে 'কীকট'-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন—"কীকটা নাম দেশেঽনার্যনিবাসঃ" (৬।৩২)। 'কীকট' শব্দের যাস্কোক্ত নির্বচন—'কিং কৃতাঃ।' 'কৃত' প্রাকৃতভাষার প্রভাবে দাঁড়াইল 'কট'। 'কিং'—এই পদের অনুস্বার লোপের পর Compensatory lengthening হইয়া হইল 'কী'। এই নির্বচন অসম্ভব নাও হইতে পারে। "তাহারা কি করে ?"—অর্থাৎ ধর্মকর্ম কিছুই করে না। সেইজন্যই বোধহয় যজ্ঞদ্বেষী অনার্যগণকে এখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আবার 'নৈচাশাখ' নামক স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। নাম হইতেই ইহা অনার্যনিবাস বলিয়া অনুমিত হয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে যাস্ক কুসীদজীবিগণের উল্লেখও করিয়াছেন।

তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম।
ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বম্॥

—এই ঋক্‌টী (১০।৫৩।৪) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাস্ক 'পঞ্চজনাঃ' সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্। ঋক্‌টীর মোটামুটি অর্থ এইরূপ :—"সেই বীর্যবতী বাক্‌কেই আজ শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিন্তা করিব, যাহাতে অসুরদিগকে অভিভূত করিতে পারি। হে যজ্ঞান্নভোক্তা ও যজ্ঞসম্পাদক দেবগণ ও পঞ্চসংখ্যক মনুষ্যগণ! তোমরা আমার যজ্ঞে অংশ গ্রহণ কর।" যাস্ক

* রঘুবংশ ৪।৬৯ ; এখানে 'কম্বোজ' না বলিয়া 'কাম্বোজ' বলা হইয়াছে।

এখানে 'পঞ্চজনাঃ' কথার দুইপ্রকার অর্থ দিয়াছেন। তিনি বলেন, "কেহ কেহ বলেন, গন্ধর্ব, দেব, পিতৃ, অসুর ও রাক্ষসগণ—ইহাদের লইয়াই পঞ্চজন।" আবার ঔপমন্যবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চমঃ," (৩।৮)। শেষের মতেই তিনি আস্থাবান্। "যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা"—(৮।৬৩।৮) এই ঋকের আংশিক ব্যাখ্যাও তিনি এই মতে করিয়াছেন। আবার মনুষ্যনামের তালিকায় তিনি 'পঞ্চজনাঃ শব্দকে গ্রহণ করিয়াছেন (৩।৭)। উপরের ঋক্‌টীতে গন্ধর্ব প্রভৃতিকে যজ্ঞাংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ কর' হইতেছে, এইরূপ অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত। স্পষ্টই উক্ত রহিয়াছে—"যাহাতে অসুরদিগকে অভিভূত করিতে পারি।" এক্ষেত্রে বিতাড়নের পাত্রকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার কথা স্ববিরোধী নহে কি? দেবতা ও অসুরগণের বৈরিতার কথা প্রসিদ্ধ। ইঁহারা একত্র অবস্থান করিয়া যজ্ঞের অংশীদার হইবেন, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। অবশ্য পুরাণে আছে, কখন কখন বিশেষ বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা মিলিত হইতেন, যেমন সমুদ্রমন্থন সময়ে। কিন্তু ঋগ্বেদের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। যাহাই হউক, প্রথম পক্ষের ব্যাখ্যা টিকিতে পারে না। দ্বিতীয় অর্থ যখন ঔপমন্যব ধরিয়া লইয়াছেন—(চারিবর্ণ ও নিষাদগণ") এবং তাহা যাস্ক সমর্থন করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে যাস্কের অন্ততঃ কিছু-কাল পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদগণের সহাবস্থান চলিত, এমন কি, যজ্ঞান্তে একত্র ভোজনাদির ব্যবস্থাও ছিল। তাঁহার সময়ে নিষাদষণ পাপের আধার বলিয়া বিবেচিত হইলেও * ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যেমন কবষ ঐলুষকে ব্রাহ্মণোচিত আচরণের জন্য ব্রাহ্মণগণ শাস্তি দিয়াছিলেন, সেইরূপ গর্হিত আচরণ নিষাদ ও শূদ্রগণকে সহ্য করিতে হইত না। "ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়সঃ পঞ্চজনাঃ,"—এখানে সুস্পষ্টই অধোরেখ পদদ্বয় 'পঞ্চজনাঃ' শব্দকেই বিশেষিত করিতেছে, দেবগণকে নহে। যজ্ঞের ভাগ লইবার অধিকারী যাহারা, তাহারা নিশ্চয়ই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহা হইলে নিষাদগণও সমাজের নিকট কিছু পবিত্রতার দাবী রাখিত, এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বৈদিক শব্দের নির্বচন করিতে বসিলেও যাস্ক এবং তৎপূর্ববর্তী নৈরুক্তগণের ব্যাখ্যায় তাঁহাদের অলক্ষ্যে সমাজের বিধিব্যবস্থার কিছু কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। সামাজিক পরিবেশের প্রভাব হইতে তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন নাই।

সবিতা সম্বন্ধে আলোচনায় (১২।১৩) যাস্ক "অধোরামঃ সাবিত্রঃ" এই বাক্যটী কাঠক (৫।৮।১), বাজসনেয়ি (২৯।৫৮), এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫।৫।২২) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ছাগের অধোদেশ 'রাম' বা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সবিতৃদেবের। এই স্থানে যাস্ক বলিয়াছেন,—"অগ্নিং চিত্বা ন রামামুপেয়াৎ। রামা রমণায়োপেয়তে ন ধর্মায় কৃষ্ণজাতীয়া।" † এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, উচ্চ বর্ণের আর্যগণের অনার্যজাতীয়া অসংস্কৃতা স্ত্রীও থাকিত; যাগযজ্ঞে

---

* "নিষাদঃ কস্মান্নিষদনো ভবতি নিষণ্নমস্মিন্ পাপকা ইতি নৈরুক্তাঃ।" (৩।৮)।

† বসিষ্ঠধর্মসূত্রে আছে—"নাগ্নিং চিত্বা রামামুপেয়াৎ। কৃষ্ণবর্ণা যা রামা রমণায়ৈব ন ধর্মায়" (১৮।১৭, ১৮)। যাজ্ঞবল্ক্য (১।৫৬) ব্যাখ্যায় বিশ্বরূপাচার্য বলিয়াছেন—কৃষ্ণবর্ণা রামা রমণায়ৈবোপেয়ত ইতি ব্রাহ্মণবাদাঃ।"

তাহার অধিকার ছিল না। এইরূপ আর্যগণ অগ্নিচয়নাদি যজ্ঞসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রতী হইলে এই অনার্যবংশীয় স্ত্রীদিগের সংসর্গ এড়াইয়া চলিতেন। ধর্মপত্নীত্বের অধিকার হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইত।

যাস্ক দেবর শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—"দেবরো দীব্যতিকর্ম্মা" (৩।১৫)। এই অনুচ্ছেদেই আবার, "দেবরঃ কস্মাদ্দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে,"—এইরূপ নিরুক্তি রহিয়াছে। শেষোক্ত অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি যাস্কের সময়ে 'নিয়োগে'র অস্তিত্ব ছিল, ইহার প্রমাণ আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে 'নিয়োগ' ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির অঙ্গভূক্ত ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার অনার্যজাতির মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল। অতএব প্রক্ষিপ্ত হইলেও তখনকার সমাজে 'দ্বিতীয় বরত্ব' মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না।

পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রই পাইত। কিন্তু সমাজের নিয়ম সর্বদা এইরূপ ছিল না। যাস্ক ক্রমান্বয়ে তিনটী মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(১) অথৈনাং দুহিতৃদায়াদ্য উদাহরন্তি। (৩।৩)

(২) পুত্রদায়াদ্য ইত্যেকে। (৩।৩)

(৩) অভ্রাতৃমতীবাদ ইত্যপরম্। (৩।৪)

পুত্র ও দুহিতা উভয়েই সমান।* যাস্ক প্রথম মতের আলোচনায় বলিয়াছেন—দৌহিত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য নাই। ["নপ্তারমুপাগমদ্ দৌহিত্রং পৌত্রমিতি," ৩।৪]†। পুত্র ও দুহিতা উভয়েরই পিতৃধনের অধিকারিত্ব বিষয়ে যাস্ক মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্মতঃ।" কেহ কেহ আবার পুত্রকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। কারণ নবজাতা দুহিতাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, দান ও বিক্রয়ও করা চলিতে পারে। সমাজে পুত্রাপেক্ষা কন্যার অবস্থা হীন ছিল বলিয়া অনেক সময়ে পিতামাতা কন্যা জন্মিবামাত্রই তাহাকে কোন অরক্ষিত স্থানে ফেলিয়া আসিত। এই প্রথা কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত রাজপুতনায় প্রচলিত ছিল। দুর্গাচার্য 'অতিসর্গ' কথার অর্থ করিয়াছেন—"স্বয়ংবরে আত্মীয়গণ কন্যাকে পরিত্যাগ করিত, উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে বলিষ্ঠ, সেই তাঁহাকে গ্রহণ করিত।" এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

যাহাই হউক, দান-বিক্রয়াদি পুত্রের সম্বন্ধেও যে চলিত না, এমন নহে। বিরুদ্ধবাদীরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শুনঃশেপের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তৃতীয় মতটী যাস্ক কর্তৃক সমর্থিত বলিয়া মনে হয়। যাস্ক দৌহিত্রকেও পৌত্র বলিয়া মনে করেন—ইহার তাৎপর্য নির্ণয় করিতে গিয়া দুর্গাচার্য বলেন,—আচার্য ইহা অভ্রাতৃকা কন্যার সম্পর্কেই বলিয়াছেন। ইহার যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করা

* "যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা"—মনু৯।১৩৯।

† পৌত্র দৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষোঽস্তি ধর্মতঃ।
তয়োর্হি মাতা পিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥—মনু ৯।১৩৩।

যাস্ক না। কারণ ভ্রাতৃহীনা কন্যা বিবাহের পরে যদি ভর্তৃবংশেই রহিয়া যায়, তবে পিতার মৃত্যুর পর পিণ্ড-দানাদি সন্তানে কর্তব্যসাধনে বাধা পড়ে। দৌহিত্র তাহার ঔর্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এইজন্য অভ্রাতৃকা কন্যা যদি পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়, তাহা হইলেই সমাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সুতরাং তৃতীয় মতই যাস্কের সিদ্ধান্ত। মনে হয়, উচ্চ বর্ণের মধ্যে এই রীতিরই বহুল প্রচার ছিল, যাস্ক তাহারই আভাস দিয়াছেন। অন্যথা সভ্রাতৃকা দুহিতাও যদি বিবাহের পর পিতৃরিক্থের দাবী করে তাহা হইলে অন্যায় করা হয়। কারণ সে তখন অন্য বংশের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে এবং পিতৃবংশে ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজনও তাহার মিটিয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃহীনা কন্যার পিতাকে প্রয়োজন বোধেই কন্যার বিবাহ দিয়া তাহার গর্ভজাত পুত্র আপনার পৌত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত। কাজেই ভ্রাতৃমতী না হইলে কন্যাকে বিবাহ করিতে বোধ হয় অনেকেই সহজে সম্মত হইত না।

আচার্য ভট্ট কুমারিলের পরিণাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীহরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ

প্রবাদ এই যে প্রায় খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বৈয়াকরণ বোপদেব গোস্বামী, রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে বহুকাল হইতে লুপ্ত এই বর্তমান ভাগবত-খানির পুনঃপ্রচার করেন, ইহা একখানি পরমসুন্দর বৈষ্ণব-ধর্ম-কাব্য বিশেষ।

মহারাষ্ট্রীয় পট্টবর্ধন ক্ষত্রিয় রাজা; পূর্ব চালুক্যের বিষ্ণুবর্ধন (৩য়) ৬৩২-৬৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজা ছিলেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে বিবেচিত হইবে, সমগ্র আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাত্য অশোকের পরে কখন এক রাজার অধিকারে ছিল না। ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী তার্কিক কুমারিল ভট্টের সময়—কন্যাকুমারিকা হইতে উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত একজন হিন্দুরাজাও ছিলেন না। বৌদ্ধ প্রধান জনপদ এবং রাজাও ছিলেন।

ভট্ট মাধবাচার্য বৌদ্ধ বিদ্বেষমূলে, কেবল লেখনী সাহায্যে যে গল্প বা উপন্যাস লিখিয়াছেন—উহার প্রায় সবটাই কল্পনামূলক রচা-কথা, ঐতিহাসিক সত্য উহাতে অতি নগণ্য॥ হিংসাবশে মানুষে করে না কি! জনৈক বৈদিক পণ্ডিত, লোক মোহনার্থে যে এতাদৃশ অলীক কথা লিখিতে পারেন—ইহা মানব-বুদ্ধির অগোচর ব্যাপার।

মাধবাচার্য খ্রীঃ ১৪ দশ অব্দের লোক। প্রায় সাতশত বৎসর পরে—কুমারিলের কথা লিখিয়াছেন ভট্ট মাধবাচার্য, কুমারিলের উক্তি বলিয়া লিখিয়াছেন—

"আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকঃ।
ন হন্তি য স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপঃ॥"

অথবা এ অসাধারণ আদেশ,—কুমারিলের প্রতিপালক এবং পৃষ্ঠপোষক রাজা সুধন্বার* হইলেও সম্ভব নয়। সমগ্র ভারত যাঁহার আদেশ মান্য করিবে, এমন একজন হিন্দু সম্রাট্ ইতিহাসের নয়, মাধবাচার্যের মনোময় জগতের হইতে পারেন। ইহাতে মাধবের হৃদয়স্থ খলস্বভাবেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজারও উপর কলঙ্ক লেপিত হইয়াছে। একজন সম্রাট্ যে প্রকৃতিপুঞ্জের উপর এতাদৃশ আদেশ করিতে পারেন, ইহা রাজনৈতিক ব্যাপারও নয়। ইনি লৌকিক রাজা নন। ইতিহাসে এ প্রকার পাশবিক রাজার নাম অতি বিরল। ভারতের ইতিহাসে এরূপ হিন্দু রাজার নাম এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

জনৈক হৈহয়-বংশীয় সুধন্বা নামক রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহার পুত্রের নাম ছিল নলধ্বজ, এই বংশের দশমরাজা কর্ণপাল, তাঁহার রাজত্বকাল খ্রীস্টীয় ১১৫-১৯৪ অব্দ। সে সময়ে কুমারিলের জন্মই হয় নাই। পেড্র এবং অমর কণ্টকের মধ্যবর্তী ভূভাগে ধনপুর নগরী—যাহার নাম হইয়াছে আজমীড়গড়, উহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়--তথায় হৈহয় সুধন্বার রাজধানী ছিল। বর্তমানে সেই স্থানকে লোকে ছত্রিশগড় বলে। এখন বৃত্তিভোগী উক্ত বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজার বংশধরেরা তথায় বাস করেন। হৈহয়-বংশীয় সুধন্বা খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের লোক হইতে পারেন। এই সুধন্বার সময়ে কুমারিলের বিদ্যমান থাকা অসম্ভব।

বাক্‌পতির অতিশয়োক্তিপূর্ণ 'গৌড়বহে' বর্ণিত যশোবর্মদেবের বিশেষণ রূপে যদি সুধন্বার প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করিতে পারেন নাই, পরাজিত হইয়াছিলেন; অতএব যশোবর্মার কোন প্রভাবই দক্ষিণ-ভারতে ছিল না। বাক্‌পতির নাটকীয় কাব্য একেবারেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য—ঐতিহাসিকতা ইহাতে বিশেষ নাই। সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয়ের বা রঘুর দিগ্বিজয়ের অনুকরণ বলিয়া ধারণা হয়। যশোবর্মা—সুধন্বা (বিশেষণে) হইতে পারেন, কিন্তু গৌড়ই তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল কিনা সন্দেহ, তদুপরি সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত শাসনতো পরের কথা। মাধবাচার্য—কুমারিলের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা উপন্যাসে হয়তো শোভা পাইতে পারে। কবি ভবভূতির গুরু কুমারিলের উক্ত প্রকার বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কোন উক্তিই করেন নাই। ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত' একখানি বিশিষ্ট নাটক। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকির রচিত নয়। ভবভূতিরও রামচরিত কল্পিত উপাখ্যান। ভট্টাচার্য কুমারিল—নৈয়ায়িক পণ্ডিত ব্যক্তি। যশোবর্মা কুমারিলাশিষ্য ভবভূতি ও বাক্‌পতির প্রতিপালক ছিলেন। যশোবর্মা অনুমান ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দের বা কিছুপরে রাজা হন। মালতী-মাধবেরলেখক—

*সু-ধনু (ধনু ?)—উত্তম ধনু যার (ধানুকী ?) – প্রবলবীর – বিশেষণের ব্যবহারেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ভবভূতি। তাহাতে বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, বিন্ধ্যপর্বতের তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রভাবের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। বৌদ্ধপ্রভাবের উচ্ছেদ, কুমারিলের ক্ষমতায় হয় নাই। অধিকন্তু তিনি জনৈক বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের নিকট পরাজিত হইয়া, শিষ্যগণ সহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে বাধ্য হন। শেষে চিতারোহণে দেহত্যাগ করেন। এখন সেই কথাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভট্টাচার্য কুমারিলের একজন ভ্রাতা ছিলেন,সেই অজ্ঞাতনামা ভ্রাতার এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম আচার্য 'ধর্মকীর্তি। * ইনি ধর্মে বৌদ্ধ (বোধহয় তাঁহার পিতা—কুমারিলের ভাইও বৌদ্ধ ছিলেন), তাঁহার সহিত খুড়া কুমারিলের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ধর্মকীর্তি কোন গুপ্ত অভিপ্রায় সংসাধনার্থ আত্মপরিচয় গোপন করিয়া খুল্লতাতের নিকট গমন করেন এবং তথায় বেতনভুক্ত ভৃত্য স্বরূপে কর্মে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় কর্মকুশলতায় তাঁহার প্রিয় হন। তাঁহাদের প্রিয়-কার্য সাধানায় যথোপযুক্ত পরিশ্রম এবং স্বভাবের মাধুর্যে সস্ত্রীক কুমারিল ভৃত্য-বেশী ধর্মকীর্তির উপর সদয় ব্যবহার করিতে থাকেন। কুমারিল-কৃত অভিনব ন্যায়সূত্রগুলি,' যদ্দ্বারা তিনি বৌদ্ধ ন্যায় খণ্ডন করিতেন, সেইগুলি শিক্ষার জন্যই তিনি খুড়ার নিকট গিয়াছিলেন ; ধর্মকীর্তির বিদ্যার পরিচয় পাইয়া এবং স্বজাতি বিবেচনায় তাঁহাতে তাঁহার উদ্ভাবিত ন্যায়সূত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

পূর্ব-মীমাংসাদর্শন প্রভাবে, বৌদ্ধ-প্রভাব অস্তমিত হইতেছিল। ধর্মকীর্তি বিশেষ যত্ন ও সাবধানে কুমারিল ও তাঁহার পত্নীর নিকট, উক্ত ন্যায়দর্শনের গুহ্যাতিগুহ্য বিষয় শিক্ষা করেন।

যথাকালে ধর্মকীর্তি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, খুল্লতাতের আশ্রয় ত্যাগ করিবার দিন স্থির পূর্বক প্রাপ্য বেতন দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, পরদিন অতি প্রত্যুষে প্রস্থান করেন। তারপর তিনি-কুমারিলের শিক্ষিত নীতি এবং কণাদ গুপ্তের তর্ক—প্রণালী অবলম্বনে, বৈদিক এবং নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, একে একে অনেকের সহিত তর্ক করিয়া জয়লাভ করিতে থাকেন। একবার বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত প্রকাশ্যভাবে, প্রায় তিন মাস ধরিয়া তর্কের পর জয়লাভ করেন এবং তাঁহাদিগকে (বিরুদ্ধবাদীদিগকে) বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত করেন। তর্কে যিনি পরাজিত হইবেন তাঁহাকে জেতার ধর্মগ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই ছিল সর্ত।

ধর্মকীর্তির এই জয়লাভ এবং ব্রাহ্মণগণের পরাজয়বার্তা শ্রবণে, ভট্টাচার্য কুমারিলের ভীষণ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল। কুমারিল ছিলেন বৌদ্ধ-বিরোধী এবং বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। এদিকে ধর্মকীর্তি বৌদ্ধধর্ম রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত।

একদা কুমারিল বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহ, ধর্মকীর্তির সমীপে গমন করিয়া—বিচার প্রার্থনা করিলেন, এবং পরাজিত ব্যক্তিকে মৃত্যু গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই পণ রাখিতে

---

* Buddist Logic, chap II, 'History of the Mediæval school of Indian Logic' page 104. মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ্, ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ ১৯০৯ খ্রীঃ।

চাহেন। ইহাতে ধর্মকীর্তি বলিয়াছিলেন—মৃত্যুবরণ হিংসামূলক, অতএব ইহা অপেক্ষা—জেতার ধর্ম পরাজিতকে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই থাকুক পণ। ইহাই স্বীকৃত হইল, যেহেতু স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। ঘোরতর বিচার চলিল এবং বহু তর্ক বিতর্কের পর, ভট্ট ধর্মকীর্তি জয়লাভ করিলেন। কুমারিল পণ অনুসারে বাধ্য হইয়া শিষ্য ও সহকারী পণ্ডিতগণ সহ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল প্রায় ৬৩৫ হইতে ৬৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

এই ভীষণ পরাজয় এবং অপমানের পর আর ভট্ট কুমারিলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকেরা ৬৫০ খ্রীস্টাব্দই কুমারিলের শেষ সময় নির্ধারণ করিয়াছেন, এই ঘোরতর অপমানে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকিবেন।

ভট্টাচার্য ধর্মকীর্তি তথাকালে একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মপালের ছাত্র। ধর্মকীর্তির এই জয়লাভের কথা ভারতীয় কোন বৈদিক গ্রন্থে নাই। না থাকিবারই কথা, কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথাসাধ্য ইহা গোপন করিয়াই গিয়াছেন। এই প্রকারের একাধিক পরাজয়ের কথাও চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক (?) এই পরাজয় কাহিনী বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া স্বীয় ভাষা সাহিত্যে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভারতভ্রমণকাল,—৬৭১ হইতে ৬৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। অতএব তিনি কুমারিলের ও ধর্মকীর্তির কতিপয় বৎসর পরবর্তী কালেই ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন কুমারিলের এই পরাজয় এবং ধর্মান্তর গ্রহণ সকলেরই স্মৃতিগত ছিল।

আচার্য মাধব, খ্রীস্টাব্দের প্রায় চতুর্দশ শতকের লোক। তিনি আচার্যের পরাজয় এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ গোপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিশ্চয় ধর্মকীর্তির বিখ্যাত ন্যায় 'প্রমাণ বার্তিক' অবগত ছিলেন এবং পাঠও করিয়া থাকিবেন। যেহেতু মাধবাচার্য তাহার প্রখ্যাত "সর্বদর্শন সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে, 'প্রমাণবার্তিকের' শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন দৃষ্ট হয় ("ভেদাশ্চ ভ্রান্তি" ইত্যাদি)। বৌদ্ধাচার্য দিঙ্‌নাগের (দ্রাবিড়ী নৈয়ায়িক প্রায় ৫০০ খ্রীঃ; বরাহ মিহির ও অমর সিংহ প্রায় ৫৪৪ খ্রীস্টাব্দের লোক) পরেই ধর্মকীর্তি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ধর্মকীর্তির "ন্যায়—বিন্দুর" টীকা সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে। কাম্বের শান্তিনাথ জৈনমঠে ন্যায়বিন্দুর মূল, ভাষ্য ও টীকা তিনখানিই ছিল। দিঙ্‌নাগের 'প্রমাণ সমুচ্চয়' এবং অক্ষপাদের ন্যায়-সূত্র প্রাচীন ন্যায়ের পুঁথি, এবং অসাধারণ প্রতিভা সমন্বিত ন্যায় গ্রন্থ। প্রমাণ-সমুচ্চয়ের দশখানি ভাষ্য-গ্রন্থ, এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। অনেকের ধারণা—বৌদ্ধন্যায়-প্রভাব-বিদ্বেষীরাই তথাকথিত গ্রন্থাদি নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকিবেন। তিব্বতে তথাকথিত ন্যায় গ্রন্থাদির অনুবাদ থাকায়, বর্তমান গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে এবং প্রকাশিত হইতেছে। তিব্বতে

গ্রন্থগুলি না থাকিলে আর প্রাপ্তির উপায় ছিল না। তথাকথিত তিব্বতী গ্রন্থ হইতে ধর্মকীর্তির পরিচয় প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ভারতের পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ প্রাধান্য-মূলক মূল্যবান্ গ্রন্থাদির ধ্বংসসাধন করিয়াছেন ; কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে এখন সত্য দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে। বৈদিকেরা কত উপায়ে স্বধর্ম ও স্বমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, এই প্রহসন হইতে কিছু অবগত হওয়াযায়।

ভারতের হিন্দু পণ্ডিতেরা বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে যে সকল মূল্যবান্ বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সংগ্রহ এবং প্রণষ্ট করিয়া ফেলিয়া আপনাদের কীর্তি ঘোষণা করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ বহুকাল হইতে তিব্বতের মঠে মঠে রক্ষিত থাকায়, সত্যানুসন্ধানকারী মহাত্মগণের চেষ্টায় পুনরায় পাওয়া যাইতেছে এবং ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটিত হইতেছে।

বৌদ্ধ পালরাজাদের সময় (খ্রীঃ ৭০০-১২০০ অব্দ) বঙ্গে চন্দ্রগোমীই প্রধান ন্যায়াচার্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কাঞ্চীর বৌদ্ধ পল্লব রাজাদের পতনের পর, দাক্ষিণাত্য, (দ্রাবিড়) ন্যায়েরও পতন হয়। কাঞ্চীপুর, নালন্দা, ওদন্তপুরী (পুরী ?), শ্রীধান্য-কটক (কটক), কাশ্মীর এবং বিক্রমশীলার পতনের পর, নবদ্বীপের ন্যায়ের প্রাধান্য প্রবর্তিত হয়।

বৌদ্ধাদি ন্যায় শাস্ত্রগুলি ধ্বংস না করিলে, হিন্দুশাস্ত্র পুরাণাদির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ন্যায়ের আঘাত সহ্য করিতে পারে এমন পুরাণাদি অতি সামান্য। হিন্দুধর্মে বিশেষ নৈয়ায়িক মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বৌদ্ধাদি ন্যায়শাস্ত্র-ধ্বংসের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল ; বোধ হয় এই কারণেই বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায়, ব্যাকরণাদি গ্রন্থ ব্রাহ্মণেরা নষ্ট করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পুরাণ এবং পৌরাণিক কাব্য মাত্রেই ন্যায়ের আঘাত সহ্য করিতে সক্ষম নহে। ভট্ট কুমারিলের শোচনীয় পরাজয় এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণে হিন্দু পণ্ডিতগণের ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই আতঙ্ক হেতুই বৌদ্ধ ন্যায়াদিশাস্ত্র, বৈদিক পণ্ডিতেরা দেখিলেই নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, ইহাতে যে কত মহামূল্য গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে বলা যায় না।

ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজে মাধবের মত প্রসিদ্ধি আছে যে,—ভগবান্ শঙ্করাচার্য ভট্ট কুমারিলকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা একেবারেই রচা-কথা। আচার্য শঙ্কর অনুমান ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে (মতান্তরে নবম শতাব্দী ?) এবং ভট্ট কুমারিল খ্রী° ৫৯০-৬৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং কুমারিল শঙ্কর অপেক্ষা শতাধিক বৎসরের পূর্বের লোক। শঙ্কর এবং কুমারিলে দেখা সাক্ষাৎ হইবার কথা নয়। শঙ্কর কি করিয়া কুমারিলকে পরাজয় করিবেন ? শঙ্করের সময় কুমারিল জীবিত ছিলেন না। খ্রী° ৬৫০ অব্দে কুমারিল চিতারোহণে দেহত্যাগ করেন। আচার্য শঙ্করের তখন জন্ম হয় নাই। ভট্ট কুমারিল সম্বন্ধে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সি, ভি, বৈদ্য এম. এ. (পুণা) মহাশয় তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (৪র্থ অধ্যায়) যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সূক্ষ্ম বিচারেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে আর্যাবর্তবাসী বলিয়াছেন।

যাহাই হউক, শঙ্করাচার্য কুমারিলের শতাধিক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালবারের "কেরল-উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—কুমারিল শঙ্করের শতবৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তুলব-দেশীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ভট্ট কুমারিলের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস কুমারিল শঙ্করের অনেক পূর্ববর্তী।

প্রবাদ এই যে—কুমারিল চিতারোহণে দেহত্যাগ করেন (খ্রী ৬৫০ অব্দ)।

শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে—"শ্রুত্যর্থ ধর্মবিমুখান্ সুগতান্ নিহন্তুং।
জাতং গুহংভুবি ভবন্তমহং নু জানে॥" (শঃ দিঃ) *

ভগবান্ ভট্ট কুমারিল যখন চিতারোহণ করেন, তখন শঙ্করাচার্য তথায় উপস্থিত হইলে কুমারিল তাঁহাকে উপরিধৃত শ্লোকার্ধ বলেন। অথচ কুমারিলের চিতারোহণকালে শঙ্করের জন্মই হয় নাই। উক্ত শ্লোকের একাধিক ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রাচীন ভাষার অনুকরণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রাচীনকালের নয়।

মাধবাচার্যের ভ্রাতা সায়ণাচার্য দাক্ষিণাত্যের সঙ্গম নামক রাজবিশেষের মন্ত্রী ছিলেন। সায়ণাচার্য 'ধাতুবৃত্তি' নামে যে গ্রন্থ লেখেন তাহাতে লিখিত আছে সঙ্গম রাজার পুত্র বুক ও হরিহর বিজয়-নগর পত্তন করেন। সঙ্গম রাজার পাঁচ পুত্র হরিহর, কম্প, বুক, সরপ এবং মুদ্দ। হরিহর রাজার পিত্তল দানপত্রে সময় নির্দেশ আছে—"১৩১৭ শকে (১৩৯৫খ্রী°) ধাতবর্ষে, মাঘমাসে, শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাসী তিথিতে পিতৃদৈবত (মঘা) নক্ষত্রে রবিবারে। †

সায়ণাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য খ্রীস্টাব্দের চতুর্দশ শতাব্দের লোক বলা অসঙ্গত হয় না (১৩শ-১৪শ মধ্য ?)। এই মাধবাচার্য 'শঙ্কর-বিজয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"প্রাচীন শঙ্কর-গ্রন্থের সার-সংগ্রহ হইল" এবং "অন্যান্য প্রাচীন কবি শঙ্করাচার্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

"বেলিগোল পর্বতের এক শিলাফলকে লিখিত আছে—"১২৯০ শকে বুকরাজা জৈন ও বৈষ্ণবদিগের ধর্মকলহ ভঞ্জন পূর্বক উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। ‡

মাধবাচার্যের সময় নির্ধারণে বিশেষ কোন গোলযোগ নাই। এই মাধবাচার্যই 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের' লেখক। শঙ্করজয়, শঙ্করদিগ্বিজয়, শঙ্করবিজয়বিলাস, কেরলউৎপত্তি (তেলেগু-ভাষায়) নামক একাধিক গ্রন্থ আছে। শঙ্কর-শিষ্য আনন্দগিরি বৌদ্ধদের সহিত তাঁহার বিচার-বিষয়ক অনেক কথাও বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য নেপালী বৌদ্ধদের অনেক গ্রন্থই দগ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাশীক্ষেত্রে অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থও পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। নেপালী বৌদ্ধেরা শৈবদের উপর অতিশয় চটা ছিলেন। ইহার নিদর্শন 'দোহাকোষে' কিছু কিছু আছে।

মাধবাচার্য কোন্ গ্রন্থ হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' লিখিয়াছেন

* এই শ্লোকের ভাব বৈদিক ঢংয়ের—১৪শ খ্রীস্টাব্দে এ প্রকার ভাষার প্রচলন ছিল না। তখন বোপদেবের মুগ্ধবোধ প্রচলিত হইয়াছিল। "নুজানে" বাক্যদ্বারা 'চিনিনা' 'বুঝায়—শঙ্করকে চিনি নাই বুঝায়।

† Asiatic Researches London, 1809. Vol 1X, pp 417-421.

‡ „ „ „ „ „ „ „ 270.

কিছুই বলেন নাই। তিনি কুমারিলের চিতারোহণে দেহত্যাগের কারণ কি কিছুই দেখান নাই, অথবা শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া দেহত্যাগের বিশেষ কারণ নাই। শঙ্করের নিকট কুমারিলের শাস্ত্র-যুদ্ধে পরাজয়—সত্য ঘটনা নয়। দ্বিতীয়, চিতারোহণ-কালে শঙ্কর তথায় উপস্থিত ছিলেন ইহাও অমূলক। তৃতীয়তঃ পূর্বোক্ত শ্লোকটী তিনি শঙ্করকে বলিয়াছিলেন ইহাও শঙ্করদিগ্বিজয়ের অলীক উক্তি। মাধবাচার্য পণ্ডিত লোক, কিন্তু শঙ্কর ও কুমারিল সম্বন্ধে অসার উক্তিই করিয়াছেন।

ধর্মকীর্তির নিকট তর্কে পরাজয় এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণই তাঁহার চিতারোহণের কারণ। এই অপবাদ হইতে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তির জন্যই—ধর্মকীর্তির বদলে শঙ্করের নিকট পরাজয়-কাহিনী মাধব বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকালে উদোরপিণ্ডি বুদোরঘাড়ে চাপাইয়া, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার আপনাদের লজ্জা নিবারণ এবং অকলঙ্ক যশোগৌরব প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহার সংখ্যা কে নির্দেশ করিবে? এই প্রকারে একাধিক গ্রন্থকার দেশবাসীকে মায়ামোহে রাখিয়া নিজেদের কতই না যশঃকীর্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

কুমারিল ভট্টের একখানি 'মনু-সংহিতার' টীকা আছে, ইহা তত সুন্দর নয়। বহ্বাড়ম্বর-পূর্ণ। সত্য গোপন করিয়া মিথ্যার প্রচার দ্বারা স্বধর্মীদের যশ বিস্তার করিতে বৈদিকগণ সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। মিথ্যা কতদিন চাপা রাখা যায়?

সম্পাদকীয় মন্তব্য—এই প্রবন্ধের মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। লেখক যেমন অনেকের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করিয়াছেন অথচ বিশিষ্ট প্রমাণ দেন নাই, অপরেও তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে পারেন। এই প্রবন্ধের মতের সহিত আমরা বহু স্থানে একমত নহি, তথাপি আলোচনা হিসাবে লেখকের মত প্রকাশ করিয়াছি। কেহ ইহার সমালোচনা করিলে আমরা তাহাও প্রকাশ করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম্. এ.

[৩]

১৮২৯ খ্রীঃ

জে. ডি. পিয়ার্সন-সঙ্কলিত একখানি ইংরেজী বাঙলা অভিধান ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১। বিশ্বকোষে এই অভিধান মুদ্রণকাল ভ্রমবশতঃ ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই অভিধানখানির একখণ্ড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারে ছিল। উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ স্কুলবুক সোসাইটীর ৭ম ও ৮ম কার্যবিবরণীতে পাইতেছি। ৭ম কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক একাধিক বাঙলা ইংরেজী অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল ২। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত কোন ইংরেজী বাঙলা অভিধান উক্ত সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত না হওয়ায় অনেকেই এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। স্কুলবুক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষ মিলিয়াসের স্কুল ডিক্‌শনারীর (Mylius' School Dictionary) বঙ্গানুবাদ করিয়া একখানি ইংরেজী বাঙলা অভিধান প্রণয়নের জন্য পিয়ার্সনকে অনুরোধ করেন। মিলিয়াসের স্কুল ডিক্‌শনারীতে আলাপ আলোচনা ও বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে সর্বদা ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তাহাদের সাধারণ অর্থ প্রদত্ত হওয়ায় ইহা প্রথম শিক্ষার্থীদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। বহু-

---

১। "Rev. J. Pearson published in 1829, for the School Book Society, a School Dictionary, English and Bengali, but it was a mere Vocabulary."

২। "Besides these works, both of which contain Bengalee words with English interpretations, it is evidently important to furnish native youth with one on the reversed plan; i. e. English with Bengalee meanings. It has too been properly remarked, that it should be the object of every learner of a foreign language to acquire, in the first instance, that part which is most commonly used in conversation and the writings of good authors; as when this is secured, other words will be easily and gradually acquired, and the remainder of his progress will be easy. Hence your Committee are of opinion, that such a manual as Mylius's School Dictionary, which contains only words frequently occurring in conversation or writing, with their more usual meanings, would be more useful for a beginner than a larger publication, in which the vast number of words and meanings would but perplex. Your Committee have therefore requested Mr. Pearson to prepare a translation of this work; and are happy to report, that he is prosecuting it with his usual diligence." C. S. B. S. 7th Repor pp. 11-12.

শব্দ-সমন্বিত বৃহৎ অভিধান অপেক্ষা এই সংক্ষিপ্ত অভিধান খানিই অনেকের নিকট সহায়ক বোধ হইত। পিয়ার্সন স্কুলবুক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া মিলিয়াসের অভিধানকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এই অভিধান রচনা করেন। স্কুলবুক সোসাইটীর ৮ম কার্যবিবরণী হইতে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উক্ত সোসাইটীর ১৪শ কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে, পিয়ার্সনের ইংরেজী বাঙলা অভিধান নিঃশেষ হওয়ায় উক্ত সোসাইটীর তদানীন্তন সম্পাদক, জে. সাইকস্-এর উপর উক্ত অভিধানের এক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ সঙ্কলনের ভার অর্পিত হয় ৩। জে. সাইকস্-সঙ্কলিত ইংরেজী বাঙলা অভিধান মূলতঃ পিয়ার্সনের অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত হইলেও নূতন অভিধানের মত হইয়াছিল। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ অর্থাৎ জে. সাইকস্-সঙ্কলিত অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ও তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের শব্দ-সংখ্যা অল্লাধিক ১৬৫০০। ইংরেজী শব্দ-সমূহ রোমান বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। এই সংস্করণে শব্দ-সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া সজ্জিত। ইহাতে প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের পাশে সর্বপ্রথম সেই শব্দটী বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি কোন জাতীয় তাহা সাঙ্কেতিক অক্ষরে নির্দেশ করা হইয়াছে। তৎপরে একাধিক বাঙলা প্রতি শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। লং-এর তালিকা ও বাঙলা গভর্নমেণ্টের নথিপত্রের ৪১ নম্বর সংগ্রহে এই অভিধানের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙলা গভর্নমেণ্টের নথিপত্রের সংগ্রহে ইহার মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। আলোচ্য অভিধানখানি স্কুলের ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত হয়। নিম্নে এই অভিধানের কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

1. Aback, ad. — পশ্চাতে ; উল্টা পাইল। পৃঃ ১
2. Boar, s. — বরাহ, শূকর ; বাণ। পৃঃ ২২
3. Cumbersome, a. — ক্লেশদায়ক, ভারি। পৃঃ ৫১

৩। "The old edition of Pearson's Anglo-Bengali School Dictionary, having been exhausted, it was resolved that another edition, considerably enlarged and amended so as to suit the present advanced state of education, should be prepared and printed. This, which is in fact a new work, is now in course of preparation by your Secretary, and it is confidently expected that it will be completed and published in the course of the present year." C. S. B. S. 14th Report. pp. 10.

"The English and Bengali School Dictionary, which was mentioned in the last Report as in course of preparation by the Secretary, but which, in consequence of his absence, did not appear so soon as was expected, has been published since his return, and has met with so favourable a reception from the public, that nearly the whole of the first edition of 1000 copies has been already sold. A new and revised edition is now in the press, and will be ready for publication when called for." C. S. B. S. 15th Report, pp. 6.

4. Dormant, a. নিদ্রিত, অপ্রকাশ। পৃঃ ৬৫
5. Equinox, s. বিষুবকাল, সমদিবারাত্রি। পৃঃ ৭৩
6. Forebode, v. অগ্রবোধ ক, সূচনা ক। পৃঃ ৮৫
7. Guise, s. বেশ, রীতি, রূপ, ধারা। পৃঃ ৯৬
8. Hobby, s. যে বিষয়ে মন আসক্ত হয়। পৃঃ ১০১
9. Inkling, s. ইঙ্গিত, ঈষদ্ জ্ঞান। পৃঃ ১১৩
10. Jurymast, s. ভগ্ন মাস্তলের পরিবর্তে ক্ষুদ্র মাস্তল। পৃঃ ১২০

তৃতীয় সংস্করণের আখ্যা পত্র :--

"English and Bengali/ Dictionary,/ For the use of Schools./ By J. Sykes./ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান।/C. S. B. S./ Calcutta:/ Printed at the Calcutta School-Book Society's Press, and sold at/ Their Depository, Circular Road./ 1858./" pp. 256. আকার ৬$\frac{৩}{৪}$" × ৫"ইঞ্চি*

১৮২৫ খ্রীঃ

এদেশের মিশনরীরা বাইবেল ও খ্রীস্টধর্ম-মূলক বিভিন্ন শব্দের একখানি ইংরেজী বাঙলা অভিধান-সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। এইরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে "Calcutta Auxiliary of the Religious Tract and Book Society"—কর্তৃক একটী শাখা-সমিতি গঠিত হয়। প্রস্তাবিত ইংরেজী বাঙলা অভিধানখানি সঙ্কলিত হইলে এবং তাহা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়ও ঐ প্রকারের অভিধান-সঙ্কলনের ব্যবস্থা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির সভ্য নয়জন যথা—ক্যাম্বেল, ডাল, এড্ওয়ার্ড, হিবারলিন, লং, ম্যাকওয়ে, মর্টন, ওয়েনজার ও ইয়েটস্। রেভারেণ্ড ওয়েন্জার ও মর্টনের উপর প্রয়োজনীয় শব্দ-সূচী ও তাহার বাঙলা অর্থ নির্দেশ করিবার ভার অর্পিত হয়। এই দুইজনের দ্বারা শব্দ-সূচী প্রস্তুত হইলে পর উক্ত সমিতি প্রত্যেক শব্দ ও তাহার অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধনক্রমে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া উক্ত শব্দ-সূচী মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল এই সমিতির কার্য নিয়মিতভাবেই চলিয়াছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সকল সভ্যকে একত্র করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রথম প্রথম সকলেই আসিতেন বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অনেকেই সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পিছাইয়া পড়েন। এই সকল কারণে উক্ত শাখা-সমিতির সকল সভ্য একমত হইয়া এই অভিধান-সঙ্কলনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র মর্টনের উপর ন্যস্ত করেন। মর্টন এদেশীয় বিভিন্ন মিশনরীদের নিকট তাঁহাদের অভিমত ও নূতন শব্দ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত শব্দ-সূচী মুদ্রণ করিয়া প্রেরণ করেন। স্থির হয়, শব্দ-সূচী-

* এই সংস্করণ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে।

সংক্রান্ত এই সকল পুস্তিকা ফেরত আসিলে উক্ত সমিতি তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন। এই অভিধান কি উদ্দেশ্যে ও কি রীতিতে সঙ্কলিত হইবে সেই সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশনে মর্টন প্রস্তাবিত নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ হয়।

উক্ত নিয়মগুলির সারমর্ম এইরূপ :—

১। এই অভিধানে বাইবেল ও খ্রীস্টধর্ম-সংক্রান্ত শব্দাবলী ব্যতীত অন্য কোন শব্দ থাকিবে না।

২। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে কেবল ইউরোপীয় মিশনরীদের সাহায্য হইবে তাহা নহে, এদেশীয় খ্রীস্টধর্ম-প্রচারকেরাও তাঁহাদের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য সকলেই একবিধ শব্দ ব্যবহার করিয়া একটী নূতন ধারার প্রবর্তন করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শব্দের সহজ প্রতিশব্দ প্রদত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে ব্যাখ্যামূলক কিছু নির্দেশ করা হইবে না।

৩। প্রস্তাবিত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইলে পর খ্রীস্টধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ সহজতর হইবে। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন লেখকের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার পর হইতে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ-বিভ্রাট অনেকটা লোপ পাইবে। এইরূপ একখানি অভিধান থাকিলে পরবর্তী লেখকেরা দুরূহ শব্দস্থলে এই গ্রন্থ হইতে প্রতিশব্দ জানিয়া লইতে পারিবেন। ইহার ফলে একজাতীয় প্রতিশব্দ সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

৪। এই অভিধানখানি শুধু বাইবেলের অনুবাদ-কার্যের জন্য সঙ্কলিত হইবে না। যাঁহারা খ্রীস্টধর্মমূলক বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিবেন তাঁহাদেরও যাহাতে ইহা কাজে লাগিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইহা সঙ্কলিত হইবে। এইজন্য অনেক শব্দের একাধিক অর্থ নির্দেশ করিতে হইবে। ইহার ফলে অনুবাদক ও গ্রন্থসঙ্কলনকর্তারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজিয়া লইতে পারিবেন।

৫। ইতঃপূর্বে মুদ্রিত বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ ও খ্রীস্টধর্মমূলক গ্রন্থাদিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের অনেক শব্দ এই অভিধানে থাকিবে। যে সকল স্থলে উপযুক্ত সুষ্ঠু শব্দের অভাব লক্ষিত হইবে শুধু সেই সকল স্থলে নূতন শব্দ দেওয়া যাইবে।

৬। এদেশে অবস্থিত খ্রীস্টধর্মপ্রচারক বিভিন্ন সমিতির সভ্য লইয়া এই শাখা-সমিতি গঠিত হওয়ায় ইহার নির্ধারণ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নির্ধারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সমিতির সভ্যদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, তাঁহারা সহজ ভাষায় বিভিন্ন শব্দের অর্থ দিতে প্রয়াস পাইবেন।

৭। বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটী শব্দ ব্যতীত অপর সকল বিদেশী পরিভাষা (Exotic terms) এই অভিধানে পরিত্যক্ত হইবে। 'আলফা', 'অমেঘা', 'আমেন' প্রভৃতি কয়েকটী গ্রীক ও হীব্রু শব্দের উপযুক্ত বাঙলা প্রতিশব্দ না থাকায় ঐ সকল শব্দেরই ব্যবহার

যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। মর্টন উপরে উল্লিখিত বিধান সমূহ অনুসরণ করিয়া আলোচ্য অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন।

মর্টন প্রায় বার বৎসর পূর্বে বিশপ জেম্‌স্‌-প্রস্তাবিত এই জাতীয় অপর একখানি বৃহৎ অভিধান-সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে গঠিত এক সমিতির সভ্য ছিলেন। সেই সমিতিতে বিশপ জেমস্‌ ও মর্টন ব্যতীত আর্কডেনকোরি, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ মিল এবং ডাঃ এইচ্‌. এইচ্‌. উইলসন সভ্য ছিলেন। এই সমিতির সভ্যদের দ্বারা সঙ্কলিত দুইটী শব্দ-সূচী প্রচারিত হইয়াছিল। এই শব্দ-সূচীর সাধারণ নাম "Rendering, with extended observations thereupon, of some of the most important Biblical and Theological Terms." প্রথমটী—ইংরেজী সংস্কৃত শব্দসূচী, ইহা ডাঃ উইলসনের মন্তব্য সহ ডাঃ মিল কর্তৃক সঙ্কলিত হয়। দ্বিতীয়টী—ইংরেজী বাঙলা শব্দ-সূচী, ইহা মর্টন কর্তৃক সঙ্কলিত। এই দুই শব্দ-সূচী মুদ্রিত এবং বিভিন্ন মিশনরীদের নিকট তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে অন্যান্য মিশনরীরা আগ্রহ প্রকাশ না করায় এবং বিশপ জেমসের অকাল মৃত্যু হওয়ায় এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। উক্ত ইংরেজী বাঙলা শব্দসূচীটী গত ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা খ্রীশ্চিয়ান অবজারভার পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখ লং-এর তালিকায় আছে [১]। ইহার একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আমি যে-খণ্ড দেখিয়াছি তাহার আখ্যাপত্র ছিন্ন, সেইজন্য আখ্যাপত্র দেওয়া গেল না[২]। নিম্নে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

1. Appease, শান্তকরণ, কোপ নিবৃত্তিকরণ, কোপ নিবারণ, পৃঃ ৬
2. Bath, (a measure, supposed to be about 7½ gallons) বাথ অর্থাৎ মদ্যাদির পরিমাপ পাত্র বিশেষ, পৃঃ ৭
3. Concision, ত্বক্‌চ্ছেদ opposed to পরিচ্ছেদ or moral purity. পৃঃ ১০
4. Dust and ashes, মৃত্তিকা এবং ভস্মমাত্র অর্থাৎ অগণ্য মনুষ্যমাত্র কীটানুকীট, পৃঃ ১৩
5. Elder, মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তি, প্রাচীন ব্যক্তি, পৃঃ ১৪
6. Felicity, কল্যান, সুখদশা, মাঙ্গল্য, স্বচ্ছলতা, পৃঃ ১৫
7. God-child, ধর্মসন্তান, ধর্মশিষ্য, পৃঃ ১৬
8. Holocaust, হোম, হোত্র, পৃঃ ১৭
9. Intercessor মধ্যস্থ, পরমাঙ্গল প্রার্থক, পৃঃ ১৮
10 Vail (of the temple) মহামন্দিরের আবরণ বা ব্যবধান বস্ত্র বিশেষ
(of a nun) পুরুষসংসর্গত্যাগিনীর মুখাচ্ছাদন বস্ত্র, পৃঃ ৩০

১। এই গ্রন্থের উল্লেখ লং-এর তালিকায় আছে। যথাঃ—"In 1845, W. Morton published a Biblical, Theological Vocabulary. pp. 31, of 800 Bengali terms."

২। এই খণ্ড রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের গ্রন্থাগারে আছে।

১৮৪৯

স্কুলবুক সোসাইটীর ৪র্থ কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে,রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বাঙলা অভিধানের স্বত্ব ৩০০৲ টাকা মূল্যে উক্ত সোসাইটীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই অভিধান স্কুলবুক সোসাইটীর সম্পাদক জে সাইক্‌স্ কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া মুদ্রিত হয়। সাইক্‌স-সঙ্কলিত এই বাঙলা অভিধানের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সোসাইটীর ১৩শ ১ ও ১৮শ কার্যবিবরণীতে এই অভিধানের উল্লেখ আছে। ১৮শ কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে উহার ছয় হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। অভিধানের আখ্যাপত্রে সাইক্‌সের নাম নাই। কিন্তু স্কুলবুক সোসাইটীর কার্যবিবরণীতে তাঁহার উল্লেখ আছে। সাইকস্-সঙ্কলিত এই অভিধানের প্রথম সংস্করণের উল্লেখ উক্ত সোসাইটীর ১৩শ ও ১৪শ কার্যবিবরণীতে পাইতেছি। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের একখণ্ড ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ [?] ১৮৪৯, তৃতীয় সংস্করণ [?] ১৮৫২ চতুর্থ সংস্করণ [?] ১৮৫৩ এবং পঞ্চম সংস্করণ[?]১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের শব্দ-সংখ্যা অল্পাধিক ১৩ হাজার। ইহাতে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া শব্দ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত অভিধানে তৎসম, তদ্‌ভব ও দেশী শব্দের সংখ্যাই অধিক। শব্দসমূহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ২১৪ টা বিদেশী শব্দও আছে। আলোচ্য অভিধানের তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ লং-এর তালিকায় আছে ২। চতুর্থ সংস্করণের একখণ্ড শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গের-কাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। পঞ্চম সংস্করণের উল্লেখ স্কুলবুক সোসাইটীর ১৯শ কার্য বিবরণীতে পাইতেছি। এই সংস্করণের একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও আছে। নিম্নে এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :

১। অকল্‌পন, প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তবিক। পৃঃ ১

২। আড়ট্ট, আড়ষ্ট, অবশ, শক্ত, অনম্য। পৃঃ ১৯

৩। ইরা, বাক্য, ভাষা, ভূমি, মদ্য। পৃঃ ২৭

৪। উল্‌টা পাল্‌টা, ফেরেফারে, গোলমালে। পৃঃ ৩৫

১। "A third new work is the Beng'ali' Dictionary, with iaterpretations in B'engali'. It might be said that this is not a new but an old work enlarged: the enlargement however is such, that it is fairly entitled to be called a new production. In the preparation of it your Financial Secretary has taken great pains, and is entitled to the thanks of the Committee." C. S. B. S; 13th Report. p. 14.

২। "School Book Society's Bengali Dictionary, 3rd Ed., 1852; pp.234 12 as., 12,000 words, S. B. S. Skul Buk Abidhan. A very good Dictionary for beginners the meanings are in Bengali and are very close."

৫। এড়াটিয়া, সমল, মন্দ, অধম, ঘৃণিত। পৃঃ ৩৭
৬। ওরমা, টাঁকানী সিঁয়ানী, সেলাই। পৃঃ ৩৯
৭। কলপ, মণ্ডপ, কাঁই, মণ্ড, লেই। পৃঃ ৪৪
৮। খতিয়ান, সংখ্যার্থবহি। পৃঃ ৫৭
৯। গালগুল, গালাঘুষা, জনরব, গপ্‌প। পৃ° ৬৫
১০। ঘটাটোপ, ডোলি আদির আচ্ছাদন। পৃঃ ৬৯

নিম্নে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র প্রদত্ত হইল। ১

দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

"অভিধান। / যাহাতে / বালকদিগের শিক্ষার্থে অকারাদি বর্ণক্রমানুসারে / অর্থের সহিত / বঙ্গভাষার বহু শব্দ সংগৃহীত হইল। / Bengali Dictionary, / For the use of Schools./ C. S. B. S. / Calcutta:/ Printed at the Calcutta School Book Society's Press, and/ Sold at their Depository, Circular Road./ 1849/" পৃঃ২ + ২৩৪; আকার, ৬$\frac{১}{২}''$ × ৪$\frac{২}{৩}''$ ইঞ্চি।

চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

"অভিধান। / যাহাতে / বালকদিগের শিক্ষার্থে অকারাদি বর্ণক্রমানুসারে / অর্থের সহিত / বঙ্গভাষার বহু শব্দ সংগৃহীত হইল। / Bengali Dictionary, / For the use of Schools. / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed at the Calcutta School-Book Society's Press, and sold at / Their Depository, Circular Road. / 1853/" পৃ°২২৮ আকার ৬$\frac{১}{২}''$ × ৪$\frac{২}{৩}''$ ইঞ্চি

১৮৫২ খ্রীঃ

স্কুলবুক সোসাইটী কর্তৃক ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে একখানা বাঙলা ইংরেজী অভিধান মুদ্রিত হয়। এই অভিধানের উল্লেখ স্কুলবুক সোসাইটীর ১৮শ কার্যবিবরণে পাইতেছি।* লং-এর তালিকায় ও এই অভিধানের উল্লেখ আছে। তাহাতে উক্ত অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ২। লং-এর তালিকা ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে

১। দ্বিতীয় সংস্করণের একখণ্ড ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ও শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়দুর্গা লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, এবং চতুর্থ সংস্করণের এক খণ্ডও শ্রীহট্ট জেলার উক্ত লাইব্রেরীতে আছে।

২। "Bengali and English Dictionary, 1st ed., 1852, 1,000 Copies, S. B.S., 2nd ed. in the press."

* "A Bengali and English Dictionary for the use of schools. This volume Completes a series of four School Dictionaries, compiled by the Secretary, more especially for the use of students in the lower provinces. The

মুদ্রিত হয়। স্কুল বুক সোসাইটীর ১৮শ কার্যবিবরণীতে (৩৮বর্ষ ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ) এই অভিধানের যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে জানা যায় উক্ত অভিধানের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৬, এবং মূল্য ৸৹ ছিল। এই অভিধানের ৩০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। ইহার উল্লেখ বাঙলা গভর্নমেণ্টের নথি পত্রের ৪১ নম্বর সংগ্রহেও আছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের মুদ্রণকাল দেওয়া নাই। এই অভিধান স্কুলবুক সোসাইটীর তদানীন্তন সম্পাদক জে. সাইকস্ কর্তৃক সঙ্কলিত।

১৮৫৫ খ্রীঃ

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে এইচ্, এইচ্, উইলসন-সঙ্কলিত রাজস্ব ও বিচার-সংক্রান্ত শব্দাবলীর এক অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহাতে আরবী, ফার্সী, হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙলা, উড়িয়া, মরাঠী, গুজরাটী, তেলেগু, কর্ণাট, তামিল, মলয়লম ভাষায় ব্যবহৃত সকল রাজস্ব ও আইন-সংক্রান্ত শব্দ সংগ্রহ করিয়া রোমান বর্ণানুসারে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। রোমান অক্ষরে লিখিত বাঙলা শব্দের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে বঙ্গাক্ষরে সেই শব্দটী মুদ্রিত হইয়াছে। এই অভিধানে ফর্স্টর, কেরী, হটন প্রভৃতির অভিধানে নাই সেরূপ বহু আইন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানখানি প্রধানতঃ বাঙলা ভাষার অভিধান নহে। কিন্তু ইহাতে বাঙলা শব্দ ও তাহার ইংরেজী অর্থ থাকায় বাঙলা অভিধান-গ্রন্থের পরিচয়ে ইহার উল্লেখ করিতে হইল। এই গ্রন্থখানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারদের নির্দেশে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া শব্দ ও তাহার অর্থ মুদ্রিত। নিম্নে এই অভিধানের কয়েকটী বাঙলা শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :—

1. Ābedan, Beng. (S. আবেদন) A petition, a plaint, an affidavit. p. 2.

2. Aḍat, or Aṛat, Beng. (আড়ৎ) A warehouse, a store occupied by a wholesale dealer ; or a monopolist ; a place from which all must purchase what they want. p. 5.

3. Āḍḍi, Beng. (আড্ডি) A title or cognomen given to persons who are, or whose ancestors were, money weighers and changers. p. 5.

4. Āḍi, or Āḍhi, Beng. (আড়ি, আঢ়ি) A measure of capacity, equal, in the neighbourhood of Calcutta, to two maunds. p. 7.

5. Āguri, Beng, (আগুরী) A low caste ; mostly cultivators. p. 11.

---

series consists of, 1. A Bengali Dictionary, of which the sixth thousand is on sale. 2. An English and Bengali Dictionary, the second edition of which is being sold: 3. An English Dictionary, of which the first edition of 5,000 copies is on sale: 4. The Bengali and English Dictionary now under notice. It contains 216 pages, and sells at twelve annas a copy. An edition of 3,000 copies has been printed." C. S. B. S. 18th Report. pp. 2.

6. A-īl, Aeel, Beng. (আইল) A bank or mound of earth forming a division between fields, a boundary mark, an embankment. p 13.

7. Ākhā, Beng. (আখা) A sack or bag, a furnace. See Ākā, p. 16.

8. Āpīl, Beng. (আপিল) The English word Appeal. p. 29.

9. Bain, Beng. (বইন, S. ভগিনী) A sister. p. 47.

10. Bānglā, corruptly, Bungalow, Beng. (বাংগলা, probably from Banga, Bengal) A thatched cottage, such as is usually occupied by Europeans in the provinces or in military cantonments. p. 59.

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা—

"A/Glossary/Of/ Judicial and Revenue Terms,/And of/Useful words occurring in Official Documents/Relating to the Administration of the Government/Of/British India,/From the/Arabic, Persian,Hindustani, Sanskrit, Hindī, Bengālī, Uṛiya, Marāṭhī/Guzarāthī, Telugu, Karnata, Tamil, Malayalam,/And other Languages./Compiled and Published Under the/ Authority of the Honorable the Court of Directors/Of the / East-India Company./By/H. H. Wilson, M. A. F. R. S./Librarian to the East-India Company, and/Boden Professor of Sanskrit in the University of Oxford,/etc,etc, etc,/London:/Wm. H. Allen and Co./Booksellers to the Honorable East-India Company./MDCCCLV/." (1855.) pp-xxiv + 728 + 4.[১]

আকার ১১"×৮১" ইঞ্চি।

---

(১) এই গ্রন্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী ও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গলের লাইব্রেরীতে আছে।

ঈশ্বরসত্তাবিষয়ক প্রমাণত্রয় *

অধ্যাপক শ্রীগিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এম্‌. এ.

ধর্মবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন ধর্ম মানবপ্রকৃতির পক্ষে কেবল প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু অপরিহার্য। এই মতবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যান সম্ভবপর হয় যদি আমরা ঈশ্বরসত্তা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করি। কারণ ঐ মতবাদ অনুসারে মানুষের যুক্তিক্ষম ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহার দরুণ ইহা পরিচ্ছিন্ন বস্তুর চরম আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে না, পক্ষান্তরে নিরুপাধিক (Absolute) ভূমা জ্ঞানময় পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতা ও তদ্বিষয়ক চেতনা ইহার মধ্যে অপরিহার্য অঙ্গরূপে সুপ্তভাবে নিহিত থাকে, এবং ঈশ্বরসত্তাসম্বন্ধীয় প্রমাণগুলি এই তথ্যেরই অভিব্যক্তিমাত্র। প্রমাণ এই কথাটীর সাধারণ চলিত অর্থে বিচার করিলে বলিতে হয় যে ঈশ্বরসত্তার প্রমাণসমূহের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি সাধারণতঃ উত্থাপিত হয় সেইগুলি তাহার পক্ষে সঙ্গত বটে, কিন্তু প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে উক্ত প্রমাণসমূহ ধর্মের নিগূঢ়যুক্তির বিশ্লেষণমাত্র। যে প্রণালীতে মানুষের জীবাত্মা ঈশ্বর-চেতনার ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া তাহাতেই স্বীয় উর্ধ্বতম প্রকৃতি বা স্বরূপের পূর্ণোপলব্ধি করে, প্রমাণসমূহ সেই প্রণালীর বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়া থাকে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে প্রমাণগুলির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে, এবং তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমরা এক্ষণে সেই উপযোগিতাই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

বিজ্ঞানসম্মত ক্রম অনুসারে প্রমাণসমূহকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

(১) জগদ্‌বিকারাশ্রয়ী প্রমাণ (Cosmological proof),

(২) জগতের রচনাশিল্পাশ্রয়ী প্রমাণ (Teleological proof),

(৩) ঈশ্বরচেতনাশ্রয়ী প্রমাণ (Ontological proof).

এই ক্রম অনুসারে বর্ণিত হইলেই ধর্মের নিগূঢ়যুক্তির প্রণালীগত বিভিন্ন স্তর ইহাদের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

(১) প্রথমতঃ জগদ্‌বিকারাশ্রয়ী প্রমাণের বিষয় আলোচনা করা যা'ক। জগতের পদার্থগত অনিশ্চয়তা ও অস্থায়িত্বকে আশ্রয় করিয়া এই প্রমাণের যুক্তিবচন প্রবর্তিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ এইরূপ—আপেক্ষিক পদার্থ-সম্বলিত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথবা, যে ব্যাবহারিক জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সদ্যোবেদ্য তাহা আপেক্ষিক ও সোপাধিক, সুতরাং

---

* অধ্যক্ষ কেয়ার্ড-প্রণীত ধর্মবিজ্ঞান-অনুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ ক্রমে লিখিত।

নিরুপাধিক সত্তাসম্পন্ন কোন বস্তু আবশ্যিকরূপে বিদ্যমান আছে। যাহা অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা বেদ্য এমন যে জগৎ তাহার মধ্যে সারবত্তা ও স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই—এই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বর্তমান প্রমাণের গোড়ার কথা। জাগতিক পদার্থের ব্যাখ্যান স্বতন্ত্ররূপে সম্ভবপর নয়; এবং এই ব্যাখ্যান করিতে হইলে মানুষের মন জগদ্‌বহির্ভূত কোন বস্তুর আশ্রয় লইতে বাধ্য, এবং যাহা অন্য নিরপেক্ষভাবে প্রতীত, স্বতন্ত্র ও সারবান্ এমন এক বস্তুর চেতনায় মানুষের মন স্থৈর্য ও শান্তিলাভ করে। এই যুক্তিবচনে চিন্তার যে গতি নিহিত রহিয়াছে তাহা নানা আকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জগৎকে বিকারাত্মকরূপে ধারণা করিয়া তাহা হইতে ঐ সমস্ত বিকারের উদ্‌ভব স্বরূপ কোন নিরুপাধিক বস্তুর সত্তা সিদ্ধান্ত করা যায়। অথবা, জগৎকে কার্যরূপে চিন্তা করিয়া তাহা হইতে চিন্তনের ঊর্ধ্বগতিতে প্রাথমিক মূল কারণের সত্তা সিদ্ধান্ত করা যায়। অথবা, আরও ব্যাপকভাবে বিচার করিলে, জগতের পরিচ্ছিন্নত্ব ভাবনা করা হয় এবং তাহার দরুণ সেই পরিচ্ছিন্নতার পরম আশ্রয়-স্বরূপ নিরুপাধিক ভূমা বস্তুর সত্তায় উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু, যে ভাবেই হউক না কেন, যুক্তি বিচারের মর্মার্থ একই হইবে। দৃষ্টান্তচ্ছলে বল' যাইতে পারে, জগদ্‌গত কার্যকারণ সম্বন্ধের ধারণা লইয়া যদি উক্ত প্রমাণ প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার দ্বারা দ্যোতিত যুক্তিবিচারবাক্য এইরূপ হইবে—যাহা কিছু আবশ্যিক বা অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান নয় তাহার সত্তা বলিতে বুঝায় অপর এক বস্তু ইহার কারণরূপে বিদ্যমান আছে, এবং সেই কারণবস্তু আবার আবশ্যিক না হইলে তাহার কারণান্তরের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এইপ্রকারে পরিচ্ছিন্ন ও অনিশ্চিত পদার্থ সমূহের কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে গেলে অবশ্য তাহা অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে এবং যাহা অপ্রতিষ্ঠ তাহার ভাবনা করা যায় না; সুতরাং ঐ কারণপরম্পরার পর্যবসানস্বরূপ এবং আদি-কারণভূত এক বস্তুর ধারণা মানবমনের পক্ষে অপরিহার্য; এই কারণই হইবে অকারণ অর্থাৎ নিজেই নিজের কারণ এবং অন্যনিরপেক্ষভাবে তাহার সত্তা অবশ্য স্বীকৃত হইবে।

উপরের যুক্তিবিচারের নগ্নতা পরিহারপূর্বক বাস্তবতার আশ্রয় করিলে বলিতে হয় উক্ত প্রমাণের দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্য অভিব্যক্ত হইতেছে—যে পরিদৃশ্যমান জগতের আমরা অংশমাত্র তাহা যে স্বরূপতঃ ক্ষণিক ও নিঃসার এই ধারণা আমাদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন না করিয়া থাকিতে পারি না; জীবনের অভিজ্ঞতা যেন জোর করিয়া আমাদের মধ্যে ঐ ধারণা উদ্রিক্ত করে; এই ক্ষণিকত্বজ্ঞানকেই আমাদের মধ্যে ধার্মিকভাবের প্রথমাবির্ভাবের কারণ বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই প্রকার ধারণা সর্বপ্রথম কোন্ সময়ে জাগ্রত হইয়াছিল তাহা নির্ধারণ করা যায় না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ইহা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সকল দেশের সকল সভ্যজাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই তথ্যই সর্বত্র সমান বলিয়া প্রতীত হয়।

"জাগতিক পদার্থমাত্রই ধ্বংস পাইতেছে, তাহার উপভোগের আকাঙ্ক্ষাও সর্বদা বিলীন হইতেছে," "পরিদৃশ্যমান বস্তুমাত্রই পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী", "বাষ্পের ন্যায় আমাদের জীবন

ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হয়, পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া যায়"—এই সমস্ত উক্তির দ্বারা যে মনোভাব ব্যক্ত হয় তাহা মানবতার ইতিহাসের ন্যায়ই প্রাচীন, অর্থাৎ মানবতার প্রথম আবির্ভাবের কাল যেরূপ অদ্যাপি নির্ধারিত হয় নাই এবং হওয়া সম্ভবপরও নয়, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে এই প্রকার মনোভাব সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। এই মনোভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—নাটকাভিনয়ের মত এই যে মনুষ্যজীবন তাহার যে-কোনও অঙ্ক আমাদের নেত্রপথে পতিত হয় তাহাই ক্ষণবিধ্বংসী, সুতরাং সমগ্র জীবনটাই ক্ষণস্থায়ী। জীবনে কত আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি তাহার ইয়ত্তা নাই বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা কি বলে না কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার পর্যাপ্ত তৃপ্তি নাই? বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য বিষয় বস্তুই না আমরা ভোগ করিতেছি, কিন্তু তাহার দ্বারা কি বাসনা কখনও চরিতার্থ হয়? সম্পদের লালসায় আমাদের ঘোরাঘুরি ছুটোছুটির কি অন্ত আছে? কিন্তু কে কবে সম্পদকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারিয়াছে? এই যে আমার কত চেষ্টার কত আদরের সম্পত্তি, ইহা চিরকালই আমার করতলগত হইয়া থাকিবে 'এমন কথা কি, কেহ কখনও বলিতে পারিয়াছে? পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কত লালায়িত, কিন্তু, যত উন্নত হউক, কোনও পদাধিকার বা প্রতিষ্ঠার স্থিরত্ব কি আছে? যাহাকে লাভ করিলে আমাদের যাবতীয় অভিলাষ ও উদ্বেগের চরম অবসান ঘটে এমন কোনও পার্থিব দ্রব্যের সারবত্তা ও স্থায়িত্ব কেহ কি কখনও কোন জায়গায় দেখিয়াছে? সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমগ্র জগতের ও জাগতিক সর্ব পদার্থের নিঃসারতা ও ক্ষণিকত্ব আবশ্যিকরূপে ও নির্বাধে আমাদের মধ্যে এমন এক মনোভাবের উদ্রেক করে যাহার প্রেরণায় আমরা মরুমরীচিকা-ময় এই জগতের অন্তরালে বিরাজমান যে পরম সত্য তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই; এইসদ্‌বস্তুই হইতেছে শাশ্বত শৈলশিখর যাহার উপরে, বিষয়বস্তুরূপ তরঙ্গমালার প্রবাহে দূরে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলেও আমরা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি।

জগৎ অস্থায়ী ও মায়িক এই যে অনুভবের কথা উপরে বলা হইল, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বরচেতনার সুপ্তসত্তা আভাসচ্ছলে ব্যক্ত করে। আমাদের সসীমত্বের জ্ঞানই বলিয়া দেয় যে আমরা ঐ জ্ঞানকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছি। যদি আমরা নিছক্ পরিচ্ছিন্ন হইতাম, তবে আমাদের মধ্যে পরিচ্ছিন্নত্বের চেতনাই থাকিত না। পূর্ণতার আদর্শের চেতনা আমাদের মধ্যে না থাকিলে আমরা কখনই স্বীয় অপূর্ণতার ধারণা করিতে পারিতাম না। 'জগতের যাহা কিছু সমস্তই মায়িক, মিথ্যা ও ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ' এই প্রকার অনুভূতি বলিতে বুঝায় আমাদের মধ্যে সত্য বা নিরপবাদ-সদ্‌বস্তুর সুপ্তচেতনা আছে যে বস্তুই হইতেছে জগতের বিনশ্বর ও বিকারশীল পদার্থ সমূহের পক্ষে মাপকাটি বা আদর্শস্বরূপ। আমরা যে জগৎকে ইন্দ্রিয়বেদ্য অস্থায়ী পদার্থসমূহের আধাররূপে দেখিয়া থাকি তাহার তাৎপর্য হইতেছে —যাহা আদৌ বিকারশীল নয় এবং যাহা অধোক্ষজ এমন এক শাশ্বত জীবনের ধারণা সুপ্তভাবে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই যে অনুভবের কথা উল্লিখিত হইল তাহাকে যদি আমরা নগ্ন যুক্তিতর্কের ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাই, যদি আমরা তাহাকে অবরোহ-

আনুমানিক প্রমাণের (syllogistic proof) আকার দিতে চেষ্টা করি, তবে তাহার দ্বারা উহার তাৎপর্যের অপব্যাখ্যান হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রচলিত আপত্তি প্রযুক্ত হইবে।

বর্তমান প্রমাণ সম্বন্ধে সর্বপ্রধান আপত্তি এই যে যথার্থ তর্কশাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে এই প্রমাণ প্রয়োগের ফলে যাহা পাওয়া যায় তাহা একটী অভাববস্তু মাত্র, এবং যে ভাববস্তু ইহার ফল বলিয়া অনুমিত হয় তাহা ন্যায্যভাবে ও সঙ্গতরূপে সিদ্ধান্তিত হয় না। উপরে প্রদর্শিত হইল যে এই প্রমাণ প্রদর্শনের মধ্যে একটী অনুমান-বাক্য আছে এবং যাবতীয় অনুমান-বাক্যের মূল নীতি অনুসারে ইহার সিদ্ধান্তবাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্য অপেক্ষা অধিক ব্যাপক কখনই হইবে না। প্রথমে নিরুপাধিক ভূমাবস্তুকে কারণরূপে স্বীকার করিয়া তাহা হইতে পরিচ্ছিন্ন কার্যপদার্থ সিদ্ধান্তিত করা যায় বটে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার বিপরীত ধারা কখনই গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে প্রতিজ্ঞাবাক্য করিয়া তাহা হইতে অসীম বস্তুর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কোন পরিচ্ছিন্ন অস্থায়ী কার্য পদার্থ হইতে অপর এক তদ্রূপ কারণদ্রব্য সিদ্ধান্তিত হইতে পারে, বড় জোর ঐরূপ কারণদ্রব্যের নিরবধি পরম্পর সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা যায়। কিন্তু এই প্রকার কারণপরম্পরা অপ্রতিষ্ঠ হওয়ায় অনুমাতার মন তাহাতে স্থৈর্য লাভ করিতে না পারিয়া সেই পরম্পরার নিরবধিক-ভাব বিসর্জনপূর্বক এমন এক কারণ দ্রব্যের অনুমান করিয়া থাকে যাহা কখনও কার্য নয়, যাহা স্বয়ং নিজেরই কারণ এবং যাহা পরিচ্ছেদাতীত ভূমাবস্তু; কিন্তু এখানে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই প্রকার সিদ্ধান্তীকরণ সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিক ও অসঙ্গত। একথা সত্য যে কোন সসীম অনিশ্চিত পদার্থের প্রতিষেধ করিয়াই আমরা উন্নততর বস্তুর ধারণায় উপনীত হইতে পারি—যাহা শুদ্ধ কারণ ও কার্যকারণ ভেদশূন্য এমন এক বস্তুর ধারণায় উপনীত হইতে পারি, কিন্তু অনুমান প্রক্রিয়ায় কোনও সঙ্কুচিত প্রত্যয় বা নীতি হইতে সিদ্ধান্তরূপে কোনও ব্যাপক প্রত্যয় বা নীতিতে উপনীত হওয়া তর্কশাস্ত্র-সম্মত নয়। "পরিচ্ছিন্ন বস্তুর নিরবধিপরম্পরার ভাবনা করিবার সামর্থ্য আমাদের মনের নাই" কেবল এই জন্যই যথার্থ ভূমাবস্তুর ধারণা অবতারণ করিলে অবশ্য বলিতে হয় যে আমাদের অবলম্বিত তর্কপদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল এবং সেই ত্রুটি বস্তন্তরের আবরণে প্রচ্ছাদিত হইল।

উপরোক্ত আপত্তি প্রকারান্তরেও ব্যক্ত করা যাইতে পারে। যেভাবে সিদ্ধান্তকরণ হইতেছে তাহা হইতে মনে হয় এখানে সিদ্ধান্তিত বস্তুটী প্রকৃতপক্ষে ভূমা বা অপরিহার্য বস্তু নয়। যথার্থ ভূমা না হওয়ার পক্ষে কারণ এই—যে জগৎ-সত্তা হইতে এই ভূমাতত্ত্ব সিদ্ধান্তিত হইতেছে তাহা ঐ ভূমাতত্ত্বের বাহিরে ভাববস্তুরূপে বিদ্যমান থাকে, বলা বাহুল্য জগতের ব্যাবহারিক সত্তা ও সত্যতা প্রথমেই স্বীকৃত হয়। সুতরাং ঐ ভূমাতত্ত্ব জগৎসত্তার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে সসীমবস্তু হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত বস্তুকে অপরিহার্য বলা চলে না, কারণ জগৎ ও এই বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং যেখানেই এই সম্বন্ধ থাকে সেখানেই কার্যদ্রব্য কারণের দ্বারা যেরূপ পরিচ্ছিন্ন হয় কারণও কার্যের দ্বারা সেইরূপ পরিচ্ছন্ন হয়। যদিই বা এই যুক্তির দ্বারা উক্ত বস্তুর অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু সে অপরিহার্যতা সত্তা-গত হইবে না কেবল কার্যকারণ সম্বন্ধগত হইবে। দুইটী বস্তুর এরূপভাবে

ভাবনা করা যাইতে পারে যে যদি তাহারা বিদ্যমান থাকে তবে একটী অপরের কারণ না হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ঐ কারণদ্রব্য কার্য-দ্রব্যের সহিত অপরিহার্য সম্বন্ধযুক্ত হইলেও তাহার সত্তা অপরিহার্য হইবে।

উপরে দেখান হইল যে বর্তমান প্রমাণপদার্থ তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তি প্রদর্শনে অসমর্থ; তথাপি অপর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে বলা যাইতে পারে যে ইহার মধ্যে যথার্থ উপযোগিতা নিহিত আছে। আমরা দেখিয়াছি, জগতের অস্থায়িত্ব ও পরিচ্ছিন্নতার অনুভবের মধ্যে মানুষের মন অস্ফুটভাবে ভূমাতত্ত্বের চেতনাযুক্ত হয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মন এই চেতনা ভূমিকায় উন্নীত হয়, সে প্রক্রিয়ারই প্রথম স্তর হইতেছে বর্তমান প্রমাণ পদার্থ। আমরা পরিচ্ছিন্ন জগতের প্রতিষেধ করিয়া থাকি এই জন্য যে স্বীয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দরুণ আমরা প্রচ্ছন্নভাবে ভূমাবস্তু সম্বন্ধে সচেতন হই এবং কোন এক অদম্য অন্তঃপ্রেরণার দ্বারা সেই বস্তুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। অসীমের সন্ধানে চিন্তার এই প্রথম অভিযানে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তাহা অপর্যাপ্ত হইতে পারে কিন্তু কখনই মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক নয়। ভূমাতত্ত্বের যে ধারণা পরিচ্ছিন্নতার প্রতিষেধ বা খণ্ডন করে, তাহা, যতই অস্ফুট ও অপর্যাপ্ত হউক না কেন, সর্বদাই সত্য এবং উন্নততর জ্ঞানলাভের পক্ষে অপরিহার্য প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপান আশ্রয় করিলে দ্বিতীয় সোপানের অভিমুখে আমরা সেই একই অন্তঃ-প্রেরণার দ্বারা যেন জোরপূর্বক চালিত হই। ভূমাচেতনা উপলব্ধির এই স্তরে যে নিগূঢ় যুক্তি আছে তাহাই পূর্বকথিত দ্বিতীয় প্রমাণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এবং সেই প্রমাণই সাধারণতঃ জগৎরচনাশিল্পাশ্রয়ী প্রমাণ নামে অভিহিত।

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

(২) আচার্য শঙ্কর

গৌড়পাদের পর আচার্য গোবিন্দপাদ কেবলাদ্বৈতবাদের ভাবরাজি প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না বা শঙ্করের গ্রন্থের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তবে তিনি যে একজন অগাধপাণ্ডিত্যপূর্ণ মহাযোগী পুরুষ ছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন তাহা শঙ্কর-গ্রন্থ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। নর্মদাতীরস্থ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া শঙ্কর শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অদ্বৈতবাদের গূঢ়তত্ত্ব-সমূহ উপলব্ধি করেন।

গৌড়পাদ ও শঙ্করে মধ্যবর্তী সময়ে এই সম্প্রদায়ের আর একজন আচার্যের নামোল্লেখ দেখা যায়। ইনি বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি। পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মতে ইঁহার মৃত্যুকাল প্রায় ৬৫০ খ্রী°। ইঁহার গ্রন্থ "বাক্যপদী"কে দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্র বলাই সঙ্গত। ইনি ব্রহ্ম ও শব্দের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া বিবর্তবাদকেই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি শঙ্করের মত জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার না করিয়া নাম-রূপাত্মকজগৎকে কাল্পনিক বলিয়াছেন। তিনি স্ফোটবাদের সমর্থক এবং ঔপনিষদ্ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

ইঁহার পরেই কেবলাদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তক আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব। শঙ্করের কালনির্ণয় বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" প্রণেতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী শঙ্করের জন্মকাল ১৪ বিক্রমাব্দ বা ৪৪ খ্রী° পূ° অব্দ প্রমাণ করিবার জন্য বহুল প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন। আবার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে মোক্ষমূলর, ম্যাকডোনেল প্রভৃতির মতে তাঁহার আবির্ভাবকাল ৭৮৮ খ্রী° হইতে ৮২০ খ্রীস্টাব্দ। সার আর, জি, ভাণ্ডারকার শঙ্করের জন্ম প্রায় ৬৮০ খ্রী: ধরিয়াছেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার "আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ" গ্রন্থে শঙ্করের আবির্ভাবকাল ৬৮৬ খ্রী° এবং তিরোভাব ৭২০ খ্রী° নির্ণয় করিয়াছেন এবং তাঁহার মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। *

বৈদিক এবং অন্যান্য গ্রন্থের উপর তিনি ২২ খানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি প্রায় ৬০ খানি প্রকরণ গ্রন্থের প্রণয়ন এবং দেবদেবীর বহু স্তবরচনা করিয়াছেন। বিবেকচূড়া-মণি, উপদেশসহস্রী, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, অপরোক্ষানুভূতি প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অদ্বৈতবাদের এক একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। বর্তমান প্রবন্ধে বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকেই অনুসরণ করিয়া তাঁহার—মতবাদ সাধারণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বেদান্তদর্শনের বিষয়গুলিকে স্থূলভাবে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সেইগুলির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয়-গুলির নাম (১) অনুবন্ধ চতুষ্টয় (২) প্রমাণ (৩) অধ্যাত্মমীমাংসা (৪) ব্রহ্মবাদ (৫) জগৎবাদ (৬) মনস্তত্ত্ববাদ (৭) সাধনা ও (৮) মুক্তি।

প্রথমত: এই অনুবন্ধ চতু:ষ্টয় কি ? অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের অধিকারী কে, ইহার আলোচ্য বিষয় কি, ইহার আলোচনার প্রয়োজন কি এবং প্রয়োজন ও আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধ কি—এইগুলির আলোচনা প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র পাঠের প্রারম্ভেই প্রয়োজন। "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক: ইহামুত্রার্থফলভোগ-বিরাগ: শমদমাদি সাধনসম্পৎ মুমুক্ষুত্বঞ্চ" (শঙ্কর ভাষ্য ১।১।১)। অধিকারীকে এই চারিটি

---

* বর্তমান প্রবন্ধকার লিখিত ও শ্রীভারতী ১ম খণ্ড ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত শঙ্করের জীবনীতে এ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈলক্ষণ্যজ্ঞান, পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুতে বিরাগ, শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধা—এই ছয়টী সাধনার উপযোগী গুণ, এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছা—এই প্রকার গুণরাজি বিভূষিত যে কোন ব্যক্তিই বেদান্ত শাস্ত্র পাঠের উপযোগী। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে, পূর্ব-মীমাংসা পাঠ, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন পাঠের পূর্বে সমাপন করা আবশ্যক। কিন্তু আচার্যশঙ্কর বলেন যখন পূর্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার বিষয় এবং প্রয়োজন বিভিন্ন—একের বিষয় ধর্ম-জিজ্ঞাসা, অন্যের বিষয় ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, একের ফল অভ্যুদয়, অন্যের ফল মুক্তি এবং যখন ধর্ম-জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ ও ভব্য অর্থাৎ ভবিষ্যতে উৎপাদনীয় বিষয় সম্বন্ধীয়, কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কোন অনুষ্ঠান অপেক্ষা করে না এবং যখন উহার বিষয় ব্রহ্ম—নিত্য সিদ্ধ এবং ভূতবস্তু, তখন পূর্ব-মীমাংসার কী সম্বন্ধ থাকিতে পারে? বাস্তবিক এস্থলে শঙ্করের কথাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

তারপর বেদান্তের আলোচ্য বিষয় কি? ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু এবং ব্রহ্মের ও আত্মার একত্ব স্থাপন ইহার মুখ্য আলোচ্য বিষয় এবং উপরিলিখিত অন্যান্য বিষয়গুলি গৌণভাবে ইহার আলোচ্য। ইহার প্রয়োজন—মুক্তি বা সংসার নিবৃত্তি এবং সম্বন্ধ প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক। অবশ্য শাস্ত্র ব্রহ্মকে নেতিমুখে প্রতিপাদন করে। কারণ ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচরম্। ইহাই সংক্ষেপে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের পরিচয়। এক্ষণে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ব্রহ্মই সকলের আত্মাস্বরূপ এবং নিজের আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কেহ সন্দেহ করে না, সুতরাং ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ এবং ইহার আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে আচার্য বলেন যে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কী, এ বিষয়ে বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ বলেন দেহই আত্মা, যেমন চার্বাক সম্প্রদায়, কেহ বলে মনই আত্মা ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্মের আলোচনা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে প্রমাণ—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের করণ বা জনক। কি কি উপায়ের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়? শঙ্করের মতে প্রমাণ ৩টী—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। পরবর্তী আচার্যগণ এই তিনটী বিশ্লেষণ করিয়া আবার ছয়টী প্রমাণের নাম করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। পূর্ব মীমাংসকদিগের মতে কেবল শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, কারণ ধর্ম-জিজ্ঞাসা কর্মের যে অতীন্দ্রিয় ফলের বিষয় আদেশ করে তাহা অনুমানের বা প্রত্যক্ষের বহির্ভূত। যাহা হউক এক্ষণে আচার্য কথিত তিনটী প্রমাণের বিষয় আলোচনা করা যাক্। শব্দ প্রমাণ অর্থে শ্রুতি এবং শ্রুতি অনুকূল স্মৃতিসমূহ। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই শ্রুতি বা বেদ বিষয়াতীত প্রত্যগাত্মস্বরূপ ব্রহ্মের প্রমাণ কি প্রকারে হইতে পারে? (অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ)? তদুত্তরে শঙ্কর বলেন অবিদ্যা-কল্পিত যে ভ্রম একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মকে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্নাকারে প্রদর্শন করিতেছে তাহার উচ্ছেদ সাধনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ প্রকাশ শাস্ত্রদ্বারা হইতে পারে না (অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তি পরত্বাৎ শাস্ত্রস্য, নহি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্মপ্রতিপিপাদয়িষতি। কিং তর্হি! প্রত্যগাত্মত্বেন অবিষয়তয়া প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদম্

অপনয়তি) (শ, ভা, ১,১,৪)। শঙ্করের মতে এই শ্রুতি বা বেদ অনাদি এবং অপৌরুষেয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ আচার্য শঙ্কর কি অর্থে ব্যবহার করিতেছেন ? কখন কখন তিনি শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন (১,৩,২৮ শ, ভা) কারণ শ্রুতি ঋষিদিগের অনুভব বা প্রত্যক্ষের সমষ্টি মাত্র। বাস্তবিক যে সত্তা ইন্দ্রিয়াতীত তাহা কি প্রকারে প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য হইতে পারে ? অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের যে বিশেষ অর্থ অনুভব তাহাই আচার্য গ্রহণ করিয়াছেন (শ, ভা, ১,৪,১৪)। এই বিশেষ অর্থে প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ বলিতে পারা যায়। এই অপরোক্ষানুভূতি কি ? ইহা অনুভবের অবস্থাবিশেষ—যে অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান ইহাদের কোন ভিন্নতা থাকে না। এই অবস্থাকেই সম্যগ্‌দর্শন বলা যাইতে পারে (শ, ভা, ১,৩,১৩)। নতুবা দেশকালাতীত পূর্ণসত্তাব্রহ্মকে মনের বৃত্তির দ্বারা জানা অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাধারণ অর্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, প্রত্যক্ষ অর্থে শ্রুতি বা ঋষিদের সম্যগ্‌দর্শন।

পরিশেষে দেখা যাক্ অনুমানের স্থান বেদান্ত দর্শনে কতখানি। সম্যগ্‌দর্শনকে অনুমান যতখানি সাহায্য করে ইহার উপকারিতা ততটুকু মাত্র (শ, ভা, ২,১,৬ , ২,১,১১)। অনুমানকে ব্রহ্মজ্ঞানের যে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না, তাহা আচার্য ২,১,১১ সূত্রের ভাষ্যে বিশদভাবেই দেখাইয়াছেন। কারণ অনুমানের কোন অঙ্কুশই নাই। যদি ন্যায়ের অবয়বগুলি স্বতঃসিদ্ধ না হয়, তবে সিদ্ধান্তের কোন স্থিরভিত্তি থাকিতে পারে না। একব্যক্তি যে যুক্তিপ্রদর্শন করিল, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার খণ্ডন করিতে সমর্থ।

এইরূপে বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আচার্য যে তিনটী প্রমাণের বিষয় বলিয়াছেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র নহে এবং শ্রুতিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। স্মৃতিকেও স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহা শ্রুতি প্রতিকূল হইলে গ্রাহ্য হইবে না (শ, ভা, ২,১,১)

কিন্তু এখানে একটী বিষয় বলার প্রয়োজন। শঙ্কর যখন বিরুদ্ধমতাবলম্বী অন্যান্য আস্তিক দর্শনের মতবাদ খণ্ডনে প্রবৃত্ত তখন তিনি অবশ্য শ্রুতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ উভয় পক্ষেরই তাহা গ্রহণীয়। কিন্তু যখন তিনি বৌদ্ধ, জৈনপ্রমুখ নাস্তিক দর্শনের মতবাদ খণ্ডনে প্রবৃত্ত তখন যুক্তি বা অনুমানকেই তিনি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমুদয়ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুমানের স্বতন্ত্র স্থান আছে।

প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় শঙ্কর সূত্রকারকেই (বাদরায়ণ) অনুগমন করিয়াছেন, কারণ সূত্রকারের মতেও প্রমাণ দুইটী—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। প্রত্যক্ষকে শ্রুতি অর্থে এবং অনুমানকে স্মৃতি অর্থে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন অনুমান প্রত্যক্ষের অনুকূল হওয়া আবশ্যক, স্মৃতিও তদ্রূপ শ্রুতিরই অনুকূল হওয়া চাই। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে শ্রুতিই একমাত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ।

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম

স্বামী অক্ষরানন্দ

ইংরেজীতে একটা কথা আছে Light comes from the East (Ex Orient Lux) অর্থাৎ প্রাচ্যদেশ হইতেই জ্ঞানের বা ধর্মের আলোক সম্পাত হয়। পৃথিবীর যত বিভিন্ন ধর্ম আছে সেগুলি প্রায় সমস্তই প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্মকে আমরা ১২টী ভাগে ভাগ করিতে পারি। মানব জাতির তিনটী প্রাচীনতম শাখা হইতে এই ধর্মগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। সেই ৩টী শাখা (১) আর্যজাতি (২) মঙ্গোলীয় জাতি (৩) সেমিটিক জাতি। কি প্রকারে এই ধর্মগুলি উদ্ভূত হইল তাহা নিম্নের তালিকায় দেখান হইতেছে।
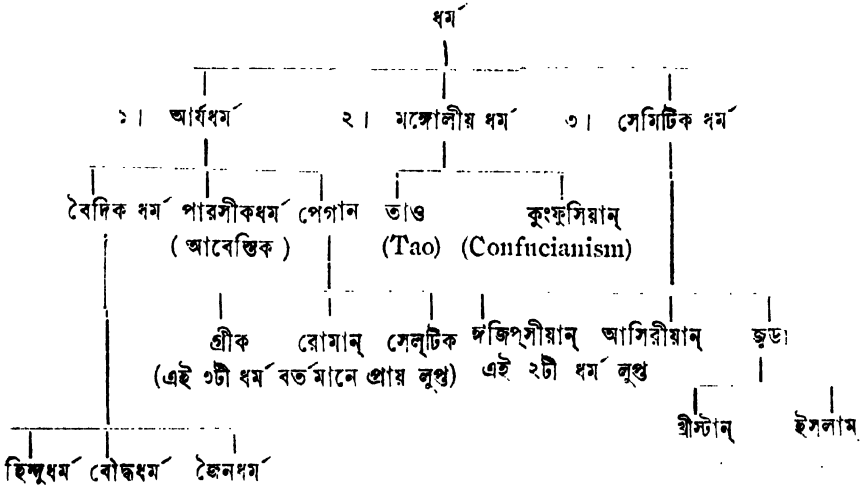
উপরিলিখিত বিভাগের মধ্যে ৩টী প্রাচীন ধর্ম—(ক) পেগান্ (যাহা আর্যধর্মেরই ১টী শাখা ছিল ও প্রাচীন গ্রীক্, রোম ও সেল্‌টিক জাতিদের ধর্ম ছিল) (খ) ঈজিপ্সীয়ান্ (যাহা সেমিটিক ধর্মের ১টী শাখা ও প্রাচীন মিসর জাতির ধর্ম ছিল) এবং (গ) আসিরীয়ান্ ধর্ম (ইহাও সেমিটিক্ ধর্মের ১টী শাখা ও আসিরীয়াবাসীদিগের ধর্ম ছিল) লুপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৯টী প্রধান ধর্ম পৃথিবীতে আছে—(১) হিন্দুধর্ম (২) বৌদ্ধধর্ম (৩) জৈনধর্ম (৪)

পারসীক ধর্ম (৫) তাও ধর্ম (৬) কুংফুসিয়ান্ ধর্ম (৭) জুডা ধর্ম (৮) খ্রীস্টান্ ধর্ম (৯) ইস্লাম্ ধর্ম।

এই ৯টী প্রধান ধর্মের মধ্যে ৪টী আর্যজাতির ধর্ম, ২টী মঙ্গোলীয় জাতির ধর্ম এবং ৩টী সেমিটিক জাতি হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রন্থ, লেখমালা ও শিল্প-স্থাপত্যাদি হইতে যে ৫টী ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের বিষয় কতক জানা যায়। বাকী ৯টী ধর্মের উদ্ভব স্থান ও বিভাগ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইতেছে।

১। হিন্দুধর্ম—এই নামকরণটী যদিও প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু ইহা ঠিক নহে। 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিয়া বৈদেশিকগণ সিন্ধু প্রদেশবাসীদের ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিত। বৈদিক ধর্মের বা আর্য ধর্মের অন্যান্য শাখা হইতে পৃথক করিয়া ইহাকে 'সনাতন ধর্ম' বলাই সঙ্গত। যদিও বৈদিক ধর্ম হইতেই এই ধর্ম উত্থিত কিন্তু বর্তমানে ইহাতে স্মৃতি শাস্ত্রেরই প্রাধান্য আছে। সুতরাং বর্তমান হিন্দুধর্ম ৩।৪ হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী নহে। এই ধর্ম ভারতের নিজস্ব ও মাত্র বর্তমান যুগে ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইতেছে। মধ্যযুগে ও বর্তমান যুগে ইহার বহু শাখা-প্রশাখা হইয়াছে। নিম্নে তাহার ১টী ক্রম-তালিকা দেওয়া হইল—
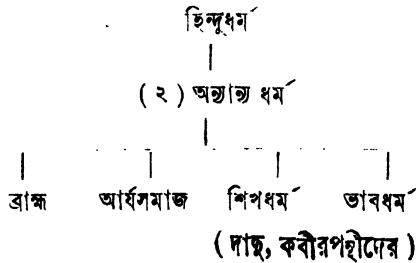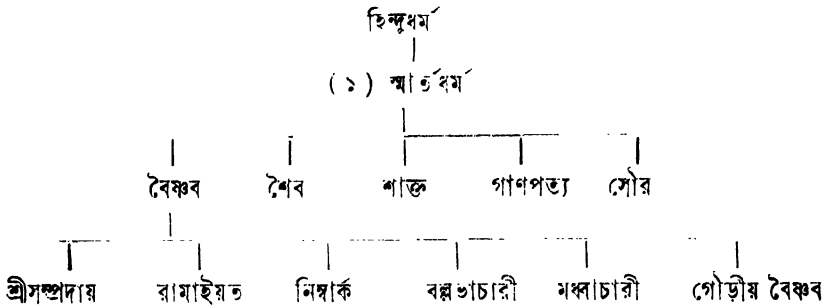
স্মার্তধর্মের অন্য ৪টী শাখারও কয়েকটী করিয়া উপশাখা আছে। অন্যান্য ধর্মের

অন্তর্গত ধর্মগুলি মধ্য ও আধুনিক যুগের। বর্তমানে প্রায় ২৫ কোটী লোক হিন্দুধর্মের অন্তর্গত।

২। বৌদ্ধ ধর্ম—শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রথম কাশীর নিকটস্থ সারনাথে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে প্রচার করেন। পরে মহারাজ অশোক ইহাকে জাগতিক ধর্মে পরিণত করেন। এক্ষণে ভারত, চীন, জাপান, মালয় উপত্যকা, সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে এই ধর্মের প্রায় ১২ কোটী লোক আছেন। ইহার ২টী সম্প্রদায়—হীনযান ও মহাযান। আর ইহা ৪টী দার্শনিক মতে বিভক্ত—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক। বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্মেরই ভাবগুলি প্রচার করে, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না।

৩। জৈনধর্ম—এই ধর্মের মতে ২৪ জন তীর্থঙ্কর বা জিন ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর। মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আর তিনিই এই ধর্মের বিশেষ প্রচার করেন। জৈনদের মতে এই ধর্ম সনাতন এবং ইঁহারা পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করদিগের কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগের মধ্যে ধরেন। ইহার ২টী সম্প্রদায়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। বর্তমানে প্রায় ভারতের ১৫ লক্ষের উপর লোক জৈনধর্মাবলম্বী। ইহা বৈদিক ধর্মেরই প্রকারান্তর।

৪। পারসীক বা আবেস্তিক ধর্ম—এই ধর্মের প্রবর্তক জরাথুস্ত্র গোঁড়াবৈদিক ধর্মাবলম্বীদের সহিত কলহ বশতঃ প্রথমে আদিম বাসভূমি সপ্তসিন্ধু (উত্তর ভারত) ত্যাগ করিয়া পারস্য বা ইরাণদেশে বহুশিষ্যসমেত গমন করেন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখান হইতে বহুদূরদেশে যেমন গ্রীস, ইতালী প্রভৃতি, এই ধর্ম প্রচারিত হয়। ৪র্থ খৃঃ অব্দের প্রথমে ইহা রোমের রাজধর্মে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে প্রায় ১২ শত বৎসর পূর্বে এই ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ পুনরায় পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বর্তমানে পারস্যে মাত্র ১০ হাজার লোক এই ধর্মাবলম্বী ও ভারতে প্রায় ১ লক্ষ লোক এই ধর্মাবলম্বী।

৫-৬। তাও এবং কুংফুসিয়ান্ ধর্ম—তাও (Tao) ও কংফুসিয়ান্ নামক ২ জন ধর্মপ্রবর্তক বুদ্ধের কিছুপূর্বে চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার করেন। এই ২টী ধর্ম বৌদ্ধ-ধর্মেরই ন্যায় নৈতিক ধর্ম, কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্মের ন্যায় দার্শনিকতত্ত্ব ইহাতে বিশেষ নাই। বর্তমানে চীনদেশে প্রায় ৩০ কোটী লোক এই দুইটী ধর্মের অন্তর্গত। আবার ইহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী।

৭। জুডাধর্ম—প্রাচীন ইহুদীজাতিদের ধর্ম ও Old Testament (বাইবেলের প্রথমাংশ) ইহার ধর্মগ্রন্থ। মুসা (Moses) এই ধর্মের একজন বিশিষ্ট প্রবর্তক। প্রায় ১৪ কোটী লোক এই ধর্মাবলম্বী; কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই এখন আদিম বাসস্থান প্যালেষ্টাইন্ হইতে বিতাড়িত।

৮। খ্রীস্টান্ ধর্ম—এই ধর্ম বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত। প্রায় ৫৩½ কোটী লোক এই ধর্মাবলম্বী। ইহার ২টী প্রধান শাখা—রোমান্ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। ইহাদের আবার কয়েকটী প্রশাখা আছে।

৯। ইস্‌লাম ধর্ম—বর্তমানে ভারতবর্ষ, পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্থান, ও উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে এই ধর্ম বিশেষ প্রচলিত। এবং প্রায় ১৭½ কোটী লোক এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ২টী প্রধান সম্প্রদায়—সিয়া ও সুন্নি। আর সর্বসমেত ৪০টী বিভিন্ন শাখা আছে (Encylopædia of Religion and Ethics Vol 10. দেখুন)। উত্তর আফ্রিকায় এক নিম্নশ্রেণীর জাতি ছিল, তাহাদের ধর্মের নাম ছিল শামন্ (Shamanism)। উহারা সকলেই এখন এই ইস্‌লামধর্মাবলম্বী। এতদ্ব্যতীত সেমিটিকজাতির ২টী প্রাচীন ধর্ম—ঈজীপসীয় ও এসিরীয়, যাহা বর্তমানে লুপ্ত, তাহাদের অন্তর্গত মানব জাতি এখন এই ধর্মাবলম্বী। এই ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ প্রায় ১২ শত বৎসর পূর্বে আরবদেশে জন্ম গ্রহণ করেন ও এই ধর্ম প্রচার করেন।

বৈদিক ধর্মের যে একটী শাখা ছিল পেগান ধর্ম, তাহার অন্তর্গত মানবজাতি বর্তমানে খ্রীস্টান্‌ধর্মাবলম্বী।

আরও ২। ১টী প্রাচীনতম ধর্ম ছিল, যেমন জাপানের সিণ্টোধর্ম, আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকোর "কোয়েজাল্‌কোল্" (Quetzalcoalt) ধর্ম প্রভৃতি।

দেবী দুর্গা

অধ্যাপক **শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ**

(২)

আমাদের বঙ্গদেশে যে দুর্গাপূজা চলিতেছে, এই ক্রম, পদ্ধতি বা ধারার কারণ কি? বেশ ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, তাহা শক্তিতত্ত্ব। শক্তি কি তাহার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। তবে এই শক্তি বলিলে কোন দেবের প্রভাব বোঝায়; বিশেষতঃ বিষ্ণু বা শিবের। এই শক্তি তাঁর অর্ধাঙ্গ, এই শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি। কয়েকখানি পুরাণে পূর্বেই ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছিল, তবে তন্ত্রে তাহাকে একেবারে পরোক্ষ করিয়া তুলিয়াছে সাধারণের বিশেষ পরিচিত শক্তি—পার্বতী, ভবানী বা দুর্গা; শাক্তরা বেশীরভাগ ইঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

শাক্তধর্ম সনাতন হিন্দুধর্মের একটী বিশেষ শাখা। আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, অতি প্রাচীনকালে এদেশে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-নাম কেমন করিয়া আসিল, তাহা এক ঐতিহাসিক সমস্যা, সে সমস্যা পূরণের বরাত পণ্ডিতদের উপর রহিল। যে ভাষা হইতেই হিন্দু-নাম আসুক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বৈদিকধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতবর্ষের আদিধর্মই হউক বা অন্যস্থান হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াই থাকুক, অতীব সুপ্রাচীনকালে এই ধর্ম ভারতবর্ষে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম এই বৈদিকধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বন্যজাতীয়দিগের মধ্যে সর্বসজীবত্ববাদ প্রচলিত ছিল। অনেকের অনুমান এই ধর্ম ভারতবর্ষের আদিম ধর্ম। অনেকের অনুমান বৈদিকধর্ম আর্যজাতির ধর্ম, এবং আর্যজাতীয় মনুষ্যেরা এক সময় ভারতের বহির্ভাগ হইতে এদেশে উপনীত হইয়া এদেশের আদিম অধিবাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম আর্য ও আদিম জাতির মিশ্রিতধর্ম। সে কথা যাক। তবে খাঁটি বৈদিকধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য ধরিয়া হিন্দুধর্ম হইতে খাঁটি বৈদিকধর্মকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। আমরা এখন হিন্দুধর্মকে যে আকারে পাই তাহা অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র ভারতে সুবিস্তৃত। শক্তি-উপাসনা ইহার একটী শাখা। হিন্দু-ধর্মের যতগুলি শাখা-প্রশাখা আছে, তাহাদিগের মূলানুসন্ধান করিলে প্রাচীন বেদে তাহা-দিগের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। সকল হিন্দুর পক্ষেই বেদ অতি পবিত্র জিনিস। বেদের দোহাই না দিয়া হিন্দুর কোন শাস্ত্রকেই রক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা বেদ-বহির্ভূত। শক্তি-উপাসনার বীজ বেদে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রচলিত শাক্তমতে বেদ-বহির্ভূত অনেক ধর্মমত মিশিয়া আছে। কোন কিছু উৎপন্ন হইতে গেলে, তাহা বহুস্থান হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া উৎপন্ন হয়। বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজভূত

অবস্থা স্থূলদৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। বস্তু যখন বৃহদাকার ধারণ করে, তখনই তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রচলিত হিন্দুধর্ম অব্যক্তাকারে কি ছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না। এখন ইহা প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া, বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বৃক্ষের বীজ বেদরূপ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাকে আর্যধর্ম-বহির্ভূত তৎকালে প্রচলিত আদিমজাতির ধর্ম হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে যে না হইয়াছে তাহা নয়। পরে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহা বিপুলকায় ও বহু অবয়ব-সম্পন্ন হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দুধর্মের পরিপুষ্টির জন্য যতকাল যে ধর্মভাবের অস্তিত্বের প্রয়োজন হইয়াছে, ততকাল সেই ধর্মভাব ভারত হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। দেখা যায় যতকাল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কলেবর পরিপুষ্টির জন্য বৌদ্ধধর্ম হইতে উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে, ততকাল বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

সকলেই অনুমান করেন ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদে স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল না। শক্তি উপাসকেরা শিবপত্নীরূপিণী দেবী, দুর্গা এবং কালী প্রভৃতির উপাসক; সুতরাং শক্তি উপাসনা স্ত্রীদেবতার উপাসনা। এইদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ঋগ্বেদে প্রচলিত শাক্তমতের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিষ্ণুর ও রুদ্রের নাম ঋগ্বেদেও আছে। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রই ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ছিলেন, বিষ্ণু ও রুদ্রের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। ঋগ্বেদের রুদ্র ভবিষ্যতে যখন শিবাকারে পূজিত হন, তখন তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সবিশেষ প্রাধান্য থাকিলেও পূজিতা দেবীরূপে ইন্দ্রাণী ও ব্রহ্মাণীর কখনও প্রাধান্য হয় নাই। ইহার কারণ কি? পরবর্তী উত্তরকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পূজাই শিথিল হইয়া পড়িল কেন? ইহার এক কারণ এ দেশের আদিম জাতিদের ভাবের সংঘর্ষ। শিব ব্রাত্য-দিগের দেবতা, তিনি ভূতপ্রেত নাচাইয়া শ্মশানে মশানে ফিরিতেন। আর্যজাতি যখন ব্রাত্য-দিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে থাকিলেন, তখন তাঁহারা ব্রাত্যদিগের শিবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের বৈদিক দেব রুদ্রের শিবের সহিত সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহারা তাঁহাদের রুদ্রকে শিবে পরিণত করিলেন। সুতরাং বৈদিক-যুগের শেষাশেষি শিবমূর্তি বৈদিক রুদ্র, ইন্দ্র ও ব্রহ্মাকে অতিক্রম করিলেন। ব্রাত্যদিগের শিব আর্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হইলেন ও আর্যসুলভ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেন। ফলে ক্রমশঃ শৈবসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। মানব-মন জগৎ সম্বন্ধে যত প্রকার ধারণায় উপনীত হইতে পারে, শৈবমতে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যে অনির্বচনীয় ও অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সমগ্র বিশ্ব নিয়মিত, তাহা শৈবশক্তি। সেই শক্তিতে একদিকে যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়, তেমনই আর একদিকে সেই শক্তি বিনাশক্ষম। সৃষ্টি এবং বিনাশ দুই পৃথক্ ব্যাপার নহে। কার্যের সহিত যেমন কারণের সম্বন্ধ, তেমনই সৃষ্টির সহিত বিনাশের ও বিনাশের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ।

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আসঙ্গলিপ্সা জীবজন্মের কারণ। ইহাই সৃষ্টির প্রবর্তক। এই লিপ্সা জীবজগতে চিরকাল আছে, ইহার আরম্ভও নাই শেষও নাই। আসঙ্গলিপ্সার ফলে

জীবের জন্ম হয়, কিন্তু জীবের পরিপোষণের জন্যও প্রকৃতিতে বিস্ময়জনক বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। অতি নিকৃষ্ট জীবকেও তাহার সন্তান পরিপালনের জন্য যত্ন করিতে ও কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। নিকৃষ্ট জীবকে স্নেহমমতা কে শিখাইল? কৌশল কে শিখাইল? স্নেহমমতা যেন প্রকৃতিরই কৌশল—জীবের পরিপালন ও রক্ষার জন্য অদ্ভুত কৌশল। যে শক্তি সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিই বিনাশ করেন, সেই শক্তি স্নেহে সৃষ্টি করিয়া ক্রোধে বিনাশ করে না। তাহার স্নেহও নাই, ক্রোধও নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্বংসের মূর্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন না। ধ্বংস সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা জগতে সৃষ্টিও দেখেন না, বিনাশও দেখেন না। সৃষ্টি ও বিনাশ গতিশীল জগতের গতির সহায়তা করে মাত্র। ইহারা জাগতিক গতিকে রক্ষা করে। ডিম্বের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ডিম্বের নাশে পক্ষীর জন্ম হয়। তেমনই ভ্রূণের বিনাশে শিশুর জন্ম হয়। আবার শৈশবের নাশে মানবত্ব। জগতে একটীর নাশ আর একটীর উদ্ভবের কারণ। তত্ত্বদর্শীরা বলেন, মৃত্যু একটী পরিবর্তন মাত্র। জগৎ পরিবর্তনশীল, জগৎ বিনাশশীল নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক চিন্ময়ী শক্তির লীলা। বিশ্বের গতি ও উন্নতি বিধানের জন্য জন্মের যেরূপ আবশ্যকতা মৃত্যুরও সেইরূপ আবশ্যকতা।

যে শক্তি জগতের মূলে থাকিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্যে সহায়তা করিতেছে তাহা শৈবশক্তি। শক্তি-উপাসকেরা এই শিবশক্তিকে দুর্গা, কালী, মহাদেবী প্রভৃতি মূর্তিতে পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দেবী ভীষণ মূর্তিতে পূজিতা হন। তিনি জীব-শোণিতে পরিতুষ্টা। শিবমন্দিরে, শক্তি-পূজা, শিব-পূজার অঙ্গ হইলেও শিবেরই সেখানে প্রাধান্য। কিন্তু শক্তিপূজক শিব-শক্তিরই উপাসক। দেবী-উপাসনা ভারতীয় অনেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের অঙ্গ, কিন্তু শৈব সম্প্রদায়ের সহিত ইহা বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

শৈব-শক্তি সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণা সুগভীর দার্শনিক আলোচনার ফল; কিন্তু শৈব ও শাক্তেরা একেবারেই এই সমুচ্চ ধারণায় উপনীত হইতে পারে নাই। শক্তি সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণায় উপনীত হইতে বহুকাল লাগিয়াছে।

যজুর্বেদে অম্বিকাদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি রুদ্রের সহিত একত্র থাকিতেন। কিন্তু যজুর্বেদে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নহেন। ইনি রুদ্রের ভগিনী। সমধিক প্রাচীন যুগে এই অম্বিকার পর্বতের সহিত সংস্রব ছিল। এই অম্বিকাকে ক্রমশঃ আমরা পার্বতী নামে অভিহিতা হইতে দেখি, এবং ইনিই পরে উমা ও হৈমবতী নামে অভিহিতা হন। হিমালয়ের শিখর-বিশেষ কোন সময়ে দেবীরূপে পূজিত হইত, এবং এই দেবীই, হৈমবতী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনিই হিমালয়ের শিখররূপে পর্বত-কন্যা, সুতরাং ইনি পার্বতী। পুরাণোল্লিখিত উমা হিমালয়-কন্যা, তিনি এবং হৈমবতীও পার্বতী নামে অভিহিতা। দেখা যাইতেছে অথর্ব-বেদে রুদ্র ঠিক শিবে পরিণত হন নাই, অম্বিকা তাঁহার সহচারিণী ভগিনীমাত্র ছিলেন। কিন্তু এই অম্বিকাই, পার্বতী, হৈমবতী ও উমা আখ্যাপ্রাপ্ত হন।

শক্তি-উপাসকেরা শিব-শক্তির উপাসক। শক্তি মূর্তিমতী হইয়া দেবীরূপে প্রকাশময়ী।

শিব ও শক্তি স্বতন্ত্রভাবে চিন্তিত হইলেও স্বরূপতঃ এক। যিনি পরমাত্মা—পরমপুরুষ, তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট। তাঁহার সকল চেষ্টা দেবী-রূপিণী শক্তির সাহায্যে। শাক্তদিগের শক্তিকে মায়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, জগতের উদ্ভব মায়া হইতে। কিন্তু বৈদান্তিকের মায়া ও শাক্তের শক্তিতে প্রভেদ আছে। বৈদান্তিক মায়া হইতে সরিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু শাক্ত শক্তির উপাসক। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতির সহিত শাক্তের শক্তির সাদৃশ্য আছে। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্ত্রী, আত্মা পুরুষ। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতি চেষ্টাশীলা। প্রকৃতি পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং কর্মই পুরুষের দুঃখের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃতি একদিকে যেমন পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া পুরুষের দুঃখময় সংসার সৃষ্টি করে, আর একদিকে তেমনই প্রকৃতিই পুরুষের মুক্তির কারণ হয়। সাংখ্য-দর্শন যে দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখিয়া থাকেন, শাক্তেরা ঠিক সেই দৃষ্টিতে শক্তিকে দেখেন না। শাক্তেরা শক্তির পূজা করিয়া থাকেন। শক্তির সাধনা করিয়া থাকেন। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং শক্তি, মায়া ও প্রকৃতির পরস্পর সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলেও, শক্তি, মায়া ও প্রকৃতি ঠিক এক জিনিস নয়।

কিন্তু শাক্ত, বৈদান্তিক ও সাংখ্যেরা বিভিন্ন পথাবলম্বী হইলেও সকলেরই লক্ষ্য এক। হিন্দুরা সংসার ও জীবনকে দুঃখময় জানিয়া সংসার ও জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। তাঁহারা বস্তুতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে চান না, দুঃখ-নিবৃত্তিই তাঁহাদিগের লক্ষ্য।

বৈদান্তিক বলেন, ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই—জগৎ মায়া। শাক্ত বলেন, শক্তি ও শিবে প্রভেদ নাই, শক্তিই শিব, শক্তিই ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম, পরাৎপরা। শক্তি-সাধনার দ্বারা মানুষ শক্তিমান্ হইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে মুক্তও হইতে পারে।

সাংখ্যের সহিত শক্তি-তত্ত্বের সাদৃশ্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষ ও শাক্তের শিব, ক্রমান্বয়ে প্রকৃতি ও শক্তির সহকারিতা ব্যতীত সকল কার্যে অপ্রবৃত্ত, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। অদ্বৈতবাদ ও শক্তিতত্ত্বে সাদৃশ্য এই যে, উভয় তত্ত্বেই ব্রহ্মসত্তায় বিমুক্তি। শাক্তের শিব, অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম। অধিকন্তু শাক্ত দেখেন শক্তিই শিবের সর্বস্ব, শক্তিকে বাদ দিলে শিবের কিছু থাকে না।

কাজেই শাক্ত শক্তিরই উপাসক হইয়া পড়েন। শাক্তের কাছে শক্তিরই প্রাধান্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর কাছে ব্রহ্মেরই প্রাধান্য। অদ্বৈতবাদী মায়া হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। অদ্বৈতবাদীর মতে মায়া হইতে অব্যাহতি পাইলে ব্রহ্মে নির্বাণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু শাক্ত শক্তিকেই অবলম্বন করিয়া পরম পুরুষার্থসিদ্ধির প্রত্যাশী।

তন্ত্রই শাক্তদিগের প্রধান শাস্ত্র। তন্ত্র সংখ্যায় বহু। তন্মধ্যে মহানির্বাণ, সারদাতিলক, যোগিনী, কুলার্ণব এবং রুদ্রযামলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্ত্র আগম ও নিগমভেদে দুই প্রকার। আগমে শক্তির প্রতি শিবের উক্তি, ও নিগমে শিবের প্রতি শক্তির উক্তি নিবদ্ধ আছে। আর এক-প্রকার তন্ত্র আছে, তাহাকে প্রপঞ্চসার তন্ত্র বলে। প্রপঞ্চসার তন্ত্র নারায়ণের প্রত্যাদেশ বলিয়া উক্ত হয়। এ ছাড়া বৌদ্ধ তন্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্রও আছে।

শাক্ততন্ত্রমতে, শক্তি বিশ্বব্যাপিনী। বিশ্ব বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড ও মানব-শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। মানব-শরীরে শক্তি কুণ্ডলিনী-রূপে বিরাজিতা। সাধনার একটী অঙ্গ এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা। শব্দ মধ্যেও কুণ্ডলিনী অবস্থিতা। শব্দ মন্ত্ররূপে বিধিপূর্বক উচ্চারিত হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন।

তন্ত্রে শরীরকে (এক বিশেষভাবে) কতকগুলি স্নায়বিক কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রসকল ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম প্রণালীসকল সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সকল প্রণালী শক্তির গতি-পথ।

তন্ত্রমতে সিদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ। কিন্তু তন্ত্র-সাধনায় গুরুর প্রয়োজন। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা অসম্ভব। তন্ত্রমতে সকল মানুষ সমান নয়। মানুষের প্রকৃতিবিশেষে অনুষ্ঠানবিশেষের উপযোগিতা তান্ত্রিকদিগের দ্বারা স্বীকৃত। তন্ত্রমতে মানুষের ভিতর প্রধানতঃ পশু, বীর ও দৈব বা দিব্য এই তিনটী ভাব দৃষ্ট হয়। এই তিনটী ভাব ক্রমান্বয়ে যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে প্রতিফলিত হয়। তন্ত্রমতে অ-তান্ত্রিকেরা পশুভাবাপন্ন, সাধারণ তান্ত্রিকেরা বীরভাবাপন্ন ও প্রধান তান্ত্রিকেরা দিব্য ভাবাপন্ন। মানুষের এই ত্রিভাব তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব, এই ত্রিগুণের সহিত সম্পর্কিত। সাধারণতঃ, তান্ত্রিকদিগকে দক্ষিণাচারী ও বামচারী এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু শাক্তেরা এই বিভাগকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। কারণ দক্ষিণাচারীরা বামাচার-অবলম্বী না হইলেও বামাচারীদিগের আচারের বিরুদ্ধবাদী নহেন। শাক্তদিগের মতে সাধনা সপ্তস্তরে বিভক্ত। বৈদিক, বৈষ্ণব ও শৈব, এই তিনটী নিম্নস্তরের সাধনা। দক্ষিণাচারীর সাধনা এক অপূর্ব সাধনা। এই সাধনায় দেবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়। এই চারি প্রকার সাধনাকে প্রবৃত্তিদায়িকা সাধনা বলা হয়। আরও তিন প্রকার প্রয়োজন হয়। সে তিন প্রকারের সাধনা নিবৃত্তিদায়িকা। শেষোক্ত সাধনার জন্য বিশেষ দীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু শাক্তমতে প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তির সাধনা করিতে হয়। বামাচার পঞ্চম সাধনা, ইহাকে পঞ্চমকার সাধনা কহে। ষষ্ঠ সাধনা সিদ্ধান্তাচার, এই সাধনায় ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি-পথে আসিতে হয়। সপ্তম সাধনা কৌলাচার। এই সাধনায় সাধনার উৎকর্ষ সাধিত হয়। কৌলসাধক সাম্প্রদায়িক ভাব অতিক্রম করেন, তিনি কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন।

দুর্গামূর্তি

আমাদের শাস্ত্রে দুর্গাদেবীর মূর্তির নানারূপ বর্ণনা আছে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় মন্দিরসমূহে বহুপ্রকারের দুর্গামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্গার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে হইলে বেদেই খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে দুর্গার উৎপত্তির কথা আছে। দুর্গার পূর্ণ পরিণতির ব্যাপারের সন্ধান পুরাণে ও তন্ত্রে লইতে হইবে।

ঋগ্বেদের খিল সূক্তে সর্বপ্রথম আমরা দেবীর কথা পাই। ইহাতে দুইটী সূক্ত আছে--- দেবী-সূক্ত ও রাত্রি-সূক্ত। প্রাচীন আচার্যগণ দেবীসূক্ত বলিলে দুর্গা-সূক্তই বুঝিতেন। রাত্রি-

সূক্তে দুর্গার স্তুতি আছে। খিলসূক্তে রাত্রিদেবীই দুর্গার নামান্তর। ঋগ্বিধান ব্রাহ্মণে (৪. ১৯) রাত্রিসূক্ত উচ্চারণ করিবার উপদেশ আছে। রাত্রিদেবী ও দুর্গা অভিন্না। রাত্রিসূক্তে (ঋক্-খিল•---১.২৭.৫) সুস্পষ্টভাবে দুর্গার উল্লেখ আছে---

"স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং
শরণ্যং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে
সুনবাম সোমম্।"
'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ।'

প্রাচ্য শাস্ত্রজ্ঞ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই বচনটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান। কিন্তু ইহা যে প্রক্ষিপ্ত নয় তাহা তাঁহারাই অন্যত্র প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যককে এই পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। ইহার কোনও অংশই যে প্রক্ষিপ্ত নয় তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। কিন্তু এই আরণ্যকে (১০.২১) এই সূক্তটী পূরাপূরি উদ্গাত হইয়াছে। তারপর মহানারায়ণ উপনিষদের বচনগুলি যে খাঁটি উপনিষদ্‌বচন তাহাও কেহই অস্বীকার করেন না। কেহ কোনদিন এ সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশও করেন নাই। এই মহানারায়ণ উপনিষদেও (৬. ৩) ঐ বচনটী সম্পূর্ণ স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু এই দুটী থেকে আমরা দুর্গামূর্তি কি রকম ছিল তাহার কোন ধারণাই করিতে পারি না।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক দুর্গাদেবীর একটী গায়ত্রী উপদেশ করিয়াছেন। সেটী এই---

কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্য-
কুমারীং ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃপ্রচোদয়াৎ।

—১০. ১. ৭

সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে কাত্যায়নী দুর্গার আরাধনার কথা বলিয়াছেন---দুর্গার মূর্তি কনকোজ্জ্বল, তাঁহার ললাটদেশে অর্ধচন্দ্র বিরাজিত। কিন্তু এ ব্যাখ্যার কোন নজির না থাকায় এসম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না।

মহাকাব্যে দুর্গা

রামায়ণে দুর্গামূর্তির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা মহাভারতের বনপর্বে ২৮-৩০শ অধ্যায়ে পাই। ৩০শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করিবার পর দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।

মহাভাগবতে (অধ্যায় ৩৬-৮৪), কালিকাপুরাণ (৬০ অ°) ও দেবীভাগবতে (৩য় সর্গ ২৭-৩০অ°) রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি কিন্তু মহাভারতের বহুপরবর্তী। এগুলি হইতে বৈদিক দুর্গার কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মহাভারতে দুর্গামূর্তি ও পূজার বর্ণনা আছে। যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতি দুর্গার আরাধনা করিয়া ছিলেন তাহারা ও প্রমাণ মহাভারতে আছে। দুর্গোৎসব সে সময়ে প্রচলিত ছিল। যুধিষ্ঠিরের সময়ে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী পূজিতা হইতেন।

দেবী যে দশভুজা, ষোড়শভুজা প্রভৃতি ছিলেন পুরাণে ও তন্ত্রে দেবীর মন্ত্রে তাহা পাওয়া যায়। আমরা দশভুজার পূজা করি। গোপীনাথ রাও, কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রভৃতি মূর্তিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পুরাণ ও তন্ত্রবর্ণিত ধ্যানমূর্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাভারত পাঠকালে দেবীর নানাবিধ মূর্তির আলোচনা করিতে করিতে আমি দেবীর একটী বিশেষ মূর্তির পরিচয় পাই। ১৩ বৎসর পূর্বে আমি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে মূর্তির কথা পূর্বে কেহ উল্লেখ করেন নাই। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে সেই প্রসঙ্গে দুটী কথা বলিব।

ইজিপ্‌টে নবাবিষ্কার

কয়েকবর্ষ পূর্বে ইজিপ্টে এক দেবী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুর্গামূর্তির সঙ্গে তাহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। মূর্তিটী সিংহোপরি দণ্ডায়মানা। এই দেবীর দুই দিকে দুইটী স্ত্রীমূর্তি। দক্ষিণে একটী অতি সুন্দর পুরুষ-মূর্তি। এই মূর্তির চারিদিকে চালচিত্রের অনুরূপ আকৃতি। এই মূর্তিটী দেখিলেই দুর্গামূর্তির কথা মনে আসে। কিন্তু এই মূর্তির মুখখানি ব্যাঘ্রের মুখের অনুরূপ। এই মূর্তির নিম্নদেশে একটী ছোট ক্ষোদিত লিপি আছে। Egyptologistগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন। তাঁহাদের পাঠ অনুসারে মূর্তির নিম্নদেশে যাহা ক্ষোদিত আছে তাহা—"দুগ্‌গম্মা।" দুগ্‌গম্মা সম্ভবতঃ 'দুর্গাম্বা' শব্দের অপভ্রংশ। অম্বা শব্দের অর্থ 'মাতা'। সুতরাং দুর্গাম্বা বলিলে 'দুর্গামাতা' বুঝায়। যদি দুগ্‌গম্মা দুর্গা হন তাহা হইলে স্ত্রীমূর্তি দুইটী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর হওয়া সম্ভব। পুরুষ মূর্তিটী কার্তিকেয়। মূর্তিটী ৪৫০০ পূ-খ্রীস্টাব্দের।

পুরীতে দুর্গা

অনেকেই পুরীতে দুর্গোৎসব দেখিয়া থাকিবেন। আমিও অনেকবার সেখানে দুর্গোৎসব দেখিয়াছি। প্রায় ১৬ বৎসর পূর্বে পুরীতে আমার সম্মুখ দিয়া কয়েকখানি দুর্গামূর্তি বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জনের জন্য যাইতেছিল। সেগুলি আমাদের বাঙলাদেশের মূর্তির মত। কিন্তু আমি তন্মধ্যে তিনখানি মূর্তি দেখিলাম ব্যাঘ্রাননা দুর্গার। পথে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাঘ্রাননা দুর্গা হইবার কারণ কি? কেহই সদুত্তর দিতে পারিল না। শেষে একটী বৃদ্ধ আমাকে বলিল, দেবীর ব্যাঘ্রাননা মূর্তিই আসল মূর্তি। হালে অন্য সব মূর্তির চলন হইয়াছে। তাহারা ছেলেবেলা থেকে ব্যাঘ্রবদনা মূর্তিই দেখিয়া আসিতেছে।

বিন্ধ্যাচলের দুর্গামূর্তি

ফিরিবার মুখে বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী মূর্তিই আমার মনে পড়িল। তাঁহার মূর্তি ভীষণা—তিনিও ভয়ঙ্করী ব্যাঘ্রাননা।

মহাভারতে

ব্যাঘ্রাননা দুর্গার উল্লেখ মহাভারতেও আছে। মহাভারতে অর্জুন কর্তৃক উচ্চারিত দুর্গার স্তব হইতে তাহা জানা যায়। এই স্তবে অর্জুন মন্দারবাসিনী সিদ্ধসেনানীর ধ্যান করিয়াছেন; কুমারী, কালী, কপালী, কপিলা, কৃষ্ণ পিঙ্গলার ধ্যান করিয়াছেন। ভদ্রকালী, মহাকালী, চণ্ডী, চণ্ডা, তারিণী, বৈরোচনী, কাত্যায়নীর ধ্যান করিয়াছেন। আর করিয়াছেন উমা শাকম্ভরীর ধ্যান। সঙ্গে সঙ্গে করিয়াছেন—কৌশিকীর ধ্যান।

"মহিষাসৃকৃপ্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনী। অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেস্তু রণপ্রিয়ে।"

এই শ্লোকটী ভীষ্মপর্বের ২৩শ অধ্যায়ের। কোকশব্দের অর্থ বৃক, ব্যাঘ্র। কোক শব্দের অন্য কোন অর্থ এখানে হয় না। কোক অতি প্রাচীন শব্দ। বেদেও ইহার প্রয়োগ আছে। ঋ° ৭. ১০৪. ২২; অ° ৫. ২৩. ৪ ইত্যাদি মন্ত্রে কোক শব্দ আছে। এই শব্দের বৈদিক অর্থ; অতি ভীষণ জন্তু—ব্যাঘ্র হওয়া অসম্ভব নয়।

তিব্বতে কালীর মত বহু মূর্তি আছে। এই সকল মূর্তির মধ্যে ব্যাঘ্রের মুখওয়ালা মূর্তিও আছে। Foucherএর Iconographic Boudhiqueএ এই রকম মূর্তি আছে। Kangra School-এর চিত্রকলায়ও মহাকালের মূর্তি আছে। মহাকাল এ চিত্রকলায় বিষ্ণু ও শিবের সম্মিলিত মূর্তি। এই মহাকালের মুখ বাঘের। শিব ও দুর্গার সঙ্গে বাঘের কি কোন সম্পর্ক আছে? শিব পরেন—ব্যাঘ্রচর্ম, আর দুর্গা ব্যাঘ্রাননা। সাঁওতাল ও অসভ্যজাতিরা বাঘের পূজা করে। মিরজাপুরে ব্যাঘ্রেশ্বরের পূজা হয়। রাজপুত ও ভীলেরা ব্যাঘ্রের সন্তান বলিয়া দাবী করে।—Crooke, II.211. ব্যাঘ্রবংশের উৎপত্তির কথার সঙ্গে শিবদুর্গার কাহিনী জড়িত আছে। নেপালে বাঘযাত্রা খুব বড় উৎসব।

শিলালিপিতে দুর্গা

৬৮৪ বিক্রমাব্দে বর্মলাটের বসন্তগড় শিলালিপিতে দুর্গার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর ৯৯৭ শকের বনপতের দীর্ঘাসি লিপিতে দুর্গার মন্দিরের উল্লেখ আছে। লিপিটী তেলেগু অক্ষরে খোদা। অনন্তবর্মার সময়ে। দীর্ঘাসি গঞ্জাম জেলার কলিঙ্গপটমের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। দীর্ঘাসি গ্রামের সিমান্তস্থান্তে একটী ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়কে লোকে "দুর্গামাতা" বলে। এখানে মন্দিরের বহু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের কাছে পাথরের দুর্গা, নন্দি ও লিঙ্গও পাওয়া যায়। একটা ছোট গুম্ফা আছে। সেখানে আজও দুর্গামূর্তির পূজা হয়।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

বল্মীক-রহস্য

ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম্. এ., ডি. লিট্. (লণ্ডন)

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,—জেতবনে, অনাথ-পিণ্ডিকের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান্ কুমার কাশ্যপ অন্ধবনে অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর জনৈক অত্যুজ্জ্বল-কান্তি দেবতা নিশীথে সমগ্র অন্ধবন উদ্ভাসিত করিয়া আয়ুষ্মান্ কুমার কাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া ঐ দেবতা আয়ুষ্মান্ কুমারকাশ্যপকে কহিলেন, ভিক্ষু! এই বল্মীক রাত্রে ধূমায়িত এবং দিনে প্রজ্বলিত হয়। ব্রাহ্মণ[১] কহিলেন, সুমেধ[২]! শস্ত্র (খনন-যন্ত্র) লইয়া ইহা খনন কর। সুমেধ তাহা খনন করিয়া দেখিতে পাইল 'লঙ্গি' (পলিঘ)[৩]; 'লঙ্গি' দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটী 'লঙ্গি'। ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! 'লঙ্গি' উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মণ্ডূক[৪]। সুমেধ মণ্ডূক দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটী মণ্ডূক। ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! মণ্ডূক উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল দ্বিধা-পথ[৫]; দ্বিধাপথ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটী দ্বিধাপথ! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! দ্বিধাপথ উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল 'পঙ্কবার' (ক্ষার-পরিস্রাবক); 'পঙ্কবার' দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটী 'পঙ্কবার'! ব্রাহ্মণ কহিলেন সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল কূর্ম[৭]। কূর্ম দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটী কূর্ম। ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর! আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল অসিধারা[৮]; অসিধারা দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে এক অসিধারা! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল মাংসপেশী[৯]; মাংসপেশী দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে এক মাংসপেশী! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ! তাহা উপরে নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্র

১, ২. ব্রাহ্মণ ও সুমেধের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন। ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ আচার্য, সুমেধ মেধাবী শিষ্য।

৩. লঙ্গি বা পলিঘ অর্থে অবিদ্যা।

৪. মণ্ডূক ক্রোধাভিভূত জনের প্রতীক।

৫. দ্বিধাপথ অর্থে দুই দিকে যাইবার রাস্তা, ইহা বিচিকিৎসা বা সংশয়েরই প্রতীক।

৬. পঙ্কবার পঞ্চ নীবরণেরই প্রতীক (প-সূ)।

৭. কূর্ম পঞ্চস্কন্ধেরই প্রতীক (প-সূ)।

৮. অসিধারা বস্তুকাম এবং ক্লেশকামেরই প্রতীক (প-সূ)।

৯. মাংসপেশী নন্দিরাগেরই প্রতীক (প-সূ)।

লইয়া আরও খনন কর। আরও খনন করিয়া সুমেধ দেখিতে পাইল নাগ (গজবর)[১০]; নাগ দেখিয়া কহিল, ভদন্ত! এই যে একটী নাগ! ব্রাহ্মণ কহিলেন, সুমেধ নাগকে যথাস্থানে থাকিতে দাও, নাড়িও না, নাগকে (যথাবিধি) নমস্কার কর। ভিক্ষু! তুমি ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই পঞ্চদশ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ভগবান্ যেভাবে প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করেন তুমি তাহা সেইভাবেই অবধারণ কর। ভিক্ষু! কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, কি দেব-মনুষ্য-সমাজে তথাগত, তথাগত-শ্রাবক, অথবা যিনি ইঁহাদের কাহারও হইতে উত্তর শুনিয়াছেন তিনি ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখি না যিনি এই সকল প্রশ্নের রহস্য বিবৃত করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে পারেন।" সেই দেবতা ইহা বিবৃত করিলেন, ইহা বিবৃত করিয়া তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর আয়ুষ্মান্ কুমারকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট দেবতার সকল কথা যথাযথভাবে নিবেদন করিয়া কহিলেন: "প্রভো! এস্থলে বল্মীক কি, রাত্রে ধূম-উদ্গীরণ কি, দিনে প্রজ্বলন কি, ব্রাহ্মণ কে, সুমেধ কে, শস্ত্র কি, খনন কি, 'লঙ্গি' কি, মণ্ডূক কি, দ্বিধাপথ কি, পঙ্কবার কি, কূর্ম কি, অসিধারা কি, মাংসপেশী কি, নাগই বা কি?

ভগবান্ কহিলেন! ভিক্ষু! এস্থলে বল্মীক চারি মহাভূত-নির্মিত, মাতৃপিতৃ-সম্ভূত, অন্নব্যঞ্জনপুষ্ট, অনিত্য, উৎসাদন-পরিমর্দন-ভেদন-বিধ্বংসনধর্মী এই দেহেরই অধিবচন বা নামান্তর। দিনের কার্য-সম্বন্ধে রাত্রে লোকে বিতর্ক-বিচার করে, ইহাই রাত্রে ধূম-উদ্গীরণ। রাত্রে বিতর্ক-বিচার করিয়া লোকে দিনে কায়বাক্যে কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই দিনে প্রজ্বলন। এস্থলে তথাগত সম্যক্-সম্বুদ্ধই ব্রাহ্মণ। সুমেধ ভিক্ষুরই নাম। শস্ত্র আর্যজনোচিত প্রজ্ঞার অধিবচন। বীর্যারম্ভই খনন। অবিদ্যাই 'লঙ্গি'। সুমেধ! শস্ত্র দ্বারা খনন করিয়া 'লঙ্গি' উত্তোলন কর, অবিদ্যা পরিত্যাগ কর; ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু! এস্থলে মণ্ডূক ক্রোধ এবং নিরাশারই নামান্তর। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া মণ্ডূক উত্তোলন কর, ক্রোধ ও নিরাশা পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এস্থলে দ্বিধাপথ বিচিকিৎসারই নামান্তর। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া দ্বিধাপথ উত্তোলন কর, বিচিকিৎসা পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। পঙ্কবার কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পঞ্চনীবরণেরই নামান্তর। সুমেধ! শস্ত্রদ্বারা খনন করিয়া পঙ্কবার উত্তোলন কর, পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এস্থলে কূর্ম পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধেরই নামান্তর। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান লইয়াই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ। সুমেধ! শস্ত্র খনন করিয়া কূর্ম উত্তোলন কর, পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। অসিধারা পঞ্চকামগুণেরই নামান্তর। পঞ্চকামগুণ, যথা—ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ,

১০. নাগ ক্ষীণাসব অর্হত্তেরই প্রতীক (প-সূ)।

প্রিয়, কামোপসংহিত ও মনোরঞ্জক চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্র-বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয় রস, কায়-বিজ্ঞেয় স্পর্শ। সুমেধ! শস্ত্র দ্বারা খনন করিয়া অসিধারা উত্তোলন কর, পঞ্চকামগুণ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। এখানে মাংসপেশী নন্দিরাগেরই নামান্তর। সুমেধ! মাংসপেশী উত্তোলন কর, নন্দিরাগ পরিত্যাগ কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ। ভিক্ষু এস্থলে নাগ ক্ষীণাসব ভিক্ষুরই নামান্তর, এহেন নাগকে থাকিতে দাও, নাড়িও না, ক্ষীণাসব ভিক্ষুকে নমস্কার কর, ইহাই দেবতার উক্তির অর্থ।

(২)

রাধাতত্ত্ব

অধ্যাপক **শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ**

লীলাই আনন্দের স্বভাব এবং আনন্দই লীলার আস্বাদ্য। মনুষ্য আনন্দ প্রণোদিত হইয়াই ক্রীড়া করে এবং ক্রীড়া করিয়া আনন্দই আস্বাদন করিয়া থাকে। কোনও প্রকার অভাব বোধ হইলে, তাহার পূরণের জন্য স্বতই ইচ্ছা হইয়া থাকে; পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের কোনও প্রকার অভাব নাই; সুতরাং ইচ্ছাও নাই। তিনি নিজেই প্রতিনিয়ত নিজানন্দ আস্বাদন করিতে-ছেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছেন; কিন্তু সে আনন্দ অপরিস্ফুট, লীলা ব্যতীত তাহা পরিস্ফুট হয় না; সেইজন্য তিনি যে অহৈতুক আত্মপ্রেমে আত্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই স্বনিষ্ঠ প্রেমাংশ শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজাংশদ্বারা নিজানন্দ আস্বাদন করেন; ইহাই তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যলীলা এবং ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত প্রেমপ্রধান ভগবদংশই শুদ্ধ জীব অথবা ভগবানের নিত্যলীলাপরিকর। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দঘন, উহাদের রূপও সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন; কিন্তু তাহা প্রেম-প্রধান বলিয়া প্রেমময় এবং ভগবানের আনন্দাস্বাদনী শক্তি বলিয়া প্রেমময়ী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য প্রভৃতি যতপ্রকার প্রেম বিমলানন্দ আস্বাদন করা যায়, ভগবান্ কৃষ্ণ নিজানন্দ পরিস্ফুট করিবার জন্য বা বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিবার জন্য, ঐ ঐ সমস্ত প্রকার প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়া, আবার একাধারে সমুদয় প্রেমও প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ সমুদয় প্রেমের একাধারে নামই 'রাধা'। প্রেমে ঈশ্বরাংশ জীবকে যেমন বশীভূত করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না। রাশির স্বভাব বুঝিতে হইলে অংশের স্বভাব দেখিতে হইবে—অগ্নিরাশির স্বভাব যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে অগ্নিকণার স্বভাব দেখিতে হইবে। ভগবদংশ জীব প্রেমেই বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব সর্বজীবাধার আনন্দ-বিগ্রহ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রেমরূপিণী রাধার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত অনুগত—কৃষ্ণ রাধা ব্যতীত থাকিতেই পারেন না।

যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম এবং যেখানে প্রেম সেইখানেই আনন্দ; আনন্দ

ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই; আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ কৃষ্ণ এবং প্রেমেরও ঘনীভূত মূর্তি রাধা। সুতরাং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধা, এবং যেখানে রাধা, সেইখানেই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভিন্ন রাধা বা রাধা ভিন্ন কৃষ্ণ থাকিতেই পারে না।

ভগবানের শত শত শক্তিগণের মধ্যে মহাভাবরূপিণী রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণই রাধার জীবন। কৃষ্ণ ভোক্তা, রাধা ভোগ্যা। বেদান্তও সিদ্ধান্ত করিয়াছে পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। জগতেও ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পুরুষ সেব্য—প্রকৃতি সেবিকা, পুরুষ রাধ্য—প্রকৃতি রাধিকা। অতএব প্রেমস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি রাধিকা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরমপুরুষ কৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। রাধিকা তত্ত্বতঃ কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি, ইঁহাকে বৈষ্ণব-শাস্ত্র স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম দিয়াছেন। চরিতামৃত উপদেশ করিয়াছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥"

সর্বাধিষ্ঠানভূত ভগবান্ কৃষ্ণে অব্যভিচারিণী স্বরূপভূত তিনটী মধ্য শক্তির অস্তিত্ব বৈষ্ণব-গণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই তিনশক্তির নাম—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। চরিতামৃত বলেন—

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তার হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনী-সার প্রেম—প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥

যেমন মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা নিত্যই ভগবানের আরাধনা করেন, সেইরূপ ঐ হ্লাদিনী শক্তির শত সহস্র বৃত্তিও মূর্তিমতী হইয়া অনুক্ষণ রাধা ও কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের সহিত একত্র অবস্থান করেন, রাধাকৃষ্ণের প্রীতিসাধনই ইঁহাদের একমাত্র অভিপ্রেত এবং ইঁহারা সর্বদাই রাধাকৃষ্ণের সেবাকার্যনিরত; এই জন্য ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের সখী ও সহচরী ভাবে যে ক্রীড়াবিশেষ প্রকটিত করেন তাহারই নাম রাস।

গর্গ-সংহিতায় (গোলক খণ্ড ৮.৬,৭) উল্লিখিত আছে যে, রাধা কৃষ্ণের অংশভূতা। কৃষ্ণ আপনার পরমতেজ বৃষভানুর পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন। সেই তেজ হইতে যমুনা-কূলের নিকুঞ্জ দেশে উত্তম মন্দিরে রাধা আবির্ভূত হন। রাধা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাধাষ্টমী উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ সূচিত হইল।

---

(৩)

জৈনধর্ম-গ্রন্থ

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

জৈনধর্মের ২টী প্রধান সম্প্রদায় আছে---(১) শ্বেতাম্বর ও (২) দিগম্বর। প্রথম সম্প্রদায়ের সাধুরা শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করেন ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সাধুরা উলঙ্গ [দিক্ + অম্বর (বসন) যাহার = দিগম্বর] অবস্থায় বিচরণ করিতেন। মুসলমান রাজত্বের সময় দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সাধুরা বসন পরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মতবাদে সামান্যই পার্থক্য আছে; কেবল আচার অনুষ্ঠানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে ৮৬খ্রী° অব্দে দিগম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব, আবার দিগম্বরীয়দের মতে ৮০ খ্রী° অব্দে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজকে প্রাচীনতম সম্প্রদায় বলে।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের যে সব ধর্ম গ্রন্থ আছে তাহা মহাবীর রচিত নহে, পরন্তু মহাবীর ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উপদেশরূপে শিষ্য ইন্দ্রভূতিকে বলেন এবং তিনি আবার স্বশিষ্য গণধর সুধর্মন্‌কে বলেন ও তিনি স্বশিষ্য জম্বুস্বামীকে বলেন। এখানে বলা প্রয়োজন জৈনধর্ম মতে ২৪ জন জিন বা তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষ জিনের নাম বর্ধমান মহাবীর। ইনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সময় এই ধর্মের ২ শ্রেণীর ধর্ম পুস্তক ছিল—(ক) ১৪ খানি পূর্ব (খ) ১১ খানি অঙ্গ। মহাবীরের পর ৮ম আচার্য স্থূলভদ্রের সময় পর্যন্ত এই ১৪ খানি পূর্বই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী ৭ জন আচার্য মাত্র ১০ খানি পূর্বের বিষয় জানিতেন। ক্রমে এই ১০ খানিও নষ্ট হইয়া যায়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে ১১ খানি প্রাচীন 'অঙ্গ' গ্রন্থ ঠিক আছে; কিন্তু দিগম্বরীয়দের মতে এই 'অঙ্গ' গ্রন্থগুলিও নষ্ট হইয়া যায় এবং শ্বেতাম্বরদিগের 'অঙ্গ'গ্রন্থগুলি প্রামাণিক নহে। যাহা হউক এই 'অঙ্গ' গ্রন্থগুলি প্রায় ৪৫৪ খ্রী° অব্দে লিপিবদ্ধ হয়।

জৈনদিগের ধর্মশাস্ত্রের নাম 'সিদ্ধান্ত'। মোট ৪৫ খানি এই প্রকার গ্রন্থ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতমগুলির নাম 'অঙ্গ'—মোট ১১ খানি 'অঙ্গ' গ্রন্থ। তার পর ১২ খানি 'উপাঙ্গ' গ্রন্থ, ১০ খানি পৈন্ন (প্রকীর্ণ) গ্রন্থ, ৬ খানি ছেদসূত্র, ৪ খানি মূলসূত্র, ১ খানি 'নান্দীসূত্র' ও ১ খানি 'অনুযোগদ্বার' সূত্র। সর্বসমেত ৪৫ খানি গ্রন্থ।

(ক) ১১ খানি অঙ্গের নাম—আচারাঙ্গ, সূত্রকৃত, স্থান, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাতধর্ম-কথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তর-উপপাতিক দশা, প্রশ্ন-ব্যাকরণ, ও বিপাক। 'দৃষ্টিবাদ' নামক আর ১ খানি দ্বাদশ অঙ্গ গ্রন্থ ছিল, কিন্তু উহা লুপ্ত।

(খ) ১২ খানি উপাঙ্গ—ঔপপাতিক, রাজপ্রশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞাপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞাপ্তি, সূর্যপ্রজ্ঞাপ্তি, নিরয়াবলি (বা কল্পিক), কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা, পুষ্প-চূলিকা, বৃষ্ণিদশা।

(গ) ১০ খানি পৈন্ন বা প্রকীর্ণ গ্রন্থ—চতুঃশরণ, সংস্তার, আতুর-প্রত্যাখানম্, ভক্তা-পরিজ্ঞা, তণ্ডুল-বৈয়ালী, চণ্ডাবীজ, দেবেন্দ্র স্তব, গণ্ডিবীজ, মহাপ্রত্যাখান, বীর স্তব।

(ঘ) ৬ খানি ছেদসূত্র—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাশ্রুতস্কন্ধ, বৃহৎকল্প, পঞ্চকল্প।

(ঙ) ৪ খানি মূল সূত্র—উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক, পিণ্ডনির্যুক্তি।

(চ) ২ খানি অন্য গ্রন্থ—নান্দীসূত্র ও অনুযোগদ্বার-সূত্র।

এই সমুদয় গ্রন্থের অনেক ভাষ্য ও টীকাদিও আছে এবং কয়েকখানির (যেমন আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, উপাসকদশা প্রভৃতি) ইংরেজী অনুবাদও হইয়াছে। আরা হইতে Sacred Books of the Jains একটি গ্রন্থমালাতেও কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থগুলি সর্ব প্রথম ৪৫৪ খ্রী° অব্দে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু কালক্রমে ইহার কতকাংশ ও ভাষা কিছু পরিবর্তিত হয়। প্রথমে ইহা অর্ধমাগধী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু পরে কতকাংশে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সংযোজিত হয়। সাধারণতঃ প্রাচীনতম অংশগুলি জৈন প্রাকৃত ও পরবর্তী অংশগুলি জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় লিপিবদ্ধ। এই সব গ্রন্থগুলি বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে, সেজন্য ভাষা ও ছন্দের তারতম্য আছে। কতকগুলি গদ্যে, কতকগুলি পদ্যে ও কতকগুলি গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে লিপিবদ্ধ।

এই সব ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত আরও কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে। এইগুলি কতক প্রাকৃত ভাষায় ও কতক সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। ইহাদের মধ্যে 'উমাস্বাতির তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র' ও তেজপাল-পুত্র বিনয় বিজয় কৃত 'লোক প্রকাশ' (ইহা ১ খানি কোষ গ্রন্থ) উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত ধর্ম ও উপদেশমূলক গ্রন্থও প্রাকৃত ভাষায় অনেকগুলি আছে যেমন সমরাদিচ্চা কথা (হরিভদ্র কৃত); উপমিতি ভবপ্রপঞ্চা কথা। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সোমদেব কৃত 'যশঃতিলক' ও ধনপাল কৃত 'তিলক-মঞ্জরী' উল্লেখযোগ্য।প্রাকৃত কাব্যে রামায়ণেরও একটি সংস্করণ আছে—ইহার নাম "পৌমচরিয়"।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে।

আমাদের কথা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। ইহার ২দিন পূর্বেই জার্মেণী পোলাণ্ড দেশকে আক্রমণ করে। ব্রিটিশ এই যুদ্ধে লিপ্ত। ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীন সুতরাং ভারতের স্বার্থ ইহাতে জড়িত। জাগতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইতেছে—এখানে সামরিক আক্রমণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে—জার্মেণী সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে নিযুক্ত অনেক ভারতীয়দের চাকুরী নষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি। ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ বিশেষ। এই দেশের লোকসংখ্যা বহু (আগামী গণনায় প্রায় ৪০ কোটী হইবার সম্ভাবনা), এখানে খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব নাই (দুর্ভিক্ষাদির অন্যতম কারণ রপ্তানী), শিল্প ও বৃহৎ কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials) প্রভৃতির অভাব নাই, জ্ঞান, বিদ্যা, কৃষ্টিতে ভারত পৃথিবীর কোন দেশ অপেক্ষা হীন নহে, আর ভারতের শৌর্য বীর্য ইহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষয়ে প্রমাণিত করিতেছে। কিন্তু আজ ভারত ব্যাধিতে জীর্ণ, অন্নাভাবে দীর্ণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিক্ষার অভাবে আত্মরক্ষায় প্রায় অসমর্থ, কলকারখানার অভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাভাবে বিদেশের মুখাপেক্ষী।

যাহাতে ভারতের এইসব অভাব দূরীকরণ হয় এবং এই সঙ্কট সময়ে বৃটনের প্রকৃত সহায়তা করিতে পারে সেজন্য গত ২৪ শে ভাদ্র বোম্বাইএ হিন্দুমহাসভার কর্তৃপক্ষদের একটী অধিবেশন হয় ও তাহাতে "ভারত ও যুদ্ধ" সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে।

(ক) ভারতে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিমানপোত, ইঞ্জিন, মোটর প্রভৃতির কলকারখানা প্রস্তুত করা

(খ) সৈন্যদলের ভারতীয়করণ ও ভারতবাসীদের যুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা দান এবং "পৌরজনপদ বাহিনীর" সৃষ্টি

(গ) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব প্রবর্তন, সাম্প্রদায়িক চুক্তির সংশোধন, ইত্যাদি

যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্যে পরিণত করেন তবে বর্তমান সঙ্কটের অনেক অবসান হয়। অবশ্য চ্যাটফীল্ড কমিটির সুপারিশে দেখা যায় ভারতের স্থলসৈন্য, নৌবহর ও বিমানবাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধোপযোগী করিবার জন্য ইংলণ্ড ভারতকে ৩৩॥০ কোটী টাকা দান করিবেন ও আগামী ৫ বৎসরে বিনাসুদে ১১১ কোটী টাকা ঋণ দিবেন। আমাদের মনে হয় আত্মরক্ষার জন্যও যাহাতে ভারতের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কয়েকটী করিয়া সামরিক শিক্ষালয় থাকে তবে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগকে স্বেচ্ছাসৈন্যরূপে ঐসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ ও ক্ষতি হইতে অনেকাংশে রক্ষা

করা যাইতে পারে। ভারতে মাত্র দেরাদুনে অবস্থিত একটী সামরিক বিদ্যালয় আছে আর সম্প্রতি ডাঃ মুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত নাসিকে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

* * * * *

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিকল্পনায় শিল্পকারখানাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটী National Planning Committee গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের উদ্যোগে এ পর্যন্ত একটিও কারখানার সৃষ্টি হইল না। প্রতিবৎসর কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ও অন্যান্য অধিবেশনে বহুটাকা ব্যয়িত হয়। কিন্তু আজ ৫০ বৎসরের এই জাতীয় আন্দোলন কেবল রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা ব্যতীত দেশের কোন গঠনমূলক কার্যে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপও করিল না বা মনোযোগ দিল না। আদর্শ বিদ্যালয়াদি স্থাপন, কলকারখানা স্থাপন ও শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার, সামাজিক রীতি নীতির সংস্কার প্রভৃতি কার্য কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। জাতীয় উন্নতি বলিতে একটা জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতিই বুঝায়।

* * *

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বর্তমান ভারতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সমৃদ্ধতর। যাহাতে অন্যান্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা পাঠ্যবিষয়রূপে গৃহীত হয় তাহার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'যুক্তপ্রদেশ' প্রমুখ কয়েকটী কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে বাংলাভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে।

* * *

বিশ্বভারতীর পরিচালিত 'লোক শিক্ষা সংসদ' জন সাধারণে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাযথ চেষ্টা করিতেছে। যদি ভারতের প্রত্যেক কলেজের ছাত্রবৃন্দ নিজেদের মধ্যে এক একটি সমিতি গঠন করিয়া এই প্রকার পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করে তবে ভারতে শীঘ্র শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হয় অথচ ইহা বহু ব্যয়সাধ্যও হয় না।

* * * *

কাশী বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় বার্ধক্য বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন আর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন বর্তমান ভারতের একজন প্রধান মনীষি স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের একটী গৌরব। আমরা যতদূর জানি ইহার পরিকল্পনাও হইয়াছিল কতকটা প্রাচীন ভারতের গুরুকুল বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায়, ইহা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ। প্রাচীন ভারতের শাস্ত্র, শিক্ষা ও কৃষ্টির রক্ষা ও প্রচারের জন্য ইহাতে বিশেষ ব্যবস্থা বা তাহার বিশেষ কার্য দেখি নাই। যাহাতে প্রাচীন ভারতের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া ইহাকে একটি আধুনিক উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা যায় তাহার জন্য ইহার কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করি।

পুস্তক সমালোচনা

দর্শন-পরিচয়—শ্রীগোপাল চন্দ্র সেন, বিদ্যাবিনোদ কৃত, কলিকাতা ৩৩, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ২৪০, মূল্য ২৲।

সংস্কৃত ভাষায় মাধবাচার্য লিখিত সর্বদর্শনসংগ্রহে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের একটী সাধারণ পরিচয় দেওয়া আছে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত Sir S. Radhakrishnanএর দুই খণ্ডে Indian Philosophy ও Dr. S. N. Dasgupta-কৃত দুই খণ্ডে History of Indian Philosophy আছে। এতদ্ব্যতীত মোক্ষমূলর সাহেব ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গেরও গ্রন্থ আছে। কিন্তু বাংলাভাষায় সরল ও প্রাঞ্জলভাবে সবগুলি দর্শনশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়মূলক গ্রন্থ নাই। কিছুকাল পূর্বে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ প্রদত্ত শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোসিফ্ লেক্‌চারগুলি ইহার অভাব অনেকাংশে পূরণ করে। কিন্তু বোধ হয় আলোচ্য পুস্তকখানিই সংক্ষিপ্তাকারে মূলতত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা প্রদানের প্রথম প্রচেষ্টা। ইহাতে ষড়্‌দর্শন, শৈবদর্শন, পাণিনি-দর্শন এবং ৩টী অবৈদিক-দর্শন—জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক-দর্শন ব্যতীত একটী অধ্যায়ে ভারতীয় ভাবদর্শন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনার বা ভাবের ধারার আভাস দিয়াছেন সুতরাং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে দর্শন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। লেখক এই অধ্যায়ে সাধারণ পাঠকবর্গকে ভারতীয় সাধনার ধারার সহিত সুনিপুণ-রূপে পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে অনেকস্থানে ক্রমতালিকা (Table) দিয়া বিষয় বস্তুকে বিশেষরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের মধ্যে মাত্র কয়েকটী ভাষ্যের বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত আছে এবং বৈষ্ণব মতের অপেক্ষাকৃত বিশদরূপ ব্যাখ্যা আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের পর যদি একটী গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) থাকিত তবে গ্রন্থখানি আরও উপযোগী হইত। কয়েকটী স্থলে গ্রন্থকার বিনা প্রমাণে ২।১টী কথা বলিয়াছেন যেমন 'লঙ্কেশ্বর রাবণকে বৈশেষিক দর্শনের একজন প্রাচীন ভাষ্যকার' (পৃঃ ৫৯), 'সমগ্র মীমাংসা দর্শন (পূর্ব ও উত্তর) বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত (পৃঃ ৭১) ইত্যাদি। ইহাতে অবশ্য গ্রন্থের উপযোগিতা কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

বাংলায় ধনবিজ্ঞান—প্রথম ভাগ—(১৯২৫-১৯৩১) ৭৪২ পাতা। মূল্য ৪॥০ টাকা। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্যান্য গবেষক কর্তৃক লিখিত। প্রকাশক চক্রবর্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ। ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে বিভিন্ন সময়ে পঠিত ও ধনবিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র "আর্থিক উন্নতি"তে লিখিত প্রবন্ধের সমষ্টি। অর্থশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞগণের নানা জাতীয় প্রবন্ধ এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। বাংলার ধনসম্ভার কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে কিরূপে বৃদ্ধি

করা যায় তদ্বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য ধনবিজ্ঞান পরিষদ প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইহার প্রধান গবেষকাধ্যক্ষ ও ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা অন্যতম পরিচালক। পরিষদ পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলির যথা—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া জাপান, ইতালি, প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক মত সমূহ আলোচনা করিয়া তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় গ্রহণযোগ্য তাহা তথ্য সহকারে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কি উপায়ে রাশিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি হইল কিরূপে জার্মান আর্থিক জগতে আবার আসন পাতিয়া বসিল ইহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই কৌতুহলোদ্দীপক। আধ্যাত্মিকতার (অলসতার) দোহাই দিয়া আমরা এই সকল তথ্যকে এড়াইয়া গেলেও বাস্তব জগতে ইহা বাদ দিয়া কিছুই চলে না। জগতের পরিবর্তনের সহিত সমান তালে না চলিতে পারিলে আমাদিগের ধ্বংস অনিবার্য তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। কিন্তু আমরা সকলে উদ্ধারের পন্থা জানি না। ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ এই সকল উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল সারবান প্রবন্ধে অনেক শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে। নানা জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি, অবনতি, পরিণতি নানা দিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের অর্থশক্তি ও কর্মসামর্থ উভয়ই অব্যাহত তাঁহাদিগকে গ্রন্থখানি অবিলম্বে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বাংলার অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং এ জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার আবশ্যক। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধা ভাল।

শ্রীনলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

Spiritual Marriage Rules And Women's Property Rights—By H. M. Banerjee, President United Mission, 53/1, Shampukur Street, Calcutta, Price one Shilling.

পুস্তকখানি আদিনাথ আশ্রমের সভাপতি শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরেজীতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কীয় বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ আলোচনা করিয়া অনেক আলোক পাত করিয়াছেন। যাঁহারা সংসার ধর্মাশ্রমে প্রবেশেচ্ছু, তাঁহারা ধর্ম বিবাহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য এই গ্রন্থ মধ্যে পাইবেন।

নারীর সম্পত্তি অধিকার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত শাস্ত্রীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই বিষয়ে নূতন আইনও প্রবর্তিত হইয়াছে (Act No XI of 1938) যে বিধবার অংশ পুত্রের তুল্যাংশ। এই প্রগতির যুগে পুস্তকখানি সকলের পাঠ করা উচিত।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

প্রত্নতত্ত্ব

১। The Antiquity of the Buddha Image. The Cult of the Buddha—O. C. Ganguly.

২। Buddha & Bodhisattva in Indian Sculpture—Dr. Raghu Vir & C. Yamamoto.

৩। Folk Art of Bengal—Ajit Kumar Mukherjee.

৪। Ships and Boats of the Ajanta Frescoes—M. Fathulla Khan

ধর্ম ও দর্শন

৫। Buddhist Philosophy, Vol I—Dr. C. L. A. De Silva

৬। তত্ত্ব সংগ্রহ---মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত।

৭। ধর্মবোধ ব্যবহারকাণ্ডম্, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা---লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী কর্তৃক সম্পাদিত

৮। দ্বৈত নির্ণয় সিদ্ধান্ত সংগ্রহ---পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ শুক্ল কর্তৃক সম্পাদিত।

৯। Hinduism and the Modern World—K. M. Pannikar.

১০। Ram Chandra and Zarathustra—Yatindra Mohan Chatterjee

১১। ন্যায়কুমুদচন্দ্রঃ--শ্রীমহেন্দ্রকুমার ন্যায়শাস্ত্রী।

১২। দর্শন পরিচয়—শ্রীগোপালচন্দ্র সেন, বিদ্যাবিনোদ।

১৩। ন্যায় পরিশিষ্টম্---মূল পুঁথি হইতে নরেন্দ্র চন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত।

১৪। যুক্তিদীপিকা---মূল পুঁথি হইতে পি, চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত।

১৫। The Geeta as a Chaitanya reads it—Swami B. H. Bonn.

১৬। Nyaya Theory of Knowledge—Dr. S. C. Chatterjee

১৭। উপনিষদ্ রহস্য---Prof K. V. Gajendragadkar.

ইতিহাস

১৮। Indian States and the New Regime—Maharaj Kumar Dr. Raghubir Sinha.

১৯। Islamic Culture, 2 Vols—A. M. A. Shushtery.

সাহিত্য

২০। কবীন্দ্র চন্দ্রোদয় :—হরদত্ত শর্মা ও এম. এম. পাটকার কর্তৃক সম্পাদিত।

২১। সুক্তিমুক্তাবলি :—ই, কৃষ্ণমাচারিয়া কর্তৃক সম্পাদিত।

২২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।

বিবিধ

২৩। Court Poets of Iran and India—R. P. Masani.

২৪। Spirit of Indian Civilisation—Dhirendra Nath Ray

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কর্তৃক সংকলিত

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)

১৩১৭ সাল

বৈশাখ—শ্রাবণ-সূর্যপূজা--শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য। প্রবন্ধ লেখক বর্তমান প্রবন্ধে ব্যাবিলোনিয়ান ও আসিরিয়ান ধর্মে সূর্য-পূজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন্ কোন্ জাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সূর্যপূজা করে তাহার সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ ইতিহাস লিখিয়াছেন।

বৈশাখ—আষাঢ়—ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ—সখারাম গণেশ দেউস্কর। পাশ্চাত্য জাতির হিসাবে হিন্দুগণের কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই সুতরাং হিন্দুজাতির ইতিহাস কিম্বদন্তী ভিন্ন আর কিছুই নহে। লেখক প্রবন্ধগুলিতে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও পুরাণগুলিতে যে ভারতীয় ইতিহাসের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান তাহা দেখাইয়াছেন ও প্রসঙ্গক্রমে মহাভারত ও রামায়ণের রচনা কালের আলোচনা করিয়াছেন।

কার্তিক—মাঘ—বেদান্ত—মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ। প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কয়েকটী আলোচনা আছে। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুপাঠ্য।

আষাঢ়—চৈত্র—মানবের জন্মকথা—শশধর রায়। Darwin প্রণীত Descent of Man নামক গ্রন্থের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ।

বর্তমান বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটী "স্ত্রী-চরিত্রের" সমালোচনা আছে।

The Indian Antiquary. Vol II.

Notes concerning the Numerals of the Ancient Dravidians.—Rev. F. Kittel, Merkara.

প্রাচীন দ্রাবিড়ীগণ আর্যপ্রভাবশূন্য হইলেও যে সংখ্যাজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, উক্ত প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাহারা এক হইতে একশত পর্যন্ত গণনা করিতে পারিত।

Weber on the Date of Patanjali,—Goldstücker কৃত "পাণিনি" প্রবন্ধের উপর অধ্যাপক Weber "Indische studien"এ (V. 150 ff) "Critique" নামক একটী প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধ Weber কৃত প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ। ইহাতে তিনি মহাভাষ্য প্রণয়নের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন ২৫ খ্রীস্টাব্দ। ইহা হইতে মহাভাষ্য প্রণেতা পতঞ্জলির সময় নির্ধারণ অতি সহজেই হইতে পারে।

Patanjali's Mahābhaṣya—Prof. Ramkrishna Gopal Bhandarkar. এই প্রবন্ধে লেখক মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির জন্মস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন

যে পতঞ্জলির জন্মস্থানের নাম গোনারডা। বোধ হয় অযোধ্যার গোণ্ডা জেলারই প্রাচীন নাম ছিল গোনারডা। এই প্রসঙ্গে বার্তিককার কাত্যায়নের জন্মস্থান সম্বন্ধে বলিতেছেন যে অধ্যাপক Weberএর মতে কাত্যায়ন পূর্বদেশীয় বৈয়াকরণ ছিলেন। কিন্তু লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে বার্তিককার কাত্যায়ন দক্ষিণদেশীয় লোক ছিলেন।

The Date of Śrī Harṣa—Kashinath Trimbak Telang, M. A., L. L. B., Advocate, High Court, Bombay.

শ্রীহর্ষের জন্মসময় নির্ধারণ এক কঠিন ব্যাপার। Dr. Buhler দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহর্ষের জন্মসময় নির্ধারিত করেন। প্রবন্ধকারের মতে ইহা সঠিক নহে। সঠিক সময় নির্দিষ্ট করিবার জন্য এই প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

সাময়িক সাহিত্য, ভাদ্র-১৩৪৬

সাহিত্য

বঙ্গশ্রী—বাংলা সাহিত্যে গল্পের সূচনা—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন আচার্য।
" —দেশ-প্রেমী বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ভট্টশালী।
" —শিক্ষার দোষ কোথায়?—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
বিচিত্রা—সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায়বাহাদুর)।
" —বাঙলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতাব্দী—ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্‌-এ, পি-এইচ ডি।
" —বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ।
" —মেঘনাদ বধ কাব্যে শিল্প কৌশল—শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার, এম্‌-এ।
অলকা—বাঙ্গালা পুঁথির পুষ্পিকা—শ্রীসুকুমার সেন।
বসুমতী—পতঞ্জলি বিরচিত ব্যাকরণ মহাভাষ্য—শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

ইতিহাস

বঙ্গশ্রী—টিপুসুলতান ও নেপোলিয়ান্—শ্রীমন্মথনাথ সরকার।
" —সিপাহী যুদ্ধের নূতন কথা—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী।
বিচিত্রা—গোয়ালিয়রের ফিলোজ বংশ—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ., বি. এল্. পি. আর্. এস।
পরিচয়—শিখসম্রাট ও সতীর শাপ—৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।
" রেনো গ্রুসের ভারতবর্ষ—{ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীইন্দিরা দেবী।
অলকা—ভারতীয় কৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম্. এ, ডি-লিট।
বসুমতী—চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

ইতিহাস

বসুমতী---ভারতীয় আর্য সভ্যতার একটি ধারা---শ্রীরমলা রায়।

প্রবাসী---দারাশুকোর কান্দাহার দুর্গ আক্রমণ ও পরাজয়---শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পি-এইচ-ডি।

ধর্ম ও দর্শন

বিচিত্রা—সন্ন্যাস ও ত্যাগ—শ্রীঅরবিন্দ।

,, —শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় সমুচ্চয়বাদ—শ্রীবরদাচরণ সেন।

পরিচয়—সুদূর প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদ ও খৃষ্টধর্ম—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম্.এ, ডি-লিট।

,, —বিজ্ঞানের ব্যর্থতামোক্ষণ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, —মীমাংসামতে আত্মবাদ—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রবাসী—অহিংসাত্মক আত্মরক্ষা—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

বসুমতী—গীতা বিচার (১৭)—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

,, —বৈষ্ণবমত বিবেক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল।

উদ্বোধন—রামায়ণে মহাবীর চরিত্র—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্।

,, —বিশ্বকল্যাণে গীতার দান—অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কাব্যপুরাণ ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণরত্ন।

,, —অনেকান্তে ঈশ্বরবাদ—শ্রীঅজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য, এম্. এ।

,, —শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মূলসূত্র—অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব, এম-এ।

ব্রহ্মবিদ্যা—মহাশ্মশানের মাহাত্ম্য—শ্রীরাধা।

,, —সাংখ্য-পরিচয়—শ্রীবিজয়বসন্ত ভট্টাচার্য।

,, অভিব্যক্তিবাদ—শ্রীতুলসীদাস কর।

,, —সর্বধর্ম-সমন্বয়—শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম।

জীবনী

বসুমতী—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্রবাসী—আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতি—শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৬শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা

১। বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, ডি-লিট।

২। বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি।

৩। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৫। গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি।

৭। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট।

৮। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৫)—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাময়িক সংবাদ

বঙ্কিমচন্দ্রের "বিবিধ প্রবন্ধ"—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর শত বার্ষিক সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রকাশিত হইয়াছে। "বিবিধ প্রবন্ধের" এই সংস্করণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রবন্ধগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—সাহিত্য, প্রত্নতত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি, দর্শন ও ধর্ম এবং বিবিধ।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ ফণ্ড—অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু এপর্যন্ত ইহার সাহায্যে কোন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ অনুদিত হয় নাই।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা—এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅমরনাথ ঝার অনুকূলতায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ডক্টর ঝা মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের পুত্র ও সুপণ্ডিত।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গীয় সাহিত্যিক য়ুনিয়নকে ভাইস-চ্যান্সেলর মহাশয় প্রাচ্যভাষা বিভাগে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ছুটীর দিন ছাড়া প্রত্যহ সওয়া তিনটা হইতে চারিটা পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার নিমিত্ত নিয়মমত ক্লাশ বসাইবার অনুমতি ও ক্ষমতা দিয়াছেন।

'সুলভ সমাচার' ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী—"শিশুভারতী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "সুলভ সমাচার" হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ সংকলন করিয়া উপরিলিখিত নামে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যেগুলি কেশবচন্দ্রের নিশ্চয়ই নিজের লেখা বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, সেগুলির নাম তিনি ভূমিকায় দিয়াছেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলর—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অসুস্থতা নিবন্ধন কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সেই পদের জন্য বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌কে মনোনীত করেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এই পদ গ্রহন করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশে শিক্ষা সংস্কার—প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজি যে নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ডক্টর জাকির হোসেন প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের সাহায্যে যাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তদনুযায়ী যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট ১৭৫০টী নূতন মডেলের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি—কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল সরকারী কর্মচারী সমিতির বিভিন্ন সাব কমিটিতে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সমিতির সহিত সহযোগিতা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

শোক সংবাদ

পরলোকে ভিক্ষু উত্তম—গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটের সময় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনের সভাপতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও রাজনীতিক নেতা ভিক্ষু উত্তম পরলোক গমন করিয়াছেন। ভিক্ষু উত্তমের মৃত্যুতে দেশ একটী বিশিষ্ট গণনায়ক হারাইল এবং ইহাতে দেশের যে ক্ষতি হইল সহজে তাহা পূরণ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীমদ্ স্বামী অভেদানন্দ—স্বামী অভেদানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। গত ২২শে ভাদ্র তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছে। তিনি জীবনের দীর্ঘকাল আমেরিকায় ও ইউরোপে বেদান্ত-প্রচার করিয়া সম্প্রতি কয়েক বৎসর এদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁহার মৃত্যুতে একজন খ্যাতনামা ধর্মোপদেষ্টার তিরোভাব হইল।

তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর তিনি কলিকাতা আহিরীটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রসিকলাল চন্দ্র।

আমরা স্বামিজীর স্বর্গত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পরলোকে অধ্যাপক ফ্রয়েড্—বিশ্ববিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সিগ্মণ্ড ফ্রয়েড গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তাঁহার লণ্ডনস্থিত বাস-ভবনে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক ফ্রয়েড্ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মোরাভিয়ার ফ্রিবার্গে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। গত বৎসর জুন মাসে নাৎসী সন্ত্রাসবাদী অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি সপরিবারে লণ্ডনে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | কার্তিক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ | তৃতীয় সংখ্যা

গীতায় ভক্তিবাদ্

রায়বাহাদুর **শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র** এম্, এ.

ভগবদ্গীতা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অংশ বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহা নূতন। আমার মনে হয় স্বয়ং ভগবানের বাণী বলিয়া সকলে ইহাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অনেকে মনে করেন, গীতা এক বিপুল সমন্বয়-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাঁহারা এরূপ ধারণার বশবর্তী, তাঁহারা গীতার মূল্য কখনই দিতে পারেন না। আমার মনে হয় ভগবদ্গীতায় যে ভাবে মুখ্য সমস্যাগুলির সমাধান-চেষ্টা হইয়াছে, সেরূপ পূর্বে বা পরে আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

গীতার প্রথম নূতনত্ব ইহার অপূর্ব কর্মবাদ। কর্মের প্রেরণা হইতেই জন্ম জন্মান্তর; বাসনা হইতে কর্ম এবং কর্ম হইতে বন্ধন। সুতরাং সর্ব প্রকার কর্ম বর্জন করিলেই জন্মের মূল উৎপাটিত হইতে পারে। অশুভ কর্মে বন্ধন হয়, আর শুভ কর্মে হয় না তাহা নহে। তেরপন্থী জৈনেরা এই জন্য দান, পরোপকার প্রভৃতি সৎ কর্ম হইতেও বিরত থাকেন। কিন্তু কর্ম একেবারে বর্জন করা সম্ভবপর নহে। গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে, মানুষ কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্মও করিতে হইবে অথচ মনে তার রঙ না ধরে; অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকে।

এই প্রশ্নের মীমাংসা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কামনা, বাসনা প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি (spring of action) হইতে কর্মের উদ্ভব, সেগুলির প্রভাব থাকিতে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে চারিত্রোৎকর্ষ হয় না। তাঁহারা শুধু এই টুকু স্বীকার করিয়াই থামিয়াছেন। চারিত্রোৎকর্ষের জন্য

বাসনার মূলোচ্ছেদন আবশ্যক—একথা যুক্তি হিসাবে অকাট্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রেরণা-শক্তি (Dynamic factor) নাই। অর্থাৎ বাসনাকে দমন করিতে যে প্রবল শক্তির প্রয়োজন, তাহা কোথায় পাইব? চরিত্রের মর্যাদা তাহা যোগাইতে অক্ষম। গীতায় সেজন্য কর্ম-ফলত্যাগের মন্ত্র প্রচারিত হইল ধর্মপ্রেরণার মধ্য দিয়া। সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায় যে ধর্মের প্রেরণা জীবনে অসামান্য শক্তি আনয়ন করে। সুতরাং কর্তব্যের জন্য কর্তব্য (Duty for duty's sake) প্রভৃতি যুক্তি-মাত্রসারনীতির দোহাই না দিয়া যদি বলা যায় যে, দুঃখ-শোক পঙ্ক নিমগ্ন মানবের উদ্ধারের এই একমাত্র উপায়, তাহা হইলে হয়ত ইহা প্রভূত প্রভাব সম্পন্ন হইতে পারে।

এই কারণে আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমই চরম আশ্রয় বলিয়া কথিত হইত। কারণ সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া লোকে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইত। সন্ন্যাস যাঁহারা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের নাম হইত ভিক্ষু। উপনিষদ্ সকল তাঁহাদেরই জন্য পরিকল্পিত। আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষদ্। বিবেকবৈরাগ্য সম্পন্ন মুক্তিপথের পথিকগণ এই উপনিষদ্ পর্যালোচনা করিয়া, সত্যের মর্ম উপলব্ধি করিয়া পরলোকের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গীতা সন্ন্যাসাশ্রমের সুখ্যাতি করেন নাই। এখানেও গীতার অভিনবত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার মতে সন্ন্যাস অর্থে ত্যাগ নহে। 'যস্তু কর্মফল ত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে' কর্মফল ত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস, ইহাই গীতার তাৎপর্য।

গীতার ভক্তিবাদ এক নূতন সামগ্রী। ভক্তির প্রাধান্য ইহার পূর্বে আর কোনও শাস্ত্রে পরিকীর্তিত হয় নাই। বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে সাত্বত বা একান্তী সম্প্রদায় ছিল।

একান্তেনা সমো বিষ্ণুর্যস্মাদেষাং পরায়ণঃ
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ ভাগবতচেতসঃ। গরুড় পুরাণ

ইঁহারা যাগযজ্ঞ এবং বিধি-নিষেধের যে ধর্ম তাহার অনুশীলন না করিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। এইজন্য ইঁহাদিগকে সাত্বিক ভাবসম্পন্ন এবং একান্তী বলা হইত। কর্মকাণ্ড অপেক্ষা ইঁহারা ভগবানের উপাসনাই প্রচার করিতেন।

এই সকল সম্প্রদায় বৈদিকযুগ হইতেই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু ভক্তিবাদ গীতায় যেভাবে তত্ত্ব ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, এভাবে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। বস্তুতঃ গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য এই ভক্তিধর্ম প্রচার করা বই আর কিছুই নয়। ভগবানের বাণী এই প্রথম ধ্বনিত হইল :—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।

সেই পরমপুরুষ অনন্যা ভক্তির দ্বারা লভ্য। অনন্য ভক্তির অর্থ যে ভক্তির অন্য কোনও শরণ বা আশ্রয় নাই। ইহারই নাম কেবলা ভক্তি, অহৈতুকী, অব্যবহিতা ভক্তি। কারণ সেই পরম পুরুষই যে আমাদের একমাত্র গতি।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি।—শ্রুতি

এই পরমাগতি লাভ করিতে হইলে শরণাগতি ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তাঁহাকে জানিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না, সুতরাং তাঁহাকে জানা ব্যতীত অন্য পথ নাই। কিন্তু গীতা আমাদিগকে নূতন কথা শুনাইলেন, ভক্তির দ্বারাই ভগবান লভ্য, জ্ঞানের দ্বারা তত সুলভ নহেন—

বহূনাম্ জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে।

ইহার সরল অর্থ এই যে জ্ঞানী তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিয়া করিয়া কোনও জন্মে হয়ত প্রপত্তি লাভ করে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। কেন না জ্ঞানবান্ একান্ত ভাবে তাঁহার শরণ লয়েন না। জ্ঞানী যদি বাসুদেবকে একমাত্র শরণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার তুলনা থাকে না।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।

জ্ঞানী ব্যক্তি সেইজন্য আমার অতিশয় প্রিয়। কিন্তু শুধু জ্ঞানী হইলে চলিবে না, নিত্যযুক্ত হওয়া চাই। ইহাই গীতার সর্বাপেক্ষা নূতন সংবাদ। আমরা এখন এই সকল তত্ত্বে এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, আমরা ভুলিয়া যাই যে, এক সময়ে ইহা হয়ত বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল। Possibly it revolutionised Hindu thought. সেইজন্য ভগবান্ পুনঃপুনঃ বলিতেছেন, যে এই ভক্তিযোগ গুহ্যাতিগুহ্য, পরম রহস্যময়, মন্ত্রের অপেক্ষাও গোপ্য। ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার বাধা ছিল, আশঙ্কা ছিল যে হয়ত সকলে ইহার মর্ম বুঝিতে পারিবে না। অভক্ত, অতপস্ক, যে শুনিতে ইচ্ছুক নহে বা যে অসূয়াপরবশ এমন ব্যক্তির পক্ষে ইহা একেবারেই উপকারপ্রদ হইবে না।

এই ভক্তিবাদের দ্বারা জ্ঞানযোগও প্রভাবিত হইল। এখানে শুধু নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় জ্ঞানের সোপানগুলি একে একে অতিক্রম করায় চরম চরিতার্থতা নহে। জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বস্তুতঃ গীতা এমনভাবে জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন যে মনে হয় সমস্ত উপনিষদের মত গীতাও একখানি জ্ঞানমুখ্য বেদান্তের গ্রন্থ। ছান্দোগ্য উপনিষদে কর্মকাণ্ডের গুণগান করা হইয়াছে (শাঙ্কর ভাষ্য), ঈশোপনিষদে জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। গীতায়ও সেইরূপ জ্ঞানের প্রাধান্য সূচক বহু শ্লোক আছে অবশ্য কর্মকাণ্ড ও উপেক্ষিত হয় নাই। গীতার প্রথম ষট্‌ক কর্মযোগের, দ্বিতীয় ষট্‌ক ভক্তিযোগের এবং তৃতীয় ষট্‌ক জ্ঞান যোগের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। এইরূপ সংস্থাপনের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, ভক্তিযোগ একদিকে কর্ম, অপরদিকে জ্ঞানকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জ্ঞান এবং কর্মকে গীতা এক স্বর্ণসূত্রে বাঁধিয়াছেন—তাহারই নাম ভক্তি। কর্ম যাঁহাতে সমর্পিত হইলে মুক্তি অধিগম্য হয়, জ্ঞানের প্রস্রবণও তিনি। সুতরাং একদিকে যেমন

কর্ম সম্বন্ধে—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।

তেমনি জ্ঞানেরও সার্থকতা ভগবৎপ্রসাদে। জ্ঞান তাঁহাকে জানিয়া কৃতকৃত্য হয়। 'এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।' শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন 'পরমেশ্বরমেকান্ত ভক্ত্যা ভজতস্তৎ প্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি।' একদিকে কর্মের চরিতার্থতা আত্ম সমর্পণে, অন্যদিকে জ্ঞানের মোক্ষপরত্ব ভগবন্মুখতায়। ভগবানকে ভক্তির দ্বারা প্রসন্ন না করিতে পারিলে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না, যাহা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটাইতে পারে।

যুক্তি তর্কের দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়, সত্য; কিন্তু তাহা ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া দিতে পারে না। জ্ঞানের ঘুঁড়ি উড়াইয়া অভিমান সঞ্চয় করা যাইতে পারে, বটে; কিন্তু ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূল বাতাস না পাইলে সে ঘুঁড়ি বেশীদূর উঠিতে পারে না, মাটিতে লুটোপুটি খায়।

ভগবান্ সেইজন্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া আমি সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ দিয়া থাকি যাহাতে মানুষ আমাকে প্রাপ্ত হয়—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহা জানিতে হইলে ভক্তি চাই। এই শ্লোকে জ্ঞান যে ভক্তির একটি অন্য (অবান্তর) ফল, তাহাও বলা হইল। কথা এই যে, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে প্রাচীর তুলিয়া দিলে ত চলিবে না। মানব চিত্তের সমগ্রতা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি এবং ভক্তির দ্বারা জ্ঞান লভ্য হয়। মুখ্য যে বৃত্তিটি তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবদ্‌গীতা যে ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে ভক্তিই মুখ্য। ভক্তি যে মানব মনের একটি কোমল ধর্ম এবং তাহা যে অতি উপাদেয়, দেববাঞ্ছিত সামগ্রীতে পরিণত হইতে পারে, তাহা বলাই গীতার অভিপ্রায়।

গীতার অভিপ্রায় এই যে ভক্তিমিশ্র জ্ঞানই মোক্ষের সাধক। ভক্তিবর্জিত জ্ঞানের কথাই এতদিন আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম—গীতা দেখাইলেন মনের একটি দিককে অন্ধকারে রাখিয়া অপর দিকের উন্নতি চেষ্টা কখনও সফল হয় না। বস্তুতঃ ভগবদ্‌গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ এরূপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে অনেক সময়ে জ্ঞান ও ভক্তি একই তত্ত্ব বলিয়া বোধ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ভক্তির দ্বারা যে জ্ঞান সুলভ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ইহাকে রাজবিদ্যা—বিদ্যার রাজা বলে ইহাই রাজগুহ্য যোগ অর্থাৎ সমস্ত গোপ্য বা রহস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥

হে অর্জুন এইরূপ অনন্য সাধারণ ভক্তি আমার প্রতি যাহার হয়, সেই আমাকে জানিতে পারে, দেখিতে পারে, এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং ভক্তিরই একটি অবান্তর ব্যাপার জ্ঞান (শ্রীধর স্বামী)। গীতার্থ সংগ্রহে সেই জন্য বলিতেছেন—

ভগবদ্‌ভক্তি যুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।

সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাৎ ইতি গীতার্থ সংগ্রহঃ ॥

ভগবদ্‌ভক্তের বন্ধনমোচন সহজেই হয়, কিন্তু আত্মবোধের মধ্য দিয়া। সেই আত্মচেতনা অর্থাৎ জ্ঞান হয় ভক্তির প্রসাদে।

সেইজন্য বলিয়াছি যে ভক্তি নামক এক নূতন তত্ত্বের দ্বারা গীতা কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা কি হয়? ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি—শ্রুতি। গীতাও তাহার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা ঘটাইবে কিসে?

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, গুণোপাধি সমস্ত অতিক্রম করিয়া জ্ঞানীভক্ত ব্রহ্মৈকত্ব লাভ করেন। শুধু তাহাই নহে। কর্মত্যাগও প্রয়োজন—

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥

তুমি মনোবৃত্তির দ্বারা সমস্ত কর্মফল (সংন্যস্য) আমাতে সমর্পণ কর এবং আমাতে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বন পূর্বক আমাতেই সতত চিত্ত সমাহিত কর। ইহাই গীতার মুখ্য সাধন এবং ইহাই গীতার অভিনবত্ব।

এক্ষণে ভক্তি বলিতে গীতায় কি বুঝায়, অন্ততঃ আমি কি বুঝিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। গীতায় ভক্তিবাদের প্রধান কথা শরণাগতি। যাঁহারা একান্তভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন তাঁহাদিগকে ভগবান্‌ মুক্তিদান করেন, এই অভয় বাণীই গীতার ভক্তিবাদ।

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ

তাহার যে কোনও পাপ থাক না, যে কোনও গ্লানি থাক না, সে নীচজাতি হউক আর অনধিকারী হউক, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করি না। অতএব আমাতে শরণাগত হও। অন্য দেবতাকে ভজন করিলেও তাহাদিগকে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তি আমিই দিয়া থাকি। একমাত্র আমাকেই যাহারা অবলম্বন করে আমি তাহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়া থাকি।

এখানে ভক্তি অর্থে শরণাগতি বা প্রপত্তি। শরণাগতি অর্থ আমরা একরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি, কিন্তু ঠিক ঐ পদের দ্বারা কি বুঝায় তাহা আমরা জানি না। পুরাণে ষড়্‌বিধ শরণাগতির কথা বলা হইয়াছে—

আনুকূল্যস্য সংকল্পং প্রাতিকূল্যস্য বর্জনং।

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ভর্তৃত্বে বরণং তথা ॥

নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়বিধা শরণাগতিঃ ॥

অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণসেবনের অনুকূল, তাহা অনুষ্ঠান করা, যাহা অনুকূল নহে তাহা ত্যাগ করা, তিনিই রক্ষা করিবেন, তিনি ভরণপোষণ করিবেন এই বিশ্বাস, সম্যকপ্রকারে আত্মসমর্পণ এবং একমাত্র তাঁহার নিকটে ব্যতীত অন্যের নিকট দৈন্য না করাকে শরণাগতি বলে।

কিন্তু এই শরণাগতির কথা কোথা হইতে আসিল তাহাই বিচার্য। বৌদ্ধ ধর্মে'ই এই শরণাগতির কথা আমরা প্রথম শুনিতে পাই। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। ইহারই জবাব হিসাবে গীতা বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ—

আর কোথায় যাইবে, কাহার শরণ লইবে? তোমার হৃদয়ে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহারই শরণ লও। এই ভক্তিকে শাস্ত্রে বলিয়াছেন, ত্বদীয়তাময়ী ভক্তিঃ। আমি তোমারই। একান্ত-ভাবে আমি তোমাকেই আশ্রয় করিলাম—

নিরাশ্রয় মাং জগদীশ রক্ষ।

এই যে নির্ভরশীলতা, ইহারই নামান্তর শরণাগতি। কিন্তু এই ত্বদীয়তাময়ী ভক্তিতে ভারকেন্দ্র পড়িতেছে আমার উপর। আমার আর কেহ নাই, আমি নিরাশ্রয়, আমাকে রক্ষা কর, আমি চিরজন্মের মত তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পরিত্যাগ করিও না। এইরূপ ভক্তিতে আমার নিজের কথাই আগে মনে পড়ে। কিন্তু ভক্তিধর্মের ক্রমাভিব্যক্তিতে মন এই ভাবের উপরে উঠিতে পারিল। তুমি আমার। তোমার নিকট চাহিব কি? আমার চাহিবার কিছু নাই। তুমি যে আমার, জন্মে জন্মে আমার, একান্ত আমার আপনার—এই অভিমানে মন যখন ভরিয়া উঠে, তখন ভক্তির অপর নাম হয় প্রেম। সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা। তাঁহাকে না পাইলে হৃদয়ে যে পরম ব্যাকুলতা আসে, তাহারই নাম ভক্তি-সাধন। ভক্তির নিদর্শন এই ব্যাকুলতা এবং পরম প্রেষ্ঠের জন্য যে পরম ব্যাকুলতা, তাহাই ভক্তিধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। ইহার নাম মদীয়তাময়ী ভক্তি।

যাহা হউক, গীতার ভক্তিবাদ জ্ঞান ও কর্মকে এক সোণার সূত্রে গাঁথিয়া মানব জীবনের পরম ও চরম চরিতার্থতা প্রকটিত করিল সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে। জ্ঞান এবং আত্মসমর্পণ এত-দুভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানে ব্রহ্মভূত হওয়া যায়, সারূপ্য প্রভৃতি মোক্ষ পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিতে একেবারে ভগবানের চরণে আত্ম নিবেদন করিবার মধ্যে যে একটি মধুর দাস্য ভাব পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে নাই। কর্ম' সমর্পণেও তাহা নাই। 'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো এই কথাটি গীতায় দুইবার বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে এই শ্লোকটিতে ভক্তি-বাদের মর্ম' নিহিত আছে। কিন্তু সর্বশেষ কথা মামেকং শরণং ব্রজ। অন্য কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় কর। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে অন্য যে সমস্ত গভীর

উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—যথা কর্মত্যাগ, সর্বভূতে সমদর্শন, শুভাশুভ ফলকাঙ্ক্ষারাহিত্য, লোষ্ট্রে-স্বর্ণে সমজ্ঞান প্রভৃতি যদি নাও আয়ত্ত হয়, তবে শুধু ভগবানের পাদপদ্মে শরণ লইলে আত্মার আর কিছু প্রার্থনীয় থাকে না। শোক থাকে না, পাপ থাকে না, চিরশান্তি করতলগত হয়। শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি ধ্রুবানীতির্মতির্মম॥

ভক্তের বিরহ

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ ঘোষ

আমরা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন স্নেহময়ী জননী আমাদের একমাত্র ভরসা, একমাত্র সহায়, একমাত্র অবলম্বন। তিনি ক্রোড়ে ও বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করেন, আমাদের পালন করেন, সংসারের দুঃখ তাপের স্পর্শটুকু পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিতে দেন না। এই মাতৃস্নেহ যথার্থই ভগবৎ কৃপা প্রসাদ; এই ভালবাসার বেষ্টনীর মধ্যে আমরা বর্ধিত হইতে থাকি বলিয়া, শৈশব আমাদের সুখের বলিয়া বোধ হয়; তখন বস্তুতঃ বলিতে ইচ্ছা হয় :—

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান,
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান। (পদ্যপাঠ ১ম ভাগ)

কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শৈশব অতিক্রম করিয়া আমরা যেমনই মাতৃসাহায্য ছাড়িয়া জগতের সাহায্য গ্রহণ করিতে থাকি, তেমনই দুঃখ ধীরে ধীরে আমাদিগকে তাহার কবলে লইতে থাকে এবং জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন দশদিক্ হইতে এই আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হই, তখন বুঝিতে পারি যে—

সুখ যাহা বল,—সে কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ? পেয়েছে কখন?
আকাশ-কুসুম মুকুতার লতা—
জীবনেতে মৃগ-তৃষ্ণিকার ভ্রম!
ওই আকাশের নীলিমা মতন,
দুঃখই জীবন স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল, বিদ্যুৎ যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার। (কবিবর নবীন সেন)

বস্তুতঃ সংসার দুঃখময়। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন – জন্মে দুঃখ, জরায় দুঃখ, রোগে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ, অপ্রিয় দর্শনে দুঃখ, প্রিয় বিরহে দুঃখ, বাসনার অপূরণে দুঃখ। জীবের এই দুঃখ-সঙ্কুল জীবন দেখিয়া করুণাময় শ্রীভগবান্ গীতাতে অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া জীবসাধারণকে মঙ্গলময়ী বাণী বলিলেন—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"

অর্থাৎ অনিত্য, সুখরহিত এই মর্তলোকে আসিয়া আমাকে ভজনা কর।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে—শ্রীভগবান কি জন্য তাঁহার ভজন করিতে মর্তবাসী জীবকে উপদেশ দিলেন? ইহার উত্তর আমরা পাই গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে – শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের, নিত্য অমৃতের, সনাতন ধর্মের, ও ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা। উপনিষদের বহুস্থানে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—(১) আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি (মুণ্ডক উঃ), (২) আনন্দো-ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ (তৈত্তিরীয় উঃ), (৩) স এষ…… আনন্দোঽজরোঽমৃত : (কৌষী: উঃ), (৪) রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়তি ॥ (তৈত্তিরীয় উঃ), (৫) আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি তৈশ্চন (তৈত্তিরীয় উঃ)। দুঃখ ও সুখ পরস্পর বিরোধী। তাই "সুখভোগ হইতে দুঃখ আপনি পালায়*।" জীবের সকল দুঃখের অবসান হয় ঐকান্তিক সুখ বা পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে পাইলে, ইহা নিঃসন্দেহ। অতঃপর জ্ঞাতব্য বিষয় হইতেছে—শ্রীভগবানের ভজন আমরা কিরূপে করিব। করুণাময় শ্রীভগবান আমাদের কল্যাণের জন্য তাহা বলিয়াছেন :—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

অর্থাৎ আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর. এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে তোমার আত্মা যুক্ত হইলে আমাকে পাইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান পুনরায় বলিলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

অর্থাৎ আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, আমি সত্য সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি তুমি আমাকে পাইবে।

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই অধ্যায়ে ইহাও বলিলেন—"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি" অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন যে জীব তাঁহার প্রিয় এবং তিনি জীবের হৃদয়ে রহিয়াছেন। জীবের সহিত যে তাঁহার ভালবাসার সম্বন্ধ শ্রীভগবান্ তাহা ব্যক্ত করিলেন। এখন কথা এই যে, যদি আমরা সর্বদা মনে রাখি যে আমরা শ্রীভগবানের প্রিয় এবং আমাদের এই হৃদয়-মন্দিরে তিনি বাস করিতেছেন যদিও গোপনে, তাহা হইলে আমাদের অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিবে এবং আমরা আর কখনও তাঁহার অপ্রিয় কোন কার্য করিতে পারিব না, কদাপি কুটিল কুপথে যাইতে পারিব না, কোনরূপ মলিনতা, অপবিত্রতা আমাদের কায়, মন এবং বাক্যে স্থান পাইবে না। কিছুদিনের এইরূপ অভ্যাসে আমরা শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহাতে শ্রদ্ধা অর্জন করিব। তখন বলিতে পারিব :—

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।" (রবীন্দ্রনাথ)
"তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভ'রে।
এ সংসারে রেখেছো তাই ধ'রে,
রইবো বাঁধা তোমার বাহু-ডোরে।" (রবীন্দ্রনাথ)

"Thou hast made us for Thyself, and our hearts can find no rest outside of Thee"—St. Augustine.

শ্রদ্ধার আবির্ভাবে আমরা শনৈঃ শনৈঃ সাধনপথের উচ্চ, উচ্চতর এবং উচ্চতম অধিকার লাভ করিব। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দধাম॥

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রদ্ধার শেষ ফল প্রেমকে "প্রয়োজন সর্বানন্দধাম" বলিয়াছেন

* অন্তরে ঈশ্বর আছেন জান্‌তে পারলে, সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকুতে ইচ্ছা হয়—শ্রীরামকৃষ্ণদেব (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)।

এবং সাধকেরা এই প্রেমকে পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন, কারণ ইহাতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়। সহস্র জন্মের কঠিন সাধনাতে যাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে প্রেমের দ্বারা, তাঁহাকে ভালবাসিয়া, সহজে লাভ করা যায়। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।"

এই অনন্য ভক্তিকে প্রেম বলা হয়। এই প্রেম সহায়ে শ্রীভগবান্ সুলভ, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ। Bible ধর্মগ্রন্থে আছে—God is love and he that dwelleth in love, dwelleth in God and God in him. খ্রীস্টান্ মরমী সাধক (mystic, বলেন – "By love, He may be gotten and holden, but by thought never."

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"অনুরাগ হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসার বুদ্ধি একেবারে চ'লে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।* ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে—

কেবল অনুরাগে তুমি কেনা,
(প্রভু) বিনে অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ
তোমারে কি যায় জানা ?

কোরানে আছে—অনুরাগী সাধকের সম্বন্ধে আল্লা বলিয়াছেন—

"He who seeketh to approach me one cubit, I will seek to approach him two fathoms; and he who walketh towards me, I will run towards him (Mahommad's Table Talk)। কিন্তু তাঁহার দিকে যাইবার পথ দুর্গম। 'দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি।'—(কঠ-উঃ)। সাধক বলেন "আমি যেতে চাই তব পথ পানে, কত বাধা পায় পায় হে" † পথটী সুগম নয়, তাহার কারণ যিনি লীলারস আস্বাদনের জন্য জীব জগৎ সৃষ্টি ‡ করিয়া এবং তাহাতে ওতঃপ্রোতভাবে থাকিয়াও তদূর্ধ্বে নির্বিকার রহিয়াছেন, তিনি জীবমাত্রের ইন্দ্রিয় সকল বহির্মুখ করিয়াছেন – "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" (কঠ-উঃ)। ইহার ফলে জীব প্রবৃত্তি পথের পথিক হইয়াছে, সুখার্থী

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

† রবীন্দ্রনাথ

‡ সোঽকাময়ত বহু স্যাম্, প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। (তৈত্তি-উঃ)। অনেনৈব জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ (ছান্দোগ্য-উঃ)।

হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহির্বিষয় লাভে নানাদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, বহুবিধ আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অনুক্ষণ পীড়িত হইতেছে। আপন হৃদি রত্নাকরের অমূল্য নিধির সন্ধান পায় না।

জীব ইহ জগতে সুখী হইবার জন্য কতই চেষ্টা করে, কতই দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে, কতই অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তবু তাহার ভাগ্যে সুখ জুটে না, জুটে কেবল দুঃখ—"সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখ পাথারে"* কেবলই একটা অতৃপ্তি, একটা অশান্তি, একটা নিরানন্দ তাহাকে সর্বদা ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহার হেতু কি? জীব যাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহধামে আসিয়াছে, তিনি ভূমানন্দ,—সুতরাং ভূমানন্দই জীবের স্বভাবগত। এই পৃথিবীর সান্ত সুখ, খণ্ড আনন্দ, পরিচ্ছিন্ন রস তাহার ভূমানন্দ ক্ষুধা দূর করিতে পারিবে কেমন করিয়া? ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"যো বৈ ভূমা তদমৃতমথযদল্পং তন্মর্ত্যম্"। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" এ সম্বন্ধে Carlyle বলিয়াছেন—Man's unhappiness, as I construe, comes of his greatness. It is because there is an infinite in him, which with all his cunning he cannot quite bury under the finite. Emerson বলিয়াছেন—We are adapted to infinity. We are hard to please and love nothing which ends." সে যে অমৃতের পুত্র, মর্ত্যধামের অনিত্য সুখ কি তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে?

সাধন পথ দুর্গম বটে, কিন্তু শ্রীভগবান্ জীবকে নিঃসম্বলে ইহসংসারে পাঠান নাই। তিনি তাহাকে, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি উত্তম ভূষণে ভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং সংসারে পাঠাইয়া অনেক সদ্বস্তু তাহাকে দান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা সে দুর্গম পথ সুগম করিয়া লইতে পারে। তিনি তাহাকে পিতামাতা দিয়াছেন—পিতৃ, মাতৃভাবে তাঁহাকে আরাধনা করিবার জন্য; স্ত্রী দিয়াছেন, পবিত্র প্রেম ভালবাসা সহায়ে তাঁহাকে পাইবার জন্য; পুত্র দিয়াছেন, বাৎসল্যভাবে তাঁহার ভজন করিবার জন্য; সখা, সুহৃৎ দিয়াছেন, তাঁহাকে সখ্যভাবে পাইবার জন্য; দাস, সেবক দিয়াছেন, তাঁহাকে দাস্যভাবে আরাধনা করিবার জন্য। এ প্রসঙ্গে Emersonএর এই উক্তিটী প্রণিধানযোগ্য—"Beholding in many souls the traits of the divine beauty, and separating in each soul that which is divine from the taint which it has contracted in the world, the lover ascends to the highest beauty, to the love and knowledge of the Divinity, by steps on this ladder of created souls.

কিন্তু আপন দুর্বুদ্ধিবশতঃ জীব সাধনার অনুকূল তাবৎ সকল বস্তুকেই সাধনার প্রতিকূল করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা মুক্তির উপায়, তাহাই বন্ধনের হেতু হইয়াছে। তাহার আপন ভোগ বাসনা, তাহার "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা" তাহার আমিত্বজনিত অভিমান তাহাকে শ্রীভগবান্ হইতে দূরে রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে এক জন পাশ্চাত্য মনীষী এইরূপ লিখিয়াছেন:—"Nothing has separated us from God but our own will, or rather our own will is our

* রবীন্দ্র নাথ

separation from God. All the disorder and corruption and malady of our nature lies in a certain fixedness of our own will, imagination, and desire, wherein we live to ourselves, are our own centre and circumference, act wholly from ourselves, according to our own will, imagination and desires —W. Law এই ভোগ বাসনা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—The self, then, has got to learn to cease to be its 'own centre and circumference': to make that final surrender* which is the price of final peace—Underhill. এই final surrender হইতেছে গীতোক্ত "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

কণ্টকাকীর্ণ সংসার পথে চলিতে চলিতে পুনঃপুনঃ ব্যথিত হইয়া, সুখলাভের সকল প্রয়াস ব্যর্থ জানিয়া এবং নিজেকে অতিশয় দীন, হীন, দুর্বল বুঝিয়া জীব অবশেষে কাতর কণ্ঠে এই রূপ উক্তি করে—

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ? কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই !
কে খেলায় ? আমি খেলি বা কেন ? জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন !
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর—অধীর—যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই !
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল ;
প্রবাহের বারি,—রহিতে কি পারি ? যাই—যাই কোথা ? কূল কি নাই !
কর হে চেতন,—কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?—
যে আছ চেতন, ঘুমা'ও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তব নাশ,—হও হে প্রকাশ,—তোমা বিনে আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই। (কবিবর গিরিশ ঘোষ)

ইহাই সর্বশক্তির আধার শ্রীভগবানে শরণাগতি। তাঁহাতে এই আশ্রয়গ্রহণ আন্তরিক হইলে সাধকের চিত্তে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধার উদয়ে, শনৈঃ শনৈঃ, সাধনার চরম ফল প্রেম লাভ হয়—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার লবেন, তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে।†

প্রেমের পরেই বিরহ। কবীর বলিয়াছেন—"প্রেম জগাবে বিরহ কো" আরও বলিয়াছেন :—কবীর বিরহ বিন্ তন্ শূন্য হৈ বিরহ হৈ সুলতান্।
জো ঘট বিরহ ন সঞ্চারে, সো ঘট জন্ মশান্।

অর্থাৎ প্রেম বিরহকে জাগ্রত করে। এই বিরহ বিনা দেহ একেবারে শূন্য, কারণ

* Do with me what you will.—ইহাই আত্ম-সমর্পণ।
† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

বিরহ হচ্চে রাজা। যে দেহে বিরহের আবির্ভাব নাই, সে দেহ মশানের তুল্য। কবীর বিরহকে সুলতান্ অর্থাৎ বড় সম্পদ বলিয়াছেন, কারণ বিরহ আগুনে পুড়িয়া ভক্তের প্রেম সর্বপ্রকার অভিমান, স্বার্থপরতা, "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা" প্রভৃতি মলিনতা বর্জ্জিত হইয়া নির্ম্মল হয়।

—বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হ'তে

পূজা মূর্তি ধরি প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে। (রবীন্দ্রনাথ)

বিরহে অর্থাৎ শ্রীভগবানের অদর্শনজনিত দুঃখে এবং তাঁহার দর্শন পাইবার ব্যাকুলতাতে ভক্ত অন্তরে খুব ব্যথা অনুভব করেন, কিন্তু অনুক্ষণ ব্যাকুলতা নিবন্ধন তাঁহার প্রাণের আরাধ্য দেবতাতে তন্ময়তা লাভ করেন।

সা বিরহে তব দীনা,
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা। (জয়দেব গোস্বামী)

শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন :—"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহবিরহোনো সঙ্গমস্তস্যা:। সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং তদ্বিরহে।"

অর্থাৎ মিলন বিরহের মধ্যে বিরহ বরণীয়, তাঁহার মিলন বরণীয় নয়; মিলনে একা তাঁহাকে পাই, কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তাঁহাতে ভরিয়া উঠে।

"তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।"—(জ্ঞানদাস)

"আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরস মাস।"—(রবীন্দ্রনাথ)

"যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই, দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে ভুলালে নয়নে,
তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে।"—(নিধুবাবু)

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা

স্বামী শঙ্করতীর্থযতি*

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এ কথাটী বেদান্তে নাই। তবে ইহা বেদান্ত-প্রতিপাদিত বটে। বেদান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে,—এই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ পরিণাম-বিনাশ-শীল; সুতরাং ইহা খাঁটি জিনিস নহে। যাহা পরিণামে টিকে না, তাহা অসত্য—মিথ্যা। এই হিসাবে জগৎ মিথ্যা। যাহা চরমে থাকে, তাহা সত্য। সেই সত্যের নামান্তর হইতেছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অনামক, তথাপি কেবল বোধ-উৎপত্তির জন্য এই নামকরণ করা হইয়াছে।

শিবপুরাণের সনৎকুমার-সংহিতায় আছে,—শিব বলিতেছেন—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অর্থাৎ কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, অর্দ্ধ শ্লোকে তাহা বলিব; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই—অপর কিছু নহে। এই শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায়, অদ্বৈতবাদরূপ মহীরুহ তিনটী শিকড়ের উপর ভর করিয়া দণ্ডায়মান। ১ম ব্রহ্ম সত্য, ২য় জগৎ মিথ্যা, ৩য় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

(ক) ব্রহ্ম সত্য—এই তত্ত্বটী সহজবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহা হৃৎপ্রত্যয় করা সকলের পক্ষেই সুসাধ্য নহে। আত্মা আছে কিনা, এ সংশয় বোধ হয় কাহারো নাই। সকলেই জানে আত্মা আছে—যেহেতু আমি আছি। তবে সংশয় হয়, আমার স্বরূপ লইয়া। আত্মা পদার্থটা কি? উহা কি দেহ, না প্রাণ? না মন? বা বুদ্ধি অথবা আর কিছু? আত্মা অনাদিকাল হইতে এইরূপ নানাবিধ বিতর্কের আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। বোধ হয় সুদূর ভবিষ্যতেও উক্ত বিতর্কের আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারিবে কিনা সংশয়। এ সম্বন্ধে আচার্যপাদ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য বলেন যে,—'বেদাদি শব্দ প্রমাণে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গেলে, যে প্রমাণ উপস্থিত করা হইবে, তাহা প্রকাশ্য কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। তার উপর, শব্দই যখন শব্দ-খণ্ডনে নিযুক্ত, তখন শব্দ-প্রমাণে আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়াও বড় সহজ কর্ম নহে। তাহার উপর, আবার ইন্দ্রিয়গুলি অতিদূর—অতি নিকট—ইন্দ্রিয়ঘাত—মনের অনবস্থান—বিষয়ের সূক্ষ্মতা—ব্যবধান—অভিভব—অনুদ্ভব ও তুল্য বস্তন্তরের সংশ্লেষ রূপ নববিধ দোষে দূষিত। এ অবস্থায় শব্দমাত্র প্রমাণ ধরিয়া সত্য নিরূপণ করিতে না যাওয়াই ভাল। আপ্তোপদেশের সাহায্যে উপলব্ধিই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।' সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীমৎ-শঙ্করের ন্যায় মহাপুরুষ যখন উপলব্ধি মাত্র দ্বারা সত্য নিরূপণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তখন সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আর অধিক বাক্যব্যয় না করাই ভাল।

---

* শ্রীগোবর্দ্ধনপীঠাধীন শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য স্বামী শ্রী১০৮ শ্রীশঙ্করতীর্থযতি মহারাজ

(খ) জগৎ মিথ্যা—(গ) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এই দুইটী তত্ত্ব আমাদের সহজ জ্ঞানের বিরোধী। কেননা,—যে জগৎ আমরা দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, তাহাকে মিথ্যা বলি কিরূপে? আর আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি, অল্প জ্ঞান, পাপপূর্ণ হৃদয়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য, কীটাণুকীট আমি,—কোথায় কোন্ অন্ধকূপে পড়িয়া রহিয়াছি,—আমি কি প্রকারে সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ব্রহ্মের সহিত আমাকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিব? বড় দুঃসাহসের কথা, বড় দাম্ভিকতার কথা!

বস্তুতঃ এই উভয় তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইব যে, সহজ জ্ঞানের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। জগৎ মিথ্যা, এ কথার তাৎপর্য কি, অতঃপর তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ কোন বস্তুর তথ্য নির্ণয়ের জন্য আমাদের মন কোন বিশেষ আকারে আকারিত হইলে, তাহাকে আমরা 'ধারণা' বলি। সুতরাং বলিতে পারা যায়, ধারণাগুলি আমাদের মন হইতে প্রসূত হইয়া আইসে বলিয়া তাহা আমাদের মনের অংশবিশেষ।

দ্বিতীয়তঃ বস্তুর স্বরূপ (The thing-in-itself, apart from our ideas), ইহা মনের বাহিরে অবস্থিত। কেননা, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও আমার idea হইতে পারে। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ একরকম,—তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা হইল অন্য রকম। এরূপ ব্যবহার সর্বদা ঘটে। এই দুইটী মত অনুসারে দেখা যায়, আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থের অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ এস্থলে ইহাই বলা হইল যে, আমাদের মনের মধ্যে জগৎ সম্বন্ধে বিচিত্র ধারণা আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল ধারণা বা Idea ব্যতীত মনের বাহিরে কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র ১ অধ্যায় ১ পাদ ২য় সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে,—"ন তু বস্তু এবং নৈবমস্তি নাস্তি ইতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষ বুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন বস্তু যাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষ বুদ্ধ্যপেক্ষম্। কিং তর্হি? বস্তু তন্ত্রমেব তৎ। ন হি স্থাণা বেকাস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষোঽন্যো বেতি মিথ্যা জ্ঞানম্। স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং। বস্তুতন্ত্রত্বাৎ—এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্।" ইহার ভাবার্থ এই যে,—কোন একটী বস্তু দেখিয়া, ঐ বস্তুটী এই রকম, বা এই রকম নহে, আছে বা নাই, এই প্রকার ধারণা হয় না। কারণ, পুরুষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নানারূপ কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু নিজ বুদ্ধি অনুসারে বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নানারূপ হইতে পারে না। তাহা হইলে বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কাহার দ্বারা নির্ধারিত হয়? একটী স্তম্ভ দেখিয়া ইহা স্তম্ভ বা পুরুষ এরূপ নানাবিধ জ্ঞান হইলে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে না। এক্ষেত্রে স্তম্ভকে পুরুষ বলিয়া জানা মিথ্যাজ্ঞান, স্তম্ভ বলিয়া জানা তত্ত্বজ্ঞান। কারণ এই তত্ত্বজ্ঞান বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর অধীন। এই ভাবে কোন বস্তুর প্রামাণ্য ঐ বস্তুর অধীন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা

ব্যতীত, বস্তুটীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। পুনঃ, আমাদের মনের ধারণা ব্যতীত বাহ্যবস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই, এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায় ২য় পাদ ২৮ সূত্র "নাভাব উপলব্ধেঃ" এই সূত্রভাষ্যে ভগবান্ শাঙ্করাচার্য বলেন—"ন খল্বভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতি প্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চ উপলভ্যমানস্য এব অভাবঃ ভবিতুমর্হতি। * * ননু নাহং ব্রবীমি ন কশ্চিদর্থমুপলভ ইতি। কিন্তু উপলব্ধি ব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি। বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য। ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি। যত উপলব্ধিব্যতিরেকোঽপি বলাদর্থস্য অভ্যুপগন্তব্যঃ, উপলব্ধেরেব। ন হি কশ্চিৎ উপলব্ধিমেব স্তম্ভঃ কুড্যং চেত্যুপলভতে। উপলব্ধি বিষয়ত্বেনৈব তু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্বে লৌকিকা উপলভন্তে।"

ইহার ভাবার্থ এই যে,—বাহ্য বস্তু নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। কেন? যেহেতু তাহার উপলব্ধি হয়। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যয়ের সময় বাহ্যবস্তু উপলব্ধ হইয়া থাকে। স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট এই প্রকার। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। * * (বিজ্ঞানবাদী হয়তো বলিবেন) আমিত বলিতেছি না যে, কিছুই উপলব্ধি হয় না, কিন্তু উপলব্ধি ব্যতীত কিছুই উপলব্ধ হয় না। (তদুত্তরে আচার্যপাদ বলিতেছেন) তা' তুমি বলিতে পার, কারণ তোমার তুণ্ড নিরঙ্কুশ অর্থাৎ তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া থাক; কিন্তু তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অর্থ অর্থাৎ বিষয় যে উপলব্ধি হইতে ভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেতু ঐরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেহ উপলব্ধিকেই স্তম্ভ বা ভিত্তিরূপে অনুভব করে না। সকলেই স্তম্ভভিত্তি প্রভৃতিকে উপলব্ধির বিষয়রূপেই অনুভব করিয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে,—অদ্বৈতবাদী যদি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে 'জগৎ মিথ্যা' বলেন কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে,—অদ্বৈতবাদীর মতে বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্তা দুই প্রকার। ১ পারমার্থিক, ২ ব্যবহারিক। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। পারমার্থিক সত্তা এক ব্রহ্মের আছে। আর কিছুরই নাই। বাহ্যবস্তুর নাই, বাস্তবস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা idea-রও নাই। কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা উভয়েরই আছে। অর্থাৎ যদি স্বীকার করা যায় যে, আমাদের জগৎবোধ রহিয়াছে, (যদি ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়) তাহা হইলে বাহ্যবস্তুরও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়। ইহার নাম ব্যবহারিক সত্তা।

যে বস্তু সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকে, তাহার পারমার্থিক সত্তা আছে বলা যায়। তাহাই প্রকৃত সত্য। আর যাহা সর্বদা সর্বত্র বর্তমান নহে, তাহার সত্তা ব্যবহারিক সত্তা। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে ব্যবহারিক সত্তাবান বলিতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, তাহাদের স্বতন্ত্রসত্তা ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। বস্তুতঃ যাহা প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা সর্বদা সর্বত্র থাকা উচিত। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, "না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"—যাহা 'আছে', তাহা কখনও কোন অবস্থায় 'নাই' হইতে পারে না। যাহা এখানে আছে সেখানে

নাই, যাহা আজ আছে কাল নাই, যাহা আজ এক রকম দেখি, কাল আর এক রকম হইয়া যায়, তাহার থাকা প্রকৃত থাকা নহে! জগতের যাবতীয় পদার্থ এইরূপ। কারণ তাহারা অনিত্য ও সসীম। আকাশও অনিত্য। মহাপ্রলয়ে একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সত্য (ব্রহ্মই) ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। সুতরাং এরূপ বিচারাবলম্বনে বলিতে পারা যায়, জগতের যাবতীয় পদার্থের পারমার্থিক সত্তা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, জগতের যাবতীয় পদার্থকে অনিত্য বলিতে পার, ক্ষুদ্র বা সসীম বলিতে পার কিন্তু মিথ্যা বল কিরূপে? এই একটি ফুল রহিয়াছে, দুই দিন পরে ইহা থাকিবে না বটে, কিন্তু এক্ষণে এই স্থানে ইহা রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার কর কি করিয়া? একথার উত্তর দিতে হইলে, 'এক্ষণ' ও 'এইস্থান' এই যে দুইটী শব্দ ব্যবহার করা হইল, এই শব্দ দুইটীর অর্থ প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। নিত্য ও অসীম আত্মার পক্ষে 'এক্ষণ' ও 'এইস্থান' কি? আত্মার নিকট সর্বক্ষণই 'এক্ষণ,' সর্বস্থানই 'এইস্থান'; আমাদের ব্যবহারিক অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই আত্মার নিকট যুগপৎ বর্তমানের ন্যায়। যেহেতু কোন স্থান তাহার পক্ষে দূরে অবস্থিত নহে, সকল স্থানই নিকটবর্তী। সুতরাং ইহা দূরে, ইহা নিকটে, ইহা বর্তমান, ইহা অতীত, ইহা ভবিষ্যৎ, আত্মার এই বোধ হইতে পারে না। আমরা আমাদিগকে দেহবদ্ধ ও জন্ম-মরণশীল মনে করি, কেবল সেইজন্যই আমরা অখণ্ড দেশ ও অনাদি প্রবাহিত কালের নাম প্রভেদ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। দেহমুক্ত, কোনরূপ বাধাহীন আত্মার পক্ষে সে সকল প্রভেদ বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং অনন্ত আত্মার পক্ষে কোন বস্তু এক্ষণে এইস্থানে আছে বলিলে বুঝিতে হইবে, বস্তুটি সর্বদা সর্বত্র রহিয়াছে। যেহেতু আত্মার পক্ষে এইক্ষণ মানে সর্বক্ষণ, এইস্থান মানে সর্বস্থান। জগতে কোন পদার্থ সর্বত্র ও সর্বদা বিদ্যমান নাই। সুতরাং অনন্ত আত্মার দৃষ্টিতে জগতের কোন পদার্থ সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না যে,—ইহা এক্ষণে ও এইস্থানে আছে, অর্থাৎ মিথ্যা। ইহাই পারমার্থিক দৃষ্টি। কারণ নিরংশ ও নিত্যতা এবং অসীমতাই আত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। ইহার অংশত্ব, অনিত্যতা ও পরিচ্ছিন্নতা কাল্পনিক ব্যাপারমাত্র।

গণিতের সাহায্য লইয়া তত্ত্বটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কোন একটি বস্তু লওয়া হউক। ঐ বস্তুটি যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছে, অনন্ত আকাশের তুলনায় তাহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ইহা যে পরিমাণ সময় ব্যাপিয়া বর্তমান থাকে, অনন্ত কালের তুলনায় তাহা যারপর নাই ক্ষুদ্র। যাহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র, তাহা নগণ্য। অর্থাৎ Zero, Zero is that which is infinitely small. সুতরাং অসীম আকাশ ও অনন্ত কালের তুলনায় ঐ গৃহীত বস্তুটি যে সময় ও যে স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহা শূন্যমাত্র। অর্থাৎ অসীমের দিক দিয়া দেখিলে, ঐ বস্তুটির অস্তিত্বই নাই। জগতের অনিত্য ও সসীম সকল পদার্থ সম্বন্ধেই এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অসীমের দিক হইতে দেখিলে তাহাদের অস্তিত্ব

নাই; যেহেতু জগতের যাবতীয় পদার্থই অনিত্য ও সসীম। এইরূপ **পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা।** এই ভাবে অসীমের দিক হইতে দেখিলেই পূর্ণ সত্য গ্রহণ করা হয়। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে যে বস্তু দেখি, তাহাতে পূর্ণ সত্য গ্রহণ করিতে পারি না। যেহেতু আমাদের মন স্বভাবতঃই বিষয়বাসনা, রাগ, দ্বেষ ও লোভাদি দ্বারা কলুষিত থাকে,—অপিচ আমাদের জন্মগত অভ্যাস দ্বারা আমাদের চিত্ত সর্বদাই বহির্মুখ-বৃত্তিপরায়ণ। সুতরাং বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের হাত এড়াইয়া আমরা চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখ করিতে পারিনা,—এজন্য আমরা দেখিবার সময় দেশ ও কালের ক্ষুদ্র অংশমাত্র গ্রহণ করি। কাজেই অধিকাংশ দেশ ও কাল আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকিয়া যায়। কিন্তু অসীমের দিক হইতে দেখিবার সময় আর দেশ ও কালের কোন অংশ দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে না বা থাকিতে পারে না; সমগ্র দেশ ও কালই দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব **অসীমের দিক হইতে দেখাই পারমার্থিক দৃষ্টি।** তথাপি এভাবে দেখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; কারণ অনন্ত কাল ও অসীমের ধারণা করিতে আমরা অভ্যাস করি নাই, এজন্য আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র ও শান্ত। এরূপ হৃদয়ের দ্বারা অনন্তের ধারণা করা যায় না। হৃদয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে পর, আত্মা অনন্তের ধারণা করিতে সামর্থ্য লাভ করে। ব্রহ্ম দর্শন হইলে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তাই শ্রুতি আছে যে,—

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই ব্রহ্মকে জানিলে, হৃদয়ের বন্ধন ভিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবাত্মা বন্ধন মুক্ত হয়, এবং তখন সে অনন্তের ধারণা করিতে যোগ্যতা লাভ করে। তখন সেই মুক্ত আত্মা দেখিতে পায় যে, জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা এক ব্রহ্ম সত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। তখনই সে বুঝিতে পারে বা উপলব্ধি করিতে পারে যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত এ বোধ হয় না। কারণ জগতের পদার্থ সকল যে পরিমাণ দেশ ও কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহা অসীম আকাশ ও অনন্ত কালের তুলনায় নগণ্য; কিন্তু পরিমিত দেশ ও কালের তুলনায় নগণ্য নহে। ব্রহ্মের অদর্শন পর্যন্ত, পরিমিত দেশ ও কালেরই ধারণা হয়, অনন্ত দেশ ও কালের ধারণা হয় না। অতএব যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততদিন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য সেই অস্তিত্বের নাম ব্যবহারিক সত্তা।

বাহ্য বস্তু এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যবর্তী ধারণা,—এতদুভয়ের মধ্যে, বিজ্ঞানবাদী বলেন প্রথমটি কল্পিত পদার্থ, উহার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই; দ্বিতীয়টী বাস্তবিকপক্ষে আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, যথার্থ কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে উহাদের মধ্যে কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। **যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে, আর কাহারো নাই। সুতরাং জগৎ মিথ্যা।** কিন্তু যে হিসাবে বলা যায়, আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি ধারণা আছে সেই হিসাবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ধারণা ব্যতীত বাহ্যবস্তুও

আছে। ইহা ব্যবহারিক সত্তা। তবেই ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়,—মায়া তাহার মূলীভূত,—আবার মায়া-বশে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদীর মতে কার্য, কারণ ব্যতীত একটা কিছু নহে। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪ সূত্রে আছে "তদনন্যত্বং আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অনন্য; কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে,—"যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞানেন সর্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি। বাচারম্ভণং বিকারো নাম মাত্রং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।"—হে সোম্য, একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে যেমন যাবতীয় মৃণ্ময় পদার্থ জানিতে বাকি থাকে না, কেবল বাক্যমাত্রে মৃত্তিকা বিকারকে স্বতন্ত্রভাবে আছে বলা হয়,—ইহা নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য। সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিলে বিশ্বজগৎ জানিতে পারা যায়। আরও এক কথা, কারণগত বস্তুটি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, কার্যরূপে পরিচিত হয়। উভয়ের মধ্যে অবস্থাগত প্রভেদ থাকিলেও বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং এখানে কারণ ও কার্যকে এক বলিয়া স্বীকার করা গেল। রসায়ন শাস্ত্রেরও একটি মূল সিদ্ধান্ত এই যে, রাসায়নিক সংযোগদ্বারা বিভিন্ন পদার্থের আবির্ভাবের সময় কোন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না। রাসায়নিক সংযোগের পূর্বে যে বস্তু ছিল, তাহারই পরমাণুগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সজ্জিত হইয়া নূতন পদার্থের ন্যায় দেখায়; কিন্তু নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তও ঠিক এই রাসায়নিক সিদ্ধান্তের অনুরূপ। যেহেতু ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, জগৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত একটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ বস্তুই কখন কখন জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছেন,—জগৎ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই। জগৎ ও জগতের মধ্যস্থিত যত বস্তু, তাহা সেই ব্রহ্মই। এই বিচারে ব্রহ্মই সত্য সুতরাং জগৎ অনিত্য, মিথ্যা হইতেছে।

এস্থলে ইহাও বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্ম হইতে যদিও জগৎ উৎপত্তি হয়, তথাপি জগদুৎপত্তির পূর্বে ও পরে ব্রহ্মের কোনরূপ বিকার বা পরিবর্তন হয় না। একথা বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তির ন্যায় নহে। অস্পষ্ট-দৃষ্ট শুক্তিতে যেরূপ রজতভ্রম হয়,—ইহা সেইরূপ। কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণে এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না যে, অদ্বৈতবাদীর মতে বাহ্য জগতের কোনরূপ অস্তিত্ব নাই,—ইহা মনের কল্পনামাত্র। যেহেতু অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তিতে রজত ভ্রমও শুদ্ধ-মনের কল্পনা নহে। তাঁহাদিগের মতে রজতভ্রমের সময় মনের বাহিরে পূর্বদৃষ্ট রজতের ন্যায় এক প্রকার রজতের উৎপত্তি হয়। অদ্বৈতবাদী ইহার নাম দিয়াছেন 'প্রাতিভাসিক রজত', ইহা সাধারণ রজতের ন্যায় নহে। যতক্ষণ আমাদের রজত বোধ থাকে, ততক্ষণ এই প্রাতি-ভাসিক রজতও বর্তমান থাকে, ভ্রম নিবৃত্তিমাত্র প্রতিভাসিক রজতও লয় হয়।

এ সকল কথা আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, 'জগৎ মিথ্যা' ইহার অর্থ, জগতের সকল পদার্থ ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী। এই অনন্ত কাল প্রবাহের মধ্যে জগতের তাবৎ পদার্থ

জলবুদ্বুদের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কিছুক্ষণ পরে সেই কাল সাগরে মিশাইয়া যাইতেছে। তাই অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—হে মায়ামুগ্ধ মানব! এই সংসার অনিত্য ও অসার; কেন এই মিথ্যা সংসারে মজিয়া থাকিয়া, সেই পরম সত্যকে ভুলিয়া রহিয়াছ? এই অলীক আসক্তি ত্যাগ কর। যাহা অনিত্য ও অশেষ দুঃখের আকর, তাহা ছাড়িয়া নিত্য ও অনন্ত সুখের আশ্রয় লও। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদীরা এই অর্থেই 'জগৎ মিথ্যা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

তারপর (গ) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আমরা সহজ বুদ্ধিতে জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহা কল্পনা করিতেও সাহস পাই না; বিচার ত দূরের কথা। কথাগুলি বুঝি আর না-ই বুঝি, আলোচনায় কোন দোষ নাই; এই বিবেচনায় এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

কোনও বিশিষ্ট প্রতিবন্ধকবশতঃ এ তত্ত্ব আমাদের হৃদ্বোধ হয় না। সেই প্রতিবন্ধকটির নাম মায়া। পরমাত্মার শক্তির নাম মায়া। সূর্যের আলোকে চন্দ্রমার দীপ্তির ন্যায়, পরমাত্মার সাহায্য ক্রমে মায়াই এই জগৎরচনা করে। গীতাতে আছে, "মম মায়া দুরত্যয়া"। বিশেষতঃ এই মায়াসম্বন্ধ থাকা হেতুতেই পরমেশ্বর লোকপ্রতীতির বিষয় হন। ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন,—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্বভূতগুণৈর্মুক্তং নৈব মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥

হে নারদ, আমি যে মায়া সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রভাবেই তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ; নচেৎ সর্বপ্রকার ভূতগণ অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিরহিত আমাকে কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এই মায়ার সম্বন্ধে অতিসুন্দর একটি শ্রুতি আছে, তদ্‌যথা—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত কর্হিচিৎ, তাং বিদ্যাদাত্মনো মায়া।"

অর্থাৎ কোন বস্তুর অভাবেও যাহার প্রতীতি হয়, অথচ পারমার্থিক বা তত্ত্বদৃষ্টিতে কোথায়ও যাহার সত্তা থাকে না, তাহাকে আত্মার মায়া বলিয়া জানিবে।

কোষাকার কীট যেমন আপনাকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া কোষমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ এই প্রকট জগতে পরমাত্মা সর্বতোভাবে মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আছেন। গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন জরায়ুদ্বারা সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত থাকে, পরমাত্মাও তেমন, এই দৃশ্যমান জগতে মায়াদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এই মায়ার আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন ইহা বুঝিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ।
নহ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে॥

অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞগণ ভিন্ন, অপর কোন ব্যক্তিই যথার্থরূপে তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয় না। এবং অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান রহিত কোন পুরুষই ক্রিয়ার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে পারে না।

যুক্তি ও বেদান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্ত্বদর্শীগণ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, "নেহ

নানাস্তি কিঞ্চন"—জগতে নানা কিছুই নাই। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"—সৃষ্টিকর্তা মায়াদ্বারা বহুরূপ হন। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"—অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল। "দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ংভবতি"—দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে। "ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি"—তাহা অপেক্ষা দ্বিতীয় কেহ নাই। "যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ"—যে অবস্থায় এই সমস্তই ইহার আত্ম-স্বরূপ হয়। এবংবিধ বহুশ্রুতি ও বেদান্তের উক্তিদ্বারা তাত্ত্বিকগণের পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে, চরমে একমাত্র সত্য থাকে, আর কিছু থাকে না। যাহার নাম সত্য, তাহাই ধর্ম, তাহাই ব্রহ্ম।

ব্যাস স্মৃতিতে আছে,—

তমঃ শ্ব ভ্রমিভং দৃষ্টং বর্ষবুদ্বুদ সন্নিভম্।
নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমভাবগম্॥

বিবেকিগণ কর্তৃক অন্ধকারস্থ ভূগর্ভের ন্যায় দৃষ্ট এই বিশ্ব বর্ষার জলবুদ্বুদ সদৃশ। ইহা বিনাশবহুল, সুখহীন এবং বিনাশের পরই অভাব প্রাপ্ত হয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানমাত্রই অবিদ্যাধিকৃত। অবিদ্যা, প্রধান, অব্যক্ত, প্রকৃতি, ভ্রান্তি ও মিথ্যা এগুলি মায়ারই নামান্তর। এজন্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানকে মায়া বলা হইয়া থাকে। পরমাত্মা মায়া দ্বারাই জন্মলাভ করেন, কিন্তু—প্রকৃত পক্ষে নহে। কারণ একই বস্তুতে সত্য সত্যই জন্মহীনতা ও বহুপ্রকার জন্মপরিগ্রহ কখনই সম্ভবে না। যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা ও শীতলতা সম্ভবেনা, তদ্রূপ। অসত্য পদার্থের মায়িক বা পরমার্থিক কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না। যেহেতু মায়াদ্বারা বা প্রকৃত পক্ষেই,—কোনরূপে বন্ধ্যার পুত্র জন্মে না।

রজ্জুতে যখন সর্পভ্রান্তি জন্মে, তখন কেবল রজ্জুর কথাই মনে পড়ে না,—মনে পড়ে এটা কি লাঠী, না জলধারা, না রজ্জু—ইত্যাদিরূপে কল্পনা হইতে থাকে। তেমনি আত্মাতে পরমার্থ সত্তাশূন্য প্রাণাদি অনন্ত পদার্থের কল্পনা হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যায় যে এটা রজ্জু, ততক্ষণ যেমন সর্প ভয় যায় না,—তেমন যতক্ষণ আত্মার স্বরূপ-সত্তা উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ ইহা প্রাণ, না মন, না বুদ্ধি, অথবা ইহা অহঙ্কার ইত্যাকার নানাবিধ ভ্রান্তি জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়। এই যে ভ্রান্ত কল্পনা, ইহাই মায়া।

এই ভ্রান্তি বা মায়াবশে নানাবিধ সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বীরা এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে,—

১। অস্তিবাদী বৈশেষিকদিগের মত এই যে,—দেহ ও প্রাণাদি হইতে পৃথক একটি আত্মা আছে, সেই আত্মাই সুখ ও দুঃখাদির অনুভবিতা।

২। নাস্তি অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের কথা এই যে,—হাঁ, আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত বটে, কিন্তু বুদ্ধি হইতে পৃথক আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই; পরন্তু প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-ধ্বংসশীল বুদ্ধিবিজ্ঞানই সেই আত্মা।

৩। অস্তি-নাস্তি-বাদী অর্থাৎ ক্ষণিক দিগম্বর মাধ্যমিক বৌদ্ধের মত এই যে,—আত্মা আছেও বটে, নাইও বটে; কারণ আত্মা দেহাতিরিক্ত হইলেও,—দেহ পরিমিত। যাহার দেহ

যে পরিমাণ, তাহার আত্মাও সেই পরিমাণ। সুতরাং দেহের যতক্ষণ স্থিতি, আত্মারও ততক্ষণ স্থিতি ; সুতরাং দেহের নাশেই আত্মারও নাশ।

৪। নাস্তি-নাস্তি-বাদী—অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত এই যে, না, আত্মা বলিয়া কোন একটি স্থায়ী সত্য পদার্থ নাই, শূন্যই বস্তুর শেষ পরিণাম, সুতরাং শূন্যই পরমার্থ সত্য। অতএব আত্মাও শূন্যস্বভাব।

এই সকল সাম্প্রদায়িক মত বিচার করিয়া অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন যে,—উপরের লিখিত মত চতুষ্টয়ের বাদীগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবটিকে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাক্ সে কথা। যাঁহাদের বিষয়ানুরাগ, ভয়, দ্বেষ এবং ক্রোধাদি সমস্তদোষ সর্বক্ষণের জন্য অপগত হইয়াছে, এবং যাঁহারা বেদার্থের তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, বেদান্তার্থ নিরূপণতৎপর সেই সমস্ত মুনিগণ কর্তৃক অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন মননশীল জ্ঞানীগণ কর্তৃক এই আত্মা নির্বিকল্প অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্পনাসম্বন্ধরহিত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।

স্বীকার করিলাম, পরমাত্ম পদার্থ যদি উপরের বর্ণিত মতই নির্বিকল্প, এবং অপরিণামী, তবে তিনি আবার মায়াদ্বারা আবরিত হন কেন ? একথা যথার্থ বটে যে পরমাত্মা আমাদের নিকট মায়াদ্বারা আবরিত রহিয়াছেন,—কিন্তু সত্য সত্যই নহে।

শুদ্ধ ও স্বচ্ছ স্ফটিকখণ্ড রক্ত জবার সান্নিধ্যে থাকিলে স্ফটিকখণ্ডকে রক্তাভ দেখায়, কিন্তু তাই বলিয়া স্ফটিকখণ্ড কি সত্য সত্যই রক্তাভ ? তদ্রূপ ব্রহ্ম বা আত্মপদার্থে এই মায়া আরোপিত হইলেও, মায়া এই ব্রহ্ম ছাড়া নহে। আত্ম নামক পদার্থ যখন আপনাকে অপ্রকট রাজ্য হইতে প্রকট জগতে আনিতে চাহেন, তখন যে ইন্দ্রজাল বিদ্যার আশ্রয় লন, সেই বিদ্যাটি আত্মপদার্থ হইতে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মপদার্থ ও মায়া দুই-ই অভিন্নপদার্থ বলিয়া জানা যাইতেছে।

জল ও জলবুদ্বুদ, অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মৃত্তিকা ও মাটির পাত্র, স্বর্ণ ও স্বর্ণবলয় যেমন নিয়তই অপৃথক, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি মায়াও তদ্রূপ নিয়তই অপৃথক। সুতরাং ব্রহ্মে মায়িক ব্যবহার অরোপিত হইলেও তাহা ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে, অপিচ তদ্ধেতু ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বও নষ্ট হয় না।

ব্রহ্মের নাম ও রূপ কল্পনা, এই উভয়ই আমাদের অজ্ঞান কৃত। ব্রহ্ম কোন নাম বা শব্দ দ্বারা অভিহিত হন না, এবং প্রমাণাদি দ্বারা কোন প্রকারে নিরূপিতও হন না, এজন্য তিনি অনামক এবং অরূপক। যেমন আগন্তুকদোষবশতঃ রজ্জুতে সর্প, ঊষর ভূমিতে উদক, শুক্তিতে রজত, ও গগনে মালিন্য আরোপিত হইয়া থাকে,—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ঐ সমস্ত ধর্ম উহাদের স্বাভাবিক নহে,—তেমনি অলুপ্তশক্তি সেই আত্মার যে সংসার—অর্থাৎ জন্ম মরণ সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ,—সে সমুদয়ও উপাধিকৃত,—অর্থাৎ অন্যের সম্বন্ধ বশতঃ

উৎপন্ন, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ নহে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ নিরুপাধিক, নির্বিশেষ, নেতি নেতি রূপে নিষেধমুখে নির্দেশযোগ্য, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী, সর্বান্তর, অন্তর্যামী, সর্বশাসনকর্তা ও উপনিষদ-প্রতিপাদ্য অক্ষর পুরুষ এবং বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

আমাদের হাতের মধ্যে পাঁচটী অঙ্গুলী; ইহার একটির নাম বৃদ্ধা, একটি তর্জনী, একটি মধ্যমা, আর একটি কনিষ্ঠা। এখানে মাত্র ৪টির নাম পাওয়া গেল। একটির কোন নাম নাই। যেটির কোন নাম নাই, সেইটি অনাম। এজন্য ঐ অঙ্গুলীর অনামিকা এই নামকরণ হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত যেরূপ,—ঠিক সেইভাবে বুঝিতে হইবে যে, সেই অনাম ও নিষ্কল সৎপদার্থ, অনামিকার ন্যায়, সর্বপ্রকার নামবর্জিত। তবে যে আমরা আত্মা, ব্রহ্ম, সৎ, চিৎ ইত্যাদি নামকরণ করিয়া লইয়াছি, উহা আমাদের মধ্যে পরস্পরের অন্তরের ভাব বিনিময়ের জন্য। এ সম্বন্ধে শ্রুতি এই যে,—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্—ইহা কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র। ইহা লোকের মুখে মুখে থাকে। এরূপ শব্দের কোন মূল্য নাই।

আমাদের হৃদয়স্থ পদ্মাকার মাংসখণ্ড বুদ্ধির স্থান। বুদ্ধি পদার্থটি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ; এজন্য বুদ্ধিতেই আত্মচৈতন্য প্রতিফলিত হয়। তদ্ধেতু বুদ্ধিতেই আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। তাহার পরেই মনের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ। সেই কারণে বুদ্ধির সাহায্যে মনেতে আত্মভ্রান্তি উপস্থিত হয়। তাহার পরেই মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। এজন্য ইন্দ্রিয়তেও চৈতন্যের আভাস হয়, এবং আত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই প্রণালীতে ক্রমে স্থূলদেহ পর্যন্ত আত্মভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। এই কারণে, জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, ইহা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে ধরিতে পারি না।

স্বভাবতঃ স্বচ্ছ বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব পাত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তিটি একেবারে আত্ম আকারে আকারিত হয়। তখন মন, তদীয় গ্রাহ্যবিষয় উপস্থাপিত না করিলে, বুদ্ধি ভোগ করিতে পারে না। এজন্য বুদ্ধি তখন মনের সাহায্য চাহে। ইন্দ্রিয়গণ বাহির হইতে বিষয় আনিয়া মনকে উপঢৌকন না দিলে, মনও কিছু করিতে পারে না। এজন্য মনকে ইন্দ্রিয়াপেক্ষিত বলিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণও দেহের আশ্রয় না পাইলে, কিছুই করিতে পারে না। এজন্য ইন্দ্রিয়গণ দেহাপেক্ষী। এইরূপে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে আত্ম-চৈতন্যে বুদ্ধি প্রভৃতি যথাসম্ভব অধ্যাস হইয়া থাকে। পরীক্ষার জন্য মরকত মণিকে দুগ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই দুগ্ধ যেমন মরকত মণির সমান আভাযুক্ত দেখায়, অথচ দুগ্ধের কিন্তু তাহা স্বাভাবিক রূপ নহে—তেমনি এই আত্মজ্যোতি হৃদয় অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন, হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়াও হৃদয় ও দেহেন্দ্রিয় সমষ্টিকে একসঙ্গে স্বীয় জ্যোতিঃ প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া থাকে। তন্নিমিত্তই সহজ বুদ্ধিতে আমরা আত্মার সহিত আমাদের অভেদ বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

আমাদের এই পরিদৃশ্যমান পরিপাটী জগৎটি সদসদাত্মক। অর্থাৎ সৎ ও অসতের সমবায়ে রচিত। একথা আরও পরিষ্কার ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, জড় ও চৈতন্যের

মিশ্রণে এই জগতের উৎপত্তি। অর্থাৎ এই জগৎ চিৎ-জড়-গ্রন্থি। নিরবচ্ছিন্ন জড় বা নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সাহায্যে এমন পরিপাটি জগদুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। জগৎ মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

নাট্যশালার অভিনেতৃগণের মধ্যে রমেশ চক্রবর্তী দুষ্মন্ত সাজিয়াছেন। সে সত্য সত্যই কিন্তু দুষ্মন্ত নহে। তবে যে আমরা তাহাকে দুষ্মন্ত বলিয়া মনে করিতেছি, ইহার নাম অধ্যাস বা আরোপ। আমাদের পরিচিত রমেশ দুষ্মন্ত সাজিয়াছে, ইহাত আমাদের জানাই আছে, তথাপি, আমরা অভিনয় দর্শনকালে কিয়ৎকালের জন্য রমেশকে ভুলিয়া, দুষ্মন্তকে দেখি। এই দৃষ্টান্ত যেরূপ—ঠিক্ তেমনি ভাবে বুঝিতে হইবে যে, যতক্ষণ সৃষ্টি ব্যাপাররূপ নাট্যমঞ্চের অভিনয় অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ আমরা ব্রহ্মকে দেখিনা,—দেখি মায়া। যেই সৃষ্টি ব্যাপার সাঙ্গ হইয়া যায়, নাট্যশালার যবনিকা পড়িয়া যায়, তখন আমাদের পরিচিত রমেশের ন্যায় ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারি। সুতরাং মায়ার হাত এড়াইতে না পারিলে, আর ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। জগতের ব্যবহারিক সত্ত মায়িক। যাহার বাহ্যাসক্তি যে পরিমাণে কমিয়াছে, তিনি ব্রহ্মদর্শনের পথে ততদূর অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কাঁচপোকা, তৈলপায়িকা ধরিয়া আপন আবাসে লইয়া যায়। কিছুদিন পরে সেই তৈলপোকাটি কাঁচপোকার আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়। তদ্রূপ আমরাও যে কোন মনুষ্য, তন্মনা হইয়া পরমার্থ চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিলে, আপনাপন ভাবনানুরূপ মনোবৃত্তি লইয়া বহির্জগতে বিচরণ করি, তদবস্থায় আমাদের নাম হয় জীবন্মুক্ত। এবংবিধ উপায় অবলম্বনে আমাদিগের ন্যায় সংসারাসক্ত মনুষ্যগণই, জগতের অনিত্যতা দর্শন করিয়া বিচারপূর্বক কালক্রমে আত্মবিদ হইয়া এই জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হন। যতক্ষণ, আত্মদৃষ্টি না খুলে ততক্ষণ নানারূপ সংশয়জালে সমাকীর্ণ হইয়া আমরা বারংবার জন্মমৃত্যুরূপ অনন্তদুঃখ ভোগ করিতে থাকি। অতঃ—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্ দর্শননিষ্ঠয়া॥"

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

রঘুনাথ শিরোমণি

শ্রীনলিনবিহারী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বি. এ.

ন্যায়শাস্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক মহর্ষি গোতমের জীবন চরিত যেরূপ অজ্ঞাত "নব্যন্যায়ের" অসাধারণ ব্যাখাতা মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির জীবনীও সেইরূপ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত না হইলেও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে। পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত কয়েকটী প্রবাদ ভিন্ন এই অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের জীবনী জানিবার কোন উপায় নাই। এই সকল প্রবাদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে তাঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্ট। তিনি নবদ্বীপে ও মিথিলায় শিক্ষা লাভ করিয়া শেষ জীবন নবদ্বীপেই অতিবাহিত করেন। কাহারও মতে তাঁহার আদি নিবাস পশ্চিম বঙ্গে (রাঢ়ে)। তিনি পূর্বপ্রবাদমতে কাত্যায়ণ গোত্রীয়। পর প্রবাদানুসারে শাণ্ডিল্য-গোত্রসম্ভূত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়। যাহা হউক আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার দান কতখানি তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারতের যে স্থানেই হিন্দুদর্শনের আলোচনা হয় সেই স্থানেই মহামতি রঘুনাথের নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। উহা বঙ্গবাসীর কম গৌরবের বিষয় নয়। দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে তাঁহার দান সত্যই অতুলনীয়। তিনি নূতন কোন দার্শনিক প্রণালীর আবিষ্কার করেন নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন বিচার ধারার উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা নূতন প্রণালী আবিষ্কার করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তত্ত্বাংশে তিনি প্রাচীন হইলেও বিচার পরিপাট্যে সত্যই অপূর্ব। খ্রীস্টীয় ১৫ শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাবের পর হইতে ন্যায়গ্রন্থ সমূহের ত কথাই নাই, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি গ্রন্থসমূহও টীকা টিপ্পনীদ্বারা অপূর্বরূপে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে লিখিত সমস্ত প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যেই তাঁহার মনীষার পরিচয় স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। এমন কি ব্যাকরণ, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থসকল তাঁহার বিচার পদ্ধতির ধারায় উদ্ভাসিত। ইংরেজী দর্শন শাস্ত্রে Bacon এর আবির্ভাবে যেমন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, Kant এর আগমনে জার্ম্মান দার্শনিক জগতে ও সমগ্র ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তার যেমন অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, রঘুনাথের আবির্ভাবেও ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রে সেইরূপ বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ) মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সমৃদ্ধ আর্য কৃষ্টির (culture) মধ্যে ন্যায় শাস্ত্রের স্থান কোথায় তাহা তিনি সম্যক নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। আমরা তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল ইত্যাদি আলোচনাকে মস্তিষ্কের অপব্যবহার বলিয়া যতই বড়াই করি না কেন, ন্যায়ের ভাষা না থাকিলে আমাদিগের চিন্তাজগতের তত্ত্বগুলি যে বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় অতি অল্প আলোচনার ফলেই ভূতলশায়ী হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অতীন্দ্রিয় আলোচনার স্থলে ন্যায়শাস্ত্রের দান অস্বীকার করা যায় না। কারণ বিশ্বাস ভাল, কিন্তু বিচার তাহার মূলকে আরও দৃঢ়তর করে। এই বিচার প্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা নির্ণয়ে মহামতি রঘুনাথের প্রতিভা অসাধারণ। বেদান্তের মননস্থানীয় ন্যায়শাস্ত্রকে তিনি অতি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা-কৌশলে ভারতের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি তাঁহারই 'টীকা'র উপর 'টীকা' রচনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, নূতন গ্রন্থ প্রণয়নের কথাও মনে আনেন নাই। নৈয়ায়িক ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ও বিচার স্থলে ন্যায় সম্বন্ধে তাঁহার মতকেই প্রমান্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যে "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক বিরাট প্রকরণ গ্রন্থ অদ্বৈত বেদান্তের গৌরব—তাহার রচয়িতা শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহোদয় রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র, মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকটই শাস্ত্র ব্যাখ্যান-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের টীকাকার ব্রহ্মানন্দ স্বামী স্বনামখ্যাত টীকার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে রঘুনাথের সিদ্ধান্তেরই খণ্ডন মণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থের সহিত পরিচয় না থাকিলে ঐ সকল গ্রন্থে প্রবেশ লাভ হয় না। এই কারণেই বলিতেছিলাম দার্শনিক জগতে রঘুনাথের দান সত্যই অতুলনীয়।

রঘুনাথ শিরোমণির জীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ও প্রতিভার পূর্ণবিকাশের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অতি অল্প বয়সেই রঘুনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতা অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। অবশেষে একান্ত অক্ষম হইয়া তৎকালীন নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের বাটীতে রন্ধন কার্যে নিযুক্ত হন। একদা বালক রঘুনাথ মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া টোলের পড়ুয়াদিগের জন্য আগুণ আনিতে যান। কোন বিদ্যার্থী একখানি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড চুল্লী হইতে বাহির করিয়া রঘুনাথকে লইতে বলেন। রঘুনাথের নিকট কোন পাত্র ছিল না। কিন্তু তিনি অপ্রতিভ না হইয়া কতকগুলি ধূলি দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তাহাতে অঙ্গারগুলি স্থাপন করিতে বলিলেন। ব্যাপারটী সামান্য হইলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাসুদেব সার্বভৌমের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া সাদরে তাহাকে টোলে ভর্তি করিয়া লইলেন। বালক রঘুনাথ অধ্যাপকের আদর্শ ছাত্র হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তৎকালীন রীতি অনুসারে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ হইল। বাল্যকাল হইতেই যে প্রতিভা বিকাশের জন্য পথ অন্বেষণ করিতেছিল তাহা এইবার স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিল। ন্যায় শাস্ত্র বিচারে, কূটতর্ক উদ্ভাবনে ও সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়া অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌমও অশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন। তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ পাঠ কালে তিনি মূলগ্রন্থেরই অনেকস্থল বিচারদুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। এই সকল দেখিয়া বাসুদেব সার্বভৌমের একান্ত ইচ্ছা হইল যে রঘুনাথ মিথিলা গিয়া সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া আসেন। তাহা ছাড়া নৈয়ায়িক সমাজে মিথিলারই তখন খ্যাতি খুব বেশী; নবদ্বীপ ন্যায়-শাস্ত্রালোচনায় বিশেষ

প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এক শুভদিনে রঘুনাথ আরও দুইজন সতীর্থের সহিত মিথিলা যাত্রা করিলেন।

তখন মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের যথেষ্ট নাম। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় রচিত নব্যন্যায়ের আকর-গ্রন্থ "তত্বচিন্তামণি"র পঠন পাঠনে ও তাহার টীকাদি রচনায় মিথিলা মুখরিত। প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র ন্যায় শাস্ত্রের খণ্ডন মণ্ডন দ্বারা মিথিলার গৌরব রক্ষা করিতেছেন। এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলায় গিয়া তাঁহারই টোলে উপস্থিত হইলেন। পক্ষধর মিশ্রের টোলের নিয়ম ছিল—কোন ছাত্রকে তাঁহার নিকট পাঠ লইতে হইলে নিম্নস্তর হইতে পরীক্ষা দিয়া উচ্চাসনে তাঁহার নিকট আসিয়া বসিতে হইত। রঘুনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য ছাত্রদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকটবর্তী কোন প্রবীন ছাত্রের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোলাহলে পক্ষধর মিশ্রের পাঠের ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ
অন্যে দ্বিলোচনা সর্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র চক্ষু, ভগবান শিবের ত্রিনেত্র, অপরাপর সকলেই দ্বিনয়ন-বিশিষ্ট—একচক্ষু আপনি কে? (রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই—একচক্ষু হীন ছিলেন) রঘুনাথ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর করিলেন—

"কুশদ্বীপ নলদ্বীপ নবদ্বীপ নিবাসিনঃ
তর্ক-সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনীষিণঃ।"

অর্থাৎ আমরা একজন কুশদ্বীপ নিবাসী তর্ক-সিদ্ধান্ত, অপর জন নলদ্বীপ নিবাসী সিদ্ধান্ত উপাধিধারী ও তৃতীয় ব্যক্তি আমি স্বয়ং নবদ্বীপ নিবাসী শিরোমণি উপাধিধারী। যাহা হউক পূর্বকথিত ছাত্রের সহিত বিচার পারিপাট্য দর্শনে পক্ষধর মিশ্র অতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অতি যত্নের সহিত রঘুনাথকে পড়াইতে লাগিলেন। কিছুকাল মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ মেধা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন ও ক্রমশঃ রঘুনাথ পক্ষধরের প্রিয়তম ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। ৩।৪ বৎসর অধ্যয়নের ফলে রঘুনাথ অনেক ন্যায়গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে রঘুনাথের কাব্যশাস্ত্রে কিরূপ বুৎপত্তি আছে জিজ্ঞাসা করায় রঘুনাথ সগর্বে উত্তর করিলেন—

"কাব্যেঽপি কোমল ধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশ ধিয়ো বয়মেব নান্যে
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিত ধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযত ধিয়ো বয়মেব নান্যে।"

আমরা বাঙ্গালী কাব্যশাস্ত্রেও যেমন কোমল, তর্ক শাস্ত্রেও অনুরূপ কর্কশ। তন্ত্রশাস্ত্রেও আমাদের যেরূপ মতি, ভগবান কৃষ্ণেও সেই রূপ আসক্তি। অর্থাৎ কোমল-কর্কশরূপ বিরুদ্ধ

পদাবলীর ও শাক্ত-বৈষ্ণবাদি বিরুদ্ধ ভাবের আলোচনা কেবল মাত্র আমাদিগের ন্যায় অদ্ভুত প্রতিভা বিশিষ্ট রাঢ় বাসীতেই সম্ভব, অন্যত্র নয়।

রঘুনাথ পাঠ শেষ করিয়া গৃহে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পঠদ্দশাতেই তিনি ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন। এখন গ্রন্থগুলি সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পক্ষধর অনুমতি দিলেন না। রঘুনাথ অগত্যা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া অধিকাংশ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দেশে আসিয়া বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহাকে নবদ্বীপেই টোল করিতে আদেশ করিলেন। টোলবাড়ীর স্থান পাওয়া যায় না। কারণ, রঘুনাথ মেধাবী ছাত্র হইলেও টোল করিবার মতন বাটী তাঁহার ছিল না। অবশেষে হরিঘোষ নামক এক ধনাঢ্য গোপ তাঁহাকে স্বীয় বিস্তৃত গোয়ালের কিয়দংশ টোল করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া দিলেন। এই স্থানেই রঘুনাথ ছাত্রদিগের পঠন পাঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই স্থানেই গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত নব্যন্যায়ের "তত্ত্ব চিন্তামণি"র উপর তাঁহার অমরটীকা "দীধিতি" রচিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তৎকালীন নবদ্বীপের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদিগের পুত্রগণকে ন্যায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত রঘুনাথের টোলে পাঠাইতে লাগিলেন। হরিঘোষের গোয়াল বাড়ী ক্রমশঃ তর্ক কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। এখন এতদ্দেশে কোন স্থানে অতিরিক্ত কোলাহল হইলে লোকে বলে "এ যেন হরি ঘোষের গোয়াল"। তত্ত্ব চিন্তামণির "রহস্য" নামক ব্যাখ্যাতা মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ তাঁহারই ছাত্র। রঘুনাথ আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "ব্যুৎপত্তিবাদ" আমার পুত্র, "লীলাবতী" আমার কন্যা। বলা বাহুল্য উহারা তন্নামক গ্রন্থদ্বয়ের নাম। কাহারও কাহারও মতে রামভদ্র নামক তাঁহার একটী পুত্র ছিল।

রঘুনাথ শিরোমণির লিখিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। যথা—গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিরচিত "তত্ত্ব চিন্তামণি" নামক গ্রন্থের উপর "দীধিতি" নামে একটী উৎকৃষ্ট টীকা। ইহা তাঁহার মনীষার অপূর্ব সৃষ্টি। (২) 'পদার্থ-খণ্ডন' গ্রন্থ—ইহাতে তিনি বৈশেষিক দর্শনের অনেক তত্ত্বের খণ্ডন করিয়াছেন। (৩) "আত্মতত্ত্ব বিবেক" নামক উদয়নাচার্য লিখিত বৌদ্ধ মত নিরাকরণ গ্রন্থের উপর 'আত্মতত্ত্ব বিবেক টীকা'।

রঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধীয় একটী প্রবাদ "বৈদিক সংবাদিনী" নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়"। উহাতে লিখিত আছে যে কাত্যায়ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীধরাচার্য ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার ২৭ পুরুষ পরে এই বংশে গোবিন্দ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম সীতা দেবী। গোবিন্দ চক্রবর্তীর দুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাথ। জ্যেষ্ঠ রঘুপতির সহিত রাজা সুবিদনারায়ণের কন্যা রত্নাবতীর বিবাহ হয়। রাজবংশে কিছু কুলগত দোষ থাকায় রঘুনাথের জ্ঞাতিবর্গের এই বিবাহে মত

ছিল না। পুত্রের বিবাহের পর রাজা জামাতাকে স্বীয় আলয়ে রাখিয়া দিতে মনস্থ করিলে সীতা দেবী জ্ঞাতিগঞ্জনার ভয়ে রঘুনাথের সহিত নবদ্বীপে চলিয়া আসেন ও বাসুদেব সার্বভৌমের বাটীতে পাচিকা বৃত্তি অবলম্বন করেন। অপরাপর কাহিনী নবদ্বীপ প্রবাদের সহিত অভিন্ন। *

রঘুনাথ শিরোমণির রচিত গ্রন্থ—

(১) তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি—ইহার অধিকাংশই চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ছাপা হইয়াছে।

(২) আত্মতত্ত্ব বিবেক দীধিতি—উদয়নাচার্য বিরচিত আত্মতত্ত্ব বিবেকের টীকা। ইহাও কাশী হইতে ছাপা হইতেছে।

(৩) অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি—ইহা তাঁহার লিখিত স্বাধীন প্রকরণ গ্রন্থ। কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) আখ্যাত শক্তিবাদ—প্রকরণ গ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক মুদ্রিত।

(৫) নঞ্‌বাদ—প্রকরণ গ্রন্থ এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক B. I. Seriesএ মুদ্রিত।

(৬) খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য দীধিতি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। তিনি ১৫৪৭ খ্রীঃ ৭০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।

---

* অনেক পণ্ডিতই শেষোক্ত প্রবাদটীতে আস্থাবান নহেন। পণ্ডিত চারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ (দর্শনাচার্য) মহাশয় তদীয় "ভামতী-প্রভা" নামক গ্রন্থে অতি নিপুণভাবে বৈদিক সংবাদিনীর প্রবাদ অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ উক্ত স্থান দেখিতে পারেন।

শ্রব্যকাব্যে কালিদাস *

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র, এম্‌. এ.

(১)

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীকে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি কিরূপ, তাহা অনেকবারই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমর্থ হন নাই। দৃষ্টান্ত দিতেন—"নুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছলো—কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হ'লো না। যাই নামা অমনি গ'লে যাওয়া! কে আর খবর দিবে?"

সাহিত্য রসানুভূতিও "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।" ইহা ব্রহ্মানন্দের অনুরূপ বটে, কিন্তু কিরূপ? মম্মট বলেন, "বিগলিতবেদান্তরমানন্দম্‌," যে আনন্দ লাভ করিলে অন্য যাহা কিছু জানিবার, সবই লয় পাইয়া যায়। কবি দৃশ্যের পর দৃশ্য তাঁহার কল্পনার বর্ণে উজ্জ্বল করিয়া পাঠককে উপহার দেন। কাব্য বাহ্যতঃ খণ্ড খণ্ড কতকগুলি দৃশ্য বা বর্ণনার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কাব্য পড়িয়া আমরা মনে অননুভূত আনন্দ পাই কেন? বিশ্বনাথ ইহার কারণ নির্দেশে বলেন, "খণ্ডশো যাত্যখণ্ডতাম্‌।" এই যে টুকরা টুকরা ঘটনার সমাবেশ, ইহার শেষ কোথায়? অখণ্ড রসের অনুভূতিতে। সাকার উপাসনায় যেমন বিভিন্ন বিগ্রহকে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রোপম আনন্দঘন নিরাকারে মন সমাহিত হইয়া নির্বিকল্পে প্রতিষ্ঠা হয়, কাব্যরসেও এইরূপ। উপনিষদের বাণী, "রসো বৈ সঃ।" সুখের ক্ষণিক বিহ্বলতা, শোকের উচ্ছ্বাস, বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা, ব্যক্তি বা ঘটনার রুদ্রবেশ—কাব্যের এই সকলকে যখন আমরা হৃদয়ের বস্তুতে পরিণত করিয়া ফেলি, তখন আমাদের মনে আপনা হইতেই ঘটনার অনুরূপ কোন না কোন রস স্থায়িভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই রসই কাব্যের সার। ইহাই রস-সমুদ্র, ইহাতেই পাঠক আপনাকে হারাইয়া ফেলে। হয়ত কোন অত্যাচারিত হতভাগ্যকে কবি সুনিপুণভাবে আমাদের মানস-চক্ষুর সম্মুখে আনিয়াছেন। তাহার করুণ বিলাপে আমরা গলিয়া যাই; মনে করি, ইহা আমাদেরই নিপীড়িত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উঠিয়াছে। আবার কখনও বা কোন মহাভাগ্যের অভ্যুদয়ে আমাদেরই উন্নতি বলিয়া মনে করি। "পরস্য ন পরস্যেতি," পরের হইয়াও বিলাপ বা অভ্যুদয় পরের নয়, আমাদেরই জীবনের একটা অংশ জুড়িয়া আছে। কবির সৃষ্ট চরিত্রে আমাদেরই চারিত্রিক বিকাশ দেখিতে পাই, আমাদের হাসিকান্না যেন কবির চরিত্রটী কাড়িয়া লইতেছে। তাই কাব্য খণ্ড হইতে অখণ্ডে, সসীম হইতে অসীমের মধ্যে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লয়, আর আমরা যথাশক্তি সেই অমৃত রস-

---

* শিবপুর Associationএ পঠিত

ধারাপানে তৃপ্ত, কৃতার্থ হইয়া যাই; কিন্তু সে আনন্দ মুখে বলিতে পারিনা। শুধু একবার বলি বাঃ চমৎকার! এই পর্যন্তই শেষ। সে আনন্দের খবর দিবার মত অবস্থা তন্ময়চিত্ত পাঠকের থাকে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্য তিনটীও ব্রহ্মানন্দ-রসের সাগর। আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদের সেই 'নুনের পুতুল'। কাব্যগুলি পড়িতে বসিয়া আপরিসীম আনন্দ উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া যাই। তাই শ্রেষ্ঠ রসপিপাসুদের পক্ষেও কালিদাসের গুণাবলীকে catalogue-এর আকারে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। আমাদের আলোচ্য কবির ভাষাতেই বলি,—

'তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।' অথবা—

'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।'

সেইজন্যই তাঁহার কাব্য আলোচনা করিতে বসিয়াই নিজের ধৃষ্টতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠি। কিন্তু আনন্দের কথা, কালিদাসের কবিতার রূপ-বিশ্লেষণ করিবার অধিকার ত পাইয়াছি। আমরা জানি, মহাপুরুষদের শিষ্যদলের মধ্যেও শ্রেণীবিভেদ আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। আমরা অধম শিষ্য হইলেও মহাপুরুষদের শিষ্যত্বে যে অধিকার লাভ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট।

মহাকাব্য কুমারসম্ভব একখানি সুন্দর lyric এবং romance। এখানে একটী চিত্রও মর্ত্ত্যের নহে। কবি কৈলাশের স্বর্গীয় পরিবেশে প্রেমকে ফুটাইয়াছেন পূর্ণরূপে। কালিদাসের স্বর্গ মর্ত্ত্যের স্পর্শ পাইবার জন্য নিরন্তর আকুল। তাঁহার বিশ্বমানবতা স্বর্গের দেবতাদিগকেও আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে অসীম স্নেহের টানে,—তাঁহাদের নহিলে পূর্ণ হয় না। অসামান্য কলা-কুশলী কালিদাস স্বর্গ-মর্ত্যকে এমনই এক প্রণয়শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার স্বর্গকে মর্ত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারিনা; আবার ধূলি-ধূসর মর্ত্ত্যের দিকে চাহিলেও দেখিতে পাই, অনিমেষ দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, উভয়ের দৃষ্টিতেই কেমন একটা করুণ আবেশ! একটী সাধারণ মানুষও নিজের অথবা দেবতাদের প্রয়োজনে একবার স্বর্গ হইতে ঘুরিয়া আসে। আবার দেবতারাও আদর করিয়া নন্দন-কানন হইতে পারিজাত তুলিয়া তাহাকে উপহার দেন, রথে চড়াইয়া দেব-সারথী তাহাকে মর্ত্ত্যে পৌঁছাইয়া দেন।

আমাদের চোখে দেবতা-মানুষের অবাধ মিলনে কোন সত্য খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু কালিদাসের কাব্য পড়িতে বসিয়া তাঁহার দৃষ্টি লইয়া, তাঁহারই উদার কল্পনা-নিষ্ঠ মন লইয়া বিচারে বসিতে হইবে। Mathew Arnold ও রসবিচারকদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন,—তাঁহারা যেন লেখক ও তাঁহার অভ্যুদয়যুগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেখেন। কালিদাসও তাঁহার সময়কার বিশ্বাসের বলেই স্বর্গমর্ত্ত্যের এই অপরূপ লীলাবিলাস কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আলঙ্কারিক ইহাকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—"অলৌকিকত্বমেতেষাং ভূষণং ন তু দূষণম্।" তাই দেবতা, মানুষ, বনের পশুপক্ষী, এমন কি তৃণগুল্ম পর্যন্তকে কবি একটী বিরাট পরিবারের অঙ্গভুক্ত করিয়াছেন। আমরা জানি, তপোবনের মানসকন্যা শকুন্তলার রাজধানীতে যাত্রাকালে

তপোবনের পশু কাঁদিয়াছিল, পাখী কাঁদিয়াছিল। জীর্ণপত্র ঝরিয়া পড়ার ছলে কবি তপোবনের গাছগুলিকেও কাঁদাইয়াছেন। কত বড় বিশ্বপ্রেমিক হইলে এমন উদার কল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব! যাহা সত্য, চিরন্তন, তাহাকে দেশকালের সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। যদি কেহ চেষ্টা করে, তবে আমরা বলিব, সে উন্মাদ স্বার্থান্বেষী।

কুমারসম্ভবের নায়িকা স্বর্গ ও মর্ত্যের শ্রেষ্ঠ গুণরাজির সমাবেশে মহীয়সী। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ব্যথা-বিরহ, আশা-আনন্দের ঢেউ স্বর্গের অন্তরেও আঘাত করে। স্বর্গে ধূলি নাই, অতি সত্য; কিন্তু সেখানেও মালিন্য আছে। সে মলিনতা দূর করিতে স্বর্গেও তপস্যার প্রয়োজন হয়।

প্রথমেই কবি তাঁহার বীণায় হিমালয়ের গান গাহিয়াছেন। মহতের জয়গানে যে যাত্রার আরম্ভ, বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাহার সমাপ্তিও কল্যাণে। হিমাচলের ভীষণরূপ কবিচিত্তে ভয়ের সঞ্চার করে নাই। তাহার মাধুর্যই তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। কবির চোখে হিমালয় 'দেবতাত্মা'। অনুকরণীয় ভাষায় কালিদাস হিমাচলের গুণগাথা রচিয়াছেন—

"অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥"

—অনন্ত রত্নের আকর হিমালয়ের হিম তাহার সৌন্দর্য নাশ করে নাই; চন্দ্রকিরণের মধ্যে কলঙ্কের মত একটীমাত্র দোষ অনন্ত গুণের মধ্যে মিলাইয়া যায়। মেঘদূতে অলকার ন্যায় হিমগিরির শোভাও যেন চিরন্তন, কালের করাল হস্ত ইহার একখণ্ড উপলকেও স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম। ত্রিভুবনের মধ্যে ঘনীভূত অমঙ্গলের মূর্তি তারকাসুর। তাহার অপসারণই কবির লক্ষ্য। এই মহাকাব্যের পটভূমি হইয়াছে নিত্য সৌন্দর্যের বিভূতি হিমালয়।

হিমালয়ের অপত্য উমা "লজ্জোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা"—নবোদিতা চন্দ্রকলার ন্যায় কিশোররূপে সকলের মন মুগ্ধ করিয়া ক্রমে যৌবনের উপবন-সীমান্তে যখন পা রাখিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে আসিয়াছে নবযৌবনের উন্মাদনা, হয়ত বা তাঁহাকে কোন্ সুদূরে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এমন সময় পিতার আদেশে উমা সমাধিবান্ শিবের পরিচর্যায় রত হইলেন।

হিমালয়ের ভোগের আতিশয্যে পরিবেষ্টিত কৈলাশের শিবের ধ্যানমূর্তি ভারতেরই সর্বকালের আদর্শকে প্রকট করিয়া দিতেছে। ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে ভোগের পান্থশালায় অতিথি হইতে হইবে। আরও অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে, রুদ্রমূর্তি প্রমথগণ শূলহস্তে এ রাজ্যের প্রহরী। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া পথিক অপরিমেয় পরিবর্তনে হতবাক্ হইয়া পড়ে। এখানে লীলাবিলাসের অবসর নাই, এই ধর্মারণ্যে প্রকৃতি নিস্তব্ধ, নিথর; ভয়ে পাখীদের কণ্ঠে কাকলী ফোটে না, তপস্যার তেজে সুকোমল পুষ্পপল্লব ম্লান হইয়া যায়। এই পরিস্থিতিই বীরাসনস্থ শঙ্করের যোগ্য আবাস, ধ্যাননেত্র বিকাশের ইহাই যোগ্যতম সহায়।

ইন্দ্র কামদেবকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন। কামদেবের কয়েকটী কথার মধ্যে চরিত্র-শিল্পী কবি ইন্দ্রের চরিত্র অতি নিখুঁতভাবে দেখাইয়াছেন। ইন্দ্র সর্বদাই সশঙ্ক, পাছে কোন নূতন শতক্রতু আসিয়া তাঁহার পদ কাড়িয়া লয়। বজ্র ও কাম-সহায়ে তিনি সর্বত্র জয়শীল। পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক। কামদেব সগর্বে বলিলেন—"আপনার আজ্ঞা পাইলে বসন্ত-সখাকে সঙ্গে লইয়া আমি পিনাকপানি মহাদেবকেও আমার আজ্ঞাবহ করিতে পারি, আর সাধারণ ধনুর্ধর ত আমার পুষ্পধনুর বিক্রম সহিতেই পারিবে না।" ইন্দ্র বলিলেন. "এখন ইহাই আমাদের প্রয়োজন। পার্বতীর প্রতি মহাদেবের আসক্তি ঘটাইতে হইবে। দেবগণের এই প্রিয়কার্যটী সাধনের ভার তোমার উপরে।" ইন্দ্র কামদেবকে শিবের কাছে পাঠাইলেন। রতি ও বসন্ত মদনের অনুগমন করিয়া শিবাশ্রমে উপনীত হইলেন। এখানেও শকুন্তলার মতই ভুলের আবৃত্তি। এই ভুলের জন্যই অঙ্গ হারাইয়া কামদেবকে অনঙ্গ সাজিতে হইয়াছে।

অসময়ে বসন্তের প্রকাশ হইল। ধ্যানস্তিমিতনয়ন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাইতে হইবে, বড় সহজ কথা নহে। চারিদিকে ঘোর ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। হঠাৎ কোথা হইতে সুরভি মলয় পবন বহিল, সুন্দরীর চরণাঘাতভিন্নই অশোকবৃক্ষে মঞ্জরী দেখা দিল। ভ্রমরের দল ফুলে ফুলে ফিরিতে লাগিল। আম্রমুকুল পিককুলের জন্য আসনার্ঘ রচনা করিল। কর্ণিকার, পলাশ, পিয়াল চারিদিক রাঙাইয়া দিল। মনসিজের এতগুলি সহায় আজ একত্র হইয়াছে ভোলাকে ভুলাইতে। দেখিতে দেখিতে তপোবনের প্রাণীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু কিন্নরী কণ্ঠের সুর যোগিরাজকে যোগচ্যুত করিতে পারিল না।

এমন সময়ে পার্বতী নিত্যকার মত শিবের পূজোপকরণ লইয়া বড় সুন্দর বেশে আসিতেছেন,—

> আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
> বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
> পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
> সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

—পার্বতী স্তনভারে কিঞ্চিৎ অবনতা, তাঁহার বসন বর্ণে তরুণ সূর্যের অনুকরণ করিতেছে; প্রচুর পুষ্পস্তবকের ভারে অবনম্রা পল্লবিনী সঞ্চারশীলা লতার ন্যায় তাঁহার শোভা। এই জাতীয় বর্ণনা পড়িয়া একটী বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়ে। কবি যখন যে রস ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তাহাকে অতি অনুকূল অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। মদনের কার্য সুসম্পন্ন করিতে যাহাতে কোন বাধা না হয়, সেইজন্যই কৈলাসের বাতাসে, বনে, পূজারিণী উমার রূপে আজ মদিরতা আসিয়াছে।

এই সময়ে মহাদেব যোগাসন হইতে উঠিলেন। বেত্রধারী নন্দী শিবকে উমার আগমনবার্তা জানাইল। নন্দীর শাসনে চারিদিক নিস্পন্দ হইয়া গেল। সকল মুখরতার

অবসানে বসন্তের উৎসব ম্লান হইয়া গেল। সখীরা পার্বতীকে এই সময়ে শিবের সম্মুখে লইয়া আসিল।

মদন-দমনের চিত্র কালিদাসের তুলিকায় কেমন সুন্দর ফুটিয়াছে! পার্বতীর সখীদ্বয় শিবের চরণে বসন্ত-জ পুষ্পের অঞ্জলি দিয়াছে। পার্বতী সলজ্জ নতশিরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। শিব পরম পরিতোষের সহিত ভক্তকে আশীর্বাদ করিলেন, "তুমি পতির অখণ্ডিত প্রেমের অধিকারিণী হও। এইখানে কবি আদর্শ প্রেমকে একনিষ্ঠ করিয়াছেন। পার্বতী পদ্মবীজের মালা শিবকে অর্পণ করিলেন। দুইজনে চোখাচোখি হইল। সুযোগবুঝিয়া বহ্নিপ্রবেশকাঙ্ক্ষী পতঙ্গের মত মদন পুষ্পধনুতে সম্মোহন বাণ স্থাপন করিলেন। শিবের মন টলিল। মুহূর্ত মধ্যে যোগী মহাদেব আপনার মনোবিকার সংবরণ করিয়া কারণান্বেষণে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। অপরাধী মনোহর বেশে আকর্ণ আকর্ষিত ধনুহস্তে অর্ধ উপবিষ্ট। হঠাৎ তপস্যাভঙ্গজনিত ক্রোধ শিবের তৃতীয়নয়নপথে বাহির হইয়া নিমেষে তপস্যার মূর্ত বিঘ্ন মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

ক্রোধদীপ্ত মহাদেব মদন-শাসনে উদ্যত। স্বর্গ হইতে দেবগণ সত্রাসে তাঁহার স্তব করিতেছেন—"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি।"—যেন কত ভয়ে, কত ব্যস্ততায় অধীর মনের স্বাভাবিক বিকাশের ছন্দই এই। এখানে কালিদাসের ছন্দনৈপুণ্য আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। সত্যকার স্বভাব কবি হইয়া কালিদাস ছন্দকে হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছেন। ক্রোধ, বিস্ময়, অনুরাগ শোক ইত্যাদির তরঙ্গে আমরা দিবারাত্র ভাসিতেছি। এই সকল বিভিন্ন অবস্থার অনুরূপ ছন্দ নিতান্ত কম নয়। সঙ্গীতজ্ঞগণ জানেন, ভিন্ন ভিন্ন সুরসংযোগে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করা যায়। সংস্কৃতে একান্ত বাহুল্যবর্জিত ছন্দ অনুষ্টুপ্। ইহার উপযোগিতা ঘটনা বর্ণনায়, অল্প কথায় বহু ঘটনার উল্লেখ। ইহা বেদের ছন্দ, রামায়ণ মহাভারতের ছন্দ, ভারতবাসীর প্রাণের ছন্দ! কালিদাস জানিতেন, অনেক সময়ে বিচিত্র বিপুল ছন্দের অবতারণা না করিয়া ইহারই সাহায্যে সুমহান্ ভাবকে রূপ দেওয়া যায়। বাল্মীকির আদর্শকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। সর্বজনবিদিত রামায়ণের শ্লোক—

রামং দশরথং বিদ্ধি মাংবিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥

শ্লোকছন্দে রচিত এই প্রকার শ্লোক পড়িতে মন যেন কোন্ কল্পলোকে উড়িয়া যায়, মহত্বের আপনা হইতেই স্ফূরণ হয়, উদাত্ত ভাবের প্রেরণা আদর্শ বিকাশে সহায়তা করে। রঘুবংশ ও কুমার সম্ভবে এই প্রকার ভাবদ্যোতক শ্লোকের অভাব নাই। শকুন্তলার শার্ঙ্গরব রাজাকে সংক্ষেপে সহজ গলায় বলিতেছেন—

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতোঽসি নঃ
শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎক্রিয়া।
সমানয়ং স্তুল্যগুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ॥

ছন্দের নাম দ্রুতবিলম্বিনী। সার্থকনামা এই ছন্দ। যতশীঘ্র সম্ভব, রাজাকে শকুন্তলার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াই শার্ঙ্গরব কণ্বাশ্রমে ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহার রাজধানীতে একমুহূর্ত দাঁড়াইবার সময় নাই—তপস্যায় ব্যাঘাত হইবে। উপযুক্ত সময়ে কালিদাস ইহাকে কণ্বশিষ্যের বাণীর বাহন করিয়াছেন। অজবিলাপ এবং রতিবিলাপের ছন্দ বিয়োগিণী। বিপুল দুঃখকে যদি প্রকাশ করিতেই হয়, তবে তাহা বিয়োগিণী মন্দাক্রান্তা বা তদনুরূপ অন্য কোন ছন্দকে আশ্রয় করিতে হইবে। বিয়োগিণীতে এক একটী পাদে মাত্র দশটী অক্ষর। আমরা জানি দুঃখী কখনও মুখর হইতে পারে না। কামদেবের বিয়োগদুঃখে অধীরা রতির বিলাপের নিদর্শনস্বরূপ একটী শ্লোক তুলিয়া দিতেছি—

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ, ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং, রমণ! ত্বামনুযামি যদ্যপি ॥

—ওগো প্রিয়তম, আমি নিশ্চয় তোমার অনুগামিনী হইতেছি; কিন্তু তবুও 'রতি কামদেবের বিরহ সহ্য করিয়া ক্ষণমাত্রও বাঁচিয়াছিল', আমার এই অবিনাশী কলঙ্ক রহিয়া যাইবে,—সে যে অসহ্য! কেমন ছোট ছোট কথায় অন্তর-বেদনার প্রকাশ! মেঘদূতের মন্দাক্রান্তার কথা কে না জানে? মন্দাক্রান্তা চলে মন্দগতিতে; দুঃখ ভারাক্রান্তা বলিয়া বঞ্চিত বিরহী যক্ষের সমবেদনায় আতুর—তাহার সখা। মন্থর-গতি নদীর মত বুকভরা ব্যথা লইয়া নিজে বহিয়া যায়, বিগলিতাশ্রু পাঠককে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

আমরা তৃতীয় সর্গে উমার কামবিকারিত অবস্থা দেখিয়াছি। পঞ্চম সর্গে সেই উমাই আবার মুনির আচরণে অভ্যস্তা হইলেন। কবি তাঁহাকে কঠোর করিয়া একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ দেখাইলেন। আপাতদৃষ্টিতে বস্তুতান্ত্রিক কালিদাসের ভাবময়ী মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্ছ্বাস সংযমে শৃঙ্খলিত হইল। তীব্রতপা পার্বতীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, তিনি যেন আমাদিগেরই মনোজগতের কোন এক হিমালয়ে বসিয়া ত্যাগে তপস্যায় বিশ্ব জয় করিতে প্রবৃত্তা। তপস্বিনী রাজকুমারীর এই একটী চিত্র—

শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং
নিরন্তরাস্বন্তর বাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈ স্তাড়িন্ময়ৈ—
র্মহাতপঃসাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥

—তাঁহার মহাতপের সাক্ষী রাত্রিগুলি বিদ্যুৎনয়ন বিকাশ করিয়া বাতাস-বৃষ্টির মধ্যে শিলাশায়িনী অনাবৃতস্থানবাসিনী তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। নিদ্রাজয়িনী পার্বতীর জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। অতি উগ্র তপস্যার শিখায় তাঁহার শরীর কালী হইল, মন উজ্জ্বল হইল।

রতিবিলাপ, অজবিলাপ, সীতাসন্দেশ—ইত্যাদি পাঠকের মনে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া দেয়—এইগুলি কালিদাসের প্রতিভার চরম অবদান। তাঁহার কাব্যপ্রতিভার ধ্যানে

বসিলে সকলের আগে মনে পড়ে তাঁহার আদি ও করুণ রসের চিত্রণ-দক্ষতা। মানব মনের যাহা কিছু কোমল বৃত্তি, তাহাই কবির দরদে পুষ্ট হইয়াছে। কখন কখন হাস্য রসের অবতারণা বা বীররসের ঈষৎ আস্ফালন তাঁহার রচনায় দেখা যায় বটে, তবে, সমগ্র মূর্তিতে নহে। অন্য রসের পরিবেশন না করা কালিদাসের পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ তিনি প্রকৃতির দুলাল। স্বাভাবিক মানব মনের বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, আদি ও করুণ রসের প্রবাহেই আমরা জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটাইয়া দিই। হাস্য বীভৎসাদি আমাদের জীবনের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ব্যাপিয়া থাকে। কাজেই অন্যরসে উদাসীন কালিদাসকে আমরা প্রশংসা না করিয়া পারি না।

কুমারসম্ভবের প্রেমের আদর্শ রতি ও অনঙ্গের চিরমিলনে। এই মিলনের পথ পরিষ্কার করিতেই কবি মহাদেবের নয়নবহ্নিতে কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। রতি প্রেম। এই মহাকাব্যে দুইটী মিলনদৃশ্য—প্রথম রতিমদনের মিলন, শেষ, রতি অনঙ্গের মিলন। প্রেম যখন মদনকে আশ্রয় করে, তখন তাহা কল্যাণপ্রসূ হয় না; তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একবার যদি কোন উপায়ে মদনের স্থূল রূপের বিনাশ ঘটে, তবে তাহার সূক্ষ্মরূপের সৌন্দর্য বসন্ত পবনের ন্যায় লোকহিতসাধন করে। কবি তাই প্রেমকে যোগজ আগুনে পোড়াইয়া খাঁটী সোনা করিয়া লইয়াছেন। প্রেমের পূর্ণরূপ নামরূপহীন বিকারহীন আত্মায় আত্মার শাশ্বত মিলন—এই সত্যই কবির মূলমন্ত্র। আবার উমাকেও তপস্যান্তে মহেশ্বরের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিবার মধ্যেও এই সত্যেরই প্রকাশ। প্রথম যৌবনের ভুলভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিতে উমাকে পঞ্চতপা হইতে হইয়াছে, 'অর্পণা' হইতে হইয়াছে—গুরুতর তপস্যায় আত্মশুদ্ধি করিতে হইয়াছে। তারপর কবি কুমার-জন্মের জন্য হরপার্বতীর বিবাহে সাক্ষী মানিয়াছেন দেবতা ও ঋষিদের—যাঁহারা বিশ্বের অশেষ কল্যাণের উৎস। উৎসবের উন্মাদনায় অন্তরের আনন্দ বিচ্ছুরিত হইয়া কুমারসম্ভব কাব্যে আলোকের যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। কুমাসম্ভবের এইখানেই শেষ। ভাবের ব্যঞ্জনায় কালিদাস অসাধারণ। এই মঙ্গলময় মিলনেই দেবসেনানীর জন্মের ইঙ্গিত, ত্রিভুবনের ধূমকেতু তারক নিধনের আভাস। এই ইঙ্গিত দিয়াই কবি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন। পাঠকের মনশ্চক্ষুর কৃতিত্বে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া, তাঁহার বহু প্রচারিত আদর্শকে উজ্জ্বলতর করিয়া তিনি এই মহাকাব্য হইতে বিদায় লইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম্‌. এ.

[৪]

১৮৫৫ খ্রীঃ [?]

লংএর তালিকায় একখানি অভিধানের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে,—

"25. Vocabulary of Elegant Words, Barnamālā Abidhān. 3rd pt. Pr. P., pp. 52, 1,200 words".

এই সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গ্রন্থকার বা গ্রন্থ মুদ্রণকাল কিছুই জানা যায় না। তবে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত এই তালিকায় উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ থাকাতে এই গ্রন্থ যে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ বা তৎপূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আখ্যাপত্রহীন একখানি অভিধান আছে, তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫২। এই গ্রন্থের বাঙলা অক্ষর ও ব্যবহৃত কাগজ হইতে ইহা প্রায় শত বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বাঙলা গ্রন্থ তালিকায় আখ্যাপত্রহীন এই গ্রন্থকে ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত অভিধানের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থে ব্যবহৃত টাইপ ও কাগজের প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ আলোচ্য গ্রন্থ ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুদ্রিত বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকিবে। এই অনুমান অসঙ্গত নহে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

লংএর তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থ ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ এই দুই গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা সমান। দ্বিতীয়তঃ লং এই গ্রন্থের শব্দসংখ্যা ১২০০ বলিয়াছেন। এই শব্দসংখ্যা আনুমানিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। লং তাঁহার তালিকায় বিভিন্ন গ্রন্থের প্রত্যেকটী শব্দ গণনা করিয়া শব্দসংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩টী করিয়া শব্দ আছে, ৫২ পৃষ্ঠায় মোট শব্দ হয় ২৩×৫২=১১৯৬; অর্থাৎ প্রায় বার শত। এই গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় ২৩টী করিয়া শব্দ মুদ্রিত হয় নাই; অধিকন্তু অকারাদি বিভিন্ন বর্ণের শব্দসমূহ মুদ্রিত করিতে গিয়া প্রথম সেই বর্ণের উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ণ শব্দ নহে, অতএব এই সকল বর্ণের সংখ্যা ও শব্দসমষ্টি হইতে বাদ দিতে হইবে। গণনা করিয়া দেখা যায় সমগ্র গ্রন্থে ১১৪৩টী শব্দ আছে। লং এই গ্রন্থের শব্দ সংখ্যা ১২০০ বলায়—শব্দ সংখ্যার দিক দিয়াও এই দুই গ্রন্থ অভিন্ন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তবে ইহা অনুমান মাত্র, প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া কোন কথা বলা সম্ভবপর নহে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে

রক্ষিত গ্রন্থে আখ্যাপত্র থাকিলে প্রেসের নাম ও ইহা তৃতীয়ভাগ কিনা তাহা জানা যাইত এবং তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত। এই স্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে—লং তাঁহার তালিকায় গ্রন্থখানিকে "Vocabulary of Elegant Words" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত মূলক শব্দ ব্যতীত কোন বিজাতীয় শব্দ স্থান পায় নাই। লংএর পূর্বোক্ত মন্তব্য ও সমভাবে এই গ্রন্থের উপর প্রযোজ্য।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থখানি অকারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। ইহার আকার ৬"×৮½" ইঞ্চি। নিম্নে এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল।

১। অভব্য—অশিষ্ট। পৃঃ ১

২। ইতর—ভিন্ন। অন্য। পৃঃ ৮

৩। উপক্রম—প্রথম। আরম্ভ। পৃঃ ৯

৪। কমট—কচ্ছপ। পৃঃ ১৪

৫। গদ্‌গদ্‌স্বর—অব্যক্ত শব্দ। পৃঃ ১৫

৬। চটক—চড়ুই পাখি। পৃঃ ১৭

৭। তুলনা—শাদৃশ্য। পৃঃ ২০

৮। পল্লব—নূতন পত্র। পৃঃ ২৭

৯। বাগ্দত্ত—বাক্যদ্বারায় দেওয়া। পৃঃ ৩৫

১০। ক্ষুন্ন—মালিন্য যুক্ত। পৃঃ ৫২

১৮৫৫ খ্রীঃ

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে কাশীনাথ ভট্টাচার্য সঙ্কলিত "বঙ্গভাষাভিধান" মুদ্রিত হয়। ইহার একখণ্ড ইণ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারে আছে।

"Vaṅgabhāshābhidhāna, Bengali Dictionary. By Kāśīnāth Bhattācharya. pp. 395. Calcutta, 1855". এই গ্রন্থের সন্ধান এ যাবৎ পাই নাই।

১৮৫৬—১৮৫৭ খ্রীঃ

১২৬৩ বঙ্গাব্দে "অমরার্থদীধিতি" নামক একখানি অভিধান মুদ্রিত হয়। ইহা মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক কোলব্রুকের অমরকোষ অনুসরণে সঙ্কলিত। এই অভিধানখানি অমরকোষের বঙ্গানুবাদ মাত্র।

আলোচ্য অভিধানের ভূমিকায় "অমরার্থদীধিতি" মুদ্রণের পূর্বে মুদ্রিত "শব্দকল্পলতিকা" নামক অমরকোষের বঙ্গানুবাদের উল্লেখ আছে। "শব্দকল্পলতিকা" ও "অমরার্থদীধিতি" অমরকোষের বঙ্গানুবাদ হইলেও এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ "শব্দকল্পলতিকায়" বিভিন্ন শব্দের লিঙ্গনির্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু এই অভিধানে তাহা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ "শব্দকল্পলতিকার" পরিশিষ্টে কোলব্রুক—সম্পাদিত অমরকোষের অনুরূপ অমরকোষোক্ত সকল

শব্দের অকারাদি বর্ণানুক্রমিক সূচী দেওয়া নাই। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এই সূচীটী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ফলে "শব্দের পর্যায় অথবা অর্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা সেই শব্দ দেখিয়া তাহার পার্শ্বস্থ সংখ্যা গ্রহণ পূর্বক অমরার্থদীধিতির তাবৎ সংখ্যক পৃষ্ঠ অবলোকন করিলেই স্বয়ং স্ব ২ জিজ্ঞাসা পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন।" এই সূচীপত্রের প্রতিপৃষ্ঠা তিন কলমে ও অভিধান অংশের প্রতি পৃষ্ঠা দুই কলমে বিভক্ত। এই গ্রন্থের মূল্য ১৲ টাকা ছিল। "সর্বার্থপূর্ণচন্দ্র" নামক মাসিক পত্রের নবম সংখ্যার (ফাল্গুন, ১২৬২) মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এই গ্রন্থের মূল্য ১৲ নির্দেশ করা আছে। "অমরার্থ-দীধিতির" ভূমিকায় ইহার সম্পাদক অন্যান্য সংস্কৃত অভিধান থাকা সত্বেও অমরকোষের বঙ্গানুবাদ করার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"অমরসিংহকৃত অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ কোষ যদিও সস্কৃত ভাষার মেদিনী প্রভৃতি সমুদয় কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, তথাপি প্রয়োজনীয় যাবন্ত সংস্কৃত শব্দ লিঙ্গভেদ সহ যথাক্রমে পর্যায়-বদ্ধ হইয়া সঙ্কলিত হওয়াতে ঐ কোষই সর্বত্র সমাদরণীয় হইয়া থাকে এবং সংস্কৃত শব্দ ও তদর্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রে আদৌ ঐ অভিধানই অনুসন্ধান করেন এই কারণে উহা অতি প্রসিদ্ধ ও সর্বত্র প্রচলিত।"

"সংস্কৃতানুযায়ি সাধু গৌড়ীয় ভাষার অনুশীলন ও উন্নতি কল্পে যত্নবান ব্যক্তিরাও উক্ত অমরকোষে জ্ঞান জন্মাইবার অভিলাষ করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবন্ধে ঐ কোষ প্রণীত হইয়াছে ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় পরিজ্ঞান ব্যতীত ঐ অভিলাষ সকলের পক্ষে সুসিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট হয়। অতএব ঐ অভিধানের যাবন্ত শব্দের পর্যায় ক্রমে লিঙ্গভেদ প্রদর্শন পূর্বক অর্থ প্রকাশ করিয়া "অমরার্থ দীধিতি" নামে এই অভিধান সংগ্রহ করা গেল।"

নিম্নে এই গ্রন্থের কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :-

গণদেবতার নাম—আদিত্য, বিশ্ব, বসু, তুষিত, অভাস্বর, অনিল, মহারাজিকা, (মহারাজক) সাধ্য, রুদ্র (পুং)। পৃঃ ১

চিরকালের নাম—চিরায়, চিরবাত্রায়, চিরস্ত, (চিরং, চিরেণ, চিরাৎ, চিরে) (অব্যয়)। পৃঃ ১৮৬

অল্পের নাম—কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, মনাক্, (অব্যয়)। পৃঃ ১৮৭

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই :—

"অমরার্থ দীধিতি। / অর্থাৎ / কবিবর অমরসিংহকৃতাভিধানস্থ শব্দ সকলের / নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / সাহায্যে/পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক / কর্তৃক / কোলব্রুকা-দির সংস্কৃতাভিধান হইতে সংকলিত। / কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৩। /" পৃঃ ৵০+৵০+১৯০+১২৫। আকার $৪\frac{১}{২}''\times ৫\frac{২}{৩}''$ ইঞ্চি।*

* এই গ্রন্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে আছে।

১৮৬১খ্রীঃ

১২৬৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সঙ্কলিত "শব্দসার অভিধান" মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের উল্লেখ বাঙলা গভর্নমেণ্টের নথিপত্রের ৪১ নম্বর সংগ্রহে আছে। ইহার একখণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মেও রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থখানি মূলতঃ ডাক্তার উইলসন সাহেবের সংস্কৃত অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে, ইহার অংশ বিশেষ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের শব্দ-সংখ্যা প্রায় ১৩,০০০। শব্দ-সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া অকারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। গ্রন্থখানি উইলসনের সংস্কৃতাভিধানের অনুকরণে সঙ্কলিত বলিয়া ইহাতে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব যুক্ত শব্দাবলী পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোন বিদেশী শব্দ স্থান পায় নাই। গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা তাঁহার এই গ্রন্থ-সঙ্কলনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যাঁহারা ছাত্রবর্গের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার শিক্ষাবিধানে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদিগের এবং ছাত্রদিগের পক্ষে অনায়াসে শব্দের লিঙ্গবিনির্ণয়-পূর্বক অর্থ-প্রতীতি-সাধন একখানি অভিধান-গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে; কত দিনে কোন্ মহাত্মা যে এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবেন এ আশায় আর কালবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া আমি এই চাপল্য প্রকাশ করিলাম।"

গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য ও টীকাদি হইতে সংগৃহীত বহু শব্দ, যাহা উইলসনের অভিধানে নাই, তাহা এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য অভিধানের প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ইহা কোন্ লিঙ্গ, কোন্ বচন তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে। একার্থ-প্রতিপাদক শব্দ-সমূহের মধ্যে [,] কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে; আর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রতিপাদক শব্দের অথবা বাক্যের মধ্যে [।] পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন দেওয়া আছে। এই গ্রন্থে অকারাদি বর্ণানুক্রমে শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কদাচিৎ আবশ্যকবোধে এই ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে।

নিম্নে এই গ্রন্থের কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল :—

১। অধ্যূঢ় (ত্রি) অতিশয়। বৃদ্ধিশীল। পৃঃ ৮

২। উদধি (পু) জলধি, সমুদ্র। পৃঃ ৪১

৩। কাচ (পু) বালি ও এক প্রকার ক্ষারদ্বারা উৎপন্ন বস্তুবিং। পরকলা। পৃঃ ৫৭

৪। গুম্ফিত (ত্রি) গ্রথিত, নিবদ্ধ, গাঁথা। পৃঃ ৭৩

৫। চঞ্চা (স্ত্রী) নলনির্মিত আস্তরণ, চাঁচ। পৃঃ ৭৭

৬। ছায়া (স্ত্রী) রৌদ্রাভাব। অন্ধকার। প্রতিবিম্ব। কান্তি, দীপ্তি, প্রভা। আলোক। সূর্যের পত্নী। পৃঃ ৮১

৭। তৈষ (পু) পৌষমাস। পৃঃ ৯১

৮। নক্র (পু) কুম্ভীর। পৃঃ ১০৩

৯। পাশক (পু) পাশা, অক্ষ। পৃঃ ১২১

১০। ব্রহ্মযজ্ঞ (পু) বেদাধ্যয়ন। পৃঃ ১৩৯

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই :—

"Dictionary / of Sanscrit and Bengaly Language. শব্দসার। / অভিধান। / প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও বাঙ্গলা ভাষায় তাহার অর্থ এবং লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত। / শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম সঙ্কলিত। / কলিকাতা। / মির্জাপুর, অপর সরকিউলর রোড নং ৫৯। / বিদ্যারত্ন যন্ত্র। / ১২৬৮ শাল১। বৈশাখ। / মূল্য ১।॰ দেড় টাকা। /" পৃঃ ✓॰+২+২২৮। আকার ৮"×৫" ইঞ্চি।

১৮৬৫ খ্রীঃ

প্যারীস্ বিশ্ব-প্রদর্শনীতে প্রেরিত বাংলা গ্রন্থ তালিকায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত একখানি ইংরাজী-বাঙলা ভকেবুলারির উল্লেখ আছে২। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। এই অভিধানের ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ বঙ্গাক্ষরে নির্দেশ করিয়া পরে বাঙলা অর্থ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬ এবং মূল্য চারি আনা মাত্র।

১৮৬৬ খ্রীঃ

ইণ্ডিয়া অপিসের গ্রন্থাগারে কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "শব্দার্থ প্রচারিকা" নামক অভিধানের একখণ্ড আছে৩। ইহার মুদ্রণ কাল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ। এই গ্রন্থ এযাবৎ দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

১৮৬৭ খ্রীঃ

ইণ্ডিয়া অপিসের গ্রন্থাগারে কেশবচন্দ্র রায় রচিত "শব্দাবলী" নামক এক অভিধান আছে৪। ইহার মুদ্রণকাল ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ। এই গ্রন্থ এযাবৎ দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

---

১ গ্রন্থের ভূমিকার তারিখ শকাব্দাঃ ১৭৮২।২৯ এ বৈশাখ। এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে আছে।

২ "285, Vocabulari—A Vocabulary, English and Bengali, the pronunciation of the English words is given in Bengali letters, and their meaning is attached in Bengali, 12mo, pages 86, 4 annas."

৩ "Śabdārthaprachārikā. By Kailāsachandra Vandyopādhyāya. pp. 5, 868, 4. Calcutta, 1866."

৪ "Śabdāvalī. By Keśavachandra Rāya. pp. 432. Calcutta, 1867."

ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(আলোচনা)

[১]

গত বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত-এম্.এ. মহোদয় লিখিত 'ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয়' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আনুসঙ্গিকভাবে ইহাতে তিনি আমার কোনও কোনও মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবোধবাবু লিখিতেছেন—'সন ১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসের "শ্রীভারতী"তে "কৃত বা সত্যযুগ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাহোক্তিতে "শককাল"কে "শাক্যকাল" বা "বুদ্ধকাল", বুদ্ধ নির্বাণ কালকে ৫৪৬ খ্রী° পূর্বে স্থাপন, দ্বিকপঞ্চ=৫৫, ইত্যাদি অর্থ করিয়া বরাহোক্তি হইতে ভারতযুদ্ধ কালকে ৩১০২ খ্রী° পূর্বে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন' ইত্যাদি।

এক্ষণে বক্তব্য এই, বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় প্রাপ্ত "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ......' ইত্যাদি শ্লোকটিতে যে 'শককাল' শব্দ অধুনা দেখা যায় ইহার প্রকৃত অর্থ কি? 'শককাল' শব্দটি বর্তমান প্রচলিত শককাল (আরম্ভ ৭৮ খ্রী°) গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয়—এই শ্লোকটি বৃদ্ধগর্গের নহে। কারণ বৃদ্ধগর্গ খ্রীস্টের জন্মের পূর্বের লোক। আমি মনে করি প্রথম বরাহ-মিহিরও খ্রীস্ট জন্মের পূর্বের লোক। যাহা হউক, এ সব বিচার এখানে না করিয়া প্রবোধবাবুর মতানুযায়ী স্বীকার করা গেল, বৃদ্ধ আর্যভট্ট নিজ উক্তি অনুযায়ী কলি বা ভারতযুদ্ধ কালের ৩৬০০ বৎসর পর আর্যভটীয় তন্ত্র লিখেন ও বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতির লেখক বরাহ-মিহির একই সময়ে, ৪২১ শক=৪৯৯ খ্রী° অব্দ=৩৬০০ কল্যব্দে (বা ভারতযুদ্ধাব্দে) জীবিত ছিলেন। আর এই বরাহ-মিহির আর্যভটের মতের সমালোচনা স্থানে স্থানে করিয়াছেন ও তাঁহার আর্যভটীয় তন্ত্র দেখিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি স্বীকার করা যায় যে বরাহ-মিহির বৃদ্ধগর্গের মতে রাজা যুধিষ্ঠির (অর্থাৎ ভারতযুদ্ধ কাল) ও বর্তমান প্রচলিত শককালের (আরম্ভ ৭৮ খ্রী°) অন্তর ২৫২৬ বৎসর লিখিয়াছেন তাহা হইলে ভারতযুদ্ধ কাল ও ৪২১ শকের অন্তর (২৫২৬+৪২১, বা) ২৯৪৭ বৎসর হয় অথচ আর্যভটের মতে ইহা ৩৬০০ বৎসর। এ মতে স্বীকার করিতে হয়, একই কালের অন্তরে আর্যভট ও বরাহ-মিহিরের মতে (৩৬০০ −২৯৪৭, বা) ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্য। এই বৃহৎ পার্থক্যের কারণ ও আনুসঙ্গিকভাবে কোন্ মতটি সত্য এ সম্বন্ধে বরাহ-মিহির কিছু বলিলেন না কেন? গণিত শাস্ত্রে সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও এরূপ পার্থক্য দেখিলে তাহা উল্লেখ ও কোন্‌টি তাঁহার মতে সত্য এ বিষয়ে দুই এক কথা না বলিয়া পারেন না। আমরা জানি, অন্য কয়েক স্থানে বরাহমিহির আর্যভটের মতের সমালোচনা করিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, 'শককাল' শব্দটি বরাহোক্তি হইলে তিনি ইহা 'শক' বা 'শাক্য' কাল অর্থে বুঝিয়াছিলেন, বা 'শক' বা 'শাক্য' কাল তিনি লিখিয়াছিলেন, পরে লেখকের দোষে উহা 'শককাল' হইয়া পড়িয়াছে। অথবা স্বীকার করিতে হয় এই শককাল সমন্বিত শ্লোকটি বৃদ্ধগর্গের মতানুযায়ী

পরবর্তী গর্গাচার্য যিনি বিক্রমাদিত্যের (৫৮ খ্রী° পূ°) অল্প পূর্বে গার্গী-সংহিতা গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন তাঁহার, এই গার্গী-সংহিতা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। যে অল্প অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহা যে খ্রীস্ট জন্মের পূর্বের লেখা তাহা Kern, Vincent Smith, Jayaswal, অধ্যক্ষ ধ্রুব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

উৎপলভট্ট বৃহৎ সংহিতার আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ···এই শ্লোকের টীকা লিখিয়াছেন। তিনি যুধিষ্ঠির কাল ও শককালের অন্তর ২৫২৬ বৎসর এই মাত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ৫০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৯৬৬ খ্রীস্টাব্দ (উৎপল ভট্টের সময়) পর্যন্ত সমস্ত হিন্দু জ্যোতিবীরাই লিখিয়াছেন বর্তমান প্রচলিত শককাল ও যুধিষ্ঠির কালের অন্তর ৩১৭৯ বৎসর। উৎপল ভট্ট এই শ্লোকের 'শককাল' যদি বর্তমান প্রচলিত শককালই বুঝিয়া থাকেন তবে এই ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্যের বিষয় কি তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই ও সে সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই কেন ? উৎপল ভট্টের সময় বর্তমান প্রচলিত শককালই সকলে জানিত। শক (=শক্য বা শাক্য) কাল অনেকেরই জানা ছিল না। সুতরাং উৎপল ভট্ট এই ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াও সম্ভবতঃ ইহা 'বৃদ্ধগর্গমতাৎ' অতএব এসম্বন্ধে কোনও সমালোচনা করেন নাই। উৎপল ভট্টের পরবর্তী (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য প্রভৃতি মনস্বীগণও এই পার্থক্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন না।

উৎপল ভট্টের পর আল্‌বেরুণী (১০৩৬ খ্রী°) ভারতে আসেন। উপরোক্ত শ্লোকটীর বিকৃত অর্থের ফলে আল্‌বেরুণী লিখিলেন যে ৩১০২ খ্রী° পূ° হইল কলিকাল, আর ইহার ৬৫৩ বৎসর পর হইল পাণ্ডব বাসুদেব কাল। শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবের সহিত কলিকালের সম্বন্ধের বিষয় ('যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবম্ যাতস্তস্মিন্নেব তদাঽহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগং ইতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥') আল্‌বেরুণী বোধ হয় শুনেন নাই। নতুবা কলিকাল ও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মধ্যে এই ৬৫৩ বৎসরের অন্তর লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য বোধ করিয়া সমালোচনা করিতেন। আল্‌বেরুণীর পর ১১৪৮ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীরে কহ্লন পণ্ডিত আবির্ভূত হন। তিনি শককালকে বর্তমান প্রচলিত শককাল স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বা ভারতযুদ্ধ কাল কল্যারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরবর্তী ইহা লিখেন ও যাঁহারা দ্বাপরান্তে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল বলেন (অর্থাৎ সমস্ত পুরাণকার, জ্যোতিবী, রাজা ও সাধারণ লোক) তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ও মূর্খ আখ্যা দেন—'ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূদ্ বার্তয়েতি বিমোহিতাঃ। কেচিদ্ এতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে॥' এভাবে তিনি (কাশ্মীর) রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে এক এক রাজার রাজত্ব কাল সময়ে সময়ে চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া অনেক কষ্টে 'গোনন্দ'কে পাণ্ডবদিগের সমসাময়িকভাবে স্থাপিত ও তিনি কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা প্রমাণিত করেন। 'Kalhana who wrote in 1148-49 was not reporting traditions, he was putting together a chronology, and (as samples of his results) he placed the great Maurya king Asoka...towards the close of the period B. C. 2448 to 1182 (!!!) and had to give to Ranaditya I a reign of three centuries...in order to square his arrangements' (Fleet, Date of Kanishka, J. R. A. S. 1913-p. 1005).

কাশ্মীর রাজের সভাপণ্ডিত ইহার ফলে যথেষ্ট যশঃ ও অর্থ কাশ্মীর রাজের নিকট লাভ করিয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কহ্লন পণ্ডিত

ভট্টোৎপলের টীকায় উদ্ধৃত বৃদ্ধগর্গোক্ত বচনটি বোধ হয় দেখেন নাই। কারণ সেখানে পাই কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে সপ্তর্ষিরা মঘায় ছিলেন (কলি দ্বাপরসন্ধৌতু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্) আর বৃহৎ সংহিতায় আছে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিরা মঘায় ছিলেন। এমতাবস্থায় দ্বাপরান্তে বা কলির আদিতে যুধিষ্ঠির ছিলেন ইহাই প্রমাণিত হয়। অথচ কহলন পণ্ডিত ভারতযুদ্ধ দ্বাপরান্তে হইয়াছিল ইহা যাঁহারা বলেন তাহাদিগকে মূর্খ ও মিথ্যাবাদী বলিয়া কুরু-পাণ্ডবগণ কলির ৬৫৩ বৎসর পর ছিলেন (শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষাণাম্ অভবন্ কুরু-পাণ্ডবাঃ ॥) ইহা বলেন। এই উক্তি কতদূর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আশা করি সুধীবর্গ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আধুনিক কালে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত এই 'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ...' শ্লোকস্থিত 'শককাল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ইহা অনুসন্ধান করেন ও অপর সমস্ত ভারতীয় প্রমাণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই শককালের প্রকৃত অর্থ শাক্যকাল নির্ণয় করেন। এরূপ কয়েকজন পণ্ডিতের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি :—

(ক) ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড সাহেব (১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ) Vikramaditya and Salivahana' প্রবন্ধে (Asiatic Researches, Vol. IX, p. 210) উপরোক্ত শ্লোকে 'শককাল' যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ বৎসর পর অর্থাৎ (৩১০২-২৫২৬, বা) ৫৭৬ খ্রী° পূ° পাইয়া ইহা শাক্য বা বুদ্ধের জন্মকাল ও ৫৪৪ খ্রী° পূ° বুদ্ধের নির্বাণকাল স্থির করেন। ইহার সমর্থনে তিনি দেখাইয়াছেন, তিনি যে প্রাচীন রাজগণের বংশাবলী পাইয়াছিলেন তাহাতে 'সুগত' বা বুদ্ধের স্থানে শকরাজের নাম আছে ও জিন বা বুদ্ধের অপর নাম 'শক'।

(খ) রামপ্রসাদ বলেন ('The Date of the Bhagavad Gita', Theosophist, 1908) বরাহমিহির কর্তৃক উক্ত এই 'শককাল' বস্তুতঃ 'শাক্যকাল'।

(গ) গোপাল আয়ার মনে করেন ('Chronology of Ancient India', Indian Review, Nov. 1909) গর্গ বচনের প্রকৃত পাঠ ভুল। উহাতে 'শককাল' স্থানে 'শাক্যকাল' পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) অধ্যাপক রামদেব লিখিয়াছেন ('ভারতবর্ষ কা ইতিহাস', শ্রীরামদেব ও সত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড) গর্গোক্ত শককাল, শাক্যসিংহ গৌতমের সহিত সংশ্লিষ্টকাল।

(ঙ) নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন বরাহমিহির ধৃত গর্গ বচনোক্ত শককালের আরম্ভ ৫৫০ খ্রী° পূ° (The Age of Sankara, Madras 1916)

(চ) সি, ভি, বৈদ্যও তাঁহার Mahabharata—a Criticism গ্রন্থে গর্গোক্ত শককাল=শাক্যকাল (৫৪৩ খ্রী° পূ°) ও ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিঃ'র অর্থ ২৫৬৬ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের কাল ৩১০৯ খ্রী° পূঃ, আমার Hindu Nakshatras প্রবন্ধ পাঠের পর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লিখেন।

(প্রথম ও শেষটি ব্যতীত অন্য মতগুলি ডঃ শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত লিখিত 'হিন্দু জ্যোতিষে শককাল' প্রবন্ধ—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৪, ১১৯ হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত।)

আমি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে 'The Hindu Nakshatras' প্রবন্ধে (Journal of the Department of Science, Calcutta University, 1924) উপরোক্ত মতগুলি না জানিয়া উপরোক্ত 'শককাল' যে 'শাক্যকাল' এ অনুমান করি। কিন্তু ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি'র অর্থ ২৫২৬ গ্রহণ করিয়া প্রায় ৩২ বৎসরের পার্থক্য পাই ও ইহার কারণ স্থির করিতে পারি নাই। পরে ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিঃ'র অর্থ ২৫৫৬ গ্রহণ করিয়া ও প্রকৃত বুদ্ধনির্বাণকাল ৫৪৬ খ্রী° পূ° জানিয়া আশ্চর্য মিল পাই ও ইহা 'The True Dates of the Buddha and Other Connected Epochs' প্রবন্ধে (Jour, of the Dep, of Letters, Cal. Univ, 1935) লিখি। এক্ষণে প্রবোধবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিঃ'র অর্থ ২৫২৬ না লইয়া ২৫৫৬ কেন লইয়াছি। ইহার উত্তরে বলা যাইতে প্যারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে সংখ্যাদ্যোতক শব্দগুলির অর্থ স্থলবিশেষে যাহা সঙ্গত মনে হয়, সেইরূপ হইবে। যেমন 'অষ্টশত' শব্দের অর্থ স্থলবিশেষে ১০৮ ও অপর কোনও স্থলে ৮০০ হইয়া থাকে। সি, ভি, বৈদ্যও পাণিনীয় সূত্রানুযায়ী দেখাইয়াছেন 'দ্বিক' শব্দের অর্থ দুইবার, দুই নহে। তিনি 'ষড়দ্বিক-'='৬৬' লইয়াছেন। আমি -'দ্বিকপঞ্চ' ='৫৫' লইয়াছি। এমতাবস্থায় '২৫৫৬' অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত শক্র বা শাক্য (বুদ্ধ নির্বাণ) কালের সহিত যোগ করিয়া যদি সর্ব ভারতীয় প্রবাদ অনুযায়ী কল্যাদির সহিত মিল হয় তবে সেখানে উক্ত অর্থ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অপরাধের হইয়াছে কিনা সুধীগণ বিচার করিবেন।

প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন '৫৪৬ খ্রী° পূ° ধীরেনবাবুর মতে নির্বাণাব্দারম্ভ, অন্য কাহারও মতে ছিল কিনা জানি না।' এই ৫৪৬ খ্রী° পূ° আমার মতে নির্বাণাব্দারম্ভ নহে, ইহা প্রাচীন সিংহলদেশীয় বৌদ্ধদিগেরই মত। James Prinsep সাহেবের Indian Artiquities (1858) গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ১৬৫ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে ৫৪৬ খ্রী° পূ° সিংহল দেশীয় 'Oriental Magazineএ প্রচারিত নির্বাণাব্দারম্ভ। পুনশ্চ বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Weber সাহেবের History of Indian Literature গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠাতে দেখা যায় এই ৫৪৬ খ্রী° পূ: উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধদিগের মতেও নির্বাণাব্দ। আমি জ্যোতিষিক গণনায় ইহাই ভগবান্ বুদ্ধের নির্বাণ বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি কাল পাই ও উপরোক্ত সমস্ত প্রমাণ ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Jour. of the Dept. of Letters, Vol. XXVII. এ 'True Dates of the Buddha' প্রবন্ধে উপস্থাপিত করি। তারপর, প্রবোধবাবু অধ্যাপক গাইগের (ও ডাঃ রায় চৌধুরীর) মতে দুইটী নির্বাণাব্দ প্রচলিত আছে, একটী ৪৮৩ খ্রী° পূ° ও অপরটী ৫৪৪ খ্রী° পূ° ইহা জানাইতেছেন। ৪৮৩ খ্রী° পূ° যে বৌদ্ধদিগের স্বীকৃত একটী নির্বাণাব্দারম্ভ, ইহা আমার জানা নাই। তবে Ceylonese Chronology মিল করিতে গিয়া ৬০ বৎসরের অধিক একটী ভ্রম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ

পাইয়া থাকেন। ইহা মিল করিতে গিয়া (৫৪৪-৬১, বা) ৪৮৩ খ্রী° পূ° ও একটি নির্বাণাব্দ ইহা গাইগার সাহেব স্থির করিতে পারেন। বস্তুতঃ প্রকৃত পার্থক্য ৪৫ বৎসরের, বুদ্ধদেবের নির্বাণ ও পরিনির্বাণকালের অন্তর, ইহা আমি উপরোক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। Maha Bodhi Societyর Journalএ দৃষ্ট হয় যে ১৯৩২ সালের মে মাস পর্যন্ত ২৪৭৫ নির্বাণাব্দ, জুন মাসে ২৪৭৬ নির্বাণাব্দ। এই নির্বাণাব্দ অতীত বর্ষে গণিত আর খ্রীস্টাব্দ বর্তমান বর্ষে গণিত। সুতরাং সাবধানতার সহিত পরিবর্তন না করার ফলে ইহা (২৪৭৫-১৯৩২, বা) ৫৪৩ বা (২৪৭৬-১৯৩২, বা) ৫৪৪ খ্রী° পূ°তে পরিণত হয়। মহাবোধি পত্রিকা হইতে প্রাপ্ত প্রকৃত তারিখ হইবে (২৪৭৬-১৯৩১, বা) ৫৪৫ খ্রী° পূ°। এইরূপ অসাবধানতার সহিত পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন নির্বাণাব্দ ৫৪৬ খ্রী° পূ° মহাবোধি পত্রিকায় ৫৪৫ খ্রী° পূ°তে পরিণত হইয়াছে।

প্রবোধবাবু জোরের সহিতই বলিয়াছেন, জ্যোতিষিক কল্যাদি বা ভারতযুদ্ধকালের (৩১০২ খ্রী° পূ°) উৎপত্তি আর্যভটের অর্থাৎ ৫০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে হইতে পারে না। তাঁহার এই মত যে ভ্রান্ত তাহা দেখাইতেছি।

আলেকজাণ্ডারের পর (৩২৬ খ্রী° পূ°) মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতি গ্রীকদূতগণ ভারতে মৌর্য রাজধানী পাটলীপুত্রে অবস্থান করেন। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয়রা Dyonysios হইতে Sandracottas (চন্দ্রগুপ্ত) পর্যন্ত ১৫৩ জন রাজা গণনা করে।......তাহারা ইহাও বলে, Dyonysios, Herakles হইতে ১৫ পুরুষ পূর্ববর্তী। এই Herakles কে তাহা তাঁহাদের উক্তি হইতে সুস্পষ্ট :—"Under the name of Herakles again, Megasthenes describes either Krishna or his brother Balarama, who were both incarnations of Vishnu. This seems an all but inevitable inference when we combine with the fact that these two brothers were natives of Mathura (now Muttra) on the river Jumna, the statement of Megasthenes that Herakles was worshipped by the inhabitants of the plain, especially the Sauraseni an Indian tribe possessed of two large cities, Methora and Kleisobara, and who had a navigable river, the Jobares flowing their territories. Now Methora is evidently Mathura, and Jobares a copyist's error for Jamuna i.e. the river Jamna or Yamuna, on which Mathura is situated. The Sauraseni are the inhabitants of the district around Mathura of which the Sanskrit name was Surasena'—McCrindle, Ancient India as described in Classical Literature, p. 64 fn.

মেগাস্থিনিস্ বলিতেছেন ভারতের সমতল ভূমির ও বিশেষতঃ শূরসেন দেশের লোকেরা হীরাক্লিসের পূজা করিয়া থাকে। এই শৌরসেনীদের দুইটী প্রধান নগর আছে। একটী মেথোরা (মথুরা) ও অপরটী ক্লিসোবেরা এবং এই রাজ্যের মধ্য দিয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। এই 'হীরাক্লিস্' যে 'শ্রীকৃষ্ণ,' 'মেথোরা' 'মথুরা' ও যোবারেস্' যমুনার লিপি

প্রমাদ তাহা Mc crindle সাহেব সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। জেনারাল কানিংহাম সাহেব বলেন 'ক্লিসোবেরা' বর্তমান বৃন্দাবনের প্রাচীন নাম 'কালিয়াবত,' ও এ অনুমান আমার ঠিক মনে হয়। 'হীরাক্লিস্' হইল 'শ্রীকৃষ্ণ'। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ববর্তী Dyonysios কে? পুরাণ মতে কুরু হইতে অর্জুন পর্যন্ত ১৭ পুরুষ ব্যবধান (শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ও তদীয় পুরাণ প্রবেশ গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ইহা দেখাইয়াছেন)। অপর, এই কুরুর পুত্র প্রথম পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র প্রথম জনমেজয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই প্রথম জনমেজয় হইতে কৃষ্ণ বা অর্জুন ১৫ পুরুষ। পুরাণের সহিত গ্রীকদূতের উক্তির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে বলিতে হয় Dyonysios হইল 'জনমেজয়ঃ।' গ্রীকভাষায় 'চ' বর্গের অভাব হেতু ও নবাগত বিদেশীয়ের পক্ষে ভারতীয় উচ্চারণ বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া 'জনমেজয়ঃ' শব্দের Dyonysios রূপান্তর হওয়া খুবই সম্ভব (Diamuna=যমুনা, Tiastanes—চষ্টন, ইত্যাদি। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত ১৩৮ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিল। ৩১০২ খ্রী° পূ° হইতে ৩২৬ খ্রী° পূ° পর্যন্ত ২৭৭৬ বৎসরে ১৩৮ জন রাজা রাজত্ব করিলে প্রতি রাজার গড় রাজত্ব কাল ২০ বৎসর হয়। ইহা যে খুব সঙ্গত কাল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রবোধবাবু-কথিত ২৪৪৯ খ্রী° পূ° যুধিষ্ঠিরের সময় স্বীকার করিলে ৩২৬ খ্রী° পূ° পর্যন্ত ২১২৩ বৎসর হয়। এই সময়ে ১৩৮ জন রাজা রাজত্ব করিলে প্রতি রাজার গড় রাজত্বকাল ১৫.৪ বৎসর হয় ও ইহা যে মোটেই সঙ্গত কাল নহে তাহা বেশ বুঝা যায়। গড়ে ২০ বৎসর হিসাবে ১৫৩ জন রাজার রাজত্বকাল ৩০৬০ বৎসর হয়। মেগাস্থিনিস্ এই ১৫৩ জন রাজার রাজত্বকাল যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা McCrindle-এর গ্রন্থে ৬০৪২ বৎসর বলিয়া ছাপা হইয়াছে দেখা যায়। মনে হয় ইহা ছাপার ভুল। প্রকৃত কাল ৩০৪২ বৎসর হইবে। গ্রীক বর্ণনা হইতে পাই যে Dyonysions-এর পর Spatembas ও তৎপর Boudyas রাজা হন। Spatembas-এর সময় সম্বন্ধে McCrindle সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেছি:—'The commencement of his reign coincides with that of the Kali Yuga which began 3102 years B. C. or 2785 years before the accession of Chandragupta (Sandracottas) who reigned while Megasthenes was ambassador of his court at Palibothra' (p. 108 fn), অর্থাৎ স্পতেম্বস্ এর রাজত্বকাল মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ২৭৮৫ বৎসর পূর্বে ও এই কাল কল্যাদি অর্থাৎ ৩১০২ খ্রী° পূ° হইতে অভিন্ন। সুতরাং '৬০৪২' পাঠ যে '৩০৪২' হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছি তাহাই যে প্রকৃত পাঠ Mc crindle সাহেবের উক্তি হইতে তাহা সুন্দররূপে বুঝা যায়। সুতরাং কৃষ্ণার্জুন প্রভৃতির (বা মহাভারত যুদ্ধের) কাল ৩২৬ খ্রী° পূ: অব্দে গ্রীকদূতগণ যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা ও আর্যভটের উক্তি একই। সুতরাং কল্যাদি বা ভারত যুদ্ধকাল (৩১০২ খ্রী° পূ°) এর উৎপত্তি আর্যভটের বা ৫০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে হইতে পারে না বলিয়া প্রবোধবাবু বলিয়াছেন তাহা যে ঠিক নহে ও ৫০০ খ্রীস্টাব্দের প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বেও যে এই মত ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা বেশ জানা যায়। (ক্রমশঃ)

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য ৮টী বিষয়ের মধ্যে ২টী বিষয় (অনুবন্ধ চতুষ্টয় ও প্রমাণ) সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার ৩য় অধ্যাত্মমীমাংসা (Metaphysics) সামান্য-ভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

শঙ্কর দর্শনের বিশেষত্ব মায়াবাদ। আর এই মায়াবাদের উপরেই অধ্যাত্ম মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে আচার্য গৌড়পাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন ব্রহ্ম বা আদিকারণ সৎ এবং এই সৎবস্তু কোন কার্যে পরিণত হইতে পারে না। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে, আর যখনই কোন কারণ হইতে কার্য হয় তখন কারণবস্তু বিকারপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে যদি জগতের উদ্ভব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ব্রহ্ম বা আদি কারণ বিনাশশীল ও বিকারী হয়। সেজন্য গৌড়পাদের মতে জীব জগতের কোন অস্তিত্ব নাই ; ইহা স্বপ্ন বা গন্ধর্ব নগরবৎ। কিন্তু শঙ্করের মতে জীব জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই থাকে তাহাকেই পারমার্থিক সত্য (Absolute Reality) বলা যাইতে পারে আর ব্রহ্মই এই প্রকার সৎবস্তু। কিন্তু জীব জগৎ অতীতকালে ছিল, বর্তমানে আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হইবে তখন ইহার অস্তিত্ব থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই অনুভূত হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে যাহার এই প্রকার জ্ঞান হইল সেই ব্যক্তিরই নিকট না হয় জীব জগৎ রহিল না কিন্তু আর সকলের নিকট ত ইহা প্রকৃতপক্ষে রহিল। ইহার তিনভাবে উত্তর দেওয়া চলিতে পারে। প্রথম মনে করুন ক্রমশঃ সকল মানবেরই এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান হইল তখন ত জগতের অস্তিত্ব লোপ পাইল। দ্বিতীয় উত্তর যাহার উৎপত্তি তাহারই বিনাশ ইহা অবিসংবাদী সত্য ; সুতরাং জগৎও যেহেতু উৎপত্তি-শীল, ইহার বিনাশ আছেই। তৃতীয় প্রকার উত্তর Idealiste Theory (···) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। বিখ্যাত জার্মাণ দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্ট (Imanuel Kant) প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমাদের জীব জগৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান হয় তাহা কতকগুলি পদার্থ (Categories) দ্বারা—যেমন দেশ (Space), কাল (Time), ইন্দ্রিয় (Senses) প্রভৃতি। কোন দ্রব্যেরই প্রকৃত সত্তা (thing-in-itself) আমরা জানিতে পারি না। সুতরাং জীব জগতের যাহা কিছু সত্তা আমাদেরই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আমার যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে তখন জীব জগতের জ্ঞান থাকিবে না সুতরাং উহার অস্তিত্বও থাকিবে না।

তাহা হইলে জীবজগতের প্রকৃত স্বরূপ কি ? এ বিষয়ে তিনটী বিভিন্ন মতবাদ আছে—পরিণামবাদ, বিকারবাদ ও বিবর্তবাদ। সাংখ্য দর্শন মতে কারণও সৎ কার্যও সৎ—ব্রহ্মই জীব

জগতে পরিণত হইতেছে। ক্রমোন্নতিবাদকে (Theory of Evolution) এই পরিণামবাদের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। আর এক মতে জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকার। কিন্তু এই সব মতবাদকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলে অনেক দোষ দৃষ্ট হয়। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য মায়াবাদ ও অধ্যাস্থবাদ দ্বারা জীবজগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'মায়া' শব্দের অর্থ স্বপ্ন বা মিথ্যা নহে। মিথ্যা অনেক রকমের হয় যেমন—(১) বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশপুষ্প প্রভৃতি; ইহারা একেবারেই মিথ্যা। কারণ বন্ধ্যার পুত্র হইতেই পারে না। (২) মরীচিকা—কতকগুলি পদার্থ কারণ না থাকিলে মরীচিকা দৃষ্ট হয় না আর সেইজন্যই সাধারণতঃ মরুভূমিতেই মরীচিকা প্রকৃতপক্ষে দৃষ্ট হয়, অথচ ইহা সৎবস্তু নহে। (৩) রজ্জুতে সর্পভ্রম; অন্ধকারে যদি হঠাৎ একটা রজ্জু দেখিয়া সর্প প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে এই যে সর্প জ্ঞানের সর্প ইহা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে পূর্ব হইতেই যদি সত্য রজ্জু ও সত্য সর্প এই দুইটী পদার্থ না থাকে এবং এই দুইটী পদার্থেরই জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে একটিকে আর একটি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না। সেজন্য অদ্বৈতবাদীরা স্বীকার করেন যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একটা প্রাতিভাসিক সর্পের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই সর্পের (যতক্ষণ না আমরা ইহাকে রজ্জু বলিয়া জানি) যে সত্তা তাহাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়। ইহাও মিথ্যা। জগৎ কিন্তু এই ৩ শ্রেণীর মিথ্যার মধ্যে কোনটাই নহে। ইহার সত্তার নাম ব্যবহারিক সত্তা। অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ জগতকে প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট বলেন। 'মায়া' তাহা হইলে কি? শঙ্করের মতে ইহা সৎও নহে কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে ইহা থাকে না, অসৎও নহে, কারণ জীবজগতের অস্তিত্ব—যাহা মায়া হইতেই উদ্ভূত—আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ইহা অনির্বচনীয় অর্থাৎ কি আমরা বলিতে পারি না। শঙ্করের বিপক্ষবাদীরা বলেন যে তিনি এমন এক মতবাদ প্রচার করিলেন যাহার (মায়ার) স্বরূপ তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। ইহার উত্তর জার্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্ট দিয়াছেন। কারণ মায়া কি বলিতে হইলে আমাদিগকে মায়াতীত হইতে হইবে। আমরা যাহা বলি তাহা মায়ার মধ্য দিয়াই (categories দ্বারা); আর যখন মায়াতীত অবস্থা হয় তখন বলাও হইবে না। যাহা হউক শঙ্করের মতে পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্রহ্মের উপর মায়া (অজ্ঞান) বশতঃ জীবজগৎ এর অধ্যাস (আরোপ) হইতেছে আর জীবজগতেরও যেমন অস্তিত্ব নাই মায়ারও অস্তিত্ব নাই। এই পরমার্থ দৃষ্টিতে জীবজগতের প্রাতিভাসিক সত্তা বলা যাইতে পারে। আর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবজগতের অস্তিত্ব আছে, মায়াও আছে। এই মায়াকে আমরা, সাধারণভাবে ব্রহ্মের (সগুণ ব্রহ্মের) শক্তি বলিতে পারি। সাংখ্যদর্শনের মতে ইহার নাম প্রকৃতি। ইহাই সংক্ষেপে অধ্যাত্ম মীমাংসা—মায়াবাদ ও অধ্যাস্থবাদ।

এইবার ৪র্থ বিষয় ব্রহ্মবাদ আলোচিত হইতেছে। আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দম্। ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব। ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। এই ব্রহ্মই যখন মায়াযুক্ত হ'ন তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একই। যিনিই সগুণ, তিনিই

নির্গুণ। ঈশ্বর যদিও মায়াযুক্ত কিন্তু তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সৃষ্টি করেন। জীব কিন্তু মায়ার বশীভূত। আচার্য রামানুজ বা বেদান্তদর্শনের অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই স্বীকার করেন। তাঁহারা মায়াকে ঈশ্বরেরই শক্তি বলেন। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি প্রভেদ নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও মায়া অভিন্ন। কিন্তু নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার না করিলে দার্শনিকতার দিক দিয়া অনেক আপত্তি হয়। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন নির্গুণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেন সমুদ্র এবং ভক্তের ভক্তি হিমে তিনি সাকার (জল যেমন জমিয়া বরফ হয়) ও সগুণ হইয়াছেন। শ্রুতিতে আছে ব্রহ্ম স্বরাট্ অবিভাজ্য, নিরংশ। সুতরাং এই প্রকার ব্রহ্ম কি প্রকারে জগতের আদি কারণ হইয়া জীব জগতে পরিণত হইতে পারে? এই আপত্তির কোন সমস্যা না হওয়ায় নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্মবাদ মানিয়া লইতে হইয়াছে। ব্রহ্মের এই সগুণভাবই তাঁহার লীলা। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ও অশেষ কল্যাণনিকর। দার্শনিক ভাষায় সমষ্টি (collective) উপাধি-উপহিত চৈতন্য (ব্রহ্ম) ঈশ্বর; আর ব্যষ্টি (individual) উপাধি-উপহত চৈতন্য জীব। সুতরাং উভয়ই যেন (নির্গুণ) ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্থানীয়। ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

এইবার ৫ম বিষয় জগৎবাদ আলোচিত হইতেছে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ঘট তৈয়ারী করিতে হইলে একজন কুম্ভকার ও মৃত্তিকার প্রয়োজন হয়। এখানে কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ। ঈশ্বর নিজের মধ্য হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। অন্য বাহিরের কোন উপাদান লইয়া নহে। যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর হইতেই তাহার জাল তৈয়ারী করে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, বৈষম্যই সৃষ্টির মূল। তাহা হইলে ঈশ্বরে কি বৈষম্য দোষ আছে? যিনি পরম কল্যাণনিকর তাঁহার মধ্যে ভেদ কেন? তাহার উত্তরে শঙ্কর বলেন জগতের বৈষম্য-দোষ মানবের ধর্মাধর্মাদির অর্থাৎ কার্যফলের উপর নির্ভর করে। মেঘ হইতে যে বারি বর্ষণ হয় ঐ বারি নানারকম বৃক্ষাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া কোথায় তিক্ত, কোথায় মিষ্ট হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টির জল একই। এই জগৎ অনাদি, কিন্তু সান্ত অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে থাকে না। মানবের বিভিন্ন কর্ম ফলে সৃষ্টির প্রবাহ অনাদিকাল হইতে হইতেছে। এক একটী কল্পান্তে বর্তমান পরিদৃশ্যমান বা অপরিদৃশ্য জগতের লয় হয় কিন্তু উহা ঈশ্বরের মধ্যে বীজাকারে থাকে, কল্পান্তে পুনরায় ঐ বীজ হইতেই নূতন জগতের আরম্ভ হয়।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

ভারতীয় কলাবিদ্যা

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রাচীন ভারতে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আর্যধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্ম মানবজীবনের কর্মকে এই ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। কথিত আছে সৃষ্টির প্রারম্ভে মানবের কর্মপ্রণালীর জন্য ব্রহ্মা ১ লক্ষ অধ্যায়ে বিভক্ত একটী বিশ্বকোষ রচনা করেন, আর তার মধ্যে এই ৪ প্রকার কর্মের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। পরে মনু ইহার মধ্যে ধর্মকাণ্ডকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা রচনা করেন। বৃহস্পতি অর্থকাণ্ডকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার অর্থশাস্ত্র রচনা করেন, আর দেবাদিদেব মহাদেবের অনুচর নন্দি কামকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া ১ হাজার অধ্যায়ে একটী কামশাস্ত্র রচনা করেন। সুতরাং নন্দিকেই এই কামশাস্ত্রের আদিগুরু বলা যাইতে পারে। নন্দির এই গ্রন্থকে পরবর্তীকালে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু ৫০০ অধ্যায়ে বিভক্ত করেন এবং আরও পরে পাঞ্চাল দেশস্থ বভ্রপুত্র বাভ্রেয় ইহাকে ১৫০ অধ্যায়ে বিভক্ত করেন ও ৭টী বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। আরও পরবর্তী কালে এই ৭টী বিষয় লইয়া ৭জন আচার্য—চারায়ণ, সুবরুণাভ, ঘোটকমুখ, গোরন্দেয়, গোনিকপুত্র, দত্তক, ও কুচমার ৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমস্ত গ্রন্থই লুপ্ত হইয়া যায়। বাৎস্যায়ন মুনি এই ৭টী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া কামশাস্ত্র রচনা করেন। এই শাস্ত্রের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যার প্রচার হয়। অনেকেই এই ৬৪ প্রকার কলা-বিদ্যা কি কি তাহা বোধ হয় অবগত নহেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীতে তাহাদের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

১। গীতম্—সঙ্গীত ইহাদের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান। এই বিদ্যার সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে।

২। বাদ্যম্—সঙ্গীত যন্ত্র। প্রাচীন ভারতে বীণাই শ্রেষ্ঠ যন্ত্র ছিল এবং এখনও ইহাকে আধুনিক সর্বপ্রকার যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে।

৩। নৃত্যম্—নাচ। ভরতমুনিই এই নৃত্য বিদ্যার আদি প্রবর্তক।

৪। আলেখ্যম্—চিত্রকলা বা চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা। বহু প্রাচীন স্তূপ, গুহা যেমন অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি এবং রাজপুতানা, কাংরা, বঙ্গদেশস্থ ছবি ভারতের এই বিদ্যার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন।

৫। ভূষণম্—কপালে মূর্তির আকৃতি লেপন। এই বিদ্যার আর প্রচলন নাই।

৬। তণ্ডুলকুসুমবলি বিকারাঃ—আলিপনা বিদ্যা। চাউলের গুঁড়ি দিয়া, পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা মন্দির প্রভৃতিতে নানারকমের আলিপনা দেওয়া।

৭। পুষ্পাস্তরণম্—গৃহাদিকে সুন্দরভাবে পুষ্প দিয়া সাজান।

৮। দশনবসনাঙ্গরাগাঃ—দন্ত, অঙ্গ ও বস্ত্রাদি নানা রকমে রং করা। সে সময়ে দেহ, দন্ত প্রভৃতিরও রং করা প্রচলন ছিল।

৯। মণিভূমিকা কর্ম—প্রস্তরাদি স্থাপন। গৃহের মেঝে ও অন্যান্য স্থানে নিপুণ-ভাবে পাথর বসান বিদ্যা।

১০। শয়নরচনম্—নানাভাবে শয্যা বিস্তারণ একটী মনোরম কলাবিদ্যারূপে প্রচলিত ছিল।

১১। উদকবাদ্যম্—নদী ও পুষ্করিণীতে নানাপ্রকার জলক্রীড়াবিদ্যা, জলের আলোড়নে নানারকম বাদ্য সঙ্গীত ধ্বনি করা ইত্যাদি।

১২। উদকঘাতঃ—পিচকারী প্রভৃতির দ্বারা জল বা রং প্রভৃতি নিক্ষেপ, যেমন হোলি উৎসবে হয়।

১৩। ঔষধিকরণ বিদ্যা—অপরকে বশীভূত করিবার জন্য কিংবা যুদ্ধ জয়ের জন্য গাছ-গাছড়া হইতে নানাপ্রকার ঔষধ, টোটকা প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার বিদ্যা। ইহা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়।

১৪। মাল্য গ্রন্থনবিকল্পাঃ—পুষ্পাদি হইতে নানাপ্রকার মাল্য তৈয়ারী করিবার বিদ্যা।

১৫। কেশেশেখরাপীড়াযোজনম্—রমনীদের মস্তকভূষণের জন্য নানাপ্রকার পুষ্পাভরণ তৈয়ারী করা।

১৬। নাট্যম্—নাটকীয় বিদ্যা।

১৭। কর্ণপত্র ভঙ্গাঃ—হস্তীদন্ত, শঙ্খ ও এবম্প্রকার দ্রব্য হইতে কর্ণভূষণাদি তৈয়ারী করা বিদ্যা।

১৮। গন্ধযুক্তিঃ—চন্দন, অগুরু ও তৈলাদি হইতে নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারী করা বিদ্যা।

১৯। ভূষণ যোজনম্—পুরাতন অলঙ্কারদিগকে নূতন ভাবে প্রস্তরাদি বসাইয়া নির্মাণ করা বিদ্যা।

২০। ইন্দ্রজালম্—নানাপ্রকার যাদুবিদ্যা দেখাইয়া নিজেদের মধ্যে ও অতিথিদের সহিত আনন্দ উপভোগ করা সে সময়ে প্রচলিত ছিল।

২১। হস্ত লাঘবম্—অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে গৃহকর্মাদি সমাপ্ত করা।

২২। কৌচুমারযোগাঃ—ইন্দ্রিয় সেবার জন্য বাজীকরণাদি ঔষধ প্রস্তুত করা বিদ্যা।

২৩। চিত্রশাকাপূপভক্ষবিকার-ক্রিয়াঃ—রন্ধনবিদ্যা। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিবার বিদ্যা শিক্ষা করা।

২৪। পানকরসরাগাসবযোজনম্—পানীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার বিদ্যা।

২৫। সূচীবাপকর্ম—বহু প্রকার সূচিশিল্প শিক্ষা করা।

২৬। সূত্রক্রীড়া—যেমন পুতুল নাচ প্রভৃতি।

২৭। বীণাডমরুক ক্রীড়া—বীণা, ডমরু প্রভৃতি বাজান।

২৮। প্রহেলিকা—সমস্যা সমাধান বিদ্যা।

২৯। প্রতিমা—আবৃত্তি বিদ্যা। এক ব্যক্তি একভাবে কোন কবিতাদি আবৃত্তি করিল, অন্য ব্যক্তি তাহার পরবর্তী অংশ আবৃত্তি করিল।

৩০। দুর্বাচকযোগাঃ—আবৃত্তি যুদ্ধ। একজন কোন গূঢ় তাৎপর্যযুক্ত আবৃত্তি করিল, অন্য ব্যক্তি অনুরূপ গূঢ়াবৃত্তি দ্বারা তাহার উত্তর প্রদান করিল।

৩১। পুস্তক-বাচনম্—কথকতা-বিদ্যা ; রামায়ণ, মহাভারতাদি সুললিতস্বরে ও তালে পাঠ করা।

৩২ নাটিকাখ্যায়িকা দর্শনম্—কাব্য নাটকাদিতে বিশেষ জ্ঞান।

৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণম্—একজন কোন ছন্দের একটি পাদ রচনা করিল, অন্যজন পরবর্তী পাদ রচনা করিল।

৩৪। পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প :—বেত প্রভৃতি হইতে গৃহের আসবাব (চৌকি, মোড়া প্রভৃতি) তৈয়ারী করা বিদ্যা।

৩৫। তর্ক্‌কর্মাণি—প্রেমোদ্দীপক মূর্তি প্রভৃতি তৈয়ারী করা।

৩৬। তক্ষণম্—সূত্রধার বিদ্যা।

৩৭। বাস্তুবিদ্যা—গৃহনির্মাণ, স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতি।

৩৮। রূপ্যরত্নপরীক্ষা (প্রস্তর পরীক্ষা বিদ্যা)—নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরাদির (যেমন হীরা, পান্না প্রভৃতি) মূল্য নির্ণয় করা।

৩৯। ধাতুবাদ—এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করিবার বিদ্যা (অবশ্য নানা-প্রকার দ্রব্য সংমিশ্রণে)।

৪০। মণিরাগজ্ঞানম্—মণিমুক্তাদি রং করা বিদ্যা।

৪১। বৃক্ষায়ুর্বেদযোগঃ—কৃষিবিদ্যা

৪২। মেষকুক্কুটলাবক যুদ্ধবিধিঃ—গৃহপালিত জন্তু যেমন ভেড়া, মোরগ প্রভৃতিকে শিক্ষা দান বিদ্যা (পরস্পরে যুদ্ধ করিবার জন্য)

৪৩। শুক-সারিকা প্রলাপনম্—কাকাতুয়া, পায়রা প্রভৃতি পক্ষীদিগকে মনুষ্যের মত কথা শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের দ্বারা গোপনবার্তা প্রেরণ করা।

৪৪। কেশমার্জন কৌশলম্—কেশ বিন্যাসাদি বিদ্যা।

৪৫। অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্—সংক্ষেপ লিপিবিদ্যা। অর্থাৎ অধিক কথাকে অল্প কথায় লিপিবদ্ধ করা। ইহা বর্তমানের Shorthand-এর মত।

৪৬। সংকেত লিপি বিদ্যা—ইহা বর্তমানের Code ভাষার অনুরূপ।

৪৭। দেশভাষাজ্ঞানম্—দেশে প্রচলিত অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করা।

৪৮। আকরজ্ঞানম্—খনিজবিদ্যা।

৪৯। পুষ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞানম্—ক্রীড়নক দ্রব্য প্রস্তুত করণ বিদ্যা। ক্রীড়ার জন্য ছোট শিশুদের গাড়ী, পাল্কী হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা তৈয়ারী করণ শিক্ষা করা।

৫০। যন্ত্র মাতৃকা—যুদ্ধাদি কার্যে ব্যবহৃত উপকরণ যথা গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী করা।

৫১। ধারণ মাতৃকা—স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা; সে সময় এই বিদ্যা বিশেষ প্রকারে আয়ত্ত করা হইত।

৫২। সম্পাট্যম্—ইহাও এক প্রকার আবৃত্তি।

৫৩। মানসীকাব্যক্রিয়া---কোন কবিতা বা লেখাতে মধ্যে মধ্যে যে অংশ বাদ দেওয়া হইবে, ঐগুলি উপযুক্ত ভাষাদি দ্বারা পূরণ করা।

৫৪। কাব্যলিখন—কাব্য রচনা, কবিতা লেখা একটি উত্তম কলা বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইত।

৫৫। উৎসাদনম্—গাত্রমর্দনকৌশল।

৫৬। অভিধান কোষছন্দোজ্ঞানম্—ছন্দ ও কোষশাস্ত্রে বুৎপত্তি, অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা।

৫৭। শব্দানুকরণ বিদ্যা—অন্য মানুষ বা পশু পক্ষীর স্বরানুকরণ করা, এখনও ইহা কিছু কিছু প্রচলিত আছে।

৫৮। বস্ত্র গোপনানি—বিভিন্ন দেশ কালোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান।

৫৯। আকর্ষণ ক্রীড়া—বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া বিদ্যা।

৬০। দ্যূত বিশেষঃ—অক্ষক্রীড়া বিদ্যা।

৬১। বালক ক্রীড়নকানি—শিশুদের জন্য পুতুল প্রভৃতি লইয়া ক্রীড়া বিদ্যা।

৬২। বৈনায়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানন্—মার্জিত ও ভদ্র সমাজোপযোগী আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। পাশ্চাত্য সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের পুত্র-কন্যাদিগকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে ইহার শিক্ষা প্রচলন বর্তমানে বিশেষ নাই।

৬৩। বৈজয়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্—নানা প্রকার কৌশল বিদ্যা শিক্ষা, যাহার দ্বারা শত্রুকে দমন করা যায়।

৬৪। বৈতালিকীনাম্ বিদ্যানাং জ্ঞানং—শরীর চর্চা বিদ্যা; যাহাতে দেহের গঠন ও সৌন্দর্যের পূর্ণতা হয় সেইরূপ ব্যায়ামাদি শিক্ষা করা।

ইহাই সংক্ষেপে ৬৪ প্রকার কলা-বিদ্যার পরিচয়। এই নামকরণগুলি শৈবতন্ত্রে আছে।

(২)

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

ধর্ম্মসাহিত্যে, দার্শনিকসাহিত্যে ও সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে ভারতের দান অতুলনীয়। এই সব অপূর্ব অবদানের উজ্জ্বল আভায় আজ সারা বিশ্বের জ্ঞানরাজ্য আলোকিত। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারত জগতের তদানীন্তন অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতি যেমন চীন, মিসর, গ্রীক প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিল না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভারতীয়দের গ্রন্থ মধ্যেই বীজাকারে ছিল আর ইহার জ্ঞানসম্ভার এখনও অনেক বিষয়ে অতুলনীয়, কিন্তু সাধারণের অজ্ঞাত। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে এবং ক্রমে জ্ঞানের এক একটী বিষয় লইয়া বিশদরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এ বিষয়ে ডক্টর স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অগ্রণী ও তাঁহার Positive Sciences of the Ancient Hindus একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এক একটী বিষয় লইয়া আলোচিত হইতেছে। (১) গণিত সাহিত্য—গণিত ও ফলিত জ্যোতিষে বহু বিষয়ে বর্ত্তমান যুগেও ভারতীয় জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ আছে। যাহা বহু পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্য জগতের আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী তাহার নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরিবার কারণ দিবারাত্র প্রভৃতি হয়—এ সব বিষয় আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রীঃ অব্দ) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বৌধায়ন ও আপস্তম্বকৃত শুল্বসূত্রাদিতে জ্যামিতির বহু বিষয় আছে। এমন কি বর্ত্তমান Co-ordinate Geometryর আবিষ্কর্ত্তা ডেকার্ট (Descartes)এর ৮ শত বৎসর পূর্বে বাচস্পতি ইহার মূলতত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। Mechanics, Differential Calculus প্রভৃতির সামান্য তত্ত্বও হিন্দুদের গ্রন্থে আছে। পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির যথেষ্টই প্রচলন ছিল।

(২) রসায়ন-বিদ্যা—ডক্টর স্যর পি. সি. রায় তাঁহার গ্রন্থে (Hindu Chemistry) এ বিষয়ে হিন্দুদের দান বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন।

(৩) আয়ুর্বেদ শাস্ত্র---বর্ত্তমান চিকিৎসা বিদ্যার প্রায় অধিকাংশ বিভাগই আয়ুর্বেদ সাহিত্যে অল্প বিস্তর আছে। বহু গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গেলেও যে সব গ্রন্থ আছে তাহাদের তত্ত্বগুলি অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অপেক্ষা এই বিজ্ঞানে অধিকতর আলোকসম্পাত করে।

(৪) গজায়ুর্বেদ, অশ্বচিকিৎসা বিদ্যা—গজ চিকিৎসার প্রবর্ত্তক ছিলেন অঙ্গদেশের অন্তর্গত চম্পার রাজা রোমপাদের গুরু পালকাপ্যমুনি। আর সালিহোত্রমুনি ছিলেন অশ্ব চিকিৎসার প্রবর্ত্তক। এই সব বিষয়ে বহু গ্রন্থ আছে।

(৫) ধাতু বিদ্যা (Mineralogy) প্রাচীন হিন্দুজাতি বিভিন্ন ধাতুর (Metals)

ব্যবহার জ্ঞানে ও বিশেষতঃ মূল্যবান্ প্রস্তরাদির জ্ঞানে কত পারদর্শী ছিল তাহা ডক্টর উদয়চাঁদ দত্ত কৃত Materia Medica of the Hindus, ডক্টর রাজেন্দ্র লাল মিত্র কৃত Indo-Aryans প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত 'রত্ন-পরীক্ষা' নামক ১ খানি বাংলা গ্রন্থেও এবিষয়ে বহু তথ্য আছে। রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার 'মণিমালা' গ্রন্থে প্রায় ৬৪ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বেদ, আয়ুর্বেদ, এবং বিশেষতঃ আয়ুর্বেদের অন্তর্গত রসশাস্ত্রসকলে ধাতুর জ্ঞান ও ব্যবহার সম্বন্ধে বহু বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। ডক্টর রামদাস সেন অগস্তিমতম্, রত্ন-সংগ্রহ, এবং মণি-পরীক্ষা নামক ৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়াছেন।

(৬) উদ্ভিদবিদ্যা—এবিষয়ে হিন্দুদের কত জ্ঞান ছিল তাহা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হইতে ও শুক্রনীতি হইতে জানিতে পারা যায়। 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' নামে বহু গ্রন্থ ছিল, উহাদের অধিকাংশ লুপ্ত। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত 'উপবনবিনোদ' গ্রন্থের শেষ ভাগে ঐ বিষয়ে, যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহা সংবদ্ধ করা হইয়াছে। করদ-রাজ্য গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব কৃত History of the Aryan Medical Science এবং অধ্যাপক ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত The Economic Botany of India পুস্তক হইতে এবিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এই বিদ্যাকে আয়ুর্বেদেরই একটি অঙ্গ ধরা হইত। Major B. D. Basu কৃত Indian Medicinal Plants এবিষয়ে একটি অমূল্য গ্রন্থ।

(৭) পদার্থ-বিদ্যা—পদার্থ-বিদ্যার অনেক মূলতত্ত্ব ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতিষীদের গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায়। ইঁহারা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য নিউটন কৃত ইহার নিয়ম (Laws of Gravitation) ইঁহারা আবিষ্কার করেন নাই। Laws of Motion প্রভৃতির অনেক তথ্য হিন্দুদের গ্রন্থে আছে। রামায়নাদি গ্রন্থে পুষ্পরথের বিষয় আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও বিমানযানের বিষয় জানা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় Laws of Motion ও Mechanics-এর অনেক তথ্য হিন্দুদের জানা ছিল। ডক্টর বড়ুয়া ও অধ্যাপক মজুমদার একটি প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে যে বিমানপোত ছিল তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা Calcutta Review-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের কথা

ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কতদূর ব্যাপ্ত হইবে ও ইহার শেষ পরিণতিতে জগতের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বলা কঠিন। ইতিমধ্যেই পোল্যাণ্ড, জার্মান ও রাশিয়ার কবলে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধবিরতিতে ইহার স্বাধীনতার দাবী পূর্ণ হইতে পারে কিনা এবং এই যুদ্ধের চরম উদ্দেশ্য কি তাহা জানিতে চাহিলে লর্ড জেটল্যাণ্ড তাঁহার ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের বক্তৃতায় বলেন, তিনি বর্তমান সঙ্কট সময়ে ভারতের এই প্রকার দাবী করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। ইহাতে ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটী কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে। বড়লাট বাহাদুর ইহার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতাদের আহ্বান করিতেছেন। সরকার যদি ভারতের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া উহা পূরণের জন্য একটা যুক্তিযুক্ত সময় নির্ধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে এই সমস্যার সহজেই মীমাংসা হইয়া যায়। আর তাহাতে ব্রিটিশ ও ভারত উভয়েরই মঙ্গল হয়।

* * *

বর্তমানে হিন্দু মহাসভাতে স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙ্গালী যোগদান করিয়াছেন এবং হিন্দু মহাসভার আগামী অধিবেশন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুজাতি একটী প্রাচীনতম মহাজাতি। ধর্মে, জ্ঞানে, কৃষ্টিতে, শৌর্যে, বীর্যে এই জাতি পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। হিন্দুজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে হিন্দু মহাসভাকে রাজনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে মন্দির সংস্কার, সমাজসংস্কার, হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানপ্রচার প্রভৃতি সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব না হইলে অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে এই সব কাজ করিতেছে তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই সব কার্য পরিচালনা করিলে অচিরে হিন্দুজাতি জগৎসভায় ইহার উপযুক্ত আসন গ্রহণে সমর্থ হইবে। আমরা হিন্দু মহাসভার কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

* * *

যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্যদ্রব্যাদিতে ভারত যে কত পরমুখাপেক্ষী তাহা সকলেই বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। ২।১টী উদাহরণ দিতেছি। ঔষধাদি প্রস্তুতকরণে আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু এ পর্যন্ত ভারতে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায় প্রণালীতে (Commercial Scale) আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত হয় নাই। ভারত হইতে বহু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ প্রস্তুতের একটিও কারখানা নাই। দেশের ধনীলোকগণ ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সকল একযোগে এই সমস্ত অভাবদূরীকরণে অবহিত হইলে ভারতবর্ষ অচিরেই অনেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে। তাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়।

পুস্তক সমালোচনা

Studies in the History of the Bengal Subah, Vol. 1. 1740—70, by Dr. Kalikinkar Dutta. M. A., P. R. S., Published by the University of Calcutta. pp. XX + 567.

আলোচ্য গ্রন্থে বাঙলার বিভিন্ন সুবা সমূহের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে। এই পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে নিপুণভাবে বাঙলার এক যুগসন্ধি কালের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া অনালোচিতপূর্ব বহু উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু প্রাদেশিক ভাষায় এবং ফারসী ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল গ্রন্থের কয়েক খানির সন্ধান আমরা সর্বপ্রথম ডাঃ দত্তের লেখায় পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের অমুদ্রিত বহু নথি-পত্র ও বহু ইউরোপীয়দের লেখা হইতেও এই গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পরিশ্রম ও প্রীতি সহকারে অমুদ্রিত এই সকল গভর্ণমেণ্ট নথি-পত্রের অনুসন্ধান করিলে গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এদেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যাইবে। গ্রন্থকার তাঁহার বিভিন্ন মতের সমর্থনে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইরূপ করার ফলে ঐতিহাসিক আলোচনার পক্ষে অর্থাৎ আমাদের সভ্যতা, সমাজ, রাজনীতি ও আর্থিক ইতিহাস সঙ্কলনের পক্ষে, এই জাতীয় গ্রন্থাদির অপরিহার্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহার জন্য এই গ্রন্থের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগে বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের ভাগ্য যখন যুগসন্ধির মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইতেছিল সেই সময়ের বাঙলার এক নিখুঁত চিত্র এই গ্রন্থে পাইতেছি। ইহাতে তদানীন্তন বাঙলার জনশিক্ষার অবস্থা, স্ত্রীলোকের অবস্থা, বিবাহ রীতি, ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি, হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক, বাণিজ্যের অবস্থা, ইংরেজস্থাপিত ফ্যাক্টরী সমূহের বিবরণ, সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের অবস্থা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার গ্রন্থের পরিশেষে যে দীর্ঘ প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভাবী ঐতিহাসিকদের নিশ্চয়ই উপকারে আসিবে। গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি ও বিস্তৃতি কতটুকু তাহারও আভাস এই প্রমাণপঞ্জীর হইতেই পাইতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইতিহাস-রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ এদেশের প্রত্যেক পাঠাগারে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—(১৭৯৫-১৮৭৬)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-মন্দির হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২+২৪২। মূল্য ২॥০ টাকা।

পুস্তকখানির প্রথম মুদ্রণ হয় সন ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। আলোচ্য পুস্তকখানি দ্বিতীয় সংস্করণের। ইহা মুদ্রিত হইয়াছে বর্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত ও কিছু পরিবর্ধিত হইয়াছে। এবারে পুস্তকের শেষে একটী পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টে আছে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের একটী তালিকা ও কয়েকজন নাট্যকারের সমুদয় নাট্যগ্রন্থের প্রকাশকাল সমেত একটী প্রমাণ-পঞ্জী। ইহা ছাড়া বর্তমান সংস্করণে নাট্যকার, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনেতৃদিগের কয়েকখানি চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে বাংলা নাট্যশালার ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত একটী ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টা আছে। সেইকারণ বাংলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁহারা বাংলার আধুনিক নাট্যশালার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হন, তাঁহাদের বিষয় ও তাঁহাদের নাট্যগ্রন্থের বিষয় এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত নহে।

রসরাজ অমৃত লাল বসু 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রে (৮ কার্তিক ১৩৩১) প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে দুটী বিশেষ উপকরণের সাহায্য লইতে হয় ;—পুরাতন সংবাদ পত্রের ফাইল ও পুরাতন বিজ্ঞাপন পত্রের তাড়া"। গ্রন্থকারও তাঁহার 'নিবেদনের' মধ্যে বলিয়াছেন—"রসরাজের উক্ত অতি সত্য কথাটী স্মরণ রাখিয়া সমসাময়িক সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিবরণ হইতে বাংলা নাটকের ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়াই বর্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য।"

গ্রন্থকার পুস্তকখানি ২ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে আছে সখের নাট্যশালার সম্বন্ধে সংবাদ ও দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সাধারণ রঙ্গালয়ের বিবরণ। বাংলা নাট্যশালা অধিকদিনের পুরাতন নহে। প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে। ইহা হেরাসিম লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাঙলা নাট্যশালা। কিন্তু বাঙালী কর্তৃক নাট্যশালার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে। নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারের বাড়ীতে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত নাট্যশালা স্থায়ী রঙ্গালয়ে পরিণত হয় নাই। বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। বর্তমান পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির আলোচনা আছে—বাংলা নাট্যশালার সূত্রপাত, বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেক্‌সপীয়র—স্কুলকলেজে নাট্যাভিনয়, নাট্যশালার নবজীবন, সখের নাট্যশালার পূর্ণবিকাশ, কলিকাতায় ও মফঃস্বলে অন্যান্য অভিনয়। দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে থিয়েটার সংক্রান্ত নূতন আইন প্রবর্তন পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে মোটামুটি বিষয়ের আলোচনা আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় এই পুস্তকের একটী ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকায় বঙ্গীয় নাট্য-শালার একটী সংক্ষিপ্ত অথচ অতি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকা লেখক তাঁহার ভূমিকার মধ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন, "গ্রন্থকার নাট্যশালার ঘটনাবলীর ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু নাট্যসাহিত্যের ভিতরকার ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। তথ্যানুসন্ধানের দিক্ দিয়া যতটুকু নাট্য সাহিত্যের উল্লেখ প্রয়োজন তাহা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু এই যুগের নাট্য সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি বা সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। * * * * সাধারণ বাঙালী পাঠক কেবল তারিখ, তথ্য বা ঘটনার অপেক্ষাকৃত নীরস বিবৃতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহার নিকট উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের, গ্রন্থকারদের বা নাট্যোল্লিখিত বিষয় বস্তুর অধিকতর সরস বিবরণ প্রত্যাশা করিতে পারে।" গ্রন্থকার তাঁহার 'নিবেদনে' তাঁহার পুস্তকখানিকে বঙ্গীয় নাট্যশালার পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস বলিয়া দাবী করেন না। তিনি বলিয়াছেন "আমি অনুসন্ধান করিয়া যে সকল পত্রিকা ও পুস্তকের খোঁজ পাইয়াছি, তাহা হইতে নাট্যশালার ইতিহাসের যথাসম্ভব নির্ভুল একটী কাঠামো গড়িয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। * * বঙ্গীয় নাট্যশালার কোন ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক এই প্রবন্ধ-গুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।" পুস্তকখানি বহুতথ্য পূর্ণ এবং পুস্তকখানির মধ্যে গ্রন্থকার যাহা দিয়াছেন, তাহার মূল্য কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই পুস্তকখানি হইতে বঙ্গীয় নাট্যশালার ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকগণ নির্বিচারে তাঁহাদের রচনার বহু মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যাঁহারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এই পুস্তকখানিও অবশ্য পাঠ্য।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

বেদ

১। ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা—মাধবকৃত—Prof. C. Kunhan Raja. M. A., D. Phil.

২। শৌনকের চরণ ব্যূহ সূত্র (বৈদিক সাহিত্য)—মহীদাসের টীকা সমেত। Edited by Pt. A. Dogara Sastri—Benares.

৩। Gṛhyasutra of Paraskara by Sri Ramakrisna. Sanskrit Text, edited by Pt. Dhundhiraja Sastri and Pt. Sri M. Sastri. (Chowkhamba sanskrit series No. 462).—Benares.

দর্শন

৪। শ্রীগদাধর ভট্টাচার্যের সামান্য নিরুক্তি (ন্যায়)---সংস্কৃত মূল। —Edited with Ganga commentary and notes by Pt. Sri Siva Datta Misra—Benares.

প্রত্নতত্ত্ব

৫। Catalogue of coins in the Indian Museum, Calcutta,—Vol II, Supplement,—Govt. of India Publication.

৬। Indian Images, II, Jaina Iconography—Prof. B.C. Bhattacarya.

সাহিত্য

৭। Mahatma Gandhi—Essays and Reflections on his life and work. Edited by Prof. Sir S. Radhakrishnan.

৮। আর্যভদন্ত অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ কাব্য---মূল সংস্কৃত।—Edited by M. M Haraprasad Shastri. Re-issue with additions by Prof Chintaharan Chakravarti.

৯। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। কলিকাতা।

ইতিহাস ও ভূগোল

১০। Indian Historical Records Commission—Proceedings of Meetings—Vol. XV.—Govt. of India Publication

১১। Development of Hindu Polity and Political Theories. Two parts in one Volume.—Narayan Chandra Bondyopadhyaya, Calcutta.

১২। Calcutta Geographical Society—Bulletin No. 1.—Poland and its frontier.—Prof. S. P. Chatterjee Msc. Phd. etc.

আয়ুর্বেদ

১৩। ভাবপ্রকাশ :—শ্রীভাবমিশ্র। মূল সংস্কৃত।—Benares.

জ্যোতিষ

১৪। তিথিচিন্তামণি---শ্রীগণেশ দৈবজ্ঞ মূল সংস্কৃত।—Benares.

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কর্তৃক সংকলিত

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)

১১শ বর্ষ ১৩১৮ সাল

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ পৌষ, মাঘ, চৈত্র } মানবের জন্ম কথা—শ্রীশশধর রায়। Darwin প্রণীত Descent of Man গ্রন্থের অনুবাদ।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ } মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু—প্রবন্ধ লেখক অতি নিখুঁতভাবে কবিকঙ্কন চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ।

ফাল্গুন, চৈত্র— হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধ লেখক দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' এই উক্তিটী বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গুহা=অন্তঃপ্রকৃতি।

আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ পৌষ, ফাগুণ } ফিডো—৺কৃষ্ণবিহারী সেন—Socrates কথিত Phaedo নামক গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ

অগ্রহায়ণ— চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে। প্রবন্ধ লেখক অতি বিস্তৃতভাবে চার্বাক দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটী মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ অবলম্বনে লিখিত।

বর্তমান বর্ষে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সমালোচনা আছে। সমালোচনাগুলি উৎকৃষ্ট।

Indian Antiquary Vol. II. 1783

Progress of Oriental Research in 1870-71. [From the Annual Report of the Royal Asiatic Society. June 1872.] এই প্রবন্ধে ইংরেজী ১৮৭০ ৭১ সালে প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

On Indian Dates—Jas. Fergusson.

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের জ্ঞান অনেকাংশে নির্ভর করে পর্বতগাত্রে, প্রস্তরে কিংবা তাম্রপাত্রে খোদিত যে সমস্ত লিপি আছে, তাহাদের পাঠোদ্ধারের উপর। এই সমস্ত লিপির তাৎপর্য উদ্ধার করাই যে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তাহা নহে পরন্তু এই শিলালিপির বা তাম্রলিপির সঠিক তারিখ নির্ণয় করা আরও অধিক প্রয়োজনীয়। শিলালিপিতে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ইহার তারিখের সামঞ্জস্য বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার কলিযুগ ও মহাভারতের যুগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

সাময়িক সাহিত্য, আশ্বিন - ১৩৪৬

সাহিত্য

প্রবাসী—মহাজাতি-সদন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিচিত্রা—দশরথ জাতক—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন।

„ বাঙলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগ—ডক্টর শ্রীমনোমনোহন ঘোষ এম-এ., পি-এইচ ডি.।

ভারতবর্ষ -শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য--মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

প্রবর্তক—বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম (অপ্রকাশিত রচনা) ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ মার্ক্সীয় ডায়লেক্‌টিস্—শ্রীতারাকিশোর বর্ধন।

পরিচয়—বঙ্গসাহিত্যের মনঃসমীক্ষণ—শ্রীসরসী লাল সরকার।

„ বিজ্ঞানের ব্যর্থতা মোক্ষণ (ক) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উদ্বোধন—বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে শাক্তকবি—

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি।

„ শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

„ বাঙলা অভিধানের উপাদান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম-এ, তত্ত্বরত্নাকর।

ধর্ম ও দর্শন

প্রবাসী—যোগ-জ্ঞানে ও অনুষ্ঠানে—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ।

প্রবর্তক—ভারতের বৈশিষ্ট্য বেদে—(সম্পাদকীয়)।

উদ্বোধন—শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ।

„ পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়---স্বামী সুন্দরানন্দ।

„ শ্রীমদ্ ভাগবত ও অদ্বয়জ্ঞানবাদ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

„ সর্বোল্লাস তন্ত্র---শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী, পি-এইচ-ডি, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ।

„ বাংলায় তন্ত্রচর্চ্চা---অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম-এ।

„ অপ্পয়দীক্ষিতের মুক্তিবাদ--অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী এম্-এ, পি-আর-এস্।

„ মহাভারতে সাঙ্খ্যমত---অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ রায় এম্-এ., বি-এল্।

ইতিহাস

বঙ্গশ্রী---বাঙ্গালীর লঙ্কাবিজয়---শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়।

উদ্বোধন---সীতারাম ও চাঁদশাহ—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি-আর-এস্।

শিল্প ও ভাস্কর্য

ভারতবর্ষ—বঙ্গ ভাস্কর্যে সূর্যমূর্তি---শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সান্যাল।

উদ্বোধন---অবনীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রোত্তর বাংলার শিল্প---শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।

সাময়িক সংবাদ

ভারতীয় ঐতিহাসিক কংগ্রেস—আগামী ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ভারতীয় ঐতিহাসিক কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রদর্শনী এই অধিবেশনের বিশেষত্ব হইবে।

ডক্টর লাহার বদান্যতা—সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, ডক্টর শ্রীবিমলা চরণ লাহা কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়েল ইন্‌স্টিটিউটে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থাকল্পে বাংলার গবর্ণমেণ্টের হস্তে শতকরা ৩॥৹ টাকা সুদের ৪৫০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ সমর্পণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা একটী ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠিত হইয়াছে। উক্ত ফাণ্ডের আয় হইতে প্রতি বৎসর দাতার মনোনীত দুইজন দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইবে।

ভারতে ডাঃ মণ্টেসরী—ডাঃ ম্যারিয়া মণ্টেসরী শিশু-শিক্ষা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতির সংস্থাপিকা। তিনি অনেক দিন ধরিয়া ভারতে আসিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। তিনি ৩০শে অক্টোবর ভারতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

এবৎসরের নোবেল পুরস্কার লাভ—ফিনল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ফ্রাঞ্জ এমিলি সিলিনপা সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কৃষকদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে উপন্যাস লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। রসায়নে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুটেনাণ্ডট্ এবং জুরিখের অধ্যাপক রুজিকা।

পাটনায় সংস্কৃত পরিষদের সমাবর্ত্তন উৎসব—স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উক্ত পরিষদের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতে নিম্ন লিখিত অংশটী উদ্ধৃত হইল—"বর্ত্তমান যুগে প্রায় সকলেই বাহ্যিক মিলন বিশেষ কেহ চাহে না। এখন অধ্যাত্মিকতার অবসাদের দিন, ইহাকে যে আবার নবভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে এবং তাহার যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে এবিষয়ে বর্ত্তমান জগৎ অত্যন্ত সন্দিহান। কিন্তু এই আত্মিক মিলন, সার্বজনীন মানবতার এই পূজাই ছিল ভারতের বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার উপরই তাহার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য নির্ভর করিয়াছিল। ইহাই যে তখনকার গণতন্ত্রবাদের সার মর্ম ছিল তাহার নিদর্শন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়।"

শোক সংবাদ

পরলোকে ডাক্তার সত্যানন্দ রায়—কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী শিক্ষাসচিব ডক্টর সত্যানন্দ রায় গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময় সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের তিনি অন্যতম উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালা দেশ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সেবক হারাইয়াছে। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ | চতুর্থ সংখ্যা

বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল কি না

স্বামী ভূমানন্দ, কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা।

১। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ একটু লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলে, মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—"বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল কি না"। এই বিষয়ে সন্দেহ হইবার কারণ এই যে, ঐ সমস্ত পৌরাণিক পুস্তকাদিতে বৃন্দাবন ও তন্নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানের বর্ণনায় এবং ঐ সমস্ত প্রদেশের ঘটনাবলীর বর্ণনায়ও সমুদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে যখন হিমালয় পর্বতও এক সময় সাগর-গর্ভে নিহিত ছিল, তখন পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে সাগর থাকা অসম্ভব নয়। বর্তমান ভারতবর্ষের অবশ্য এখনও তিন দিকে সমুদ্র রহিয়াছে ও এক দিকে হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে এক্ষণে সমুদ্র নাই। কিন্তু রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যায়, হিমালয়ের উত্তরে এক কালে সমুদ্র ছিল। সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত যখন চতুর্দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন উত্তর দিকে যাহাদিগকে পাঠান হয়, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—"তোমরা হিমালয়ের গন্ধমাদনাদি পর্বত সমূহ অতিক্রম করিয়া, ক্রমে মন্দর পর্বতে উপস্থিত হইবে ও মুনিগণ-পরিবৃত পর্বত শ্রেষ্ঠ সেই মন্দরগিরি অতিক্রম করিয়া রত্নপূর্ণ উত্তর সমুদ্রের তীরে বিশ্রাম করিবে—

> "তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং মন্দরং মুনিসংবৃতম্
> উত্তরং রত্নসংপূর্ণং সমুদ্রং গন্তুমর্হথ ॥
> তং কাল মেঘপ্রতিমং মহানাদং ভয়াবহম্
> উত্তরং তীরমাসাদ্য বিশ্রাময়িতুমর্হথ ॥

ইহা হইতে সুস্পষ্টই প্রমাণীকৃত হয়, সে সময় হিমালয়ের উত্তরেও সমুদ্র ছিল। ভারতবর্ষ

জম্বুদ্বীপেরই একটি বর্ষ। কাজেই পৌরাণিক যুগে ইহার ভিতরেও স্থানে স্থানে সমুদ্র থাকা অসম্ভব নয়। কারণ সমুদ্র হইতে যখন কোনও দ্বীপ জাগিতে থাকে, তখন কখনও উহা বিভিন্ন খণ্ডাকারে, কখনও বা এক খণ্ডেই জাগিয়া উঠে। বতমান কালের দ্বীপগুলির আকারও বহু পূর্বে এরকম ছিল না, বহু পরিবর্তনের পর তাহাদিগের বর্তমান আকার হইয়াছে; আবার হয়ত সুদূর ভবিষ্যতেও অন্য আকার ধারণ করিবে। অনেক স্থলে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ কালে একত্র মিলিত হওয়ায়, এক অখণ্ড দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে, কোথাও বা প্রথমে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হইয়া, পরে উহা বৃহদাকারে পরিণত হইয়াছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীগুলির চরের দিকে লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে চরগুলি খণ্ডাকারে উঠে, পরে পলি পড়িতে পড়িতে, সবগুলি মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ চর হইয়া পড়ে ও তাহাতে বড় বড় গ্রামের পত্তনও হয়। কখনও বা একটি ক্ষুদ্র চর জাগিয়া উঠে ও ক্রমে পলি পড়িয়া উহাই কালে বৃহৎ চর হইয়া পড়ে। বর্তমান ভারতবর্ষও অবশ্য এই ভাবেই কালে এক অখণ্ড ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবতে যে বৃন্দাবনের বর্ণনা আছে, তাহার নিকটে সে কালে সমুদ্র থাকা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান বৃন্দাবন সনাতন গোস্বামী কর্তৃক অনুমান ৪০০ বৎসর হইল প্রকটীকৃত হইয়াছে, এবং ইহার নিকট এক্ষণে সমুদ্র নাই। অবশ্য এই বৃন্দাবনই পৌরাণিক বৃন্দাবন কি না, তাহা বিচার করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যাহাই হউক, প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সমুদ্র বৃন্দাবন হইতে সে যুগে অধিক দূরে ছিল না।

২। মথুরায় কংশের কারাগারে যে সময় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, সেই সময়ে প্রকৃতির যে সমস্ত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই—

"মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্
নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে॥" (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।৩।৭-৮)

অর্থাৎ ঘন তিমিরাবৃত নিশীথ কালে ভগবান জন্মগ্রহণ করিলেন; তৎকালে সাগরের সঙ্গে সঙ্গে জলধর মন্দ মন্দ গর্জন করিতে লাগিল। এখন, এই "সাগর" শব্দ লইয়া টীকাকারগণ মহা গোলে পড়িয়াছেন; কারণ বর্তমানে আমরা যাহাকে বৃন্দাবন বলি, তাহার নিকটে কোনও দিকেই সমুদ্র নাই। শ্রীধরস্বামী এ সম্বন্ধে নিঃশব্দ বলিলেই হয়। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন—"অনুসাগরম্—সাগরে গর্জতি সতি।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন—"অনুসাগরম্ সমুদ্রে। যদ্বা, সাগরং গর্জন্তমনু।" "সমুদ্রে" শব্দটি তিনি কি ভাবে ও কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, পরিষ্কার বোঝা যায় না; পরাংশের অর্থ—প্রথমে সাগর গর্জন করিল, পরে মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন করিল। অন্যান্য টীকাকারদিগের মধ্যে অনেকেই নিঃশব্দে এই দুই টীকাকারের অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। বীর রাঘবাচার্য গোলমাল দেখিয়া বলিলেন, শব্দটা বোধ হয় "সাগরম্" নয়, "সাদরম্" হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আবার "অনু" উপসর্গকে খাপখাওয়ান যায় না। বিজয়ধ্বজ তীর্থ বলিলেন "অনুসাগরম্ সমুদ্রস্যোপান্তে," অর্থাৎ সমুদ্রের নিকট মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। জীব গোস্বামী

বিশেষ কিছু বলিলেন না, কেবলমাত্র বলিলেন—"অনুসাগরম্ সাগরেণ সহ;" অর্থাৎ সাগরের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। বল্লভাচার্য বলিলেন—"সাগর-নিকটে," অর্থাৎ সাগরের নিকটে মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—"অনুকৃতঃ সদৃশীকৃতঃ সাগরঃ সাগর-গর্জনং তদ্ যথা স্যাত্তথা"; অর্থাৎ সাগর-গর্জনের অনুকরণ করিয়া, মেঘ গর্জন করিতে লাগিল। বলদেব বিদ্যাভূষণও ঐরকম একটা ব্যাখ্যা করিয়া ধামা-চাপা দিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী শুকদেব, তাঁহার টীকায়, সাগর সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই করিলেন না। টীকাকারগণ যিনি যাহাই বলুন না কেন, ভাগবতের শ্লোক হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, মথুরা ও বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল ও সমুদ্রের গর্জন সেখান হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত। বিষ্ণু পুরাণেও দেখি—

"সিন্ধবো নিজশব্দেন বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্" (বিঃ পুঃ ৫ম অঃ।৩।৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে সমুদ্রও নিজশব্দে মনোহর বাদ্য করিতে লাগিল।

৩। কালিয় নাগ সমুদ্র-মধ্যবর্তী রমনক দ্বীপে বাস করিত। কালে অহঙ্কারবশে গরুড়কে উপেক্ষা করায়, তৎকর্তৃক অভিমর্দিত হইয়া কালিয় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে ও স্বকীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদে থাকিবার জন্য বৃন্দাবনের নিকটবর্তী একটি হ্রদে প্রবেশ করে; কারণ কালিয় জানিত যে, ঐ হ্রদ সৌভরি মুনির শাপ প্রভাবে গরুড়ের অগম্য—

"সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীববিহ্বলঃ
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্॥ (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৭।৮)

কেহ কেহ এই হ্রদকে কালিয়-হ্রদ, কেহ বা কালিন্দী হ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাহারও মতে ঐ হ্রদ যমুনারই বিযুক্ত অংশ, কেহ বলেন উহা যমুনারই অন্তর্গত। যাহাই হউক, মহাবলশালী গরুড়ের সহিত যুদ্ধে দুর্বল হইয়া পড়িয়া, কালিয় নাগের পক্ষে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দূর গমন সম্ভবই নয়। কাজেই মনে হয়, সমুদ্র হইতে পলায়ন করিয়া কালিয় নিকটবর্তী হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিল। এখানে "হ্রদ" শব্দটিও লক্ষ্যের বিষয়। সমুদ্র সরিয়া দূরে গেলে, তাহার পরিত্যক্ত, অনরুদ্ধ জলরাশিই সাধারণতঃ হ্রদে পরিণত হয়। যাঁহারা চিল্কা হ্রদ দেখিয়াছেন ও তাহার লবণাক্ত জল আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যেই স্বীকার করিবেন যে, চিল্কা এক সময় সমুদ্রই ছিল, এক্ষণে সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়ায় উহা হ্রদে পরিণত হইয়াছে। কালিয় যে হ্রদে প্রবেশ করে, মনে হয় তাহাও পূর্বে সমুদ্রই ছিল; পরে সমুদ্র দূরে চলিয়া যাওয়ায় উহার জল আবদ্ধ হইয়া হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। কাজেই স্বীকার করিতে হয় কালিয় হ্রদও এই-ভাবেই হ্রদে পরিণত হইয়াছিল এবং তখন সমুদ্র বৃন্দাবন হইতে বহু দূরে ছিল না।

৪। অপরপক্ষে দেখি, কালিয়-হ্রদের তীব্র বিষাক্ত জল পান করিয়া তৃষ্ণার্ত গাভী সকল ও গোপগণ, জীবন-শূন্য হইয়া জলের নিকটে পতিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন ও কালিয় নাগকে দমন করিবার জন্য তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকোপরি তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন। ভগবানের পদাঘাতে নাগের যাবতীয় ফণা বিধ্বস্ত

ও বিশীর্ণ হইয়া পড়ে ও কালিয় ভগ্নগাত্র ও মৃতকল্প হইয়া মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে থাকে—

"তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাতপত্রো।
রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ" ॥ (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৩০)

তদ্দর্শনে নাগপত্নীগণ ভীত হইয়া ভগবানের স্তুতি করে ও তাঁহার নিকট মুমুর্ষু স্বামীর জীবন প্রার্থনা করে—

"অনুগৃহীষ ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥" (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৫২)

নাগপত্নী কর্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান ভগ্নমূর্দ্ধ মূর্চ্ছিত নাগকে পরিত্যাগ করেন। কালিয়ও ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতি কষ্টে ভগবানের স্তব করে। ভগবান তাহাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া কালিয়কে হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সমুদ্রে যাইতে আদেশ দেন—

"ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্ ॥" (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৬০)

কিন্তু পাছে, গরুড় পুনরায় তাহার উপর অত্যাচার করে, সেই জন্য তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার মস্তকোপরি আমার যে পদচিহ্ন বর্তমান থাকিল, তাহা দেখিলেই গরুড় আর তোমার উপর আক্রোশ করিবে না"—

"দ্বীপং রমনকং হিত্বা হ্রদমেতৎ উপাশ্রিতঃ
যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্থাং নাদ্যান্মৎপদলাঞ্ছিতম্ ॥" (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৬৩)

কালিয়ও ভগবানের আদেশক্রমে, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, নির্ভয়ে সপরিবারে সমুদ্র মধ্যস্থ রমনক দ্বীপে চলিয়া গেল—

"ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্
সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ ॥" (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৬৬-৬৭)

ইহা হইতেও পরিষ্কারই অনুমান করা যায় যে, বৃন্দাবনের কালিয়-হ্রদ হইতে সমুদ্র বহুদূরে ছিল না। ভগ্নমুণ্ড, ভগ্নগাত্র কালিয়ের পক্ষে দূরগমন অসম্ভব।

৫। প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও, এখানে একটি বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভাগবতে কালিয় হ্রদের বর্ণনায় দেখিতে পাই, ঐ হ্রদস্থ জল বিষাগ্নিদ্বারা এমন উত্তপ্ত ছিল যে, তাহা সর্বদাই ফুটিত ও হ্রদের উপর দিয়া পক্ষিসকল উড়িয়া যাইবার সময়ও বিষ-প্রভাবে জীবন শূন্য হইয়া তাহাতে পতিত হইত। ঐ হ্রদের তীরস্থ তৃণ বৃক্ষাদি ও পশুগণও বিষাক্ত জলস্পর্শী বায়ুর সংস্পর্শে প্রাণত্যাগ করিত। হরিবংশের বর্ণনায়ও দেখি সর্পসম্ভূত বহ্নি হইতে ধূম উদ্গত হইত বলিয়া তাহার চতুর্দিকে ধূমময় ছিল ইত্যাদি

"কালীন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্হ্রদঃ কশ্চিদ্বিষাগ্নিনা
শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ ॥ (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৪)

বিপ্রুষ্মতা বিষোদোর্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ
ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ॥ (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।১৬।৫)

আশ্চর্যের বিষয়, সার ওয়ালটার স্কটের (Sir Walter Scott) ট্যালিসম্যান (The Talisman) নামক পুস্তকে মরুসাগরের (Dead Sea) বর্ণনা ঠিক এই কলিয়হ্রদের বর্ণনার অনুরূপ—

"The whole land around, as in the days of Moses, was "brimstone and salt ; it is not sown, nor beareth, nor any grass groweth thereon" ; the land as well as the lake might be termed dead, as producing nothing having resemblance to vegetation and even the very air was entirely devoid of its winged inhabitants, deterred probably by the odour of bitumen and sulphur, which the burning s[illegible]exhaled from the waters of the lake, in steaming clouds, frequently assuming the appearance of water spouts."

৬। বর্ষাকালে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা বর্ণনা করিতে, ভাগবত বলিতেছেন—
"সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষুভে শ্বসনোর্মিমান্" (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।২০।১৪)

অর্থাৎ সমুদ্র, নদী সকলের সহিত সঙ্গত ও বায়ুবেগে তরঙ্গায়িত হইয়া, ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। এই "সিন্ধু" শব্দের ব্যাখ্যাও অনেকে অনেক রকম করিয়াছেন, কেহ বা নিঃশব্দ। কেহ বলিলেন ওটা সিন্ধু নদী। কেহ বলিলেন সিন্ধুর উল্লেখ, সাধারণ বর্ষা বর্ণনার জন্য; বৃন্দাবনের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই সমস্ত ব্যাখ্যা পড়িলে হাসিও পায়। বৃন্দাবনের সহিত সিন্ধুর কোনও সম্বন্ধ না থাকিলে, বৃন্দাবনের শোভা বর্ণনায় সিন্ধুর বর্ণনা কেন ? কাজেই মনে হয়, বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিলই।

৭। শ্রীবৃন্দাবনের শরৎকাল বর্ণনায় ভাগবতে দেখি—

"নিশ্চলাম্বুরভূৎতুষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে" (শ্রীমঃ ভাঃ ১০।২০।৪০)

অর্থাৎ শরৎকাল সমাগমে জল নিশ্চল হওয়ায় সমুদ্র তুষ্ণিম্ভাব ধারণ করিল। এখানে দেখি "সমুদ্র" শব্দ সম্বন্ধে টীকাকারগণও তুষ্ণিম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কেবল মাত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে, মথুরার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত জলাশয় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই ভাগবতে "সমুদ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত জানিনা।

৮। ভাগবতে আরও দেখিতে পাই, মাতা দেবহূতিকে সাংখ্য যোগের উপদেশ দিয়া কপিল পিতার আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর পূর্ব দিকে গমন করেন এবং সমুদ্র তাঁহার স্তুতি ও পূজা করেন—

"স্তূয়মানঃ সমুদ্রেন দত্তার্হণ-নিকেতন।"

কপিলের পিতা কর্দ্দমের আশ্রম ছিল সরস্বতী নদীর তীরে। সেখান হইতে তিনি

উত্তর-পূর্বে অর্থাৎ হিমালয়ের দিকে গমন করেন ও সমুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কাজেই দেখা যায় হিমালয়ের নিকটবর্তী স্থানে তখনও সমুদ্র ছিল।

৯। মহাভারতেও দেখিতে পাই, খাণ্ডব-দাহন কালে নানাবিধ প্রাণী ও হস্তী, মৃগ, তরক্ষু প্রভৃতি পশুদিগের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া সমুদ্র-মধ্যস্থ মীনগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল

ভূতসঙ্ঘাশ্চ বহবঃ দীনাশক্রুর্মহাস্বনম্
রুরুদুর্বারণাশ্চৈব তথা মৃগতরক্ষবঃ
তেন শব্দেন বিত্রেসুর্গঙ্গোদধিচরা ঝশাঃ ॥

খাণ্ডব বন ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী) হইতে অধিক দূরে নয়। বৃন্দাবনও ত ঐ অঞ্চলেই। কাজেই খাণ্ডব বনের প্রাণিদিগের চীৎকারে যখন সমুদ্রের মৎস্যগণ ভীত হইয়াছিল, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমুদ্র সেকালে ঐ প্রদেশ হইতে অধিক দূরে ছিল না।

১০। মহাভারতের বনপর্বে দেখিতে পাই, তীর্থস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মদেবকে বলিয়াছেন—

'ততো গত্বা সরস্বত্যা সাগরস্য চ সঙ্গমম্''

অর্থাৎ প্রভাস তীর্থ হইতে, সরস্বতী যেখানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই তীর্থে যাইবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে স্নান করিয়া, ক্রমে গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে যাইবে; পরে অরুন্ধুতিবট তীর্থে গমন করিয়া সমুদ্রজলে আচমন করতঃ ব্রহ্মচারী হইয়া সমাহিতভাবে অবস্থান করিবে—

'অরুন্ধুতিবটং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপঃ
সামুদ্রকমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥

তীর্থগুলির ক্রম-বর্ণনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়, সমুদ্র তখন প্রয়াগ ও প্রভাস হইতে বহু দূরে ছিল না।

১১। দাক্ষিণাত্যের পরম বৈষ্ণব প্রাচীন আলওয়ারদিগের যে সমস্ত প্রেম-সঙ্গীত এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা হইতেও দেখা যায় বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল। এই প্রেমিক বৈষ্ণব আলওয়ারগণ খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে দ্রাবিড় দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কতকগুলি পদ, বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে, সখিগণ বিরহিনী বালিকা শ্রীমতী রাধিকার অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন—

দুঃখ দিল তারে বিরহী-বিহগ
কাতর করুণ তান,
পুষ্পিত-তট-প্লাবক-সফেন
সায়রের গুরু গান ॥

অপর একটি পদে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে, বিরহিনী রাধিকা, পথস্থিত রথচক্রের চিহ্নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন ও পাছে উদ্বেল সমুদ্র তাহার তরঙ্গমালা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথচক্রের সেই শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলে, তাই কাতর ভাবে সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

গোধূলি লগন, করোনা তোমার
তরঙ্গমালা দিয়া,
মুছিওনা তার রথের চিহ্ন,
যে গেল আঁধারিয়া ॥

সখিগণ ত উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

যত বলা যায়,　　এ সে অতি হায়
অল্পবয়সী বালা
কালো এ সাগর　　গর্জে সে শুধু
যেন দয়াহীন কালা !

উদ্ধৃত শ্লোক ও পদগুলি একত্রে অলোচনা করিলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল। আমার এই ধারণার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কাহারও কোনও শাস্ত্রীয় প্রমান, প্রাচীন দোঁহা, বাণী, শ্লোক বা পদ জানা থাকিলে, তিনি যদি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত ও অনুগৃহীত হইব ; কারণ এই বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান করার ইচ্ছা আমার আছে।

ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[আলোচনা]

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন আমি আর্যভট্টের কালক্রিয়াপাদের ১০ম শ্লোকের পাঠ পরিবর্তিত করিয়া আর্যভটের কাল ১৬৪ খ্রী° পূ° স্থির করিয়াছি। এরূপ করিবার কারণ আমি প্রবন্ধে লিখিয়াছি। এখানে আর একটু বিশদভাবে লিখিতেছি। কালক্রিয়ার ৯ম শ্লোকে জৈনমতের যুগবিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে। এই জৈনমতে অবসর্পিনী যুগার্ধের ছয়টি যুগপাদের চারিটী মহাবীর নির্বাণের (৫২৮ খ্রী° পূ°) চারিবৎসর পর অর্থাৎ ৫২৪ খ্রী° পূ°তে শেষ হয়। সুতরাং কালক্রিয়াপাদের ১০ম শ্লোকের 'ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ' প্রকৃত পাঠ হইতেই পারে না, 'চত্বারোযুগপাদাঃ' পাঠ হইবে। অপর, ৫২৪ খ্রী° পূ°র ৩৬০০ বৎসর (ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ) পর ৩০৭৭ খ্রীস্টাব্দ আর্যভটের কাল কস্মিন্‌কালেও হইতে পারে না। সুতরাং 'ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্ঠৌ' (অর্থাৎ ৩৬০ বৎসর পর অর্থাৎ ৫২৪—৩৬০, বা ১৬৪ খ্রী° পূ°) পাঠই সঙ্গত; ইহা পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এক্ষণে আর্যাষ্টশত (১০৮ আর্যা শ্লোক সমন্বিত) বা আর্যভটীয় তন্ত্রের ৯ম ও ১০ম শ্লোকের অর্থের সহিত 'দশগীতিকা' সূত্রের তৃতীয় শ্লোকের অর্থের কোনক্রমেই সঙ্গতি করা যায় না। কারণ এই শ্লোকে ভারত যুদ্ধকালে (৩১০২ খ্রী° পূ°তে) তিন যুগ গত হইয়াছে অর্থাৎ বর্তমানে সমস্ত হিন্দু জ্যোতিষী প্রভৃতির মতানুযায়ী চতুর্থ কলিযুগ এখনও চলিতেছে, এরূপ লিখিত আছে। এই দুই উক্তি একই লোকের হইতে পারে না। সুতরাং 'আর্যাষ্টশত' ও দশগীতিকা' পৃথক পুস্তক দুইখানি দুই ব্যক্তির লেখা। আমার মনে হয়, 'দশগীতিকা' গ্রন্থখানি দ্বিতীয় আর্যভটের লেখা। 'আর্যাষ্টশত' বৃদ্ধার্যভটের লেখা, যাঁহার সময় (৫২৪—৩৬০, বা ১৬৪ খ্রী° পূ°)। পরে দ্বিতীয় আর্যভট এই আর্যাষ্টশতে কোনও কোনও শ্লোকের কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। আল্‌বেরুণী ১০৩২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আসিয়া এই কুসুমপুর নিবাসী দ্বিতীয় আর্যভটের একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন ইহা যে আর্যাষ্টশত (আর্যভটস্ত্বিহ-নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানং।'—গণিতপাদ, ১ম শ্লোক) তাহা তাঁহার আলোচনা হইতে বুঝা যায়।

অবান্তরভাবে প্রবোধ বাবু আল্‌বেরুণীর প্রমাণে 'গুপ্তবলভী' অব্দের আরম্ভ ২৪১ শককাল ইহা লিখিয়া, গুপ্ত বিক্রমাদিত্যরাজগণের অব্দই যে বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য অব্দ (৫৮ খ্রী° পূ°) ও ৫৮ খ্রী° পূ° যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের কাল আমার এই মত যে অসত্য সে বিষয়ে পাঠকগণকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এ বিষয়ে সংক্ষেপে দুই এক কথা মাত্র এখানে বলিব। আল্‌বেরুণীর উক্তি গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল সম্বন্ধে যদি এতই নিঃসন্দিগ্ধ হইত, তাহা হইলে টমাস্, কানিংহাম প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত অনেক মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া উহা নির্ণয়ের জন্য সচেষ্ট হইতেন না, ও 'A Great step in advance was gained by Dr. Fleet's determination of the Gupta era which had been the subject of much wild conjecture. His demonstration that the year 1 of that era is A. D. 319-20 fixed the chronological position of a most important dynasty and reduced chaos to order ... ... Most of the difficulties which continued to embarass the chronology of the Gupta period, even after the announcement of Dr. Fleet's discovery in 1887 ... ... ' এরূপ মত ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ করিতেন না। বস্তুতঃ 'গুপ্তাব্দ' যে 'বলভী অব্দ' ইহা ডাঃ ফ্লীটেরই মত ও তাঁহার অনুসরণকারীগণই গুপ্তাব্দকে 'গুপ্তবলভী' অব্দ আখ্যা দিয়া থাকেন। আল্‌বেরুণী এরূপ কিছুই বলেন নাই। Alberuni's India গ্রন্থে Sachauএর অনুবাদে এরূপ আছে :—

'For this reason people ... ... have adopted instead the eras of—

(1) Sri Harsha (2) Vikramaditya (3) Saka (4) Valabha, and (5) Gupta,

The era of Valabha is called so from Valabha, the ruler of the town of Valabhi ... ... The epoch of this era falls 241 years later than the epoch of the Saka era.

'As regards the Gupta kala, people say that they were wicked powerful people, and when they ceased to exist, this date was used as the epoch of an era. It seems that Valabha was the last of them ... উপরোক্ত অনুবাদ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আল্‌বেরুণী গুপ্ত ও বলভী অব্দ পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাও লিখিয়াছেন যে গুপ্ত রাজত্বের শেষ সময়ে রাজত্বকারী বলভী রাজা হইতে বলভী অব্দের আরম্ভ। এমতাবস্থায় গুপ্তাব্দ ও বলভী অব্দ এক হইতে পারে না। আল্‌বেরুণী পরে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অর্থ এই হইবে যে গুপ্তরাজগণের ব্যবহৃত অব্দ ও বলভীরাজগণের ব্যবহৃত অব্দ একই (গুপ্তাব্দ ও বলভী অব্দ এক, ইহা নহে)। কারণ ঐতিহাসিকগণ জানেন বলভীরাজগণ গুপ্তাব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। বলভী অব্দের ব্যবহার যে কয়স্থানে ভারতীয় লিপিতে পাওয়া যায় তথায় স্পষ্ট 'বলভী অব্দ' এভাবে লিখিত আছে। অপর ৫৮ খ্রী: পূ: অব্দের বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের নাম মহাদেব লিখিত 'Srudhava' (?) গ্রন্থে 'চন্দ্র বীজ' এরূপ আল্‌বেরুণী দেখিয়াছিলেন 'In the book Srudhava by Mahadeva I find as his name

Candrabiya ইহা চন্দ্রবীজ (=বিক্রম) অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, ইহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং গুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজগণের অব্দই যে বিখ্যাত বিক্রমাব্দ এ অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

সর্বভারতীয় কিম্বদন্তী অনুসারে অনুমান ৩১০০খ্রীঃ পূ:তে কলিযুগের আরম্ভকাল ও এই কলিযুগের আরম্ভে (বা দ্বাপরান্তে) কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বৃদ্ধগর্গের মতানুযায়ী বৃহৎ সংহিতায় যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল ও শককালের অন্তর সম্বন্ধে যে উক্তি আছে সেখানে 'শককাল' বলিতে শাক্যকালই বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে আমার নিজমত ব্যতীত বহু পণ্ডিতের মতই পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। কল্যারম্ভ সম্বন্ধে ভারতে দ্বিতীয় মত কুত্রাপি নাই। শককাল শব্দের অর্থ বর্তমানে প্রচলিত শককাল গ্রহণ করিলে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকাল কল্যারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পর স্বীকার করিতে হয়। অথচ 'অন্তরে চৈব সংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ। স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥' 'এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাৎ যৎপ্রবর্ততে॥' 'প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।' ইত্যাদি মহাভারত মধ্যস্থ বচন হইতেই জানা যায় যে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ কল্যারম্ভেই হইয়াছিল। প্রবোধ বাবু ইহা স্বীকার করিয়াও ২৪৪৯ খ্রী° পূ°র সমীপে অর্থাৎ এক কলিযুগ আরম্ভের প্রায় ৬৫০ বৎসর অপর এক কলির আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকাল ২৪৪৯ খ্রী° পূ° ঠিক রাখিতে গিয়া ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। এই সময়ে কলির আরম্ভের স্বপক্ষে তিনি ভাগবতামৃত নামক শ্রীমদ্‌ভাগবতের কোনও এক টীকা হইতে একটি শ্লোক দেখাইয়া বলিতেছেন 'কলির ২০০০ বৎসর গত হইলে চিকুরবিহীন বুদ্ধদেব ব্যক্ত হন। শেষ বুদ্ধদেব অনুমান ৫০০ খ্রী° পূ°তে ছিলেন। ৩১০২ খ্রী° পূ°তে কল্যারম্ভ, ইহার প্রায় ২৫০০ বৎসর পর তাঁহার জন্ম। এমতাবস্থায় শেষ বুদ্ধের কাল কলির ২০০০ এর পর ও ৩০০০এর পূর্বে। শেষ বুদ্ধের পূর্বেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। অশোকের লিপিতেই কনকমুনি বুদ্ধের উল্লেখ আছে। তিনি গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ছিলেন। চীনদেশীয় প্রাচীন প্রবাদে খুব সম্ভবতঃ এই কনকমুনি বুদ্ধের নির্বাণ কালই ৮৫০ খ্রী° পূ° পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় এই বুদ্ধের কাল ৩১০০খ্রী° পূ°র ২২০০ বৎসর পর হয়। যাহা হউক, ঈদৃশ দুর্বল প্রমাণের সাহায্যে প্রবোধ বাবুর কল্পিত কল্যারম্ভ সমর্থনের চেষ্টা খুবই দুঃখের বিষয়। কল্‌হণ পণ্ডিতও কল্যব্দ ৩১০২ খ্রী° পূ° হইতে স্বীকার করিয়া ইহার ৬৫৩ বৎসর পর কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকাল লইয়াছেন 'শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষাণাম্ অভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥' কিন্তু ইহা যে সমস্ত পুরাণ ও মহাভারত মধ্যস্থ বচনের বিরোধী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের মধ্যে তাহা হইলে ৬৫০ বৎসরের অন্তর দাঁড়ায় তাহা তিনি ভাবেন নাই। প্রবোধ বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণটি আরও অদ্ভুত। বঙ্গ দেশীয় প্রাচীন পঞ্জিকায় লিখিত থাকে 'কলিকালে যুধিষ্ঠির পরীক্ষিত ... বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ৩৬৯৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারূঢ় হইবার পর সাহ সুলতান প্রভৃতির কাল।' এই পঞ্জিকা লিখিত শ্লোক ঠিক ধরিলেও ৩১০০ খ্রী° পূর্বের

৩৬৯৫ বৎসর পর অনুমান ৬০০খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহা মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের কাল। পঞ্জিকার লেখক হয়ত এই কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রবোধ বাবুর অনুমিত অর্থ স্বীকার করিলে সমস্ত হিন্দু জ্যোতিষিক প্রমাণের বিরুদ্ধে পঞ্জিকাকার একটী উক্তি করিয়াছেন বলিতে হয় ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই পঞ্জিকাকারের পক্ষে সূর্য সিদ্ধান্তাদি জ্যোতিষ গ্রন্থের বিরুদ্ধে কোনও উক্তি করা কি সম্ভব ছিল? বস্তুতঃ পঞ্জিকা-কারের উক্তি এই: 'কলৌ যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ঃ বিংশত্যধিকশত সংখ্যক হিন্দু বংশোদ্ভবা রাজানঃ ... পঞ্চনবত্যধিক ষট্‌ত্রিংশৎ শত বর্ষাণি ব্যাপ্য রাজ্যং কৃত্বা স্বরারূঢ়াঃ। ততঃ সাহ-সোলতান ময়নন্দ (মহম্মদ?) আদি একষষ্ঠিসংখ্যক যবনবংশোদ্ভবা রাজানঃ ... চতুশ্চত্বা-রিংশদধিক দ্বাদশ শত বর্ষাণি ব্যাপ্য রাজকর্ম কৃত্বাদিবং গতাঃ। তত্র সাহ আকবরসানি শাসন সময়ে ইংলণ্ড দেশীয় ম্লেচ্ছ কুলোদ্ভবা রাজানঃ আসন্, সম্প্রতি তেষামেবাধিকারঃ।' সুতরাং পঞ্জিকাকার বলিতেছেন কলির ৩৬৯৫ বৎসরের পর মুসলমানদের কাল ও তাঁহাদের ১২৪৪ বৎসর রাজত্বের পর ইংরেজদের রাজত্বকাল আরম্ভ। অর্থাৎ কল্যারম্ভের (৩৬৯৫+ ১২৪৪, বা) ৪৯৩৯ বৎসর পর অর্থাৎ (৪৯৪০-৩১০২ বা) ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইংরেজদের রাজত্বারম্ভ। এইকাল সিপাহীবিদ্রোহের অল্প পূর্বে। সুতরাং পঞ্জিকার উক্তি হইতে যুধিষ্ঠিরের কাল ৩১০২ খ্রী° পূ°ই সমর্থিত হয়। প্রবোধ বাবুর অনুমিত ২৪৪৯ খ্রী° পূ° মোটেই সমর্থিত হয় না। প্রবোধ বাবু পঞ্জিকাকারের উক্তির অংশমাত্র উদ্ধার করিয়া যেভাবে নিজ মতের সমর্থনের প্রমাণ পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়।

মহাভারতীয় কল্যাদি ও কলিযুগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রবোধ বাবু দেখিলেন যে কলিযুগারম্ভে মাঘী পূর্ণিমা ও উত্তরায়ণারম্ভের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল ও এই যুগাদি মাঘ ধনিষ্ঠাদিতে অমান্তে আরম্ভ হইবে। ২৪৪৯ খ্রী° পূ'র সমীপে পাঁচ বৎসর পূর্বে এরূপ সমাবেশ হইয়াছিল তিনি পাইলেন। কিন্তু এখানে তিনি গণনায় বড় একটী ভুল করিয়াছেন। ২৪৫৪ খ্রী° পূ° অব্দের ৭ই জানুয়ারীর সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির যে সংস্থান গণিয়াছেন তাহা ৯ই জানুয়ারীর হইবে। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম ইহা ছাপার ভুল, ৭ই স্থানে ৯ই হইবে। কিন্তু কিছু পরে দেখি তিনি লিখিতেছেন তাঁহার মনে হয় এই কলি-যুগ পরদিন ৮ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। এই ভাবের ভুল তিনি তাঁহার অপর প্রবন্ধেও (Some Astronomical references from the Mahabharata,' J. R. A. S. B Vol. III. 1937) করিয়াছেন। সেখানে তিনি ২৪৪৯ খ্রী° পূ'র ২১এ অক্টোবর (জুলিয়ান্ বা Old style তারিখ] কে ৩০এ সেপ্টেম্বর (গ্রেগোরিয়ান বা new style) তারিখে পরিবর্তিত করিয়াছেন। তিনি ২১ অক্টোবর তারিখের সূর্যের যে মধ্যাবস্থান গণনা করিয়াছেন উহা বর্তমানকালের (যেমন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের) ১লা অক্টোবরের সূর্যের মধ্যাবস্থান। সুতরাং ২৪৪৯ খ্রী° পূ'তেও ১লা অক্টোবর (গ্রেগোরিয়ান্) তারিখের অবস্থান ঐরূপ হইবে, ৩০এ সেপ্টম্বরের হইবে না। এভাবে ৪ঠা ও ২১এ নভেম্বর (জুলিয়ান তারিখ) যথাক্রমে

১৫ই অক্টোবর (গ্রেগোরিয়ান্) ও ১লা নভেম্বর (গ্রেগোরিয়ান্) হইবে—১৪ই অক্টোবর ও ৩১এ অক্টোবর হইবে না। অর্থাৎ ২৪৪৯ খ্রী° পূ°তে জুলিয়ান্ ও গ্রেগোরিয়ান্ তারিখের অন্তর ২০ দিন হইবে। এভাবে তিনি ভীষ্ম প্রয়াণের দিন গণিলেন ৯ই জানুয়ারী ২৪৪৮ খ্রী° পূ°। ঐ দিনের সূর্যের সংস্থান ঠিকই গণিলেন (২৭১° অংশ)। কিন্তু চন্দ্রের সংস্থানে বড় ভুল করিলেন। ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ ৯ই জানুয়ারী কুরুক্ষেত্র কাল ৫টা সন্ধ্যায় চন্দ্রের সায়ন স্ফুট—১৬৪°১ অর্থাৎ ঐদিন বৈকালে মাত্র কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি আরম্ভ হইয়াছিল। গত শ্রাবণের শ্রীভারতী'তে তিনি আবার লিখিলেন 'দক্ষিণায়ন শেষ হইয়াছিল ৯ই জানুয়ারী শনিবার ২৪৪৮ খৃ° পূ° অব্দে এবং ভীষ্মের দেহত্যাগ পরদিন হইয়াছিল।' কিন্তু তাঁহার নিজের গণনা হইতেই দেখিবেন দক্ষিণায়ন শেষ হইয়াছিল ৮ই জানুয়ারী। চন্দ্রের সংস্থান তিনি যাহা গণিয়াছেন তাহা ৯ই জানুয়ারীর না হইয়া ১০ই জানুয়ারীর হইবে। কিন্তু তাঁহার নিজ সংস্থান হইতেই দেখিবেন যে ১০ই জানুয়ারী বেলা ২টার সময় কৃষ্ণাষ্টমী তিথি মাত্র আরম্ভ হয়। যাহা হউক, প্রবোধবাবু দেখিবেন যে সর্বভারতীয় মতানুযায়ী কল্যারম্ভ ৩১০২ খ্রী° পূ° অব্দের পূর্ব বৎসরই ৩১০৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ১৫ই জানুয়ারী কুরুক্ষেত্র কাল ভোর ছয়টায় সায়ন সূর্য স্ফুট—২৭১°৩; সায়ন চন্দ্র স্ফুট—৮৯°৪। সুতরাং এই দিন উত্তরায়ণারম্ভ ও পূর্ণিমা ছিল। পূর্ণিমান্ত প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে সংঘটিত হয়। সুতরাং পূর্ববর্তী অমান্তে সূর্য, চন্দ্র ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছিল। এমতাবস্থায় প্রবোধ বাবু দেখিবেন যে ৩১০২ খ্রীঃ পূঃর পূর্ববৎসরই মহাভারতীয় কল্যাদি ও কলিযুগের সর্বাংশে সমর্থক, তাঁহার মত পাঁচ বৎসর পূর্বে ইহার সমর্থন পাইতে হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রব্যকাব্যে কালিদাস

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র, এম্. এ.

(২)

রঘুবংশ সম্ভবত: কালিদাসের পরিণত বয়সে রচিত সর্বশেষ শ্রব্যকাব্য। মেঘদূতের যক্ষ গুহকের আক্ষেপ—"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"—রাজচক্রবর্তীরাও এই সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই সাধারণ কথাটিই কলাকুশল কালিদাসের লেখনীতে নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সূর্যবংশীয় রাজগণ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া অবশেষে মানবতার কোন্ সোপানে উঠিয়াছেন, তাহাই এই মহাকাব্যে বর্ণনীয়।

কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা ও কাব্যপ্রতিভা—এই দুইয়েরই সংমিশ্রণের ফল রঘুবংশ। দৃশ্যকাব্যে' লোকচরিত্র অঙ্কনে নিপুন কবিকে তাঁহার শ্রব্যকাব্যেও অনেকটা পাই। রঘুবংশ পাঠে এই সত্যই মনে জাগিয়া উঠে যে, কবি কাব্যটীতে বিভিন্ন চরিত্র লইয়াই আলোচনা করিতে বসিয়াছেন,—কোনটী উত্তম, কোনটী অতি উত্তম, আবার কোনটী বা সূর্যবংশে অপাংক্তেয়। মনে রাখিতে হইবে, পুরাণলভ্য ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়াই অর্থাৎ ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই মহাকাব্যের বিকাশ। ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া কবির প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে। কোন রাজার উদ্দেশে কবি সর্গের পর সর্গ নিবেদন করিয়াছেন, কাহারও জন্য বা সংক্ষিপ্ত উপচার যোগাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সংসারের অন্ধকার দিকটাও কবি অকুণ্ঠচিত্তে প্রচার করিয়াছেন ভাবসম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে।

রঘুবংশ অবলম্বনে কবি বিচ্ছিন্ন কালের, বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সংযোগসেতু রচিয়াছেন। ইহা শুধু ঐতিহাসিকের সত্যানুসন্ধিৎসা নহে, নীতিবিদের শুষ্ক সমালোচনা নহে—ইহা কবির হৃদয়ের ধন। তাঁহার রাজগণ ব্যক্তিত্বের দাবী রাখেন না,—রাজদণ্ড ধারণের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহারা আজ হৃতরাজ্য হইয়াও সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক—মানব হইয়াও কোটীকল্প পরমায়ুর অধিকারী। তাঁহারা শুধু ভারতের নহেন, বিশ্বমানবতার সম্পদে গরীয়ান্। বিষয় গৌরবে রঘুবংশ চমৎকার। কিন্তু কেন যে রাজা অগ্নিবর্ণের সমুচিত মরণের সাথে সাথেই কবি কাব্যের যবনিকা টানিয়া দিলেন, তাহা কবিই জানেন।

রঘুবংশের আদি শ্লোকেই মহাকবি তাঁহার "উপমা কালিদাসস্য" এই বিশ্বজনীন প্রশস্তি সার্থক করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক কবি প্রার্থনা করিতেছেন বিশ্বজনক জননীর নিকট, যেন শব্দ ও অর্থের চরমরূপে তাঁহার কাব্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কাব্যকলার উপজীব্য বাক্য ও তদনুগ অর্থ; যেমন ভাস্কর্যের উপাদান তৃণকাষ্ঠ প্রস্তরাদি। শিল্পীর নৈপুণ্যে অতি সাধারণ পদার্থও অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়া হৃদয়ে অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করে। ভাবব্যঞ্জনার মাপকাঠি দিয়া তাঁহার শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার করা হয়। সৃষ্টির প্রথম হইতেই বাক্ ও অর্থ নিত্য মিলিত।

সেই জন্যই নিত্যমিলনের প্রতীক বিশ্বজনক জননীর সঙ্গে বাক্য ও অর্থের উপমা। কালিদাসের উপমায় অনেকস্থলে শ্রুতি-স্মৃতির সন্নিবেশে অনেকেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত তাঁহারা একথা ভাবিয়া দেখেন না যে, ধর্ম জিনিষটী অভারতীয়-দিগের জীবনের একটী দুর্বোধ্য ব্যাপার। তাই ধর্মজগতের সঙ্গে কাব্যজগতের মৈত্রীস্থাপন করিবার কথা তাঁহাদের কল্পনায় আসেনা। কিন্তু ভারতবর্ষের আর্যজীবন সম্পূর্ণরূপে অন্য ধরণের। তাহা ধর্মের অক্ষয় ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ধর্ম কালিদাসের শ্রোতাদিগের কষ্টকল্পনার বস্তু নয় —ইহা তাহাদিগের স্বভাব সিদ্ধ। আমাদের কবির কল্পনায় পত্নী, পুত্র ও পতি যথাক্রমে 'শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিঃ।' আর্যভারতীয় জীবনের আদর্শের সহিত ইহার কেমন সুন্দর মিল আছে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

রঘুবংশের প্রথমে কবি আদর্শ রাজ-চরিত্র আঁকিয়াছেন। রাজারা আদর্শ ক্ষত্রিয় এবং আদর্শ ব্রাহ্মণের গুণাবলির অধিকারী। ব্রাহ্মণোচিত সংযম, ধর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ, তপস্যা যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই; এক কথায় তাঁহারা 'আজন্ম শুদ্ধ'। আবার নীতিকুশলতা, বিজিগীষা, সুন্দর সুস্থ শরীর, অমিত পরাক্রম, ভীমকান্ত ক্ষত্রিয়গুণে তাঁহারা অলঙ্কৃত। কাব্যে যে সকল সৌভাগ্যবান্ রাজার স্তুতি রহিয়াছে, কবির প্রতিভাস্পর্শে তাঁহারা অমর হইয়া গিয়াছেন। সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ তাঁহাদের চিরন্তন প্রজা, আর রাজোচিত মাহাত্ম্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল তাঁহারা এই সকল প্রজার জন্য "সন্তৃতার্থ"।

রাজা দিলীপ রঘুবংশের আদর্শের প্রতিনিধি। রাজার প্রজাহিতসাধন উপলক্ষ্য করিয়া কবি উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন,—"তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা"—বিধাতা যেন তাঁহাকে পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারাই নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুণ থাকিলেই সুখ হয় না, বরং ধার্মিকের জীবন দুঃখময়। দিলীপেরও একটী দুঃখ, তিনি অপুত্রক। "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্" রঘুবংশীয়দিগের প্রথা অনুসরণ করিয়া দিলীপ বহু ভার্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না দেখিয়া প্রধানা রাণী সুদক্ষিণার সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

পথে স্বভাব সুন্দর দৃশ্য,—প্রকৃতির অভিরাম লীলাবৈচিত্র্য। কালিদাস রাজচক্রবর্তী হইতে তপোবনের অধিবাসী পর্যন্ত সকলকেই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে আনিয়া দাঁড় করাইতে আনন্দ পান। প্রকৃতিই জীবনকে পূর্ণতা-সম্পদে সম্পন্ন করিয়া দেয়। মানুষের জীবন যাত্রায় তাহার সহযোগ অপরিহার্য। Wordsworth-এর Lucy Gray-র মত শকুন্তলা প্রকৃতিরই পালিতা কন্যা। প্রকৃতিমাতার স্নেহরসে তাহার অন্তর-বাহির পুষ্ট বলিয়া তাহার স্বাভাবিক পবিত্রতা সকলেরই মন কাড়িয়া লয়। ভবভূতি যখন রামের সীতা নির্বাসনরূপ কঠোর কার্যে বাসন্তীকে মূর্চ্ছিত করাইলেন, তখন তিনি এই বার্তাই দোষান্বেষীদের শুনাইলেন যে, ভালমন্দ বিচারের পরিমাপক প্রকৃতিই। বাসন্তী বহিঃপ্রকৃতির প্রতিমামাত্র, যদিও সীতার দণ্ডকারণ্যবাসের 'পিয়সহি'। ভবভূতি কালিদাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

কালিদাসের শ্রব্যকাব্য আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা শকুন্তলাকে প্রকৃতির কোল হইতে টানিয়া আনিলাম কেন, সে বিষয়ে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। রসগ্রাহী গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহোদয় সত্যই বলিয়াছেন—"His Vikramorvasi is a wonderful production of poetry rather than a drama."—কালিদাসের বিক্রমোর্বশী ত্রোটক দৃশ্য-কাব্যের অপেক্ষা বরং কবিতারই পরম রমণীয় বিকাশ। কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয়ে। বিক্রমোর্বশীতে আমরা রসের দিকটাই অনেক বেশী করিয়া পাই, ঘটনা পরম্পরার নাটকীয় বিস্তার যেন এখানে গৌণ। অভিজ্ঞান শকুন্তলাও তেমনি একখানি মনোহর শ্রব্যকাব্য। যদিও বাহ্যতঃ ইহা পঞ্চসন্ধিসমন্বিত নিছক নাটক। শকুন্তলা পড়িতে পড়িতে আপনা হইতেই চক্ষু মুদিয়া আসে। যেন বাহিরের দৃশ্যে কি হইতেছে, তাহা দেখিবার, জানিবার প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে। শুধু মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে কোন্ ভাষায় রসের অভিনয় চলিতেছে, তাহাই এখানে মুখ্য। ভাববিলাসী কালিদাস তাই নাটককেও ভাবুকতা দিয়া সযত্নে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে নিষ্ঠুর বাস্তবের সহিত সংঘর্ষে নাটকের অকাল মরণ না ঘটে। আদর্শবাদী ভারতীয় জীবনের অভিব্যক্তি•নাট্যকলায়, আর কালিদাস এই ভারতমন্ত্রেরই উপাসক। তাই তাঁহার দৃশ্যকাব্য গ্রীক নাট্যসাহিত্যের মত ঘটনাসর্বস্ব নহে—তাই তাহার ঘটনাকে অনেকাংশে বর্জন করিবারও শক্তি আছে। পূর্ণ মাত্রায় স্বভাব কবি বলিয়াই তাঁহার শকুন্তলার স্বভাব সুন্দর জীবনের প্রথমাংশ হইয়া উঠিয়াছে একটা প্রচণ্ড ভুলের অভিশাপে বিরহ-বিধুর; পরে নিসর্গের অপরিসীম স্নেহের আকর্ষণে কুটীল নাগরিক সংযমহীনতার প্রতীক দুষ্যন্তের শির যখন শকুন্তলার চরণে লুটাইয়া পড়িল, তখনই শকুন্তলার জীবন মিলন-মধুর। কালিদাস প্রেমের জয় গাহিয়াছেন, প্রেমকে প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে সার্থক করিয়াছেন। মূর্ত প্রেম শকুন্তলা "সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা"—বিশ্বনিয়ন্তার প্রথমতম সৃষ্টি,—সত্য, শিব, সুন্দরের মিলন বেদী।

যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা অদৃশ্য চক্রীর চক্রে ভীত হন না – বিপদ যতই ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাঁহাদের শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। তাঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলে পৃথিবীর যাবতীয় কার্য অক্লেশে অম্লান বদনে সাধন করিতে পারেন। পুত্র লিপ্সায় মহারাজ দিলীপ আজ নন্দিনীর পরিচারক। ইহাতে তাঁহার ক্ষোভ না হইয়া আনন্দ হইয়াছে। তাঁহার ধর্মপত্নী সুদক্ষিণাও অদৃষ্টকে সানন্দে মানিয়া লইয়াছেন। কি অদ্ভুত পরিবর্তন!

সেবাপরায়ণ মহারাজ দিলীপ যখন ছায়ার মত বনে বনান্তরে নন্দিনীর অনুগমন করিতে লাগিলেন, তখন প্রকৃতি রাজসেবার অধিকার পাইয়া নিরতিশয় হর্ষ লাভ করিল। পাখীর কলকাকলীতে দিলীপ আপনার জয় গান শোনেন, লতা হইতে ফুল ঝরিয়া পড়ার মধ্যে মাঙ্গলিক লাজ বর্ষণ দেখিতে পান, কীচক শব্দ শুনিয়া মনে করেন বুঝি বনদেবী গানের সাথে সাথে বাঁশী বাজাইতেছেন, আবার স্নিগ্ধ পবন প্রবাহে চামরব্যজন সুখ অনুভব করেন। রাজচক্রবর্তীর সিংহাসন আজ বনানীর সর্বত্র। মেঘদূত ও কুমারসম্ভবে প্রকৃতির ছবি আঁকিতে গিয়া কবি তাহাকে idealistic করিয়া তুলিয়াছেন,—এখানেও সেইধারা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন;—

"শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগ্নিঃ
আসীৎ বিশেষা ফলপুষ্প-বৃদ্ধিঃ ॥"

—রাজার উপস্থিতির মাহাত্ম্যে দবাগ্নি বারিবর্ষণ বিনাই শান্ত হইল, সহসা ফল ও পুষ্পের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইল।

তারপর অষ্টমূর্তি মহাদেবের কিঙ্কর দিলীপকে পরাভূত করিল। এখানে কালিদাস অতিপ্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। Shakespeareকে যেমন নাটকের চরিত্র-বিকাশের প্রয়োজনেই এইরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, কালিদাসকে কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রকার সৃষ্টিতে প্রবর্তিত হইতে হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, ইহা মহাকবির বিশ্বপ্রেমিকতার নিদর্শন। প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিকের মধ্যে তিনি অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দেন নাই; অতি-প্রাকৃতিকের হস্তে প্রাকৃতিকের পরাভব ঘটান নাই, বরং তাহারা একে অন্যের সাথী। 'মনুষ্যদেব' মহারাজের প্রকৃতিগত মহত্ব মায়াসিংহের আকর্ষণে ধূলি-লুণ্ঠিত হয় নাই। সিংহের যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া দিলীপের আত্মনিবেদন জগতে ছড়াইয়া পড়িল। কত প্রলোভন রাজার সম্মুখে!

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং
নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।,

কল্যাণরাশির ভোক্তা বলিষ্ঠ শরীর,—প্রজাদের নিকট পিতার সম্মান কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি যদি নন্দিনীকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ-ভাজন হইতেও হইত না। মোটের উপর ত্যাগের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার পক্ষে যতগুলি সুবিধা রাজার প্রয়োজন ছিল, সবগুলিই তাঁহার করতলগত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ ভোগের আনন্দকে ছাপাইয়া বহু উর্ধে উঠিল, ধ্রুবনক্ষত্রের মত মানব ইতিহাসের আকাশে চির-উজ্জ্বল হইয়া রহিল। কালিদাসকে ভোগলোলুপ কবি বলিয়াই যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একদেশদর্শী। মহাকবিকে ঠিক ঠিক জানিতে হইলে তাঁহার রচনা অখণ্ডভাবে দেখিতে হইবে। ভোগকে যখন তিনি কাব্যের কোঠায় আমন্ত্রণ করিলেন, তখন তাহার উপচার সম্ভার দেখিয়া পাঠকের মনে বিস্ময় জাগে, আবার ত্যাগের মহিমা চিত্রিত করিতে গিয়া কবি সর্বত্যাগী নিরাভরণ নিরাবরণ শঙ্করের কথা স্মরণ করিয়াছেন। তিনি সংসারের দুইটী বিপরীত ভাবের সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসীম কৃতিত্ব। তিনি যাহাই পাইয়াছেন, তাহাই অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছেন। দিলীপ কবির ধন-ভাণ্ডারের নিধি।

রঘু জন্মিলেন মূর্তমহোৎসবের ন্যায়। নন্দিনীর সেবা সার্থক হইল। রাজারাণীর হৃদয়ে বাৎসল্যরসের জোয়ার আসিল। কালিদাস দাম্পত্য প্রেমের গ্রন্থি করিয়াছেন পুত্রকে। তাঁহার রাজগণ পুত্র জন্মের জন্যই দার পরিগ্রহ করেন। বিক্রমোর্বশীতে আয়ুস্ এবং শকুন্তলায় ভরত পতি-পত্নীর মাঝে দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে রঘু বড় হইলেন—ধীরে ধীরে যৌবন আসিয়া

তাঁহার শৈশবকে নিরস্ত করিল। রঘু-সহায় দিলীপ "বিভাবসুঃ সারথিনেব বায়ুনা"—পবন-সহায় অগ্নির ন্যায় শত্রু পক্ষের অসহ্য হইয়া উঠিলেন।

শততম অশ্বমেধের অশ্ব ভীরু দেবরাজ অপহরণ করিলেন। ক্ষত্রিয় কুমার রঘু তিরস্কারে তাঁহাকে অস্থির করিলে তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নির্ভীক রঘু তাহা শুনিবেন কেন? যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 'মানুষ' রঘুর তেজে বজ্রের শক্তিও পরাহত হইল। কালিদাস মানুষকে অমরের আসনে বসাইলেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন। দিলীপ বুঝিলেন, তাঁহার বংশ আজ সুপ্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। তিনি রাজত্বের গুরুভার হইতে মুক্তি লইলেন। রঘু বসিলেন সিংহাসনে।

তারপর দিগ্বিজয়ের নিষ্ঠুর আনন্দে সৌম্যদর্শন রঘু হইলেন ভয়ানক। পরাজিত রাজারা তাঁহার চক্রবর্তিত্ব মানিয়া লইলেন। অখণ্ড ভারতে তাঁহার একনায়কত্ব স্থাপিত হইল; তাঁহার ক্ষাত্রতেজ সফল হইল। মেঘদূতে মেঘের যাত্রাপথ নির্দেশের মত এখানেও কবির ভৌগোলিক জ্ঞানের অবিসংবাদী প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ্ ছন্দ লঘুপদক্ষেপে জয়শীল রঘুর কীর্তি-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া চলিয়াছে। কবির কল্পনা তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইবার অবসর নাই, যেন তাহাতে দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। কবির বীররস চিত্রনে দক্ষতা নাই একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মনোযোগের সহিত রঘুর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ এবং দিগ্বিজয়ের অংশ পড়িয়া দেখিবেন।

বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দৃশ্য। সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় দিলেন,—"মৃৎপাত্র শেষামকরোদ্ বিভূতিম"। অকালে প্রার্থী কৌৎস আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিলেন—

'পর্য্যায়পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ
কলক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ।'

—পর্যায়ক্রমে সুরগণ হিমাংশুর এক একটী কলা পান করিবার ফলে তাহার যে ক্ষয় হয়, তাহা বৃদ্ধি অপেক্ষা শ্লাঘনীয়। অদাতা রঘুর রাজকোষ যদি সম্পদে পূর্ণ থাকিত, তবে কৌৎসরূপী নিখিল বিশ্বের জনগণ দুঃখিত হইত। অসময়ে অতি সজ্জন যক্ষপতি কুবের স্বর্ণ বর্ষণ করিয়া তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করিয়া দিলেন, রঘুর ও কৌৎসের সমস্ত লজ্জা দূর হইল। কবির কল্পনা-দক্ষতায় দাতার দানের মাহাত্ম্য ও গ্রহীতার গ্রহণ মাহাত্ম্যের জন্য পাশাপাশি আসন পড়িল। রাজার উপরোধ সত্ত্বেও গুরুভক্ত কৌৎস প্রার্থিত ধনের এক কপর্দকও অতিরিক্ত লইলেন না।

রঘুতনয় অজের জীবন অতি বিচিত্র। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভা এবং ইন্দুমতীর বিয়োগ-বিধুর অজের মর্মভেদী রোদন—এই দুইটীই কবির কল্পনায় বেশ সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। সভার দ্বার-রক্ষিণী সুনন্দাও কবি। তাহার সপ্রতিভ বর্ণনাভঙ্গী এবং চক্ষুরাগ-বিহ্বলা ইন্দুমতীর সহিত চিত্তাকর্ষী কৌতুক পাঠকের মনে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। শুদ্ধান্তচারিণীদের অসামান্য আনন্দের দৃশ্য বড় মনোরম। স্বভাব সুলভ কৌতূহল তাহাদিগকে আরও মনোহরবেশে সাজাইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইস্থান হইতেই ছুটিল সৌভাগ্যশালী অজকে দেখিবার আশায়।

'তথা হি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং
সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।'

—যেন তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি একমাত্র নয়নদ্বয়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল। কালিদাসের উৎপ্রেক্ষার সাবলীলতা পরবর্তী কবিদের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজকুমারকে দেখিবার আগ্রহ অন্য কোন কথায় বোধ করি এমন সুন্দর ও সমগ্রভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। অন্য কবিরা স্বাভাবিক রূপকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল অলঙ্করণেই ব্যস্ত—কঙ্কালকে মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সাজাইতেই তাঁহাদের সময় কাটিয়া যায়। কালিদাসের মত এমন সরল সহজ-ভাবে সৌন্দর্যকে অনুভব করিতে তাঁহারা যেন লজ্জা বোধ করেন।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং নাকৃতির্মণ্ডনানাম্॥

সুন্দরী তন্বীকে বল্কলে ভূষিত করিতে তাঁহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

স্ত্রীরত্ন লইয়া অজ নিজ রাজ্যে চলিতেছেন, এমন সময়ে হতাশ প্রার্থীরা একযোগে তাঁহার পথ আগ্‌লাইলেন। কৃতজ্ঞ যক্ষ-সখার আদরের দান প্রস্বাপন বাণ দিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম শিথিল করিলেন—তাঁহারা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। অবসর পাইয়া শোণিতাক্ত বাণাগ্র দ্বারা বিপক্ষের ধ্বজদণ্ডে এই অক্ষরগুলি লিখিয়া দিলেন—

যশো হৃতং সম্প্রতি রাঘবেন,
ন জীবিতং বঃ কৃপয়েতি বর্ণাঃ॥

—অজ এখন তোমাদের যশই হরণ করিলেন, কিন্তু কৃপাপরবশ হইয়া জীবন অপহরণ করিলেন না। কালিদাস প্রচার করিলেন, যদি ভোগ করিতে চাও, তবে ভোগের সামর্থ অর্জন কর। "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা৷" তবে কঠোর ও কোমল উভয় বৃত্তিরই প্রয়োজন আছে।

তারপর একটী করুণ দৃশ্য। অদৃষ্টের নির্মম আঘাতে ইন্দুমতীর পার্থিব জীবনের সকল সুখ অস্তমিত হইল; রাজার জীবনে সেই যে তামসী রজনীর আবির্ভাব হইল, তাহা আর প্রভাত হইল না।

একদা নগরোপবনে রাজা দয়িতার সহিত বিহার করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ আকাশপথে চলিয়াছেন মহাদেবকে বীণা শুনাইতে। বীণাটী পারিজাত-মালায় ভূষিত। সহসা বায়ুবেগে মালাগাছি খসিয়া পড়িল ইন্দুমতীর উপরে। অমনি ইন্দুমতীর পূর্বজীবনের অভিশাপ অন্তরিত হইল, তাঁহার গতাসুদেহ ভূপতিত হইল। রাজার আর্তরবে সকলেরই নয়নকোণে অশ্রু দেখা দিল।

অজবিলাপ মহাকালেরই বিলাপ। সৌন্দর্যের আকর এমন ভাবে ধ্বংস করিতে বোধ হয় মহাকালও কাঁদিয়াছিল। তাই সমস্ত রঘুবংশ বিলুপ্ত হইলেও এই বিলাপের বিলোপ কখনও

হইবেনা। রাজাও সাধারণ মানুষ। ইন্দুমতীর বিরহে তাঁহার সমুদ্রের মত নিতল গাম্ভীর্য কোথায় চলিয়া গেল।

অভিতপ্তময়োহপি মার্দবং
ভজতে কৈব কথা শরীরিষু।

—সুকঠিন লৌহও অগ্নির উত্তাপে গলিয়া যায়, আর শোকাগ্নিতে প্রাণীর অবস্থা কি হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ দেখি! আজ হইতে তাঁহার মধুমাস নিরুৎসব। রাজপ্রাসাদ সঙ্গীতহীন, রুক্ষ বিভীষিকা লইয়া তাঁহাকে যেন উপহাস করিতেছে। তাঁহার ইন্দুমতী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোকিলের কণ্ঠে কণ্ঠে তাহার স্বর-মাধুরী, কলহংসীদের গতিতে তাহার মদমন্থর গতি, মৃগীদের নয়নে তাহার বিলোল দৃষ্টি—ফলতঃ তাহার যাহা কিছু ছিল, সবই রাখিয়া গিয়াছে। তবু শান্তি নাই তবু আজ শোকদীর্ণ হৃদয় একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। প্রেমপ্রতিমা আজ পৃথিবীকে চিরবিরহে সন্তপ্ত করিয়া বিদায় লইয়াছে।

বশিষ্ট সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু "মানুষ" অজ অতি স্বাভাবিক ভাবেই সে সান্ত্বনায় শান্ত হইলেন না। নিদারুণ শোকাহত রাজা যদি "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্"—এই মামুলি কথায় প্রকৃতিস্থ হইতেন, তবে কালিদাস মানব হৃদয়ের তত্ত্ব জানিতেন না আমরা এই অপবাদ দিতাম। কবি এই পরীক্ষা সসম্মানে পার হইয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ

দেবী দুর্গা

অধ্যাপক **শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ**

(৩)

আমাদের দেশে দেবীপূজার দুইটী প্রকারভেদ আছে। বাসন্তীপূজা পূজার একরূপ, অপররূপে ইহা দুর্গাপূজা। বাসন্তীপূজা করিবার নিয়ম এক, দুই বা তিন দিন। আর দুর্গা-পূজার বিধি একদিন হইতে আরম্ভ করিয়া একপক্ষ পর্যন্ত। দুর্গাপূজায় সাতটী কল্পের বিধান আছে। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমী হইতে আশ্বিন মাসের মহানবমী পর্যন্ত যে পূজা তাহাকে 'নবম্যাদি কল্প' বলে; আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্যন্ত যে পূজা তাহার নাম 'প্রতিপদাদি কল্প'; আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্যন্ত পূজাকে 'ষষ্ঠ্যাদি কল্প' বলে। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে মহানবমী পর্যন্ত পূজাকে 'সপ্তম্যাদি কল্প' নামে অভিহিত করা হয়। আশ্বিন মাসের মহাষ্টমী হইতে মহানবমী পর্যন্ত যে পূজা তাহা 'অষ্টম্যাদি কল্প'। কেবল যদি মহাষ্টমীতে পূজা হয় সেই পূজার নাম 'অষ্টমী কল্প' হইবে। এইরূপ কেবল মহানবমীতে পূজা হইলে তাহাকে 'নবমী কল্প' বলা হয়। বিধি এই যে, সামর্থ্য, সুযোগ ও সুবিধানুসারে এই সপ্তবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন কল্পানুসারে দেবীর পূজা হইতে পারে। আমাদের বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ষষ্ঠ্যাদি কল্পে দেবীর পূজা বিহিত হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর 'বোধন' ও 'আমন্ত্রণ' করিতে হয়। পরে সপ্তমী হইতে নবমী পর্যন্ত দেবীর যথারীতি পূজাদি করিয়া দশমীতে বিসর্জন দিতে হয়। পূজার তিন দিনই চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। বলিদানও পূজার একটী প্রধান অঙ্গ।

সাধারণতঃ বাসন্তীপূজা তিন দিনের পূজা। কালিকাপুরাণে অষ্টমী কল্পের—আর 'দুর্গোৎসব-বিবেকে' নবমী কল্পের বিধি আছে। এই দুই গ্রন্থের মতে এই পূজা দুই দিন বা এক দিন করা চলে। পূজাতে চণ্ডীপাঠও আছে। ষষ্ঠীতে সায়ংকালে 'বিল্ববৃক্ষমূলে' 'আমন্ত্রণ' ও প্রতিমার 'অধিবাস' করিয়া রাখিতে হয়। পরদিন সপ্তমীতে আমন্ত্রিত বিল্বশাখা কাটিয়া যথা-বিধানে পূজা করিতে হয়। বাসন্তীপূজার প্রবর্তনকাল-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড, ৬২ অ°) বলেন, প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাসমণ্ডলে মধুমাসে (চৈত্রমাসে) দুর্গাদেবীর পূজা করেন। দ্বিতীয়বারে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সঙ্গে মধুকৈটভের যুদ্ধের সময়ে প্রাণ-সঙ্কট-কালে দেবীপূজা করেন। বসন্তের ও শরতের পূজার পার্থক্য আছে। বাসন্তীকে কালোচিত পূজা বলে; শারদীয়া পূজাকে অকালপূজা বলে, এই টুকুই প্রধান ভেদ। অকাল বলিলে আমরা বুঝি কি? সৌর বর্ষের মকর-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত উত্তরায়ণ; কর্কট-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যন্ত দক্ষিণায়ণ। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক অয়নে

দেবতারা জাগ্রত থাকেন, অপর অয়নে নিদ্রিত। যখন তাঁহারা জাগ্রত তখন 'কাল'; যখন নিদ্রিত তখন 'অকাল'। উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত এবং দক্ষিণায়নে তাঁহারা নিদ্রিত, তাই উত্তরায়ণে বাসন্তী কালের পূজা, আর দক্ষিণায়নে শারদীয়া অকালের পূজা। আর অকালের পূজা বলিয়াই এই পূজার এত আদর। অকালে দেবতাদের নিদ্রা, কাজেই দেবীকে জাগাইতে হয়, সেইজন্যই বোধনের ব্যবস্থা। শারদীয়া পূজায় শুধু আমন্ত্রণ ও অধিবাস করিলেই চলে না, এ পূজায় বোধন করিতে হয়। আর এই বোধনই এই পূজায় প্রধান ও বিশেষ কার্য। আমরা যে দুর্গা পূজা করিয়া থাকি সেই দেবীর মূর্তি সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা দরকার।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ-মূর্তি-সংযুক্ত দুর্গার ধ্যান করিবার নিয়ম আছে। কিন্তু এইরূপ একত্র সংযুক্ত মূর্তির বর্ণনা একটী স্থান ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। একমাত্র কালীবিলাসতন্ত্রে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, অসুর ও সিংহসংযুক্ত দুর্গাদেবীর আরাধনার কথা আছে।

আমাদের দুর্গা দশভুজা, ত্রিলোচনা। দেবীপুরাণে (৩২ অধ্যায়) নির্দেশ আছে—

'বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন দশবাহুস্ত্রিলোচনাম্॥
কারয়েদ্ ভক্তিমান্ যস্তু দেবীং শাস্ত্রবিশারদঃ' ॥ ১৯-২০।

এই পুরাণে দেবীর আর এক মূর্তির কথা আছে—

"দ্বিভুজা যা চ বিংশাষ্টা তাবদ্দোর্দণ্ডধারিণী ॥" ৩৩।

দশভুজা দুর্গাপূজার কথা কালিকাপুরাণে (৬১ অধ্যায়, ২১-২২ শ্লোক) আছে।

দেবীর রূপ—মাথায় জটা, অর্ধচন্দ্রের মুকুট, তিনটী চক্ষু, মুখ পূর্ণচন্দ্রের মত, দেহের আভা তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য, দাঁড়াইবার ভঙ্গী বেশ সুন্দর—তাঁহার দেহ নবযৌবনসম্পন্ন, সর্বাভরণভূষিত; দন্ত—মনোহর; ভাব—উগ্র ত্রিভঙ্গিমাযুক্ত। দেবী মহিষমর্দিনী। মূলোত্থিত মৃণালবৎ দশবাহুযুক্তা। দেবীর দশ হাত। সকলের উপরে প্রথম দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, তাহার নীচে খড়্গ, তার নীচে চক্র, ক্রমনিম্নে তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি; বামবাহু-উর্ধ্ব হইতে ধরিলে পাই—১। খেটক, ২। গুণযুক্ত ধনুক, ৩। পাশ, ৪। অঙ্কুশ, ৫। ঘণ্টা ও পরশু।

দেবীর নিম্নে ছিন্নশির মহিষ। মহিষের মাথা কাটা যাওয়ায় খড়্গপাণি দানব বাহির হইতেছে। এই দানবের হৃদয় শূল দিয়া উদ্ভিন্ন হওয়ায় অস্ত্র বাহির হইয়া পড়িতেছে। অঙ্গ রক্তে রঞ্জিত, আরক্ত চক্ষু বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে। দেবী পাশযুক্ত বাম হস্তে তাহার কেশ ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহার রক্ত বমন হইতেছে, দেবী তাহাকে 'আঃ' এই শব্দ করিয়া সিংহকে দেখাইয়া দিতেছেন। দেবীর দক্ষিণপদ সমানভাবে সিংহের উপর। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডী, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডা—এই অষ্টশক্তিতে দেবী পরিবৃতা।

দেবী দশভুজা, ত্রিনেত্রা। তিনি দ্বিভুজ হইতে আটাশ হাত ধারণ করেন।

দেবীর পূজা কয়েকটী পদ্ধতি মতে সম্পন্ন করিতে হয়। সাধারণতঃ বৃহন্নন্দিকেশ্বর—

পুরাণোক্ত পদ্ধতি, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে দেবী পূজিতা হইয়া থাকেন।

মৈমনসিংহ জেলায় মৎস্যপুরাণোক্ত পদ্ধতি ও দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী মতে পূজা বিহিত হয়। রাজসাহী জেলায় বাণীনাথকৃত 'দুর্গাপূজা-পদ্ধতি' অবলম্বন করিয়া দেবীর পূজা হইয়া থাকে। আরও দু একটা জেলায় একটু আধটু ইতর বিশেষ আছে।

দেবীপুরাণ ও দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি বোধ হয় এক নয়। দেবীপুরাণে (২২ অধ্যায় ৭ম শ্লোক) আছে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে নয় রাত্রি পূজার ব্যবস্থা—

"কন্যাসংস্থে রবৌ শুক্রশুক্লামারভ্য নন্দিকাম্॥"

দেখা যাইতেছে দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতির ধারা ইহাতে নাই। এ পূজা যে রামচন্দ্রের পূজা অথবা ইহাতে যে অকাল বোধন আছে এ সব কথা কালিকাপুরাণে নাই, বিসর্জনের কথাও নাই। এই পুরাণের ধ্যান ও দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতির ধ্যান এক নয়। এই পদ্ধতির ধ্যান কালিকা-পুরাণের ধ্যান। দেবীপুরাণে—২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১ ও ৩২ অধ্যায়ে পূজা ও বিধি দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি হইতে এক রকম পদ্ধতি তৈয়ারী করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি হইয়া যাইবে না।

কালিকাপুরাণে ৫২ হইতে ৬১ অধ্যায় পর্যন্ত দেবীর আবির্ভাব ও পূজার কথা আছে। প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে সেই একই কথা। তবে কাঠামটা বজায় আছে। কালিকাপুরাণে দেবীর মূর্তি তিন রকম—একবার ইনি উগ্রচণ্ডা, অষ্টাদশভুজা, একবার ভদ্রকালী ষোড়শভুজা, একবার দুর্গা, কাত্যায়নী দশভুজা। এই তিন মূর্তিতেই দেবী মহিষমর্দিনী। এই পুরাণের ৬৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম সৃষ্টিতে মহিষাসুরকে উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে ভদ্র-কালীরূপে, এখন দুর্গারূপে তাহাকে বধ করিয়া থাকেন।

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কালিকাপুরাণোক্ত কয়েকটী বচন পাওয়া যায়। সেকালে অর্থাৎ রঘুনন্দনের সময়ে এবং তাহার কিছু পরে কিরূপভাবে দেবীপূজা হইত তাহার একটু নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

'সপ্তম্যাং বিল্বশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ।
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ।
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্যাদ্বলিদানং মহানিশি।
প্রভূতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ॥'

দুর্গার লীলার মধ্যে প্রসিদ্ধ লীলা তাহার অসুরদলন। অসুরদলনই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের বিষয়। দুর্গাপূজকদের এখানি বিশেষ শাস্ত্র। এই গ্রন্থে দুর্গা সমগ্র দেবতাদের সমষ্টিভূত শক্তি হইতে চণ্ডিকা নামে আবির্ভূত হন। তাঁহাকে তাঁহারা ক্রোধে মহিষাসুরের উপর ফেলেন। দেবী সমস্ত অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। তারপর চণ্ডিকা ও মহিষাসুরে একা একা যুদ্ধ। শেষে মহিষাসুরের মাথার উপর

দাঁড়াইয়া তার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন এই অসুর মহিষের আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কাঁধের ভিতর দিয়া অসুর বাহির হইল। দেবী তাহাকেও বিনাশ করিলেন। আমাদের প্রতিমায় মার এই মূর্তিই আছে। ছবিতেও এই মূর্তি। কাব্যেও এই মূর্তি। ৭ম শতকের মহাকবি বাণ এই দৃশ্যই তাঁর চণ্ডীশতকের প্রথম শ্লোকেই বর্ণনা করিয়াছেন। মহিষাসুর-বধ ছাড়াও দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ-বধের কথা আছে। এই দুই অসুর দেবতাদের তাড়াইয়া ত্রিলোক কাড়িয়া লইয়াছিল। দেবতারা পার্বতীর সাহায্য চাহিলেন। তিনি তখন গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। তাঁর শরীর হইতে আর এক দেবী বাহির হইল—নাম অম্বিকা বা চণ্ডিকা। শুম্ভ নিশুম্ভের দুই সহচর ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ। তাহাদের পরামর্শে শুম্ভ এই সংবাদ দিয়া দূত পাঠাইল যে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে চায়। দেবী রাজী হইলেন। তবে কড়ার করিলেন যে তাঁহাকে যুদ্ধে হারাইতে হইবে। এই শুনিয়া শুম্ভ অনেক অসুর লইয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিবার জন্য ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন। তিনি তো সকলকে বধ করিয়া ফেলিলেন। চণ্ড মুণ্ডের পালা এই বার। তারাও বিপুল সেনা লইয়া গেল। অম্বিকা তাহাদের দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের চোটে কপাল দিয়া আর এক দেবী বাহির হইলেন। ইনি হইলেন কালী—শীর্ণদেহা, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিতা, নরমুণ্ডহারা, তাঁর প্রকাণ্ড মুখের ভিতর দিয়া জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহার সঙ্গে খুব যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চণ্ড ও মুণ্ডকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার নাম হইল—চামুণ্ডা। এ নাম ইহার আগে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। পরে মালতী-মাধবে আছে। এই বার শুম্ভ বিপুল বাহিনী লইয়া অম্বিকার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। দেবতারা সব দেহধারণ করিয়া অম্বিকার দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অসুরদিগের ভিতর ছিল রক্তবীজ। তার রক্ত মাটিতে পড়িলেই আর রক্ষা নাই—অমনি এক জন জন্মিবেন। যুদ্ধ চলিল। এদিকে রক্তবীজের রক্তে অসংখ্য অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল। চণ্ডিকার তখন আদেশ হইল—চামুণ্ডা! রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়িবার আগেই খাইয়া ফেল। শেষে রক্ত-শূন্য করিয়া ক্লান্ত অসুরকে মারিয়া ফেলিলেন। অতঃপর দেবীর সিংহ অসুরদের মধ্যে মহাত্রাসের উৎপাদন করায় নিশুম্ভ দেবীকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সমর হইল। নিশুম্ভ পপাত মমার চ। শুম্ভকে দেবী নিহত করিলেন এই এক আখ্যায়িকা।

দুর্গার আর একটী মূর্তি আছে। সে মূর্তি যোগনিদ্রা বা নিদ্রাকালরূপিণী। হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব ২ অ°) বৈশম্পায়ন বলেন,—দেবকীর পুত্রনাশে কংশের মতলব নষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণু পাতালে যান। সেখানে তিনি নিদ্রাকালরূপিণীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সহায়তা করিলে তিনি তাঁকে সারা দুনিয়ায় জাহির করিয়া দেবেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি যশোদার নবম সন্তানরূপে সেই দিন জন্মিবেন, যেদিন তিনি দেবকীর অষ্টম পুত্ররূপে জন্মিবেন। তারপর উভয়কে বদলাবদলি করা হইবে। তাঁকে পাহাড়ে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। তখন তিনি অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়া তাঁহারই সমান গৌরব পাবেন। ইন্দ্র তাঁর স্তুতি করিবেন ও তাঁহাকে কৌষিকী নামে তাঁর ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আর ইন্দ্র বিন্ধ্যপর্বতে তাঁর

অনন্তকাল বাসের ব্যবস্থা করিবেন। যেখানে তিনি বিষ্ণু-ধ্যান করিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিবেন এবং জীব বলিদ্বারা পূজিত হইবেন।

এই একই আখ্যায়িকা আবার বিষ্ণুপুরাণ (৫.১) প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে আছে।

আর এক পুরাণের মতে ইনি বিষ্ণুর যশোভাক্ (মার্কণ্ডেয় ১.২৪৮) কল্পান্তে যখন বিষ্ণু অনন্ত সমুদ্রে যোগনিদ্রাতে রত হলেন, মধু ও কৈটভ তাঁর কাছে আসিল। মতলব ব্রহ্মাকে নাশ করিবে। কিন্তু বিষ্ণু চক্র দিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলেন। যোগনিদ্রা এ সময় কি করিলেন? ব্রহ্মা তাঁহাকে আরাধনা করায় তিনি বিষ্ণুর চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। বিষ্ণু জাগিয়া উঠিলেন। অসুর বিনষ্ট হইল।

মহাভারতে দেবীকেই কৈটভনিসূদন বলা হইয়াছে।

যে সময় মহাভারত লেখা হয় তখন দুর্গার পূজা খুব প্রতিষ্ঠিত। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণের সময়ও খুব চলিত।

সংস্কৃত-সাহিত্যের আর এক শাখায় দুর্গাপূজা ছাপিয়া উঠিয়াছিল। সেটী হইল তন্ত্র। তন্ত্রের আর একটা ধারা এই যে, হর ও পার্বতী কোন না কোন রূপে কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন। সাধারণতঃ উমা বা পার্বতীকেই পাওয়া যায়। ইনি পতিকে কোন না কোন পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শিব উত্তরে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রণালী বা বিবরণগুলি নূতন ধরণের। বেদসম্মত পুরাতন পদ্ধতির স্থানে নূতন মত প্রচার।

বলদেবের প্রমেয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রথম প্রমেয়

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

গৌতমীয় তন্ত্রেও—

দেবী শ্রীরাধিকা পরা, সুতরাং তিনি কৃষ্ণময়ী, তথাপি পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী (সকল লক্ষ্মীর অংশিনী), সর্বকান্তি এবং সম্মোহিনী ইতি।

[প্রথম প্রমেয় ১০ম শ্লোকে যে 'নিত্য লক্ষ্যাদিমত্ব' শ্রীকৃষ্ণের তারতম্যের প্রতি একটী হেতু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ঐ পদের মধ্যস্থিত আদি শব্দের অর্থ নিত্যধামত্ব বুঝিতে হইবে।]

আদি শব্দের প্রয়োগ বশতঃ নিত্যধামত্ব বুঝায় যথা,—ছান্দোগ্য উপনিষদ (৭।২৪।১)

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

"দেবী কহি দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।
কিংবা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ায় বসতি-নগরী॥
'কৃষ্ণময়ী' কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্বপালিকা সর্ব জগতের মাতা॥
'সর্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিংবা সর্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্বশক্তি বর্য॥
সর্ব সৌন্দর্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে।
সর্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হৈতে॥
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সর্ব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥"

প্রশ্ন হইল, "সেই ভগবান কোন্ স্থানে অবস্থান করেন।" ইতি
উত্তর হইল, "আপন মহিমায়।" ইতি।

মুণ্ডক উপনিষদেও—(২।২।৭)

এই আত্মা দিব্য (অপ্রাকৃত) ব্রহ্মপুর পরব্যোমে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইতি

ঋগ্বেদেও—(১।১৫৪।৬)—

আমরা আপনাদিগের দুই জনের সেই প্রসিদ্ধ গৃহে গমন করিতে কামনা করি। যে গৃহে প্রশস্ত বিষাণবিশিষ্ট কামধেনু সকল বিচরণ করিয়া থাকে।

এ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন, সেই ভক্তেচ্ছাবর্ষী উরুগায় * শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ প্রচুর পরিমাণে (অসংখ্য) প্রকাশ পাইতেছেন। ইতি।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষেদও—(উত্তর ৩৫)—

'সেই সপ্তপুরীরা মধ্যে গোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ।' ইতি।

জিতন্তে স্তোত্রেও—

'বৈকুণ্ঠ নামক লোক যাহা দিব্য যাড়্গুণ্যসংযুক্ত অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য প্রাকৃত গুণত্রয়শূন্য, ভগবন্ময় পাঞ্চকালিক নিত্যসিদ্ধগণকর্তৃক পরিপূরিতা সভা এবং প্রাসাদ সংযুক্ত বন, উপবন, বাপী, কূপ, তড়াগ, বৃক্ষসমূহে সুশোভিত প্রকৃতির অতীত অযুত সূর্যের প্রভাবিশিষ্ট পরম মঙ্গলময় এবং দেববৃন্দের বন্দনীয় ইতি।

ব্রহ্ম সংহিতাতেও—(৫।২)

সেই মহতো মহীয়ান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্থানের নাম হইতেছেন শ্রীগোকুল; তাহার

* এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) সুন্দর বলিয়াছেন—

এই শব্দ দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে—

নানাপ্রকারে তিনি গীত হইয়া থাকেন। অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক যিনি গীত হইয়া থাকেন। উরুধা গীয়তে উরুভির্গীয়তে বা।

† সপ্তপুরী যথা—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারকা।

অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন, সমাধি এই পাঁচটী পঞ্চকাল। যাঁহারা এই পঞ্চকালপরায়ণ তাঁহারা পঞ্চকালিক।

আকার সহস্রপত্র কমলসদৃশ। ঐ কমলের কর্ণিকাই তাঁহার ধাম। সেই ধাম অনন্ত বা সংকর্ষণের অংশে অনাদিকাল হইতে প্রকট রহিয়াছেন। ইতি।

পূর্বে যে সকল প্রমাণবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মাদি শব্দের প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই মহেশ্বর ভগবান্ প্রপঞ্চে আপনার স্বরূপভূত ধাম সমূহকে অবতারিত করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

অজ্ঞজনগণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে যেমন সাধারণ মানবতনয় বলিয়া নিরূপণ করে, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দের মথুরাদি ধামকেও প্রকৃতির উপাদানে গঠিত বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে।

অনন্তর নিত্যলীলাত্ব। সেই শ্রুতি—(বৃহদারণ্যক ৩।৮।৩; ৪।৬।৭)

যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণবত্ব নিত্য তাহা হইয়াছে এবং হইবেও। ইতি এক অদ্বিতীয় দেবতা নিত্যলীলায় অনুরক্ত। তিনি বিশ্বব্যাপী হইয়াও ভক্তব্যাপী, বিশ্ববাসীর অন্তর্যামী হইয়াও ভক্তের অন্তরে অন্তরাত্মারূপ অহরহ প্রকাশমান। ইতি—(৪।৯)

স্মৃতি ও গীতা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "হে অর্জুন আমার জন্ম ও কর্ম অপ্রাকৃত-ভাবে অনুপ্রাণিত। যে ব্যক্তি ইহা যথার্থরূপে জানিতে পারে সে দেহত্যাগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না;—আমাকেই পাইয়া থাকে। ইতি।

শ্রীহরির আকার সর্বদাই অনন্ত বলিয়া, পার্ষদগণ অনন্ত বলিয়া, ধাম অনন্ত বলিয়া এবং সেই সাকারাদির মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই বলিয়া তাঁহার সেই কর্ম বা লীলা নিত্য হইতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই বলিয়া থাকেন।

ইতি প্রমেয়রত্নাবলীতে ভগবৎ পারতম্য প্রকরণ প্রথম প্রমেয়।

বাংলার অতীত গৌরব পাহাড়পুর*

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্

প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া বাংলায় পাহাড়পুরের নাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পাহাড়পুরের নাম প্রথমে Buchanan Hamilton-এর Journalএ দৃষ্ট হয়। তিনি East-India Company'র নির্দেশে ১৮০৭-১৮১২ খ্রীস্টাব্দে পূর্বভারতের দেশ সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যে ৫৫নং গবেষণামূলক পুস্তক (Memoir) —"Excavations at Paharpur, Bengal." প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা পাহাড়পুরের অতীত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইতে পারি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এই Memoir লিখিয়াছেন ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রাওবাহাদুর শ্রীযুক্ত কে, এন দীক্ষিত, এম-এ, এফ, আর, এ, এস্-বি।

কলিকাতা হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইনে জামালগঞ্জ নামে যে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, তাহা হইতে ৩ মাইল পশ্চিমদিকে এই পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। পাহাড়পুরের ভৌগলিক অবস্থান অক্ষবৃত্ত হইতে ২৫°২´ উত্তরে ও দ্রাঘিমারেখার ৮৯°৩´ পূর্বে (25°2´N. Lat ; 89°3´E. Long). এই গ্রাম উত্তর বঙ্গের সমতলভূমিতে অবস্থিত। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এই সমস্ত অঞ্চল ধৌত করিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই সমতল ক্ষেত্রের একস্থান পাহাড়ের মত উচ্চ, সেই স্থানের নাম পাহাড়পুর। এই পাহাড় হইতেই বোধ হয় পাহাড়পুর নামের উৎপত্তি।

খ্রীস্টীয় ১৮০৭-১৮১২ অব্দে Buchanan Hamilton সাহেবের দেশ পরিদর্শনের সময় দিনাজপুর জেলায় পাহাড়পুর অতীত ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনরূপে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এইস্থানে ১০০ হইতে ১৫০ ফিটের মধ্য মাপের একটি খাড়া উচ্চ ইষ্টকের স্তূপ দেখিতে পান। স্থানটী জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং স্তূপের মাথার উপরে একটী বৃক্ষ দণ্ডায়মান দৃষ্ট[১] হইয়াছিল। ইহার পর Westmacott সাহেব কর্তৃক এই স্থানটী পরিদৃষ্ট হয়[২]। তাহার পর ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে স্যর আলেকসান্দার কানিংহাম (Sir Alexander Cunningham), (ইনি সেই সময় ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন) এই স্থান পরিদর্শন করিয়া এই স্থান সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণীতে[৩] লিপি-

---

* বর্তমান প্রবন্ধটীর জন্য Director General of Archaeology in India, Rao Bahadur K. N. Dikshit লিখিত "Archaeological Memoir no. 55—Excavations at Paharpur, Bengal" নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায় হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

১। Martin's Eastern India, para 2, page 669.

২। J. A. S. B. Vol. XLII, page 189.

৩। A tour in Bihar and Bengal Vol. XV, page 117.

বন্ধ করেন। ডাঃ কানিংহামের মতে স্তূপের উচ্চতা সমতল ক্ষেত্র হইতে ৮০ ফুট এবং ইহাই পরে সঠিক উচ্চতা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। Buchanan সাহেবের বিবরণীতে যে সমস্ত ভুল পরিদৃষ্ট হয় কানিংহাম সাহেব তাহাদের সংশোধন করেন। Buchanan সাহেবের বিবরণীতে গোয়াল ভিটার পাহাড়কে (Gwalbhiter Pahar) গোপাল চিতার পাহাড় (Gopal chitar Pahar) বলিয়া বর্ণনা করা আছে। গোয়াল ভিটার নাম পাহাড়পুর নাম অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। পাহাড়পুরে যে সমস্ত প্রাচীন দলিলপত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত গোয়াল ভিটা নামের কোনও রূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। গোয়াল-ভিটা ও পাহাড়পুরের মধ্যে একটী গ্রাম অবস্থিত, তাহার নাম ধর্ম্মপুরী :—বোধহয় ইহা এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতার নামেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এখন পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার কাহিনী বলা যাউক। General Cunningham সাহেব এই ভগ্নস্তূপে খননকার্য করিবার মানসে কতকগুলি সুনিপুণ মজুর লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু এই স্থানের মালিক জমিদার বলিহারের রাজা তাঁহাকে এইকার্যে বাধা প্রদান করেন। Cunningham সাহেব এই স্তূপের চতুর্দিকে যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল, তাহা পরিষ্কার করেন এবং মধ্যস্থলের স্তূপের উপর কোন কোন অংশে সামান্য খননকার্য করেন। ইহা হইতে তিনি দেখিতে পান যে এই স্তূপটী একটী সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ, তাহার প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ২২ ফিট।

Buchanan Hamilton সাহেব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মধ্যস্থিত স্তূপটী একটী মন্দির। ইহার কারুকার্যের সাদৃশ্য হইতে তিনি স্থির করেন যে মন্দিরটী ব্রহ্ম বা নেপালের বৌদ্ধ মন্দির হইবে। কিন্তু General Cunningham স্থির করেন যে এই স্তূপটী একটী হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই মন্দির মধ্যে যে একটী মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি (Terracotta Plaque) ছিল, তাহা তিনি ভুলক্রমে কালীমূর্তি বলিয়া মনে করেন। Hamilton সাহেব মনে করেন যে পাহাড়পুরে যে সমস্ত জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পালবংশীয় রাজগণের সময়কার এবং তাঁহার এই ধারণা পরে ঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে "প্রাচীন স্তম্ভ সংরক্ষণ" আইনানুসারে (Ancient Monuments Preservation Act) পাহাড়পুরের স্তূপ ও তাহার চতুর্দিকস্থ ভূভাগ রক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ঘোষিত হইবার পরে ইহা ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে আসে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাচ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়, তখন ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী রাও বাহাদুর কে. এন. দীক্ষিত এই স্থান পরিদর্শনের জন্য গমন করেন এবং ইষ্টকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া স্থানটী নির্দিষ্ট করিয়া আসেন।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে এই স্থানে প্রাথমিক খননকার্য আরম্ভ হয়। সেই সময় রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (Varendra Research Society in Rajshahi) প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি দীঘাপতিয়া নিবাসী কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহিত একযোগে পাহাড়পুরে কার্য করিবার জন্য কিছু টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও উক্ত অনুসন্ধান সমিতি হইতে একদল গবেষক পাহাড়পুরের নিকট অবস্থান করিয়া ডক্টর ডি. আর. ভাণ্ডারকরের নির্দেশে সেখানে খননকার্য আরম্ভ করেন। সেই সময় উক্ত বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে সমস্ত প্রকোষ্ঠ ছিল সেইগুলি খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছিল। পরে ১৯২৫—২৬ খ্রীস্টাব্দে স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উক্ত কার্য আবার আরম্ভ করা হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম মধ্যস্থ বৃহৎ স্তূপের উত্তরাংশ খনন করিয়া, ইহার প্রধান সোপানশ্রেণী, অট্টালিকার নানাবিধ মৃন্ময় কারুকার্য এবং ইহার নির্মাণের সাধারণ পরিকল্পনা লোকচক্ষুর সমক্ষে আবিষ্কৃত করেন। ইহার পরে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এখানে খননকার্য চলিতে থাকে। ইহার মধ্যে ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩১—৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মি° জি. সি. চন্দ্র এই খননকার্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিহারের দক্ষিণ পূর্বদিকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল এবং তৎসংলগ্ন যে প্রাঙ্গন ছিল, সেই গুলির খননকার্য সম্পন্ন করেন। শেষে ১৯৩২-৩৩ ও ১৯৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দে সত্যপীড়ভিটা স্তূপের খনন শেষ হয়। ইহা প্রধান মন্দির হইতে প্রায় ৩০০ গজ পূর্বে।

পাহাড়পুর মহাস্থান হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় ২৯ মাইল দূরে অবস্থিত। মহাস্থানের প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন। ইহা তৎকালে সেই অঞ্চলের রাজধানী ছিল। বনাগড় হইতে পাহাড়পুরের দূরত্ব ৩০ মাইলেরও অধিক। ইহা বনাগড়ের দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত। বনাগড়ের পূর্ব নাম কোটীবর্ষ, উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী। পাহাড়পুর মঠের প্রতিষ্ঠাতা কেন যে এই নিভৃত স্থানটীকে তাঁহার মঠ স্থাপনের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ সঠিক-ভাবে বলা কঠিন। বোধ হয় তিনি পাহাড়পুরে নালন্দার মত বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটী বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তিনি আরও মনে করিয়াছিলেন যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ জনপদের কোলাহল হইতে দূরে অতি নিভৃত প্রদেশস্থ এই মঠে শান্তিতে বসবাস করিবার ও শাস্ত্রালোচনার সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন। এই স্থান মনোনয়নের আর একটী কারণ হইতে পারে ভগবান বুদ্ধ যখন জেতবন হইতে পৌণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে বিশ্রাম করেন। মহারাজ অশোক এইস্থানে একটী স্তম্ভ নির্মাণ করেন, কিন্তু আজ সেই স্তম্ভের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নাই। জনপদ হইতে অতিদূরে মঠ স্থাপন করিয়া ইহার স্থাপয়িতা নিশ্চয়ই ইহার কার্য পরিচালনার জন্য প্রভুত দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

সোমপুরে (বর্তমান পাহাড়পুরে) এই সুবৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার স্থাপন নিশ্চয়ই পাল-রাজগণের কীর্তি বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যেরূপ নৈষ্ঠিক বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যে তাঁহাদের রাজত্ব বরেন্দ্র-ভূমির কেন্দ্র স্থলে একটী সুবৃহৎ ও সর্বাঙ্গসুন্দর বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ তাঁহার পৌণ্ড্রবর্ধন পরিদর্শনের বিবরণীতে বলিয়াছেন যে তিনি এখানে যে বহু সংখ্যক শ্রমণ দেখিয়াছিলেন তাঁহারা

সকলেই জৈন নির্গ্রন্থ মতাবলম্বী। তাহা ছাড়া তিনি এখানে প্রায় ১০০ শত হিন্দু মন্দির ও মাত্র ২০টী বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীতে পাহাড়পুরের এই উচ্চ মন্দির এবং বৌদ্ধ বিহারের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এখানে কোনও বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু পালরাজগণ কর্তৃক সোমপুরে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার কথা আমরা মহায়ন বৌদ্ধ কিংবদন্তীতে শুনিতে পাই এবং আমরা আরও জানিতে পারি যে এই বিহার প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল। নালন্দা, বৌদ্ধগয়া প্রভৃতি আরও যে সমস্ত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মালোচনার কেন্দ্র ছিল, এই বিহারের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ সেই সকল কেন্দ্রে প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে খ্রীস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে পাহাড়পুরের বিহারের অবস্থা অতীব সমৃদ্ধ ছিল। এই সমস্ত বিষয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত স্থাপত্য ইত্যাদির নিদর্শনগুলি পালরাজগণের সময় অপেক্ষা আরও অতীত কালের বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সেখানে প্রধান মন্দির নির্মাণ ও বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা খ্রীস্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে পালরাজগণ কর্তৃকই সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্বভারতেই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য বর্তমান ছিল। অতএব এরূপ ধারণা স্বাভাবিক যে মুসমান বিজয় পর্যন্ত পাহাড়পুরের বিহারের অবস্থা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

এই সুবৃহৎ বৌদ্ধ চৈত্যের উত্থান পতনের ইতিহাসের সঙ্গে দেশের তৎকালীন ইতিহাস আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যতদূর জানা যায় খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাস্থান হইতে সম্প্রতি যে শিলালিপি[১] পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে সে সময়ে মহাস্থান একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার রাজধানী ছিল। মহাস্থানের নাম ছিল তখন পুণ্ড্রনগর। মহাস্থানে শুঙ্গরাজগণের[২] যে সামান্য সামান্য শিল্পফলক ও কুশানদিগের যে সমস্ত মুদ্রাখণ্ড[৩] পাওয়া গিয়াছে, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানে স্থানে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই সন্ধি যুগের ইতিহাসের সামান্য আভাষ পাইতে পারি। গুপ্ত রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান পাওয়া যায়। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত ঘটনাবলীর যে সমস্ত Records আছে তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুপ্তরাজগণ উত্তর বঙ্গে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পুণ্ড্রবর্ধনে তাঁহাদেরও একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। যে সমস্ত নথিপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, সে সময়ে মন্দিরাদি নির্মাণ ও তাহাদের

(১) Ep. Indica, Vol. XXI, p, 83.

(২) cf. A. S. R 1928-29, p, 96.

(৩) J. A. S. B (N. S) Vol, XXVIII, p, 127, ff.

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাদের অনেক দান আছে। পাহাড়পুরে যে নথি[১] পাওয়া গিয়াছে তাহাতে একটি জৈনমন্দিরে পূজার জন্য দানের উল্লেখ আছে। সেই সময়ে ধর্ম লইয়া কোনরূপ বিরোধ-ভাব প্রকাশ পাইত না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ও জৈনধর্মেই উত্তর বঙ্গের অধিবাসীরা অধিকতর আস্থাবান্ ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্ধন জৈন যতিগণের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা হইলে বর্তমান পাহাড়পুরের নিকট নিশ্চয়ই একটী প্রসিদ্ধ জৈনবিহার ছিল। ইউসেন সিয়াঙ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রমণের বিবরণীতে বলিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈন ও হিন্দুধর্মই সে সময়ে অধিকতর সমৃদ্ধ ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কেন্দ্রীয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতির পর ঐ বংশের দু একজন বংশধর বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিনয় গুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে একজন। গুপ্তরাজগণের যে সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন গুপ্তরাজগণের বংশেরই লোক। সেই সময় তাঁহারাও স্বাধীনতা অর্জন করেন এবং তাহাতে দক্ষিণবঙ্গে কয়েকজন স্থানীয় নৃপতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই সমস্ত নৃপতিগণের মধ্যে ধর্মাদিত্য, গোপালচন্দ্র ও সমাচারের নাম তাঁহাদের তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়। গুপ্তরাজগণের সময়ে যেরূপ মুদ্রার প্রচলন ছিল, সেই সকল মুদ্রার নকল অনেক দিন ধরিয়া বাংলা দেশে চলে, ভারতের আর কোন প্রদেশে ততদিন পর্যন্ত চলেনা। ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পশ্চিমবঙ্গ ও সম্ভবতঃ উত্তর বঙ্গও রাজা শশাঙ্কের করতলগত হইয়াছিল। তিনি একজন শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি যে ভীষণ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ এর বিবরণীতে দৃষ্ট হয়, তাহা অতি-শয়োক্তি বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে বাংলা দেশে চারুকলার কোন কোন বিভাগে একটী স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছিল এবং পাহাড়পুরের মত স্থাপত্যবিদ্যা বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হইয়াছিল খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ও ৭ম শতাব্দীর প্রথমে। তাহার পর ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত কিছু সময় যাবৎ বাংলার রাজনৈতিক গোলমালের জন্য স্থাপত্য শিল্পকার্যে বিরতি ঘটে। বাংলার আভ্যন্তরীণ নানা বিবাদ বিসম্বাদ হেতু ও স্থানীয় শাসনকর্তাগণের পরস্পরের মধ্যে হিংসাদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বাংলার বাহির হইতে অনেক অর্থলোলুপ শাসনকর্তা সুযোগ বুঝিয়া রত্নগর্ভা বাংলাদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলে বাংলা দেশ কামরূপ, কান্যকুব্জ, মহাকোশল, এমন কি সুদূরবর্তী কাশ্মীর দেশের নৃপতিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। শত শত বৎসর ধরিয়া গুপ্তরাজগণের শান্তিপূর্ণ রাজত্ব সময়ে যে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ক্রমাগত পর পর আক্রমণের দ্বারা তাহা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সঙ্কটকালে বাংলার অধিবাসিগণ তাহাদের দেশের এই অরাজকতা নিবারণ করিবার জন্য গোপালকে তাহাদের নৃপতি মনোনীত করিল। এই গোপালই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই পালবংশ বাংলায় প্রায় সার্ধ তিনশতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিলেন

(১) Ep. Indica, vol, XX, p. 59.

এবং পাল রাজগণের দ্বারা বাংলা দেশে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শিল্পাদির অভ্যুদয় সংঘটিত হয়।

পাল নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের অভ্যুদয়ে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই পাল রাজগণের সময়েই নালন্দা ও পাহাড়পুরে বৌদ্ধবিহার ইত্যাদি স্থাপিত হয়। কিন্তু সে সময় ব্রহ্মণ্যধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের কোনরূপ শত্রুতা প্রকাশ পায়না। ৮ম শতাব্দীর শেষে ও ৯ম শতাব্দীর প্রথমে পালবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নৃপতি ধর্মপাল ও দেবপাল এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে পাল সাম্রাজ্য প্রায় বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এক সময়ে কনোজরাজ্যও পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। কনৌজে ধর্মপাল তাঁহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পাল-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার স্থাপিত হয়। সোমপুরের বিহার ব্যতীত আরও অনেক বিহারের বিষয় বৌদ্ধ সাহিত্যে দৃষ্ট হয়—যথা অগ্রপুরের বিহার, উষ্মপুরের বিহার, গোপুরের বিহার, এতপুরের বিহার, এবং জগদ্দলের বিহার। এই সকল বিহার, অপেক্ষা পাহাড়পুরের বিহারই সমধিক প্রসিদ্ধ। পাহাড়পুরের বিহার প্রতিষ্ঠায় পাল নৃপতিগণের দান ছিল।

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল রাজগণ গুর্জরনৃপতি প্রথম ভোজরাজ ও মহেন্দ্র পালের হাতে বিশেষভাবে নিগৃহীত হন। পাহাড়পুরে মহেন্দ্র পালের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরের যে একটী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বাংলার গুর্জর আক্রমণের কিছু আভাস পাওয়া যায়। পরে আবার দশম শতাব্দীর শেষ দিকে যখন প্রথম মহীপাল দ্বিতীয় পালরাজ্য স্থাপন করেন, তখন পালবংশীয়গণের আবার সৌভাগ্য দেবতা ফিরিয়া আসে। Pag Sam Jon Zang হইতে জানা যায় যে মহীপাল একজন নৈষ্ঠিক বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি উদান্তপুরীতে (বিহারে) সহস্র সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নালন্দা ও সোমপুরে প্রতিষ্ঠিত বিহারে পূজাদির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সময় সোমপুর বিহার হইতে বীর্যেন্দ্র ভদ্র নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বোধগয়ার বৌদ্ধপীঠ দর্শনে গমন করেন এবং সেখানে কিছু কিছু দানও করিয়া আসেন। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলায় স্থাপত্য বিদ্যার কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা পাহাড়পুরের প্রধানমন্দিরের পুনর্গঠনে এবং সন্ন্যাসীগণের জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত প্রকোষ্ঠ নানারূপ আলঙ্কারিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং সত্যপীড়ের ভিটায় যে তারা মন্দির আছে তাহাতে অনেক উপাসনা স্থান নির্মিত হইয়াছিল। মহীপাল ও তাঁহার পুত্র ন্যায়পালের পর পাল রাজগণের সৌভাগ্যসূর্য আবার রাহুগ্রস্ত হয়। সেই সময় বাংলাদেশ উপর্যুপরি কয়েকবার বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। চেদিরাজ কর্ণ (মধ্য ভারতীয়), চোলরাজ রাজেন্দ্র ও জনৈক স্থানীয় কৈবর্ত সর্দার দিব্য বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। নালন্দার শিলালিপিতে বঙ্গদেশ বা পূর্ববঙ্গ হইতে যে আক্রমণের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তাহা এই সময়ে

পাহাড়পুরের আক্রমণেরই বিষয় মনে হয়। তাহার পর রামপাল আবার নিজ বংশের সৌভাগ্য-দেবীর পুনরুদ্ধার করিয়া ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে একটী স্থায়ী পাল রাজ্য স্থাপন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার শাসনভার সেনবংশীয়দের হাতে আসে। তখন পাহাড়পুরের প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছু অবনতি ঘটে।

১৩শ শতাব্দীর প্রথমেই মুসলমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। মুসলমানগণ অনতিবিলম্বেই উত্তরবঙ্গ অতিক্রম করে। সেই সময় যে পাহাড়পুরের এই বিশাল মন্দির মূর্তিপূজাবিরোধী আক্রমণকারিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। তাহার পর এখানকার মন্দির ও আশ্রম ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়। এই আশ্রমে খননকার্যের সময় সুলতানগণের এবং বাংলার স্বাধীন শাসনকর্তাগণের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই বুঝা যায় যে এই ধ্বংসস্তূপ অতি নিভৃত বলিয়া দেশের কোন গোলমালের সময় স্থানীয় লোকেরা তাহাদের অর্থাদি মূল্যবান বস্তু সেখানে নিরাপদে রাখিত। খননকার্যের দ্বারা আরও প্রতীয়মান হইয়াছে যে এইস্থানে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত লোকজনের বসবাস ছিল। সেই সময় মধ্যে মধ্যে পরিব্রাজকগণ এই স্থান পরিদর্শনের জন্য আসিতেন। মুঘল রাজত্ব সময়ে ও ইংরেজ শাসনের প্রথমে এই ভগ্নস্তূপে নানারূপ বনজঙ্গল জন্মিয়া স্থানটীকে একেবারে দুষ্প্রবেশ করিয়া তুলে। Cunningham সাহেব বলেন যে মধ্যস্থিত স্তূপ বন্যজন্তুদের বিশেষত: চিতাবাঘের আবাসস্থল ছিল। পরে নিকটস্থগ্রামবাসিগণ কর্তৃক এই স্তূপ উদ্ধারের জন্য সামান্য সামান্য কার্য আরম্ভ হয়। শেষে এই স্থানটী "প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ আইনের" আমলে আসিয়া ভারত সরকার কর্তৃক স্থানটীর উদ্ধারের জন্য খননকার্য আরম্ভ হয়।

বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মোপদেশ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্‌-এ., বি-এল্., পি-এইচ্‌-ডি.

বুদ্ধদেবের সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে নিবদ্ধ আছে। এই সূত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় মধ্যপথ। মধ্যপথ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভিন্ন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলিতে আমরা বুঝি সম্যক্‌ বিশ্বাস, সম্যক্‌ সঙ্কল্প, সম্যক্‌ বাক্য, সম্যক্‌ কার্য, সম্যক্‌ জীবন, সম্যক চেষ্টা, সম্যক্‌ স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। মধ্যপথাবলম্বীরা দুইটি অন্ত ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে :— (১) কামভোগ এবং (২) অলাভজনক কষ্টকর এবং অনুপযোগী আত্মনিগ্রহ।

দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখের নিরোধের পথ, এই চারিটী আর্য সত্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্ভুক্ত।

স্বর্গগত অধ্যাপক Rhys Davids বলেন, "ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় করা কঠিন। বৌদ্ধধর্মের সারধর্ম এই সূত্রে পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতের ধর্মাবস্থার উপর ইহার বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।"

পেটকোপদেশ নামক একটী পালি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেব তাঁহার পরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত সম্বোধিলাভের জন্য যাহা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই সূত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। পেটকোপদেশের মতে চারিটী আর্য সত্যই অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে মধ্যপথের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপথই প্রকৃত পথ; এই পথ অবলম্বন করিলে মুক্তি লাভ করা যায়।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্ভুক্ত :—সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সঙ্কল্প, সম্যক্‌ বাক্য, সম্যক্‌ কর্ম, সম্যক্‌ জীবন, সম্যক্‌ চেষ্টা, সম্যক্‌ স্মৃতি, সম্যক্‌ সমাধি, সম্যক্‌ জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি। সম্যক্‌ জ্ঞান ও সম্যক্‌ বিমুক্তি যে আর্য মার্গের অন্তর্গত তাহা সাধারণতঃ লোকেরা জানে না।

বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মোপদেশের বিষয় ধর্মচক্র না হইয়া যদি ধর্মতর্ক হইত, তাহা হইলে সুসঙ্গত হইত। যে দুইটী অন্তের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহা ব্যতীত আরও তিনটী অন্তের বুদ্ধদেব উল্লেখ করেন।

পালি মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত অরিয়পরিয়েসন সূত্রে মধ্যপথ এবং আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গের উল্লেখ নাই। দুইটী অন্তেরও উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূত্রানুসারে বুদ্ধদেব পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট নিম্নোক্তভাবে তাঁহার ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, "হে ভিক্ষুগণ! ইন্দ্রিয় সুখ পাঁচ প্রকার :—(১) যাহা চক্ষে দেখা যায়, (২) যাহা কর্ণে শোনা যায়, (৩) যাহা নাসিকায় আঘ্রাণ করা যায়, (৪) যাহা জিহ্বায় আস্বাদ পাওয়া যায় এবং (৫) যাহা শরীরে স্পর্শ করা যায়।

এইগুলি সুখকর, মনোহর, আনন্দদায়ক, এবং কামনা ও বাসনার সহিত জড়িত। যে সকল ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ অন্ধের মত লোভের বশবর্তী হইয়া অলীক সুখের দিকে ধাবমান হয়, ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করেন না, তাহারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে; কিন্তু যাহারা লোভের বশবর্তী না হইয়া ইহাদের অনুসরণ করে, ভবিষ্যৎ বিপদের কথা স্মরণ রাখে, তাহারা দুঃখের কবলে পতিত হয় না।"

বুদ্ধদেব নয়টী সমাপত্তির* বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার ধর্মোপদেশ শেষ করেন। যে কোন ব্যক্তি সমাপত্তির ধারাবাহিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারে।

বুদ্ধদেবের এই ধর্মোপদেশ অসম্পূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহাতে প্রতীত্য সমুৎপাদের উল্লেখ নাই। বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গ নামে বহু পুরাতন পালি গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহামান্য অশ্বজিৎকে বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশের সারমর্ম জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি প্রতীত্য সমুৎপাদের বিষয় উল্লেখ করেন।

অরিয়পরিয়েসন সুত্র হইতে আরও জানা যায় যে বোধিসত্ত্ব সত্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রতীত্য সমুৎপাদের বিষয় আবিষ্কার করেন। নির্বাণলাভ এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ—এই দুইটী বিষয় বুদ্ধদেবের দার্শনিক জীবনের সর্বপ্রথমে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। প্রতীত্য সমুৎপাদ বুদ্ধদেবের সর্বপ্রথম চিন্তার ধারা ছিল এবং আর্য দশমার্গই মধ্যপথ নামে খ্যাত।

* ধ্যানকে (পালি ঝান) বুঝায়।

———

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

জগৎ বলিতে কেবল আমাদের পৃথিবী বা সৌরজগৎ বা সমগ্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল বুঝায় না। ভারতীয় ঋষিদের জ্ঞানে ১৪ প্রকার ভুবনের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়াছিল। ৭টী উর্দ্ধ ভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য ; আর ৭টী অধোলোক—তল, অতল, সুতল, বিতল, রসাতল, পাতাল ও মহাতল। এই ১৪ ভুবন লইয়া একটী ব্রহ্মাণ্ড ; এইরূপ আবার কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে। আর এই সব ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিই জগৎ নামে আখ্যাত। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে ঈশ্বর চৈতন্যময়, তাঁহার মধ্য হইতে কি প্রকারে জড় জগতের সৃষ্টি হইল। ইহার উত্তর দিতে হইলে জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি দেখিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বে জড় (matter) কে পরমাণুতে (Atom) বিভক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই পরমাণুবাদ বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের মতে স্থান পায় না। বর্তমানে পরমাণুকে electron ও proton এই দুই প্রকার energy বা শক্তির সমষ্টি মাত্র বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে পরমাণু শক্তি বা energy মাত্র। আর ইহাকে চৈতন্যের একটা বিকাশ বলায় কোন দোষ হইতে পারে না।

এইবার ৬ষ্ঠ বিষয় মনস্তত্ত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে। মানবের স্থূল শরীর—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতাত্মক। সূক্ষ্ম শরীর—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার সমন্বিত। বেদান্তের 'মন' পাশ্চাত্য দর্শনের Mind নহে। বেদান্তের মতে মন জড়, ইউরোপীয় মতে মন চেতন ; এবং ইউরোপীয় দর্শন বলে মনের তিনটী ধর্ম—Thinking (চিন্তাশক্তি), Feeling (অনুভবশক্তি), ও Willing (ক্রিয়াশক্তি)। বেদান্তের মতে মন সংকল্পবিকল্পাত্মক। যেমন দূর হইতে একটা গাভী দেখিলে ইহা গাভী কি না এই যে ভাব হয় তাহা মনের ধর্ম ; বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা ; অর্থাৎ হ্যাঁ ইহা গাভী এই জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম ; এবং অনুসন্ধান চিত্তের ধর্ম বা বৃত্তি। সুতরাং মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই তিনের সংযোগ কার্যে Thinking, Feeling ও Willing হয়। আর অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহংকার (Egoism)। এই সূক্ষ্ম শরীরের পর কারণ-শরীর। মনে করুন সূক্ষ্ম শরীর যেন একটা দর্পণ বিশেষ, ইহার উপর যদি ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপ সূর্য প্রতিভাসিত হয়, তাহা হইলে যে আর একটি প্রতিফলিত সূর্য (যেমন দর্পণ হইতে দেওয়ালে পড়ে) হয় ইহাই অদ্বৈত-বাদীদের জীবাত্মা ; ইহা কারণ-শরীরান্তর্গত। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বা ইহা হইতে পৃথক কোন বস্তু নহে। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদীদের মতে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ এবং দ্বৈতবাদীদের মতে ইহা পরমাত্মা হইতে পৃথক। একটি

মানুষের সহিত অপর মানুষের বৈষম্য তাহার সূক্ষ্ম শরীরজনিত। যাহার সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার যত মার্জিত ও শুদ্ধ সে তত উন্নত। মানবের প্রত্যেক কার্য এই সূক্ষ্ম শরীরের উপর একটি সংস্কার বা ছাপ রাখিয়া যায়। এই সংস্কার সমষ্টির নাম অদৃষ্ট। আর পাপপুণ্য কর্মজনিত এই অদৃষ্টই ভবিষ্যৎ উচ্চ বা নীচ জন্মের কারণ।

এখানে বলা প্রয়োজন একটি পাপ কর্মের ফল পরবর্তী পুণ্য কর্মের ফল দ্বারা set off অর্থাৎ রহিত করা যায় না। প্রত্যেক কর্মেরই ফল পৃথক সংস্কাররূপে বর্তমান থাকিবে ও ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং পুণ্যকর্মের দ্বারা উত্তরোত্তর উচ্চলোকে জন্ম হইতে পারে, কিন্তু মুক্তি হইতে পারে না। কর্মফলের রোধ ও পরজন্ম রোধ হইতে পারে জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞানাগ্নি সব কর্মফল ভস্মীভূত করিতে পারে। মানবের মৃত্যু কেবল একটা স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থূলশরীর পরিগ্রহমাত্র। সূক্ষ্মশরীর ও তৎসহ কারণ শরীর, যতক্ষণ না নির্গুণ মুক্তিলাভ হয় ততক্ষণ বর্তমান থাকিবে। বলা প্রয়োজন যে, সগুণ মুক্তিলাভের পর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পূর্বে যে ৭টী উর্দ্ধলোকের বিষয় বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধারণতঃ স্বর্গলোক হইতে মানব পুণ্যকর্মের ফলভোগের পর পুনরায় ভূর্লোকে বা ভুবর্লোকে জন্ম পরিগ্রহণ করে; কিন্তু সত্য, তপ, জন, মহ প্রভৃতি লোক হইতে আর পুনরাগমন হয় না। বেদান্তের মতে কেবল মানব কেন জীবজন্তুরও এই প্রকার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর আছে। তবে তাহাদের সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর অত্যন্ত অচেতন অর্থাৎ উহাদের চৈতন্যশক্তি বা consciousness অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। এমন কি বৃক্ষাদিরও যে চৈতন্য আছে তাহা মনু মহারাজও বলিয়াছেন—"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ" (মনুসংহিতা) সুতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে মানব বা যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের পরস্পরে কোন প্রভেদ নাই, একই চৈতন্য বা ব্রহ্মের বিকাশমাত্র। বর্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের মতে বা বিজ্ঞানের মতে জড়বাদ ও চৈতন্যবাদের সমস্যা ও বিভাগরেখার সমাধান করিতে পারা যায় না। কিন্তু বেদান্তের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে বর্তমান প্রচলিত জড়বাদের কোন স্থান নাই। Matter বা (Atom) বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরাই একটী energy বা শক্তিরই সমষ্টি প্রমাণ করিয়াছেন। এই বিষয়গুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে শঙ্কর বেদান্তের মনস্তত্ত্ববাদ ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ববাদ অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ও ইহা সকল সমস্যার সমাধান করে। আর এই মনস্তত্ত্ববাদ জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত কর্মফলজনিত ক্রমাভিব্যক্তি (Evolution) ও ক্রমাবনতি (Involution) উভয়ই স্বীকার করে।

এইবারে ৭ম বিষয় সাধনা সম্বন্ধে সামান্য ভাবে উল্লিখিত হইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সাধনার কয়েকটী পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন—কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। নিষ্কাম (অর্থাৎ কামনা রহিত হইয়া) ও নিরহংকার (অর্থাৎ আমিত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া কর্ম করার নাম কর্মযোগ। এই প্রকারে যে কোন কর্মই করা যায়, তাহা বেদাধ্যায়নই হউক বা চণ্ডাল-বৃত্তিই হউক, তাহার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান বা ভক্তির উদয় হয়। রাজযোগ

হইতেছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধকরা, যাহাতে কোন প্রকার কামনা বা বাসনার তরঙ্গ উত্থিত না হয়; এইপ্রকার নিরুদ্ধচিত্তে জ্ঞান বা ভক্তির উদয় হয়। ভক্তিযোগ—ইহা ২ প্রকার; বৈধীভক্তি ও রাগানুগাভক্তি। নানাপ্রকার উপচার দ্বারা ও মন্ত্রদ্বারা ইষ্টদেবের পূজার নাম বৈধীভক্তি। আর ভক্ত ও ইষ্টদেবের মধ্যে একটী প্রগাঢ় অনুরাগ বা ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যে ধ্যান ও স্মরণ তাহা রাগানুগা ভক্তি। এই সম্বন্ধ ৫ প্রকারের—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। বৈধীভক্তিই গাঢ় হইলে রাগানুগাভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই ভক্তিযোগদ্বারা ইষ্টদেব লাভ বা সগুণ ব্রহ্ম লাভ হয় ও ইহার নাম সগুণ ভক্তি। নির্গুণ মুক্তি কেবল জ্ঞানমার্গ দ্বারাই সম্ভবপর হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্মযোগ ও রাজযোগ, জ্ঞান বা ভক্তিযোগের সহকারী। শঙ্করের মতে জ্ঞানমার্গের উপযোগী ভক্তির নামান্তর স্বস্বরূপের অনুসন্ধান বা আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান। এই প্রকার ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরের সহিত জীবের অভিন্নতা বোধ জন্মে। শঙ্করের মতে উপাসনা তিন প্রকার—অঙ্গাঙ্গবদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। কোন যজ্ঞের অঙ্গ বিশেষ ব্রহ্মবোধে উপাসনার নাম অঙ্গাঙ্গবদ্ধ উপাসনা। কোন বস্তু অবলম্বনে, যেমন প্রতিমায় বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাবোধ প্রতীক উপাসনা বা তটস্থ উপাসনা। আর মাত্র আত্মপ্রতীকে উপাসনার নাম অহংগ্রহ উপাসনা বা পুরুষবিদ্যা। জ্ঞানমার্গের সাধনার ৩টী সোপান—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। বেদ শাস্ত্রাদি পঠন বা শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ সমাধান করিবার নাম শ্রবণ; এই বিষয়ে বিভিন্ন মত বিশ্লেষণ কবিয়া প্রকৃত পথ বা মত নির্ধারণের নাম মনন; আর প্রকৃত পথ নির্ধারিত হইবার পর নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সেই বিষয়ে তদ্‌ভাবভাবিত হওয়ার নাম নিদিধ্যাসন। 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মহাবাক্যের এই প্রকার নিদিধ্যাসন করিতে করিতে চিত্ত তদাকার-কারিত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়।

শঙ্করের মতে জ্ঞানমার্গের সাধন ৪টী—যথা (ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (ব্রহ্মই নিত্য বস্তু ও আর সব অনিত্য এই প্রকার জ্ঞান), (খ) ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার ভোগে বিরক্তি), (গ) শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা এই ৬টী সম্পদ্ (গুণ) যুক্ত হওয়া এবং (ঘ) মুমুক্ষুত্ব—এই ৪টী প্রধান সাধন। আর নিষ্কামভাবে কর্ম করা জ্ঞানের গৌণ সাধন। অন্তরেন্দ্রিয় মন-সংযমের নাম শম; জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমের নাম দম; সকল প্রকার দুঃখ—শারীরিক ও মানসিক, সহ্য করার নাম তিতিক্ষা; বিষয় হইতে মনকে নিগৃহীত করার নাম উপরতি; গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা; মোক্ষলাভের জন্য একান্ত আগ্রহের নাম মুমুক্ষুত্ব। শঙ্করের মতে যাঁহার এই গুণগুলি আছে তিনিই বেদান্ত মার্গের সাধনের অধিকারী। এবিষয় পূর্বেই অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

এইবার ৮ম বিষয় 'মুক্তি' সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। মুক্তি মানে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ না করা ও কর্মফল ভোগ না করা। ইহা প্রধানতঃ ২ প্রকার—সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ মুক্তি ৪ প্রকার—সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য বা সার্ষ্টি। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে মানব সাধনার দ্বারা উত্তরোত্তর উর্দ্ধ্বলোকে যাইতে পারে। উর্দ্ধ্বলোকে তাহার

সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর একই থাকিবে, তবে বর্তমানের অনুরূপ স্থূলশরীর না থাকিয়া জ্যোতির্ময় স্থূল শরীরে অবস্থান করিবে। উর্দ্ধতমলোক সত্যলোক—ইহার অন্তর্গত ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক আছে। বিষ্ণুলোকে আবার গোলক ও বৈকুণ্ঠলোক আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইষ্টদেবতাদের নিত্য লীলা হইতেছে। যিনি সগুণ মুক্তি লাভ করেন তিনি এই সব লোকের মধ্যে নিজ ইষ্টদেবের লোকে অবস্থান করেন। সালোক্য মুক্তি মানে ইষ্টদেবের সহিত একই লোকে অবস্থান; সারূপ্য মুক্তি মানে ইষ্টদেবেরই ন্যায় মূর্তিতে অবস্থান; সামীপ্য মুক্তির অর্থ ইষ্টদেবের নিকটেই সর্বদা অবস্থান এবং সাযুজ্য বা সার্ষ্টি মুক্তি মানে ইষ্টদেবেরই ন্যায় ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করা। সগুণ মুক্তির এই কয়টী বিভিন্ন অবস্থা। নির্গুণ মুক্তির অর্থ সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের ধ্বংস হইয়া নির্গুণ ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়া। ইহা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভবপর হয়।

এই প্রসঙ্গে অবতারবাদ সম্বন্ধেও ২।১টী কথা বলা প্রয়োজন। অবতার শব্দের অর্থ উচ্চ লোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া মানব জন্ম পরিগ্রহ করা। সুতরাং অবতার অতি মানব-পুরুষ। ৩ প্রকারের অবতার হইতে পারে—আবেশাবতার, আংশিকাবতার ও পূর্ণাবতার। যদি কোন মানব ইহজন্মেই ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার করিয়া সগুণ মুক্তি লাভ করেন ও জীবন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করেন, ঈশ্বর তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাতে ঐশীশক্তি নিয়োজিত করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার দ্বারা জগতের উপকারার্থ অনেক কাজ করাইয়া ল'ন। এইপ্রকার মহাপুরুষকে আবেশাবতার বলে, কারণ তাঁহাতে ঐশীশক্তি আবিষ্ট হয়। কোন উর্দ্ধতম লোক হইতে ঈশ্বরের আংশিক শক্তির অধিকারী হইয়া যে মহাপুরুষ পৃথিবীতে কোন বিশেষ আদর্শ স্থাপনের জন্য বা জগতের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হ'ন তাঁহাকে আংশিক-অবতার বলে। আর যিনি এইরূপ পূর্ণ শক্তির অধিকারী হইয়া জগতে আবির্ভূত হ'ন তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ পূর্ণাবতার বলা হয়।

রামানুজ ও বেদান্তের অন্যান্য আচার্যেরা সগুণ মুক্তি পর্যন্ত ধারণা করিয়াছেন। অদ্বৈত-বাদী শঙ্কর সম্প্রদায়ই নির্গুণ মুক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ., বি. এল.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর যে ত্রিলোকপাবনী প্রেমশক্তি শান্তিপুরকে ডুবাইয়া নদীয়াকে ভাসাইয়া দাক্ষিণাত্যে, উৎকলে ও গৌড়দেশে তরঙ্গলীলা বিস্তার করিয়াছিল, সেই প্রেমশক্তি তাঁহার পরম কৃপাপাত্র শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই নরোত্তম-শাখারই অনুত্তম ফল পরমভাগবত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথের অলৌকিক শক্তিতে ও অসাধারণ প্রতিভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে এক নবযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বৃন্দারণ্যবাসী গোস্বামিগণের অপ্রকটাবস্থায় বিশ্বনাথই শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধাররূপে বৃত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজকে নানা বিপৎসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম বহুদিন হইতে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাচর্চার জন্য বিখ্যাত। এই স্থানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে কোনও প্রধান অধ্যাপক-বংশে আনুমানিক ১৫৬৮ শকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আবির্ভূত হন। বিশ্বনাথের পিতামাতার নাম জানিতে পারা যায় নাই। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম রামভদ্র, মধ্যম সহোদরের নাম রঘুনাথ, বিশ্বনাথ কনিষ্ঠ। বিশ্বনাথ বাল্যকালে স্বগৃহে অবস্থান করিয়াই ব্যাকরণ, কাব্য-অলঙ্কারাদির পাঠ শেষ করিয়া মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরবর্তী সৈয়দাবাদ নামক স্থানে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

গুরুপ্রণালী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশ-প্রাপ্ত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী মহাশয়ের একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরই গৌড়দেশে বৈষ্ণব-শাস্ত্র শুদ্ধ রসমাধুর্যগর্ভ কীর্তন ও বৈষ্ণব সদাচারের পুনঃ প্রবর্তন করেন। ইঁহাদের শাখা ও উপশাখায় পুনরায় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ১৫৩৩ শকাব্দায় কার্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে আত্মগোপন করিলে তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও তাঁহার অভিন্ন-প্রাণ শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্য ঠাকুরই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আশ্রয়-স্বরূপ পরিগণিত হন। শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার অনুরূপা পত্নী রামনারায়ণী দেবীর গর্ভে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একটী মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিন্নপ্রাণ সখা ও পরমার্থ ভ্রাতা শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্যের ঔরসে তাঁহার মূর্তিমতী ভক্তিস্বরূপা পতিব্রতা ভার্যার গর্ভে রাধাকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচরণ নামক দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণের পর কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই রামকৃষ্ণ আচার্য ঠাকুর স্বীয় সখা গঙ্গা-নারায়ণকে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে দান করেন।

যথা নরোত্তমবিলাসে—

'রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ এক প্রাণ।
দেহমাত্র ভিন্ন লোকে করে এক জ্ঞান॥
শ্রীঠাকুর চক্রবর্তী সন্তান-রহিত।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত॥
আচার্য জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষমনে।
অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে॥'

শ্রীকৃষ্ণচরণ ভক্তি-শাস্ত্রের অনুশীলনে ও সাধারণ ভক্তির আচরণে স্বকুলেরই অনুরূপ হইয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্তী বালুচরের গাম্ভিলা নামক পল্লী গঙ্গানারায়ণের নিবাসস্থান ছিল। শ্রীকৃষ্ণচরণ শ্রীমদনমোহন নামক শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা প্রবর্তন করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার স্তবামৃতলহরীর পরমগুরু প্রভু বরাষ্টকে বলিতেছেন—

'স্থিতিঃ সুরসরিত্তটে মদনমোহনো জীবনম্।
স্পৃহা রসিক-সঙ্গমে চতুরিমা জনোদ্ধারণে॥
ঘৃণা বিষয়িষু ক্ষমা ঝটিতি যস্য চানু-ব্রজে।
স কৃষ্ণচরণপ্রভুঃ প্রদিশতু স্বপাদামৃতম্॥'

'গঙ্গাতীরে যাঁহার স্থিতি, মদনমোহনই যাঁহার জীবন, রসিক ভক্তগণের সঙ্গলাভই যাঁহার ইচ্ছা, পতিতজনের উদ্ধার-বিষয়ে যাঁহার পটুতা, বিষয়িগণে যাঁহার করুণা এবং অনুগত ব্যক্তির প্রতি যিনি অতি শীঘ্র ক্ষমাশীল, সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ আমাকে স্বপাদামৃত-দানে অনুমতি প্রদান করুন।' শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর উপযুক্ত পুত্র শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী। ইনিও শাস্ত্রজ্ঞানে প্রবীণ, পরম ভক্ত এবং অতিশয় উদার-স্বভাব ছিলেন। ইনি সৈয়দাবাদে বাস করিয়া উপযুক্ত শিষ্যগণকে শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইতেন। বৃদ্ধবয়সে ইঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীধাম বৃন্দাবন আশ্রয় করিলে ইনিই শ্রীমদনমোহনের সেবাভার গ্রহণ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীভাগবতাধ্যয়নকালে ইঁহারই গুণে বিমোহিত হইয়া ইঁহারই শ্রীপদাশ্রয় করেন। কেহ কেহ শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্যকে, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী মহাশয়কে গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয় "স্তবামৃত-লহরী" নামক গ্রন্থে "শ্রীগুরুচরণ-স্মরণাষ্টকম্" স্তবে শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীকেই স্বীয় গুরুনামে অভিহিত করিয়া স্তব করিয়াছেন এবং "শ্রীপরমগুরু-প্রভুবরাষ্টকম্" নামক স্তবে শ্রীল কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীকে পরমগুরু বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন।

অধ্যয়ন ও শাস্ত্রপ্রচার

শ্রীভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিবার পর ইনি সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন ও গুরুকুলে বাস করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার ও টীকাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গৌড়দেশে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা ক্রমেই হ্রাস

হইয়া আসিতেছিল এবং তৎকালে সাধারণ শ্রেণীর বৈষ্ণবগণও শ্রীল গোস্বামিপাদগণের প্রকাশিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের আলোচনায় সমর্থ হইতে ছিলেন না। কিন্তু গৌড়ীয় কুলচূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিখিল ভক্তি-শাস্ত্র সিদ্ধান্তের সার সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাদয়ালু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষায় প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রচার করিয়া বৈষ্ণবগণের সাধনবর্ত্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা যাহাতে অপসিদ্ধান্ত-দুষ্ট না হয় তজ্জন্য ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। যাঁহারা শ্রীহরি-ভজনে একান্ত আগ্রহশীল, অথচ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অধিকার না থাকায় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ও শ্রীলঘুভাগবতামৃত এই অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থত্রয় পাঠ করিতে বা সম্যক্ আলোচনা করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের জন্য তিনি এই তিন গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ' ও 'শ্রীভাগবতামৃতকণা' নামে সংগ্রহ করিয়া ঐ সময়ে প্রচার করেন। অনন্তর তিনি সারার্থবর্ষিণী নামক শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার টীকা, সুখবর্তিনী নামে আনন্দচম্পু-কাব্যের টীকা, আনন্দচন্দ্রিকা নামে উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, বিদগ্ধমাধবের টীকা, গোপালতাপনীর টীকা এবং সুবোধিনী নাম্নী অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকা প্রকাশ করেন। কোন্ সময়ে এই পুস্তকের টীকা রচনা আরম্ভ হয় এবং কোন্ সময়ে শেষ হয় তাহা সম্পূর্ণ নির্দেশ করা না গেলেও সৈয়দাবাদ বাসকালেই যে উক্ত গ্রন্থাবলীর টীকা রচিত হয় এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কারণ উহার মধ্যে বহু টীকাতেই সৈয়দাবাদ-নিবাসী 'শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণা' অর্থাৎ সৈয়দাবাদ-নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মা কর্তৃক রচিত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ইহার পরেই শ্রীল চক্রবর্তী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। ঐ সময়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবনের নানাস্থানে অবস্থান করিতেন এবং ঐ সময় স্বসম্প্রদায়-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি শ্রীভাগবতের সারার্থদর্শিনী নাম্নী টীকা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার কৃত তৃতীয় স্কন্ধের টীকা শেষ হইবার সময় তিনি যমুনাতটে বাস করিতেছিলেন একথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬২৬ শকাব্দে সারার্থ-দর্শিনী টীকার রচনা শেষ হয়।

বিশ্বনাথ বৃন্দাবন গমন করিবার পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনের পূর্বসম্পদ ও শ্রীর অপহ্নুতি ঘটিয়াছিল। শ্রীল গোস্বামিপাদগণের তিরোভাবের সঙ্গেই অপ্রাকৃত শ্রীধাম আপনার মহিমা ও সৌন্দর্যগোপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের প্রিয়-শিষ্যমণ্ডলীরও ক্রমশঃ তিরোভাব ঘটিতেছিল। স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবিগ্রহসকলও যবনের অত্যাচারের ছলে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিতে ছিলেন। অনুমান ১৫৯২ শকাব্দে মোগল সম্রাট্ অওরঙ্গজেব সসৈন্যে মথুরায় আগমন করিয়া বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত শ্রীশ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির ধ্বংস করেন। শ্রীধামের পূজারিগণ বৃন্দাবন, গোকুল, মহাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীবিগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। বৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া শ্রীগোপীনাথ, মদনমোহন, গোবিন্দ, রাধাবিনোদ, রাধা দামোদর প্রভৃতি চলিয়া গিয়াছিলেন, মথুরা হইতে শ্রীকেশবদেবকে উদয়পুরে নাথদ্বারে রক্ষা করা হইল।

যেস্থানে কল্পদ্রুম-মূলে রত্নাগার সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তি শোভা পাইত সেই শ্রীগোবিন্দদেবের অপূর্ব শোভাশালী শ্রীমন্দির ভগ্ন হইল। শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাবও ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছিল। বিশ্বনাথ শ্রীবৃন্দাবনের এই অবস্থা দেখিয়া স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে অসাধারণ প্রতিভাশালী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কার্যের সহায়তা করেন। বলদেব ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয়ের আনুগত্য করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রে সহজেই অধিকার লাভ করিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ বলদেবের সহায়ে ব্রজমণ্ডলে অধ্যাপনাদি দ্বারা গোস্বামিশাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। বৃন্দাবনধামে পুনরায় ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ায় দলে দলে বিভক্ত ছাত্রগণ বৃন্দাবনে সমাগত হইতে লাগিল। বিশ্বনাথ পুনরায় একবার গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশেও তাঁহার শিষ্য ছিল। 'ভক্তি-রত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাসের' গ্রন্থকার নরহরি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে স্বীয় পরিচয় প্রদান-স্থলে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রেঙ্গাপুর গ্রাম নিবাসী স্বীয় পিতৃদেব জগন্নাথকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অল্পকাল মধ্যেই চক্রবর্তী মহাশয় পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে তিনি স্থায়ীভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন। ঐ সময়ের একটী বিশেষ ঘটনার কথা তিনি স্বীয় 'মন্ত্রার্থ-দীপিকায়' উল্লেখ করিয়াছেন। কামগায়ত্রীর অর্থ পর্যালোচনা করিবার সময়ে তিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের—

'কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর তায় হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥

এই পদ্যটীর প্রমাণ কামগায়ত্রী যে কিরূপে চতুর্বিংশ অক্ষর এবং অর্ধাক্ষরে গঠিত তাহা বুঝিতে পারেন না। কি করিয়া যে অর্ধাক্ষরের অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ব্যাকরণ, পুরাণ, তন্ত্র, নাট্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও তিনি উহাতে অর্ধাক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু ঐ সকল শাস্ত্রেই স্বর-ব্যঞ্জন ভেদে পঞ্চাশৎ অক্ষরের উল্লেখ আছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞাপাদেও স্বর-ব্যঞ্জনাদিভেদেও পঞ্চাশদ্ বর্ণের উল্লেখ আছে। মাতৃকান্যাসাদিতেও মাতৃকারূপের ধ্যানে কুত্রাপি অর্ধাক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু বৃহন্নারদীয় পুরাণে—শ্রীরাধিকার সহস্রনাম স্তোত্রে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধাকে পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিনী বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, কবিরাজ গোস্বামীর কি ভ্রম হইল? কিন্তু তাহাও ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ-রহিত সর্বজ্ঞ। যদি "খণ্ড-ত (ৎ) কে" অর্ধবর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ক্রমভঙ্গদোষে দোষী হন।

কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন—

সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণবপুঃ সিংহাসনে, বসি রাজ্য-শাসনে
ক'রে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্শন,
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহার চন্দন বিন্দু
সেই এক পূর্ণ চন্দ্র মানি ॥
কর নখ চাঁদের হাট বংশীর উপায় করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদ নখ চন্দ্রগণ তলে করে সুনর্ত্তন
যার ধ্বনি নূপুরের গান"

উদ্ধৃত বর্ণনার প্রথমে কৃষ্ণমুখ—একচন্দ্র, তাহার পর দুই গণ্ড দুই চন্দ্র তাহার পর চন্দন-বিন্দুপূর্ণচন্দ্র—চন্দ্রবিন্দুর নিম্নস্থ যে ললাট ভাগকে অষ্টমীর ইন্দু বা অর্দ্ধচন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চমাক্ষরই অর্দ্ধাক্ষর হইবার কথা, কিন্তু খণ্ড-ত (ৎ) কে অর্দ্ধাক্ষর ধরিলে, শেষাক্ষরই অর্দ্ধাক্ষর হয়—পঞ্চমাক্ষর হয় না। বিশ্বনাথ এই প্রকার সন্দেহে আকুল হইয়া ভাবিলেন, যদি মন্ত্রাক্ষর গোচর না হয় তবে দেবতাও গোচরীভূত হন না, অতএব উপাস্য দেবতার সাক্ষাৎ না ঘটিলে দেহত্যাগই আমার কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া মনোদুঃখে দেহত্যাগ-অভিলাষে রাধাকুণ্ডতটে নিপতিত হইলেন। ঐরূপ সঙ্কল্পের পর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে তাঁহার তন্দ্রা উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—'হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উঠ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকলই সত্য। তিনি নর্ম-সহচরী, তিনি আমার অনুগ্রহে আমার অন্তঃকরণের সকল ভাবই অবগত আছেন। তাঁহার বাক্যে তুমি কোনরূপ সন্দেহ করিও না। কামগায়ত্রীই আমার উপাসনা মন্ত্র, আমিও মন্ত্রাক্ষর দ্বারে ভক্তের নিকট প্রকাশিত হই। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে সমর্থ নহে। "বর্ণাগমভাস্বৎ" নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে এবং যাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তুমি তাহা শ্রবণ কর, তদনন্তর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া সকলের উপকার সাধনার্থ ইহার প্রমাণ সংগ্রহ কর।"

স্বয়ং বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া চেতনা লাভ করতঃ বিশ্বনাথ শীঘ্র উত্থিত হইলেন এবং হা রাধে—রাধে বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে হৃদয়ে শ্রীরাধিকার আদেশ বাণী ধারণ করিয়া তাহার পালনে যত্নবান হইলেন। অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয়বিষয়ে

শ্রীরাধিকা যাহা বলিলেন তাহাতে যে ষ কারের পর "বি" অক্ষর আছে—সেই ষ কারই অর্ধাক্ষর, তদ্ভিন্ন পূর্ণাক্ষর পূর্ণচন্দ্র।"

শ্রীরাধিকার কৃপায় মন্ত্রার্থ গোচর হওয়ায় বিশ্বনাথ ইষ্টদেব সাক্ষাৎ করিয়া সিদ্ধদেহে নিত্যলীলার পরিকরভুক্ত হইলেন। এই সময় তিনি রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগোকুলানন্দ নামক শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এখন হইতে প্রধান শিষ্য বলদেবই শিষ্যগণকে অধ্যাপনা করাইতেন। শ্রীবিশ্বনাথ অন্তর্দশায় ও অর্ধবাহ্যদশায় ভজনানন্দে অধিকাংশ কাল যাপন করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোস্বামিপাদগণের প্রভাব কিঞ্চিৎ লোপ পাইবার পরই স্বকীয়া পরকীয়া বাদ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। বিশ্বনাথ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াও পশ্চিমাঞ্চলের বৈষ্ণবগণের স্বকীয়াবাদের ভ্রম নিরসন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন-মানসে 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা' 'গোপীপ্রেমামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করেন। কিন্তু উহাতেও সমস্ত গণ্ডগোলের মীমাংসা হয় নাই। বিরুদ্ধপক্ষীয় বৈষ্ণবগণ অম্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহকে বুঝাইলেন যে, শ্রীগোবিন্দ-দেবের সহিত শ্রীরাধিকার পূজা শাস্ত্রসম্মত নহে, কারণ ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধিকার নাম দৃষ্ট হয় না। রাজা অগত্যা শ্রীমতী রাধিকার মূর্তি পৃথক্ গৃহে রাখিয়া তাঁহার স্বতন্ত্র পূজার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ তখন ইহার প্রতীকারের জন্য শ্রীবিশ্ব-নাথের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বনাথের আদেশে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরে গমন করিয়া স্বকীয়বাদী বৈষ্ণবদিগকে পরাস্ত করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের একসঙ্গে সেবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। জয়পুরের গল্তায়ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের বেদান্তের কোনও ভাষ্য নাই, অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে তত্রত্য গোবিন্দদেবের সেবাধিকারী করা উচিত নহে বলিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের বিবাদ হয়। তখন শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয় অতীব প্রাচীন এবং তখন অধিকাংশ সময়ই তিনি ভজনানন্দে অর্ধবাহ্য ও অন্তর্দশায় অবস্থান করিতেছেন। তখন তাঁহার চলিবার শক্তিও ছিল না। তখন তাঁহারই আদেশে আবার তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গল্তায় গমন করিয়া শাস্ত্রবিচারে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া তথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবাধিকার রক্ষা করিয়া আসেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সময় শ্রীল চক্রবর্তীপাদের আদেশে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অত্যল্প কালেরই মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য নামক সুপ্রসিদ্ধ মাধ্বগৌড়ীয় ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু একথা কতদূর প্রমাণসহ তাহা এ পর্যন্ত জানা যায় নাই; ভাগবত এই ব্রহ্মসূত্রের সূত্র-কার নির্মিত ভাষ্য, এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বমত স্থাপনের জন্য কোনও পৃথক্ ভাষ্যের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এক্ষণে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও শ্রীভাগবতের স্ব স্ব মতানুযায়ী টীকা প্রণয়ন করিয়া উক্ত গ্রন্থকে স্বমতানুসারী প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হওয়ায়, তাৎকালিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মসূত্রের একটী পৃথক্ ভাষ্যের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই শ্রীল চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্মতিক্রমেই যে বলদেব বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বিশ্বনাথ বেশাশ্রয় করিয়াছিলেন বা ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বেশাশ্রয়ের নাম হরিবল্লভ। কিন্তু আমরা এ কথার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। পরন্তু বিশ্বনাথ শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামেই স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তবে যখন তিনি কীর্তনের পদ-রচনা করিতেন, তখন ঐ পদে তিনি হরিবল্লভ নাম ব্যবহার করিতেন। ভক্তিরত্নাকরের গ্রন্থকার নরহরি পদ-রচনায় ঘনশ্যাম নাম ব্যবহার করিতেন, পদ-রচনায় এরূপ নামান্তর গ্রহণের প্রথা অন্যত্রও দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বনাথ পদ-রচনা কালে এরূপ নামান্তর গ্রহণ করিতেন। তিনি "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি" নামক যে পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহা প্রমাণিত হয়। কাহারও মতে হরিবল্লভই বিশ্বনাথের নামান্তর। ফলতঃ তিনি আধুনিক বৈষ্ণবগণের ন্যায় ভেক বা বেশ গ্রহণ করেন নাই। ইহাই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা।

বিশ্বনাথ যে ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় বিস্মিত হইতে হয়, তাঁহার এই অসাধারণ কার্যের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবপ্রধানগণ কর্তৃক তখন তাঁহার নামের একটী ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল যথা—

'বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্যাখ্যায়াভবৎ ॥'

অর্থাৎ "সকলকে (ভক্তশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথ মহাদেবের ন্যায়) ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম বিশ্বনাথ এবং ভক্ত-মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় ইনি চক্রবর্তী।" ফলতঃ এই ব্যাখ্যা যে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও অতিরঞ্জিত হয় নাই ইহা তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজের ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। তিনি অনুমান ৮০ বর্ষ বয়সে মাঘী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে অন্তর্দশার অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন।

মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কালবশে তাঁহার বহু গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, আমরা অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার কোনও কোনও গ্রন্থের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। যতদূর অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি তদনুসারে আমরা তৎকৃত গ্রন্থাবলীর একটী তালিকা প্রদান করিলাম, ইহাতে কোনও ভ্রম দৃষ্ট হইলে অভিজ্ঞ ভক্তমণ্ডলী অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

(ক) টীকাগ্রন্থাবলী—

১। সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা)   ২। সারার্থবর্ষিণী (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা)
৩। আনন্দচন্দ্রিকা (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকা)   ৪। সুখবর্তিনী (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূকাব্যের টীকা)
৫। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কৃত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা
৬। শ্রীঠাকুর মহাশয় কৃত প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার সংস্কৃত টীকা
৭। বিদগ্ধমাধবের টীকা   ৮। সুবোধিনী (অলঙ্কার কৌস্তুভের টীকা)

৯। গোপাল তাপনীর টীকা।

(খ) সংগ্রহ-গ্রন্থাবলী—

১০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিন্দু

১১। উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ

১২। ভগবতামৃতকণা

১৩। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি

(গ) মূল প্রবন্ধাবলী—

১৪। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত

১৫। চমৎকার-চন্দ্রিকা

১৬। গোপীপ্রেমামৃত

১৭। স্তবামৃতলহরী

১৮। প্রেমসম্পুট

১৯। গৌরাঙ্গলীলামৃত

২০। স্বপ্নবিলাসামৃত

২১। সাধ্যসাধনকৌমুদী

২২। মন্ত্রার্থদীপিকা

২৩। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

২৪। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম

২৫। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা

২৬। ঐশ্বর্য কাদম্বিনী *

২৭। মাধুর্যকাদম্বিনী

২৮। বৈষ্ণবভাগবতামৃত

---

* আমরা বহু দিন অনুসন্ধান করিয়াও "ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী" গ্রন্থখানি পাই নাই। যদি কাহারও নিকট ঐ গ্রন্থ থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া লেখকের নিকট জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব —প্রবন্ধ-লেখক।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

শিল্প-শাস্ত্র

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ, বি. এল্.

প্রাচীন ভারত শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যায় যে কত উন্নত ছিল তাহা বোধ হয় অনেকে সম্যক্ অবগত নহেন। এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কথিত আছে দেব বিশ্বকর্ম্মাই এই শাস্ত্রের আদিগুরু। মানসারে লিখিত আছে ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে বিশ্বকর্ম্মা, ময়, ত্বস্তার এবং মনু এই ৪ জন শিল্পকারের উদ্ভব হয় এবং ইহাদের ৪ পুত্র স্থপতি, সূত্রগ্রাহী, বর্দ্ধকী ও তক্ষক হইতে জগতে ৪ প্রকার শিল্পকার-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের শিল্পী এবং তিনি ১হাজার প্রকার শিল্পবিদ্যার উদ্ভবকর্ত্তা।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন ও এ বিষয়ের গ্রন্থাদি অধিকাংশই বিলুপ্ত। বর্ত্তমানে গুহা ও অন্যান্য স্থানে যে সব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় ইহার অধিকাংশই বৌদ্ধ-যুগের। মানবের যে সৌন্দর্য বোধ ও অনুরাগ তাহারই স্ফুরণ এই শিল্প বিদ্যার মধ্যদিয়া। আর ভারতের এই বিদ্যা ধর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। শুধু ভারতের কেন প্রাচীন মিশর, এসিরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেরও শিল্প বিদ্যার ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈন ধর্ম্ম এই ৩টী আর্য ধর্ম্মই ভারতের এই বিদ্যাকে এত সমৃদ্ধ করিয়াছে। সারনাথ, সাঞ্চি, বারহুত প্রভৃতি স্থানের স্থাপত্য বৌদ্ধযুগেরই নিদর্শন। গান্ধার দেশীয় স্থাপত্য বিদ্যায় অনেকে গ্রীকদের প্রভাব অনুমান করেন। হইতে পারে তদানীন্তন কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া গ্রীকভাস্কর্যের নিদর্শন ভারতে আনীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে যে সব শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় সে গুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি যথা—(ক) বাস্তুশাস্ত্র (খ) শিল্পশাস্ত্র (গ) চিত্র শাস্ত্র। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই লুপ্ত। যাহা বর্ত্তমানে পাওয়া যায় ইহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটী প্রাচীন ও অধিকাংশ গুপ্তযুগের ও পরবর্তী যুগের। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে ইহারা লিপিবদ্ধ। তবে ইহাদের উপাদান প্রাচীন লুপ্ত পুঁথি হইতেই সংগৃহীত।

(ক) বাস্তুশাস্ত্র বা স্থাপত্য বিদ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়—

(১) বাস্তুবিদ্যা—ইহা মহামহোপাধ্যায় টি, গণপতি শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ত্রিবাঙ্কুর সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই এবং তিনি দেব বিশ্বকর্ম্মা কৃত লুপ্ত গ্রন্থের উপাদান হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন বলেন। ইহা ১৬টী অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহার মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ, বেদী নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু বিষয় আছে।

(২) মনুষ্যালয় চন্দ্রিকা—ইহা ৭টী অধ্যায়ে বিভক্ত ও মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ত্রিবাঙ্কুর সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৩) ময়মটম্—ইহাও পূর্বোক্ত পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত। ইহা দৈত্যগুরু ময় কর্তৃক লিখিত এবং ৩৪টী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে গ্রামনির্মাণ, নগরনির্মাণ, রাজপ্রাসাদনির্মাণ প্রভৃতি বহুবিষয় আছে। স্থাপত্য বিদ্যার ইহা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।

(৪) শিল্পরত্নম্—ইহাও পূর্বোক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার ২টী খণ্ড—১ম খণ্ড ৪৬ অধ্যায়ে ও ২য় খণ্ড ৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে ১ম খণ্ডই প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) যুক্তিকল্পতরু—ইহা ঈশ্বর চন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা ওরিয়েন্টাল্ সিরিজে প্রকাশিত।

(৬) বৃহৎ সংহিতা—বরাহমিহির কৃত। ইহা অবশ্য ১ খানি জ্যোতিষগ্রন্থ; কিন্তু ইহার ৫৩ ও ৫৬ অধ্যায়ে বাস্তুবিদ্যা ও প্রাসাদলক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।

(৭) বিশ্বকর্মপ্রকাশম্—ইহা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত; বিশ্বকর্মা ইহার প্রণেতা বলিয়া কথিত।

(৮) সমরাঙ্গণ সূত্রধার—রাজা ভোজদেব ইহার প্রণেতা, এবং মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও গায়কোবাড্ ওরিয়েন্টাল্ সিরিজে ২খণ্ডে প্রকাশিত। বিশ্বকর্মা তাঁহার পুত্রদের বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়াছেন তাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। তদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে বিমান যন্ত্র প্রভৃতি বহু যন্ত্র নির্মাণ প্রণালীও আছে।

(৯) মানসার—ইহা মানসার নামক ঋষি কর্তৃক প্রণীত এবং এবিষয়ের একটি প্রধান গ্রন্থ। ইহা ডক্টর পি. কে. আচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরেজীতে অনুদিত হইয়াছে।

(১০) কতকগুলি পুরাণগ্রন্থ—উপরিলিখিত ৯টী গ্রন্থ ব্যতীত কতকগুলি পুরাণে যেমন মৎস্যপুরাণ (২৫২-৮ অধ্যায়) অগ্নিপুরাণ (১০৪ অধ্যায়), গরুড় পুরাণ (৪৬-৭ অধ্যায়), নারদপুরাণ (১৩ অঃ), ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (৭ অঃ), ভবিষ্যপুরাণ (১২, ১৩০-২ অঃ), লিঙ্গপুরাণ (২য় খঃ ৪৮ অঃ), বায়ুপুরাণ (১ম খঃ ৩৯ অঃ) স্কন্দপুরাণ (২৪।২৫ অঃ) প্রভৃতিতে এই বিদ্যা-বিষয়ক বহুতথ্য সংগ্রথিত আছে।

(খ) শিল্প শাস্ত্র বা ভাস্কর-বিদ্যা। মাত্র নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রকাশিত গ্রন্থের কোন কোন অধ্যায়ে এ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। বলাবাহুল্য সাধারণতঃ দেবদেবীর প্রতিমা বা মূর্তি তৈয়ারী প্রণালীই উহাতে আছে—

(১) বৃহৎ সংহিতার (বরাহ মিহির কৃত) ৫৮ অধ্যায়। (২) শুক্রনীতির (শুক্রাচার্য কৃত) ৪র্থ অধ্যায়। (৩) বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের ৩য় খণ্ড। (৪) মৎস্যপুরাণের ২৫৯ অধ্যায় (৫) অগ্নিপুরাণের ৪৯ অধ্যায়। (৬) কাশ্যপ শিল্পম্—এ বিষয়ের এই খানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত। ইহা ৮৮ পটলে বিভক্ত। (৭) প্রতিমামাণলক্ষণম্—ইহা অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও লাহোর হইতে প্রকাশিত।

এতদ্ব্যতীত এ বিষয়ে নিম্নলিখিত অপ্রকাশিত গ্রন্থের পুঁথি আছে—

(১) মার্কণ্ডেয় মত বাস্তু শাস্ত্র—ইহার অসম্পূর্ণ পুঁথি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে।

(২) ময়বাস্তু বা ময়মতাগমঃ—ইহা মান্দ্রাজ হইতে তেলেগু অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসুর Principles of Indian Silpa Sastra এর মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) প্রতিমামান লক্ষণম্ বা আত্রেয় তিলক—ইহা মহর্ষি আত্রেয় কর্তৃক প্রণীত।

(৪) দশতালন্যগ্রোধ প্রতিমামণ্ডল-বুদ্ধ-প্রতিমালক্ষণম্।

(৫) সম্যক্ সম্বুদ্ধভাসিত প্রতিমালক্ষণ বিবরণনাম। উপরোক্ত (৩-৫ সংখ্যক) পুঁথি নেপাল দরবারে আছে এবং ইহাদের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদও আছে।

(৬) প্রতিমালক্ষণ বিধানম্—ইহা মালয় অক্ষরে লিখিত।

(৭) প্রতিমাদ্রব্যাদিবচন—(Oppert's List). (৮) তারালক্ষণ (Auf. Cat). (৯) বিম্বমান (British Museum) (১০) মূর্তিধ্যান (Auf.) (১১) মূর্তিলক্ষণ (Auf.) (১২) লক্ষণ সমুচ্চয় (Auf.) (১৩) শিল্পসার (১৪) সকলাধিকার—অগস্ত্যকৃত।

(গ) চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে সামান্য গ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যায়—

(১) চিত্রলক্ষণম্ নামক ১ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া যায়। ইহা জার্মান ভাষাতে অনূদিত হইয়াছে। (২) বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ এর একটী অধ্যায় চিত্রসূত্র বিষয়ক। (৩) পূর্বোল্লিখিত [ক (৪)] শিল্পরত্নম্ এর শেষ অধ্যায় চিত্রবিদ্যা বিষয়ক। (৪) চিত্রসূত্রম্ (Auf. Cat. Pt. I) (৫) চিত্রপট (Oppert's. List.) (৬) চিত্রকর্মশিল্পশাস্ত্র (Auf. Cat.)

ময়মতাগমঃ গ্রন্থে বহু প্রাচীন গ্রন্থকারের যেমন গার্গেয়, মারীচ, আত্রেয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহাদের গ্রন্থ সম্ভবতঃ লুপ্ত।

(ক) বাস্তুশাস্ত্র বিষয়ের আরও কতকগুলি অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে যথা—

(১১) অঙ্কশাস্ত্র (Vide Oppert's List. vol. I. 2499) (১২) অপরাজিত পৃচ্ছা—ভুবনদেব কৃত (Aufrecht Cat. Cat.) (১৩) অপরাজিত বাস্তুশাস্ত্র—বিশ্বকর্মাকৃত (সুরাটে প্রাপ্তব্য) (১৪) অভিলাষিতার্থ চিন্তামণি—মল্ল সোমেশ্বর কৃত (Taylor's Cat.) (১৫) অংশুমৎ (কাশ্যপীয়) (Taylor's Cat) (১৬) অংশুমানকল্প (Auf. Cat.) (১৭) ২৮টী মহাগমের মধ্যে ৫টী মহাগমে স্থাপত্যবিদ্যাবিষয়ক বহুতথ্য আছে—অংশুমৎ ভেদাগম, কামিকাগম, কারণাগম, বৈখানসাগম, ও সুপ্রভেদাগম। (১৮) অগস্ত্য-সকলাধিকার (Aufrecht Cat.) (১৯) আগার বিনোদ (২০) আয়তত্ত্ব—মণ্ডনসূত্রধার কৃত (২১) আয়াদিলক্ষণ (Aufrecht) (২২) আরামাদি প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি (Aufrecht) (২৩) কূপাদি জলস্থানলক্ষণ (Oppert's List.) (২৪) কৌতুকলক্ষণ (Oppert's List.) (২৫) ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা (২৬) ক্ষীরার্ণব—বিশ্বকর্মাকৃত (Aufrecht) (২৭) ক্ষেত্রনির্মাণ বিধি (Oppert's List.) (২৮) গার্গ সংহিতা (Trinity College Libr.) (২৯) গৃহনিরূপণ সংক্ষেপ (Auf. Cat.) (৩০) গৃহনির্মাণবিধি (৩১) গৃহপিঠিকা Oppert's List. (৩২) গৃহবাস্তু প্রদীপ—ইহা সম্ভবতঃ লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩৩) গোপুর বিমানাদি লক্ষণ (Oppert's List.) (৩৪) ঘট্টোৎসর্গ সুচনিকা (Auf. Cat.) (৩৫) চক্রশাস্ত্র (Oppert's List.) (৩৬) জয়মাধব মানসোল্লাস—জয়সিংহদেব কৃত (Auf. Cat.) (৩৭) জালার্গল—বরাহমিহির কৃত (Oppert's List.) (৩৮) জালার্গল যন্ত্র—(Oppert's List.) (৩৯) জ্ঞানরত্নকোষ — বিশ্বকর্মকৃত (Auf. Cat.) (৪০) পীঠ-লক্ষণ (Oppert's List.) (৪১) প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব বা ময়সংগ্রহ (Auf. Cat.) (৪২) প্রতিষ্ঠা তন্ত্র (Auf. Cat.) (৪৩) প্রাসাদকল্প (Oppert's List.) (৪৪) প্রাসাদ কীর্তন (৪৫) প্রাসাদ দীপিকা (Auf.) (৪৬) প্রাসাদ মণ্ডন বাস্তুশাস্ত্র (৪৭) প্রাসাদ লক্ষণ—বরাহমিহির কৃত (Oppert's List.) (৪৮) প্রাসাদালংকার লক্ষণ (Oppert's List.) (৪৯) মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব—রঘুনন্দনকৃত (৫০) মনুষ্যালয় লক্ষণ (Oppert's List.) (৫১) মন্ত্রদীপিকা (৫২-৫৭) ময়রচিত ময়মটম্ (ইহার বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) ব্যতীত ইঁহার রচিত অন্যান্যগ্রন্থ—ময়মটশিল্পশাস্ত্রবিধান, ময়-শিল্পশতিক, ময়শিল্প, ময়বাস্তু, ময়বাস্তুশাস্ত্রম্, ময়মটবাস্তুশাস্ত্রম্ (৫৮) মানকথন (Oppert's List.) (৫৯) মানব-বাস্তু লক্ষণ (৬০) মানসোল্লাস (৬১) মানসোল্লাস-বৃত্তান্তপ্রকাশ (৬২) মূলস্তম্ভনির্ণয় (৬৩) রত্নদীপিকা (৬৪) রত্নমালা (৬৫) রাজগৃহনির্মাণ (৬৬) রূপমণ্ডল (৬৭) বলিপীঠলক্ষণ (৬৮) বাস্তুচক্র (৬৯) বাস্তুতত্ত্ব (৭০) বাস্তুনির্ণয় (৭১) বাস্তুপুরুষলক্ষণ (৭২) বাস্তুপ্রকাশ (৭৩) বাস্তুপ্রদীপ (৭৪) বাস্তুপ্রবন্ধ (৭৫) বাস্তুমঞ্জরী (৭৬) বাস্তুমণ্ডল (৭৭) বাস্তু-যোগতত্ত্ব (৭৮) বাস্তুরত্নাবলী (৭৯) বাস্তুরাজবল্লভ (৮০) বাস্তুলক্ষণ (৮১) বাস্তুবিচার (৮২) বাস্তুবিধি (৮৩) বাস্তুশাস্ত্র—সনৎকুমার কৃত (৮৪) বাস্তুশাস্ত্র, রাজবল্লভ মণ্ডন এবং ভূপতিবল্লভ কৃত (৮৫) বাস্তু-শিরোমণি (৮৬) বাস্তুসমুচ্চয় (৮৭) বাস্তুসংখ্যা (৮৮) বাস্তুসংগ্রহ (৮৯) বাস্তুসংগ্রহমু (৯০) বাস্তুসর্বস্ব (৯১) বাস্তুসার (৯২) বাস্তুসারণি—ইহা ১৪খানি গ্রন্থ হইতে সংকলিত। (৯৩) বাস্তুসারসর্বস্ব-সংগ্রহ (৯৪) বিমান লক্ষণ (৯৫) বিশ্বকর্মমত (৯৬) বিশ্বকর্মাজ্ঞান (৯৭) বিশ্বকর্মাপুরাণ (৯৮) বিশ্বকর্মাপ্রকাশ (৯৯) বিশ্বকর্মাসম্প্রদায় (১০০) বিশ্বকর্মাশিল্পশাস্ত্র (১০১) বিশ্ব-বিদ্যাভরণ (১০২) বৈখানস (১০৩) বৈখানসাগম (১০৪) শাস্ত্রজলধিরত্ন (১০৫) শিল্পকলাদীপিকা (১০৬) শিল্পগ্রন্থ (১০৭) শিল্পদীপিকা (১০৮) শিল্পনিঘণ্টু (১০৯) শিল্পলেখা (১১০-১১) শিল্পশাস্ত্র—কাশ্যপ ও অগস্ত্যকৃত (১১২) শিল্প-শাস্ত্র সারসংগ্রহ (১১৩) শিল্প সর্বস্ব সংগ্রহ (১১৪) শিল্প সংগ্রহ (১১৫) শিল্পার্থ শাস্ত্র (১১৬) শিল্পী শাস্ত্র (১১৭) যড়বিদিক সন্ধান (১১৮) সনৎ কুমার বাস্তুশাস্ত্র (১১৯) সর্ববিহারীয়যন্ত্র (১২০) সংগ্রহ শিরোমণি—ইহা বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি কৃত লুপ্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত (১২১) সারস্বতীয় শিল্পশাস্ত্র।

উপরে সংক্ষেপে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের একটি সাধারণ তালিকা প্রদত্ত হইল। দেখা যায় ইহাদের অধিকাংশই অপ্রকাশিত। এই তালিকা Dr. P. K. Acharya কৃত A Dictionary of Hindu Achitecture, Prof. P. N. Bose কৃত Silpa Sastra, Principles of Indian Silpa Sastra প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে বাংলার এই ২জন ও ত্রিবাঙ্কুরের মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী যথেষ্ট গবেষণা করিতেছেন।

বৈদিকধর্মে সংস্কার-প্রথা

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী

প্রাচীন কাল হইতে মানব জাতির সকল স্তরের মধ্যেই অল্প বিস্তর সংস্কার-প্রথা প্রচলিত আছে। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকার সংস্কার-প্রথা বর্তমান। আর্য জাতির সকল ধর্মেই সংস্কার-বিধি আছে। তন্মধ্যে আবার বৈদিকধর্মে এইসকল সংস্কার বিধি সর্বাপেক্ষা বেশী। অনেকেই হিন্দুদের মাত্র দশবিধ সংস্কারের কথা জানেন। কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি ও নিয়মাদির বিষয় সম্যক্ অবগত নহেন। ইহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে বহুপ্রকার সংস্কার বিধির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অনেক স্থলে বিভিন্ন মতও ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সংস্কারের ঐতিহাসিক ভিত্তি, উৎপত্তি এবং ব্যাখ্যামূলক কোন গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নাই। আশাকরি কোন যোগ্য ব্যক্তি এই অভাব পূরণ করিবেন।

সংস্কার কি? আর্যদিগের শরীর ও মন পরিশুদ্ধ করিবার জন্য সমাজ ও ধর্মমূলক কার্য-বিশেষ। ঋগ্বেদে উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কারের কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু গৃহ্যসূত্রাদির মধ্যে ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনা ও ক্রিয়াপ্রণালী পরিলক্ষিত হয়। গৌতম স্মৃতির মধ্যে ৪০ প্রকার সংস্কারের বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু আশ্বলায়ন স্মৃতির উপর ভিত্তি করিয়া 'সংস্কার রত্নমালা'তে ২৫ প্রকার সংস্কারের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এই ২৫ প্রকার সংস্কারকে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা—

ক)	নৈমিত্তিক সংস্কার—	১৬ প্রকার
(খ)	বার্ষিক সংস্কার—	৭ ,,
(গ)	মাসিক সংস্কার—	১ ,,
(ঘ)	নিত্য সংস্কার—	১ ,,

গৌতম স্মৃতি ও আশ্বলায়ন স্মৃতিতে বর্ণিত সংস্কারের নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

		গৌতমস্মৃতি	আশ্বলায়ন ও অঙ্গিরাস্মৃতি
১।	গর্ভাধান—	১ প্রকার	১ প্রকার
২।	পুংসবন—	১ ,,	১ ,,
৩।	সীমন্তোন্নয়ন—	১ ,,	১ ,,
৪।	জাতকর্ম—	১ ,,	১ ,,
৫।	নাম করণ—	১ ,,	১ ,,
৬।	বিষ্ণুবলি—	× ,,	১ ,,

		গৌতমস্মৃতি	আশ্বলায়ন ও অঙ্গিরাস্মৃতি
৭।	নিষ্ক্রামণ—	× „	১ „
৮।	অন্নপ্রাশন—	১ „	১ „
৯।	চৌল বা চূড়াকরণ—	১ „	১ „
১০।	উপনয়ন—	১ „	১ „
১১।	বেদ ব্রত—	৪ „	৪ „
১২।	স্নান—	১ „	১ „
১৩।	বিবাহ—	১ „	১ „
১৪।	পঞ্চ মহাযজ্ঞ—	৫ „	১ „
১৫।	পার্বণ—	× „	১ „
১৬।	হবির্যজ্ঞ—	৭ „	× „
১৭।	সোমযজ্ঞ—	৭ „	× „
১৮।	পাকযজ্ঞ—	৭ „	৭ „
		৪০ প্রকার	২৫ প্রকার

উপরিলিখিত সংস্কারের মধ্যে আমরা দশটীর বিষয় সাধারণতঃ উল্লেখ করি, যথা—

১। গর্ভাধান—পূর্ববর্তী যুগে ইহার নাম ছিল চতুর্থীকর্ম। বিবাহের ৪র্থ রাত্রিতে গর্ভোৎপাদনের জন্য এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হইত। ইহার পূর্বে স্ত্রী পুরুষের যৌনসঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা বিবাহেরই একটী অঙ্গ ছিল। তখন বাল্য বিবাহ প্রথা ছিল না। পরবর্তীকালে যখন বাল্য-বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত হইল, তখন বিবাহের অনেক পরে কন্যার উপযুক্ত বয়সে এই সংস্কার কার্যের বিধি হইল এবং ইহার নাম হইল "গর্ভাধান"। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে (১।১১) এ নামের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদে এবং আপস্তম্ব ও বৌধায়ন সূত্রাদিতে দেখা যায় অনূঢ়া কন্যাদের দেহ বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব গৃহীত। যাহাতে কন্যা ভবিষ্যতে পবিত্র সন্তানের জননী হইতে পারে সেজন্য তাহার দেহ পরিশুদ্ধির জন্য এই সংস্কার বিধি। একটী উডুম্বর ডাল সুগন্ধিযুক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রাখা হয় ও যাহাতে গন্ধর্ব কন্যাকে পরিত্যাগ করে সেজন্য ২টী মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৮৫।২১।২২) উচ্চারণ করিয়া ঐ ডালটী ফেলে দেওয়া হয়। অন্যান্য ক্রিয়া বিবাহের সময়েই হয়।

২। পুংসবন—আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে (১।১৩।১) এই সংস্কারের উৎপত্তি বর্ণনা আছে। পুত্র সন্তানের জন্যই এই সংস্কার এবং সাধারণতঃ গর্ভাবস্থার ২য় (পারস্কর সূত্র), ৩য় (গোভিল সূত্র) বা ৪র্থ (ভরদ্বাজ ও জৈমিনি সূত্র) মাসে শুক্লপক্ষে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। কোন্ গ্রহনক্ষত্রের সংস্থানে ইহার অনুষ্ঠান হইবে তাহাও উল্লিখিত আছে।

৩। সীমন্তোন্নয়ন—স্ত্রীলোকের মাত্র প্রথম গর্ভাবস্থায় এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। চুল-গুলির মধ্যদেশ পৃথক করিয়া উপরদিকে তুলিয়া দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ সন্তান সম্ভাবনা না হওয়ার

পূর্ব পর্যন্ত সে যুগে চুলগুলি পৃথক (অর্থাৎ সিঁথিকাটা) হইত না। সাধারণতঃ গর্ভের ৪র্থ মাসে এই সংস্কার হয়। মানব ও কাঠক গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী ৩য় মাসে এবং সাংখ্যায়ন সূত্রানুযায়ী ৭ম মাসে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে একটী হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

৪। জাতকর্ম—সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের সমষ্টিগত নাম জাত কর্ম। সন্তানকে প্রথম স্তন্য দান ও তাহার নাড়ী সূত্র কর্তনের পূর্বেই এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। তারপর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ও সন্তানকে নানাপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা স্নান করান হয়।

৫। নামকরণ—ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের গৃঃ সূঃ এর মতে জন্মের ১০ম দিনে এবং সামবেদের জৈমিনির সূত্রমতে ১২শ দিনে সন্তানের নামকরণসংস্কার হয়। প্রথমে কতকগুলি মন্ত্রদ্বারা স্নান করান হয়। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। কি প্রকার নাম হওয়া উচিত সে বিষয়েও অনেক নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। নিষ্ক্রামণ—সন্তানকে গৃহ হইতে প্রথম উন্মুক্ত স্থানে বাহির করা। জন্মের ৪র্থমাসে এই সংস্কার হয়। ইহার সহিত সূর্য-দর্শন ও চন্দ্র-দর্শন নামক আরও ২টী ক্ষুদ্র সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্তানকে সূর্য ও চন্দ্র দেখান হয়; পরিশেষে একটি ভোজ প্রদান করা হয়।

৭। অন্নপ্রাশন—সন্তানের ৬ষ্ঠ মাস বয়ঃক্রমে প্রথম তাহাকে অন্নভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। কাঠক সূত্রমতে কিন্তু দাঁত বাহির হইবার পর এই সংস্কার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। পারস্কর ও আপস্তম্ব গৃঃ সূঃ এর মতে সন্তানকে মাংস খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জৈমিনি ও কাঠক সূত্রমতে তাহা নাই।

৮। চৌল বা চূড়াকরণ—সন্তান জন্মের ১ম বর্ষে (বৌধায়ন ও সাংখ্যায়ন মতে) বা ৩য় বর্ষে (পারস্করমতে) তাহার ১টী চুলগুচ্ছ রাখিয়া বাকী সমস্ত চুল প্রথম কর্তিত হয়। ইহাতে হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়।

৯। উপনয়ন—উপনয়ন সংস্কার শুধু বৈদিক আর্যদিগের মধ্যে নহে, পরন্তু পারসীকদের মধ্যেও প্রচলিত আছে এবং বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকদেরও উপনয়ন হইত। দণ্ডধারণ পারসীকদের মধ্যে প্রচলিত নাই। ইহাকে দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে যথাক্রমে ৮ হইতে ১৬, ১০ হইতে ২২ ও ১২ হইতে ২৪ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার হওয়া কর্তব্য।

১০। বিবাহ—মনুসংহিতার মতে ৮ প্রকার বিবাহ প্রথা। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য প্রথাই সাধারণতঃ প্রচলিত।

আমাদের কথা

প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ও বিভিন্ন সহরে নানাপ্রকার সভাসমিতির বার্ষিক ও সাময়িক সাধারণ অধিবেশন হয়। এ বৎসরেও কলিকাতায় হিন্দু মহাসভাদির অধিবেশনাদি হইবে। এই প্রকার অধিবেশনে বহু অর্থব্যয় হয়। যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার অধিকাংশই ব্যয়িত হয়। ইহাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদিও গৃহীত হয়। কিন্তু তারপর ঐ সব প্রস্তাবকে কার্যকরী করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার অভাব কতকাংশে পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তরূপে আমরা ২টী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি—জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা। জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বর্তমানে কয়েক বৎসর যাবৎ সুদূর গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার জন্য সাময়িক নগরাদি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—এবং কয়েক লক্ষ টাকাও ইহাদের জন্য ব্যয়িত হয়। ইহার দ্বারা একটা প্রচার ও সাময়িক উত্তেজনা ও বক্তৃতাদি ব্যতীত স্থায়ী কার্য কতটা হয় ও লক্ষ্যের প্রতি কতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তাহা অনুধাবনের বিষয়। দর্শকমণ্ডলী ও উদ্যোক্তা প্রভৃতি-দের নিকট হইতে এই টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় এত টাকা এই-রূপে ব্যয় না করিয়া ইহার দ্বারা স্থায়ী ও গঠনমূলক অনেক কার্য সাধিত হইতে পারে। ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও কর্মীদল সৃষ্টির জন্য যদি কেবলমাত্র এই সব প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ স্থানে স্থানে একত্র হ'ন তাহা হইলে অনেক কম অর্থ ব্যয়িত হয় আর উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা গঠনমূলক কার্য হইতে পারে।

* * * *

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হিন্দুমিশন প্রভৃতি---ধর্মপ্রচার ও অন্যান্য সেবাকার্যের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবর্গকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সব কর্মীদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য ইহাদের অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠান নাই। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে---রোমান্ ক্যাথলিক প্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য কার্শিয়ংএ একটি প্রতিষ্ঠান আছে---পারসীকদিগের ধর্মপ্রচারক সৃষ্টির জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ বোম্বাই-এ কমা এথর্টন ইনস্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর এই ইনস্টিটিউটের জন্য কমাসাহেব বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম প্রচারক ও সেবকদের শিক্ষাদানের জন্য কোন কলেজ নাই। আমাদের মনে হয় যদি এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ একত্র মিলিত হইয়া প্রথমেই ভারতের কয়েকটী প্রধান স্থানে—যেমন কাশী, হরিদ্বার, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে এবংপ্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে হিন্দুপ্রচারকদিগের পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

* * * *

সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়ের নিকটে গুরুকুল বিদ্যালয়ের আদর্শানুযায়ী একটি বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। এ বিষয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আর্য-সমাজ উত্তর ভারতে এইপ্রকার অনেকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট

চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিমভারতে Servants of India Society কয়েকটী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অবশ্য সেগুলি গুরুকুলের আদর্শানুযায়ী নহে। ধর্ম ও ভাবপ্রচারের উপযুক্ত কেন্দ্র শিক্ষায়তনসমূহ। খ্রীস্টধর্মপ্রচারকেরা ভারতের বহুস্থানে এইপ্রকার শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন যদি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে কাজ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই প্রকার গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে দেশে আদর্শ শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম হয়।

* * * *

আগামী হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের কর্তৃপক্ষদিগের দৃষ্টি নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করি—

(১) 'হিন্দু' শব্দটী 'সিন্ধু' শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং এই প্রকার অপভ্রংশমূলক একটী শব্দকে একটী প্রাচীনতম ধর্মের সহিত যুক্ত করিয়া 'হিন্দুধর্ম' এই আখ্যা দেওয়া সমীচীন নহে। এই ধর্মের আদি উৎস বেদ সুতরাং বর্তমান হিন্দুধর্মকে 'বৈদিক ধর্ম' এই আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ভারতভূমির অন্যান্য ধর্মগুলি---বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, পারসীক, প্রভৃতি---মূলতঃ বৈদিক ধর্মেরই বিভিন্ন সংস্কার ; সুতরাং এই সকল ধর্মের যদি সাধারণ নাম 'আর্যধর্ম' প্রদত্ত হয় তাহা হইলে সমীচীন হয়। 'হিন্দু মহাসভার'ও তাহা হইলে 'ভারতীয় আর্য মহাসভা' নামকরণ করা প্রয়োজন।

(২) সরকার কর্তৃক 'হিন্দুদিগকে' 'অ-মুসলমান' (Non-Muslim) এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় $\frac{৪}{৫}$ অংশ যে ধর্মাবলম্বী তাহাদিগের এই প্রকার নামকরণের আশু উচ্ছেদ করা প্রয়োজন।

(৩) 'হিন্দুমহাসভা'কে এত বড় একটা জাতির প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিপন্ন করিতে হইলে ইহাকে কেবল রাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না---পরন্তু এই জাতির মঙ্গলজনক সকল কার্যেই ইহাকে অগ্রণী হইতে হইবে---যেমন (ক) মন্দির সংস্কার ; প্রাচীন মন্দিরগুলির অধিকাংশই বহু দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে পরিচালিত। এই প্রকার বহু সম্পত্তি ধর্মমূলক কার্যে ব্যয়িত না হইয়া অনেক ক্ষেত্রে অপব্যয়িত হইতেছে। এই সব সম্পত্তিকে হিন্দুর জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া ইহাদের দ্বারা সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক কার্য করা। (খ) সামাজিক কুপ্রথাদির সংস্কার---যেমন বাল্যবিবাহনিরোধ, পণপ্রথারোধ ইত্যাদি। (গ) শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই মহান্ জাতি যাহাতে সুদক্ষ হইতে পারে তাহার বিধান করা। (ঘ) ভারতীয় কৃষ্টি, জ্ঞান ও শিক্ষার যাহাতে প্রচার হয় ও গ্রন্থাদি যাহাতে প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা। (ঙ) ধর্মপ্রচারকদিগের জন্য বিদ্যালয়, সামরিক বিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয় প্রভৃতি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

এই সব কার্য মাত্র হিন্দু মহাসভার দ্বারা পরিচালনা করা অবশ্য সম্ভবপর নয় ; সেজন্য আংশিকরূপেও যে সব প্রতিষ্ঠান এই সব কার্য পরিচালনা করিতেছে---তাহাদের সহিত একযোগে কার্য করিবার ব্যবস্থা করা।

পুস্তক সমালোচনা

প্রেমধর্ম—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. এ., বি. এল, পি. আর. এস্. বেদান্তরত্ন প্রণীত। (১৩৪৫) পৃষ্ঠা ৪৪২, মূল্য ২॥০ টাকা। প্রকাশ কার্যালয় ১৩৯বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্, কলিকাতা।

দার্শনিক জগতে হীরেন্দ্র বাবুর নাম সুপরিচিত। দার্শনিক সাহিত্যে তাঁহার দান অতীব মূল্যবান ও বিশাল, যাহার দ্বারা তিনি আজ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অন্যতম। আলোচ্য পুস্তকখানি হীরেন্দ্র বাবুর লেখনী প্রসূত, এখানিও যে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সাধারণের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পুস্তকখানি দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে প্রেমধর্মের প্রকৃতি ও তাহার ব্যাখ্যান আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—প্রেমধর্মের যে পূর্ণ প্রকট হইয়াছে বৈষ্ণবধর্মে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা। প্রেমধর্মের সারকথাগুলি দর্শনের দিক দিয়া যে কত গভীর ও ধর্মের দিক দিয়া যে কত উদার তাহা হীরেনবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। হীরেনবাবু প্রাচ্যদর্শনে যেমন সুপণ্ডিত, পাশ্চাত্য দর্শনেও তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ। প্রেমধর্মে তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এখানে একদিকে যেমন বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব ও মাধুর্য সুললিত ভাষায় পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে তিনি আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধর্মশাস্ত্র হইতে অনুরূপ বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণবধর্মের অবোধ্য বিষয়গুলিকে বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেমের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ হীরেনবাবুর পুস্তকে শাস্ত্রকারগণের পরমার্থরূপে প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এখানে প্রেমধর্মের প্রচারক নহেন, তিনি ইহার বিচারক—চিন্তাশীল ও পক্ষপাতিত্বশূন্য। পাশ্চাত্য দেশে মিষ্টিসিজম্ সম্বন্ধে Miss Under-Hill-এর পুস্তক যেমন উল্লেখযোগ্য এখানে, মিঃ দত্তের প্রেমধর্মও সেইরূপ খ্যাতিলাভ করিবে।

শ্রীরাধিকাচরণ অধিকারী

বাংলার ধন-বিজ্ঞান—দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩১-১৯৩৩) ৫৮২ পাতা। মূল্য ৩৲ টাকা। অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার ও বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের অন্যান্য গবেষক কর্তৃক লিখিত। প্রকাশক চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং ; ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাংলার ধন-বিজ্ঞান ১ম ভাগের সমালোচনা আমরা ইতঃপূর্বেই করিয়াছি (শ্রীভারতী আশ্বিন ১৩৪৬)। বর্তমান গ্রন্থখানি ধন-বিজ্ঞান পরিষদের গবেষকবর্গ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ সকলের সমষ্টি। অবশ্য গবেষকগণ মাত্র এই কয়টী প্রবন্ধ লিখিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই। সম্পাদক মহাশয়ের উক্তিতে প্রকাশ 'একমাত্র বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে গবেষকগণের অর্থনৈতিক চিন্তার পরিধি ও প্রণালী বুঝিতে পারা যাইবে না।' যাহারা গবেষকগণের অন্যান্য রচনা জানিতে ইচ্ছুক তাহারা "আর্থিক উন্নতির" পুরাতন সংখ্যা সকল পাঠ করিলে ভাল হয়। বর্তমান গ্রন্থে অধ্যাপক সরকারের 'ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যে যুক্তিযোগ'

"রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূলসূত্র" প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, 'নরেন্দ্রনাথ রায়' লিখিত 'রাষ্ট্রের ব্যয়', শ্রীসুধাকান্ত দে লিখিত 'বিশ্ব-বাণিজ্যে ভারতের দান' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিরূপে প্রসার লাভ করা যায় তাহার ইঙ্গিত আছে। অন্যান্য অনেক ছোটখাট শিল্প সম্বন্ধে কোন্ কোন্ পন্থা দেশ বিদেশে কার্যকরী হইয়াছে তাহারও আলোচনা বর্তমান গ্রন্থ খানিতে স্থান পাইয়াছে। এজাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিরল। আমরা সকলকেই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধা ভাল।

শ্রীনলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত ও স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০৩+১।৵০। মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র।

মনোরম কাগজে ছাপা ও মজবুত কাপড়ে বাঁধাই সুদৃশ্য এই গীতাখানি পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। ইহাতে মূল, অন্বয়মুখে প্রত্যেক সংস্কৃত শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ, প্রাঞ্জল অনুবাদ, দুর্বোধ্য অংশের সরল পাদটীকা, অনুবাদসহ গীতাধ্যান, গীতা মাহাত্ম্য ও গীতাপাঠবিধি এবং সর্বশেষে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। এতগুলি একসঙ্গে কোনও পকেট-গীতাতে আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই গীতাখানি সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকপাঠিকার নিত্য পাঠোপযোগী হইয়াছে এবং সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ ও স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষেও উহা পরম উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে অন্বয়ার্থ এবং অনুবাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুযায়ী করা হইয়াছে। গীতার অন্বয়মুখে শব্দার্থ সর্বপ্রথম ৺স্বামী কৃষ্ণানন্দ করেন; কিন্তু তাঁহার গীতা অতি বৃহৎ ও ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ। ঢাকার শ্রীজগদীশ ঘোষ মহাশয়ের গীতায় অনুরূপ অন্বায়ার্থ ও অনুবাদ আছে, কিন্তু তিনি তাঁহার গীতায় শ্রীঅরবিন্দের গীতাব্যাখ্যানুযায়ী 'পুরুষোত্তমবাদ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেলুড়মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দের এই গীতাখানি শঙ্করাচার্যকৃত গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকাস্বরূপ পঠিত হইতে পারে। শঙ্করাচার্যের মতে কর্ম, যোগ ও ভক্তি সম্মত সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় কারণ এইগুলি বহিরঙ্গ সাধনমাত্র, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতে কর্ম, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান—প্রত্যেকটাই অন্য নিরপেক্ষ মুক্তিমার্গ। গীতায় ৪।৫, ৩।১৯, ৫।২৭-২৮, ১১।৫৪ এবং ১২।৩-৪ মূলশ্লোকগুলিতে বিবেকানন্দজীর মতই সমর্থিত হয়। বর্তমান গীতাখানিতে এই উদার ও অভিনব ভাবের অনুকূল অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ আছে।

গীতা ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই নিত্যপাঠ্যগ্রন্থ। সাধারণতঃ পাঠকপাঠিকাগণ অন্যের সাহায্য ব্যতীত গীতার অর্থ বুঝিতে পারেন না। এই গীতাখানির দ্বারা সর্বসাধারণে নিজে নিজেই কাহারো সাহায্য না লইয়া গীতার্থ অবগত হইতে পারিবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

বেদ

১। Social and Religious Life in Gṛhyasūtras—Dr. V. M. Apte, Bombay.

দর্শন ও ধর্ম

২। Science of Social Organisation or the Laws of Manu in the light of Ātma-vidyā by Bhagvan Das. 2. vols. 2nd ed. revised and enlarged—Adyar.

৩। Nyāyasūtras (ন্যায়সূত্রাণি) of Gautama.—A system of Indian Logic, ed. with Vātsyāyana Bhāsya and short Sanskrit Notes – Dr. Ganga Nath Jha. Poona Or. S. no. 58.

৪। ভগবদ্‌গীতা—শ্রীধরী (সুবোধিনী) টীকা সমেত—R. Pansikar. Benares.

৫। Indian Epistomology – Dr. Jwalaprasad—Lahore.

প্রত্নতত্ত্ব

৬। Annual Bibliography of Indian Archæology, Vol XII for the year 1937.—Leiden.

ইতিহাস

৭। Gaikwads of Baroda, English Documents. ed. by J. H. Gense—2 vols. Bombay.

৮। Alivardi and His Times – Dr. K. K. Dutta. M. A., Ph. D., P. R. S.—Calcutta University.

সাহিত্য

৯। চারুদত্তম্ – A Sanskrit drama in four Acts attributed to Bhāsa, critically edited with Intro. Notes and trans. by Prof. C. R. Devadhur. Poona.

জ্যোতিষ

১০। গ্রহগণিতাধ্যায় – প্রথম খণ্ড – বাসনা ভাষ্য ও শিরোমণি প্রকাশ টীকা সমেত – D. V. Apte. Poona.

আয়ুর্বেদ

১১। হরমেখলা – ed. with comm. by K. Sāmba Śiva Sāstri Part II. Pariccheda V.; Trivandrum.

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কর্তৃক সংকলিত

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)

দ্বাদশ বর্ষ ১৩১৯ সাল

বৈশাখ—শ্রাবণ—ভাদ্র **মহাভারতের ঐতিহাসিকতা**—শ্রীহরিচরণ শাস্ত্রী লিখিত। আলোচ্য আশ্বিন—মাঘ—ফাল্গুন প্রবন্ধে লেখক যাঁহারা পুরাণের ঐতিহাসিকতা বিশ্বাস করেন না তাঁহাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার, পরিণতি বুঝিতে হইলে পুরাণগুলিকে ইতিহাস না বলিয়া উপায় নাই। লেখক ইতিহাস (History) কত রকম অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাশ্চাত্য মতে পুরাণগুলিকে ইতিহাস না বলিলেও আমরা উহাদিগকে সমাজের ইতিহাস বলিয়াই বুঝি। প্রসঙ্গত: তিনি দেখাইয়াছেন মহাভারত সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে কাল্পনিক ব্যক্তি বা রাজন্যবর্গের আলোচনা নাই। উহারা সকলেই রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন।

বৈশাখ-আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র—**জ্ঞানদাস**—শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু – বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাসের কয়েকটি পদাবলী অবলম্বনে অতি সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদাবলী যেমন প্রসাদ গুণ-সম্পন্ন, সমালোচকের নিপুণ হস্তের সমালোচনাও সেইরূপ অতি মধুর।

মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র – **জয়দেব ও বিদ্যাপতি**—শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু। লেখক গীত-গোবিন্দ ও বিদ্যাপতির কয়েকটী পদাবলীর উদ্ধার করিয়া নিপুণ সমালোচনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে যাঁহারা বৈষ্ণব কবিতায় স্থল বিশেষে অশ্লীলতার গন্ধ পান তাঁহাদের ধারণা অতি ভ্রান্ত। গীত-গোবিন্দাদি গ্রন্থ মধুর রসের চরম পরিণতি।

পৌষ-চৈত্র—**বেদের কথা**—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল—চারিটী প্রবন্ধে লেখক 'বেদ' বলিতে আমরা কি বুঝি তাহার স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম-চৈতন্যের মধ্যে যে বিশ্বছবি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহারই পরিচয় বেদ। ইহা সৃষ্টির মূল হইতে বর্তমান বলিয়া অনাদি অপৌরুষেয়। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের অনেকগুলি বৈষ্ণব-ধর্ম-সম্বন্ধীয় সারবান্ প্রবন্ধ আছে।

Indian Antiquary, Vol. II. 1873

Early Printing in India—খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে Goa Jesuits কর্তৃক ভারতে মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তন হয়। কিন্তু প্রথমে ইংরেজী অক্ষরেই ছাপার কার্য আরম্ভ হয়।

On the Dialects of the Palis—G. H. Damant.—বর্তমান প্রবন্ধে লেখক কতকগুলি সচরাচর অপ্রচলিত পালিশব্দ ও তাহাদের ইংরেজী প্রতিশব্দের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

Abhinanda, the Gauda – G. Bühler, PH. D.

অভিনন্দ বা অভিনন্দন নামে এক কবি ছিলেন। তিনি গৌড়দেশ বাসী। তাঁহার দুইটী পুস্তকের নাম 'রামচরিত্র মহাকাব্য' ও 'কাদম্বরী কথাসার।' এই দুইখানি গ্রন্থই এখনও বোধ হয় অপ্রকাশিত আছে। লেখক Gujrat হইতে তাঁহার যে Catalgue of Mss প্রকাশিত করেন, তাহার দ্বিতীয় fascicleএর ১০২ পৃষ্ঠায় ১৮৭ নং এবং ১২৮ পৃষ্ঠায় ৬নং এই দুই গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করেন। প্রথম গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ।

The Calendar of Tipu Sultan – P. N. Purnaiya B. A.

মহীশূরের টিপু-সুলতান বর্ণ-জ্ঞান রহিত ছিলেন বলিয়া কথিত হইলেও ইহা কম আশ্চর্যের কথা নহে, যে তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন বর্ষ গণনা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁহার সপ্তাহে ৭ দিন ছিল বটে এবং বৎসরে মাসের সংখ্যাও ১২ ছিল, কিন্তু মাসের দিন সংখ্যা ইংরেজী বা হিন্দুদিগের মাসের দিন সংখ্যা অনুযায়ী ছিল না। Col. William Krikpatrik মনে করেন যে ১৭৮৪ খ্রীঃ জানুয়ারী এবং জুনমাসের মধ্যে কোন সময়ে এই নূতন পঞ্জিকা প্রবর্তিত হয়।

On the authorship of the Ratnavali—G. Buhler Ph. D. –Dr. Fleet ও Edward Hall বাসবদত্তার ভূমিকাতে বলিয়াছেন যে রত্নাবলীর রচয়িতা কাশ্মীরের শ্রীহর্ষদেব নহেন, তিনি কনোজের শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধন। বর্তমান প্রবন্ধে ঐ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

Nagamangala Copper plate Inscription.—Lewis Rice.

এই তাম্রশাসনটী নাগমঙ্গল মন্দিরে পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনের একটী পাঠ এখানে প্রদত্ত হইয়াছে।

Notes on the Saiva-Siddhanta—The Rev. C. Egbert Kennet Vepery, Madras—তামিলদের মধ্যে প্রচলিত যে একপ্রকার ধর্মপদ্ধতি বর্তমান, তাহার নাম শৈবসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অষ্টবিংশতি শৈবগ্রন্থ বা আগমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই পদ্ধতির অনুসরণ করেন তাঁহাদিগকে আগমপন্থী বলে।

সাময়িক সাহিত্য, কার্তিক,—১৩৪৬

সাহিত্য

প্রবাসী—বিচিত্র বুদ্ধমূর্তি—শ্রীরমেশ বসু।

,, —সংস্কৃত সাহিত্যের পাখী ও তাহার নাম তালিকা—শ্রীসত্যচরণ লাহা।

,, —পত্রালাপ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষ—বঙ্কিম সাহিত্যে প্রেম—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।

,, —'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য—মঃ মঃ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

,, —মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্. এ., পি. এইচ. ডি।

বঙ্গশ্রী —দুর্গাপূজা ও বর্তমান কাল—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য।

,, —উনবিংশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্য—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর বর্মণ।

প্রবর্তক—রূপশাসন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে—শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

,, —অজন্তার নির্মাণ-পরিকল্পনার রহস্য—শ্রীঅজিত ঘোষ।

উদ্বোধন—বাঙালী হিন্দুর স্বগৃহ সমস্যা—স্বামী সুন্দরানন্দ।

,, —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন—স্বামী বিশ্বানন্দ।

,, —বাঙলা অভিধানের উপাদান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম্. এ. তত্ত্বরত্নাকর।

,, —ধর্মের আন্দোলন ও আর্থিক উন্নতি—ডক্টর শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ধর্ম ও দর্শন

প্রবাসী—বুদ্ধাবতার চৈতন্যদেব—শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়।

পরিচয়—উপনিষদে জীবতত্ত্ব—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, —জৈন ও বাৎসীপুত্রীয় মতে আত্মবাদ—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রবর্তক—শ্রীদুর্গা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

,, —উপনিষদের আলো—শ্রীমতিলাল রায়।

,, —দর্শন ও জীবন—ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার।

উদ্বোধন—শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য—

—অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ., পি. এইচ-ডি।

বঙ্গশ্রী—আকবর কি নিরক্ষর ছিলেন?—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পরিচয়—শিখ সম্রাট ও সতীর শাপ—৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

,, —রেণেগ্রুসের ভারতবর্ষ—ইন্দিরাদেবী কর্তৃক অনুবাদ।

প্রবর্তক—রাজা কংসনারায়ণ ও বঙ্গে প্রথম দুর্গোৎসব

—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাময়িক সংবাদ

ভারতের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা—নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে আলোচনার জন্য ভারতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। পরিকল্পনায় আছে—

(১) ভারতের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেকটি মানুষের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ আর সেই আত্মপ্রকাশের সামনে থাকবে পরস্পর সহযোগিতা ও মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের সংকল্প।

(২) শিক্ষার প্রতিস্তরে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি জাগ্রত রাখতে হবে—(ক) শরীরের উন্নতি (খ) জাতীয় সংহতি (গ) অর্থোপার্জনের ক্ষমতা (ঘ) সংস্কৃতির বিকাশ (ঙ) নৈতিক বুদ্ধির উদ্বোধন।

(৩) শিক্ষার স্তর থাকবে তিনটী: (ক) বিদ্যালয় প্রবেশের পূর্বের শিক্ষা, (খ) বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষা, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

(৪) বিদ্যালয়ের শিক্ষায় দুটি স্তর থাকবে: (ক) প্রাথমিক শিক্ষা (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার কাল হবে সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত। মাধ্যমিক শিক্ষার কাল হবে চৌদ্দ থেকে সতেরো বৎসর পর্যন্ত। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার সঙ্গে হাতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনার কেন্দ্রে আছে বৃত্তিকরী শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার সমন্বয়।

গ্রাম উন্নয়নের ধারা—বাংলার নূতন গবর্ণর ২রা ডিসেম্বর সরকারী গ্রাম উন্নয়ন বাহিনী পরিদর্শন করেন। গবর্ণর বাহাদুর বলেন—আমাদিগকে তিনটী মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইতে হইবে। ব্যাধি, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা—এই তিন শত্রু যতদিন সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত না হইবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিত নহে।

যুক্ত প্রদেশের জনশিক্ষা—শ্রীযুক্ত চতুর্বেদীর পরিচালনায় গত ডিসেম্বর (১৯৩৮) মাসে যুক্তপ্রদেশে জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অভিযান সুরু করা হইয়াছে। তাঁহার বিরাট পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সাত লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে আর পাঁচ হাজার নরনারী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, প্রত্যেকে এক বছরের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে লেখাপড়া শিখাবে।

শোক সংবাদ

পরলোকে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন—গত ২০শে নভেম্বর সোমবার রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের সময় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বেহালাস্থ বাস ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাংলার একজন বিখ্যাত সাহিত্যসেবী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স খোলা অবধি ডক্টর দীনেশচন্দ্র বাংলা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান চিরকাল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ডক্টর সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তিন বন্ধু', 'বেহুলা', 'সতী', 'ফুল্লরা' প্রভৃতি প্রায় এক শত গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পূর্ববঙ্গ গীতিকা পুস্তকখানি সম্প্রতি ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রমা রোঁলার ভগিনী মাদাম রোঁলা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

ডক্টর সেনের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ | পঞ্চম সংখ্যা

কর্ম

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি*

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ১. ১. ৭

এই শ্রুতির তাৎপর্য এই যে,—মাকড়সা যেমন অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি সৃষ্টি করে ও পুনশ্চ সংবরণ করিয়া লয়,—পৃথিবীতে অপরের সাহায্য না পাইয়াও যেমন ওষধিসমূহ আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবিত জীবদেহ হইতে যেরূপে কেশ ও লোমসমূহ আপনা-আপনি উদ্গত হয়, সেইরূপ ক্ষর-শূন্য ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে॥ এখানে অনায়াসে অর্থ প্রতীতির জন্য বহু দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে।

এখানে 'অক্ষর ব্রহ্ম' কি, তাহার একটু পরিচয় না থাকিলে কথাগুলি বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে,—এইজন্য তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার ১৫শ অধ্যায়ে ১৬শ শ্লোকে আছে,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতাণি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া এই লোকে দুইটী পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত শরীরী ভূতগণ ক্ষর পুরুষ, আর কূটস্থই অক্ষর পুরুষ বলিয়া অভিহিত॥ কূট শব্দ বহ্বর্থ

---

* শ্রীগোবর্ধন পীঠাধীশ শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী ১০৮ শ্রীশঙ্কর তীর্থ যতি মহারাজ

জ্ঞাপক,—কামারেরা যাহার উপর লোহা রাখিয়া পিটায়, তাহার নাম কূট; মৃত বৃক্ষাদির নাম কূট; পর্বতাদির নাম কূট। মোট কথা ঐসকল পদার্থ নির্বিকাররূপে অবস্থান করে বলিয়া তাহাদিগকে 'কূট' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। "কূটবৎ নির্বিকারেণস্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে।"—পঞ্চদশী। এই যে নির্বিকার 'অক্ষর পুরুষ',—ইহা হইতেই এই দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কিরূপে, তাহা বলা যাইতেছে—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যংলোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥
(মুণ্ডক শ্রুতি, ১.১.৮)

অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্রমশঃ,—যুগপৎ নহে। এই জন্য সেই ক্রম প্রদর্শন করা যাইতেছে। তপস্যা অর্থাৎ উৎপাদন উপযোগী জ্ঞান দ্বারা সর্বজ্ঞান স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখতা লাভ করেন। সেই উন্মুখতা প্রাপ্ত ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যাকৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। অন্ন অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রাণ অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় হিরণ্য গর্ভ, তাহা হইতে মন (অন্তঃকরণ), তাহা হইতে সত্য অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্যরূপ আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র, তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোক সমূহ, লোক সমূহতে মনুষ্যাদি প্রাণিগণের সদসৎ বিবিধ কর্ম, এবং শুভাশুভ কর্ম সমূহে আবার সুদীর্ঘ কালস্থায়ী কর্মফল সমূহ সমুৎপন্ন হয়। কথাগুলি আরও একটু বিস্তার করিয়া বলা যাইতেছে।

ভূতযোনি ব্রহ্ম, তপস্যা অর্থাৎ উৎপত্তি বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা উপচিত অর্থাৎ যেন আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করেন, অঙ্কুর সদৃশ এই জগৎ সমুৎপাদনার্থ উক্ত বীজও যেন স্ফীততা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রে জোয়ারের জল যেমন উচ্ছ্বাস দ্বারা স্ফীত হয়, তদ্রূপ। এইরূপে সর্বজ্ঞতানিবন্ধন সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহার বিষয়ক শক্তি ও জ্ঞানে সমুপচিত সেই ব্রহ্ম হইতে অন্ন (যাহা ভোগ করা যায়, তাহাই অন্ন; সংসারী জীবগণের সাধারণ কারণ অব্যাকৃত প্রধানই সেই অন্ন), সেই অন্ন হইতে প্রাণ, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রাণই সমস্ত জগতের জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির অধিষ্ঠাতা; অবিদ্যা, কামনা ও তদনুগত কর্ম সমষ্টি রূপ বীজের অঙ্কুর স্বরূপ এবং জগতের আত্মা। সেই প্রাণ হইতে আবার সংকল্প, বিকল্প, সংশয়, নির্ণয়াদি স্বভাব সম্পন্ন মনঃ নামক অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। সেই সঙ্কল্পাদি স্বভাবসম্পন্ন মন হইতে সত্য নামক আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, সেই ভূত-পঞ্চক হইতেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথাক্রমে পৃথিব্যাদি লোক সমূহ সৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত লোকে আবার দেবতা মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী নানাবিধ কর্ম এবং সেই কর্মাধীন শুভাশুভ কর্মফল সমুৎপন্ন হয়। যে পর্যন্ত কর্ম সমূহ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ তৎফলও বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ যতকাল কর্ম থাকিবে, তাহার ফলও ততকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। এই হিসাবে কর্মফলকে অমৃত বলা হইয়াছে।

কর্ম কি, এবং তাহার ফল কিরূপ, এতদ্বিষয়ে বিশিষ্ট আলোচনা না করিলে এত সহজে

এ কথাটা বুঝা যাইবে না। পুরাণাদি আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে,—

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্প কোটি শতৈরপি।
অবশ্যমের ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥

অর্থাৎ কর্ম সমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শত কোটী কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে কর্ম সমুদয়ের ক্ষয় হয় না। অর্থাৎ কর্মের প্রদেয় ফল ভোগ না হওয়া পর্যন্ত কর্মকে থাকিতেই হয়। ফল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া গেলেই, কর্ম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

মনুষ্যমাত্রকেই স্বীয় অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। ঐ কর্ম তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মান।

(ক) বর্তমান জন্মের পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সমস্ত কর্মানুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্মের সুযোগ ও সময়াভাবে এখনও যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, সেই সমস্ত কর্মের নাম 'সঞ্চিত'।

(খ) যে সমস্ত কর্মের ফলভোগার্থ, বর্তমানে এই উপস্থিত দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্মের নাম 'প্রারব্ধ'।

(গ) আর, এই বর্তমান দেহে যে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই সমস্ত কর্মই 'ক্রিয়মান'।

সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান কর্ম পরম্পরায়িতরূপে উৎপন্ন। যদি এই বর্তমান দেহে, আত্মজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রিবিধ কর্মের কোনটিই বিনষ্ট হইবে না। শত-কোটী কল্পেও উহাদের উচ্ছেদ হইবে না; কিন্তু বর্তমান দেহে আত্মজ্ঞানোদয় হইলে, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান এই উভয়বিধ কর্মসমূহ দগ্ধ বীজের ন্যায়, ফলোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায়, তদবস্থায় কেবল প্রারব্ধ কর্মসমূহ উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগ নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্মও ফল প্রদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত ভোগ প্রদান করিতে থাকে। কতকালে যে প্রারব্ধ কর্ম ফল ভোগ ক্ষয় হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। এজন্য বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে,—"এবং কর্মফল নিয়ম তদবস্থাবধৃতে" —এইরূপে প্রারব্ধ কর্ম ভোগ দ্বারা নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইয়া গেলে, তখন একেবারে কর্মক্ষয় হইয়া যায়,---আর দেহ থাকে না। "যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তে ভূয়ঃ" "যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে"। সুতরাং দেহ ভিন্ন কর্মও থাকে না। থাকিতে পারে না। কর্ম যখন থাকে না, তখন দেহ থাকিবে কিরূপে? শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "প্রারব্ধ কর্মণাং ভোগাদেবক্ষয়ঃ"। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। অপিচ আত্মজ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত, তত্তৎ কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।

দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাগুলিকে বিশদীকরণ করা যাইতেছে। কোন একটা রেলওয়ে ষ্টেশনে বস্তা বন্দি করা কতকগুলি ছোলা বোঝাই রহিয়াছে। ছোলা বোঝাই প্রত্যেক বস্তাকে 'সঞ্চিত' কর্ম বলিয়া মনে করা যাউক। প্রত্যেক বস্তায় অগণিত ছোলা রহিয়াছে। প্রত্যেকটী

ছোলা এক একটী অভুক্ত কর্ম স্বরূপ গণনীয়। উহার একটি বস্তা এমন জায়গায় রহিয়াছে যে, তথায় একটু বৃষ্টি একটু রোদ ও একটু হাওয়া লাগিবার সুবিধা রহিয়াছে। ঐ বস্তার মধ্যে যে কয়েক শত বা কয়েক হাজার ছোলার গায়, বৃষ্টি রোদ ও হাওয়া লাগিয়াছে, সেগুলি অঙ্কুরিত হইয়াছে। ঐ বস্তার অপর অংশস্থিত ছোলাগুলির গায় তেমন বৃষ্টি, রোদ ও হাওয়া লাগে নাই বলিয়া সেগুলি অঙ্কুরিত হয় নাই। যে গুলি অঙ্কুরিত হয় নাই, সে গুলিকে 'সঞ্চিত' কর্ম বলিয়া মনে করা যাউক। যে গুলির অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, সে গুলিকে 'প্রারব্ধ' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। প্রারব্ধ কর্মের স্বভাব এই যে,—সে কর্মফল ভোগায়তন একটি দেহ রচনা করিয়া দেয়। তদ্রূপ আমাদেরও পূর্ব পূর্ব দেহের অনুষ্ঠিত যে সকল কর্ম অদ্যাপি সুযোগ অভাবে ফল প্রদান-উন্মুখ হয় নাই, সে গুলিকে আমরা 'সঞ্চিত' কর্ম বলিয়া নির্দেশ করি। সঞ্চিত কর্মের মধ্যে যে গুলি ফলপ্রদান-উন্মুখ হইয়া বর্তমান এই ভোগায়তন দেহ ধরাইয়া দিয়াছে, তাহাকে বলি 'প্রারব্ধ' আবার সেই প্রারব্ধ কর্মের মধ্যেও যাহা করিয়া আসিয়াছি, যাহা করিতেছি ও যাহা করিব, সেই সকল কর্মের নাম 'ক্রিয়মান'। অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মবশাৎ প্রাপ্ত ভোগায়তন দেহদ্বারা অনুষ্ঠিত ত্রৈকালীন কর্মই ক্রিয়মান সংজ্ঞায় অভিহিত।

প্রারব্ধ কর্ম আবার তিনপ্রকার—ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, পরেচ্ছাকৃত।

(ক) 'ইচ্ছাকৃত প্রারব্ধ' কর্ম যথা—অপথ্যসেবী, রাজপত্নীগামী ইত্যাদি। স্বকীয় প্রবল প্রারব্ধ কর্মবশাৎ এই শ্রেণীর কার্য করিতে হয়। এই ইচ্ছাজনক প্রারব্ধ কর্ম নিবারণ করিতে ঈশ্বরও সমর্থ নহেন।—

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় আছে—

> সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
> প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩।৩৩

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাব অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের অনুরূপ চেষ্টা করেন। (অন্যের কথা আর কি বলিব) সকলভূতই স্বভাব অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের অনুগত।—যোগদ্বারা অন্তঃকরণ নিগ্রহ কি করিবে ?

অবশ্য ভবিতব্য প্রারব্ধ কর্মের যদি প্রতীকার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, নলরাজা দুঃখে পতিত হইতেন না। এ সম্বন্ধে পঞ্চদশীকার বলেন যে,—

> অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্ যদি।
> তদা দুঃখৈ র্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ ॥

(খ) 'অনিচ্ছাকৃত প্রারব্ধ' ভোগসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন---

অর্জুনের প্রশ্ন---

> অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
> অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় ! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩।৩৬

হে শ্রীকৃষ্ণ, ইচ্ছা না থাকিলেও, ধার্মিক পুরুষও যেমন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া যে পাপচরণ করেন, তদ্বিষয়ে প্রবর্তক কে ?

প্রত্যুত্তরে শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩।৩৭

রজোগুণ সমুদ্ভব এই যে সর্বগ্রাসী মহদনিষ্টজনক কাম ও ক্রোধ, এতদুভয়কেই এই বিষম শত্রু জানিবে। (ইহারাই পুরুষের প্রবর্তক)। অতএব হে অর্জুন, যে কর্ম তুমি করিতে ইচ্ছা কর না, স্বভাবজাত প্রারব্ধ কর্মদ্বারা কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া, অবশের ন্যায় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।

(গ) যে কর্ম করিতে ইচ্ছা নাই, অনিচ্ছাও নাই, কেবল অন্যের প্রীতিলাভের নিমিত্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাকে 'পরেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ' বলা হয়।

দৃষ্টান্ত দ্বারা উপরের কথাগুলিকে পরিষ্কার করা যাইতেছে—

দেহের সংশ্রবে যে সকল ব্যাপার ঘটে, তাহাই সাধারণতঃ মুক্ত পুরুষদিগের কর্ম সংজ্ঞাভুক্ত। ইহারই নাম প্রারব্ধ। চোর, ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া চুরি করে, পরের অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছা দ্বারা বেত্রাঘাত নামক প্রারব্ধ কর্ম তাহার শরীরের সংশ্রবে আইসে। আমি যখন সিড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গি,—ইহা চোরের চুরি করার ন্যায় ইচ্ছাকৃত নহে,—চোরের বেত্রদণ্ড ভোগের ন্যায় পরেচ্ছা কৃতও নহে,—অর্থাৎ ইহা কাহারও ইচ্ছা দ্বারা সাধিত হয় না বলিয়া ইহাকে 'অনিচ্ছাকৃত প্রারব্ধ' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ৪. ১৮

মুক্তপুরুষদিগের স্বাভাবিক লক্ষণ এই যে, তাঁহারা কর্মকে অকর্ম দেখেন, আর সকর্মকে কর্ম বলিয়া দেখেন; এজন্য তাঁহারাই বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকর্মকারী।

এই শ্লোকের কথাগুলি বড় জটিল, এজন্য আরও সহজ করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাইতেছে—

সাধারণ লোকেরা যাহাকে কর্ম বলিয়া মনে করে, তাহা দৈহিক ভোগসাধন জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, তাহাকে বলা হয় পার্থিব। পার্থিব কর্ম শরীর রক্ষার্থ প্রয়োজন। সাধারণের ন্যায় মুক্ত পুরুষদিগের দেহের প্রতি আত্ম বুদ্ধি নাই; এজন্য শরীরের ভোগ সাধনের জন্য পার্থিব কর্মমাত্রে তাঁহারা উদাসীন। সুতরাং শরীর রক্ষার্থ যে যে কর্মের প্রয়োজন, তাঁহারা সেই সকল কর্মকে অকর্ম দেখেন। পক্ষান্তরে, সাধারণ লোকেরা পারমার্থিক কর্মকে অকর্ম বলিয়া দেখে, যেহেতু তাহাদের শরীরের উপর দৃঢ়তর আত্মবুদ্ধি রহিয়াছে, এজন্য শরীর ধারণের নিমিত্ত যে যে কর্ম করা প্রয়োজন, তাহাই তাহারা করে, তদতিরিক্ত কোন কর্ম তাহার করিতে চাহে না। অর্থাৎ অপার্থিব বা পারমার্থিক কর্মে তাহাদের রুচি নাই,

মুক্ত পুরুষদিগের পারমার্থিক কর্মে অধিকতর অধ্যবসায় থাকায়,—সাধারণ লোকেরা যাহাকে অকর্ম দেখে,—সেই অকর্ম অর্থাৎ পারমার্থিক কর্মকেই, তাঁহারা কর্ম বলিয়া দেখেন।

উপরে বলা হইয়াছে যে, প্রারব্ধ কর্ম ভোগদ্বারা নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইয়া গেলে, তখন একেবারে কর্মক্ষয় হইয়া যায়, আর দেহ থাকে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। প্রারব্ধ কর্ম ভোগের জন্য যে দেহ রচিত হইয়াছে, যদি সেই দেহেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তবেই ঐ দেহের প্রারব্ধ কর্ম ভোগ দ্বারা নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইয়া গেলে, তখন আর দেহ থাকে না। কিন্তু যদি ঐ দেহে জ্ঞানোৎপত্তি না হয় তবে, প্রারব্ধ ভোগায়তন দেহ ধারণ করিয়া, ঐ দেহেই অনুষ্ঠিত ক্রিয়ামান কর্মগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার যাইয়া সঞ্চিত কর্মের মধ্যে জমা হইতে পারে। অর্থাৎ প্রারব্ধ দেহ ধারণ করিয়া আমি যে কর্ম করিয়া আসিয়াছি, যাহা করিতেছি, ও যাহা করিব, ঐ সমস্ত কর্মের মধ্যে এমন অনেক কর্ম করিতে পারি, যাহার ফল এবার এই দেহে ভোগ হইল না, সুতরাং তাহা সঞ্চিত কর্মের মধ্যে যাইয়া জমা হইল। এইরূপে ক্রিয়মান কর্মগুলি যদি সঞ্চিত কর্মের মধ্যে জমা হইতে থাকে, তবে পথ বাড়িয়া গেল, মুক্তি সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল।

জ্ঞান বিচার দ্বারা পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। আসক্তি যাহার যত কম, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞান-পথে উন্নীত। আসক্তিই বন্ধন, অনাসক্তি মোক্ষের হেতু।

অনেক সময়ে, এমন দেখা যায় যে, যে কর্ম করিয়া সাধারণ মনুষ্য বদ্ধ হয়, ঠিক সেই শ্রেণীর তেমন কর্ম করিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের বন্ধন ঘটে না। ইহার কারণ কি, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতাতে আছে,—

> ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
> ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ৪. ১৪

মদীয় কৃত কর্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না, যেহেতু কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই। এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্ম করিয়াও কদাচ কর্মে বদ্ধ হন না। গীতা বলিবার সময়, ভগবান তখন আত্মময় পুরুষ; সুতরাং তাঁহার তাৎকালিক অবস্থাই মুক্তপুরুষদিগের লক্ষণ। মুক্তপুরুষেরাও আত্মসত্তায় পরিণত হইয়া, কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধন প্রাপ্ত হন না।

আবার আরও পরিষ্কাররূপে বলিতেছেন,—

> ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
> কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ৪. ২০

সেই যে ব্রহ্মবিৎ পুরুষ, তিনি কর্ম ও তৎফলে-আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত সুতরাং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা, বা প্রাপ্ত বিষয়ের পরিরক্ষণ বিষয়ে যত্নবান না হইয়া, কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি কিছুই করেন না।

এই যে উপরে বর্ণিত অবস্থা, উহা মুক্ত পুরুষদিগের ঘটে, বিষয়াসক্ত-চিত্ত মনুষ্যেরা তাহার কোন সন্ধানই রাখে না,---যেহেতু তাহাদের চিত্ত বহির্মুখ পরায়ণ, সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি তাহাদের না থাকায়, তাহারা এ সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারে না।

তারপর বলিতেছেন,—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন, পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৫. ১০

কর্মসকল ব্রহ্মেআধান বা সমর্পন করিয়া, ইন্দ্রিয় সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক যিনি কর্ম করেন, তিনি কর্মফলে লিপ্ত হন না।—কিরূপ? না যেমন পদ্মপত্র সর্বদা জলে থাকিয়াও জলদ্বারা পরিলিপ্ত হয় না।

সাধারণ মনুষ্য স্থূলবুদ্ধিতে বুঝে যে, কর্ম করিলেই তাহার ভালমন্দ একটা না একটা ফল ফলিবেই। কর্ম করিব, অথচ তাহার ফলে আমার কোন ইষ্টানিষ্ট ঘটিবে না, এমন কথা হইতে পারেনা। বস্তুতঃ একথা,-বহির্মুখবৃত্তিপরায়ণ, সংসারাসক্ত জীবের উপযোগী কথাই বটে। তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে, শাস্ত্রগুলি, আমাদের বোধের বিপরীত কথা বলিতেছেন কেন? আমাদিগকে বোধের বিপরীত কথা বলায়, শাস্ত্রের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক অশ্রদ্ধার ভাব আইসে। সেই যে শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা, ইহাত সহজে দূর করা যায় না। কেন এমন হয়? অবশ্যই ইহার বিশেষ কারণ আছে।

বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিব যে, এগুলি, অবস্থা ভেদের কথা মাত্র। তুমি জ্বর ও রক্তামাশয়ে কাতর, তোমার পক্ষে দুধ, ঘি অপথ্য। আমি সুস্থদেহী, আমার কাছে উহা অপথ্য নহে, বরং সুপথ্য। সেইরূপ,—যাঁহাদের দেহের উপর আত্মবুদ্ধি নাই, তাঁহারা কর্ম করেন, অথচ কর্ম করিয়া, কর্মফলে বদ্ধ হন না। আর আমার দেহের প্রতি প্রগাঢ় আত্মবুদ্ধি রহিয়াছে,—বিশেষ মনযোগ সহকারে সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির পথ দিয়া আমি বিষয় সেবা করিতেছি, আমি কর্ম করিয়া সুতরাং কর্মে বদ্ধ হইতেছি। এস্থলে একমাত্র অবস্থাভেদে কর্মের বন্ধন ও অবন্ধন ঘটিতেছে।

মহামুনি দুর্বাসা, একদা যমুনা পার হওয়ার উদ্দেশ্যে যমুনাতটে উপস্থিত। যমুনার ঘাটে বহু দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে জল লইবার জন্য বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, বালকবালিকাগণ সঙ্গে লইয়া সমবেত হইয়াছে। পাছে বেলা অধিক হইয়া গেলে, বালকবালিকারা ক্ষুধায় ক্লেশ পায়, এজন্য মুড়ি, খই, ছাতু, গুড় যাহার যাহা ঘরে আছে, তাহার কিছু কিছু কাপড়ে বাঁধিয়া সঙ্গে আনিয়াছে। দুর্বাসা সহসা সেস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মায়েরা, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাইতে দাও। কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা কহিল, আপনাকে খাইতে দেওয়ার যোগ্য এমন কোন জিনিষ আমাদের সঙ্গে নাই। আমরা জল লইতে আসিয়াছি, কেবল ঐ ছেলে মেয়ে গুলির জন্য যৎসামান্য কিছু খাদ্য আনিয়াছিলাম, তাহা তাহারা খাইয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে। একথা শুনিয়া দুর্বাসা কহিলেন, উহাদের ভুক্তাবশেষ যাহা আছে, তাহাই দাও,

খাইয়া যমুনার জল পান করি। স্ত্রীলোকেরা তাহাই দুর্বাসার কাছে উপস্থিত করিল। দুর্বাসা তাহা আহার করিয়া উদর ভরিয়া যমুনার জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন,—"আমি যদি এখন কিছু না খাইয়া থাকি, হে যমুনে, তবে তোমার জল দুইদিকে সরিয়া যাইয়া আমাকে পথ দিউক, পরপারে যাই।" এই কথার পর যমুনার জল, সহসা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পথ রচনা করিয়া দিল; দুর্বাসা পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। স্ত্রীলোকেরা দেখিল, এ লোকটা মিথ্যাকথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া ওপারে চলিয়া গেল। কেন না দুর্বাসা তাহাদের চক্ষুর সামনে বসিয়া খাইল,—অথচ খাইয়া বলিল, যদি না খাইয়া থাকি যমুনা পথ দাও। এ কিরূপ কথা হইল। তাহারা কেহই ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারিলনা। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া তাহারা এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তবে সদুত্তর পাইল। শ্রীকৃষ্ণ সরহস্য সে কথা তাহাদিগকে সরল ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে সেকথাগুলি বলা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছ কি, যাহার ২।১ রাত্রি অনিদ্রা ভোগের পর, খুব গাঢ় নিদ্রা আসিল; সেই নিদ্রা ভঙ্গের পর সহসা জাগিয়া উঠিয়া, মনে করিতে পারিতেছে না, সে এখন কোথায় আছে, এখন দিবা কি রাত্রি, স্নানাহার করিয়াছে কি না। একথা শুনিয়া অনেক স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, হাঁ আমার তেমন অবস্থা একবার ঘটিয়াছে, আমার দুইবার তেমন অবস্থা হইয়াছে। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ঠিক্ এইরূপ মুক্ত পুরুষ দিগের দেহের প্রতি ভুল হইয়া থাকে। তবে, তোমাদের ভ্রান্তি ক্ষণিক, আর মুক্ত পুরুষ দিগের ঐরূপ ভ্রান্তি তদপেক্ষা স্থায়ী। এই মাত্র তফাৎ। দুর্বাসা আহার করার পরক্ষণেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আহার করিয়াছেন কিনা? আহার রূপ ব্যাপারটা দৈহিক কিনা, তাই তাঁহার ঐরূপ ভ্রান্তি হইয়াছিল।

উপরের কথিত প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বন করিয়া এক্ষণে বলা যাইতে পারে, দৈহিক কর্ম করিয়া তত্তদ্ ফলে মুক্ত পুরুষ দিগের কোনরূপ আসক্তি থাকে না, সুতরাং বন্ধন ও ঘটে না। নিম্নোদ্ধৃত গীতোক্তি একথার সমর্থন করিতেছে।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধি র্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮।১৭

আমি কর্তা, আমাদ্বারা এই কর্ম সম্পাদিত হইল, এরূপ ভাব যাঁহার নাই, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় পথে যিনি বুদ্ধিদ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, এমন যে আত্মদর্শী লোক, তিনি সকল লোকের হনন করিলেও হনন জনিত পাপে লিপ্ত হন না।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা॥

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

শ্রব্যকাব্যে কালিদাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র, এম্. এ.

ত্রয়োদশ সর্গে কল্পনামহোৎসবে মাতোয়ারা কবি তাঁহার বিপুল বিভব লইয়া পরিপূর্ণ-মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। লঙ্কাসমরে বিজয়ী রামচন্দ্র পুষ্পকবিমানে সীতাকে লইয়া অযোধ্যার অভিমুখী হইয়াছেন। রাবণের অশোকবনে চেড়ীপরিবৃতা সীতার দুঃখাবসানে অতীত সুখদুঃখের পসরা তাঁহাদের মানসনেত্রে উপনীত হইল। সীতার চিত্ত-বিনোদনের জন্য রামচন্দ্র সীতার পরিচিত অপরিচিত স্থান সমূহ দেখাইতে লাগিলেন। কুমার-সম্ভবের হিমালয়ের মত রঘুবংশের সাগরও বিরাট, মহৎ। কবি রামচন্দ্রকে সাগরের গুণগানে মুখর করিয়াছেন। এখানে প্রত্যেকটী উপমা মনোজ্ঞ, রত্নাকরের মহত্ত্বের কথা প্রত্যেকটীই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পুষ্পকের সাথে সাথে কবিও ছুটিয়া চলিয়াছেন। পাছে তাঁহার কল্পনার দুলাল রাম-চন্দ্রের আনন্দ নিবেদনের একটী কথাও হারাইয়া যায়, যে এই ভয়ে তিনি উৎকর্ণ। রামের প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল দুইটী উদারতার প্রতীকের উপর—সুনীল আকাশ, যাহাতে নক্ষত্রেরা দল বাঁধিয়া ছায়াপথকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, আর ফেনিল উচ্ছল সমুদ্র,—শরণাগত বৎসল, আত্মমহিমায় দশদিক ব্যাপ্ত করিয়া বিষ্ণুর ন্যায় অবস্থিত সমুদ্র। দূরে সৈকত রেখা।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
—র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥

—বহুদূরে বন-নীল বেলাভূমি। উজ্জ্বল সাগরের বুকে সফেন জলরাশি নৃত্যপরায়ণ। বহুদূরে দিগ্‌বলয় রথচক্রের ধারায় কলঙ্করেখার মত। শ্লোকটী পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, কবির ধ্যাননেত্র অতদূরের তটরেখার শ্যাম সমারোহে বিমুগ্ধ। পদবিন্যাসনৈপুণ্যে অনেক স্থলেই অর্থের উপলব্ধি হয়। অনুকার শব্দগুলির ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধারণ কথার রাশি সাজাইয়া কলাকৌশলে ভাবের রূপায়নে বাহাদুরি আছে। কালিদাস এই বাহাদুরির দাবী করিতে পারেন অনায়াসেই। উদ্ধৃত শ্লোকটী পাঠ করিলে সাগরতীরের দূরত্ব সহজেই অনুভূত হয়।

রথ সাগরতীরে আসিয়া পড়িয়াছে। মুক্তারাশি এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া আছে। দূর হইতে মনে হইয়াছিল, তীরে শুধু তমাল ও তালীবন। এখন ভ্রম কাটিয়া গিয়াছে। স্বভাব কবি পশ্চাতে একবার কুতূহলাবিষ্ট হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—

"এষা বিদূরী ভবতঃ সমুদ্রাৎ
সকাননা নিষ্পততী ভূমিঃ।"

—সমুদ্র বেগে দূরে সরিয়া যাইতেছে, আর কাননের সহিত এই ভূমি সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। এই প্রকারের গতিশীল রথে আরোহণ করিলে নীচের বা চারিদিকের দৃশ্য কিরূপ দেখায়, তাহার যথাযথ বর্ণনা আমরা শকুন্তলাতেও পাইয়াছি।

কামচারী পুষ্পক কখনও সুরপথ, কখনও মেঘপথ, কখনও বা বিহঙ্গপথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। সীতার রূপের স্পর্শ পাইবার জন্য অধীর মেঘ বিদ্যুতের ছলে তাঁহার হাতে সুবর্ণবলয় পরাইয়া দিল। ক্রমে গিরি-কান্তার, তপোবন, নদনদী, সরোবর রথের তলে বিচিত্র দৃশ্যাবলীর সৃষ্টি করিল। ছবির পর ছবি আসিতেছে আবার চোখের পলকে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। রামচন্দ্র যেখানে যেখানে চোখের জলে সীতার সন্ধান লইয়াছিলেন, সেই সেই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবার কালে করুণ দৃষ্টিতে সীতার মুখের পানে চাহিয়া কত কথাই বলিলেন! সে কি ভুলিবার জিনিষ?

অনুরূপ প্রসঙ্গে ভবভূতি সীতার মুখে সহানুভূতি মাখানো কথা বসাইয়াছেন—"অই দেব রহু উলানন্দ! এব্বং বি মম কারণাদো কিলিস্তো আসী"—অয়িদেব রঘুকুলানন্দ! এই হত-ভাগিনীর জন্য এতখানি ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলে?" কালিদাস কিন্তু সীতাকে দিয়া কথা বলান নাই। তাঁহার আর্টের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। বহুকাল পরে আজ রামের পাশে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে সীতা কখনও আনন্দে কখনও বা শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়িয়া আজ তিনি কথা কহিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

সরযূর কথা বলিতে গিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"সেয়ং মদীয়া জননীব,"—এই সরযূ আমার জননী কৌশল্যার ন্যায়। তাঁহার এই বাক্য সার্থক হইয়াছে। জীবন সায়াহ্নে এই সরযূই মাতার যত্নে রামের দ্বিতীয় জীবন লক্ষ্মণকে আপনার প্রেমাপ্লুত বক্ষে আশ্রয় দিয়াছেন। রামচন্দ্রকেও বস্তুতঃ সরযূই আশ্রয় দিয়াছিলেন। কৌশলী কবি কৌশলে রামকে দিয়া নদীকে 'মা' বলাইয়াছেন।

রথ অযোধ্যায় আসিল। প্রজারা মহোৎসবে মাতিল। আত্মীয় পরিজনের সহিত আবার মিলন হইল। রাম অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। ভরত আজ দায়মুক্ত হইলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্র কৈকেয়ীকেও নানা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। "জহার লজ্জাং ভরতস্য মাতুঃ"—এইভাবে "ভরতের" মাতার লজ্জা দূর করিলেন। রামের ক্ষমাগুণে বশীভূতা কৈকেয়ী, যিনি পূর্বে একমাত্র ভরতেরই মাতা ছিলেন, তিনি আজ চারিভ্রাতার মাতা হইলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে স্বার্থপরতার লজ্জা দূর হইয়া তাঁহাকে আবার মহিমার পথে তুলিয়া দিল।

অযোধ্যার শ্রী দিনে দিনে রাজপুরীর আনন্দ উৎসবের পরিবেশে বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু এত সুখ সীতার ভাগ্যে থাকিবে, উহা বিধাতার সহিল না। দুঃখিনী সীতার অদৃষ্ট চিরতরে

অন্ধকার করিয়া 'ঈশানের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের' মত নির্বাসন আদেশের অক্ষরগুলি রামের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্মণ রথস্থা সীতাকে গঙ্গাতীরে নামাইতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহার শঙ্কিত মন চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে চরিত্র-দেবতা গঙ্গা তরঙ্গ-হস্ত তুলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতেছেন—নিষ্ঠুর লক্ষ্মণ! এমন নৃশংস আচরণ হইতে বিরত হও। রামচন্দ্রকে মহাভ্রম হইতে উদ্ধার কর। কি করুণ দৃশ্য! সীতার দুঃখে প্রকৃতি গলিয়া গিয়াছে—"অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।" তরঙ্গ আজ প্রকৃতির হস্ত রূপে মানুষের কাছে অনুনয় জানাইতেছে। কিন্তু সরলা সীতা যে 'মহারাজ' রামের আদেশে অযোধ্যার সুখ হইতে বঞ্চিত। প্রকৃতির অশ্রুবন্যায় সে আদেশ টলিবে না। সীতার জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যথার্থ সাধ্বী—

'আত্মানমেব স্থিরদুঃখভাজং
পুনঃ পুনর্দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ।'

—বিনা অপরাধে নির্বাসিতা হইয়াও স্বামীর নিন্দা না করিয়া জন্ম দুঃখিনী আপনাকেই পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিলেন। সীতাচরিত্র অদ্ভুত। একমাত্র ভারতেই সীতাকুসুম ফুটিতে পারে, অন্যত্র নহে। অন্যদেশের হইলে সম্মুখে উপস্থিত লক্ষ্মণ হইতেন 'দুষমন'। কিন্তু ক্ষমাশীলা সীতা দেবরকে সোহাগ করিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃভক্তিতে চমৎকৃত হইলেন, তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। রামের প্রতি সামান্য অভিমান হইলেও তাহা চাপিয়া গেলেন,—নিজেরই কৃতকর্মের ফল বলিয়া বিপুল দুঃখকে বরণ করিয়া লইলেন। নিজের যাহা কিছু বলিবার ছিল, দেবরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। মহারাণীর গাম্ভীর্য, নারীর সরলতা, ভর্ৎসনার সূক্ষ্মতা, সীমাহীন শোক—এই সকল মিলিয়া তাঁহার উক্তিকে বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ করিয়া তুলিয়াছে। করুণরস প্রকাশে কবি এখানে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা মিলে না। অন্য কবি হইলে সীতাকে লক্ষ্মণের সম্মুখেই কাঁদাইতেন কিংবা তাঁহার মুখে অভিশাপের গ্লানিকর উক্তি বসাইয়া দিতেন। কিন্তু কালিদাসের সীতা রঘুকুলবধূ হইয়া গর্হিত আচরণ করিতে জানেন না। এক্ষেত্রে গাম্ভীর্যের প্রয়োজন আছে।

লক্ষ্মণ ফিরিয়া গেলে নিরুদ্ধ শোকাবেগ তাঁহার হৃদয় নিপীড়িত করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া চলিল। তিনি তখন "বিগ্না কুররীব"—ভীতা কুররী পক্ষিনীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে কাঁদিলেন। শকুন্তলার বিরহে তপোবনের যে অবস্থা হইয়াছিল, সীতার শোকেও বনের সেই দশা উপস্থিত হইল। প্রেমিক, ঋষি, কবি বাল্মীকি, 'যস্য শোকঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত"—যাঁহার শোক শ্লোকে রূপান্তরিত হইয়াছিল—তিনি আসিয়া সীতাকে সান্ত্বনা দিলেন। সীতা আশ্রমে থাকিয়া বালপাদপগুলিকে সযত্নে বর্ধিত করিতে করিতে পুত্রপালন-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ওদিকে ধর্মনিষ্ঠ রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সীতার মহিমময়ী মূর্তি অঙ্কিত হইয়া রহিল।

ষোড়শ সর্গে কবি একটী অদ্ভুত অতি প্রাকৃতিক ঘটনার আশ্রয়ে তাঁহার প্রতিভাকে

উৎসারিত করিয়াছেন। রাজধানী কুশাবতীতে কুশ রাজত্ব করিতেছেন। অযোধ্যাপুরী শূন্য নিস্তব্ধ। হৃতগৌরবা অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দর্পণতলে প্রতিবিম্বের মত রজনীযোগে কুশের নিরুদ্ধদ্বার বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন। কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশের পরস্ত্রীবিমুখ মনের কথা স্মরণ রাখিয়া আপনার পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য বলুন।" উত্তরে দেবী কি বলিবেন? হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যায়! হায়! অযোধ্যার রাজপথে এখন শৃগাল বিচরণ করে। মেরুস্পর্দ্ধী সৌধশ্রেণী বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে, বন্যমহিষ প্রমোদ সরোবর কলুষিত করিতেছে, উৎসবান্তে মৃৎপাত্রের মত অযোধ্যা ঘৃণাভাজন, পরিত্যক্ত। রাজা শুনিলেন, অযোধ্যায় রাজধানী আবার উঠিয়া আসিল। সরযূ নদীতে তক্ষকতনয় কুমুদ কুশের বিক্রমে ভীত হইয়া ভগিনী কুমুদ্বতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কবি রঘুবংশ মালিকায় নূতন নূতন কুসুম গাঁথিয়া দিলেন।

'রঘুবংশে'র শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ। কামুক, ইন্দ্রিয়সেবী, ভোগসর্বস্ব রাজা বভুক্ষিত ও বিচারপ্রার্থী প্রজাদের নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া অন্তঃপুরচারী হইলেন।

'ইন্দ্রিয়ার্থপরিশূন্যমক্ষমঃ
সোঢ়ুমেকমপি স ক্ষণান্তরম্।'

—ইন্দ্রিয়ের বিষয়শূন্য ক্ষণমাত্রও রাজা অগ্নিবর্ণ সহিতে পারিতেন না। সর্ববিধ কামকলায় অভিজ্ঞ হইয়া তিনি স্ত্রীব্যসনেই গা ঢালিয়া দিলেন।

বিধির অমোঘ বিধানে অগ্নিবর্ণ মরিয়াছেন। কর্তব্যে অবহেলা করিয়া তিনি শাস্তি পাইয়াছেন। তাঁহার মরণে কবির আদর্শেরই জয় হইল। কালিদাস গ্রন্থশেষে অগ্নিবর্ণ মহিষীর গর্ভস্থ সন্তানের সংবাদ দিলেন। তাঁহার অভিষেকও হইয়া গেল। এ যেন রাহুমুক্ত চন্দ্রের প্রকাশ,—ধূমকেতু বিলায় মঙ্গলাচরণ। পাঠকের মন উন্মার্গগামী অগ্নিবর্ণের অ-রঘুবংশোচিত জীবনযাত্রায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এখন নূতন আশায় তাহা আবার রঞ্জিত হইল।

মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি মহৎ আদর্শের সূচনায়। কিন্তু এখানে তাহা হইল না। এমত হইতে পারে, কবির কল্পনাকে ব্যাহত করিয়া কাল তাঁহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল—মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের মত 'জাল কবির' হাতে পড়িয়া রঘুবংশকে দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। অথবা পূর্বে যেমন বলিয়াছি—রঘুবংশ ইতিহাস ও কাব্যের অপূর্ব সমন্বয়। পাঠক! কুমারসম্ভবের হিমালয় প্রশস্তির সেই শ্লোকটী স্মরণ করুন।

রঘুবংশ-রূপ বিমলচন্দ্রকিরণের মধ্যে কলঙ্ক স্বরূপ অগ্নিবর্ণ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে—

এক হি দোষে গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

রঘুবংশ কালিদাসের প্রতিভার অনবদ্য অবদান। (ক্রমশঃ)

ভক্তের বিরহ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ

বিরহ যখন নিবিড় হয়, তখন ভক্ত শয়নে স্বপনে, ঘটে পটে, জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে কেবলই তাঁহার চিরবাঞ্ছিতকে দেখেন। ত্রিভুবনে যেন তাঁহার প্রাণের দেবতা ভিন্ন আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। তখন কিবা অন্তরে কিবা বাহিরে তাঁহার প্রিয়তমের স্ফুরণ হয়।

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ।
স্থাবর জঙ্গমে দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)
যখন বিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে থা কি
সে নটবর বেশে, দাঁড়ায় এসে,—দেখি।

(কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিনী)

এতদবস্থায় ভক্ত তাঁহার প্রিয়তমের সত্তায় ডুবিয়া যান; তিনি যে তাঁহার প্রিয়তম হইতে পৃথক বা তাঁহার প্রিয়তম অন্তরালে রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পাইতেছেন না—এ বোধ তখন তাঁহার থাকে না। 'তিনি' এবং 'আমি'—এই দ্বৈতের লোপ হয়। তখন 'আমি' নাই, কেবল 'তিনি'ই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন,—"নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ।" ভালবাসা বা প্রেম রাজ্যের ইহাই নিয়ম। চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ॥

পারস্য কবি জামী বলিয়াছেন---

"All that is not one must ever
Suffer with the wound of absence
And whoever in love's city
Enters finds but room for one
And but in oneness union."

এ সম্বন্ধে পারস্য মরমী সাধক সুফীদিগের মধ্যে একটি সুন্দর রূপক গল্প প্রচলিত আছে। তাহা এই—একজন প্রেমিক তাঁহার প্রিয়ার গৃহদ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন 'দ্বার খোলো'। প্রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" প্রেমিক বলিলেন "আমি"। দ্বার খোলা হইল না। প্রেমিক দ্বিতীয়বার দ্বারে আঘাত করিলেন, আবার প্রশ্ন হইল, "কে তুমি"? এবারে প্রেমিক তাঁহার নাম বলিলেন। এবারেও দ্বার খুলিল না। প্রেমিক তৃতীয়বার দ্বারে আঘাত করিলেন। পূর্বের মত প্রশ্ন হইল, "কে তুমি"? এবারে কিন্তু প্রেমিক বলিলেন,—প্রিয়ে, আমি হচ্ছি তুমিই। তখন দ্বার খুলিল।

ভক্ত তাঁহার প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনাও করেন, তাঁহার সহিত একত্বভাবের জন্য---

"এই কর হরি দীন দয়াময়,
তুমি আমি যেন দুটি নাহি হয়,
জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয়
চিন্ময় চির সুন্দর।" (কৃষ্ণানন্দস্বামী)

কিন্তু তিনি ঐ ভাবে সর্বক্ষণ থাকিতে পারেন না। তিনি বলেন---

"ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, মন,
চিনি খেতে ভালবাসি।" (রামপ্রসাদ)

এজন্য তিনি দ্বৈতভাবে নামিয়া আসেন,—তখন তাঁহার বড় সাধ যে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের–চিরসুন্দরের রূপ দেখিবেন, তাঁহার অমিয়মাখা কথা শুনিবেন, তাঁহার দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করিবেন, তাঁহার অধর সুধা পান করিবেন, তাঁহাকে আপন বাহু যুগলের মধ্যে বক্ষে ধারণ করিবেন–

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণে পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ (জ্ঞান দাসের পদাবলী)

তখন ভক্ত কতই বিলাপ করেন প্রিয়তমের অদর্শনে—

(১) হা নাথ! রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥
(গোপীদিগেরবিলাপ-শ্রীমদ্ভাগবত)

(২) যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে॥ (শ্রীচৈতন্য দেবের উক্তি)

৩) অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥

* * * *

শুন ভেল মন্দির, শুন ভেল নগরী।
শুন ভেল দশদিশ শুন ভেল সগরী॥
কৈছনে যায়ব যামুন তীর।
কৈছেন নেহারব কুঞ্জ কুটির॥ (বিদ্যাপতির পদাবলী)

(৪) ক নন্দ কুল চন্দ্রমা : ; ক শিখি চন্দ্রিকালঙ্কৃতি :
ক মন্দ্র-মুরলী-রব : ক নু সুরেন্দ্র-নীল-দ্যুতি :।
ক রাস-রস-তাণ্ডবী ক সখি জীব রক্ষৌষধিঃ॥ (ললিত মাধব নাটক)

(৫) বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥ (বিদ্যাপতির পদাবলী)

(৬) হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি জনম বহি গেলা॥ (বিদ্যাপতির পদাবলী)

(৭) আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যামবঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
(চণ্ডীদাসের পদাবলী)

(৮) পুন নাহি হেরব সে চাঁদ বয়ান।
দিন দিন ক্ষীণ তনু, না রহে পরাণ॥

* * * *

নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে ফাটি যায় মোর হিয়া॥

(৯) কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদ বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
(বলরাম দাসের পদাবলী)

(১০) সখিরে!—কোথায় সে প্রাণবল্লভ মুরলীবদন।
তাহারে না দেখি' মোর না রহে জীবন॥
(কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গন্ধর্ব্ব মিলন)

(১১) কোথা গো, বিশাখে,
দেখা সে বঁধুকে,
না দেখে বিধু মুখে
পরাণ যে যায় দুখে।
(কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিনী)

(১২) কোথা রইলে প্রাণনাথ, ওহে নিঠুর মুরলী বদন !
(কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিনী

(১৩) হায়রে, কোথায় আজি শ্যামজলধর ;
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ ! একাকিনী,
রাধারে ভুলিলে কিহে রাধা-মনোহর ?
(ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

(১৪) কোথা হে রাখাল চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি ! শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,
আইল গোধুলি, কোথা রহিল মাধব ?
(ব্রজাঙ্গনা কাব্য)

(১৫) কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কই।
হ'ল মন উচাটন, প্রাণ ধৈর্য্য মানে না, প্রাণ সই।
ক্ষণেক উঠি, ক্ষণেক বসি,
পড়ে পাতের উপর পাত, এই এল রাধা নাথ,
ব'লে কুঞ্জের দ্বারে আসি।
(রাম বসুর পদাবলী)

(১৬) হায় ! যদবধি হরি গেছে মধুপুরী,
অনাথিনী করি গোপী গণে।
তদবধি চিত, হয় চমকিত,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে ॥
হায় ! কোথা গেলে পাব, সে প্রাণ মাধব,
কিরূপে মিলিব তার চরণে।
কদম্বের তল, বিহারের স্থল,
হেরে আঁখি জল বহে সঘনে ॥
(হরু ঠাকুরের পদাবলী)

Father ! Father !

Why hast Thou forsaken me ?—Jesus Christ.

As the hart panteth after the waterbrooks, so panteth
my soul after Thee, O God. – Psalms.

Ah ! return, and love me still ;
See me subject to Thy will ;
Frown with wrath, or smile with grace,
Only let me see Thy face !
King, and Lord, whom I adore,
Shall I see Thy face no more ?—Madame Guyon.

,Lord, since Thou hast taken from me all that I had of Thee, yet of Thy grace leave me the gift which every dog has by nature : that of being true to Thee in my distress, when I am deprived of all consolation. This I desire more fervently than Thy heavenly kingdom !"

—St. Mechthild of Magdeburg.

O burn that burns to heal !
O more than pleasant wound !
And O soft hand, O touch most delicate,
That dost new life reveal,
That dost in grace abound,
And, slaying, dost from death to life translate !

—St. John of the Cross.

Oh, oh this heart of mine doth pant,
And beat for Thee !
Come, dear Lord, come, and grant
Thyself to me. —A mystic poet.

When wilt Thou come unto me, Lord ?
For, till Thou dost appear,
I count each moment for a day,
Each minute for a year. —Thomas Shepherd.

With Thee a prison would be a rose garden, oh Thou ravisher of hearts : with Thee hell would be paradise, oh Thou cheerer of souls.

—Rumi.

ভক্ত যখন এইরূপ খেদোক্তি করিতে থাকেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি স্বীয় অন্তরে নিবদ্ধ হয়—তিনি তথায় অনুসন্ধান করিতে থাকেন--কি পঙ্কিলতা রহিয়াছে, যাহার জন্য প্রাণের দেবতা তাঁহাকে দেখা দিতেছেন না। ভক্ত দেখেন যে তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগুলির আক্রমণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই; তিনি জীবমাত্রকে তাঁহার প্রিয়তমের পরিজন জ্ঞানে, কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে পারেন নাই; প্রিয়তম তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই--দুঃখ, শোক, তাপ, যাহা পাইয়াছেন তাহা প্রিয়তম দিয়াছেন, তাঁহার কৃত কর্মের অপরিহার্য ঋণশোধের জন্য, তাঁহার দুষ্কৃতি ক্ষয়ের জন্য, তাঁহাকে পবিত্র করিয়া 'আপনার' করিয়া লইবার জন্য। কিন্তু, ইহা না ভাবিয়া তিনি তাঁহার প্রিয়তমের উপর অযথা কতই দোষারোপ করিয়াছেন। এইরূপে আপনাকে বহুদোষে দোষী জানিয়া তিনি কাতর কণ্ঠে প্রিয়তমকে ডাকিয়া বলেন—প্রভো! তোমার শ্রীচরণে আমি অগণিত অপরাধে অপরাধী---আমাকে ক্ষমা কর; দেব! তুমি ত জান, আমি কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য---চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য, কতই চেষ্টা করি, কিন্তু সফল হইতে পারি না। রিপুজয়ী হওয়া, চিত্তশুদ্ধি করা আমার সাধ্যাতীত। নাথ! আমি বড়ই দুর্বল—কিন্তু আমার বড় সাধ—তুমি আমায় দেখা দিয়া কৃতার্থ করিবে। হে দয়ার ঠাকুর! তুমি দয়া করিয়া দেখা না দিলে আমার সাধ কেমন করিয়া মিটিবে? হা নাথ! কোথা তুমি! এস, এস, প্রভো! দেখা দাও! দেখ, তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ বড় কাতর। কাতর হ'য়ে তোমায় ডাকিলে তুমি তো দেখা দাও, তবে কেন আমায় দেখা দেবে না?

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে, মরণে জনমে, জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমপিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥

(ক্রমশঃ)

কার্য ও কারণ (১)*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

কার্য কারণের ফল না তাহারই বিস্তৃতি মাত্র? এই প্রশ্ন চিরদিনই দার্শনিকদিগের একটি প্রধান সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভারতীয় সাংখ্যগণের ন্যায় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক-গণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে কার্য কারণেরই বিস্তৃতি মাত্র এবং এতদ্দ্বয়ের সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু Aristotelian Logic-এর প্রভাবে গ্রীক্ দর্শন যে-পথে পরিচালিত হইল তাহাতে প্রায় দুই সহস্র বৎসরের জন্য ইউরোপীয় দর্শনে কার্য ও কারণের প্রকৃত সম্বন্ধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসারই আর অবকাশ রহিল না। তথাকথিত কারণ ও কার্য যে প্রকৃত পক্ষে antecedent ও consequent মাত্র, cause ও effect নহে, এ-কথা ইউরোপীয় নব্য নৈয়ায়িক-দের কেহ কেহ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না, কারণ antecedent ও consequent-এর এই অনন্ত ধারা সম্ভব হইল কিরূপে? বিভিন্ন দার্শনিক এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়াছেন। Descartes ও Spinoza যথাক্রমে সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট ঈশ্বর স্বীকার করিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিলেন। Descartes-এর দ্বৈতবাদ ও Spinoza-র জড়স্বভাব চৈতন্য অস্বীকার করিয়া Leibniz জড় ও চৈতন্যের দ্বন্দ্ব দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার করিলেন যে পরিবর্তনশীলতাই হইল বস্তুর ধর্ম। Bergson এই দিক হইতে Leibniz-এর মন্ত্রশিষ্য। এই তিন ইউরোপীয় দার্শনিকের প্রচারিত প্রধান তত্ত্বগুলি বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীগণ যাহা বলিতেন তাহার অবিকল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় সর্বপ্রথম—James Mill-এর কথায়; তাঁহার মতে বিশ্বপ্রপঞ্চ হইল একটি "Thread of consciousness।" কথাটি শুনিলেই মনে হইবে যে ইহা বৌদ্ধ দার্শনিকদের প্রকথিত "বিজ্ঞান-সন্ততি"র ইংরাজী অনুবাদ। John Stuart Mill আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে এই "Thread of consciousness" বিভিন্ন "link"-এর সমন্বয়ে গঠিত, এবং এই সকল link-এর মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না:—"Whatever number of links the chain of causes and effects may consist of, how any one link produces the one which is next to it, remains equally inexplicable to us." ইহা খাঁটি বিজ্ঞানবাদের কথা। তবে Mill যাহা অযৌক্তিক বলিয়া বুঝিয়াও সংস্কারবশতঃ অস্বীকার করিতে সাহস করেন নাই বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নির্ভয়ে তাহা অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তত্ত্বসংগ্রহে এ-সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে তাহা হইতে এ-কথা বুঝা যাইবে।

প্রথমে পূর্বপক্ষী আপত্তি তুলিতেছেন:—

ক্ষণিকানিত্যতালীঢ়ং সর্বং চেদ্বস্তু তৎ কথম্।
কর্মতৎফলসম্বন্ধকার্যকারণতাদয়ঃ ॥ ৪৭৬ ॥

---

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 19.

অর্থাৎ, সর্ববস্তুই যদি ক্ষণিকত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় তবে কর্ম ও কর্মফল, কারণ ও কার্য প্রভৃতির সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হয়?—শান্তরক্ষিত কারিকাটিতে বিশেষ করিয়া ক্ষণিকত্ব রূপ অনিত্যতার কথা বলিয়াছেন; কমলশীলের মতে অন্য সকল প্রকারের অনিত্যতার অবচ্ছেদই এখানে আচার্যের উদ্দেশ্য। এবং "প্রভৃতি" বলিতে এখানে বুঝাইতেছে হেতু ও ফলের সম্বন্ধজ্ঞাপক প্রমাণ, যাহা অনুভূতির পর প্রত্যভিজ্ঞানে, দৃষ্ট পদার্থ পুনরায় দেখিবার বাসনায়, বন্ধনের পর মুক্তিতে, অনুভূত দ্রব্যের স্মৃতিতে, সংশয়ের পর মীমাংসা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যাপারেও দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে সকলেই যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিজ্ঞাই কখন টিকিতে পারে না। বৌদ্ধ কিন্তু ক্ষণিকত্ব সমর্থনের উদ্দেশ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া সর্বসম্মত একটি বিশ্বাসের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা অগ্রাহ্য। তাহার উপর আরও জিজ্ঞাস্য, কারণ (=কর্ম) ও কার্যের (=ফল) মধ্যে যদি কোন সম্বন্ধই না থাকে তবে একজনের কৃতকর্মের ফল অপর একজনে অর্শাইবে না কি? এরূপ কথা যে সর্বশাস্ত্রবিগর্হিত তাহা বলাই বাহুল্য।

যঃ ক্ষণঃ কুশলাদীনাং কর্তৃত্বেনাবকল্প্যতে।
ফলপ্রসবকালে তু নৈবাসাবনুবর্ততে ॥ ৪৭৭ ॥
যঃ ফলস্য প্রসূতৌ চ ভোক্তা সংবর্ণ্যতে ক্ষণঃ ॥
তেন নৈব কৃতং কর্ম তস্য পূর্বমসংভবাৎ ॥ ৪৭৮ ॥
কর্মতৎফলয়োরেবমেককর্ত্রপরিগ্রহাৎ।
কৃতনাশাকৃতপ্রাপ্তিরাসক্তাতিবিরোধিনী ॥ ৪৭৯ ॥

এই কারিকা তিনটিতে নূতন কথা কিছু নাই। এখানে বলা হইতেছে, ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে একই কর্মের কর্তা ও ফলভোক্তা বিভিন্ন ব্যক্তি, কারণ কার্যের কর্তা এই মতে ফলোৎপত্তির সময়ে আর উপস্থিত থাকিতে পারে না। ফলোৎপত্তিকালে যে-ব্যক্তি ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হয় কর্মকালে তাহার যখন অস্তিত্বই ছিল না তখন ইহাও নিশ্চিত যে সেই কর্মের কর্তা ছিল অপর কোন ব্যক্তি। সুতরাং কর্মের কর্তা ও তাহার ফলভোক্তার একত্ব স্বীকার না করায় কৃতকর্মের বিনাশ এবং অকৃত কর্মের ফলপ্রাপ্তি অপরিহার্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহা যে সর্বনীতিবিগর্হিত তাহা নিঃসন্দেহ।

পূর্বপক্ষী এইবার কুমারিল ভট্টের যুক্তি উত্থাপন করিয়া (কুমারিলমতোপন্যাসেন) বলিতেছেন যে কর্মকর্তা ও ফলভোক্তার সম্বন্ধবিপর্যয়ই ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি নহে; আত্মারূপ কোন স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে জীবের কর্মে প্রবৃত্তিই আসিতে পারে না :—

নৈরাত্ম্যবাদপক্ষে তু পূর্বমেবাববুধ্যতে।
মদ্বিনাশাৎ ফলং ন স্যান্মত্তোহন্যস্যাপি বা ভবেৎ ॥ ৪৮০ ॥

ইতি নৈব প্রবর্তেত প্রেক্ষাবান্ ফললিপ্সয়া।
শুভাশুভক্রিয়ারম্ভে দূরতস্ত ফলং স্থিতম্॥ ৪৮১ ॥

কমলশীল এই কারিকাদ্বয়ের ব্যাখ্যাচ্ছলে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে ক্ষণিকত্ব স্বীকার করার অর্থ সকল ভাববস্তুর নৈরাত্ম্য স্বীকার করা, কারণ কার্য যখন সর্বত্রই হেতুর মুখাপেক্ষী তখন কার্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকিলে হেতুক্ষণের সহিত কিরূপে তাহার যোগ রক্ষা হইবে? সমস্ত কার্যই অস্বতন্ত্র এবং হেতুপরতন্ত্র; সুতরাং কার্য স্বীকার করিলে এ-কথা আর বলা চলিবে না যে হেতু বা পরিণামের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তদুপরি বিবেচ্য, এই ক্ষণের জীবের যদি জানা থাকে যে পরক্ষণে আর তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না এবং এই ক্ষণের কার্যের ফল যখন পরবর্তী কোন ক্ষণে ভিন্ন ভোগ করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে এই ক্ষণের জীব ক্ষণান্তরস্থ অপর কোন জীবের ভোগবিধানের জন্য কর্ম করিতে যাইবে কেন্?—এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ক্ষণিকত্ব সত্য হইলে কর্ম ও কর্মফলের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাহাতে যে কার্যকারণ সম্বন্ধেরও অনুপপত্তি ঘটে তাহাই দেখাইবার জন্য কুমারিল বলিয়াছেন :—

নানাগতো ন বাতীতো ভাবঃ কার্যক্রিয়াক্ষমঃ।
বর্তমানোঽপি তাবস্তং কালং নৈবাবতিষ্ঠতে॥ ৪৮২ ॥

অর্থাৎ, অতীত বা অনাগত ভাববস্তু কার্যোৎপাদন করিতে পারে না, এবং ভাববস্তু ক্ষণিক হইলে বর্তমানেও তাহা কার্যোৎপাদনের সময় পাইবে না।—পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে এই কথাই বিশদভাবে বুঝাইয়া বলা হইয়াছে :—

ন হ্যলব্ধাত্মকং বস্তু পরাঙ্গত্বায় কল্প্যতে।
ন বিনষ্টং ন চ স্থানং তস্য কার্যকৃতিক্ষমম্॥ ৪৮৩ ॥
পূর্বক্ষণবিনাশে চ কল্প্যমানে নিরন্বয়ে।
পশ্চাত্তস্যানিমিত্তত্বাদুৎপত্তির্নোপপদ্যতে॥ ৪৮৪ ॥

অর্থাৎ যে-বস্তু নিজেই এখনও আত্মলাভ করে নাই (অনাগত) তাহা কখনই অপর কোন বস্তুর কারণস্বরূপ হইতে পারে না। যাহা অতীত তাহাও এই কারণেই কার্যোৎপাদনে অসমর্থ। বর্তমান বস্তুও যে কার্যোৎপাদন করিতে পারে তাহাও নহে, কারণ তাহা ক্ষণমাত্র স্থায়ী। আরও কথা এই যে, পূর্বক্ষণের বস্তুর যদি নিরন্বয় (absolute) বিনাশ ঘটিয়া থাকে তবে তাহার কার্যস্বরূপ অনুবর্তী ক্ষণের বস্তুরও আর উৎপত্তি ঘটিতে পারিবে না।

বৌদ্ধ এইবার মীমাংসকের এই আপত্তির চমৎকার একটি উত্তর দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, পূর্বক্ষণের বিনাশের পর নহিলে যে উত্তরক্ষণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ঘটে না তাহা নহে; দাঁড়িপাল্লার একদিক উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অপর দিক নামিয়া পড়ে, পূর্বক্ষণের বিনাশ

ও উত্তরক্ষণের উৎপত্তিও সেইরূপেই সম্ভব হইতে পারে। * এইরূপে বর্তমানের অবিনষ্ট হেতুক্ষণ হইতেই পরক্ষণের কার্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। এই কথার উত্তরে মীমাংসক বলিতেছেন :--

নাশোৎপাদসমত্বেঽপি নৈবাপেক্ষা পরম্পরম্।
ন কার্যকারণত্বে স্তম্ভব্যাপারানন্বগ্রহাৎ ।। ৪৮৫ ।।

অর্থাৎ বিনাশ ও উৎপত্তি সমকালীন হইলেও এতদ্দ্বয়ের একটি অপরটির মুখাপেক্ষী হইতে পারে না, এবং সে-অবস্থায় বিনশ্যমান ও উৎপদ্যমান ক্ষণের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধও অসম্ভব।—কমলশীল ইহার উপর ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন যে নিরন্বয় বিনাশ যেহেতু সম্পূর্ণ নীরূপ সেই হেতু তাহা কখনই হেতুরূপে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না।

বৌদ্ধ কিন্তু বলিতে পারেন, তথাকথিত কারণ প্রকৃতই যে ফলোৎপাদনে সহায়ক হইবে এমন কি কথা আছে? কারণ ও কার্যের মধ্যে পৌর্বাপর্য ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই (অন্তরেণাপি ব্যাপারম্ আনন্তর্যমাত্রেণ হেতুফলভাবো ভবিষ্যতি)। এ-কথার উত্তর :—

জায়মানশ্চ গন্ধাদির্ঘটরূপে বিনশ্যতি ।
তৎকার্যং নেষ্যতে যদ্বত্তথা রূপান্তরাণ্যপি ।। ৪৮৬ ।।

অর্থাৎ, কার্যকারণ সম্বন্ধ যদি পৌর্বাপর্য ভিন্ন আর কিছুই না হয়, তবে কি ঘটাদির রূপ বিনাশের পরই কোন গন্ধ পাওয়া যাইলে সেই রূপকেই গন্ধের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? তাহা যখন হয় না, তখন একটি রূপের পর রূপান্তরের আবির্ভাবের সময়েই বা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে কেন? দুইটি ঘটনার পৌর্বাপর্য মাত্র আশ্রয় করিয়াই যে তাহাদের একটিকে কারণ ও অপরটিকে কার্য বলিয়া অভিহিত করা যায় না তাহা এইরূপে প্রমাণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষী এইবার উপসংহারচ্ছলে বলিতেছেন :—

তস্মাৎ প্রাক্কার্যনিষ্পত্তের্ব্যাপারো যস্য দৃশ্যতে।
তদেব কারণং তস্য ন ত্বানন্তর্যমাত্রকম্ ।। ৪৮৭ ।।

অর্থাৎ, ফলোৎপত্তির পূর্বেই যাহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই কেবল কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে; কেবল মাত্র কার্যের পূর্বত্ব কখনই কারণত্বের সম্যক্ প্রমাণ রূপে বিবেচিত হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী এইরূপে কার্য ও কারণের মধ্যে পৌর্বাপর্য ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে যে চলে না তাহা প্রতিপাদন করিয়া এইবার দেখাইতেছেন যে কার্য ও কারণের মধ্যে শুদ্ধ পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ প্রমাণও করা যায় না :—

ক্ষণস্থায়ী ঘটাদিশ্চেন্নোপলভ্যেত চক্ষুষা।
ন হি নষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে চিরাতীত পদার্থবৎ ।। ৪৯০ ।।

* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৌদ্ধমতে কাল একটি particular mode of action ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কার্যকারণভাবোঽপি প্রত্যক্ষানুপলম্ভতঃ।
······ভাবানাং স্বভাবানুপলম্ভনাৎ ॥ ৪৯১ ॥

অর্থাৎ, ঘটাদি যদি ক্ষণস্থায়ী হয় তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার উপলব্ধি ঘটিবে না, কারণ চিরাতীত পদার্থের ন্যায় নষ্ট পদার্থেরও প্রত্যয় সম্ভব নহে। কার্যকারণ ভাবও প্রত্যক্ষ (perception) ও অনুপলম্ভ (non-apprehension) হইতে প্রমাণিত হয় না, কারণ ভাবাবলীর স্বভাবের উপলব্ধিই অসম্ভব।

পূর্বপক্ষী এইবার দেখাইতেছেন যে বস্তুর উপলব্ধি সম্ভব হইলেও পূর্বক্ষণ ও পরক্ষণের পরিযোজক কোন স্থির সত্তা স্বীকার না করিলে ক্ষণদ্বয়ের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না :—

কো বা ব্যবস্থিতঃ কর্তা সংধত্তে ক্রমবদ্গতিম্।
অস্ত দৃষ্টাবিদং দৃষ্টং নান্যাদৃষ্টৌ তু লক্ষ্যতে ॥ ৪৯২ ॥

কমলশীল বলিয়া দিয়াছেন যে 'গতি' কথাটি এখানে 'উপলব্ধি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারিকাটির* তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইল :—ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে, ক্রমিক অনুভূতিগুলির মধ্যে পরস্পর যোগ সাধন করিবে কে? এইরূপ যোগসাধক কোন স্থির কর্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে বৌদ্ধের কথা স্বীকার করা যায় না।—পরবর্তী কারিকায় দেখান হইতেছে যে ভাবাবলী ক্ষণভঙ্গী হইলে প্রত্যভিজ্ঞাও (re-cognition) অসম্ভব হইয়া পড়ে :—

ক্ষণভঙ্গিষু ভাবেষু প্রত্যভিজ্ঞা চ দুর্ঘটা।
ন হ্যন্যনরদৃষ্টোঽর্থঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে পরৈঃ ॥ ৪৯৩ ॥

যে-ব্যক্তি যাহা দেখিয়াছে সেই ব্যক্তিই কেবল তাহা পরে স্মরণ করিতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধ মতানুযায়ী ব্যক্তি যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতে থাকে তবে পূর্বানুভূত পদার্থ কাহারও পক্ষে স্মরণ করাই সম্ভব হয় না।

বৌদ্ধ ইহার উত্তরে বলিতে পারেন যে পুনর্জাত কেশ ও নখ যেমন পৃথক্ হইলেও পূর্ববৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেইরূপ আপাত সাদৃশ্যই প্রত্যভিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। এ-কথার উত্তর :—

সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং ভিন্নে কেশাদিকে ভবেৎ।
জ্ঞাতুরেকস্য সদ্ভাবাদ্বিভেদে ত্বনিবন্ধনম্ ॥ ৪৯৪ ॥
প্রতিসন্ধানকারী চ যদ্যেকোঽর্থো ন বিদ্যতে।
রূপে দৃষ্টেঽভিলাষাদিস্তৎ কথং স্যাদ্রসাদিষু ॥ ৪৯৫ ॥

অর্থাৎ, পুনর্জাত কেশাদির সাদৃশ্যজ্ঞান যে সম্ভব হয় তাহার কারণ জ্ঞাতা সে-ক্ষেত্রে একই থাকে; কিন্তু—বৌদ্ধ যেমন বলেন—জ্ঞাতা ও জ্ঞায়মান বস্তু দুইই যদি পরিবর্তিত হইতে থাকে তাহা হইলে এই প্রত্যভিজ্ঞানের কোন ভিত্তিই আর থাকিবে না। পূর্বক্ষণের দ্রষ্টা ও পরক্ষণের প্রত্যভিজ্ঞাতা যদি এক ব্যক্তি না হয় তবে যে-বস্তু দেখিয়া পূর্বদ্রষ্টার আস্বাদনে অভিলাষ জন্মিয়া-

* কারিকাটি দুষ্টপাঠ।

ছিল সেই বস্তু স্মরণ করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাতার রসনাই বা সিক্ত হইবে কেন? বস্তুটি প্রথমে যে ব্যক্তি দর্শন করিয়াছিল কেবল তাহারই মনে যে তৎস্মরণে লোভাদির উদ্রেক হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।—পূর্বপক্ষী এইবার দেখাইতেছেন যে ক্ষণিকত্ব সত্য হইলে বন্ধন ও মুক্তিও সম্ভব হয় না:—

রাগাদিনিগড়ৈর্বদ্ধঃ ক্ষণোঽন্যো ভবকারকে।
অবদ্ধো মুচ্যতে চান্য ইতীদং নাববুধ্যতে ॥ ৪৯৬ ॥

অর্থাৎ, বৌদ্ধের কথা মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয়, এই সংসাররূপ কারাগারে রাগাদি নিগড়ের দ্বারা যে "ক্ষণটি" (অর্থাৎ, একটি বিশিষ্ট ক্ষণের জীব) আবদ্ধ রহিয়াছে সেটি কখনও মুক্তি পাইবে না; মুক্তি পাইবে আর একটি "ক্ষণ" যেটির বন্ধনই কখনও ঘটে নাই।—কেবল তাহাই নহে, মুক্তি যখন সম্ভবই নয়, তখন জীবের মুক্তির জন্য চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে:—

মোক্ষো নৈব হি বদ্ধস্য কদাচিদপি সম্ভবী।
একান্তনাশতস্তেন ব্যর্থো মুক্ত্যর্থিনাং ক্ষণঃ ॥৪৯৭॥

অর্থাৎ, এরূপ হইলে বদ্ধ জীবের মুক্তি কখনও সম্ভব হইবে না, কারণ ক্ষণিক অস্তিত্বের পরই যদি একান্ত বিনাশ ঘটিয়া যায় তবে মুক্তির অবকাশ ঘটিবে কখন?—পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে ইহাতে কোন বিরোধ নাই, মুক্তি কেবল অবদ্ধ জীবের পক্ষেই সম্ভব হইবে, তবে উত্তর:—

মোক্ষমাসাদয়ন্দৃষ্টো বদ্ধঃ স নিগড়াদিভিঃ।
অবদ্ধো মুক্তিমেতীতি দৃষ্টব্যাহতমীদৃশম্ ॥ ৪৯৮ ॥

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করুক না কেন, সর্বত্রই দেখা যায় যে সেই ব্যক্তি পূর্বে নিগড়াদির দ্বারা বদ্ধ ছিল; অবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তিলাভ হইল মানবীয় অভিজ্ঞতার বিপরীত (দৃষ্টব্যাহত)।

বৌদ্ধ মত যে অনুমানের দ্বারাও বাধিত হয় তাহা দেখাইবার জন্য পূর্বপক্ষী এইবার বলিতেছেন:—

একাধিকরণাবেতৌ বন্ধমোক্ষৌ তথা স্থিতেঃ।
লৌকিকাবিব তৌ তেন সর্বং চারুতরং স্থিতম্ ॥ ৪৯৯॥

অর্থাৎ, জগতের নিয়মই হইল এই যে বন্ধন যাহার আছে—তাহারই কেবল মুক্তি সম্ভব; এই কথা লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষে সমভাবে সত্য। সুতরাং পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য।—এই সকল যুক্তির দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে জীবের সমস্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আশ্রয় স্বরূপ একটি স্থির আত্মা স্বীকার করিতে হইবে। সমস্তই ক্ষণক্ষয়ী হইলে স্মৃত্যাদি কখনই সম্ভব হইত না।

এতক্ষণে পূর্বপক্ষ শেষ হইল। এখানে কিন্তু ভাবিয়া দেখা দরকার, কার্যকারণ সম্বন্ধ বিচার (অর্থাৎ খণ্ডন) করিতে গিয়া বৌদ্ধ ও তাঁহার পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক এতক্ষণ ধরিয়া অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন কেন। বিচারে নৈয়ায়িক কোথাও বিজ্ঞানমাত্রতার বিরুদ্ধে

কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, এবং না করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন, কারণ মানুষের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোন সত্তার যে প্রকৃত অস্তিত্ব আছে তাহা বাস্তবিকই প্রমাণ করা যায় না। সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহা হইলে আপাততঃ উভয় পক্ষের মতেই ব্যক্তিগত বিজ্ঞানে সমাবিষ্ট। এখন এই ব্যক্তিগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্বন্ধ—অর্থাৎ দুইটি বিভিন্ন ক্ষণের ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সাপেক্ষতা—আত্মা বা তদনুরূপ কোন স্থিরসত্তা ব্যক্তিরেকে কিরূপে সম্ভব হয়? সুতরাং কার্যকারণ সম্বন্ধের বিচারে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

বৌদ্ধ উত্তরে বলিতেছেন :—

অত্রাভিধীয়তে সর্বকার্যকারণতাস্থিতৌ।
সত্যামব্যাহতা এতে সিধ্যন্ত্যেবং নিরাত্মসু ॥ ৫০১ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যদিও আত্মার কথা টানিয়া আনিয়াছেন তথাপি উত্থাপিত বিষয়গুলি সবই প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পর্কিত; আত্মা ব্যতিরিক্তও এগুলি সব সম্ভব হইতে পারে।—দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক দৃষ্টি ও প্রত্যভিজ্ঞা; দৃষ্টি কারণ, প্রত্যভিজ্ঞা কার্য। এই কারণ ও কার্যের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে তাহাই আশ্রয় করিয়া নৈয়ায়িক আত্মার অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু যদি দেখান যায় যে দৃষ্টির পর প্রত্যভিজ্ঞা আত্মা ব্যক্তিরেকেও সম্ভব হয় তাহা হইলে কিন্তু আর এই দৃষ্টান্ত হইতে আত্মার অনুমান করা চলিবে না। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে কার্যকারণ সম্বন্ধই আত্মা ব্যতীত সম্ভব হয় না তবে বক্তব্য :—

যথাহি নিয়তা শক্তির্বীজাদেরঙ্কুরাদিষু।
অন্বয্যাত্মবিয়োগেঽপি তথৈবাধ্যাত্মিকে স্থিতিঃ ॥ ৫০২॥

অর্থাৎ, তথাকথিত কার্য শক্তির (potency) বলেই সম্ভব হয়; অঙ্কুরের শক্তি হইতেই বীজের উৎপত্তি; বিভিন্ন অবস্থার সংযোজক (অন্বয়ি) কোন আত্মা ব্যক্তিরেকেও আধ্যাত্মিক ব্যাপার এই শক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।—একটি বিশেষ ক্ষণে যখন একটি বিশেষ কার্য সাধিত হয় তখন নৈয়ায়িক তাহার নানাবিধ কারণ অনুমান করিয়া থাকেন—ঘটের কারণ যেমন কুলাল, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি। বৌদ্ধ কিন্তু এ-কথা আদৌ স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন, ঘটাভাবের অন্ত্যক্ষণের "শক্তি"ই হইল ঘটভাবের প্রথম ক্ষণের অদ্বিতীয় কারণ। বিজ্ঞাতার চিত্তে পূর্বাবস্থার অন্ত্যক্ষণ ও পরাবস্থার আদ্যক্ষণের মধ্যে কোন অন্তরঙ্গ যোগ স্বীকার করিবার কারণ নাই, কারণ প্রত্যেক ক্ষণের কার্য স্ব স্ব শক্তির দ্বারাই সাধিত হইতেছে। কাজেই বৌদ্ধমতে কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণের যোগসাধক কোন আত্মা অনুমান করারও প্রয়োজন নাই। কমলশীল ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এ-অবস্থায়, কোন আত্মার নির্দেশ ব্যক্তিরেকেও, বীজের শক্তি যেমন কেবল অঙ্কুরের প্রতিই উন্মুখ (নিয়ত) হইয়া থাকে, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ প্রতিক্ষণস্থ শক্তির বলেই ক্ষণিক কার্যাবলী নির্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত হইবে না কেন? বীজাদি যে নিরাত্মক তাহা নৈয়ায়িককেও স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ নৈয়ায়িক যখন বলেন যে জীবশরীর নিরাত্মক

হইলে তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি থাকিত না তখন তাহা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহার মতে শ্বাসপ্রশ্বাসবিহীন বীজাদি সাত্মক হইতে পারে না।

আত্মা ব্যতিরেকেও * যে তথাকথিত কার্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হয় তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে :—

পারম্পর্যেণ সাক্ষাদ্বা ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ধি শক্তিমৎ।
ততঃ কর্মফলাদীনাং সম্বন্ধ উপপদ্যতে ॥ ৫০৩ ॥

অর্থাৎ, শক্তির বলে বাহ্য জগতে যেমন হেতু ও ফলের বৈশিষ্ট্য উদ্বুদ্ধ হয়, আধ্যাত্মিক জগতের সংস্কাররাশির মধ্যেও ঠিক সেইরূপ। সাক্ষাৎ ভাবেই হউক আর পরম্পরাক্রমেই হউক, কোন বিশেষ দ্রব্য কেবল একটি বিশেষ স্থলেই "শক্তি"-মান্; ইহাই কর্ম ও ফলের সম্বন্ধ বলিয়া পরিচিত। এই "শক্তি" শুভাশুভ কর্মের প্রভাবে বিভিন্ন "ক্ষণে"র পরম্পরাক্রমে নির্দিষ্ট ফলে উপনীত হয়—যেমন দৃষ্ট বস্তু দর্শন মাত্র (দৃষ্টিক্ষণ) মানুষের স্মরণ হয় যে ইহা পূর্বেই দেখা গিয়াছিল (স্মৃতিক্ষণ); ইহা করিব, না উহা করিব, এইরূপ চিন্তা করার (বিমর্শক্ষণ) পরই যেমন মানুষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় (নির্ণয়ক্ষণ), ইত্যাদি। বৌদ্ধ কিন্তু কদাচ স্বীকার করেন না যে এই স্মৃত্যাদি কার্য পরম্পরাক্রমে একই নিত্য পদার্থ আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া যাইতেছে (ন হি ক্বচিদেকপদার্থান্বয়িত্বেন স্মরণাদয়ো বৌদ্ধস্য প্রসিদ্ধাঃ)। বৌদ্ধ বলেন, এ-সকল প্রত্যয়মাত্র (concept or consciousness only)। কথিত হইয়াছে :—"কর্মও আছে, ফলও আছে, কিন্তু এমন কোন কর্তাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যে এই বর্তমান স্কন্ধাবলী পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্কন্ধ গ্রহণ করিবে। ... জগদ্ধর্মের ইঙ্গিত এই যে একটি (অর্থাৎ, তথাকথিত কারণ) ঘটিলে অপরটি (কার্য) ঘটে, একটির উৎপত্তির পর অপরটির উৎপত্তি সম্ভব হয়।" † কমলশীল এখানে কোন আগমগ্রন্থ উদ্ধার করিয়া বৌদ্ধ দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্ষণিকবাদীর নিকট যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আপনা হইতেই প্রতীত্যসমুৎপাদে পরিণত হয় তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

পূর্বপক্ষী এখন প্রশ্ন করিতেছেন, কোন স্থিরসত্তা যদি বাস্তবিকই না থাকে তবে শাস্ত্রে ও লৌকিক সাহিত্যে পুদ্গল (personality) সম্বন্ধে কেন বলা বলা হয়, "এই ব্যক্তিই যখন কর্ম করিয়াছে তখন অন্যে কিরূপে তাহার ফলভোগ করিবে?" ইহার উত্তর :—

কর্তৃত্বাদিব্যবস্থা তু সন্তানৈক্যবিবক্ষয়া।
কল্পনারোপিতৈবেষ্টা নাঙ্গং সা তত্ত্বসংস্থিতেঃ ॥ ৫০৪ ॥

---

* বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের নিকটেই আত্মা স্বীকার করা আপাতদৃষ্টিতে অধিক প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতে পারে; কারণ বাস্তব জগৎ সম্পূর্ণ অস্বীকার করায় আধ্যাত্মিক অনুভূতিই বৌদ্ধের একমাত্র সম্বল, যাহা আত্মা ব্যতিরেকে কল্পনা করাই কঠিন। বৌদ্ধ কিন্তু দেখাইয়াছেন যে প্রতিক্ষণস্থ শক্তির বলেই নৈসর্গিক কার্যের ন্যায় আধ্যাত্মিক অনুভূতিও সম্ভব।

† অস্তি কর্মাস্তি ফলং কারকস্তু নোপলভ্যতে য ইমান্ স্কন্ধান্ নিক্ষিপতি, অন্যাংশ্চ স্কন্ধানুপাদত্তে। ... তত্রায়ং ধর্মসংকেতঃ, যদুতাস্মিন্ সতীদং ভবতি, অস্যোৎপাদাদিদমুৎপদ্যত ইতি।

অর্থাৎ, বিজ্ঞানক্ষণসন্তানের (chain of moments of consciousness) ঐক্য লক্ষ্য করিয়াই কেবল কর্তৃত্বাদি স্বীকার করা হয় ; ইহাও কিন্তু কাল্পনিক, কারণ ইহা প্রকৃত সত্তার অঙ্গস্বরূপ নহে। কমলশীল ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন :—যে-সকল লোকের জ্ঞানদৃষ্টি পুঞ্জীভূত অজ্ঞান-তিমিরের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে তাহারাই কেবল নিজেরা প্রকৃতপক্ষে কি তাহা বিচার না করিয়া বিশিষ্ট হেতু ও ফলে পরিণম্যমাণ সংস্কারাবলীর মধ্যে একত্ব (homogeneity) কল্পনা করতঃ বলিতে আরম্ভ করে "সেই আমিই কার্য করিতেছি" এবং মুক্তির জন্য উন্মুখ হয়। মন্দধী জনের এই অভিমানের অনুরোধেই বুদ্ধগণ তাহাদিগকে উচ্ছেদবাদের কুহক হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানক্ষণসন্তানের একত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে কর্তৃত্বাদিও আরোপ করিয়া গিয়াছেন। পাছে কেহ মনে করে যে বিজ্ঞানসন্তানের একত্ব স্বীকার করাই হইল বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করা, এইজন্য কারিকায় বলা হইয়াছে "নাঙ্গং সা তত্ত্ব-সংস্থিতেঃ"। অর্থাৎ, এই বিজ্ঞানসন্তান প্রকৃত সত্তার অঙ্গস্বরূপ নহে।—কমলশীল এই কয়েকটি বাক্যে বৌদ্ধ দর্শনের গূঢ়তম তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানসন্তানের প্রত্যেক ক্ষণটিকে discrete ও autonomous বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু স্মৃতি প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক্ষণসন্ততির ভিত্তিতে কোন মতেই অনুমান করা যায় না বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে বিজ্ঞান প্রতিক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় না ; বিনষ্ট ক্ষণিকবিজ্ঞানের একটা সংস্কার (residual energy, elan vital) প্রতিক্ষণেই থাকিয়া যায়, এবং সেই সূত্রেই সন্তানস্থ ক্ষণাবলীর যোগ রক্ষিত হয়।

নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর কিন্তু বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে বীজাদির বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা অন্বয় সম্বন্ধ আছেই। বীজ যখন অঙ্কুরে পরিণত হয় তখন প্রকৃত-পক্ষে যাহা ঘটে তাহা এই যে বীজেরই বিভিন্ন অবয়ব অঙ্কুরে অন্যরূপে সন্নিবিষ্ট হয় (ব্যূহান্তরমাপদ্যন্তে)। এই অভিনব সন্নিবেশের সময় বীজস্থ পৃথিবীধাতু অপ্‌-ধাতুর দ্বারা সংগৃহীত অন্তরাগ্নিতে পরিপাকের ফলে যে রসদ্রব্য উৎপন্ন করে তাহাই বীজের পূর্বাবয়বগুলির সহিত মিলিত হইয়া অঙ্কুরে পরিণত হয়। তাহা হইলে বৌদ্ধ কিরূপে বলিতে পারেন যে বীজের অতি সূক্ষ্মাংশও আর অঙ্কুরে অবশিষ্ট থাকে না ? *

উদ্দ্যোতকরের প্রশ্নের উত্তরে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহা খুব সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না :—

ক্ষিত্যাদীনামবৈশিষ্ট্যে বীজাঙ্কুরলতাদিষু।
ন ভেদো যুক্ত ঐকাত্ম্যাত্তদা সিদ্ধা নিরন্বয়া ॥ ৫০৭ ॥

---

* মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর এখানে তাঁহার organic chemistry-র জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কোন বৈজ্ঞানিক তাঁহার এই উক্তির সম্যক্ আলোচনা করিলে ভাল হয়।

অর্থাৎ, বীজ, অঙ্কুর, লতা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও যদি ক্ষিত্যাদি ধাতু অপরিবর্তিতই থাকে তবে এই তিন অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকিবে না, কারণ এতত্রয় একাত্মক হইলে তাহাদের মধ্যে ভেদ সম্ভব হইবে না। অতএব প্রমাণিত হইল যে এই সকল বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরস্পর কোন যোগ নাই।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে ক্ষণিকবাদে কখনই কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। বিনষ্ট পদার্থ কোন কার্যের কারণ হইতে পারে না; এবং অবিনষ্ট পদার্থকেও কারণরূপে স্বীকার করা যায় না, যে-হেতু তাহাতে স্বীকার করা হয় যে কার্যের পরেও কারণ অবিকৃত রহিয়াছে। ইহার উত্তরে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন:—

অত্রোচ্যতে দ্বিতীয়ে হি ক্ষণে কার্যং প্রজায়তে।
প্রথমে কারণং জাতমবিনষ্টং তদা চ তৎ ॥ ৫০৯ ॥
ক্ষণিকত্বাত্তু তৎ কার্যং ক্ষণকালে ন বর্ততে।
বৃত্তৌ বা বিফলং কার্যং নির্বৃত্তং তদ্যতস্তদা ॥ ৫১০ ॥

এই কারিকাদ্বয়ে একটি দুরূহ প্রশ্নের অত্যন্ত সরল এক উত্তর দেওয়া হইয়াছে:—সন্ততিস্থ যে-কোন ক্ষণদ্বয়ের প্রথমটিকে কারণ ও দ্বিতীয়টিকে কার্য বলিলেই তো সমস্ত বিসংবাদ চুকিয়া যায়! প্রথম ক্ষণে জন্মিয়াছিল কারণ, এবং সেই ক্ষণে তাহা অবিনষ্টই ছিল; কিন্তু এই কারণ ক্ষণিক হওয়ায় পরবর্তী কার্যক্ষণে ইহার আর কোন কার্য সম্ভব হয় নাই। আর সম্ভব হইলেও কার্যক্ষণে কারণক্ষণের কার্য সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইবে, যে-হেতু কারণক্ষণের মুখাপেক্ষা না করিয়াই কার্যক্ষণে কার্য আরম্ভ হইয়া যায়।—কারণের মধ্যেই কার্যের উপক্রম না দেখিলে বৌদ্ধ সেটিকে কারণ বলিয়া স্বীকারই করেন না। ইহা যে খুবই যুক্তিসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ অন্য সকল অবস্থাতেই কার্য ও কারণ হইয়া পড়ে dircrete, এবং সেই জন্য তাহাদের মধ্যে যে কোন সম্বন্ধ আছে তাহাই প্রমাণ করা যায় না। কমলশীল সেইজন্য এইখানে বলিয়াছেন যে অবিনষ্ট কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি স্বীকার করাই বৌদ্ধের উদ্দেশ্য। ইহাতে যে কার্য ও কারণের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হইবে তাহা নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রথমক্ষণস্থ কারণ আত্মলাভ করিলে, তাহা বিনষ্ট হইবার পূর্বেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া দ্বিতীয় ক্ষণের কার্য উৎপন্ন হয় *। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বৌদ্ধ মতে কার্যের উৎপত্তি অবিনষ্ট কারণ হইতে। কারণ, প্রথমক্ষণে কারণটি অবিনষ্টই থাকে। কার্যের সত্তাকালে কিন্তু আর কারণের অস্তিত্ব থাকে না, ক্ষণিকত্ববশতঃ কার্য তৎপূর্বেই নিঃশেষ হইয়া যায়।—ক্ষণিকত্বের ভিত্তিতে কার্যকারণ ভাব বুঝান বা বুঝিতে পারা যে কত কঠিন তাহা কমলশীলের এই আলোচনার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কঠিন হইলেও বৌদ্ধের যুক্তি অখণ্ডনীয়; কারণ যদি কার্য হইতে পৃথকই হয়—এ-কথা নৈয়ায়িকও অস্বীকার করেন না—তবে ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সামান্য অস্তিত্বও একটি কার্য। তবে

* প্রথমক্ষণভাবিকারণতাসাদিতাত্মলাভমবিনষ্টমেব প্রতীত্য দ্বিতীয়ে ক্ষণে কার্যং প্রজায়তে।

বৌদ্ধ পক্ষের দুর্বলতাও সুস্পষ্ট। কারণ বৌদ্ধ একবার বলিয়াছেন যে ক্ষণাবলী পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; কিন্তু তাহার পরেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে সংস্কারের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষণের মধ্যে একটি যোগও রক্ষিত হয়।—পরবর্তী কারিকাত্রয়ে শান্তরক্ষিত এই আলোচনার উপসংহার করিয়াছেন :—

তস্মাদনষ্টাত্তদ্ধেতোঃ প্রথমক্ষণভাবিনঃ।
কার্যমুৎপদ্যতে শক্তাদ্দ্বিতীয়ক্ষণ এব তু ॥ ৫২১ ॥
বিনষ্টাত্তু ভবেৎ কার্যং তৃতীয়াদিক্ষণে যদি।
বিপাকহেতোঃ প্রধ্বস্তাদ্যথা কার্যং চ বক্ষ্যতে ॥ ৫২২ ॥
যৌগপদ্যপ্রসঙ্গোঽপি প্রথমে যদি তম্ভবেৎ।
সহভূহেতুবত্তচ্চ না যুক্ত্যা যুজ্যতে পুনঃ ॥ ৫২৩ ॥

অর্থাৎ, প্রথমক্ষণস্থ শক্ত (efficient) ও অবিনষ্ট হেতু হইতেই দ্বিতীয়ক্ষণে কার্য উৎপন্ন হয়। যদি বলা যায় যে কার্য তৃতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হয় তবে স্বীকার করা হইবে যে বিনষ্ট হেতু হইতে কার্য উৎপন্ন হইতেছে। এবং আরও স্বীকার করা হইবে যে কার্যের বিপাকের (ripenig, realisation) হেতু বিধ্বস্ত হইলেও কার্য সম্ভব হয়। প্রথমক্ষণে কার্য স্বীকার করিলে কার্য ও কারণের যৌগপদ্য অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কার্য ও কারণের সহাবস্থান যেমন অযৌক্তিক ইহাও তদ্রূপ।—কমলশীল 'পঞ্জিকা'য় বলিয়াছেন, বৈভাষিকদিগের মতে কার্য তৃতীয়ক্ষণে আরম্ভ হয়। বৈভাষিকগণ বলেন "একোঽতীতঃ প্রযচ্ছতি।" কিন্তু তাহাতে বিনষ্ট কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি স্বীকার করা হয়। এই জন্যই বিজ্ঞানবাদী এ-কথা বলেন না। এই বৈভাষিকগণই কিন্তু আবার বলিয়া থাকেন যে কার্য কারণের সহজাত (তৈরেব বৈভাষিকৈঃ সহভূর্হেতুরিষ্যতে)। ইহাও অবশ্য অযৌক্তিক।

(ক্রমশঃ)

ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[আলোচনা]

পূর্বানুবৃত্তি

এক্ষণে পুরাণে লিখিত পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর কাল হইতেও পরীক্ষিতের কাল অনুমান ৩১০০ খ্রী° পূ° সমর্থিত হয় কিনা দেখা যাউক। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও ডঃ শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদারও নামসাম্যে 'নন্দিবর্ধণ', 'মহানন্দী' যে 'নন্দ' এ অনুমান করিয়াছেন। (Early History of India, 4th ed. p. 41, ও Jour. of the Behar and Orissa Research Society 1923 p. 418) নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপূর্বে শিশুনাগ বংশ ১৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপূর্বে প্রদ্যোত বংশীয়েরা রাজত্ব করেন। ইহাদের শেষ রাজার নাম নন্দিবর্ধন, যিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। ৩২৬ খ্রী° পূ°তে নন্দবংশের উচ্ছেদ ও মৌর্য বংশের আরম্ভ। সুতরাং নন্দিবর্ধনের কাল (৩২৬+১০০+১৬৩+২০ বা) ৬০৯ খ্রী° পূ°। অপরপক্ষে নন্দবংশের মহাপদ্মনন্দের কালও অন্ততঃ ৪২৫ খ্রী° পূ°। এমতাবস্থায় পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে অন্তর অনুমান ২৬০০ বৎসর হয়। পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর কাল সম্বন্ধীয় পুরাণের শ্লোকের একটি পাঠ এরূপ পাওয়া যায় ---

'যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। তাবৎ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চ শতোত্রয়ম্'। এখানে পঞ্চশতোত্রয়ম্ 'পঞ্চশতত্রয়ম্' হইবে বুঝা যাইতেছে। এই পাঠটি Bodelian Libraryতে রক্ষিত পুথির পাঠ। এই পুথি সম্বন্ধে Pargiter সাহেব বলিয়াছেন 'Well written, fairly free from clerical mistakes.' এই পাঠটীর অর্থ এই দাঁড়ায় যে পরীক্ষিৎ ও নন্দের অন্তর পঞ্চশত ত্রয়ং (৩×৫০০) অধিকং বর্ষ সহস্রং (১০০০) অর্থাৎ ১৫০০+১০০০ বা ২৫০০ বৎসর। এই অন্তর পুরাণে কোন্ বংশ কতদিন রাজত্ব করিয়াছিল তাহার সমষ্টি হইতে সমর্থিত হয় কিনা দেখা যাউক। বৃহদ্রথ বংশের বিবরণে পুরাণে স্পষ্ট লিখা আছে 'প্রাধান্যতঃ প্রবক্ষ্যামি' অর্থাৎ এই বংশের প্রধান প্রধান রাজগণের নাম উল্লেখ করিবেন। এই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৃহদ্রথদের রাজ্য কাল সম্বন্ধে শেষে উল্লিখিত হইয়াছে 'ষোড়শৈতে নৃপা জ্ঞেয়া ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ ত্রয়োবিংশাধিকং তেষাংরাজ্যং চ শত সপ্তকম্॥' আবার পর শ্লোকেই বলিতেছেন: 'দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপা জ্ঞেয়া ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ। পূর্ণং বর্ষ সহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি॥' এই দুই শ্লোকেই 'ভবিতারো বৃহদ্রথাঃ' পাঠ দেখা যায়। ইহা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৃহদ্রথদের সম্বন্ধে বলা হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাদের ১৬ জন রাজার রাজত্ব কাল ৭২৩ বৎসর ও ৩২ জন রাজার রাজত্ব কাল ১০০০ বৎসর। সুতরাং বার্হদ্রথ বংশের মোট রাজত্ব কাল ১২৩

বৎসর। এই বার্হদ্রথ বংশের বিবরণের পর প্রদ্যোত বংশের বিবরণের পূর্বে পুরাণকার লিখিতেছেন 'বার্হদ্রথেম্বতীতেষু বীতিহোত্রেম্ববন্তিষু। পুলিকঃ স্বামিন্ হত্বা স্বপুত্রমভিষেক্ষ্যতি॥' সুতরাং দেখা গেল এই প্রদ্যোত বংশের পূর্বে বৃহদ্রথ, বীতিহোত্র ও অবন্তী বা মালবগণ অতীত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় প্রবোধ বাবু এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন। 'বৃহদ্রথগণ অতীত হইলে পর বীতিহোত্র রাজগণের রাজত্বকালে অবন্তিদেশে।' Pargiter সাহেবও এই শ্লোকের সহজ ও সরল অনুবাদ করিয়াছেন 'When the Bṛhadrathas Vitihotras rnd Avantis have passed away.' এই বীতিহোত্র ও মালবগণ কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা পুরাণে উল্লিখিত নাই। মনে হয় ইহাদের গণতন্ত্র (Republican form of Goveurment) রাজত্ব ছিল। এজন্য পুরাণকার ইহাদের Presidentদের বা তাহাদের রাজ্যকাল উল্লেখ করেন নাই। তবে বীতিহোত্রগণের সংখ্যা ২০ জন ইহা নন্দবংশের বর্ণনার পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ইহাদের পর প্রদ্যোতগণ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর শিশুনাগেরা ১৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে নন্দবংশের আরম্ভ। ইঁহারা ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। বীতিহোত্র ও মালবগণ ব্যতীত এই সমস্ত রাজবংশের কাল মোট (১৭২৩+১৩৮+১৬৩+১০০, বা) ২১২৪ বৎসর পাওয়া যায়। সুতরাং ২০ জন বীতিহোত্র, ও মালবগণের রাজ্যকাল অনুমান ৫০০ বৎসর দাঁড়ায়। এই অনুমান যে ঠিক তাহা গ্রীক বিবরণী হইতেও বুঝা যাইবে। 'From the time of Dionysios to Sandracottos the Indians counted 153 kings and a peried of 6042 (?) years but among these a Republic was thrice established ...and another to 300 years and another to 120 years. The Indians also tell us that Dionysios was earlier than Herakles by fifteen generations.' (Mc crindle, Ancient India p 203-4) Dionysios যে জনমেজয়ঃ এ অনুমান পূর্বেই করিয়াছি। (দ্রাবিড়ী ভাষায়ও 'দুবরাজ' যুবরাজের অপর রূপ)। এই প্রথম জনমেজয়ের পঞ্চদশ পুরুষ পর যে কৃষ্ণার্জুনের সময় তাহাও গ্রীক বিবরণী যইতে দেখান হইয়াছে। এ মতে ভারত যুদ্ধের সময় হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় ১৩৮ জন রাজার রাজত্বে কাল (৩১০২-৩২৬, বা) ২৭৭৬ বৎসর অর্থাৎ গড়ে প্রতি রাজার রাজত্বকাল ২০ বৎসর ও ইহা যে খুবই সঙ্গত তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে তিনবার প্রজাতন্ত্র শাসনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একবার প্রজাতন্ত্র শাসনের কাল পুথির ঐ অংশ নষ্ট হওয়ার উদ্ধার করা যায় নাই। অপর দুইবারে শাসন কাল ৩০০ ও ১২০, মোট ৪২০ বৎসর পাওয়া যায়। পুরাণ-প্রাপ্ত ২১২৩ বৎসর রাজত্ব কালের সহিত এই ৪২০ যোগ করিলে ২৫৪৩ বৎসর হয়। সুতরাং অপর একবার প্রজাতন্ত্র শাসনের কাল, যাহা গ্রীক বিবরণী হইতে উদ্ধার করা যায় নাই, তাহা (২৭৭৬-২৫৪৩, বা) ২৩৩ বৎসর পাওয়া যায়। এই গ্রীক বর্ণনার তিনবার প্রজাতন্ত্র শাসনেরও পুরাণের বীতিহোত্র ও অবন্তীগণের উল্লেখ একই বুঝা যাইবে। সুতরাং গ্রীক বিবরণী হইতেও কৃষ্ণার্জুন ও নন্দবংশের অন্তর প্রায় ২৬০০ বৎসর পাওয়া যায়। এই কালই মোটামুটি হিসাবে (in round numbers) পুরাণকার আড়াই হাজার বৎসর লিখিয়াছেন।

এক্ষণে পুরাণকথিত সপ্তর্ষিচার ও পরীক্ষিৎকালে সপ্তর্ষির অবস্থান হইতেও অনুমান ৩১০০ খ্রী° পূ° যুধিষ্ঠিরের কাল সমর্থিত হয় কিনা দেখা যাউক।

মনস্বী কোলব্রুক্ সাহেব তাঁহার 'On the Indian and Arabian Divisions of the Zodiac' (Miscellaneous Essays p. 317 ff) প্রবন্ধে ও Brennand সাহেব তাঁহার Hindu Astronomy (p, 76) গ্রন্থে এই সপ্তর্ষিরা মঘায় ইহার অর্থ যে যুধিষ্ঠিরের সময় মঘায় দক্ষিণায়ন হইত ইহা অনুমান করিয়াছেন ও এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্য ও নিঘণ্টুদৃষ্টে আমরা জানিতে পারি 'সপ্তঋষয়:, 'গাব:', 'রশ্ময়:', 'কিরণা:' ইত্যাদি শব্দ সূর্য্যরশ্মির অপর নাম। যুধিষ্ঠিরের সময় 'সপ্তঋষয়:' মঘায় ছিলেন ইহার অর্থ এই যে, সে সময় সূর্য মঘায় আসিলে পূর্ণভাবে 'সপ্তঋষয়:' বা কিরণ বিতরণ করিতেন অর্থাৎ তখন দক্ষিণায়ন কাল। অতি প্রাচীনকাল হইতে অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, মঘা, চিত্রা প্রভৃতি তারা হইতেই মোটামুটি তৎতৎ নক্ষত্রবিভাগের আদি স্থান ধরা হইত। সুতরাং পূর্বফল্গুনী তারার আরম্ভ স্থানই মঘানক্ষত্র বিভাগের অন্তস্থান। ৩১০০ খ্রী° পূ°র পূর্বফল্গুনী (δ Leonis) তারার সায়ন স্ফুট ৯০°৫ অর্থাৎ দক্ষিণায়ন স্থানের অর্ধ অংশ পূর্বে। সুতরাং সে সময় বিলোমগতিতে দক্ষিণায়ন বিন্দু মঘা নক্ষত্রে প্রবেশ করিয়াছে। এমতে সপ্তর্ষিদের গতি যে অয়ন চলন (precessional motion) কে বুঝাইত তাহা বেশ বুঝা যায়। বর্তমান জ্যোতিষ অনুযায়ী এই precessional period বা সপ্তবিংশ নক্ষত্র ভোগ কাল অনুমান ২৬০০০ বৎসর। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষীরা ইহা ২৭০০০ বৎসর অর্থাৎ এক এক নক্ষত্র ভোগ কাল ১০০০ বৎসর পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে একটি 'শূন্য' (০)র ভুলে ইহা ২৭০০ বৎসর বা এক নক্ষত্র ভোগ কাল ১০০ বৎসরে পরিণত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে Brennand সাহেব তাঁহার Hindu Astronomy গ্রন্থে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এই সপ্তর্ষিভগণ যে পূর্বে ২৭০০০ বৎসর ছিল তাহা পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায় :—'সপ্তর্ষীণাম্ যুগম্ হ্যেতদ্ দিব্যয়া সংখ্যয়া স্মৃতম্। মাসা দিব্যা: স্মৃতা: ষষ্টির্ দিব্যাব্দানি তু সপ্ততি: ।।' মৎস্য ও বায়ুপুরাণের পাঠ 'ষষ্টির্' ও সপ্ততি:' স্পষ্ট লেখা আছে। কিন্তু Pargiter সাহেব জ্যোতিষ শাস্ত্রে অজ্ঞতা নিবন্ধন 'ষষ্টির্' পাঠ সম্বন্ধে লিখিলেন 'Matsya and Vayu Sastir erroneously'.। কিন্তু 'সপ্ততি:' পাঠ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সপ্ততি: অর্থাৎ ৭০ দিব্য বৎসর হইল মানুষ মানের (৩৬০×৭০, বা) ২৫২০০ বৎসর (বর্তমান প্রতীচ্য জ্যোতিষ মতে precessional period কেহ কেহ ২৫৮৬৮ বৎসর অনুমান করেন) ও ষষ্টি দিব্যমাস হইল ৫ দিব্য বৎসর অর্থাৎ মানুষ মানের (৩৬০×৫ বা) ১৮০০ বৎসর। সুতরাং সপ্তর্ষিভগণ কাল হইল (২৫২০০+১৮০০ বা) ২৭০০০ বৎসর। অর্থাৎ এক নক্ষত্রভোগকাল ১০০০ বৎসর। মনীষী কোলব্রুক সাহেব পুরাণের এই পাঠটি দেখিলে খুব দৃঢ়তার সহিতই সপ্তর্ষিদের গমন যে অয়ন চলন (precessional motion) তাহা বলিতেন। সপ্তর্ষিরা এক এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর অবস্থান করেন ইহা যে ভুল পাঠ তাহার অপর একটি প্রমাণ দিতেছি।

আলুবেরুণী ১০৩২ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি এখানে আসিয়া বৃহৎ সংহিতার সেই শ্লোকটির পাঠ এরূপ দেখেন 'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ ···। ষট্শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্ একৈকস্মিন্ ঋক্ষে।' অর্থাৎ সপ্তর্ষিরা এক এক নক্ষত্রে ৬০০ বৎসর অবস্থান করেন। এই ৬০০ বৎসর অবস্থান সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করিয়া সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। পরে তিনি কাশ্মীরে গিয়া শুনিলেন এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিরা ১০০ বৎসর অবস্থান করেন। এই বিরুদ্ধ মত শুনিয়া তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এখানে লক্ষ্য রাখিবার বিষয় এই যে ১০৩২ খ্রীস্টাব্দেও বৃহৎ সংহিতার পাঠ ছিল 'ষট্শতং'। এই পাঠটি কোথায় গেল? বর্তমানে বৃহৎ সংহিতায় এই পাঠ বা কোনও টীকাকারের এ সম্বন্ধে কোনও উক্তিই পাওয়া যায় না। কাশ্মিরী প্রবাদ ১০০ বৎসরই এখন বৃহৎ সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই পাঠ এক সময় 'দশ শতং' এরূপ ছিল কিনা কে জানে? 'ষট্শতং' পাঠের একটি সঙ্গতকারণ যাহা মনে হয় লিখিতেছি। পূর্বে সপ্তর্ষিদের মধ্যে অঙ্গিরা (E Ursa Majoris) তারার ধ্রুবকের পরিবর্তনকেই সপ্তর্ষির গতি বলা হইত মনে হয়। ১৫০০ খ্রী° পূ° অব্দে এই তারার সায়ন ধ্রুবক (polar longitude) ১৩৫'৫ ও ৩০০ খ্রী° পূ° অব্দে এই তারার সায়ন ধ্রুবক ১৬১'৯। উভয়ের অন্তর ১২০০ বৎসরে ২৬'৪ অংশ অর্থাৎ দুই নক্ষত্র ভোগ, সুতরাং এক এক নক্ষত্র ভোগ কাল ৬০০ বৎসর। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের কোন কোন পুথিতে 'তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা জ্ঞেয়া অষ্টাশতং সমাঃ।' এ পাঠ আছে। এগুলি ভ্রম নহে। সপ্তর্ষি তারাগুলি ক্রান্তি বৃত্তের অনেক উর্ধে অবস্থিত এ কারণ এই তারার সায়ন ধ্রুবকের পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে অসমান। উপরোক্ত আলোচনা হইতে সপ্তর্ষিদের (অর্থাৎ দক্ষিণায়নবিন্দুর) ৩১০০ খ্রী° পূ° অব্দে মঘা নক্ষত্র বিভাগে প্রবেশ ও উহা যুধিষ্ঠিরের সময় বুঝা যাইবে। মঘা (Regulus) তারায় যুধিষ্ঠিরের সময় দক্ষিণায়ণ ধরিয়া তাঁহার কাল প্রায় ৭০০ বৎসর পর প্রবোধ বাবু ধরিয়াছেন। অয়ন স্থানের বিলোমগতি হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় মঘাতে দক্ষিণায়ন বলিতে মঘার অন্তভাগে বিলোমক্রমে প্রবেশ বুঝাইবে। যেমন বরাহমিহির নিজে বলিতেছেন 'সাম্প্রতম্ অয়নং পুনর্বসুতঃ'। অর্থাৎ তাঁহার সময় দক্ষিণায়ন স্থান পুনর্বসুতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা যে পুনর্বসুর শেষ ভাগে প্রবেশ তাহা তাঁহার অপর উক্তি হইতে বুঝা যাইবে; 'সাম্প্রতম্ অয়নং সবিতুঃ কর্কটকাদ্যং' অর্থাৎ কর্কট রাশির আদি ভাগে তখন দক্ষিণায়ন। সকলেই জানেন পুনর্বসু নক্ষত্র বিভাগের আদিস্থানের স্ফুট ৮০° ও অন্তস্থানের স্ফুট ৯৩'৩°। কর্কট রাশির আদি ৯০° অংশের পর। সুতরাং বরাহমিহিরের সময় পুনর্বসু নক্ষত্রের অন্তভাগে দক্ষিণায়ন স্থান বিলোমক্রমে অশ্লেষার্ধ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের সময় দক্ষিণায়ন মঘার আদিতে বা মধ্যস্থানে থাকিলে 'অশ্লেষার্ধাদ্ দক্ষিণম্ উত্তরম্ অয়নং রবে ধর্নিষ্ঠাদ্যম্' এইভাবে বলা হইত। সুতরাং পুরাণ কথিত সপ্তর্ষিবিচার ও পরীক্ষিৎকালে সপ্তর্ষির (দক্ষিণায়নের) অবস্থান হইতেও যুধিষ্ঠিরাদির সময় অনুমান ৩১০০ খ্রী° পূ° পাওয়া যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে রাজা ও রাজবৈদ্য

কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ

প্রাচীন কালে রাজবৈদ্যকে কেবল রাজার চিকিৎসা কার্য্যের জন্যই ব্যাপৃত থাকিতে হইত না। রাজা যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া রাজাকে শত্রুপক্ষের প্রযুক্ত বিষ হইতে রক্ষা করিবার ভার রাজবৈদ্যের ছিল ১। কেন না, শত্রুপক্ষ রাজাকে এবং রাজার সৈন্যসামন্তগণকে বিনাযুদ্ধে কৌশলে বিনাশ করিবার জন্য রাজা যে পথ দিয়া যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিতেন সেইপথ; যে সকল জলাশয়ের জল পান করিতেন সেই সকল জলাশয়ের জল, যে সকল খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতেন সেই সকল ভোজ্যদ্রব্য, এবং বিশ্রান্ত হইয়া যে সকল বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন, সেই সকল বৃক্ষের ছায়াকে, এমন কি রাজার অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাকের জন্য ব্যবহার্য ইন্ধন বা জ্বালানি কাষ্ঠ ও অশ্ব প্রভৃতির খাদ্যদ্রব্য সকলকেও দূষিত বা বিষাক্ত করিয়া রাখিত ২। রাজার সন্নিহিত রাজবৈদ্যকে এই সকল দ্রব্যকে রাজার বা রাজ-অনুচরগণের ব্যবহারের পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইত এবং দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইলে, উহাদিগকে শোধিত করিয়া ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দিতে হইত।

রাজার স্বাভাবিক আহার বিহারাদির ব্যতিক্রমের জন্য যে রোগ হইত, তাহাকে দোষজ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফের বৈষম্যজনিত ব্যাধি বলা হইত, তদ্ভিন্ন যে কোন প্রকার ব্যাধি হইত, তাহাকে আগন্তুক ব্যাধি বলা হইত ৩। এই দোষজ ও আগন্তুক—উভয়বিধ ব্যাধির প্রতীকারের জন্য তখনকার-কালে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত। উপায়ত্রয়ের নাম, "দৈবব্যপাশ্রয়" "যুক্তিব্যপাশ্রয়" এবং "সত্ত্বাবজয়"। দৈবব্যপাশ্রয়--মন্ত্র, ওষধি, মণি, মঙ্গল, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, দেব-দ্বিজ-গুরু প্রভৃতিকে প্রণিপাত ও তীর্থযাত্রাদি দ্বারা রোগ প্রতীকারের ব্যবস্থা। যুক্তিব্যপাশ্রয়—আহার অর্থাৎ পথ্য ও ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসা। আর সত্ত্বাবজয়--অহিত বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করা বা আত্মসংযম ৪। এই ত্রিবিধ উপায়ের উপদেশ ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির

১ "যুক্তসেনস্য নৃপতেঃ পরানভিজিগীষতঃ।
ভিষজা রক্ষণং কার্য্যং × × × ×॥" সু. সু. ৩৪ অ.।

২ "রক্ষিতব্যো বিশেষেণ বিষাদেব নরাধিপঃ।
পন্থানমুদকং ছায়া ভক্তং যবসমিন্ধনম্।
দূষয়ন্ত্যরয়স্তচ্চ জানীয়াচ্ছোধয়েৎ তথা॥ ঐ।

৩ যে ভূতবিষবাগ্নি-সংপ্রহারাদিসম্ভবাঃ—
নৃণামগান্তবো রোগাঃ × × ×॥" চ. সূ. ৭ অ.।

৪ "ত্রিবিধমৌষধমিতি দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্ত্বাবজয়শ্চ
তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং মন্ত্রৌষধিমণি মঙ্গল নিয়ম প্রায়শ্চিত্তোপবাস স্বস্ত্যয়ন

বিধিব্যবস্থার জন্য তখনকার কালে লোকে অথর্ববেদ্‌বিদ্‌ পুরোহিত ও চিকিৎসকের শরণ লইত। সেজন্য রাজার সর্ববিধ দৈববাধা প্রতীকারের জন্য একজন রাজপুরোহিতও রাজার সঙ্গে থাকিতেন। ইহাঁদের কার্য ছিল, রাজাকে দোষ এবং আগন্তুক কারণ হইতে, আগত মৃত্যু হইতে রক্ষা করা ৫। এখন যেমন ভারতে অধিকাংশ মৃত্যুকে কালমৃত্যু বলিয়া অনেককে মনকে প্রবোধ দিতে দেখা যায়—তখনকার কালে সেরূপ ছিল কিনা বলা যায় না। বোধহয় এরূপ চেষ্টা-বিমুখ দৈববিশ্বাস তখন ছিল না। কেন না,—রাজাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলা হইয়াছে,—অথর্ববেদবিৎ চিকিৎসকগণের মতে একশত একটী মৃত্যুর মধ্যে একটী মৃত্যুকে কাল-মৃত্যু বলা যায়, অবশিষ্ট সবই আগন্তুক বা অকাল-মৃত্যু ৬। অতএব রাজবৈদ্য রাজাকে আগন্তুক বা অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার উপদেশ মত কার্যাদি করিতেন। কেন না, ব্রহ্মা জনসাধারণের সর্ববিধ শারীর ও মানস দুঃখের প্রতীকারের জন্য যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ রচনা করিয়াছিলেন,—তাহাতে এমন অনেক প্রতীকারের উপায় সকল বর্ণিত হইয়াছে, যে সকল পুরোহিতের সমধিক আয়ত্ত ৭। রাজাকে সর্ববিধ বিপৎ হইতে রক্ষা করা রাজবৈদ্য ও রাজপুরোহিতের কেবল কর্ত্তব্যকর্ম নহে,—না করিলে তাঁহাদের ধর্ম্মহানি এবং দেশদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতা পর্যন্ত হইত। কেন না—তখনকার রাজা এখনকার রাজা হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক ছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্মকে সাংকর্য বা ব্যভিচার হইতে রক্ষা, বৈদিক ধর্মকর্মের যথা নিয়মে অনুষ্ঠান এবং প্রজাগণের জীবন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু করণীয়, সে সমস্তই রাজার অবশ্য করণীয় কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত ৮। এই জন্যই ত্রেতাযুগে একজন ব্রাহ্মণের শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তিনি রাজা রামচন্দ্রকে সেই মৃত্যুর জন্য অপরাধী করিয়াছিলেন এবং রাজা রামচন্দ্রও তাহার প্রতীকার করিয়াছিলেন।

রাজা যুদ্ধ করিতে গিয়া যেখানে সুমহান্ শিবির সংস্থাপন করিয়া নিজের বাসের জন্য পটগৃহ সন্নিবেশ করিতেন, সেইখানে রাজগৃহের পরেই রাজবৈদ্যের জন্য বাসস্থান নির্ম্মিত হইত।

প্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং—পুনরাহারৌষধ-দ্রব্যাণাং যোজনা।
সত্ত্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোঽর্থেভ্যো মনোনিগ্রহঃ।" চ, সূ. ১ম অ.।

৫ "দোষাগন্তুজ-মৃত্যুভ্যো রসমন্ত্রবিশারদৌ।
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং যত্নৌ বৈদ্যপুরোহিতৌ।" সু-সূ ৩৪ অ

"একোত্তরং মৃত্যুশতমথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংজ্ঞস্তু শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।" ঐ।

৬ "ব্রহ্মা বেদাঙ্গমষ্টাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমভাষত।
পুরোহিতমতে তস্মাদ্বর্ত্তেত ভিষগাত্মবান্।" সু. সূ. ৩৪ অ.

৭ "সঙ্করঃ সর্ব্ববর্ণানাং প্রণাশো ধর্ম্মকর্ম্মণাম্।
প্রজাণামপি চোচ্ছিত্তির্নৃপব্যসনহেতুতঃ।" ঐ।

৮ "স্কন্ধাবারে চ মহতি রাজগেহাদনন্তরম্।
ভবেৎ সন্নিহিতো বৈদ্যঃ সর্ব্বোপকরণান্বিতঃ।" ঐ

রাজবৈদ্য চিকিৎসার সকল উপকরণ অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, সে সমস্তই লইয়া তথায় সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন এবং যে সকল লোক শত্রুপক্ষের প্রযুক্ত বিষ বা শল্যের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার ব্যাধির দ্বারা পীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাঁহাদের চিকিৎসা করিতেন ৯।

প্রাচীনকালে, রাজবৈদ্য হইতে হইলে কতকগুলি বিশিষ্টগুণের অধিকারী হইতে হইত। যথা,—যে শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়া নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, সে শাস্ত্র ব্যতীত আরও অনেক শাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা থাকা এবং তাঁহার সমব্যবসায়ী চিকিৎসক-মণ্ডলীর ও রাজার নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠা বা সমাদর থাকা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন যিনি রাজবৈদ্য হইতেন তাঁহাকে কেবল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেই চলিত না,—সুনিপুণভাবে স্বহস্তে সকল কর্ম করিতে, কঠোর পরিশ্রম করিতে, অতি সত্বর কর্ম সম্পাদন করিতে, দেখিবামাত্র উপায় নির্ধারণ করিতে এবং বুদ্ধিপূর্বক ধীরভাবে পবিত্রতার সহিত কর্ম করিতে, তাঁহার সর্বদা উদ্যোগ বা চেষ্টা থাকাও একান্ত আবশ্যক ছিল। এতাদৃশ বৈশারদ্য ও সত্যপরায়ণতা এবং সেই সঙ্গে ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ না থাকিলে কেহ রাজবৈদ্য হইতেন না। তখন রাজবৈদ্যের সঙ্গে যে পরিচর বা পীড়িতের সেবাকার্যের জন্য সেবক থাকিত, তাহা সাধারণ সেবকের মত হইলে চলিত না। এজন্য পরিচরের গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—যাহার স্বভাব স্নিগ্ধ অর্থাৎ কোমল, যে চিকিৎসককে রোগীর সম্বন্ধে কোন কথাই গোপন করিবে না, যাহার দেহে বেশ বল আছে, যে রোগীর সেবা-কার্যে সর্বদা নিযুক্ত, চিকিৎসকের আদেশ পালনে সদা উদ্যুক্ত এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে সমর্থ এরূপ সেবক চিকিৎসা কার্যের একটী অঙ্গবিশেষ ১০।

আয়ুর্বেদে দেখা যায়—রাজাকে হত্যা করিবার জন্য বিক্রমশালী শত্রুগণ এবং বিদ্বেষ-সম্পন্ন ভৃত্যগণই ক্রুদ্ধ হইয়া অবসর প্রাপ্ত হইলে বিষ প্রয়োগ করিত। সাধারণতঃ তাহারা অন্নপানাদিতে বিষ সংযুক্ত করিয়া রাখিত, কখনও বা রাজার চিত্তবিনোদনের জন্য বিষকন্যাকে উপহাররূপে প্রেরণ করিত। রাজা তাহার সহিত সঙ্গত হইয়া বিষাক্ত-দেহ

তত্রস্থমেনং ধ্বজবদ্‌যশঃখ্যাতিসমুচ্ছ্রিতম্
উপসর্পন্ত্যমোহেন বিষশল্যাময়ার্দিতাঃ।" সু. সূ. ৩৪ অ.

৯ "স্বতন্ত্রকুশলোঽন্যেষু শাস্ত্রার্থেষ্বহিষ্কৃতঃ।
বৈদ্যো ধ্বজ ইবাভাতি নৃপতদ্বিদ্যপূজিতঃ॥
তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সর্জ্জোপস্কর-ভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী বিশারদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ স ভিষক্‌পাদ উচ্যতে॥" ঐ

১০ স্নিগ্ধোঽজুগুপ্সুর্বলবান্ যুক্তো ব্যাধিতরক্ষণে
বৈদ্যবাক্যকৃদশ্রান্তঃ পাদঃ পরিচরঃ স্মৃতঃ॥ ঐ

হইত, তাহার ফলে রাজার প্রাণবিয়োগ ঘটিত[১১]। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষসেও রাজা চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার শত্রুপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত বিষকন্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়।

রাজার অন্নপানীয় যাহাতে শত্রুপক্ষ বা বিদ্বিষ্ট ভৃত্য কর্তৃক বিষাক্ত না হইতে পারে, তাহার জন্য রাজা যথোচিত ব্যবস্থা তো করিতেন-ই, অধিকন্তু তিনি আর একজন বৈদ্যকে অন্নপানীয় প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য তাঁহার পাকশালার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিতেন। ইনিও রাজবৈদ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্য চক্রপাণি দত্ত মহোদয়ের পিতা নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতি নরপালদেবের পাকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন[১২]। এই পাকশালার অধ্যক্ষের গুণাবলী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যিনি পাকশালার অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ও সদ্বংশ-জাত, সতত কর্মতৎপর, স্নিগ্ধ-মধুর চরিত্র, প্রিয়দর্শন, লোভ ও প্রতারণাশূন্য, রাজার প্রতি অনুরক্ত, কৃতজ্ঞ, মেধাবী, কষ্টসহিষ্ণু, ক্রোধ-পারুষ্য ও মদ-মাৎসর্য-বিবর্জ্জিত, ক্ষমাবান্, সদাচার-সম্পন্ন ও অকপট প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণবিভূষিত হইতে হইত এবং রাজাও তাঁহাকে প্রচুর বিত্ত দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিতেন। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন বৈদ্য সর্বদা পাকশালার অধ্যক্ষরূপে রাজভবনে বিচরণ করিতেন। তাঁহার নিকট ভোজ্য, পানীয় প্রভৃতি পরীক্ষার উপকরণ এবং বিবিধ প্রকার বিষনাশক ঔষধ সকলও থাকিত[১৩]।

রাজার অন্নপানীয় বিষাক্ত কিনা পরীক্ষার জন্য পাকশালাধ্যক্ষ বৈদ্যের আদেশে, কাক, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, হংস, জীবজীবক, শুক, শারিকা ও ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী এবং মর্কট ও পৃষত নামক মৃগ প্রভৃতি সযত্নে রাজভবনে প্রতিপালিত হইত। ইহাদের দ্বারা রাজার অন্নপানীয়াদির পরীক্ষা এবং রাজভবনের শোভাবর্ধন—উভয়ই হইত। কোন কোন প্রাচীন রাজবংশে এখনও ইহার শেষ-স্মৃতি পশুপক্ষিশালা বা চিড়িয়াখানারূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

১১ "রিপবো বিক্রমাক্রান্তা যে চ স্বে কৃত্যতাং গতাঃ।
সিসৃক্ষবঃ ক্রোধবিষং বিবরং প্রাপ্য তাদৃশম্॥
বিষৈর্নিহন্তুনিপুণাঃ নৃপতিং দুষ্টচেতসঃ।
বিষকন্যোপযোগাদ্বা ক্ষণাজ্জহ্যাদসূন্ নৃপঃ॥" সু. ক. ১ম অ.

১২ গৌড়াধিনাথ-রসবত্যধিকার-পাত্র
নারায়ণস্যতনয়ঃ"—ইত্যাদি—চক্র. সূ. অ. ১৫ শ্লোক

১৩ "কুলীনং ধাম্মিকং স্নিগ্ধং সুভৃতং সততোত্থিতম্।
অলুব্ধমশঠং ভক্তং কৃতজ্ঞং প্রিয়দর্শনম্॥
ক্রোধ-পারুষ্য-মাৎসর্য্য-মদালস্য-বিবর্জ্জিতম্।
জিতেন্দ্রিয়ং ক্ষমাবন্তং শুচিং শীলদয়ান্বিতম্।
মেধাবিনমসংশ্রান্তমনুরক্তং হিতৈষিনম্।
পটুং প্রগল্ভং নিপুণং দক্ষং মায়াবিবর্জ্জিতম্॥
পূর্ব্বোক্তৈশ্চ গুণৈর্যুক্তং নিত্যসন্নিহিতাগদম্।

রাজা পাকশালার অধ্যক্ষের আদেশে যে রন্ধনশালা নির্মাণ করাইতেন, তাহা প্রশস্তদিকে যেখানে রৌদ্রবাতাস উত্তমরূপে আসিতে পারে তথায় নির্মিত হইত। পাকশালার ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত হইত। ঘরের মধ্যে কোন ঘর থাকিত না। তাহার জানালাগুলিও বড় বড় হইত এবং সেই জানালা দিয়া যাহাতে কীট পতঙ্গাদি আসিতে না পারে, সেজন্য পরিষ্কার জাল দেওয়াও থাকিত। পাকশালার ঘরের ভিতরে চাঁদোয়া খাটান হইত এবং পাকশালার ব্যবহার্য পাত্রগুলিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মাজিয়া রাখা হইত। রন্ধনশালার উঠানে তৃণাদি কোন আবর্জনা থাকিত না। যে সকল পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত স্ত্রী-পুরুষ, তাহারাই কেবল সেই পাকশালায় কর্মাদি সম্পাদনের জন্য তথায় থাকিতে পাইত [১৪]। তথায় যে সকল ভৃত্য নিয়োজিত হইত, তাহারা আচার-সম্পন্ন, অনুকুল, নিপুণ, বিনীত, প্রিয়দর্শন ও প্রসন্নচিত্ত হইত। তাঁহাদিগকে দাড়ি-গোঁফ কামাইতে হইত, হাতে বড় বড় নখ রাখিতে পারিত না, স্নানাদি করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে হইত ও মাথায় পাগড়ী বাঁধিতে হইত এবং ধীর ও সংযতভাবে আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত। এইরূপ ভৃত্য একাধিক বা অনেক থাকিত। কেননা প্রত্যেককে বিভিন্ন প্রকার কর্ম করিতে হইত [১৫]।

এক্ষণে রাজার অন্নপানীয় বিষসংযুক্ত কিনা তাহার পরীক্ষা পাকশালাধ্যক্ষ যেরূপভাবে করিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। এই পরীক্ষায় মুল্যবান্ কোন যন্ত্রের আবশ্যক ছিল না। পরীক্ষাকার্য সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ওবিজ্ঞানসম্মত ছিল এবং যে কোন ব্যক্তি এতদনুসারে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইত।

বিষাক্ত অন্ন পরীক্ষা যথা—(১) রাজার অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য হইতে কিয়দংশ মক্ষিকা ও বায়স প্রভৃতি পক্ষীদিগকে প্রথমে খাওয়াইয়া দেখা হইত। যদি উহা ভক্ষণ করিয়া মক্ষিকা ও বায়সাদি মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহা হইলে উহা যে বিষযুক্ত তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণীকৃত হইত। অথবা—

মহানসে প্রযুঞ্জীত বৈদ্যং তদ্বিদ্যপূজিতম্। সু. ক. ১ অ.

১৪ সাজলকং গবাক্ষাঢ্যমাপ্তবর্গ-নিষেবিতম্।
প্রশস্ত-দিগ্‌দেশকৃতং শুচিভাণ্ডং মহচ্ছুচি।
বিকক্ষস্থষ্টসংস্থষ্টং সবিতানং কৃতার্চ্চনম্।
পরীক্ষিত-স্ত্রীপুরুষং ভবেচ্চাপি মহানসম্।

১৫ "শুচয়ো দক্ষিণা দক্ষা বিনীতাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
সংবিভক্তাঃ সুমনসো নীচকেশনখাঃ স্থিরাঃ।।
স্নাতা দৃঢ়াঃ সংযমিনঃ কৃতোষ্ণীষাঃ সুসংযুতাঃ।
তথাচাজ্ঞাবিধেয়াঃ স্যুর্বিবিধাঃ পরিকর্ম্মিণঃ।" সু. ক. অ.

(১-১১) "নৃপভক্তাদ্বলিং ন্যস্তং সবিষং ভক্ষয়ন্তি যে।
তত্রৈব তে বিনশ্যন্তি মক্ষিকাবায়সাদয়ঃ।।
হুতভুক্তেন চান্নেন ভৃশংচট্‌চটায়তে।

(২) ভোজ্য দ্রব্যের কিয়দংশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি অত্যন্ত চট্‌চট্‌ শব্দ এবং ময়ূরের কণ্ঠের মত তীব্র উজ্বল শিখা নির্গত হইত কিংবা অগ্নিশিখা বিচ্ছিন্ন ও তাহা হইতে তীক্ষ্ণ ধূম নির্গত হইত এবং সে ধূম সহসা উপশমিত না হইত, তাহা হইলে উহা বিষসংযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইত। তদ্ভিন্ন,—

(৩) বিষসংযুক্ত অন্নাদি দর্শন করিলে চকোরের চক্ষুর বর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিত এবং—

(৪) বিষাক্ত অন্নাদি দর্শন করিলে জীবজীবক পক্ষীর মৃত্যু (৫) কোকিলের স্বর বিকৃতি (৬) ক্রৌঞ্চের মত্ততা (৬) ময়ূরের উদ্বেগ ও রোমাঞ্চ (৭) শুক ও সারিকার চীৎকার (৮) হংসের বিকট আর্ত্তনাদ (৯) ভৃঙ্গরাজের নিনাদ (১০) পৃষত নামক মৃগের অশ্রু বিসর্জন ও (১১) বানরের মতভেদ হইত।

রাজাকে যে সকল ভৃত্য ক্রোধপরবশ হইয়া অথবা বিপক্ষপক্ষের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বিষ প্রদান করিত, তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে এবং রাজাকে হত্যা করিবার জন্য রাজ-ব্যবহার্য যে সকল দ্রব্যে বিষপ্রদান করা হইত, সে সকল দ্রব্যের নামাদি এবং তাহাদের প্রতীকার বা চিকিৎসাদি—এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক-বোধে উল্লিখিত হইল না।

এই প্রবন্ধে প্রাচীনভারতের তদানীন্তন রীতিনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় যাহা প্রদত্ত হইল, তাহা বোধ হয় বর্তমানে অনেকেরই অবিদিত আছে। আশাকরি ইহাদ্বারা তখনকার কালের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে।

ময়ূরকণ্ঠপ্রতিমো জায়তে চাপি দুঃসহঃ ॥
ভিন্নার্চ্চিস্তীক্ষ্ণধূমশ্চ ন চিরাচ্চোপশাম্যতি।
চকোরস্যাক্ষি-বৈরাগ্যং জায়তে ক্ষিপ্রমেব তু ॥
দৃষ্টান্নাৎ বিষসংসৃষ্টাৎ ম্রিয়ন্তে জীবজীবকাঃ।
কোকিলঃ স্বরবৈকৃত্যং ক্রৌঞ্চস্তু মদমৃচ্ছতি।
হৃষ্যেন্ময়ূর উদ্বিগ্নঃ ক্রোশতঃ শুকসারিকে।
হংসঃ ক্ষ্বেড়তি চাত্যর্থং ভৃঙ্গরাজস্তু কূজতি।
পৃষতো বিসৃজত্যশ্রু বিষ্ঠাং মুঞ্চতি মর্কটঃ।
সন্নিকৃষ্টাংস্ততঃ কুর্য্যাদ্রাজ্ঞস্তান্ মৃগপক্ষিণঃ ॥
বেশ্মনোঽথ বিভূষার্থং রক্ষার্থঞ্চাত্মনঃ সদা।" সুশ্রুত-কল্পস্থান ১ম অ

আবেস্তা-সাহিত্যে উপনয়ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র, এম্‌. এ.

ভারতীয় আর্যধর্মের মূল যেমন বেদ, পার্শী বা জরথুস্ত্র-প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বীদেরও সেই প্রকার মূল ধর্মগ্রন্থ হইতেছে আবেস্তা। ইরাণীয় আর্য ও ভারতীয় আর্যগণ অতীতে বহুকাল একত্র বসবাস করায় উভয়েরই দৈনন্দিন জীবনে প্রায় একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস-পূর্ব যুগের অনেক সংস্কারই সুসভ্য আর্যগণ আত্মসাৎ করিয়া সেগুলিকে যুগোপযোগী ক্রিয়াকলাপ দিয়া পরিপুষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে আর্যজীবনের বিবিধ জটিল সংস্কারের সৃষ্টি হইল। এইগুলির মধ্যে উপনয়ন সংস্কারটীর গুরুত্ব অনেক বেশী। ভারতীয় আর্যদিগের উপনয়ন-প্রথা প্রধানতঃ গৃহ্যসূত্র গুলির মধ্যে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন বৈদিকগ্রন্থেও বহুস্থানে এতৎসংক্রান্ত বিধিনিষেধের উল্লেখ দেখা যায়, তবে গৃহ্যসূত্রের মত এমনতর সর্বাঙ্গীণ নহে। পার্শীদের উপনয়ন প্রধানতঃ আবেস্তা হইতে জানিতে পারা যায়। তবে কোন কোন বিশেষ বিবরণ পরবর্তী যুগের সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই, কারণ বেদের মতই আবেস্তারও অনেক অংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেগুলি সম্প্রদায়ক্রমে আবেস্তোত্তর সাহিত্যে বর্তিয়া গিয়াছে। বৈদিক উপনয়ন এবং পার্শী উপনয়নের মধ্যে এত বেশী সাদৃশ্য রহিয়াছে যে আমরা একটী হইতে অপরটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারিনা। কাজেই জিজ্ঞাসু পাঠক দুইটী সম্প্রদায়ের মূলীভূত ধর্মগ্রন্থ সকল পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলেই সমধিক লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই।

বৈদিক ধর্মে দ্বিজবর্ণের জন্য প্রধানতঃ একটী মাত্র (নিত্য) উপনয়নই বিহিত ছিল, কিন্তু বিশেষ বিশেষ কার্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন (নৈমিত্তিক) উপনয়নও দেওয়া হইত। পার্শীদের মধ্যে তখন দুইটী উপনয়ন হইত---প্রথম বয়সে শিশুকে জরথুস্ত্রীয় ধর্মের অঙ্গীভূত করিবার জন্য যে উপনয়ন দেওয়া হইত, তাহা নওজোত্‌ (Naojot), এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পার্শীকে পৌরোহিত্যের অধিকার দানের জন্য যে দ্বিতীয় উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল, তাহা নাবর্‌ (Navar) ও মরাতিব্‌ (Maratib) নামে চলিয়া আসিয়াছে। ইঁহাদের উপনয়ন দুইটীও যথাক্রমে আমাদেরই মত নিত্য ও নৈমিত্তিক। কারণ নাবর্‌ ও মরাতিব্‌ বংশপরম্পরায় যাঁহারা পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাদেরই জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কাজেই যাগযজ্ঞ বিশেষ অনুষ্ঠানের ভূমিকা বলিয়া ইহারা নৈমিত্তিক আখ্যা পাইতে পারে। নিম্নে সংক্ষেপে উপনয়ন দুইটীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

প্রথমতঃ নওজোত্‌। এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে নানা আলোচনা রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা সুপ্রাচীন "আবেস্তীয়" 'নবজ্‌ওতর্‌' [=সংস্কৃত, নব-হোতর্‌] শব্দেরই পরবর্তী রূপ। উপনয়নের পর হইতে পার্শী শিশুকে ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের আচরণ করিতে

হয় বলিয়াই এই ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। মতান্তরে পারসীক 'নউজ্যাদ্' বলিতে যাহ' বুঝায়, ইহা তাহাই। 'নউজ্যাদ্' অর্থ 'নবজাত'। উপনয়নে পুনর্জন্ম হয়, এই ধারণা আর্যধর্মে এমন কি অনার্যদিগের মধ্যেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই পুনর্জন্ম হইতেছে আধ্যাত্মিক নবজীবন। এই ভাবটী ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নানারূপ আচারও রহিয়াছে। কাজেই সমাজতত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে শেষোক্ত অর্থেরই অধিকতর যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন হয়। আধুনিক পার্শীগণ এই সংস্কারকে বলেন 'শিব্-কুস্তী (śib-kusti)। নওজোত্ মুখ্যতঃ আজীবন-পরিধেয় পবিত্র সুদ্রহ্ [অঙ্গরাখা] এবং কুস্তী বা কোস্তী [মেখলা] ধারণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। 'শিব্-কুস্তী' কথাটী হইতে কুস্তীর প্রধান্যই খ্যাপিত হইতেছে।

পার্শী শিশু জন্মাবধি প্রায় ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অন্তঃপুরে জননী প্রভৃতির আদর যত্ন অনুভব করিয়া ৫ হইতে ৭বৎসর পর্যন্ত পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করিত। বিদ্যাশিক্ষা তাঁহাদের জাতীয় জীবনে একটী প্রধান কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বেন্দীদাদে (৪।৪৪) আছে—"পবিত্র মন্ত্রাত্মক শব্দ (Maθra Spenta) কেবল মাত্র শিক্ষালিপ্সুদের (Kratu-cinah) কাছেই উচ্চারণ করা যাইতে পারে"। আবেস্তার অন্তর্ভূত দীন্‌কার্ত্ গ্রন্থে তাঁহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বহুতর কথা জানা যায়। বেন্দীদাদ্ (১৫।৪৫) এবং দীন্‌কার্ত্ (১৭০ তম পরিচ্ছেদ) সাত বৎসর বয়সে নওজোতের বিধান দিয়াছেন। অর্থাৎ সেই সময় হইতেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষারম্ভ। অবশ্য শিশু যদি তখন তাহার নূতন জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তবে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নওজোত্ সংস্কার স্থগিত রাখা চলিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে নওজোত্ না হইলে পাপের ভাগী হইতে হয়। দীন্‌কার্তে ইহাকে একটী পাপ কার্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। আমাদেরও গৃহ্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অনুরূপ শব্দ হইতেছে 'পতিত-সাবিত্রীক' এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় ব্রাত্যস্তোম দ্বারা। ১৫ বৎসর অতীত হইয়া গেলে বালক অসংস্কৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া পাপ-দানবীর আয়ত্তীকৃত হইয়া পড়ে। বেন্দীদাদে (১৮।৫৪-৫৯) এই বিষয়ে একটী সুন্দর কথোপকথন আছে। স্রওষ বা স্রোষ্[১] এবং দ্রুজ্[২] পরস্পর আলাপ করিতেছেন। স্রওষ প্রশ্ন করিলে উত্তরে দ্রুজ্ বলিতেছেন, "আমরা পাপ-দানবীরা এবং দএব-গণ, কোন স্ত্রী বা পুরুষ কুস্তী এবং সুদ্রহ্ বিরোহিত হইয়া চারি পা চলিলেই তাহাকে আমাদের করায়ত্ত করিয়া ফেলি। তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মজ্জা পর্যন্ত বিশীর্ণ করি। তদবধি সে পৃথিবীতে ধর্মলোপ করিবার জন্যই বিচরণ

---

১ মূর্তিমান্ ধর্ম, আনুগত্যের প্রতীক; মৃত্যুর পর মানুষের আত্মাকে স্বর্গে পৌঁছিয়া দিবার ভার ইঁহার উপরেই ন্যস্ত এবং ইনি রাশ্‌নু ও মিথ্রের সহিত লোকান্তরিত আত্মার বিচার করিয়া থাকেন। ইনি অহুর মজ্‌দ্ কর্তৃক নিযুক্ত দূত এবং দএব (পাপিষ্ঠ দানব) দিগের উপর দণ্ডাঘাত করিয়া থাকেন।

২ পাপ-দানবী আমাদের পাপপুরুষ বা 'কলি' সম্বন্ধে যে ধারণা সেই ধারণা লইয়া ইহার চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ইহার নিবাস নরকে। লোকে ধর্মাচরণ দ্বারা ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে। সংস্কৃত দ্রুহ্ ধাতু অর্থে বিদ্রোহ করা, ধর্ম-বিদ্রোহিণী বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

করিতে থাকে।" এই প্রসঙ্গে সদ্-দর্ (১০।১ ; ৪৬।১) এবং ষায়স্ত্ লা ষায়স্ত্ (১০।১৩) দ্রষ্টব্য। কুস্তী বিরহিত হইয়া বিচরণ করার অপরাধ দীনা-ঈ-মইনোগ্-ঈ-ক্রৎ [Dina-I-mainog-I-xrat] (২।৩৫) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এখানে এই অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবার আদেশ রহিয়াছে। অনুরূপ আদেশ 'অর্তা-ঈ-বিরাফ্ নামক্' [Arta-I-viraf Nāmak] (২৫।৬) এবং পতেৎ [Patet] (১০) গ্রন্থেও রহিয়াছে।

জরথুস্ত্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই কুস্তী ধারণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কুস্তী শব্দটীর নানাবিধ ব্যুৎপত্তি রহিয়াছে। পারসীক 'কুশ্ত্' (Kušt) অর্থে 'দিক্', 'কটি', 'সীমা' ও 'অর্ণবপোত' বুঝায়। এই সকল অর্থই কুস্তীর অর্থে আরোপ করা হইয়াছে। কোন্‌টী যে সত্য, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে কুস্তী যখন মেখলা ছাড়া অন্য কিছুই নহে, তখন 'কটি'-অর্থক 'কুশ্ত্' শব্দের সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সুদ্রহ্ নামক অঙ্গরাখা শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া প্রস্তুত হইত। দুইখণ্ড কাপড় সেলাই করিয়া জামার আকারে পরিতে হইত। কুস্তীর উপাদান ছিল মেষলোম। (বৈদিক উপনয়নে মেষলোম নির্মিত বসন বৈশ্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল)। ৭২ গুণ সূত্র দ্বারা কুস্তী প্রস্তুত হইত। পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরাই এই সূত্র বয়ন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং পুরোহিত স্বয়ং মন্ত্রোচ্চারণ-সহ পরিমাণানুযায়ী ছেদন ও দীক্ষিতের জন্য উৎসর্গ করিতেন। ৭২ সংখ্যাটী 'যাস্ন'-গ্রন্থের ৭২টী অধ্যায়ের প্রতীক। এই ৭২ গুণ সূত্রকে একত্র করা বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। অঙ্গরাখার শ্বেতবর্ণ পবিত্রতার সূচনা করিতেছে। দুই টুকরা কাপড় যে এক সাথে মিলাইয়া জামা তৈয়ার করা হইত, ইহা অতীত ও ভবিষ্যতের মিলন বলিয়া ধরা হইত। মেখলা (রশনা) সম্বন্ধে বৈদিক আর্যগণের মধ্যে এত বেশী খুটিনাটি একেবারেই ছিল না। কেবলমাত্র বর্ণভেদে উপাদান ভেদের ব্যবস্থা দিয়াই সূত্রকারগণ ক্ষান্ত হইয়াছেন।

নওজোতের পূর্বে শিশুকে কতকগুলি সূক্ত মুখস্থ করিতেই হইত। সেইগুলির মধ্যে 'নীরং কুস্তী' প্রধান। আমাদের গায়ত্রীর ('তৎ সবিতুর্বরেণ্যং'—ইত্যাদি) আসনে পার্শীরা এই 'নীরং কুস্তী'কে বসাইয়াছিলেন।

উপনয়নের দিনে প্রাতঃকালে শিশু স্নান করিয়া উপনয়ন-মণ্ডপে গমন করিত। পূর্বে শিশুর উপবাসের রীতি ছিল না। একখণ্ড শ্বেতবস্ত্রে ঊর্ধদেহ আচ্ছাদিত করিয়া একটী অনুন্নত আসনে পূর্বাস্য হইয়া শিশুকে উপবেশন করিতে হইত। পাশে একটী প্রদীপ জ্বলিত। সম্মুখে প্রধান পুরোহিত উপবিষ্ট হইতেন। তিনি একটী নূতন সুদ্রহ্ শিশুর হস্তে অর্পণ করিলে উপস্থিত পুরোহিতবর্গ সকলে মিলিয়া 'পতেৎ' (প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র) পাঠ করিতেন। পরে শিশু 'যথা অহূ বৈর্যো' উচ্চারণ করিত। এইবার উপনয়নের আসল ক্রিয়াকলাপ সুরু হয়। প্রথমে দীক্ষাপ্রার্থী নিজেকে জরথুস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য সূক্ত-বিশেষ পাঠ করে, তখন সুদ্রহ্ ধারণ করা হয়। তারপর 'নীরং কুস্তী' আবৃত্তির পর কুস্তী ধারণ। যাস্ন (১২) গ্রন্থটীতে জরথুস্ত্র-কথিত ধর্মের সার সঙ্কলন করা রহিয়াছে।

এই সূক্তটী পাঠ করিলে যথার্থ নওজোত্ শেষ হয়। অনন্তর প্রধান পুরোহিত উপনীতের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদাত্মক 'তন দরুস্তী' পাঠ করিতে করিতে উপনীতের মস্তকে তণ্ডুল, দাড়িম, নারিকেল-শাঁস, শুষ্ক আঙুর প্রভৃতি ঢালিয়া দেন। তারপর সকল পুরোহিত সমবেতকণ্ঠে আর একবার 'তন্ দরুস্তী' আবৃত্তি করেন। পরে পুরোহিতের দক্ষিণা প্রদান এবং সামাজিক উৎসবে নওজোতের উদ্‌যাপন হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নাবর্ ও মরাতিব্, এই দুইটি পৌরোহিত্যের অধিকার দিবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। পৌরোহিত্য তখন বংশানুক্রমিকভাবে জরথুস্ত্রীয় ধর্মে প্রচলিত ছিল। কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হইত। পৌরোহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই পর পর এই অনুষ্ঠান দুইটীর প্রয়োজন ছিল।

নাবর্ হইতেছে প্রাথমিক উপনয়ন। এই শব্দটী 'নাঙ্গবর্' বা 'নাগ্‌বর্' [পহ্লবী—'নাপর্', 'নাঙ্গবর্'] রূপেও লিখিত আছে। ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় দুঃসাধ্য। নাবর্-অনুষ্ঠানের তিনটি অঙ্গ। প্রথমতঃ পবিত্রতা আধানের জন্য 'বরষ্‌নুম্' নামক নয়দিনব্যাপী ক্রিয়া। ইহা বেন্দীদাদে (৮।৩৫-৭২ ; ৯।১—৫৭) বর্ণিত হইয়াছে। যিনি পুরোহিত হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার জন্য একটী 'বরষ্‌নুম্' হইত। আবার যাঁহার বিগত আত্মার স্মৃতিতে অথবা যাঁহার সম্মানার্থে উপযুক্ত ব্যক্তির উপনয়ন হইতেছে, তাঁহার জন্যও একটী 'বরষ্‌নুম্' অনুষ্ঠিত হইত। দুইটীই পরপর সম্পন্ন হইত, অথবা একটী শেষ করিবার পর কয়েকদিন পরে অপরটী করা হইত। বরষ্‌নুমের পরে দুইজন পুরোহিতের উপর 'গেউরা' উৎসব সম্পাদনের ভার দেওয়া হইত। 'গেউরা' কথাটী আবেস্তা √গরেউ ধাতু (প্রাপ্ত্যর্থক) হইতে নিষ্পন্ন। এই উৎসবে ছয়দিন ধরিয়া 'যাস্‌ন' আবৃত্তিসহ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান চলে। 'জওতর্' (=বৈদিক 'হোতর্') নামক পুরোহিত সহযোগীদের লইয়া এই আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই ছয়দিনের মধ্যে দীক্ষালিপ্সুকে বিধর্মীর সংস্পর্শ এড়াইয়া ধর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিতে হয়। সপ্তম দিনে স্নান সমাপন করিয়া তিনি শ্বেত 'জামা' এবং 'পিচ্ছোরি' (মেখলা) পরিহিত হইয়া সাময়িক পৌরোহিত্যের চিহ্নস্বরূপ বামহস্তে একখানা শাল এবং দক্ষিণহস্তে একটী দণ্ড (আবেস্তা—'বজ্র' (vazra) ধারণ করেন। সম্ভব হইলে 'দর-ই-মিহ্‌র্' অগ্নি-মন্দিরে শোভাযাত্রা সহ উপস্থিত হইয়া উপনয়ন দীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নতুবা শোভাযাত্রা বাদ দিয়াই করা হয়। দীক্ষার্থী তারপর যাস্‌ন [মীনো নাবর্ যাস্‌ন] আবৃত্তি করিবার জন্য প্রস্তুত হন। যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের সহিত দীক্ষার্থী 'জোতী' (জওতর্) এবং দীক্ষাদাতা 'রাথ্‌বী'র (জওতরের সহকারী ঋত্বিক্) অংশ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে 'বাজ্' উৎসব সমাপনান্তে ভোজন করিয়া 'আফ্রিঙ্গান্' উৎসব করা হয়। ইহার পরের দুইদিন একবার করিয়া ভোজনের বিধি রহিয়াছে। দ্বিতীয়দিনে স্রওষের উদ্দেশ্যে উৎসবগুলি পুনরনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য প্রথমদিনের মত অপরাহ্ণে না হইয়া 'বাজ্' এই দিন প্রাতঃকালেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে সীহ্ রোচক্ (sih rocak)

বা মাসান্তর্গত ত্রিশদিনের উদ্দেশ্যে আবার এইগুলি করা হয়। চতুর্থদিনে 'অহুর মজ্‌দ'কে উদ্দেশ্য করিয়া ইহাদের পুনঃাবৃত্তি হয়, তবে এইদিনের বিশেষত্ব হইতেছে যাসন্‌-পাঠ। দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একমাস সময়ের মধ্যে দীক্ষার্থীকে অতিমাত্রায় সংযত হইয়া থাকিতে হয়। কোনরূপ অপবিত্র চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যথানির্দিষ্ট সময়ে আহারাদি এবং ভূমিতে শয়ন ইত্যাদি আচরণ বাধ্যতামূলক। এই সকল বর্ণনা হইতে আমাদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থোক্ত দীক্ষনীয়েষ্টির কথা মনে না পড়িয়া যায় না। শারীরিক পবিত্রতা কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হইলে আবার নূতন করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হয় বলিয়া আজকাল পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই 'নাবর্‌' উপনয়ন দিয়া রাখা হয়। এই উপনয়ন লইবার পর অধুনা জীবিকা নির্বাহের জন্য অনেকে পৌরাহিত্য ভিন্ন অন্য পথও ধরিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের বেলায় 'যাস্‌ন' হইতে সামান্য মাত্র অংশই আবৃত্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। পূর্ণমাত্রায় 'নাবর্‌' অনুষ্ঠান করিবার পরে দীক্ষিত পুরোহিত 'হের্‌বদ্‌' নামে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি পুরোহিতের যাবতীয় করণীয় সম্পাদনের অধিকার লাভে সমর্থ হন না। কয়েকটী বিশিষ্ট ক্রিয়াসম্পাদন করিবার জন্য তাঁহাকে 'মরাতিব' নামক উপনয়নও লইতে হয়।

'মরাতিব'—উপনয়নার্থীকে 'যাস্‌ন' এবং 'বীস্‌পরদ্‌' ভিন্ন বেন্দীদাদ্‌ও পাঠ করিতে হয়। ইহাতে দশ দিন স্থায়ী একটী 'বরষ্‌নুম্‌' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একাদশ দিবসে একজন সুযোগ্য ঋত্বিকের সহিত "মীনো নাবর্‌ যাসন্‌" আবৃত্তি করিতে করিতে 'খুব্‌' উৎসব সম্পন্ন হয়। পরদিন প্রওষের উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে একটী যাসন্‌ এবং মধ্যরাত্রে বেন্দীদাদ্‌ আবৃত্তি করা হইলে 'মরাতিব' শেষ হইয়া যায়। এই সময়ে উপনীতের সামাজিক নাম হয় 'মোবদ্‌' (পহ্লবী, 'মগুপৎ')। এখন হইতে তিনি জরথুষ্ট্রীয়ধর্মের সকল অনুষ্ঠানের অধিকার লাভ করিয়া পার্শী সমাজের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হন।

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

পূর্বে বেদান্তের প্রতিপাদ্য ৮টী বিষয় অদ্বৈতমতানুযায়ী স্থূলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অদ্বৈতচিন্তার ধারাকে কয়েকটী যুগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রথম যুগের দার্শনিকগণের ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। আচার্য শঙ্করকে ব্রহ্ম-সূত্রের প্রথম অদ্বৈতমতপর ভাষ্যকার বলা চলে না, কারণ তিনি তাঁহার ভাষ্যের মধ্যেই পাণিনির গুরু উপবর্ষের ভাষ্যের বিষয় বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৩) এবং উপবর্ষ ভাষ্য হইতে তাঁহার ভাষ্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু এই ভাষ্য লুপ্ত। আচার্য গৌড়-পাদের গ্রন্থগুলিও শঙ্করভাষ্যের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। ইনি শঙ্করের পরমগুরু ছিলেন এবং ইঁহার রচিত প্রধান গ্রন্থ মাণ্ডুক্য-উপনিষদের উপর কারিকা। ইহার উপর শঙ্করের ভাষ্য আছে। ইহা পুনা আনন্দাশ্রম ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার 'মিতাক্ষরা' নাম্নী ১টী টীকাও আছে। উহা কাশীতে পাওয়া যায়। এই কারিকার ৪টী প্রকরণ এবং সর্বসমেত ইহাতে ২১৫ শ্লোক আছে। গৌড়পাদের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকাভাষ্য'। কাহারও মতে ইহা অন্যকোন গৌড়পাদ কর্তৃক রচিত। এই ভাষ্যের উপর 'চন্দ্রিকা' নামক একটী টীকা আছে। ইহা বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত। গৌড়পাদের তৃতীয় গ্রন্থ 'উত্তরগীতা ভাষ্য'। ইহা শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত। 'উত্তর গীতা' মহাভারতের একটি অংশ। গৌড়পাদের মতবাদ পূর্বেই সামান্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়পাদের জীবনী বিশেষ জানা যায় না। তবে তিনি গৌড়দেশীয় বলিয়া উল্লিখিত আছে (নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি ৪।৪৪)।

শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ-লিখিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। আচার্য শঙ্কররচিত বহু গ্রন্থ আছে। মাত্র ৩২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল সুতরাং এত অল্প সময়ের মধ্যে এত গ্রন্থ রচনা তাঁহার অসাধারণ মনীষারই পরিচয়দান করে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিকে আমরা ৫ শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—

১। (ন্যায়প্রস্থান) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ইহার উপর ভামতী, কল্পতরু, পরিমল, আভোগ প্রভৃতি বৃত্তি ও টীকাদি আছে। Thibaut কৃত ইংরেজী অনুবাদও Sacred Books of the East Series-এ প্রকাশিত হইয়াছে। আর পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশের বঙ্গানুবাদ আছে।

২। (শ্রুতিপ্রস্থান) দ্বাদশ উপনিষদ ভাষ্য—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষদ্।

৩। স্মৃতিপ্রস্থান—গীতাভাষ্য, বিষ্ণু সহস্রনামভাষ্য, সনৎসুজাতীয় ভাষ্য ও ললিতা-ত্রিশতীভাষ্য (মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত)।

৪। প্রকরণ গ্রন্থ—বিবেকচূড়ামণি, উপদেশসহস্রী, অপরোক্ষানুভূতি, বাক্যবৃত্তি, আত্মনিরূপণম্, আত্মবোধ, শতশ্লোকী, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ, প্রপঞ্চ সারতন্ত্রপ্রমুখ প্রকরণগ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত প্রবোধ সুধাকর, মনীষা পঞ্চক দশশ্লোকী, অজ্ঞানবোধিনী মোহমুদ্গর, বাক্যসুধা, প্রমুখ ক্ষুদ্র প্রকরণগ্রন্থ আছে।

৫। স্তোত্রাবলী—বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর প্রায় ৭৫টী স্তোত্র।

আচার্য শঙ্করের গ্রন্থের বহু সংকরণ হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত ২০ খণ্ডে সমাপ্ত সংস্করণই উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহাতে কতকগ্রন্থ—যেমন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ভাষ্য, অজ্ঞান-বোধিনী এবং কয়েকটী স্তোত্র নাই।

প্রকরণ গ্রন্থগুলির মধ্যে (ক) উপদেশ সহস্রীর উপর রামতীর্থ স্বামীর পাদযোজনিকা টীকা ও পদ্যাংশের উপর বোধনিধির টীকা আছে, (খ) অপরোক্ষানুভূতির উপর বিদ্যারণ্য স্বামীর টীকা আছে, (গ) শতশ্লোকীর উপর আনন্দগিরির টীকা আছে, (ঘ) দশ শ্লোকটীর উপর মধুসূদন সরস্বতী ও ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর টীকা আছে, (ঙ) বাক্যসুধার উপর ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর টীকা আছে, (চ) পঞ্চীকরণের উপর সুরেশ্বরাচার্যের ভাষ্য আছে, (ছ) প্রপঞ্চসার-তন্ত্রের উপর পদ্মপাদাচার্যের টীকা ও অন্যান্য টীকা আছে, (জ) আত্মবোধের উপর বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত রচিত 'দীপিকা' নাম্নী টীকা আছে, (ঝ) মনীষা পঞ্চকের উপর গোপাল বালযতি-কৃত 'মধুমঞ্জরী' নামক ও অন্যান্য টীকা আছে। স্তোত্রগুলির মধ্যে কেবল দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রের উপর টীকা আছে।

তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্যের উপর বহুবৃত্তি, দীপিকা, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি আছে। তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

(৩) পদ্মপাদাচার্য

পদ্মপাদাচার্য আচার্য শঙ্করের প্রথম শিষ্য। ইঁহার পূর্বনাম সনন্দন। দাক্ষিণাত্যের চোলপ্রদেশে ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। শঙ্কর যখন বদরিকাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন সনন্দকে তিনি আহ্বান করেন। ইনি তখন নদীর অন্য তীরে। অসাধারণ গুরুভক্তি-প্রভাবে তিনি গুরুর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ নদীর উপর দিয়াই অগ্রসর হ'ন এবং তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে একটি করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এইজন্য ইঁহার নাম পদ্মপাদ। ইনি পূর্বে নৃসিংহদেবের ভক্ত ছিলেন এবং ইষ্টলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপাবলে ইনি পরবর্তীকালে যখন কাপালিক উগ্রভৈরব সমাধিস্থ শঙ্করকে নিধনোদ্যত তখন সেই কাপালিককে বধ করেন। ইনি এক সময়ে শঙ্করভাষ্যের উপর রচিত তাঁহার বার্তিক গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া মাতুলালয়ে যান ও সেখানে এই গ্রন্থের পুঁথি রাখিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। ইঁহার মাতুল ছিলেন পূর্বমীমাংসা দর্শনের অন্তর্গত প্রভাকর মতাবলম্বী। তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া নিজের গৃহ দগ্ধ করিয়া পদ্মপাদের এই গ্রন্থ ভস্মীভূত করেন। মাতুলালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া পদ্মপাদ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন মর্মাহত হইয়া পুনরায় এই গ্রন্থ লিখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মাতুল তখন

বিষপ্রয়োগে পদ্মপাদকে পাগল করে। পদ্মপাদ তখন গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের নিকট পদ্মপাদ পূর্বে একবার ঐ গ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। শঙ্কর অসাধারণ স্মৃতিশক্তিশালী ছিলেন। তিনি তখন আবৃত্তি করিয়া গেলেন ও পদ্মপাদ স্বরচিত গ্রন্থ পুনরায় লিখিয়া লইলেন। ইনি পরে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত পুরীর গোবর্ধন মঠের অধীশ ছিলেন।

ইঁহার রচিত ভাষ্যবার্তিকের নাম পঞ্চপাদিকা। ইহার মাত্র কিয়দংশ (চতুঃসূত্র) পাওয়া যায় ও ইহা কাশী 'বিজয় নগর সিরিজ' এ প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী অংশ লুপ্ত। ইহার উপর প্রকাশাত্ম যতির 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' নামক টীকা আছে। ইহা বিজয় নগর সিরিজে প্রকাশিত। এই টীকার উপর আবার অখণ্ডানন্দমুনি কৃত 'তত্ত্বদীপন' নামক টীকা আছে। (বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত)। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত পঞ্চপাদিকার টীকা ও অমলানন্দ কৃত 'পঞ্চপাদিকা দর্পণ' নামক টীকা, পঞ্চপাদিকা বিবরণের উপর নৃসিংহাশ্রম কৃত 'ভাবপ্রকাশিকা' নামক টীকা আছে। কিন্তু এগুলি এখনও অপ্রকাশিত। পদ্মপাদ তাঁহার গ্রন্থে প্রভাকর মতকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং শঙ্কর মতকে যুক্তি সাহায্যে আরও দৃঢ়তর করিয়াছেন।

(৪) সুরেশ্বরাচার্য

শঙ্করের ২য় শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য। ইঁহার পূর্বনাম মণ্ডনমিশ্র। ইঁহার বাসস্থান ছিল মাহিষ্মতী নগরে (ইহা বর্তমান ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত ও নর্মদাতীরস্থ) এবং ইনি প্রসিদ্ধ মীমাংসক কুমারিল ভট্টের ছাত্র। শঙ্করের সহিত বিচারে ইনি পরাজিত হইয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বিচারের মধ্যস্থ ছিলেন মণ্ডনেরই স্ত্রী, বিদুষী উভয় ভারতী। পরে আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ (দাক্ষিণাত্যে) স্থাপন করিয়া সুরেশ্বরকে উহার মঠাধীশ করেন। সুরেশ্বর লিখিত তিনখানি প্রকরণ গ্রন্থ আছে। (১) ব্রহ্মসিদ্ধি--ইহা এখনও অপ্রকাশিত এবং ইহার উপর বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্বসমীক্ষা' নামক টীকা আছে ও নিত্যবোধনাচার্যেরও ১টী টীকা আছে। (২) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি—ইহা বোম্বাই সেণ্ট্রাল বুকডিপো ও বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত। ইহার উপর জ্ঞানোত্তম মিশ্রের 'চন্দ্রিকা' নামক টীকা আছে। (৩) ইষ্টসিদ্ধি বা স্বারজ্যসিদ্ধি। ইহা এখনও অপ্রকাশিত। ইহার উপর শ্রীমজ্ঞাঙ্করানন্দ স্বামীর ১টী টীকা আছে। সুরেশ্বরের লিখিত ২টী ভাষ্যবার্তিক আছে—(১) তৈত্তিরীয় ও (২) বৃহদারণ্যক। এই দুইখানিই পুণা আনন্দাশ্রম হইতে আনন্দজ্ঞান কৃত টীকা সমেত প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ আছে—বিধিবিবেক। ইহার উপর বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়কণিকা' টীকা আছে। ইহা কাশী মেডিকেল হল হইতে প্রকাশিত।

আচার্য শঙ্কর কৃত পঞ্চীকরণের উপর সুরেশ্বরের একটি টীকা আছে। ইহা বোম্বাই-এ প্রকাশিত।

সুরেশ্বরাচার্যকৃত গ্রন্থগুলি অদ্বৈত বেদান্তের আকর গ্রন্থ। ইনি প্রাভাকর মত খণ্ডন করিয়াছেন, ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন ও প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাপার-তন্ত্র নহে ; মুক্তি নিত্যসিদ্ধ।

পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর ব্যতীত শঙ্করেরআরও ২ জন শিষ্য ছিলেন—হস্তামলক ও তোটকাচার্য। হস্তামলকাচার্যের 'হস্তামলক' নামক ১টী ১৪ শ্লোকযুক্ত আত্মজ্ঞান বিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। উহার উপর আচার্য শঙ্করের ভাষ্য আছে। তোটকাচার্যের লিখিত মাত্র ১টী গুরু স্তব আছে। সুরেশ্বরাচার্যের তিরোধানের সহিত (ইনি শঙ্করের পরেও অনেকদিন জীবিত ছিলেন) বেদান্তদর্শনের অদ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রথম যুগ শেষ হয়। পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর হইতে শঙ্কর সম্প্রদায়ের দুটি শাখার সৃষ্টি হয়, এবং পরবর্তীযুগে সুরেশ্বরের মতই প্রাধান্য লাভ করে। বলা বাহুল্য এই দুই শাখায় সামান্যই মত প্রভেদ আছে। এই যুগের আর একজন আচার্যের বিষয় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। ইনি সর্বজ্ঞাত্মমুনি। ইঁহার অপর নাম নিত্যবোধাচার্য। সুরেশ্বরের পরবর্তীকালে ইনি শৃঙ্গেরী মঠের পীঠাধীশ হ'ন। ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন ও ইঁহার আবির্ভাবকাল ৭৫৮ খ্রীঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ অব্দ। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণ যখন ইলোরার কৈলাস মন্দির স্থাপন করেন তখন ইনি ইঁহার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখা হইতে জানা যায়। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "সংক্ষেপ শারীরকম্"। ইহাকে শঙ্করভাষ্যের প্রকরণবার্তিক বলা যাইতে পারে ও ইহা শ্লোকে লিখিত। ইহার উপর মধুসূদন সরস্বতীর 'সারসংগ্রহ টীকা' ও রামতীর্থ স্বামীর "অন্বয়ার্থ প্রকাশিকা টীকা" আছে। ইহা কাশী ও পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত। পুণার সংস্করণে রামতীর্থের টীকা ও অগ্নিচিৎপুরুষোত্তমমিশ্র কৃত 'সুবোধিনী' নাম্নী একটি টীকা আছে।

আচার্য সর্বজ্ঞাত্ম মুনিও ভাট্টমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রতিবিম্ববাদী। অর্থাৎ ঈশ্বর অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্ব ও জীব অন্তঃকরণে প্রতিফলিত চিৎপ্রতিবিম্ব। তাঁহার মতে জীব জাতি ও ব্যক্তিভেদে এক। অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটী শক্তি।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

যে মহাপুরুষ খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত ভারতের গৌরবময় অতীতের কাহিনী ও জ্ঞানরাজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমক্ষে সিংহনাদে বিঘোষিত করিয়া এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যুগের সূচনা করিয়াছেন—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ধর্মসমন্বয় বাণী বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন—দেশে দেশে এইমাসে তাঁহার জন্ম স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের ধর্ম, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে সে এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণ। বর্তমান যুগাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার সম্পদ্ জগৎকে দান করিবার জন্য এই অমিততেজা সন্ন্যাসীপ্রবর বিবেকানন্দকে নিজহাতে গড়িয়াছিলেন। উদ্দেশ্য--এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া পরাজিত পরানুকরণান্ধ মোহাচ্ছন্ন জাতির গতিকে ইহার সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের দিকে পরিবর্তন করা। বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনী ও বাণী অনেকেই অবগত। তাঁহার শুভ জন্ম তিথিমাসে সাম্প্রদায়িক দোষদুষ্ট, দ্বেষহিংসা-ক্লিষ্ট ও আদর্শ-পরিভ্রষ্ট জাতিকে তাঁহারই বাণী ও আদর্শের সামান্য পরিচয় দান করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কলিকাতা নগরীর সিমলা পল্লীস্থ ভবনে এক শুভ পৌষসংক্রান্তির পুণ্যপ্রভাতে ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারী পৌষী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে এই বিশ্ববিজয়ী বীর বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপরায়ণা আদর্শ হিন্দুরমণী, আর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত একজন প্রতিভাশালী উচ্চশিক্ষিত, উদারমতাবলম্বী, স্বাধীনচেতা আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। পিতামাতার বহুগুণই এই বালক নরেন্দ্রনাথ দত্তের (বিবেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ) জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের শৈশবের কার্যাবলী ও অনুসন্ধিৎসা তাঁহার সুমহান ভবিষ্যৎ জীবনেরই পরিচয় দিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা, স্বাধীনচিত্ত, বন্ধুপ্রীতি, সুকণ্ঠ ও বলিষ্টদেহ শীঘ্রই তাঁহার অধ্যাপক মণ্ডলীর ও আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কলিকাতার জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউসন্ হইতে তিনি বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিলেও তাঁহার উদার স্বভাব ও দানশীলতার জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। মাতা ও নাবালক ভ্রাতা ভগ্নীর অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য তিনি এই সময় বিশেষ বিব্রতহইয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই দক্ষিণেশ্বরের যুগাদর্শ রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই যুবককেই তাঁহার তপঃসম্ভূত ফল জগতকে দান করিবার শ্রেষ্ঠ

পাত্ররূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ছাত্র জীবনে নরেন্দ্রনাথ পরাজ্ঞান ও ঈশ্বর দর্শনের প্রবলানুরাগে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্যদিগের সঙ্গ করিতেন। কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি লাভ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণকেই তিনি ঈশ্বর দ্রষ্টা মহাপুরুষ জ্ঞানে সেই সময়ে গুরুপদে বরণ করেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে ১৮৮৬ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট যে ভীষণ দুর্দ্দিনে যুগাবতার মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ মহাসমাধিস্থ হ'ন—এই ৬ বৎসর কাল আমরা নরেন্দ্রনাথের কঠোর সাধনার পরিচয় পাই। এই সময়ের প্রথম ভাগে তাঁহার পঠদ্দশা শেষ হয় ও ইহার শেষভাগে তিনি তাঁহার আয়ত্ত কয়েকটি গুরুভাই সমেত গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হ'ন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত---হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া মহারাজা, ধনী ও দরিদ্রের সহিত মিশিয়া বর্তমান ভারতের প্রকৃত রূপের সন্ধান পান। এই সময়ে তিনি কয়েকটী দেশীয় নৃপতি ও বহুছাত্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁহার মান্দ্রাজস্থ ছাত্র ও বন্ধুদের উৎসাহে আমেরিকা চিকাগো সহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ১১ই সেপ্টম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টম্বর এইধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান হয়। যে দিন তিনি বেদান্তধর্মের সার্বজনীনত্ব ও হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্বসভায় বিজয় নির্ঘোষে প্রচার ও প্রমাণ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতের ও হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় আরম্ভ হইল। তিনিই হইলেন এই মহাসভার শ্রেষ্ট প্রতিনিধি। তারপর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ও ইংলণ্ডে তিনি দীর্ঘ ৪বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতের অমূল্য জ্ঞানরাজি ও তত্ত্ব সমূহ প্রচার করেন এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাকে শিষ্য ও শিষ্যাশ্রেণীতে পরিণত করিয়া ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা করেন। ভারতে আগমন করিয়া কলম্বো হইতে আল্মোরা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা প্রদান দ্বারা গুরুপ্রদত্ত ভাবরাজি ও আদর্শ ভারতবাসিকে দান করেন ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ বপন করেন। ভারতে তাঁহার সহিত কয়েকটী পাশ্চাত্য মহিলাও আগমন করিয়া তাঁহার কার্যের সহায়তা করেন। নিজ গুরুভাইগণের সাধনা ও চেষ্টায় এবং দেশস্থ ও বিদেশস্থ অর্থ সাহায্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামিজীর স্বাস্থ্য কয়েকবার ভগ্ন হয়। তারপর ১৯০২ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় কর্মশ্রান্ত বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আত্মোপলব্ধির চরম অবস্থায় মহাপ্রয়াণ করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্থূলশরীরে আর ইহজগতে নাই। কিন্তু তাঁহার শক্তি এখনও তাঁহার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের মধ্যদিয়া জনহিতকর কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে।

বর্তমান যুগে ভারতে অনেক দেশনেতা বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বিবেকানন্দের মত একাধারে দেশপ্রেমিক, মানবমিত্র, সাধক, বাগ্মী ও কর্মী এযুগে কেহ জন্মিয়াছেন কিনা জানিনা। তিনি ছিলেন একাধারে শঙ্করের প্রতিভা ও বুদ্ধের হৃদয় সমন্বিত

ভারতের নষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য, পুনরায় ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দানের জন্য, ইহার অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য, আর্ত ও দুঃস্থদিগকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবার জন্য, ভারতের স্বাধীনতা ও সম্পদ অর্জনের জন্য, ইহার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য, ভারতে আবার নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি গুরুকুলের ন্যায় আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য, ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচারকল্পে ইহার বিভিন্ন স্থানে আশ্রম স্থাপনের জন্য---এক কথায় ভারতের জাতীয় মেরুদণ্ড, সনাতন ধর্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁহার অপূর্ব পরিকল্পনা ও আদর্শ যদি বর্তমান যুগে কিয়দংশও কার্যে পরিণত করা যায় তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যগগনের অমানিশা তিরোহিত হইয়া আবার নবীন ভারতের শুভ প্রভাত হইবে।

তাঁহার ধর্ম ছিল মানুষ তৈয়ারী করা। তিনি চাহিয়াছিলেন এক সহস্র যুবক—তেজবান, বীর্যবান, ব্রহ্মচারী, শিক্ষিত যুবক—যাঁহারা দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবেন। তিনি চাহিয়াছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অপূর্ব সামঞ্জস্য। তিনি চাহিয়াছিলেন মূর্খ ও নীচজাতিকে শিক্ষিত ও ব্রাহ্মণ করিতে—উচ্চজাতিকে টানিয়া নীচে নামাইতে নহে। তিনি চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্যের আদর্শে ভারতে কলকারখানা স্থাপন করিতে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে। আজ যে সব নেতারা দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতেছেন তাঁহারা স্বামীজির পরিকল্পনায় অনেক নূতন আলো ও সম্ভবতঃ নিজেদের ভুলভ্রান্তিও দেখিতে পাইবেন। তিনি তাঁহার সাধকনেত্রে বর্তমান ভারতের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়াছিলেন ও ইহার উদ্ধারের পন্থাও স্থির করিয়াছিলেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার শতমুখী প্রতিভা ও কার্যাবলীর বিশ্লেষণ ও মতবাদের আলোচনা সম্ভবপর নহে। তাঁহার শিষ্যবর্গ লিখিত কয়েক খণ্ডে ইংরেজী ও বাংলা জীবনীগ্রন্থ সমূহ ও মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত ৭ খণ্ডে তাঁহার বক্তৃতাবলী ও গ্রন্থসমূহ পাঠে এ বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। তদীয় শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদও উদ্বোধন অফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

জগৎ কল্যাণব্রতে আত্মাহুতির মূর্তিমান প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মাসে তাঁহার কর্মপ্রণালী, তাঁহার আদর্শ আবার দেশবাসীর সমক্ষে উজ্জ্বলতর হউক, তাঁহার পুণ্যময়-বাণী আবার ঘনতমসাবৃত জাতীয় জীবনের রজনীর মধ্যে আলোক সম্পাত করুক!

(২)

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও শিক্ষানুষ্ঠান

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ, বি. এল্.

[বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির ও অনুষ্ঠানের মাত্র একটু আভাষ প্রদত্ত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করিবার এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সহিত ইহার তুলনা করিবার ইচ্ছা রহিল।]

গিরিনদী-বেষ্টিত, ঋষিকুল-সেবিত, শান্তরসাস্পদ, শ্যামল তপোবনে প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলা-নিকেতনে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত ছিল। এই সব তপোবনেই মানব মনে জ্ঞানের প্রথম আলোক সম্পাত হইয়াছিল, এইখানেই সভ্যতা ও কৃষ্টির বীজ প্রথম রোপিত হইয়াছিল, আর এই সব কেন্দ্রই ধর্মের বাণী বিশ্বসভায় প্রেরিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় গাহিয়াছেন---

"প্রথম প্রভাত উদয়-তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভুবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।"

সকলেই জানেন সনাতন আর্য-ধর্মে ৪টী বর্ণের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এবং ৪টী আশ্রমের—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—বিধি ও নিষেধমূলক কার্যাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের যুগে এই বর্ণাশ্রমধর্মের এত বিস্তারিত নিয়মাদি ছিল না; কিন্তু ক্রমে যখন জ্ঞানের প্রসার, সমাজের বিস্তার ও রাজ্যরক্ষার সমস্যা হইতে লাগিল, তখন গুণ ও কর্ম অনুযায়ী ৪টী বর্ণের ও মানব জীবনের আদর্শের সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার জন্য ৪টী আশ্রমের প্রয়োজন হইল। পৌরাণিক যুগেও গীতায় শ্রী ভগবান্ বলিতেছেন "চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।" পৃথিবীর অন্য কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে এইপ্রকার বর্ণাশ্রমধর্মের সুন্দর পরিকল্পনা দেখা যায় না। পরবর্তী কালে কিন্তু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। ভারতীয়দের মধ্যে নানাপ্রকার জাতি ও আচারধর্ম প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের জাতীয়তাভাবকে ও সমাজকে শতধা ছিন্ন করিল।

সাধারণতঃ বিদ্যারম্ভের সময় শিশুর ৫ম বর্ষ। সে সময় একটী সংস্কার কার্য হয় তাহা হইতেছে 'বিদ্যারম্ভ সংস্কার'। কোন শুভদিনে পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠানের সহিত এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হইত। ইতিপূর্বেই শিশুর শরীর ও মনের পবিত্রতার জন্য আরও কয়েকটী সংস্কার অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, যেমন---গর্ভাবস্থাতেই গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি, তারপরে জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ ইত্যাদি। যাহা হউক বিদ্যারম্ভকেই ছাত্র-জীবনের প্রথম সংস্কার বলা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে চৌলকর্ম সংস্কারের সঙ্গেই বিদ্যারম্ভ হইত। 'মুহূর্ত মার্তণ্ড' নামক একটী জ্যোতিষ গ্রন্থে বিদ্যারম্ভের প্রশস্তকাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। অনেকে বলেন বর্তমান কালের

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সে যুগে কোন প্রকার পাঠশালা ছিল না। যদিও ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রাদির মধ্যে এই প্রকার পাঠশালার বিষয় বর্ণিত নাই, কিন্তু জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে এইসব বিদ্যালয়ের বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে লিপিবিদ্যা, অক্ষর পরিচয় ও অঙ্কশাস্ত্রের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। তারপর বিদ্যারম্ভ হইত উপনয়ন সংস্কারের পর। এই সংস্কারের বিষয় ঋগ্বেদেও পাওয়া যায় (১০।১০৯।৫)। এই উপনয়ন সংস্কার নবীন ছাত্রের মনে একটি গভীর রেখা সম্পাত করে। উপবাস-ক্লিষ্ট, শুদ্ধস্নাত ছাত্র যখন মেখলা ও কৌপীন পরিধান করে তখন যে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হয় তাহা অতি সুন্দর। তিনটী সূতার মেখলা যেন তিনটী বেদ-দ্বারা ছাত্রকে বেষ্টিত করিয়া রহিল। ব্রহ্মচারীর দণ্ড তাহাকে জ্ঞানরাজ্যে ভ্রমণকারী রূপে পরিণত করিল। উপনয়নের তিন দিবস পরে 'মেধাজনন' অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছাত্র যেন মেধাবী ও স্মৃতিশক্তিশালী হয়। তারপর ছাত্রের ব্রহ্মচর্যাশ্রম আরম্ভ হইল। তাহাকে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করা হইল। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় ছাত্রকে কয়েকটী বাৎসরিক ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান 'উপাকর্ম বা শ্রাবণী' এবং 'উৎসার্জন'; আর নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান---আশ্বমেধিকা প্রভৃতি। তদানীন্তন গুরুকুল সমূহে সাধারণতঃ বর্ষাকালে পাঠারম্ভ হইত। প্রথমদিনে শিক্ষক ও ছাত্রেরা একত্রে এই উপাকর্ম অনুষ্ঠান করিতেন। বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রকারেরা আষাঢ়, শ্রাবণ বা ভাদ্রের পূর্ণিমা তিথিকে এই উপাকর্মের প্রশস্ত দিন বলেন। পৌষ ও মাঘ মাসে উৎসার্জন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত এবং ইহার সহিত বাৎসরিক বেদাধ্যয়ন কাল শেষ হইত। বৎসরের বাকী ৬ মাস বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতির অধ্যয়ন করান হইত। বেদের এক একটি অংশ অধ্যয়নারম্ভের প্রথমে এক একটি নৈমিত্তিক যজ্ঞ হইত যেমন---উপনিষদ পাঠারম্ভের প্রথমে রহস্য বা উপনিষদ্ ব্রত, অশ্বমেধযজ্ঞ পাঠের আরম্ভে আশ্বমেধিকা ব্রত, আরণ্যক পাঠের আরম্ভে ব্রাতিক ব্রত ইত্যাদি। সাধারণতঃ ৮ম বর্ষে ব্রাহ্মণদিগের, ১২শ বর্ষে ক্ষত্রিয়দের ও ১৬শ বর্ষে বৈশ্যদের সন্তানের উপনয়ন হইত এবং তাহাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম অন্ততঃ ১২ বর্ষকাল স্থায়ী হইত। যাঁহারা অধ্যয়ন শেষে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন তাঁহাদিগকে উপকুর্বন্ ব্রহ্মচারী, আর যাঁহারা এই আশ্রমেই যাবজ্জীবন থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিতেন তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হইত। পাঠশেষে একটী অনুষ্ঠান হইত তাহাকে সমাবর্তন বা স্নানসংস্কার বলে। ইহা কতকটা বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation-এর মত। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পরেও যাহাতে বিদ্যাধ্যয়নের ধারা আজীবন থাকে, সেজন্য গৃহীদের বৎসরে অন্ততঃ ২ মাস গুরুগৃহে বাসের ব্যবস্থা ছিল। আচার্য ছাত্রকে এই সমাবর্তন উৎসবের সময় যে উপদেশগুলি প্রদান করিতেন (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।২ দেখুন) তাহা কতকটা বর্তমান Convocation Address-এর মত।

ব্রাহ্মণদের যে সব গ্রাম্য উপনিবেশ থাকিত তাহাদের নাম 'অগ্রহার'। এই সবস্থানে প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যাদান করা হইত। এইসব বিদ্যালয়কে লিপিশালা ও ইহাদের শিক্ষকদিগকে দারকাচার্য বলা হইত। গ্রামের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনার জন্য পরিষৎ

থাকিত। উপনয়নের পর ছাত্রকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। তখন তাহাকে 'অন্তেবাসী' বা 'গুরুগৃহ বাসী' বলা হইত। এক একটি গুরুর অধীনে বহু ছাত্র বাস করিত ও শিক্ষালাভ করিত। এইগুলিই এক একটি গুরুকুল। এক একটি গুরুকুলে প্রধান গুরু বা কুলপতির অধীনে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য অনেক আচার্য বা উপাধ্যায়ও থাকিতেন। এইসব গুরুকুল বর্তমানের Residential বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। কিন্তু এইসব গুরুকুলে ছাত্রদের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে সব ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহার বিশেষ স্থান নাই। ছাত্রদিগকে অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিতে হইত, তারপর প্রাতঃস্নান ও হোমাদি সমাপনান্তে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত, দ্বিপ্রহরে ভিক্ষায় বহির্গত হইতে হইত। ভিক্ষা ব্রত অবশ্য সব গুরুকুলেই প্রবর্তিত ছিল না, কারণ অনেক গুরুকুল রাজন্যবর্গ বা ধনীলোকদিগের অর্থ বা দানদ্বারা পরিচালিত হইত। অপরাহ্নে পাঠ গ্রহণের পর পুনরায় সন্ধ্যায় কাষ্ঠাহরণ প্রভৃতির জন্য ছাত্রেরা একত্রে নিকটস্থ বনে যাইত। ইহাকে একটি সুন্দর ব্যায়াম বলা যাইতে পারে। রাত্রে পুনরায় গুরুসন্নিধানে পাঠালোচনা হইত।

ভারতের বহুস্থানে মুনিঋষিদের তপোবনগুলি এইরূপ এক একটি গুরুকুল ছিল। তমসা নদীর তীরে চিত্রকূট পাহাড়ে বাল্মীকির আশ্রম এইরূপ একটি গুরুকুল ছিল। এইখানে ভরদ্বাজ ঋষি শিক্ষালাভ করিয়া নিজে আবার গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানে একটি গুরুকুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাল্মীকির আশ্রমেই রাঘববংশের লব ও কুশ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গা সরযুর সঙ্গম-স্থানে ঋষি অনঙ্গদেবের ও অগস্ত্যের আশ্রম---বশিষ্ঠের আশ্রম---বিন্ধ্যপর্বতস্থ শুক্রের আশ্রম---মিথিলার নিকটস্থ অরণ্যে গৌতমের আশ্রম--বদরিকাশ্রমে ঋষি পরাশরের আশ্রম---এই প্রকার বহু আশ্রম গুরুকুলরূপে ভারতীয় শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারের কেন্দ্র ছিল। দণ্ডকারণ্যে ও নর্মদা, গোদাবরী ও ভাগিরথীর তীরে এই প্রকার অসংখ্য গুরুকুল ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সে সময় তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র এমন কি সুদূর তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে পরিব্যাপ্ত। তক্ষশীলা গান্ধার প্রদেশের রাজধানী ছিল। রামায়ণে আছে (৭।১০১।১০-১৬) ইহা ভরত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও রাজকুমার তক্ষের নামানুযায়ী তক্ষশীলা বলিয়া কথিত। বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডির উত্তর পশ্চিমে প্রায় ১২ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া এই স্থানের ভগ্নস্তূপ বর্তমান। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুপ্রকার (১৮) বিদ্যার চর্চা হইত। ইহার ধনুর্বেদ বিদ্যালয়ে ভারতের ভিন্ন স্থান হইতে ১০৩ জন রাজপুত্র শিক্ষালাভ করিতেন। ইহার আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে জীবক (ইনি রাজা বিম্বিসারের অবৈধ পুত্র) প্রমুখ আয়ুর্বেদ বিশারদগণ শিক্ষা লাভ করিতেন। সম্ভবতঃ পাণিনিও (ইঁহার জন্মস্থান আটকের নিকটস্থ সালাতুরে) ইহার ছাত্র ছিলেন। কাশীও সে সময় একটী প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।এই সব আশ্রম ও তৎসংলগ্ন গুরুকুল ব্যতীত সে সময় মন্দিরগুলি, তীর্থস্থান সকল, মঠ ও রাজধানী গুলিও এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। পরবর্তী বৌদ্ধযুগে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর

তদানীন্তন প্রাচীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১ হাজার অধ্যাপক ও ১০ হাজার ছাত্র ছিলেন। ইহার অন্তর্গত কলেজে ৮টী বড় হল ও তিন শত কক্ষ ছিল। নালন্দার যে অংশে পুস্তকালয় ছিল তাহার নাম ধর্মগঞ্জ। রত্নসাগর, রত্নোদধি এবং রত্নরঞ্জক নামক তিনটী প্রাসাদে ইহার লাইব্রেরী ছিল। পরবর্তী যুগে ৮ম শতাব্দীতে রাজা ধর্মপাল-স্থাপিত বিক্রমশীল' বিহার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বর্তমান ভাগলপুরের প্রায় ২৪ মাইল পূর্বে গঙ্গার দক্ষিণতীরে পাথর ঘাটা নামক পাহাড়ের উপরে ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত বলভি বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ ভারতের এন্নায়িরম্ কলেজ (ইহা দক্ষিণ আর্ক জেলার অন্তর্গত) প্রভৃতি বহু বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী ভারতে শিক্ষা প্রচার করিত।

এই সব বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরুকুলে সাধারণতঃ এই ১৮ প্রকার শাস্ত্রের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত—৪ বেদ (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ) ৬টী বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ), ৪টী উপাঙ্গ (পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্র), ৪টী উপবেদ (আয়ুর্বেদ, যুদ্ধবিদ্যা, সঙ্গীত ও অর্থশাস্ত্র)। তদানীন্তন ভারতে যে বহুপ্রকার শিল্প বিদ্যালয় ছিল তাহা ৬৪ প্রকার শিল্পের নাম হইতে জানা যায়। সে সময় যে বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যালয় (Commercial College) ও যুদ্ধ বিদ্যালয় (Military College) ছিল তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সব গুরুকুলগুলি যে কেবল ছাত্রদিগের জন্যই ছিল তাহা নহে। সে সময় স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন হইত, বেদ শিক্ষাদান হইত ও অন্যান্য শিল্পশাস্ত্রও অধ্যয়ন করান হইত।

আমাদের কথা

গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, Indian History Congress ও Indian Historical Records Commission-এর সদস্য ও প্রতিনিধিদিগকে এক জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রীতির জন্য ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতদিগের এইরূপ একত্র সমাবেশ পরস্পরের মধ্যে গবেষণাবিষয়ক ভাবের আদান প্রদানে যথেষ্ট সহায়তা করে।

* * *

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিলভারত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হইল। প্রচারাদি কার্যের, সুন্দর বক্তৃতাদির, গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রস্তাবের ও হিন্দু জনসাধারণের উৎসাহ ও আন্তরিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে এই অধিবেশন বিশেষ সাফল্যযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রায় কুড়িটী প্রস্তাব ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু সংগঠন-মূলক প্রস্তাবটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যর্‌ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের হিন্দুদিগের প্রাচীন গৌরবকাহিনী ও তাঁহাদের বর্তমান দুরবস্থা অতি সুন্দরভাবে তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। বীর সাভারকারের বক্তৃতাও মনোরম হইয়াছিল।

* * *

যাহাতে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের (গণিত ও ফলিত) বিশেষভাবে গবেষণা হয় ও এই শাস্ত্রের বহু অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ঐগুলি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়, এ বিষয়ে আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য হয় তাহার জন্য ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের কার্যকরী সভার গত অধিবেশনে একটি পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও ইহার জন্য একটি পৃথক কমিটিও গঠিত হইতেছে। আমরা এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি কামনা করিতেছি।

* * *

জৈনধর্ম ভারতের একটি প্রাচীনতম আর্যধর্ম। ইহার অন্তর্গত দর্শন ও ধর্মমূলক বহু গ্রন্থ আছে। জৈন সম্প্রদায়ের সংখ্যা যদিও খুব বেশী নহে (সমগ্র ভারতে প্রায় ১৫ লক্ষ জৈন আছেন) তথাপি ইহার দর্শনাদি গ্রন্থ পৃথিবীর মনীষি ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বহু ধনী ব্যক্তি থাকিলেও এই সব গ্রন্থের বহুল প্রকাশ ও প্রচার হয় নাই। এইজন্য ইন্‌স্টিটিউটের গত সভায় একটি জৈনবিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছে ও একটি পৃথক কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা জৈন সম্প্রদায় ও জৈন শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে এ কার্যে যোগদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ইউরোপের বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ। ইহার ফলে কত অমানুষিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। আমরা জ্ঞান, কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শনগুলির রক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা বলিতেছি। ভারতের জ্ঞান ও কৃষ্টির নিদর্শন ইহার প্রাচীন পুঁথি। এমন বহু অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে যেমন জার্মেণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে চলিয়া গিয়াছে যাহার অন্য কোন সংখ্যা (কপি) ভারতে নাই। যদি সম্ভব হয় ভারতের শিক্ষিত, ধনী ও সরকারগণ এইগুলিকে স্বদেশে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করেন বা অন্ততঃ দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলির কপি করাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন, তবে ভারতীয় সংস্কৃতির দিক দিয়া বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

* * * * *

গত ২৫শে নভেম্বর কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। বর্তমান যুগে ভারতীয় মহিলারা জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করিতেছেন। জাতীয় জীবনে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী করিতেছেন, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব আন্দোলন মাত্র মুষ্টিমেয় অভিজাত বংশের বা শিক্ষিতা মহিলাদেরই মধ্যে প্রধানতঃ নিবদ্ধ। শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই গ্রাম্য বা অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, কুসংস্কার দূরীকরণ, শিশুপালন ও শিক্ষা প্রভৃতি কার্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ভারতে মাত্র একটি (পুণাতে) স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রাচীন ভারতে ও বৌদ্ধযুগে স্ত্রীদিগের বহু আশ্রম ও মঠ ছিল। বর্তমানে ইউরোপেও এই প্রকার অনেক আশ্রম আছে। কিন্তু বর্তমান ভারতে বোধ হয় ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই প্রকার একটি আশ্রম বা মঠ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের এবিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাঁহার অকাল দেহত্যাগে ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই। আমাদের বক্তব্য ভারতের এই নব জাগরণের দিনে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মহিলারা যদি সনাতন ধর্মের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সমাজ-সংস্কার কার্য, শিশুপালন প্রভৃতি কার্যে যোগদান করেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যান হয়।

পুস্তক সমালোচনা

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত ও উদ্বোধন কার্যালয় (১, মুখার্জি লেন, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৪০৭; মূল্য ১॥ টাকা।

এই গ্রন্থখানি ২ ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে বেদের কয়েকটী সূক্ত ও উপনিষদ্ হইতে কতকগুলি অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'বৃহৎ স্তবকবচমালা' ও এই প্রকার স্তবের অন্যান্য কয়েকটী পুস্তক আছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ নাই। অর্থবোধ ও ভাবের অনুভূতি না থাকিলে দেবদেবীর স্তব পাঠে সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। কিন্তু সাধারণ পাঠক পাঠিকারা প্রচলিত স্তব পুস্তকের মধ্যে অন্বয় ও অনুবাদ না থাকায় উহার স্তবের ভাব ও অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। বর্তমান গ্রন্থখানি সেই অভাব সম্পূর্ণ পূরণ করিয়াছে। ইহার প্রথমভাগের অন্তর্গত সূক্তাদির অবশ্য অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল উদ্ধৃতাংশের একত্র সন্নিবেশই প্রথম ভাগের বিশেষত্ব। আর স্তবাদির অনুবাদ ও অন্বয় ইহার দ্বিতীয়ভাগকে বিশেষ উপযোগী করিয়াছে। যদিও ইহাতে খুব অধিক সংখ্যক স্তব নাই তথাপি ইহাতে সকল দেবদেবীরই প্রধান প্রধান স্তব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচলিত অন্যান্য স্তবগুলিও যদি এই প্রকার অন্বয় ও অনুবাদসহ আর একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার হয়।

গ্রন্থখানির ছাপাই ও বাঁধা সুন্দর। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

তত্ত্বসন্দর্ভঃ—শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামী বেদান্ততীর্থ প্রণীত টীকা "স্বর্ণলতা" সমন্বিতঃ। মূল্য ২৲ টাকা।

বৈষ্ণবাচার্যচূড়ামণি শ্রীজীবগোস্বামীপাদ "ষট্সন্দর্ভঃ" বা "ভাগবত সন্দর্ভঃ" নামক যে বিশ্ববিশ্রুত বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম সন্দর্ভই "তত্ত্বসন্দর্ভঃ"। ইহার "বিষয়" সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তির সহিত তাঁহার ভজনই "প্রয়োজন"। প্রমাণস্বরূপ শ্রুতির, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদির অভ্রান্ত মত মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (শ্রীগৌরাঙ্গদেব) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। গোস্বামীপাদের স্মরণীয় শ্লোক তত্ত্বসন্দর্ভে যথা :—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্॥
কলৌসঙ্কীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥ ২॥

আলোচ্য গ্রন্থে আছে—(১) মূল গ্রন্থ, (২) স্বর্ণলতা নাম্নী টীকা, (৩) পণ্ডিত অশোক নাথ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ-লিখিত ইংরেজী ভাষায় একটী দীর্ঘ ভূমিকা, (৪) টীকাকার-লিখিত ইংরেজী ভাষায় শ্রীজীবগোস্বামী পাদের জীবনকথা ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয়।

"স্বর্ণলতা" টীকাটী মূল গ্রন্থের মর্ম বুঝিবার বেশ সহায়ক হইয়াছে, এজন্য টীকাকার গৌরকিশোর গোস্বামী মহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ। টীকাটী তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। ভূমিকা ও জীবন কথা বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ

পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর অষ্টাশীতিতম গ্রন্থ। পৃষ্ঠা সংখ্যা –২+২০২ ক্রোড়পত্র —৩৪+১১, মূল্য আট আনা।

ব্রজেন্দ্রবাবুর নাম পূর্ব হইতেই সাধারণের নিকট সুপরিচিত। তিনি "সংবাদপত্রের সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড," "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস," "বাংলা সাময়িক পত্রের তালিকা" ও "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" এই সমস্ত প্রাচীন তথ্যপূর্ণ পুস্তক সংকলন করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু বর্তমান পুস্তকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করিয়া তাঁহার পাঠকদিগকে উপহার দিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বাঙ্গালার প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বাঙ্গালার একটী গৌরবের বিষয়। ইহার প্রতিষ্ঠার ও ইহার কার্যাবলীর আনুপূর্বিক ইতিহাস জানিবার কৌতূহল বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই থাকা অসম্ভব নহে। ব্রজেন্দ্র বাবু আলোচ্য পুস্তকখানি সংকলন করিয়া আমাদের সেই কৌতূহলের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু তথ্যদর্শী ঐতিহাসিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও কার্যাবলীর প্রাচীন যে সমস্ত নথি ও দলিল পত্রাদি আছে তাহা হইতে তিনি এই গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পূর্বনাম ছিল "বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার"। ১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে, কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ২।২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। পরে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম. এ. সি-এস্, মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব্ লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নাম পরিগৃহীত হয়। বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের স্থাপয়িতা ছিলেন মিষ্টার এল, লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্তী। সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে ইংরেজী সাহিত্যের এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন। বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের কার্যকলাপে ইংরাজীবহুলতা দেখিয়া অনেক সদস্য তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করায় ইহার সভ্যগণ পূর্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে পূর্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার বর্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নামে অভিহিত করেন। ফলতঃ ঐ ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে।

আলোচ্য পুস্তক খানিতে সাহিত্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগণের আদ্যন্ত তালিকা, পরিষদ্

মন্দির প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক শাখাসভাপ্রতিষ্ঠা, পরিষদ গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী ইত্যাদি পরিষদ্ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন পরিষদের একটি মহৎ অনুষ্ঠান। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও এই পুস্তকমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরিষদের পুঁথিশালায় কি কি পুঁথি আছে এবং পরিষদ গ্রন্থাগারে কি কি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে তাদের বিষয় আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অবগত হইতে পারি। "দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার" পত্রে ও 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' যে সমস্ত প্রবন্ধ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের একটী তালিকা সংকলনকর্তা আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের গবেষকমণ্ডলীর বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

এই পুস্তকে প্রথমতঃ সাহিত্য পরিষদের ১৩৪২ সন পর্যন্ত ইতিহাস সংকলিত হইয়াছিল। পরে আবার একটী ক্রোড় পত্র সংলগ্ন করিয়া পুস্তকখানিতে ১৩৪৬ সনের আশ্বিন মাস পর্যন্ত পরিষদের ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুস্তকখানি বাঙ্গালার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বিশেষ ভাবে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

বেদ

১। Rgveda Saṃhitā—ed. for the first time with Venkata Mādhava's Comm. by Dr. L. Sarup. Vol. I, Lahore.

দর্শন ও ধর্ম

২। ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যম্—ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল টীকা সমেত
—পণ্ডিত ভার্গব শাস্ত্রী, বোম্বাই।

৩। ন্যায়সূত্রপাঠঃ—বাচস্পতি মিশ্র, পুণা।

৪। প্রমাণ মীমাংসা—সুখলাল সঙ্ঘভি, আমেদাবাদ।

প্রত্নতত্ত্ব

৫। Inscriptions on the Northern Karnātaka and Kolhapur State—
Prof. K. G. Kundanagar, Kolhapur.

৬। Monograph on Sānchi—3 Vols.
—Sir John Marshall,—Govt. of India Publication.

সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব

৭। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—উপক্রমণিকা, মূলসংস্কৃত ও "কুমার-তোষিণী" টীকা, ইংরেজী অনুবাদ, ইত্যাদি সমন্বিত।

—অধ্যাপক আর. এম্. বোস কর্তৃক সম্পাদিত।

৮। Grammaire Sanskrite (in French) – Dr. L. Renou, Paris.

৯। ভোজদেবের সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্—নারায়ণ দণ্ডনাথের টীকা সমেত – তৃতীয় ভাগ K. Sāmbaśiva Sāstri কর্তৃক সম্পাদিত। – Trivandrum.

ইতিহাস

১০। Pre-Musalman India – V. Rangacharya. Vol. II. Pt. I— Vedic India – Aryan expansion in India, Madras.

আয়ুর্বেদ

১১। ভগবতাচার্যের রসরত্নসমুচ্চয়: – ইহাতে হিন্দী টীকা ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা আছে।

---অম্বিকা দত্ত শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, বেনারস।

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কর্তৃক সংকলিত

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)

১৩শ বর্ষ, ১৩২০ সাল

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ } বৈদিক সাধনার আভাস---শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার। লেখক প্রবন্ধগুলিতে কতকগুলি বৈদিক মন্ত্রের আলোচনা করিয়া প্রাচীন আর্যগণের জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে কিরূপ ধারণা ছিল তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনাগুলি অতি সুন্দর। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পরবর্তী দর্শন সমূহের বীজসকল কোথায় কিভাবে বেদে পাওয়া যায় তাহারও দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র } শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব---শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। লেখক কয়েকটী প্রবন্ধের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের তুলনা করিয়া ব্রাহ্মগণ ও বৈষ্ণবগণ যে মূলতঃ একইভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের আধ্যাত্মিক মাধুর্যের বিষয় বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রমাণাদি তত্ত্বেরও বিশেষ আলোচনা আছে।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন---রসের রূপ---শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। তিনটী প্রবন্ধে লেখক মাধুর্যরসের

অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বে ১৩১৯ সালে বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৩২০ অগ্রহায়ণে 'পূর্বরাগ' প্রকাশিত হইয়াছে। ফাল্গুন ও চৈত্রে ইহার অনুবৃত্তি আছে।

পৌষ—ধর্মমঙ্গল – শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বসু। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের অতি সুন্দর সমালোচনা।

বৈশাখ—চণ্ডীদাস---শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু। সমজাতীয় পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক সমালোচনা। লেখকের মতে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস আরও মধুর।

The Indian Antiquary, Vol 111, 1874.

Allusions to Krishna in Patanjali's Mahabhashya—Professor R. G. Bhandarkar, Bombay.

বর্তমান প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক ভাণ্ডারকর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিষয়ে যে উল্লেখ আছে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

An investigation into the Origin of the Festival of Krishnajanmastami—Translated from the German Prof. A. Weber.

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে Berlin Akademie der Wissenschaften-এ Prof. Weber কৃষ্ণজন্মাষ্টমী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্তমান প্রবন্ধ সেই মূল প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ। Prof Weberএর প্রবন্ধে জন্মাষ্টমী উৎসবের মূলকারণ, উৎসবে করণীয় বিষয়গুলির বিবরণ এবং এই উৎসব সংক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

The Ajanta Frescoes—Mr. Griffiths অজন্তাগুহায় যে সমস্ত চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাদের নকল করিবার জন্য কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং অনেক টাকা ব্যয় করেন। তিনি যে সমস্ত চিত্রের নকল করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে একটী বিবরণী প্রকাশ করেন। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার উক্ত বিবরণী ও অজন্তার চিত্রসকলের বিষয় আলোচনা আছে। তিনি তাঁহার এই বিবরণীতে বলিয়াছেন—"ভারতীয় চিত্রাঙ্কনাদি ললিত-কলা বিষয়ের উদাহরণস্থল একমাত্র অজন্তায় অঙ্কিত চিত্রাবলী।" তিনি আরও বলিয়াছেন "অজন্তা ছাড়া ভারতের আর কোথাও স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্যবিদ্যা ও চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার এরূপ সমাবেশ দৃষ্ট হয় না।"

সাময়িক সাহিত্য, অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

সাহিত্য

ভারতবর্ষ—শিশু-চৈতন্য ও ফ্রয়েড—শ্রীজনরঞ্জন রায়।

„ সঙ্গীতবিকাশ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, বি এস্-সি (গ্লাসগো)।

„ বাংলা পুঁথিতে বানান ও লিপিকৌশল—শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ।

বঙ্গশ্রী—শিবসঙ্কীর্তন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

„ বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ কালীপূজা—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

পরিচয়—মনস্তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব---শ্রীসরসী লাল সরকার।

উদ্বোধন--জাতি-বিদ্বেষের যৌক্তিকতা---শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় এম-এ, বি-টি।

ব্রহ্মবিদ্যা---উপনিষদের আখ্যায়িকা---শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস।

„ অভিব্যক্তিবাদ—শ্রীতুলসীদাস কর।

বিশ্ববাণী—সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রথার নিদর্শন—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এ, এম্ (ব্রাউন), পি-এইচ-ডি (হাম্বার্গ)।

ধর্ম ও দর্শন—

ভারতবর্ষ—ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পরিচয়—জীবের সাংপরায়—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

„ ক্ষণিকবাদ—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ।

উদ্বোধন—গীতার অদ্বৈত—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীচণ্ডী ও বেদান্ত—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী।

„ সাংখ্য-পরিচয়—শ্রীবিজয়বসন্ত ভট্টাচার্য।

„ দর্শন প্রসঙ্গ—শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী।

প্রবর্তক—বেদান্তে ভক্তিবাদ—শ্রী ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী।

„ ভারতে আধ্যাত্মবিজ্ঞান ও শিবশক্তিতত্ত্ব—বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

বিশ্ববাণী—অদ্বৈতবাদ—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন—অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি এইচ্-ডি।

„ তুরস্কের নবজন্ম—শ্রীশুধাংশুকুমার বসু।

বঙ্গশ্রী—যশোহর-পরিচিতি—শ্রীসুশীলকুমার বসু।

প্রবর্তক—দিল্লীর পুরাতন পাতা—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

বিবিধ

ভারতবর্ষ—জাপান—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ—সামাজিক ও দাম্পত্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—ডাঃ সুবোধচন্দ্র মিত্র, এম-বি (কলি.) এম-ডি (বার্লিন)

" সেরাইকেলা ভ্রমণ—শ্রীকাননগোপাল বাগচী।

" জগন্নাথদেবের অদ্ভুত দারুমূর্তির পরিচয়—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়।

উদ্বোধন—চীন-শিল্পে ভারতের প্রভাব—রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল।

প্রবর্তক—বহির্বিবাহের উৎপত্তি ও প্রসার—শ্রীসন্তোষকুমার দে এম-এ।

বিশ্ববাণী—আচার্য শ্রীশঙ্কর—স্বামী বেদানন্দ।

সাময়িক সংবাদ

হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন—গত ১২ই পৌষ অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন কলিকাতায় সংঘটিত হয়। বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল. কেটি মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জি, এন. সি. চ্যাটার্জি ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার হিন্দু জননেতৃগণের সবিশেষ চেষ্টায় এবার এই অধিবেশন বিশেষভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশন—ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিল কমিসনের বর্তমান বৎসরের অধিবেশনে স্যর যদুনাথ সরকার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে অনেক লেখক কর্তৃক গবেষণাপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ পঠিত হয়। কমিশনের অধিবেশনের পর ঐতিহাসিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষ্যে সিনেট হলে একটী বহু শিক্ষাপ্রদ ঐতিহাসিক প্রদর্শনী হইয়াছিল।

বাঙালীর সাময়িক শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতসভা—ভারতসভা বঙ্গের নূতন গবর্ণরকে অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষ্যে বাঙালীদিগকে সামরিক শিক্ষাদান ও স্থায়ী রেজিমেণ্ট গঠনের অনুরোধ জানান। গবর্ণর বলেন, বিষয়টী ভারত সরকারের এলাকাভুক্ত; তিনি ইহা ভারত সরকারকে জানাইবেন।

বাঙলায় প্রায় আড়াই হাজার পুস্তক নিষিদ্ধ—বাংলার আইন পরিষদে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী স্যর খাজা নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন যে ১৯২০ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বাংলা গবর্ণমেণ্ট ২৩১৯ খানি পুস্তক এবং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত ২১২ খানি পুস্তক, মোট ২৫৩১ খানি পুস্তক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।
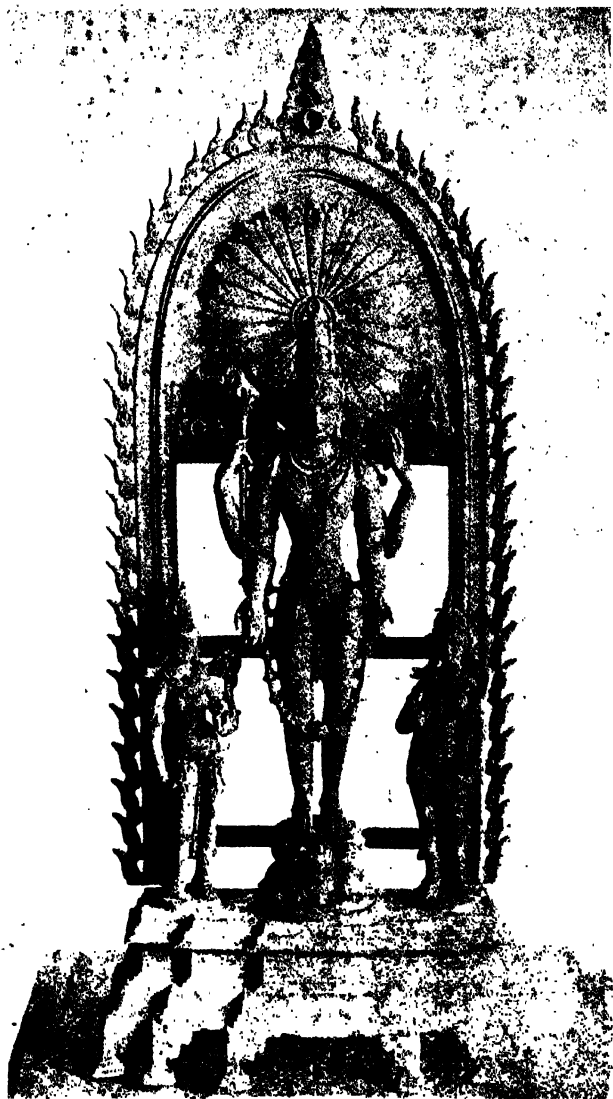
পদ্মহস্তে সরস্বতী

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বাংলার প্রাচীন ভূ-বিভাগ

অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদলাল পাল এম্. এ.

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ অথবা তাহার বিভিন্ন অংশসমূহ বিবিধনামে অভিহিত হইত, যথা—গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ। ইহাদের ভৌগলিক সীমা-নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সীমা ত দূরের কথা, এমন কি কোন কোন স্থানের অবস্থিতি-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। বর্তমান সময়ের মত প্রাচীনকালেও এদেশের নদী-গুলি দ্বারাই সীমা নির্ণয় করা হইত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার নদীর গতি দিনদিনই পরিবর্তিত হইতেছে। আজকাল যে ভূভাগের উপর দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত, গুপ্তরাজত্বকালে যে সেরূপ হইত তাহার নিশ্চয়তা নাই। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের নদীগুলির পরিবর্তনশীলতা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতার ন্যায় সর্বজনবিদিত। উপরোক্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল আবার বৃহৎ বিভাগগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কতকগুলি নামান্তর মাত্র। আবার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের সীমাও পরিবর্তিত হইয়াছে। পৌনবনা নামক জৈন উপাঙ্গে আছে যে তাম্রলিপ্তি বঙ্গের অন্তর্গত ছিল ও বর্তমান দিনাজপুর জেলাস্থিত কেডিবর্ষকে রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত একটি নগর বলা হইয়াছে। বঙ্গ ও রাঢ়ের রাজনৈতিক অবস্থা যখন উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই ইহা সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রাচীন বাংলার বৃহত্তর ও অধিকতর সুপরিচিত ভূভাগ ছিল গৌড় ও বঙ্গ।

গৌড় বলিতে আমরা সাধারণতঃ উত্তর বঙ্গ বুঝি। কিন্তু মনে হয় রাঢ় দেশও গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। মৌখরী বংশীয় রাজা ঈশানবর্মার শিলালিপিতে (৫৫৪ খৃঃ অঃ) গৌড়গণকে "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ষষ্ঠশতাব্দীতে গৌড়গণ সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে বাস করিত। কৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে (১০ম খৃঃ শঃ) রাঢ়াপুরীকে

গৌড় দেশস্থিত একটি নগরী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একখানি মাদ্রাজের শিলালিপিতে দক্ষিণ রাঢ় গৌড় দেশের অন্তর্ভুক্ত দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে রাঢ় গৌড়দেশের মধ্যেই ছিল। বর্তমান বর্ধমান বিভাগ রাঢ়দেশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। মানভূম ও হাজারীবাগ জেলার কতকাংশও প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত থাকিতে পারে। আতায় নদীই ছিল উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমা এবং মনে হয় ইহাদের অন্য নাম ছিল ব্রহ্ম ও সুহ্ম। রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয়ে এবং কম্বোজ বংশীয় নয় পালদেবের ইর্ডা তাম্রশাসন হইতে মনে হয় যে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপশ্চিম ও বালেশ্বর জেলার কতকাংশ নিয়াই দণ্ডভুক্তি দেশ ছিল। ইহা সুস্পষ্ট যে দণ্ডভুক্তি রাঢ়দেশ হইতে বিভিন্ন ছিল। তাম্রলিপ্তগণকে মহাভারতে একটি জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইওয়াং চোয়াংএর সময়ে তাম্রলিপ্তে একটি রাজ্য ছিল।

উত্তর বঙ্গের প্রাচীন নাম ছিল পৌণ্ড্রদেশ। বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানই যে ভারত-প্রসিদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন নগরী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি প্রায় উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। আবার পাল ও সেনদের সময়ে প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা বিভাগের অধিকাংশই এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্র নামে অভিহিত হইত। শিলিমপুর শিলালিপি হইতে মনে হয় যে বরেন্দ্র পৌণ্ড্র দেশের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল। ৯৬৭ খৃষ্টাব্দের এক দক্ষিণ ভারতীয় তাম্রলিপিতে বরেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং উক্ত লিপিতে "গৌড়চূড়ামনি" ও "বারেন্দ্রদ্যুতিকণা" বিশেষণে বিশেষিত এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। সুতরাং দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিল। বর্তমান রাজসাহী বিভাগের (জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং ব্যতীত) ভূ-ভাগ নিয়াই বরেন্দ্র দেশ গঠিত। মনে হয় পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল।

বঙ্গের সীমার বিষয় কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। অনুমান করা যাইতে পারে পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও উত্তরে বরেন্দ্র, বঙ্গের সীমা ছিল। হরিকেল ও সমতট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল কিনা তাহা বলা যায় না। "আসুর" ভাষা প্রবর্তন প্রসঙ্গে মঞ্জুশ্রীমূলতন্ত্র নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গ, হরিকেল ও সমতটের পাশাপাশি উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে এই তিনটি স্বতন্ত্র ভূভাগ ছিল। কিন্তু গুজরাট দেশীয় ১২শ শতাব্দীর আভিধানিক হেমচন্দ্রের মতে বঙ্গ ও হরিকেল এক দেশের নামান্তর মাত্র। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত দুইখানা পুঁথিতে হরিকোল (=হরিকেল ?) ও শ্রীহট্ট দেশকে একই দেশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইৎসিং ও তাপ কাং নামক চীন পরিব্রাজকদের মতে হরিকেল পূর্বভারতের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত এবং অপর একজন পরিব্রাজক ইউহে বলিয়াছেন যে সিংহল হইতে হরিকেলে পৌঁছিতে ৩০দিন লাগে এবং নালন্দা হইতে ইহার দূরত্ব ছিল ১০০ যোজন। শ্রীচন্দ্র দেবের রামপাল তাম্রশাসন হইতে মনে হয় যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পাশাপাশি ছিল, এবং বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালির কিয়দংশ

ইহার অন্তর্গত ছিল। পূর্বোক্ত প্রমাণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে হরিকেল সমুদ্র তীরবর্তী এবং সিংহল হইতে সমুদ্র পথে হরিকেলে যাতায়াত করা যাইত।

সমতট নাম হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইহা সমুদ্রতীরবর্তী দেশ। পণ্ডিতবর কানিং-হামের মতে হুরাণঘাটা নদী ও বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যস্থিত গঙ্গার বদ্বীপই ছিল সমতট দেশ। বিজয় সেনের ব্যারাকপুর শাসন হইতে জানা যায় যে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী খাড়িবিষয়ে সমতটীয় নল দ্বারা ভূমি মাপের প্রচলন ছিল। খাড়ি পরগণা ডায়মণ্ডহারবার সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত। সুতরাং চব্বিশ পরগণার এই অংশ সমতটের মধ্যেই স্থিত ছিল, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। মহীপাল দেবের রাজত্বকালের ৩য় বর্ষের বাঘৌরায় প্রাপ্ত মূর্তির নিম্নস্থিত লিপি হইতে জানা যায় যে বর্তমান ত্রিপুরা জেলা পর্যন্ত প্রায় সমতটের সীমা ছিল। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ত্রিপুরা জেলার কামতা গ্রামই সমতটের রাজধানী ছিল।

চন্দ্রদ্বীপ এখনও বাখরগঞ্জ জেলার একটি পরগণা। খুলনা ও নোয়াখালী জেলার কিয়দংশ প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বঙ্গ এবং বঙ্গাল নাম শুনিয়া মনে হয় ইহা একই দেশের নামান্তর মাত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে চার পাঁচখানা লিপিতে ও ন্যায়চন্দ্র সূরির হাসির মহাকাব্যে বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশ একস্থানেই পাশাপাশি উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গাল নামটি আমরা দশম শতাব্দীর পূর্বে কুত্রাপিও পাই না। বঙ্গাল দেশ যদি বঙ্গ হইতে পৃথক হয়, তবে তাহার স্থিতি নির্ণয় করা সোজা নয়। মার্কোপোলের ব্রহ্ম দেশীয় নরপতিগণকে বঙ্গালাধিপতি বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বঙ্গাল দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রকার সম্বন্ধ ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত অনোরথ (১০৪৪-৯৭খৃঃ অঃ) বঙ্গাল দেশ পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পরবর্তী রাজা অলৌ ঈস্যু ও পট্টিকের রাজাদুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। রণ বঙ্কমল্লদেবের ময়নামতী শাসনে ঐ অঞ্চলে ব্রহ্মদেশীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মপুত্রের পূর্ববর্তী বর্তমান চট্টগ্রাম বিভাগই যে বঙ্গাল দেশ কথিত হইত তাহা অনুমান করা যায়।

শ্রব্যকাব্যে কালিদাস

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র এম্. এ.

(পূর্বানুবৃত্তি)

মেঘদূতের মেঘ কালিদাসের কল্পনাশক্তির বহিরঙ্গরূপ। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর অর্চনা-ভবনের আলিম্পন মেঘের গতিরেখা। স্বাধিকার-প্রমত্ত অভিশপ্ত যক্ষের নিকট রামগিরির আশ্রম একটী নিঃসঙ্গ দ্বীপ। নিরবধি বিরহ সাগরজলের মত ইহাকে চারিদিক হইতে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। 'আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে'—যেদিন প্রকৃতির নয়নে বেদনার ঢল নামিয়াছে, কালিদাসের পিপাসী মন যেদিন বহিঃপ্রকৃতির করুণ ক্রন্দনে একান্ত ব্যথিত, মথিত,—সেইদিন যক্ষের কাতরতার অভিব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যের কবি তাহার বেদনার বার্তা অমৃতলোকে পাঠাইবার জন্য আকুল। আপনার বীণার ঝঙ্কারে কবি আপনি মুগ্ধ; তাই আষাঢ়-মেঘের অপরূপ লীলায় বিমোহিত হইয়া স্বচ্ছন্দবনজাত কুটজকুসুমে আপনার কাব্যভারতীর অর্চনা করিলেন,—প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার স্তুতিগান রচিলেন। "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা,"—নির্গুণের নিকট প্রার্থনার সাফল্য অপেক্ষা গুণবানের নিকট প্রার্থনার ব্যর্থতাও আকাঙ্ক্ষণীয়। অতি উদার মেঘের নিকটে তাই কালিদাসের এই আকুতি।

আজীবণ প্রেমের সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া যক্ষপতির প্রচণ্ড রোষ দুইটী হৃদয়ের মাঝখানে যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার এপারে রামগিরি, ওপারে অলকা—অনিত্য ও সৌন্দর্যের নিত্যকার লীলাবিলাস। রামগিরি আকাঙ্ক্ষার ও অলকা আকাঙ্খানিবৃত্তির প্রতীক। একটীতে প্রকৃতির বিচিত্রতায় বহির্মুখ মনের অসীম উন্মাদনা অপরটীর মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি শুনিয়া নিথর হইয়া গিয়াছে। যক্ষরাজ এমন এক স্থানে অপরাধীকে নির্বাসিত করিয়াছেন, যেখানে প্রেমিক প্রেমিকায় বিহ্বল আনন্দ একদিন পূত মহিমায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, যেখানে প্রতিটী মুহূর্ত্ত হইবে নির্বাসিতের জীবনে কণ্টকময়।

হৃদয়ে হৃদয়ে কাণাকাণি, জানাজানি সূক্ষ্ম রূপের মধ্যেই মূর্ত হইয়া উঠে। রামগিরি ও অলকার আত্মায় আত্মায় মিলনের পথে দিঙ্‌নাগের 'স্থূলহস্তাবলেপ' গগনস্পর্দ্ধী বিন্ধ্যকূটের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মেঘরূপী অতি সাবধানী কবি তাহা এড়াইয়া চলিবেন—বলাকার মালায় আপনার শুভ্র সৌন্দর্যে আকাশতল উদ্ভাসিত করিয়া। পৃথিবীর বহু উর্দ্ধ স্তরে মেঘের যাত্রাপথ। নীচে নয়ন মন ভুলানো পৃথিবীর রূপসজ্জা। অন্তহীন আকাশে কল্পনার ভেলা ভাসাইয়া কবি অলকায় পাড়ি দিয়াছেন। এখানে ধরণীর স্থূল রূপের বিকিকিনির অবকাশ নাই। বহু দূরের কোন এক গৃহতলে স্থির দুইটী আঁখিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এই পৃথিবীরই সঞ্জীবন-রস নহিলে তাহার পুষ্টি হইতে

পারে না, স্বর্গের অভিসারে উদ্যত ধরণী বাঞ্ছিত মিলনের পূর্বে নিজ সত্তাকে ভুলিতে পারে না। তাই কবির মেঘ উড়িতে উড়িতে মাঝে মাঝে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীতে বিশ্রাম করিবে। পথে কালজয়ী মহাকাল-মন্দির। দেবদাসীরা আরতির অপূর্ব নৃত্য বিলাসে বিহ্বল। রূপতিয়াসী মেঘ এই দৃশ্য না দেখিয়া যাইবে না। উজ্জয়িনীর পথে পথে অভিসারিকারা চলিয়াছে প্রিয়সন্ধানে,—মেঘ বজ্রনির্ঘোষে তাহাদিগকে ভীত, চকিত করিয়া তুলিবে না। দ্বিতীয় অমরাবতী উজ্জয়িনীর মেখলা শিপ্রা,—তারপর আসিবে নির্বিন্ধ্যা। বাতাসে নীল চেলাঞ্চলের মত নীল জলরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছুটিবে। অবনত বেতসের শাখায় শাখায় বাতাসজল মাতামাতি করিবে। রাশি রাশি কদম্বপুষ্পে পর্বতে পর্বতে জাগিবে রোমাঞ্চ। পৃথিবীর এক লহরী মুক্তামালার মত চর্মণ্বতী কৃশ ধারায় বাহিয়া যাইবে। কৃতজ্ঞ আম্রকূট পাতিয়া দিবে তাহার আনত শিখর, বন্ধুর বিন্ধ্যতলে প্রবাহিতা শীর্ণা রেবা সেবার-ডালি লইয়া করিবে মেঘের প্রতীক্ষা। পুষ্পিত বনভূমির গন্ধের অর্ঘ্য, মানিনী বেত্রবতীর ক্ষণিক স্পর্শ, গম্ভীরার মনোরম চঞ্চলতা,—তারপর কুরুক্ষেত্রের করাল বিস্তার, পবিত্র সরস্বতীর অনন্ত জল-ধারা, মুমুক্ষুর বড় আদরের গঙ্গা,—মেঘের এসকল নহিলে চলিবেনা। আরও উত্তরে দেবগিরির ধূসর সানুরেখা দিক্‌চক্রবালে দেখা দিবে। সিদ্ধদম্পতীগণ তথায় স্বচ্ছন্দবিহারে আনন্দিত। বৃষ্টিকণায় বীণা ভিজিয়া যাইবার ভয়ে তাহারা মেঘের পথ ছাড়িয়া দিবে।

"আপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্"—বিপন্নের ব্যথাহরণই লোকোত্তরদিগের সম্পদের ফল। কবির উদার অন্তরের রূপক মেঘ তাই হিমালয়ে দেবতরুশ্রেণীর দাবদাহ নিভাইয়া মহত্বের পরিচয় দিবে। মহান্ হিমালয়ের সংস্পর্শ যখন তাহাকে বিপুল স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখন তাহার জীবনের পরমতম মুহূর্ত, মাহেন্দ্রক্ষণ। মহাপুরুষ হিমাচল স্নেহাতুর হৃদয়ে তাহাকে জনকল্যাণ বাণী শুনাইবে। মহাবেদের চরণপাতে পবিত্র কৈলাস "রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ,"—যে কৈলাস কুমুদশুভ্র-শিখর লইয়া প্রত্যহ ত্র্যম্বকের পুঞ্জীভূত অট্টহাসির মত দাঁড়াইয়া, তাহারই পাদমূলে শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে মেঘ আপনাকে ভুলিয়া যাইবে। আরও উর্ধে যেখানে বিরহী কালিদাসের শাশ্বত নিলয় শাশ্বত সৌন্দর্যে বিলসিত, সেইখানে মেঘ পরিপূর্ণ হৃদয়ে অবতরণ করিবে।

পৃথিবীর দৃশ্য কমনীয়, কিন্তু কবি তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহেন না। নিজের প্রয়োজনে তাঁহাকে অলকায় আসিতে হইয়াছে। পথের অপরূপ বিত্তরাশি তাঁহাকে পিছন পানে কতই ডাকিয়াছে, পৃথিবীর খেলাঘরে স্বর্গ ও নিসর্গের মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহাকে টলাইতে বৃথাই চেষ্টা করিয়াছে। প্রেমের অঞ্জন কবি চোখে পরিবেন সত্য, কিন্তু যে অঞ্জন একদিন পরেই ম্লান হইয়া যাইবে, তাহাতে তিনি বীতরাগ। তাই মেঘকে বারবার বলিতেছেন,—

তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে, ঘর্ম্মলব্ধস্য ন স্যাৎ।
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈ র্গর্জিতৈ র্ভায়য়েস্তাঃ ॥

—হে সখে, নিদাঘে হৃদয় তাহাদের শুষ্ক। তুমি তাহাদের নয়নমণি। তোমাকে

পাইয়া তাহারা অধীর হইয়া উঠিবে। তাহাদের হস্ত হইতে যদি মুক্তি না পাও, তবে শ্রবণপরুষ গর্জনে তাহাদিগকে ত্রস্ত করিয়া তুলিবে। সেই অবসরে তোমার গমনপথের পথিক হইবে। ওরে সাবধানী পথিক, মুহূর্তের অধিক পৃথিবীর রূপে আসক্ত হইও না। সে যে কুহকী! অর্ফিয়ুসের বাঁশরীতে তোমার উদ্ধারের জন্য কবে তান উঠিবে জানিনা। তাই বলি, পিঞ্জর-পীড়িত হইও না, সাবধান!

মর্ত্যের অশ্রান্ত অশান্ত রূপহিল্লোল প্রতিহত হইয়া পরাজয় মানিয়াছে। আলুলায়িত-কেশা মন্দাকিনী অলকার পবিত্রতার রূপক। এখন শরতের উন্মেষ। মেঘ এখানে আসিয়া দেখিল,—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসব রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমান্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

কালিদাস মনের মত করিয়া নিজ হস্তে অলকার বধূদের সাজাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের হাতে লীলাকমল তুলিয়া দিয়াছেন, অলকে শুভ্র কুন্দফুল গুঁজিয়াছেন, লোধ্রকুসুমের পরাগে মুখশ্রীকে করিয়াছেন পাণ্ডুর। কেশপাশে নূতন কুরুবক পুষ্প, কর্ণে শিরীষ কুসুম এবং সীমান্তে সুরভি নীপ পরাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছেন।

এখানকার সৌন্দর্যকে 'নিত্য' শব্দে বিশেষিত করিতেছিলেন। যক্ষপুরে 'পাদপা নিত্য-পুষ্পাঃ,' পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমর মধুর মদির গুঞ্জনে আত্মহারা। আবার, "হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মানলিন্যঃ"—সরোবরে সর্বদাই পঙ্কজরাশি বিকশিত, আর তাহাদের প্রিয় হংসশ্রেণী মেখলার আকারে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখানে গৃহ-ময়ূরেরা 'নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ।' রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে অলকা সর্বকালে উল্লসিত। মনে পড়ে, কবি অশ্বঘোষ সৌন্দরনন্দে বলিয়াছিলেন---

তাং সুন্দরীং চেন্ন লভেত নন্দঃ
সা বা নিষেবেত ন তং নতভ্রূঃ।
দ্বন্দ্বং ধ্রুবং তদ্ বিকলং ন শোভে—
তান্যোন্যহীনাবিব রাত্রিচন্দ্রৌ॥

—নিশা ও নিশানাথ পরস্পর বিরহিত হইলে যেমন হইত, ঠিক তেমনই হইত, যদি না নন্দের সহিত সুন্দরীর যোগ হইত। কালিদাস তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, তবে নিশা ও নিশানাথের বিরহ-চিন্তা মন হইতে নিঃশেষে দূর করিয়া দিয়া অলকার রাত্রির সহিত চন্দ্রের 'নিত্য'মিলন ঘটাইয়াছেন। এখানে অশ্রুপাত কেবলমাত্র 'আনন্দোত্থ,' এখানকার যক্ষেরা নিত্য যৌবনের অধিকারী,—"বিত্তেশানাং নচ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।" চিরযুবক যক্ষগণ অল-

কার অপার্থিব রূপমদিরাপানে বিহ্বল। মণি-কনক যক্ষকন্যাগণের ক্রীড়ণক; মন্দাকিনীর কণবাহী স্নিগ্ধ সমীরে আনন্দিত হইয়া ঘন-পল্লব মন্দার-ছায়ায় তাহারা ক্রীড়া করে।

বিরহের দুঃখ শুধু মানুষেরই ললাটে অভিশাপের চিহ্ন আঁকিয়া যায়, রূপ-রস-গন্ধে পাগল করা মানুষেরই জীবন ফুটিতে গিয়া অনন্ত ব্যর্থতায় ঝরিয়া পড়ে। আর অলকার মিলন নিত্যকালের, চির আনন্দের,—এ মিলন মৃত্যুঞ্জয়ী। রবীন্দ্রনাথ মিলনের আনন্দকে ফুটাইয়াছেন—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ-পূর্ণিমা।

অলকার নিত্যমিলনের রূপ এইরূপই নহে কি?

তারপর যক্ষ-কবির প্রেম-নিকেতন। সেখানে তাহার প্রিয় তাহার "দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি"—তাহার সুদীর্ঘ বিরহের ব্রত পালন করিতেছে। মথিত সাগরে লক্ষ্মীর ন্যায় কল্যাণী যক্ষ-প্রিয়া সৌন্দর্যের পরিবেশে উপবিষ্টা। রক্তাশোক এবং বকুলবৃক্ষে তাহাদের ক্রীড়াপর্বত সাজানো। তাহাদের অবিচ্ছেদ মিলন অশোকের রূপ এবং বকুলের গন্ধে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তর বেদনায় অবিরল অশ্রুপাতে মলিনবদনা যক্ষিণী বিরহ-সন্তাপে দগ্ধ, প্রসাধনবিহীনা, নিরাভরণা। ক্ষীণ-কলা চন্দ্রের ন্যায় যক্ষপ্রণয়িণী ভূশয্যায় নিদ্রিতা,—হয়ত প্রিয়তমের স্বপ্নে দর্শন প্রিয়ার নিদ্রাকে মিলনোৎসবেসার্থক করিয়া রাখিয়াছে। যক্ষদূত নিঃশব্দে তাহার চরণোপান্তে নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট। ক্ষণিক সুখ জাগরণে যখন যাইবে মিলাইয়া, তখন মেঘের অবকাশ। কলিদাসের মেঘের পরিচয় অতি মধুর। একবার তাহাকে চিনিতে পারিলে বিরহী কখনও তাহাকে ছাড়িয়া দিবেনা জানিয়াই কবি তাহাতে লঘুগতি হইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং যোষিতানাং,
মন্দ্রস্নিগ্ধৈ ধ্বর্নিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি॥

—যে স্তিমিত স্নিগ্ধ ধ্বনিতে প্রবাসী প্রিয়জনকে তাহার বিরহাকুল প্রিয়ার বেণী মোচন করিতে ক্ষিপ্রগতি করিয়া থাকে,—এ সেই মেঘ। মানুষের হৃদয়ের সহিত ইহার অচ্ছেদ্য যোগ। তাই প্রেমের ব্যথা নিবেদন করিতে অলকায় তাহার আগমন। কবি যে সুদূরাভিসারী আকাশের গায়ে কল্পনার দাগ কাটিয়া দিয়াছেন, সেই চিহ্নিত পথে মেঘ আসিয়াছে এই বার্তা বহিয়া—যক্ষ-রমণীর প্রেম এখনও মরে নাই, যক্ষের প্রেম এখনও পূর্ণ গৌরবে ভাস্বর। বিরহ সাধনার কষ্টি-পাথরে তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র। আর চারি মাস পরেই সেই পরীক্ষায় জয়যুক্ত হইয়া যক্ষ আবার অলকায় আসিবে। কর্ত্তব্যের অবহেলায় সঞ্চিত পাতকে যক্ষপুরী অপবিত্র হইয়া গিয়াছিল। আবার তাহা চরিত্র গৌরবে দীপ্ত হইয়া উঠিবে। আজ রামগিরি ও অলকা উভয়েই উভয়ের উষ্ণ নিশ্বাসে জীর্ণ, তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সুদিন

আসিবে,—মেঘদূতের সম্নেহ বারিনিষেকে চির কিশোর প্রণয়ি-যুগল তাহাদের হারানিধি আবার খুঁজিয়া পাইবে।

কর্ত্তব্যের ক্রটীকে কালিদাস কখনও ক্ষমা করেন নাই। অবশ্য এই বিচ্যুতি কবির সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কবি নিজেই রুদ্রহস্তে অপরাধীকে তাহার আসন হইতে ধূলায় নামাইয়া দিয়াছেন, আবার তপস্যার পবিত্র সলিলে তাহার সকল গ্লানি নিজহস্তে ধুইয়া মুছিয়া তাহাকে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান প্রেমের অপমান নহে, মদনভস্ম প্রেমের পরাজয় নহে, বরং সপ্ততীর্থের পূত সলিলে প্রেমের অভিষেক, সত্যকার প্রেমের উদ্বোধন।

দেশে দেশে, কালে কালে এই মেঘদূত কতবার রামগিরি ও অলকায় আনাগোনা করিয়াছে; কত ছন্দে প্রেমবার্ত্তা গাঁথিয়া, কত নূতন সুরে গাহিয়া বিরহী প্রেমিকের চিত্তে নব আশার বাণী শুনাইয়াছে। বিযুক্ত হৃদয়ের প্রেম-সাধনার উপায়ন হইয়াছে আবার প্রিয়মিলন,--
-তপস্যার সার্থকতা হইয়াছে এমনই পরিপূত মহিমায়। কত বহিরঙ্গ রূপ মিশিয়া গিয়াছে আন্তর রূপের ফল্গুধারায়। উপনিষদের সেই যুগপ্লাবী অমৃতময় ঝঙ্কার—"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"---পৃথিবীর সর্বত্র মহৎ চিত্তে দোলা দিয়াছে। ভারতের কবি কালিদাস উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে পাইতে হইলে আগে আপনাকে হারাইতে হইবে; নিজের খণ্ড সত্তাকে ব্যাপ্ত করিয়া অখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবেই আকাঙ্খিত বস্তু আপনি আসিয়া কল্যাণী মূর্তিতে পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ঈশ্বরসত্তাবিষয়ক প্রমাণত্রয়

অধ্যাপক **শ্রীগিরিন্দ্রনারায়ণ মল্লিক** এম্. এ.

(পূর্বানুবৃত্তি)

[২]

দ্বিতীয় অর্থাৎ জগদ্রচনা শিল্পাশ্রয়ী প্রমাণ :—

আমরা দেখিলাম, জগদ্‌বিকারাশ্রয়ী প্রমাণ পদার্থ তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রমাণরূপে ঈশ্বরসত্তা প্রতিপাদনে অসমর্থ। তথাপি ইহার সারবত্তা ও দ্যোতকতা আছে, এবং তাহা হইতেছে এই— ধর্মের নিগূঢ় যুক্তি অনুসারে চিন্তা উন্নততর ও সমৃদ্ধতর ধারণার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, এবং এই ক্রমোর্ধ্বগতির প্রথম ক্রম হইতেছে উক্ত প্রমাণ। ঐ অগ্রগতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হয় যে কেবল সসীম বস্তু সমূহের প্রতিবোধের দ্বারা আমরা যে ভূমাতত্ত্বে উপনীত হই তাহা যথার্থ ভূমা নয়, কারণ যথার্থ ভূমা তাহাকেই বলে যাহা সসীম বস্তুর প্রতিষেধ না করিয়া তাহাকে স্বাভ্যন্তরে স্থান দেয় ও তাহার স্বরূপ নির্বচন করে। অবশ্য প্রথমে আমরা নিরুপাধিক-তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু হইয়া অস্থায়ী অসৎ বস্তুর প্রতিষেধেই কিছু সন্ধান পাইয়া থাকি, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় বস্তু বিকারশীল, নশ্বর ও মায়িক, ইহার অন্তরালে এক অবিনশ্বর সত্য বিরাজ করে—এই প্রকার সুপ্তচেতনাই আমাদের মনে প্রথম জাগ্রত হয়। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়বেদ্য এমন জগতের মধ্যে যখন আমরা কোনও সারবত্তা দেখিতে পাই না, তখন স্বভাবতঃই ইহার বিরোধী বা বিপরীত কোন কিছুর মধ্যে ইহার অনুসন্ধান করিয়া থাকি। কিন্তু যে ভূমাবস্তু সসীমের প্রতিষেধ মাত্র, যে অপরিহার্য বস্তু সাপেক্ষ বস্তুসমূহের প্রতিষেধ মাত্র, তাহা যথার্থ নিরুপাধিক ভূমাতত্ত্ব নয়; কারণ, এই প্রণালীতে লব্ধ যে ধারণা তাহা আদৌ ভাবপদার্থ নয়। ইহা স্ববিরোধী বস্তু হইতে প্রাপ্ত ও তাহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অপরিহার্যতার সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে যদি সাপেক্ষত্বের ধারণা করা সম্ভবপর না হয়, তবে সাপেক্ষত্বের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অপরিহার্য বস্তুর ধারণা অসম্ভব না হইবে কেন? এই দুইটির প্রত্যেকটি সমানভাবে অপরের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে, যদিও আমরা ব্যবহারিক জগৎকে পরিণামী ও আকস্মিক বস্তুমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছি, তথাপি এই অবরসত্তারও ব্যাখ্যান প্রয়োজনীয় হয়। "জগৎ একটা অন্তঃসার শূন্য প্রদর্শনী মাত্র, বাষ্পের ন্যায় ইহার ক্ষণিক আবির্ভাব ও পরক্ষণেই বিলয়"—এইভাবে জগদ্‌ব্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা হয় করিতে পার, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন উঠিবে "কোথা হইতে জগতের উৎপত্তি হইল, কেনই বা উৎপত্তি হইল? ইহার সত্তার পক্ষে যুক্তিই বা কি? আমরা সকলেই স্বাপ্নিক উপাদানে গঠিত বটে, কিন্তু স্বপ্ন ত স্বতন্ত্র বস্তু নয়, বাস্তব জাগ্রত জীবনের সহিত তাহারও একটা সম্বন্ধ আছে। স্বপ্নে খেয়ালমত কত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, কত অদ্ভুত বস্তুর

দর্শনাদি হয়, এবং সেই সমস্তের মধ্যে কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা থাকে না, মাত্রা থাকে না, স্থায়িত্ব ত দূরের কথা; কিন্তু এইগুলির দ্বারাও অধিকতর স্থায়ী ও সারবান পদার্থ লক্ষিত হয় এবং ইহারা তাহারই ছায়ামাত্র। ব্যবহারিক জগৎ অসার ও পরিণামী হইতে পারে, কিন্তু এই জগতের উর্ধ্বে বিরাজিত যে সদ্‌বস্তুর আমরা সন্ধান করি তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু নিশ্চয় আছে যাহা শুধু জগতের প্রতিষেধ না করিয়া তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যান করে, এবং তাহাকেই বলে যথার্থ ভূমাতত্ত্ব যাহা সসীম বস্তুসমূহের প্রতিষেধ মাত্র না করিয়া তাহাদিগকে স্বক্রোড়ে স্থান দেয় ও তাৎপর্য ব্যাখ্যান করে। অস্থায়ী সাপেক্ষ বস্তুসমূহের কেবল প্রতিষেধের দ্বারা যে অপরিহার্য বস্তুর ধারণা লাভ করা যায় তাহা অপেক্ষা, যাহার মধ্যে নিজের ও যাবতীয় সাপেক্ষ বস্তুর তাৎপর্য নিহিত থাকে সেই অপরিহার্য বস্তু উন্নততর। চিন্তার অপরিহার্য উর্ধ্বগতির দ্বারা এই প্রকার ভূমা বস্তুর জ্ঞানের সন্ধান করা হ'য়।

উপরোক্ত ভূমাতত্ত্বের জ্ঞানলাভের চেষ্টা যে এক প্রকার সমস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই "ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন জগতের স্রষ্টা ও রচনাশিল্পী" এই প্রকার ভাবনার দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের প্রথম সূত্রপাত হয়। উক্ত জ্ঞানলাভের জন্য মনের যে উর্ধ্বগতি হয় তাহার কারণ, একদিকে সাপেক্ষ বস্তু অপরদিকে অপরিহার্য নিরুপাধিক তত্ত্ব এই দ্বন্দ্ব-উল্লঙ্ঘনের প্রয়োজনীয়তা মনের মধ্যে অনুভূত হয়; এবং সেই প্রয়োজনসিদ্ধির প্রথম চেষ্টা বলিতে বুঝায় এমন এক অপরিহার্য বস্তুর ধারণা যাহা সাপেক্ষ বস্তুসমূহের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু স্বয়ং পূর্ণ ও স্বৈরিত। সর্বজ্ঞ স্রষ্টা ও রচনা-শিল্পীর ধারণার মধ্যে আমরা পাই সেই কারণবস্তুর ধারণা যাহা বহির্ভূত কার্যদ্রব্যের কেবল পরিপূরক নয়, কিন্তু স্বানুভবী, এবং অন্যকে নিয়ন্ত্রণের পূর্বেই স্বৈরিত হইয়া থাকে। এইরূপে ঈশ্বরকে মনে করা হয় তিনি স্বানুভবী, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আত্মায়ত্ত ও অন্যনিরপেক্ষ; তিনি অন্য কোনও কিছুর দ্বারা প্রেরিত না হইয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও লীলাচ্ছলে জগৎসৃষ্টি করেন, এবং স্বীয় অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জগতের মধ্যে অসংখ্য পদার্থ রচনা করেন। যেহেতু এই সমস্ত রচনার মধ্যে অপূর্ব কৌশল ও কল্পনাচাতুর্য প্রকাশিত হয়, যেহেতু তিনি পূর্বচিন্তিত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সুনিপুণ উপায় প্রয়োগ করেন, এইজন্য আমরা অনুমান করিয়া থাকি যে তাঁহার মধ্যে অসীম শক্তি, অসীম প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বিদ্যমান আছে।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে উপরোক্ত যুক্তি বিচারের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহার জন্য ইহা অজ্ঞ জনসাধারণের নিকটে গ্রাহ্য ও চিত্তাকর্ষক হইলেও যুক্তিবিচারপটু দার্শনিকের নিকটে হীনবলরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্যবহৃত উপকরণরাজির মধ্যে যে সমস্ত কার্যফল উৎপাদনের স্বাভাবিক শক্তি নাই, আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক সময়ে সেই কার্যফল কেবল স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যাদৃচ্ছিকক্রমে উৎপন্ন করিয়া থাকেন; এই প্রকার স্থলে অজ্ঞ জন সাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিকাশ মনে করিয়া থাকে। যে সমস্ত অসংস্কৃত জড়ীয় উপাদানের নিজস্বভাবে কোনও প্রকার আকারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার লেশমাত্র নাই, মনুষ্যশিল্পী স্বীয় পূর্বকৃত কল্পনা অনুসারে তাহাদিগকে একটা রূপ দিয়া থাকেন, এবং এইখানেই

তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তর, কাষ্ঠ ও বজ্রলেপাদি সরঞ্জাম—এই সমস্তের যদি সৌধাকারে পরিণত হওয়ার স্বাভাবিক শক্তি থাকিত; যদি লৌহ, পিতল, দস্তা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যের ঘটিকাযন্ত্র বাষ্পচালিত বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আকারে পরিণত হইবার স্বাভাবিক প্রেরণা থাকিত, তবে যন্ত্রশিল্পী স্বীয় উদ্ভাবনীশক্তি ও কৌশলের সর্ব কৃতিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া উদ্যানপালের নিকৃষ্ট সম্মানের অধিকারী হইতেন, অথবা যে শিক্ষক স্বাভাবিক বৃত্তি-সমৃদ্ধ বালকের বিনয়াধানে কৃতকার্য হন সেই প্রকার শিক্ষকের অমুল্লেখযোগ্য সম্মানের দাবি করিতে পারিতেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বীজ ও লতার পুষ্পফল উৎপাদনের যে নৈসর্গিক শক্তি তাহার সুযোগ লইয়া উদ্যানপাল যৎকিঞ্চিৎ কার্য করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার লক্ষণীয় কৃতিত্ব কিছুই নাই। পূর্ব ক্ষেত্রে বলা হইয়া থাকে যে উপযোগী বা মনোজ্ঞ উপেয়প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ হইতে পারে এইরূপ আকারে অপ্রাণীন জড় দ্রব্য স্বতঃ পরিণত হইতে পারে না, কেবল এইজন্য বাহিরের কোনও রচনাশিল্পীর শিল্পকৌশল লোকের এত বেশী চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। এইরূপে, যখন আমরা দেখি জগদ্‌রচনার যাবতীয় অসংস্কৃত উপাদানের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রেরণা বা শক্তি না থাকিলেও উহারা গ্রহাদি জগৎ ও প্রাণীন যন্ত্রপদার্থে অহরহঃ পরিণত হইতেছে, এরূপ অসংখ্য ও নানাকারের সাবয়ব পদার্থ উহাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত গঠিত হইতেছে যে তাহাদের প্রত্যেকটি অন্য নিরপেক্ষ-ভাবে আকৃতি ও সংস্থায় (function) অপূর্ব সংযোগ ও নির্মাণ কৌশলের নিদর্শনরূপে লোককে স্তম্ভিত করিয়া দেয় এবং চতুঃপার্শ্বস্থ অন্য পদার্থের সহিত অপূর্ব যোগসম্বন্ধে স্বতঃ প্রেরিত হইয়া থাকে—যখন আমরা পরিদৃশ্যমান জগতে এইরূপ অপূর্ব সমাবেশের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হই, তখন হৃদয়ে স্বতঃই এই ধারণার উদ্রেক হইয়া থাকে যে অসীম শক্তিশালী ও অমেয়-প্রজ্ঞাসম্পন্ন বাহিরের কোনও রচনাশিল্পী নিশ্চয় বিদ্যমান আছেন যাঁহার কর্তৃত্বের প্রভাবেই উপরোক্ত কার্যফলের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, কারণ নৈসর্গিক সম্বন্ধশূন্য কতকগুলি বস্তু সমঞ্জসভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া এমন অপূর্ব পদার্থনিচয় সৃষ্টি করে যে তাহাদের দ্বারা সমভাবে একই পরিস্ফুট উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে।

লোকপ্রিয়তা ও মনোজ্ঞতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় উপরোক্ত মতবাদ হইতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ধর্মের উপকরণ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তিবিচার-রূপে ইহা আদৌ অনবদ্য নহে। তাহার কারণ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে যে যোগসম্বন্ধ এই মতবাদের কেন্দ্রভূত, তাহা প্রথমতঃ একটা বহিরঙ্গ সম্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ ইহা সম্পূর্ণরূপে যাদৃচ্ছিক।

(১) বাহিরের রচনাশিল্পীর ধারণা হইতে বুঝায় তিনি পূর্ণতা ও নিরপবাদ প্রজ্ঞা হইতে বহু দূরে আছেন। ইহার স্বরূপগত এমন কতকগুলি পরিচ্ছিন্নতা আছে যাহা ভূমাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, অথচ উক্ত জগদ্‌রচনাশিল্পী ভূমাবস্তুরূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্য-শিল্পী এমন সমস্ত উপকরণ লইয়া কার্য করেন যেগুলি তাঁহার প্রয়োগের জন্য আহৃত হয়; যে চিন্তা বা ধারণাকে তিনি কার্যে পরিণত করেন তাহা তাঁহার নিজ স্বরূপের মধ্যেই থাকে না।

বলা বাহুল্য, উক্ত উপকরণরাজি প্রয়োগ করিতে গেলে তাহার পরিচ্ছিন্নতা রূপ ধর্মের দ্বারা শিল্পী উপহৃত না হইয়া থাকিতে পারেন না। তবে, উপকরণ সমূহের মধ্যে লক্ষণীয় উপযোগী পদার্থরূপে স্বতঃ পরিণত ও রূপান্তরিত হওয়ার সামর্থ নাই, এবং এই অর্থে তাহাদের অনমনীয়তা (intractableness) স্বীকার করা যায়; রচনা শিল্পী স্বীয় প্রতিভা ও কৌশলের দ্বারা এই অনমনীয়তা দোষকে পরাভূত করিতে পারেন, অথবা উপকরণের নৈসর্গিক ধর্মের সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে এমন একটা কল্পনাবিকৃত রূপ দিয়া থাকেন যাহা তাহাদের মৌলিক প্রকৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ আগন্তুক; এই বিশেষ কৃতিত্বের দরুণ রচনাশিল্পীরপ্রতিভা ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার, মনুষ্যশিল্পী যখন যন্ত্র নির্মান কার্য্য শেষ করেন, তখন হইতে তাঁহার চিন্তা ও শক্তি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে না; কিন্তু, বিশ্বায়তনের যে সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা, শক্তি ও বেগ যন্ত্রনির্মাণকালিক শিল্পী-চিন্তা-শক্তির পক্ষে আগন্তুক ছিল, তাহাদের পরিবেষ্টনীতে ঐ যন্ত্র ন্যস্ত করা হয়। একথা বলা হইতে পারে না যে, যে সমস্ত পরিচ্ছিন্নতার উপরে উল্লেখ করা হইল, সেগুলি কেবল সসীম শক্তিসম্পন্নমনুষ্যশিল্পীর পক্ষেই প্রযোজ্য এবং যে শিল্পী তাঁহার রচনার উপযোগী উপকরণ সমূহের স্বয়ং স্রষ্টা ও সংরক্ষক সেই শিল্পীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে বাহিরের রচনা শিল্পী বলিতে যে ধারণা বুঝায় তাহার সহিত উক্ত পরিচ্ছিন্নতাগুলি সদা সম্পৃক্ত, এবং সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রনের অতিরিক্ত ধারণা ইহার সহিত যোগ করিলেও আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। রচনাশিল্পী যে সমস্ত উপকরণ লইয়া কার্য করেন, তাঁহারা স্বতঃ পরিণত হইয়া কোনও পদার্থ রচনা করে না; সে শক্তি বা প্রেরণা তাহাদের মধ্যে নাই, এই জন্য তাহাদিগকে অনমনীয় বস্তু বলা যায়। এই অনমনীয়তা ধর্মকে পরাভূত করিয়া রচনা-শিল্পী স্বীয় শক্তি ও কৌশল প্রভাবে নানাপ্রকার অপূর্ব বস্তু রচনা করিয়া থাকেন, এবং এই জন্যই আমরা তাঁহার অধিকতর প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু অলৌকিক শিল্পীর পক্ষে কিছু বিশেষত্ব আছে; জগদ্‌রচনার যে সমস্ত উপকরণ লইয়া তিনি কার্য করেন, তাহাদের স্রষ্টা তিনি নিজেই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে গোঁড়ায় যে অনমনীয়তা ধর্ম অর্থাৎ ত্রুটি থাকে এবং যাহাকে পরাভূত করিয়া শিল্পী জগদ্‌রচনায় জৈব-অজৈব অনন্ত প্রকারের অপূর্ব বস্তুসমূহ সৃষ্টি ও গঠন করেন, সেই ত্রুটির জন্য মূলতঃ তিনিই দায়ী। দোষত্রুটি নিরসন পূর্বক কার্যে সাফল্য লাভ করিলে অবশ্য প্রদর্শিত বুদ্ধি, কৌশল ও প্রজ্ঞার জন্য কৃতিত্ব পাওয়ার কথা বটে, কিন্তু দোষত্রুটি নিজকৃত হইলে কৃতিত্ব নিশ্চয় কমিয়া যায়। জগৎ-শিল্পী ঈশ্বরের পক্ষে এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। যেখানে মনে করা হয় শিল্পীকে জড়-উপরকণগত নৈসর্গিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে না, তিনি কেবল উক্ত উপকরণের স্বাভাবিক প্রেরণাসমূহের সুযোগ লইয়া অদ্ভুত সাধনে সমর্থ হইতেছেন, সেখানে বলিতে হইবে যে রচনার সময়ে তাঁহার মধ্যে যে বিশেষ চিন্তা ও বুদ্ধিকৌশল উদয় হইয়াছে তাহা সৃষ্টিকালে ছিল না, আগন্তুকরূপে পরবর্তী কালে আসিয়াছে। এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে যে মৌলিক প্রেরণা বা শক্তির সত্তা অনুমিত হয়, তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকে না যাহার নিমিত্ত উপকরণরাজির পক্ষে, প্রকৃতির মধ্যে সুবিন্যস্ত

অবয়ব সঙ্ঘাতের দ্বারা রচিত যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহাদের আকারে ক্রমবিকাশপূর্বক পরিণত হওয়া অপরিহার্য; যদি তাহাই হইত তবে বর্তমান মতবাদের কোনই শক্তি থাকিত না। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে এই প্রকার শিল্পী বলিতে বুঝায় সেই কর্তৃপুরুষ, যিনি প্রাথমিক সৃষ্টি আলোচনাকালে যাহা তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না সেইরূপ একটী কৌশল পরে উদ্ভাবন করিয়া তাহার দ্বারা রচনা করেন; প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, তিনি তাঁহার প্রাথমিক ধারণার সংশোধন বা প্রকর্ষসাধন করিতে থাকেন। পরিশেষে বক্তব্য— মনুষ্যশিল্পীর পক্ষে যে পরিচ্ছিন্নতার কথা উপরে বলা হইল অর্থাৎ তিনি যন্ত্রনির্মাণকার্য শেষ করার পর তাহা হইতে চিন্তা ব্যাবর্তিত করিয়া বিশ্বায়তনের নিয়মশৃঙ্খলার পরিবেষ্টনীতে ঐ যন্ত্রকে ন্যস্ত করিয়া থাকেন, জগদ্-রচনার অলৌকিক শিল্পীকে তদতিরিক্ত বিধাতৃরূপে কল্পনা করিলে যদিও আমরা সেই পরিচ্ছিন্নতা পরিহার করিতে পারি, তথাপি এই বর্ণনচাতুর্যের দ্বারা তাঁহার প্রাথমিক কৌশল যে সীমাবদ্ধ এই দোষের ক্ষালন হয় না। Providenceএর ধারণা বলিতে বুঝায় অলৌকিক শিল্পী জগদ্‌রচনার কার্য শেষ করার পর বিধাতা ও নিয়ন্তারূপে তাহার সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উক্ত বিধাতা বা নিয়ন্তৃ-পুরুষ জগদ্‌যন্ত্রের বহির্ভূত সুতরাং তিনি উহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। যে শক্তি কোনও কার্যকে সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, তন্নিরপেক্ষভাবে ঐ কার্যের একটা নির্দিষ্ট স্বরূপ আছে একথা বলিতেই হয়। অলৌকিক শিল্পী চিরকাল ধরিয়া একই কার্য পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করেন একথা আমরা ভাবিতেই পারি না; সুতরাং বলিতে হয় উক্ত কার্যের একটা বিশেষরূপ ও স্বভাব আছে যাহার সংরক্ষণ শিল্পী Providence রূপে করিয়া থাকেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কার্যের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা ঐ শিল্পীর পক্ষে বহিরঙ্গ।

রচনাকৌশলাশ্রিত ঈশ্বরসিদ্ধি-প্রমাণ আর প্রকারের আছে যাহাকে অন্তর্নিহিত বা সারবান্ টেলিওলজি (teleology) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। উপরে যে সমস্ত আপত্তির কথা বলা হইল, তাহা এই প্রমাণে প্রযোজ্য নয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এই প্রমাণবস্তুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের জৈব যন্ত্রের মধ্যে। জৈব কাঠামগুলির উৎপত্তি ও প্রকর্ষসাধনে যে চিন্তা বা রচনাকৌশল ক্রিয়াশীল থাকে, তাহাকে আদৌ বাহির হইতে ক্রিয়াশীল যান্ত্রিকশক্তিমাত্র বা কার্যদক্ষতা বলা চলে না; কারণ, এই শেষোক্ত বহিরঙ্গশক্তি যন্ত্রনির্মাতা মনুষ্যশিল্পীর রীতি অনুসারে ব্যবহার্য উপাদান সমূহকে নানাভাবে সংগঠিত, সুবিন্যস্ত ও সমাবেশিত করে, এবং তাহার পর বুদ্ধিপূর্বক কল্পনার সাহায্যে উহাদিগকে নানা পদার্থের আকারে রচনা করে। পক্ষান্তরে, আমরা যে টেলিওলজির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি, তদনুসারে রচনাশক্তি ও রচনাচিন্তা অন্তর্লীন সারবস্তুরূপে জড়দ্রব্যের মধ্যেই নিহিত থাকে। ইহা অনুবর্তী দ্বিতীয় কল্পনারূপে ক্রিয়াশীল হইয়া মৌলিক উপাদান সমূহকে এমনভাবে উপযোগী ও লক্ষ্যোন্মুখ করে না যে উপযোগিতা ও লক্ষ্যোন্মুখতা ঐ উপাদানের স্বভাবনিষ্ঠ ছিলনা। রচনাকালে ব্যাপারবতী যে চিন্তা বা কল্পনা তাহা ঐ উপাদানের মধ্যেই প্রথমাবধি বিদ্যমান থাকে,

এবং যে অখণ্ড পদার্থ পরে রচিত হইবে তাহার সমগ্রশক্তির দ্বারা প্রাথমিক অণু-পরমাণু পর্যন্ত এই যুক্তিবাদ অনুসারে অনুপ্রাণিত থাকে। জৈব পদার্থের রচনাপূর্বকসমগ্রতা সাধনের জন্য কোনও বহিরঙ্গশক্তির মধ্যস্থীকরণের প্রয়োজনীয়তা এই যুক্তিবাদে স্বীকার করা হয় না। জৈব পদার্থ মাত্রেই গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত স্বয়ং রূপায়িত হয় ও বিকাশ লাভ করে। প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত যে প্রাণবত্তা আছে তাহার দ্বারা বাহিরের সর্বপ্রকার মধ্যস্থীকরণ প্রতিসিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং বাহিরের সমস্ত উপাধি (Conditions) অনুগামীরূপে ইহারই প্রকর্ষ সাধন করে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে কোনও পদার্থের তাৎপর্য নির্ণয় বা ব্যাখ্যানের জন্য আমাদিগকে ইহার বাহিরে অনুসন্ধান করিতে হয় না। যৌক্তিকতাই হইতেছে ব্যাখ্যানের মূল অস্ত্র, এবং তাহা ঐ পদার্থের স্বরূপের মধ্যে অনুচ্ছেদনীয়রূপে অবস্থিতি করে, উহা তাহার আত্মস্বরূপ; সুতরাং কোন পদার্থের তত্ত্ব উপলব্ধি করার তাৎপর্য হইতেছে ঐ পদার্থের সত্তানুকুল যৌক্তিকতা বা অধিষ্ঠানের মর্ম উপলব্ধি করা। পরিশেষে বক্তব্য—য়ন্তা ও সংরক্ষণ এই দুই এর ধারণা দুইটিকে, পদার্থের প্রকৃতি ও সংরক্ষণী শক্তি এই দুইটি বস্তুকে পৃথক করা যায় না; যদি তাহাই না যায়, তবে 'একটি অপরটির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন' একথাও বলা চলে না। রূপায়িত হওয়ার কল্পনা নিজের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে বলিয়াই জৈব পদার্থ সমুহ বাঁচিয়া থাকে; ইহার জন্য কোনও আগন্তুক ধারণার প্রয়োজন মাত্র থাকে না। এক অর্থে বলিতে গেলে, জৈব পদার্থ নিজের নিজেই নিয়ন্তা ও পরিচালক। জৈব পদার্থ যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে তাহার একমাত্র কারণ উহার মধ্যে প্রাণবত্তার নীতি প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল। ইহার জন্যই ঐ পদার্থের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিকার্য চলিতে থাকে এবং উপাদান অবয়ব সমুহের মধ্যে পরস্পর বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ আপনাপনি প্রতিনিয়ত হইতে থাকে। এই সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার বিরাম হইলেই পদার্থের সত্তাবিলোপ ঘটিয়া থাকে।

উপরে যে রচনাকৌশলাশ্রিত প্রমাণ বিবৃত হইল, তাহা যদি সমগ্র সসীম জগৎ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়, তবে আমরা দেখিতে পাইব—এখানে এমন একপ্রকার রচনাকল্পনা প্রকটিত যাহার সম্বন্ধে প্রচলিত রচনাকৌশলিক প্রমাণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত হয় সেই সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। তাহার কারণ, সে ক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান জগৎকে মনে করিতে হইবে একটা বিশাল সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মশৃঙ্খলাক্ষেত্র—একটা অখণ্ড জৈব পদার্থ যাহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধারণা স্বতঃ উৎসারিত হইয়া স্বোপলব্ধি করিতেছে; ইহার প্রাণস্বরূপ যৌক্তিকতা নিম্নতম শ্রেণীর পদার্থের মধ্যেও সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ক্রমবিকাশের নীতিতে উর্ধ্বতন শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া যাবতীয় পদার্থ ব্যাপিয়া বিদ্যমান থাকে এবং এই ব্যাপক আত্মপ্রকাশে বিচ্ছেদ ও অবকাশের লেশমাত্র থাকে না। ইহার ফলে নিম্নশ্রেণীর পদার্থ উন্নত শ্রেণীর সম্বন্ধে পারিভাষিক কারণরূপে নির্দিষ্ট না হইলেও উন্নত পদার্থরূপে অভিব্যক্তি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পূর্বকল্পিত ও সুষ্ঠু সুচিত হইয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীক পদার্থের যথার্থ স্বরূপ উন্নতশ্রেণীকের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, এবং চরম বিকাশের অবস্থায় সমগ্র অখণ্ড জগতের তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এইপ্রকার জগদ্‌রচনাশ্রিত মতবাদ অনুসারে অলৌকিক ধীশক্তি একটা যাদৃচ্ছিক শক্তিমাত্র নয় যাহা জগৎ-উপাদান রাশির মধ্যে শূন্যস্থান সকল পূরণ করিবার জন্য অথবা তাহাদের প্রকর্ষ সাধনের জন্য বাহির হইতে আসিয়া থাকে ; অথবা ইহা এমন একটা শক্তি নয় যাহা কখন স্রষ্টা কখন শিল্পী, কখনও বা সংরক্ষকরূপে নানামূর্তিতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে কার্য করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ইহা যাবতীয় পদার্থের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ও যৌক্তিকতা ; ইহার দ্বারা রচনাব্যাপারে প্রারম্ভ হইতেই চরমবিকাশের পূর্বাববোধ ও পূর্বাভাস হইয়া থাকে। এই শক্তি ও যৌক্তিকতা নিরবচ্ছিন্ন ও নিরপেক্ষভাবে রচনাকার্যে ব্যাপৃত থাকে, এবং ক্রমবিকাশের রীতিতে চরম পরিণতির দিকে অহরহঃ ধাবিত হয় এবং এই চরম পরিণতির স্বরূপ ইহা দ্বারাই নির্ণীত হয়।

জগৎ এবং ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে যে সম্বন্ধ, এই দুই এর উক্ত প্রকার ভাবনায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইলেও ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ভূয়োদর্শনরূপ অভিজ্ঞতার দ্বারা, অথবা যে উপপাদন-রীতিকে আশ্রয় করিয়া জগদ্‌রচনাকৌশলাশ্রিত যুক্তি বিচার প্রবর্তিত হয় তাহার দ্বারা উক্ত প্রকার ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। জগতের লক্ষণীয় ব্যবহারিক সৎ পদার্থ সমূহের দ্বারা যে সমস্ত বিশিষ্ট সংযোজনা প্রদর্শিত হয় তাহা হইতে আমরা জগতের অকারণ-কারণ-বস্তুর সত্তা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তাহার কারণ, ঐ চরম বস্তুর ধারণা বাদ দিলে—তাহার অপেক্ষা না রাখিলে—জগতে কোনও প্রকার নির্দোষ যোজনা বা যোগাযোগ থাকিতেই পারে না, এবং যে সমস্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর আদর্শ জগতে বিদ্যমান তাহারা স্বভাবতঃ অসম্পূর্ণরূপে বিবেচিত। সুতরাং ঐ সমস্ত যোগাযোগ ও আদর্শ বস্তুর সাহায্যে ভূমাতত্ত্বের সত্তা প্রতিপাদন করা ত দূরের কথা, বরং বলিতে হয় ইহাদের তাৎপর্যাবধারণ ঐ ভূমাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ভূমাচৈতন্যের ধারণা যে আলোক সম্পাত করে কেবল তাহারই সাহায্যে এবং তাহার অনুযায়ী রূপে আমরা সর্বপ্রথম দেখিতে পাই এই চিৎ-জড়াত্মক জগতের মধ্যে কি অদ্ভুত রচনা কৌশল ও রচনার আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া আছে। এইরূপ হইলে ঐ কৌশল ও লক্ষ্যের জ্ঞানের উপর কি প্রকারে পারমার্থিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ? এই প্রণালীতে এবং তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তি বিচার পদ্ধতিতে যে ঈশ্বরের সত্তা অনুমিত হয় তাহা অপূর্ণ বলিতেই হইবে কারণ ঐ সমস্ত রচনা কৌশল ও তাহার ফলভূত পদার্থরাশি নিজস্বরূপে অপূর্ণ এবং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক অঙ্গমাত্র। জগতে অবয়বযোজনা ও পারস্পরিক যোগাযোগের দৃষ্টান্ত অসংখ্য এবং তাহা হইতে অন্তরালে ক্রিয়াশীল রচনাকৌশল ও রচনাশিল্পীর অনুমান করা হয়—এই যুক্তি বিচার অন্য সকল দিক্ দিয়া নিরবদ্য হইলেও যে ত্রুটীর এখানে উল্লেখ করা হইল তাহার জন্যে আমাদিগকে বলিতেই হয় যে সহস্র রচনাশিল্পী একত্র করিলেও এমন এক ভূমাতত্ত্বের জ্ঞান আমরা পাইতে পারি না যিনি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি স্থিতিলয়ের একমাত্র কারণ।

(ক্রমশঃ)

ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয়

[আলোচনা]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে মহাভারতের মধ্যে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকাল নির্ণয়ের সহায়ক যে সব উক্তি আছে তাহা হইতেও অনুমান ৩১০০ খ্রী° পূ°তে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল কিনা তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। আনন্দের বিষয় প্রবোধবাবু তাঁহার প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন 'এই সব বাক্যাবলীর সমস্তগুলিই জ্যোতিষিক এবং প্রাচীনতম স্তরের বলিয়াই আমাদের প্রতীতি হইতেছে।'

(১) যেদিন শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন সে দিন চন্দ্রমা রেবতীনক্ষত্রে ছিলেন ও সে সময় শরৎকাল।

(২) সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছিল এমন সময় চন্দ্রমা যেদিন পুষ্যানক্ষত্রে গমন করেন সেদিন দুর্যোধন সন্ধির কোনও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া স্বপক্ষীয় রাজগণকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন 'আজ পুষ্যানক্ষত্র, অতএব তোমরা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে অগ্রসর হও।'

(৩) সেই দিনই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে স্বীয় রথে উঠাইয়া অনেক বুঝাইয়াছিলেন। সে চেষ্টায়ও বিফলমনোরথ হইলেন। কর্ণ রথ হইতে অবতরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন "হে কর্ণ এখান হইতে গমন করিয়া দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য প্রভৃতিকে বলিবে 'সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদ্ অমাবস্যা ভবিষ্যতি। সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তাং হ্যাহুঃ শক্রদেবতাম্।"

(৪) শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ সমীপে বিরাট নগরে আগমন করিয়া সন্ধি স্থাপনে অকৃতকার্যতা জানাইয়া বিশ্রামার্থ নিজ আবাসে গমন করিলেন। সন্ধ্যার পর পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ ভবনে আনাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক শ্রবণ ও মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

(৫) পরে বলদেব আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কৌরবপক্ষ অবলম্বনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না।

(৬) তখন বলদেব রুষ্ট হইয়া সমস্ত যাদবগণ সমভিব্যবহারে সরস্বতী তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে চন্দ্রমা যেদিন অনুরাধা নক্ষত্রে গমন করেন সেদিন পাণ্ডবশিবির পরিত্যাগ করিলেন। 'ততো মন্যুপরীতাত্মা জগাম যদুনন্দনঃ। তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাযশাঃ। মৈত্রনক্ষত্রযোগেন সহিতঃ সর্বযাদবৈঃ।' (শল্যপর্ব-৩৫অ-১৩ শ্লোক।)

(৭) বলদেবের প্রস্থানের পর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ সমভিব্যবহারে পুষ্যানক্ষত্রযোগে

কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন। 'রোহিণেয়ে গতে শূরে পুষ্যেণ মধুসূদনঃ। পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যথাবভিমুখঃ কুরূন্॥ (শল্য ৩৫, ১৫)'।

ফলিত জ্যোতিষ মতে এই পুষ্যা ক্ষত্রিয়দিগের নক্ষত্র। সুতরাং কৌরবগণের ন্যায় পাণ্ডবগণও নিজ জয়লাভ আশায় শুভনক্ষত্রের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সুতরাং উপরোক্ত শ্লোকসমূহ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সেই পুষ্যানক্ষত্রদিনে কৌরব-শিবির হইতে ফিরিবার সময় যে বলিয়াছিলেন "সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদ্' জ্যেষ্ঠানক্ষত্র যুক্ত অমাবস্যা হইবে ঐদিন সংগ্রামারম্ভ কর, এই অমাবস্যা পুষ্যানক্ষত্রের পর সপ্তম দিবসের অমাবস্যা নহে। কেন না পুষ্যানক্ষত্রের পর সপ্তমদিবসের নক্ষত্র স্বাতী। জ্যেষ্ঠা কোন মতেই হইতে পারে না। স্বাতী নক্ষত্রের অমাবস্যার পরবর্তী অমাবস্যা জ্যেষ্ঠায় হইবে (৩১০০ খ্রী° পূ°তে স্বাতী তারার ধ্রুবক ১৪৮°.৭ ও জ্যেষ্ঠা তারার ধ্রুবক ১৭৭°.৫। উভয়ের অন্তর ২৮°.৮)। সুতরাং 'সপ্তমাচ্চাপি দিবসাৎ' এর প্রকৃত অর্থ এই হইবে 'অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের অমাবস্যার পর যে অমাবস্যা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে হইবে এই অমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ কর।' মনে করুন পরশ্ব সোমবার হইবে। আমাদের যদি এই সোমবারের পরের সোমবার কাহাকেও কিছু করিতে বা বলিতে ইচ্ছা হয় তখন এরূপ বলিয়া থাকি 'পরশ্বের পরের সোমবার ইহা করিবে।' এখানেও শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যের প্রকৃত অর্থ এইরূপ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উপরোক্ত গোলমাল মিলাইতে না পারিয়া বলিলেন পুষ্যানক্ষত্রের পরদিনের পরদিন হইতে সাতদিন গণনা করিয়া অষ্টমদিনে অমাবস্যা হইবে উহাই চন্দ্রের শীঘ্রগতির ফলে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত অমাবস্যা। 'কার্তিকশুক্ল দ্বাদশ্যাং রেবত্যাং কৃষ্ণ প্রয়াণম্ ততো মার্গশীর্ষ কৃষ্ণপঞ্চম্যাং পুষ্যে সেনয়োর্নিযাণম্ ততঃ পঞ্চম্যা-উপরি ষষ্ঠীমারভ্য সপ্তদিনানি গণয়িত্বা তদুপরি অষ্টমেঽহ্নি অমাবস্যা ভবতি ইতি অনেন ত্রয়োদশ দিনাত্মকোঽয়ং কৃষ্ণপক্ষো মহোৎপাতজনক ইতি সূচিতম্ ক্ষীণয়োশ্চ তিথ্যোঃ...।' কিন্তু এভাবে চেষ্টা করিয়াও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত অমাবস্যা পাওয়া যে কতদূর অসম্ভব ও অসঙ্গত আশা করি সুধীবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। প্রবোধবাবু এই অসুবিধা বুঝিতে পারিয়া ১৯২৯ সালের ২১শে নভেম্বর পুষ্যানক্ষত্রদিনের সদৃশ পাইয়া ইহারও দশদিন পর জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র-যুক্ত অমাবস্যা পাইয়াছেন। এই সব চেষ্টা সে কতদূর অসঙ্গত তাহা বুঝা যাইবে। এই পুষ্যা-নক্ষত্রদিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলদেবের কোন আলাপের সুযোগই হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদির সহিতও কোন আলাপ বা মন্ত্রণা হয় নাই। এমতাবস্থায় এই পুষ্যানক্ষত্র দিনেই বলরামের বিফল মনোরথ হইয়া তীর্থযাত্রা বা পাণ্ডবদের যুদ্ধযাত্রা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইসব ব্যতিক্রমের বিষয় প্রবোধবাবুও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। বস্তুতঃ বলদেব অনুরাধা নক্ষত্রদিনেই বিরক্ত হইয়া পাণ্ডব শিবির পরিত্যাগ করেন ইহা আমরা পাইয়াছি। তারপর প্রশ্ন এই 'জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত অমাবস্যার পরের পূর্ণিমা কৃত্তিকানক্ষত্রে কিরূপে সম্ভবে? জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের পর দ্বাদশনক্ষত্র কৃত্তিকা। সুতরাং তিথি দ্বাদশী বা ত্রয়োদশী হইতে পারে; কার্তিকী পূর্ণিমা হওয়া একেবারেই অসম্ভব, মার্গশীর্ষী হইবে। এই অমিল প্রবোধ

বাবুও স্বীকার করিয়া এই পৌর্ণমাসী দিনের সদৃশ দিন ১৯২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর শুক্লাত্রয়োদশী প্রাপ্ত হন। এই শুক্লাত্রয়োদশীর অপর নাম যে 'অনুমতি' প্রবোধবাবুর নিকট ইহা নূতন শুনিলাম। আমরা জানি চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমার নাম 'অনুমতি।' কেননা তখনও চন্দ্রের পূর্ণ হইতে এককলা বাকী থাকে। 'কলাহীনে চানুমতিঃ পূর্ণোরাকা নিশাকরে।' ত্রয়োদশীর দিন ত দুই কলাহীন চন্দ্র দৃষ্ট হয়। পূর্ণিমান্তের সময় বা কিছু পূর্ব হইতে পূর্ণচন্দ্র বলিয়া অনুমান করা যায় ও এই সময়ই রাকা চন্দ্র। প্রবোধবাবু নিজেই বলিতেছেন পরদিন ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পূর্ণিমা আরম্ভ হয়। সুতরাং সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে এককলা হীন চন্দ্র ও ইহাই অনুমতি চন্দ্রমা।

নীলকণ্ঠ আবার আর এক বিপদে পড়িলেন। যুদ্ধের শেষ দিন ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধকালে বলদেব উপস্থিত ছিলেন। বলদেব বলিতেছেন :—

'চত্বারিংশদ্ অহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ। পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥' নীলকণ্ঠ ইহার অর্থ লইলেন শ্রবণা নক্ষত্রে বলদেব প্রত্যাগত হন ও সে দিন ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধ দিবস। এদিকে ভারতসাবিত্রী-নামক একখানি খণ্ডিত পুঁথিতে লেখা আছে :—'হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্। প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রং যমদৈবতে ॥…………অমাবস্যান্তু মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ। অমাবস্যান্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্যোধনোহতঃ।' অর্থাৎ শুক্লাত্রয়োশীতে ভরণী (যমদৈবত) নক্ষত্রে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধারম্ভ হয়। অমাবস্যা দিবস মধ্যাহ্নে শল্য নিহত হন ও ঐ অমাবস্যার সন্ধ্যায় রাজা দুর্যোধন নিহত হন। তাহা হইলে শ্রবণা নক্ষত্রে বলদেব প্রত্যাগত হন, এই মহাভারত উক্তির সহিত মিল করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে অমাবস্যায় যুদ্ধ শেষ দিন পাওয়া গেল। ইহার অষ্টাদশ দিবস পূর্বে যুদ্ধারম্ভ। ভারত সাবিত্রী মতে সেদিন ভরণী নক্ষত্র যাহা শ্রবণা হইতে একবিংশ নক্ষত্র পূর্বে, ইহা কিরূপে সম্ভবে? অষ্টাদশ দিনে তিন তিথি ক্ষয় অসম্ভব। সুতরাং নীলকণ্ঠ ভারত সাবিত্রীর বচন গ্রাহ্য করিলেন না। 'যমদৈবতে ইতি ভরণী না গ্রাহ্যা কিন্তু যুগ্ম দৈবতং মৃগশীর্ষমেব গ্রাহ্যং……যুদ্ধারম্ভাদ্ অষ্টাদশেঽহনি তীর্থযাত্রাতঃ আগতস্য বলদেবস্য বচনাৎ যুদ্ধ সমাপ্তি দৃশ্যতে ততঃ প্রাচীনে অষ্টাদশঋক্ষে মৃগশার্ষে এব যুদ্ধারম্ভঃ সম্ভবতি নতু একবিংশে ভরণ্যাম্, অষ্টাদশদিনমধ্যে নক্ষত্রত্রয়ক্ষয়স্য অযুক্তত্বাৎ।' কিন্তু ইহাতেও আর এক অসুবিধা রহিয়া গেল। ভারত সাবিত্রীতে আছে 'অর্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘমাসেঽসিতাষ্টমীম্'। মাঘকৃষ্ণা অষ্টমীতে অর্জুন কর্তৃক ভীষ্ম (সাংঘাতিক ভাবে) আহত হন। ইহা কিরূপে সম্ভবে? পূর্ণিমান্ত মার্গশীর্ষ ত্রয়োদশীতে যুদ্ধারম্ভ হইলে ইহার দশম দিনে পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী হইবে। মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী হইতে পারে না। সুতরাং নীলকণ্ঠ বলিলেন : 'অত্র পৌষেঽপি মাঘশব্দো মকরায়ণাভিপ্রায়েণ তদানীং তৎ সম্ভবাৎ' অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের সময় পৌষমাসকেও উত্তরায়ণ সামনে আসিতেছে এজন্য মাঘ মাস বলা হইয়াছে!! শ্রীযুত প্রবোধবাবু তাঁহার 'Some astronomical references in the Mahabharata' প্রবন্ধে (Jour. of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. III.

1937. pp. 106 fn) বলিতেছেন : তিনি কলিকাতা Imperial Library তে রক্ষিত একখানি 'ভারত সাবিত্রী' গ্রন্থে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অষ্টমীতে ভীষ্ম পতিত হন এরূপ পাঠ দেখিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে নীলকণ্ঠ ভুল করিয়াছেন বলিতে হয়। কারণ তাঁহার সমস্ত আলোচনাই পূর্ণিমান্ত চান্দ্রমাস ধরিয়া গণিত। প্রবোধবাবুর এই পাঠ ঠিক হইলে বলিতে হয় ভীষ্মদেবের নিজ উক্তি অনুসারে চান্দ্রমাঘের (আদ্যাষ্টমী অর্থাৎ) শুক্লাষ্টমীতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। আর এই শুক্লাষ্টমীতে তাঁহার দেহত্যাগ ইহা ত সর্বভারতে অবিসংবাদিত প্রবাদ। ভীষ্মদেবের সেই উক্তির টীকায় নীলকণ্ঠ বলিতেছেন 'মাসঃ সৌম্যঃ ইতি অন্যঃ পাঠঃ। সৌম্যশ্চান্দ্রঃ। মাসস্য চতুর্ভাগ করণে সার্দ্ধসপ্ততিথেরেকৈকভাগত্বাৎ অষ্টম্যর্দ্ধস্যামতীতত্বেন প্রথমভাগস্য বিদ্যমানত্বাৎ ত্রিভাগ শেষো ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যর্থং তেন আদ্যাষ্টমীত্যর্থঃ।' অমান্ত চান্দ্রমাসের আদ্যাষ্টমী মধ্যে ভীষ্মদেবের দেহত্যাগ হইলে পক্ষ শুক্লই হয়। সুতরাং ভারত সাবিত্রীমতে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মের পতন হইল ইহার ৫৮ দিবস পর শুক্লপক্ষ পাওয়া যায় না। (এসম্বন্ধে অন্য আলোচনা পরে করা যাইবে)। যুদ্ধের দশম দিবসে কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীষ্মের পতন স্বীকার করিলে অষ্টাদশ বা যুদ্ধ শেষ দিবস অমাবস্যা না হইয়া শুক্লপ্রতিপৎ হয়। সুতরাং নীলকণ্ঠ বলিলেন 'অত্রাপি অমাবস্যা শব্দ ইষ্টদিনে প্রতিপদ্যেব প্রযুক্তো বেদিতব্যঃ!' প্রবোধ বাবু আবার দেখিলেন শ্রবণাযুক্ত অমাবস্যায় যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহার অনুমিত ভারত যুদ্ধকালের (২৪৪৯খ্রীঃ পূঃ) উত্তরায়ণ মাত্র ত্রিশ দিন পর ধরিতে হয়। অথচ ৫০ দিন পর উত্তরায়ণ স্বীকার না করিলে তাঁহার অনুমিত যুদ্ধবর্ষ রক্ষা করা যায় না। কারণ তিনি নিজেই দেখাইতেছেন যে সে সময়ের শ্রবণা (Altair) তারার সায়ন স্ফুট ২৪০° অংশ। সুতরাং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যার মাত্র ৬২ দিন পর উত্তরায়ণ স্বীকার করিতে হয়। এই অন্তর 'ভারতসাবিত্রী' বা মহাভারত কোনও গ্রন্থ হইতেই সমর্থিত হয় না। সুতরাং প্রবোধ বাবু যুদ্ধ শেষ দিন শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি লইলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি শেষ হয়। সূর্যের সায়ন স্ফুট সে দিন ২২০° অংশ অর্থাৎ শ্রবণা-তারা তখনও ২০° অংশ পূর্বে অবস্থিত। সুতরাং ৫০ দিন পর উত্তরায়ণ পাওয়া গেল। ইহাতে তাঁহার অনুমিত যুদ্ধবর্ষ সমর্থিত হইল। কিন্তু এই সব সমর্থন পাইতে গিয়া ভারত সাবিত্রীর স্পষ্ট উক্তি 'অমাবস্যার মধ্যাহ্নে শল্য নিহত হন ও অমাবস্যার সন্ধ্যায় রাজা দুর্যোধন নিহত হন' প্রবোধ বাবু অস্বীকার করিয়াছেন। এভাবে নিজের সুবিধামত কোনও সময় ভারত সাবিত্রী হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া অন্য সমস্ত প্রমাণ অবিশ্বাস করা; আবার অন্য সময় মহাভারত হইতে দুই একটি উক্তি করিয়া তাহারও আবার মহাভারত বিরুদ্ধ অর্থ লইয়া নিজ মতের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ দিন হইতে ৫০ দিন উত্তরায়ণ লইতে গিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা পড়িয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিতেছেন:—'মন্তব্য—আমরা ভারত যুদ্ধের শেষ দিন এবং সেই বর্ষের দক্ষিণায়নান্ত দিনের মধ্যে অন্তর ৪৯ দিন ব্যবহার করিলাম। যে দুইটি বাক্য এই অন্তর সূচনা করিতেছে তাহার একটি শল্যপর্বে এবং অপরটি অনুশাসন পর্বের শেষে; মধ্যে

সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি এবং প্রায় সম্পূর্ণ অনুশাসন পর্ব পড়িয়া আছে। শান্তি এবং অনুশাসন পর্বের মধ্যে যে কত পরবর্তী কালের যোজনা আছে তাহার অনুমান কঠিন। যদি আমরা এই দিনান্তর ৪৯ অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতাম তবে ভারতযুদ্ধ আরও পূর্ববর্তী হইয়া পড়িত। অমান্তকে জ্যেষ্ঠা তারার বেশী পশ্চাতে ফেলিলে অনেক দোষ হইবে এবং জ্যেষ্ঠা অমাবস্যাও পাওয়া যাইবে না। এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা নিরূপিত ভারতযুদ্ধবর্ষকে যে নাড়া চাড়া করা যায় না তাহা নহে, তবে এরূপ করিয়াও নিরূপিত যুদ্ধ বর্ষকে অপর দুইটি কিম্বদন্তীর একটি দ্বারাও সমর্থিত করা যায় না। মহাভারতে অনেক মল সঞ্চয় হইয়াছে—লেখক, কথক পাঠক ইত্যাদির দোষে, সেগুলিকে যথাসাধ্য বর্জন চেষ্টা ভিন্ন সত্যান্বেষণ সম্ভব হইতে পারে না।' প্রথম শলপর্বের শ্লোকটি বলদেব বাক্য। এই শ্লোকটি হইতে প্রবোধ বাবু ধরিলেন পুষ্যানক্ষত্রে বলদেব যাত্রা করেন। ইহার দশ নক্ষত্র পরে জ্যেষ্ঠা অমাবস্যা। ৪২ দিনের বাকী থাকিল (৪২—১০, বা ৩২ নক্ষত্র ; অষ্টাদশ দিনে যুদ্ধ শেষ। সুতরাং যুদ্ধারম্ভ দিন ৩২-১৮, বা ১৪ তিথি (অমাবস্যার পর) অর্থাৎ শুক্লা চতুর্দশী। জ্যেষ্ঠা অমাবস্যার এই ৩২ দিন পর যুদ্ধ শেষ ও যুদ্ধশেষ দিনের ৫০ দিন পর ভীষ্মের বাক্যানুযায়ী দেহত্যাগ ধরিয়া জ্যেষ্ঠা অমাবস্যার ৮২ দিন পর ভীষ্মের দেহ ত্যাগ পাইলেন। শল্যপর্বের বলদেব বাক্যের অর্থ ভুল বুঝিয়া নীলকণ্ঠ প্রভৃতি অনেকেই ভারতযুদ্ধারম্ভ দিন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উক্তি অবিশ্বাস করিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় যুদ্ধ আরম্ভ কর। ঐ দিন যুদ্ধারম্ভ ধরিলে যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে বলদেব কথিত শ্রবণানক্ষত্র হয় না। সুতরাং জ্যেষ্ঠাযুক্ত অমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ হয় নাই। ঐ দিন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে বলিয়াছেন এরূপ নীলকণ্ঠাদি স্থির করিলেন। 'সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তাং হ্যাহুঃ শক্রদেবতাম্'-ইহার অর্থ ধরিলেন 'সংগ্রামঃ সংগ্রামসাধন কলাপঃ যুজ্যতাং একীভূয়াবতিষ্ঠতাম্, সংগ্রামারম্ভস্তু দিনান্তরে এব বক্ষ্যতে।' 'সংগ্রামে যুজ্যতাং' এই স্পষ্ট বাক্যের এরূপ অর্থ করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীবর্গ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। বস্তুতঃ কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ জ্যেষ্ঠাযুক্ত অমাবস্যায়ই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যানুযায়ী আরম্ভ হইয়াছিল। বলদেব বাক্যের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। শল্যপর্বোক্ত বলদেব বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই 'আমি তীর্থযাত্রায় প্রস্থানের পর আজ ৪২ দিন। আমি শ্রবণানক্ষত্রে যাত্রা করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে প্রত্যাগমন করিয়াছি।' এই শ্লোকাংশের (পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ।') প্রকৃত অন্বয় এরূপ হইবে :—'সংপ্রয়াতঃ শ্রবণে, পুষ্যেণ পুনরাগতঃ অস্মি'। যুদ্ধের শেষ দিন পুষ্যানক্ষত্র হইলে অষ্টাদশ দিবস পূর্বে যুদ্ধারম্ভ দিনে শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুযায়ী ঠিক জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রই পাওয়া যায়। এই 'শ্রবণে সংপ্রযাতঃ, পুষ্যেণ পুনরাগতঃ' আমার মনে হয় ঠিক ইংরাজীতে আমরা যেমন বলি 'I started on the 6th and returned by the 20th এই ভাবে এখানে বলা হইয়াছে। আবার, যুদ্ধারম্ভ জ্যেষ্ঠাযুক্ত অমাবস্যায় গ্রহণ করিলে ঠিক পূর্ববর্তী পূর্ণিমা কার্তিকী পূর্ণিমা পাওয়া যায় ও সব বিষয়ে মিল পাওয়া যাইবে। প্রবোধ বাবুর মত জ্যেষ্ঠা অমাবস্যার পরবর্তী পূর্ণিমাকে কার্তিকী পূর্ণিমা করিতে গেলে যে সব অসামঞ্জস্য পাওয়া যায় তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

অপর বাক্যটি হইল ভীষ্মের 'অষ্টপঞ্চাশতম্ রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতঃ।' যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের পতন হয়। যুদ্ধারম্ভ দিনের আবার ১৪ দিন পূর্বে প্রবোধ বাবু জ্যেষ্ঠা যুক্ত অমাবস্যা ধরিয়াছেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠা যুক্ত অমাবস্যার ১৪+৯+৫৮, বা) ৮১ দিন পর ভীষ্মের দেহত্যাগ পান। এ হিসাবে যুদ্ধ শেষ দিবসের ৫০ দিন পর উত্তরায়ণ পাইয়া নিজ অনুমিত ২৪৪৯ খ্রী° পূ° ভারতযুদ্ধ কালের সহায়ক প্রমাণরূপে পাইলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষের ৫০ দিন পর ভীষ্মদেবের দেহত্যাগ ধরিলে 'পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরু প্রবীর, শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য। ততঃ শুভৈঃ কর্মফলোদয়ৈস্ত্বং সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্॥' (শান্তি ৫১-১৪) এই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের সহিত কি ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়? প্রবোধ বাবু বলিতেন 'শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ শেষের পরদিনই এই বাক্য বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং পাণ্ডবকালে দৃষ্ট অয়ন দিবস পরিশুদ্ধ হইত এবং অনুমিত অয়ন দিবস প্রায়ই ভ্রান্ত হইত।' উপরোক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাক্য সম্বন্ধে প্রবোধ বাবু বলিতে চাহেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে ভীষ্মদেবের আর ৫৬ দিন আয়ু আছে বলিয়াছেন তাহা সত্য নহে। বস্তুতঃ ইহা ৫০ দিন হইবে। অনুমান করিয়া উত্তরায়ণের আর কত দিন বাকী আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। এই অনুমানে ৬ দিনের ভুল আছে। প্রবোধ বাবু বলিতে চাহেন সেকালের লোকেরা বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ এতই অজ্ঞ ছিলেন যে কোনও বৎসরে কবে উত্তরায়ণ হইল জানিয়া পর বৎসরে কবে উত্তরায়ণ হইবে বলিতে তাঁহাদের ৬ দিনের ভুল স্বাভাবিক। ঈদৃশ যুক্তি যে কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। তারপর এই উক্তি শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ শেষের পরদিনই বলিয়াছিলেন এই প্রতীতি তাঁহার কিসে হইল? এরূপ অনুমান করিয়া ৫৬কে ৫০ না করিতে পারিলে তাঁহার ২৪৪৯ খ্রীঃ পূঃ ঠিক রাখা যায় না ইহাই কি কারণ? ৫৬ স্বীকার করিলে ত ৬ দিন বাড়িয়া যায়। সুতরাং ২৪৪৯ খ্রী° পূ°-র ৪৩০ বৎসর পূর্ব অর্থাৎ অনুমান ২৯০০ খ্রী° পূ° প্রবোধবাবুর মতে ভারত যুদ্ধের কাল হয়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কবে এই উক্তি করিয়াছিলেন ইহা মহাভারতে স্পষ্ট লিখিত আছে। যুদ্ধান্তে পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি স্ব স্ব সুহৃদ্ ও জ্ঞাতিবর্গের সলিল ক্রিয়া সম্পাদনান্তে নিজেদের বিশুদ্ধি সম্পাদনার্থ মাসপূর্ব হওয়া কাল পর্যন্ত ভাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। পরে হস্তিনাপুরে প্রবেশ ও রাজ্যাভিষেক। অভিষেকের পর যুধিষ্ঠির নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া দেখিলেন তিনি একান্ত মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। ইহাতে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অবিলম্বে ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। রথারোহণে ভীষ্মের নিকট গমনানন্তর অন্যান্য সান্ত্বনার পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আপনার দেহ ত্যাগের আর ৫৬ দিন বাকী আছে।' নীলকণ্ঠ এই বাক্যের অর্থ করিতে গিয়া দেখিলেন ভীষ্ম বলিতেছেন ৫৮ রাত্রির পর তাঁহার দেহত্যাগ হইতেছে। অথচ ঘটনা পরম্পরা ও শ্রীকৃষ্ণ বাক্য একত্রিত হইলে ভীষ্মের শর-শয্যানের প্রায় (৩১+৫৬, বা) ৮৭ দিন পর উত্তরায়ণ ও তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের 'পঞ্চাশতং ষট্ চ' ইহার অর্থ করিলেন (৫×৬, বা) ৩০ দিন। ভীষ্ম বাক্যের

৫৮ দিনের আর বাকী থাকিল ২৮ দিন। সুতরাং ভীষ্মদেবের শরশয়ান দিবস হইতে ২৮ দিনের মধ্যে পুরের বহির্ভাগে অবস্থান, পুর-প্রবেশ, অভিষেক প্রভৃতি সমাধা করিলেন। নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা এই :—'পঞ্চাশতং ষট্ চ ইতি তবজীবিত-সম্বন্ধিনাং দিনানাং শেষং পঞ্চ ষট্ চ পঞ্চবারম্ আবর্তিতাঃ ষট্ ইতি রীত্যা ত্রিংশদ্ ইতি জ্ঞেয়ম তাবদেব আশতং শতাবধি যদ্দিনানাং শতেন কর্তুং শক্যং তৎ ত্রিংশতাপি কর্তুং শক্যম্ (?) ইত্যর্থঃ। অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ ইতি ভীষ্মো বক্ষ্যতি। তত্র ত্রিংশদ্ 'অতঃ পরং শিষ্টা অষ্টাবিংশতিরিতি পূর্বং ব্যতীতাঃ। তথাহি ভীষ্মস্য শরতল্প শয়নানন্তরং অষ্টৌ দিনানি, ততো দুর্যোধনাশৌচং যুযুৎসোঃ ষোড়শ দিনানি তেন সহ পুরং প্রবিশতাং পাণ্ডবানামপি তাবন্তি দিনানি গতানি পঞ্চবিংশে সর্বেষাং শ্রাদ্ধদানং। ষড়্‌বিংশে পুর প্রবেশঃ। সপ্তবিংশে রাজ্যাভিষেকঃ। অষ্টবিংশে প্রকৃতি সান্ত্বনং আভ্যুদয়িকং দানঞ্চ। ঊনত্রিংশে ভীষ্মং প্রতি আগমনং তদ্দিনমারভ্য ত্রিংশদ্ দিনানি শিষ্টানি ইতি জ্ঞেয়ম্।' এই ব্যাখ্যা কত দূর সঙ্গত তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভীষ্মের পতনের দিন হইতে একমাস (২৯ বা ৩০ দিন) গঙ্গাতীরে অবস্থান ও অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদনের পর ৩১ দিনের মধ্যে রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি কার্য সম্পাদনান্তে পরদিন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবের সমীপে গিয়া বলিলেন আপনার জীবিতকালের আর ৫৬ দিন অবশিষ্ট আছে। সুতরাং ভীষ্মদেব শরশয্যায় সর্বসমেত (৩১+৫৬, বা) ৮৭ রাত্রি কাটাইয়া ৮৮তম দিবসে দেহত্যাগ করেন। ভীষ্মদেবের বাক্যের অর্থও ইহাই। 'অষ্টপঞ্চাশতং' শব্দের অর্থ অষ্ট-পঞ্চ (অষ্টাধিক পঞ্চ, ৮+৫=১৩) অশতং শতাদ্ হীনং অর্থাৎ (১০০–১৩, বা) ৮৭ রাত্রি। আমার মনে হয় এই শ্লোকে এটি 'ব্যাসকূট'। নীলকণ্ঠ অন্যত্র ভীষ্মপর্বের ১৭ অধ্যায়ের ১।২ শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন :— অশতং শতহীনং যথাস্যাৎ তয়ো অষ্টপঞ্চ অষ্টপঞ্চাশৎ রাত্রয়ো ব্যতীতাঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। বিলোম শোধনাৎ অষ্টপঞ্চাশদ্ ঊনং শতং রাত্রয়ো দ্বাচত্বারিংশদ্ রাত্রয়ো ব্যতীতাঃ ইত্যর্থঃ। তথা য পৌষ কৃষ্ণাষ্টমীতো মাঘশুক্লপঞ্চম্যাং তাবতী দিনসংখ্যা পূর্যতে…' অর্থাৎ 'অষ্টপঞ্চ' অর্থ ৫৮, অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ' অর্থ (১০০-৫৮, বা) ৪২ রাত্রি। তিনি পৌষ কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীষ্মের পতন স্বীকার করিয়া ইহার ৪২ দিন পর পূর্ণিমান্ত মাঘশুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ভীষ্মদেবের দেহত্যাগ ঈদৃশ এক ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়াছেন। মনে হয় এই ব্যাখ্যা অপর কোনও টীকাকারের। এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য মোটেই রাখা যায় না। তাই তিনি ৫৮ রাত্রি স্বীকার করিয়া পঞ্চাশতং ষট্ চ' এর একটি কষ্ট কল্পিত অর্থ লইয়া কোনও প্রকারে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শরশয্যায় শয়নের ৮৭ দিন পর ভীষ্মের দেহত্যাগ ও এই অর্থ গ্রহণ করিলে মহাভারতস্থ সমস্ত বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে। এ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যানুযায়ী জ্যেষ্ঠা অমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ দিন হইতে (৯+৮৭, বা) ৯৬ দিন পর উত্তরায়ণ ও ভীষ্মের দেহত্যাহ দিবস পাওরা যায়। এই ৯৬ দিন পাইলেই অনুমান ৩১০০ খ্রী° পূ° ভারতযুদ্ধের কাল হইবে তাহা প্রবোধবাবুও স্বীকার করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ন্যায়প্রবেশ

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

প্রথম অধ্যায় (শাস্ত্রারম্ভ)

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় বেদবিদ্যার ন্যায় আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়-বিদ্যা মানব-সমাজের কল্যাণার্থ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন, কোনও মনুষ্যের মনীষা হইতে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয় নাই ১। অতএব ন্যায়-বিদ্যার আদি উৎপত্তি কাল নির্ণয় করা কঠিন। আজ হইতে কতকাল পূর্বে মহর্ষি অক্ষপাদ সূত্ররূপে ন্যায়বিদ্যা প্রচার করেন তাহাও নিঃসন্দেহে স্থির করা যায় না। তথাপি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থসমুদায় মধ্যে প্রচলিত ন্যায়সূত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অন্য ন্যায়গ্রন্থ সকলের উপজীব্য ইহাতে সন্দেহ নাই। ন্যায়-সূত্রের রচনাকাল মহাভারত রচনাকালের পরবর্তী নহে এরূপ স্বীকার করিবার কারণ আছে ২। সুতরাং ন্যায়সূত্র লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ইহা বলিতে পারা যায়।

শাস্ত্রের নাম

আন্বীক্ষিকী, তর্কবিদ্যা, ন্যায়-বিদ্যা, ন্যায়বিস্তর প্রভৃতি শব্দ সাধারণতঃ ন্যায়শাস্ত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। জৈনন্যায়ে "অত্র যৌগাঃ" বলিয়া অনেক স্থলে ৩ যে সকল মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রে তাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ঐরূপ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় প্রাচীনেরা "ন্যায়-শাস্ত্র" অর্থেও "যোগ" বা "যোগশাস্ত্র" শব্দ প্রয়োগ করিতেন, এবং তদনুসারেই ন্যায়মতাবলম্বীদিগকে "যৌগ" বা "যৌগিক" বলা হইত।

মহর্ষি অক্ষপাদ ও মহর্ষি কণাদ উভয়েই যোগী ছিলেন। যোগবলেই মহর্ষি অক্ষপাদ

১। তানুবাচ সুরান্ সর্বান্ স্বয়ম্ভূর্ভগবাংস্ততঃ।
শ্রেয়োঽহং চিন্তয়িষ্যামি ব্যেতু বো ভীঃ সুরর্ষভাঃ ॥ ২৮ ॥
ততোঽধ্যায়সহস্রাণাং শতং চক্রে স্ববুদ্ধিজম্।
যত্র ধর্ম্মস্তথৈবার্থঃ কামশ্চৈবাভিবর্ণিতঃ ॥ ২৯ ॥
ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্ত্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
(শান্তিপর্ব, ৫৯ অধ্যায়)

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" এই শ্লোক হইতে ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের পূর্বে রচিত ইহা পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে ন্যায়মত খণ্ডন করায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি মহর্ষি গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ইহা পরে ব্যক্ত হইবে।

৩। রত্নাকরাবতারিকা।

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের স্বরূপ জানিয়া ন্যায়সূত্র এবং মহর্ষি কণাদ দ্রব্যাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বৈশেষিক সূত্র রচনা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রসিদ্ধির ফলেই ন্যায়মতাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া "যৌগ" শব্দের প্রয়োগ হইত কিনা বলা যায় না।

পক্ষান্তরে "ন্যায় ও বৈশেষিক" উভয় মতেই পরমাণুকারণবাদ স্বীকৃত হওয়ায় পরমাণুদ্বয়ের যোগ অর্থাৎ সংযোগ সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান কারণ বলা হইয়াছে। পূর্বে অন্য কোন আস্তিক দর্শনে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারাই উক্ত মতবাদের প্রথম প্রবর্তক। এজন্য পরমাণু কারণবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত মতাবলম্বীদিগকে "যৌগ" বলা হইত ইহাও বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রকারের নাম

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, বার্তিককার উদ্দ্যোতকর, আচার্য শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীনগণ ন্যায়সূত্রকার মহর্ষিকে অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রকারের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। অক্ষপাদের গৌতম এবং গোতম নামও প্রসিদ্ধ। গোতম ঋষি সূত্রকারের পূর্বপুরুষ ছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্য সূত্রকার গৌতম নামে বিখ্যাত। তিনি নিজের যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধ মত সকল খণ্ডন করিয়া প্রতিবাদিগণের চিত্তে খেদ উৎপন্ন করিতেন এইজন্য তাঁহাকে গোতম বলা হয় [১]। বংশের প্রতিষ্ঠাতা পিতামহ বা আরও ঊর্ধতন পুরুষের নামানুরূপ অধস্তন বংশধরের নাম রাখিবার রীতি বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে। সূত্রকার মহর্ষি গোতমবংশীয় হওয়ায় এইরূপেও তাঁহার গোতম নামে প্রসিদ্ধি থাকা অসম্ভব নহে। স্কন্দপুরাণে মহর্ষি অক্ষপাদকে অহল্যার পতিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ২। মহাভারতে দেখা যায় অহল্যার পতির নাম মেধাতিথি। এই মেধাতিথি[৩] নামই মহর্ষি অক্ষপাদের প্রকৃত নাম বলিয়া মনে হয়। অহল্যাবৃত্তান্ত রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক ইহাতে সন্দেহ নাই। সুপ্রাচীন মহাকবি ভাসের "প্রতিমা" নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় রাক্ষসরাজ রাবণ ন্যায়-শাস্ত্রে মেধাতিথির ছাত্র বলিয়া সীতাদেবীর নিকটে আত্মপরিচয় দিতেছেন।

১। গৌর্বাক্ তয়ৈব তময়ন্ পরান্ গোতম উচ্যতে।
গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ॥
দেবীপুরাণ শুম্ভনিশুম্ভমথন পাদ, ১৩ অধ্যায়।

২। অক্ষপাদো মহাযোগী গৌতমাখ্যোঽভবন্মুনিঃ।
গোদাবরীসমানেতা অহল্যায়াঃ পতিঃ প্রভুঃ॥
মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকা খণ্ড, ৫৫ অধ্যায় ৫ শ্লোক।

৩। মেধাতিথির্মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্তপসি স্থিতঃ।
বিমৃশ্য তেন কালেন পত্ন্যাঃ সংস্থাব্যতিক্রমম্॥
শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্মপর্ব ২৬৫ অধ্যায়।

দিতেছেন।[১] ইহাতে বুঝা যায় মেধাতিথি রাবণের সমকালীন এবং ন্যায়-শাস্ত্রজ্ঞ এইরূপ প্রসিদ্ধি মহাকবি ভাসের সময়েও ছিল। অতএব ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষির প্রকৃত নাম মেধাতিথি, গৌতম ও গোতম এই দুইটী নাম গোত্রানুসারী বলা যায়।

ন্যায়-সূত্রকার মহর্ষির অক্ষপাদ নামসম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ—

মহর্ষি বাদরায়ণ পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি ন্যায়মত খণ্ডন করায় আচার্য গৌতম রুষ্ট হইয়া ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন যে তুমি গুরুদ্রোহী, আমি এই নেত্র দ্বারা আর তোমার মুখ দর্শন করিব না। তখন মহর্ষি ব্যাসদেব গুরু গৌতমকে বুঝাইয়া বলিলেন যে ব্রহ্মসূত্রে শুষ্কমূল তর্কেরই খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ঐরূপ খণ্ডন করিতেও ন্যায়ানুসারী পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি নিজ গ্রন্থে গুরুবাক্যের প্রামাণ্যই স্বীকার করিয়াছেন, গুরুদ্রোহী হন নাই। শিষ্যের এই উত্তরে মহর্ষি মেধাতিথি সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজ বাক্যের সত্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যোগবলে চরণে চক্ষু সৃষ্টি করতঃ তদ্দ্বারা প্রণামকালে মহর্ষি ব্যাসের মুখাবলোকন করিতেন।[২]

শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারের গৌরব

অতি প্রাচীন এবং জগৎপূজ্য মহর্ষি ব্যাসদেব প্রমুখ শিষ্যগণের গুরু কেবলমাত্র ইহাই ন্যায়সূত্রকারের অসাধারণ গৌরবের হেতু নহে, তাঁহার রচিত ন্যায়সূত্রও তাঁহার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। বস্তুতঃ ন্যায়দর্শনে উদ্ভাবিত নিয়ম প্রণালীর এমনই একটি বিশেষত্ব আছে যে বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিলেও আস্তিক, নাস্তিক সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মসমূহ মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ ন্যায়সূত্র প্রদর্শিত নিয়মপ্রণালীর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিশৃঙ্খল বিচারের দ্বারা সন্দিগ্ধ বিষয়ের কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। সুতরাং স্ব-সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিবার জন্য কোন সম্প্রদায়ই ন্যায়শাস্ত্রের বিচারপ্রণালী পরিহার করিতে পারিতেন না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া তৎকালে প্রচলিত অন্য সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তেরই যথোচিত প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্যের উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, অন্য কোনও শাস্ত্রকারের বাক্য দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। ন্যায়সিদ্ধান্তের প্রতিবাদী হইয়াও তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলরূপে ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র উদ্ধার কালে "তথাচ আচার্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্" (বেদান্ত দর্শন ১ অধ্যায় ১ম পাদ ৪র্থসূত্র) এইরূপ উক্তিদ্বারা ন্যায় সূত্রকারের প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

---

১ ভোঃ কাশ্যপগোত্রোঽস্মি। সাঙ্গোপাঙ্গং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্মশাস্ত্রং, মাহেশ্বরং বেদশাস্ত্রং, বার্হস্পত্যম্ অর্থশাস্ত্রং, মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রং, প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ। প্রতিমা ৫ম অঙ্ক।

২ দেবীপুরাণের শুম্ভনিশুম্ভমথনপাদের কয়েকটী শ্লোক উক্ত কিংবদন্তীর মূল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ন্যায়দর্শনের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য

বৈশেষিক শাস্ত্র ন্যায়ের সমানতন্ত্র, অতএব আপাত দৃষ্টিতে ন্যায় শাস্ত্র ও বৈশেষিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিভিন্ন মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই দুই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একই। মহর্ষি গৌতম ন্যায় শাস্ত্রের প্রয়োজন বুঝাইতে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'নিঃশ্রেয়স' শব্দের অর্থ অপবর্গ বা মুক্তি। মুক্তি অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও 'নিঃশ্রেয়স' শব্দে অন্য সকল প্রকার মঙ্গলও বুঝাইয়া থাকে। অতএব ঐহিক সাধারণ শুভ হইতে পরম মুক্তি পর্যন্ত মানবসমাজের সর্ববিধ শ্রেয়োলাভই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। মহর্ষি কেবলমাত্র মুক্তি বুঝাইতে অন্যত্র অপবর্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু শাস্ত্রারম্ভে তাহা না করিয়া 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ ব্যবহার কেন করিয়াছেন, তাহার কারণ চিন্তা করিলে উক্ত উদ্দেশ্যই পরিস্ফুট হয়।

মহর্ষি কণাদ ধর্মনিরূপণের উদ্দেশ্যে বৈশেষিক সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে উক্ত হইয়াছে ধর্মের ফল অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, কিন্তু পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের ফল ব্যক্ত করিতে তিনিও নিঃশ্রেয়স কথাটীই ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য পৃথক্ নহে।

প্রাচীনেরা শব্দের যোগলভ্য অর্থাৎ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগে (derivation) লভ্য অর্থ হইতে রূঢ়িলভ্য বা প্রসিদ্ধ অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন[১], তদনুসারে এই শাস্ত্রে অপবর্গই প্রধানতঃ আলোচনার বিষয়। সূত্রকারের 'নিঃশ্রেয়স' শব্দ ব্যবহারের মূলে এইরূপ অভিপ্রায় থাকাও অসম্ভব নহে।

এই শাস্ত্র হইতে অন্যবিধ শ্রেয়োলাভ কিরূপে হইতে পারে ভাষ্যাদিতে তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে প্রধান বিষয় অপবর্গের লাভে ইহার উপযোগিতা কিরূপ।

শাস্ত্রের উপযোগিতা

মুক্তির স্বরূপ কি এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। তবে মুক্তিবাদীরা সকলেই স্বীকার করেন যে—"কেহ মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় আর তাহাকে সংসার ভোগ করিতে হয় না।" সুতরাং "চিরকালের জন্য সর্বদুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি" এইরূপ বলিলে কাহারও আপত্তি হইবে না। তাই সূত্রকার "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" বলিয়া ঐ সর্বসম্মত অংশটীই গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্তরূপ অপবর্গ বা মুক্তি দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং উহার জন্য দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। দুঃখ প্রাণীরই ধর্ম, প্রাণহীন কাষ্ঠ প্রস্তরাদির দুঃখ হয় না। প্রণিধান করিলে ইহাও স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে সকল দুঃখের পূর্বক্ষণেই প্রাণীদিগের বিষয়বিশেষে কোনরূপ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অসহ্য শীত উষ্ণ

---

১ লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্ যোগাপহারিণী।
কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ॥ কুমারিলভট্ট।

ভোগে সন্তানের পীড়াদি অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে দুঃখ হয় ইহা অনুভবসিদ্ধ। অতএব বিষয়জনিত জ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ ইহা অবাধে বলা যায়। ঐরূপ জ্ঞান জন্ম বা শরীরাদি বস্তুর সহিত আত্মার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। অতএব কোনও দেশে বা কালে এক আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকিলেই উহার সহিত আত্মার সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় জ্ঞান ও তাহার কার্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে [১]। 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" এই উপনিষদ্ বাক্য হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। এই পথে বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু বর্তমান থাকিতে দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি বা মুক্তি হইতেই পারে না। অতএব দুঃখনিবৃত্তির জন্য সমগ্র জগতের বিনাশ একান্ত আবশ্যক। এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যে প্রত্যেক মনুষ্যেরই চেষ্টার ফলে রৌদ্রসন্তপ্ত মৃৎপাত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় নিশ্চিহ্নরূপে নষ্ট হইতে পারে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ অবলম্বনে তাহাই দেখাইয়াছেন।

আচার্য অক্ষপাদের দৃষ্টি অনুরূপ। সমস্ত দুঃখেরই মূল কারণ জ্ঞান, আত্মা জ্ঞানের নিমিত্ত শরীরাদি বস্তুর অপেক্ষা রাখে ইহা তাঁহারও সম্মত। তবে যে কোন বস্তুর সহিত সংযোগ হইলেই যে জ্ঞান এবং তাহার ফল দুঃখ অবশ্যম্ভাবী ইহা তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং এইমতে দ্বিতীয় কোন কোন বস্তু থাকিলেও দুঃখনিবৃত্তি বা অপবর্গ হইতে পারে। দ্বৈতবাদীরা এই দৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়াই মুক্তিসৌধ রচনা ও তাহার সোপান আবিষ্কার করিতে যত্ন করিয়াছেন।

বিষয়-জ্ঞান দুঃখের কারণ ইহা সত্য। কিন্তু সকল জ্ঞানই দুঃখের কারণ নহে। যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা এবং অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম—এই দ্বিবিধ জ্ঞানই দুঃখের কারণ হইতে পারে কিন্তু ঐরূপ সমস্ত জ্ঞানেরই মূলে যে আর একটী জ্ঞান রহিয়াছে তাহা অযথার্থ বা ভ্রম ইহা সর্বসম্মত। উহা শরীরাদি অনাত্ম-বস্তুতে আত্ম-বুদ্ধি। আমরা ঐ বুদ্ধিকে "আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি কর্তা" ইত্যাদি নানা আকারে অনুভব করিয়া থাকি। আত্মা ও অনাত্মা-শরীরাদির এই ভ্রমাত্মক অভেদ-বুদ্ধি হইতে আমার পুত্র, আমার অর্থ, আমার বাড়ী ইত্যাদি নানাবিধ অযথার্থ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভ্রম জ্ঞানকে সাংখ্যে ও বেদান্তে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হয়। আত্মার স্বরূপ যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে আর পূর্বোক্তরূপে ভ্রম হইতে পারে না এবং তখনই দুঃখের মূলোচ্ছেদ হওয়ায় দুঃখ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না বলিয়া অপবর্গ বা মুক্তি লাভ হয়।

মুক্তির চরম কারণ এই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য আত্মার উপাসনা করিতে হয়। এই উপাসনা ত্রিবিধ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

আত্মার স্বরূপ কি তাহা প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্য বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। ইহা শ্রবণ, প্রথম উপাসনা। শ্রুতিলব্ধ আত্মজ্ঞান সুদৃঢ় না হইলে সমাধি লাভ সম্ভব হয় না, এজন্য শ্রুতিবাক্য-

---

১ "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ"। পাতঞ্জল দর্শন ২।১৭ সূত্র।

নুসারে 'আত্মা শরীর প্রভৃতি সকল অনাত্মবস্তু হইতে ভিন্ন' এইরূপ অনুমান করিতে হয়। ইহাই আত্মার মননরূপ উপাসনা। এই দ্বিতীয় উপাসনা সুনিষ্পন্ন হইলেই আত্ম-সাক্ষাৎকারের মুখ্য কারণ নিদিধ্যাসনরূপ তৃতীয় উপাসনা সম্ভব হয়। নিপূর্ব ধ্যৈ ধাতুর অর্থ দর্শন বা সাক্ষাৎকার। স প্রত্যয় যোগে উহার অর্থ হয় সাক্ষাৎকারবিষয়ক ইচ্ছা। এই ইচ্ছা প্রবল হইলে চিত্ত একাগ্র হয়। ফলে সমাধি লাভ ঘটে। ফলতঃ নিদিধ্যাসনের অর্থ সমাধি। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারে মননের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

"আত্মা সকল অনাত্মবস্তু হইতে ভিন্ন" এইরূপ অনুমান কিন্তু আত্মা ও তদিতর সকল বস্তুর জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই হইতে পারে না। সকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানুষকে সর্বজ্ঞতার শক্তি অর্জন করিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব। অতএব আত্মজ্ঞানার্থীকে স্থূলরূপে অর্থাৎ সামান্যাকারেই সকল বস্তুর জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। এই জ্ঞানের জন্য যাবতীয় বস্তুর শ্রেণীবিভাগ বিশেষ আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই সূত্রকার মহর্ষিদ্বয় শাস্ত্রারম্ভেই সকল বস্তুর বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

এইরূপ বিভাগের প্রসঙ্গে পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা যে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন তাহা বর্তমান কালেও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রকারগণ বস্তুসমুদায়ের যে বিভাগ করিয়াছেন তাহার অর্থ—কতকগুলি বস্তুতে একটী অথবা একজাতীয় অনেক বিশেষ ধর্ম দেখিয়া উহার ধর্মী বা আশ্রয় বস্তুগুলির কোনও একটী সাধারণ নাম বা সংজ্ঞা নির্দেশ মাত্র। ইহার দ্বারা কোনও বস্তুর স্বরূপগত হানি বা বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। সুতরাং কোনও বস্তুর নবাবিষ্কৃত কোন গুণের পরিচয় পাইয়া উহার অন্যরূপ বিভাগ বা সংজ্ঞা করিলে তদ্দ্বারা শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিভাগ

পূর্বে পদার্থ-বিভাগের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। এই বিভাগ বস্তুটী কি তাহা এখন বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন বস্তু নিরূপণ করিতে হইলে উহার কারণ, কার্য প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভজ্যমান বস্তু অনেক বা বহু হওয়া আবশ্যক। একটী মাত্র বস্তুর কখনও বিভাগ হইতে পারে না। যে বস্তুসমুদায়ের বিভাগ করিতে হইবে তাহাদের সর্বসাধারণ কোনও ধর্ম থাকা চাই। ঐ ধর্মকে সামান্যধর্ম বলে। ঐ সামান্যধর্মবিশিষ্ট বস্তুর এমন কতকগুলি বিশেষ ধর্ম থাকা চাই যাহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ। বিশেষধর্মগুলির মোট সংখ্যা লইয়াই বিভাগে সংখ্যা নির্দেশ হইয়া থাকে। অতএব বলা যায় যে—

সামান্য ধর্মের দ্বারা অবগত বস্তু সমুদায়কে বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া যে নির্দেশ করা হয়, ঐ নির্দেশই **বিভাগ**।

প্রশ্ন। পদার্থ কয়প্রকার ?

উত্তর। পদার্থ সাত প্রকার[১] —(১) দ্রব্য (২) গুণ (৩) কর্ম (৪) সামান্য (৫) বিশেষ (৬) সমবায় ও (৭) অভাব। (এই নির্দেশই বিভাগ)

পদার্থত্ব বা প্রমেয়ত্ব উল্লিখিত দ্রব্যাদি সাতটী বস্তুতেই বর্তমান রহিয়াছে। অতএব উহা সামান্য ধর্ম। উহার সাহায্যে সমুদায় বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে একটী স্থূল জ্ঞান হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। (১) দ্রব্যত্ব (২) গুণত্ব (৩) কর্মত্ব (৪) সামান্যত্ব (৫) বিশেষত্ব (৬) সমবায়ত্ব (৭) অভাবত্ব এই সাতটী ধর্ম পদার্থত্বের অন্তর্গত বা ব্যাপ্য এবং উহারা পরস্পরবিরুদ্ধও বটে[২]। অতএব পূর্বোক্ত নির্দেশ **'বিভাগ'** হইতে পারিল।

'বঙ্গদেশবাসী মানুষ মুসলমান ও অমুসলমান ভেদে দ্বিবিধ' ইহা অপর একটী বিভাগ। এই উদাহরণে এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা 'বঙ্গবাসিত্ব'রূপ সামান্য ধর্ম দ্বারা পরিচিত হইতেছে। মুসলমানত্ব ও অমুসলমানত্ব এই দুইটী উহার অবান্তর ধর্ম, এবং উহারাও পরস্পর-বিরুদ্ধ।

বিভাগকর্তা ইচ্ছানুসারে অবান্তর ধর্মগুলিকে অল্প বা অধিক বলিয়া গ্রহণ করতঃ বিভাগে সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারেন। এই বিষয়ে তিনি স্বাধীন। যেমন, উক্ত স্থলেই 'বঙ্গদেশীয় মানুষ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ভেদে চতুর্বিধ' এই প্রকারেও বিভাগ করা যাইতে পারে।

প্রবিভাগ

বিভাগে যাহারা বিশেষ ধর্ম উহাদিগের কোনটীকে সাধারণ ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অন্তর্গত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম দ্বারা বস্তুনির্দেশকে **প্রবিভাগ** কহে। কোনও বস্তুর প্রবিভাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ বিভাগ করা আবশ্যক।

যথা, পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব। ভাবপদার্থ ছয় প্রকার—(১) দ্রব্য (২) গুণ (৩) কর্ম (৪) সামান্য (৫) বিশেষ ও (৬) সমবায়। এই শেষোক্ত বিভাগকে প্রবিভাগ বলা হয়।

১ বিষয়ত্ব প্রতিযোগিত্ব তদ্ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি নব্য ন্যায়ে সর্বত্র সুলভ পদার্থগুলিও এই সপ্ত প্রকারের অন্তর্গত। কেহ কেহ মনে করেন ঐগুলি অতিরিক্ত, এই বিভাগের অন্তর্গত নহে। মুক্তিলাভে এই সাতটীই সমধিক উপযোগী হওয়ায় মহর্ষি ইঁহাদেরই বিভাগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এই কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন। (প্রমেয়সূত্রভাষ্য)

২ দ্রব্যত্ব কেবল দ্রব্যেই থাকে, গুণ কর্ম প্রভৃতি আর কোন বস্তুতেই থাকে না; এইরূপে গুণত্ব কেবল গুণেই থাকে দ্রব্য বা কর্ম প্রভৃতি অপর কিছুতেই থাকে না। অতএব দ্রব্যত্ব গুণত্ব প্রভৃতি ধর্মসকল পরস্পর বিরুদ্ধ। একত্র থাকিতে না পারাই বিরোধ। যাহারা একত্র থাকিতে পারে না তাহারাই পরস্পর বিরুদ্ধ. এই লোকব্যবহার শাস্ত্রেও সমানভাবে চলে।

লক্ষণ ও লক্ষ্য

বিভাগ-প্রকরণে বলা হইয়াছে—বিশেষ ধর্মগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ঐ বিরোধের জ্ঞান উহাদিগের আশ্রয় বা ধর্ম্মীর লক্ষণ ব্যতীত হইতে পারে না। এজন্য সাধারণতঃ লক্ষণ ও লক্ষ্য কি তাহা বুঝা আবশ্যক।

লক্ষণ, অসাধারণ ধর্ম, ব্যাবর্তক ধর্ম প্রভৃতি শব্দে একই অর্থ বুঝায়। ব্যাবর্তক ভেদক, অর্থাৎ যে ধর্ম বা গুণের দ্বারা কোন বস্তুকে অন্যান্য সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়, ঐ ধর্ম বা গুণই উক্ত বস্তুর **লক্ষণ**, আর যে বস্তুটীকে পৃথক্ করা হইল উহাই ঐ লক্ষণের **লক্ষ্য**।

ফলতঃ প্রশ্নবাক্যে যে শব্দের অর্থ অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা হয় সেই শব্দের অর্থই লক্ষ্য এবং যে শব্দের দ্বারা ঐ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় সেই শব্দের অর্থই লক্ষণ। যেমন কেহ প্রশ্ন করিল—গরু কাহাকে বলে? উত্তর হইল—যাহার গলকম্বল[১] আছে (গলকম্বলবান্ গৌঃ) তাহাই গোরু।

এখানে 'গরু' শব্দের অর্থ লইয়াই প্রশ্ন হইয়াছে, সুতরাং গো'মাত্রই 'লক্ষ্য'। উক্ত প্রকার উত্তর পাইলে "গো" বিষয়ে আর জিজ্ঞাসা হয় না। অতএব "গলকম্বল" গরু'র লক্ষণ। ফলতঃ যাহা যে বস্তুর অসাধারণ ধর্ম, সেই বস্তুর উহাই লক্ষণ। এই হিসাবে "গোত্ব"-জাতিও "গরু"র লক্ষণ হইতে পারে।

এইরূপে তেজঃ কি? এই প্রশ্নে '**তেজঃ**' বস্তু লক্ষ্য। উত্তর—যাহার স্পর্শ উষ্ণ তাহাই 'তেজঃ' (উষ্ণস্পর্শবৎ তেজঃ)। উষ্ণস্পর্শ কি এবং কাহার স্পর্শ গরম তাহা বালকেরও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত প্রকার উত্তর পাইলে 'তেজঃ কি?' এই প্রশ্ন আর হয় না। অতএব তেজঃপদার্থের লক্ষণ—**উষ্ণস্পর্শ**।

লক্ষণ দ্বিবিধ—ব্যবহার সাধক ও ইতর-ব্যাবর্তক।

ব্যবহার-সাধক—যে লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য বস্তুটির কেবল পরিচয়ই হইয়া থাকে কিন্তু অন্য বস্তুর (অলক্ষ্যের) ভেদ সিদ্ধ করা যায় না, তাহা **ব্যবহার সাধক** লক্ষণ।

যেমন, পদার্থের লক্ষণ—প্রমিতিবিষয়ত্ব বা প্রমেয়ত্ব। এমন কোনও বিষয় নাই বা হইতে পারে না যে বিষয়ে প্রমিতি, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান হয় না। অতএব পদার্থমাত্রই প্রমেয় বা প্রমার বিষয়। সুতরাং প্রমেয়ত্ব সকল পদার্থেই আছে এবং সকল পদার্থই এই লক্ষণের লক্ষ্য, অলক্ষ্য কিছুই নাই। এজন্য "প্রমিতি-বিষয়ত্ব"রূপ লক্ষণ কাহারও ভেদ সিদ্ধ করিতে পারে না। অতএব "প্রমিতি-বিষয়ত্ব" ব্যবহার সাধক লক্ষণ। (ক্রমশঃ)

১ যে অবয়ব-সন্নিবেশ থাকায় গরুকে অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি সজাতীয় চতুষ্পদ এবং মনুষ্য বৃক্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিজাতীয় বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝা যায় ঐ অবয়ব-সন্নিবেশের নাম "গলকম্বল"। গলকম্বল ছোট, বড়, ষাঁড় ও গাভী সকল গরুতেই থাকে এবং গরু ব্যতীত অপর কোন বস্তুতে থাকে না।

দেবী সরস্বতী

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

দেবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে—দেব বা দেবতা শব্দের অর্থ বা নিরুক্তি কি? আমরা দেবতার পূজা, অর্চনা করিয়া থাকি, দেবতা বলিতেও একটা কিছু বুঝি, কিন্তু এখন যাহা বুঝি, বরাবর হয়তো তাহা বুঝিতাম না, আর বুঝিলেও বোঝার মধ্যে অনেক তারতম্য রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ স্বতঃ-প্রমাণ, আর বেদের মন্ত্র হিন্দুর সকল প্রমাণের প্রমাণ। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, যদি বেদের মন্ত্র বুঝিতে চাও, সর্বাগ্রে তোমাকে মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ও ছন্দঃ বুঝিতে হইবে; তাহা না বুঝিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিলে, স্মরণ করিলে, জপ করিলে, হোম যজ্ঞ বা যজন করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। এইজন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেন—

"এতান্যবিদিত্বা যোঽধীতেঽনুব্রূতে জপতি জুহোতী যাজতে যাজতে তস্য ব্রহ্ম নির্বীর্যং যাতযামং ভবতি।"—শুক্ল যজুঃ সর্বানুক্রমসূত্র।

বৃহদ্দেবতাকার ঋষিও বলিয়াছেন, মন্ত্রের দেবতাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে; যিনি দেবতাকে জানেন, তিনিই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া থাকেন। দেবতাকে ঠিক না বুঝিলে কেহ বৈদিক বা লৌকিক কর্মের ফল পায় না।

মহর্ষি কাত্যায়ন ঋক্-সংহিতার অনুক্রমণিকায় এই ঋষি ও দেবতা বলিলে কি বুঝায়, তাহার আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি। তিনি যাহা বলেন, তাহা দেবতা। সেই বাক্যে যে বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, তাহাও দেবতা। "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা। তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্তু সা দেবতা॥"

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নিরুক্তকার যাস্ক নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে [৭ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য় খণ্ড (১৫)] দেবশব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো উবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা..."

বৈদিক ঋষিগণ কোনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া "দেব" শব্দ ঈরিত করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পাণিনির 'দিব্' ধাতুর দশবিধ অর্থসাহায্যে 'মানবতত্ত্ব' গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শশিভূষণ সান্ন্যাল মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, "যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু, পাপনাশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম—নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি দ্যোতন স্বভাব, যাঁহার প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতিভাজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহারই গুণ কীর্তন করে, যাঁহারই বিভূতি ঐশ্বর্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়,—চৈতন্যস্বরূপ, অখিল গতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি দেব—'তিনি দেবতা।'

বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক দেবতা ব্রাহ্মণ্যযুগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম অগ্নি, সবিতা, সোম, বসু, বরুণ, যম ও অশ্বিদ্বয়। বেদের পরবর্তীযুগে কুমার বা গণেশ, কুবের বা বৈশ্রবণ, কাম প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় দেব হইয়াছিলেন। দেবদিগের মধ্যে লক্ষ্মী বা শ্রী, সরস্বতী ও গঙ্গার নাম উল্লেখ্য। ঋগ্বেদে সরস্বতী নামের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহাতে সরস্বতী নদী বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝায়। পরে উপনিষদ্ ব্রাহ্মণসমূহে দেখিতে পাই তিনিই আবার বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদুষী হন। ঋগ্বেদের বাগম্ভৃনী ঋকে "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি" ইত্যাদি সূক্তে ইঁহারই ব্রহ্মদর্শনের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। এই সূক্তটী দেবীসূক্ত নামে কথিত এবং বঙ্গদেশের শক্তিপূজার বৈদিক মূল ইহাতেই নিহিত। "ব্রাহ্মণগ্রন্থের বাগ্‌বৈ সরস্বতী" এবংবিধ উক্তি হইতে উপরোক্ত অম্ভৃণ দুহিতাকেই কেহ কেহ সরস্বতী মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫ম ব্রাহ্মণ) আদিত্য অম্ভৃণীকে শুক্লযজুর্বেদ শিক্ষাদান করেন; আর বাক্ অম্ভৃনীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। "বাগ্‌বৈ সরস্বতী" এই বাক্যে বাক্যমাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে বাক্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, তিনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী। এই দেবীকে যিনি পাইতে চাহেন, তিনি বাক্যকেই সেই সরস্বতীরূপে উপাসনা করিবেন, ইহা বলাই "বাগ্‌বৈ সরস্বতী" এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য।

এখানে আমরা সরস্বতী শব্দের নিরুক্তি বিষয়ে আলোচনা করিব। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (২.২৩.) সরস্বতী শব্দের দুইটী অর্থ করিয়াছেন, "নদীরূপা" ও "দেবতারূপা"—"সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।" ১.৩.১২ ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন :—

"দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।"

ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে সরস্বতীর উভয় অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার (৯. ২৬) 'সরস্বতী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

'সরস্বতী সর ইত্যদক নাম সর্তেস্তদ্বতী।'

প্রাচীন ঋষিগণ সরস্বতীর স্তুতি করিতেন। তাঁহারা সরস্বতী বলিলে কি বুঝিতেন? 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ যে 'জল' ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না তাহা বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্র হইতে বেশ বোঝা যায়। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বলেন, এক্ষণে যে সকল বৈদিক শব্দ অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তন্মধ্যে 'সরস্' একটী। সরস্ শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ; এবং তজ্জন্য সূর্যের একটী বৈদিক নাম 'সরস্বান্। সরস্বতী—অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ী দেবতা। * বটব্যাল মহাশয়ের উক্তির সমর্থন পক্ষে তেমন যুক্তি পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে 'সরস্বৎ' শব্দ তিনবার মাত্র আছে। দশম মণ্ডলে (৬৬. ৫) প্রথমান্ত সরস্বান্ এবং অন্যত্র (১. ১৬৪. ৫২; ৭. ৯৬. ৪) দ্বিতীয়ান্ত 'সরস্বন্তম্'। দশম ও সপ্তম মণ্ডলে 'স্বরস্বৎ' শব্দের অর্থ 'জলাধিপতি'। প্রথম মণ্ডলে ইহার অর্থ 'সূর্য'। এখানে সূর্য জলের গর্ভোৎপাদক; সুতরাং

* সাহিত্য ৫ম বর্ষ (১৩০১) পৃঃ ৭০৬

ইহার সহিতও জলের সম্পর্ক। কাজেই সূর্যের এই নামের সার্থকতা এদিক্ দিয়াও থাকিতে পারে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ যুগে 'সরস্' শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণে (৭. ৫. ১. ৩১ ; ১১. ২. ৪. ৯) আমরা দেখি মনকে সরস্বান্ বলা হইয়াছে—'মনো বৈ সরস্বান্।' এটী সরস্বানের আধ্যাত্মিক অর্থ। তারপর দেখি 'স্বর্গো লোকঃ সরস্বান্' (তাঃ ১৬. ৫. ১৫) 'পৌর্ণমাস' সরস্বান্ (গোঃ উঃ ১. ১২)। স্বর্গলোককে সরস্বান্ বলিলে বুঝাইতে পারে—জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক। কেননা, অথর্ববেদে (১০. ২. ৩১) স্বর্গকে বলা হইয়াছে—'স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ', তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে—'স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাবৃতঃ' (১. ২৭. ৩)। হয়তো এইরূপেই পরযুগে সরস্বতীর একটী পর্যায় হইয়া থাকিবে—'জ্যোতির্ময়ী'। কিন্তু সরসের আদিম অর্থ জ্যোতি নয়।

সপ্তপুণ্যতোয়া নদীর মধ্যে সরস্বতী একটী। এই নদী পুণ্যসলিলা, যে কোন পূজাদি করিতে হইলে অগ্রে এই নদীর আহ্বান করিতে হয়।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

মনুতে লিখিত আছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদী। এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে খ্যাত। এই নদীর পর্যায়—প্লক্ষসমুদ্ভবা, বাক্প্রদা, ব্রহ্মসুতা, ভারতী, বেদাগ্রণী, পয়োষ্ণীজাতা, বাণী, বিশালা, কুটিলা। দেশভেদে এই নদীর ৭টী নাম হইয়াছে—পুষ্করে পিতামহের যজ্ঞে এই নদী আহূতা হইয়া সুপ্রভা নামে, এইরূপ নৈমিষারণ্যে সত্রযাজী ঋষিগণ কর্তৃক আহূতা হইয়া কাঞ্চনাক্ষী, গয়দেশে গয়রাজ-যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিশালা, উত্তরকোশলাতে ঔদ্দালক মুনিযজ্ঞে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজযজ্ঞে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে দক্ষপ্রজাপতি-যজ্ঞে সুরেণু ও হিমালয় পর্বতে ব্রহ্মার যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিমলোদা, উক্ত ৭টী স্থানে সরস্বতী নদী ৭টী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

সরস্বতী একটী মহাপুণ্য তীর্থ। মহাভারতে এই নদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। "সমুদয় সরিতের মধ্যে সরস্বতী অতি পবিত্রা এবং সতত সর্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতী নদীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অত্যন্ত সুদুষ্কৃত বিষয়ের জন্যও শোকপ্রকাশ করে না। এই নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। * * * সরস্বতী নদী পুণ্যনদী সকলের মধ্যে প্রধানা।' (মহাভা' শল্য প' ৫৪ অ')

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এই নদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই নদী অতি পুণ্যতমা। যদি কেহ এই নদীতে স্নান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুলোকে বাস করেন। চাতুর্মাস্য, পূর্ণিমা, অক্ষয়া, অমাবস্যা প্রভৃতি শুভ

তিথ্যাদিতে যিনি সরস্বতীতোয়ে অবগাহন করেন, তাঁহার সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। অগ্নিতে যেমন সকল বস্তু দগ্ধ হয়, তদ্রূপ এই সরস্বতী নদীতে সকল পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। হেলা বা শ্রদ্ধা যে কোনরূপেই হউক এই নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুং প্রকৃং খ. ৬ অ')

সরস্বতী দেবী গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণতা হন। এই নদীর উৎপত্তি-বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (প্রকৃতি খ° ৬ অ°) লিখিত আছে। "লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা—এই তিন জন হরিপ্রিয়া ছিলেন এবং ইঁহারা সর্বদা হরি-সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন। হরিও এই তিনজনকে সর্বদা সমানভাবে দেখিতেন। কাহারও প্রতি কোনরূপ ব্যবহারের তারতম্য করিতেন না। কিন্তু একদা সরস্বতী বিষ্ণুকে গঙ্গার প্রতি অধিক প্রেমযুক্ত দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হন এবং বিষ্ণুর প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, সুভর্তিগণ কামিনীগণের প্রতি সকল স্থানেই সমান ব্যবহার করেন, কিন্তু খলস্বভাব ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, অতএব আপনার গঙ্গার প্রতি অধিক প্রীতি প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত ও ধর্মসঙ্গত নহে। লক্ষ্মী ইহা ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু আমি ক্ষমা করিব না। সরস্বতী বিষ্ণুকে এইরূপে তিরস্কার করিলে গঙ্গা তাঁহাকে বলিলেন, স্বামীর সমীপেই তোমার গর্ব খর্ব কবিব, দেখি তোমার কান্ত কি করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে শাপ প্রদান করেন, যে তুমি অদ্য হইতে ধরাতলে সরিৎরূপে অবতীর্ণ হইবে। গঙ্গা সরস্বতীকে এইরূপে শাপ দিলে সরস্বতীও গঙ্গাকে সরিৎরূপে পরিণতা হইতে শাপ দিলেন। অতঃপর দুইজনে পরস্পরের অভিশাপে সরিৎরূপে পরিণতা হইলেন।

সরস্বতী নদীর এত মাহাত্ম্য কেন, তাহার কারণ আমরা বেদ হইতে পাই। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আর্যগণ যেমন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আর্যবর্তভূমে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঐ সময়ে তাঁহারা প্রধানতঃ এক একটী নির্মল সলিলা খরপ্রবাহা পুণ্যপ্রদা নদীতটে আপনাদের বাসভবন মনোনীত করিয়া লইলেন। ঋক্‌সংহিতা আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে মধ্য এশিয়া হইতে এই নদী প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় আর্য উপনিবেশের মধ্য দিয়া প্রবাহমানা ছিল। এই নদীতটে আর্যগণ স্বভাবজাত প্রভূত শস্য লাভ করিতেন। ঋক্ ২.৪১.১৬-১৮ মন্ত্রে সরস্বতী, অন্নবতী, উদকবতী ও দ্যুতিমতীরূপে বর্ণিতা, অন্ন তাঁহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া থাকে তিনি অসমৃদ্ধকে সমৃদ্ধি দান করেন। এই কারণে প্রাচীন বৈদিক সমাজে সরস্বতী "অম্বিতমে, নদীতমে দেবীতমে' বলিয়া পূজিতা হইয়াছিলেন। সরস্বতী আর্যজাতির জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিলেন বলিয়া আর্য ঋষিগণ হৃদয়ের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিয়তই তাঁহার স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু মন্ত্রে সরস্বতী নদীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় আর্যসমাজ বহুদিন এই নদীতটে বাস করিয়াছিলেন। (বাজসনেয় সংহিতা ১৯.৯৩, অথর্ববেদ ৪.৪.৬ ইত্যাদি তৈত্তিরীয় সংহিতা ১.৮১৩.৩, শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৬.২.৪)। ঋগ্বেদের (৩।২৩।৪) মন্ত্রের "দৃষদ্বত্যাং মানুষ

আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে' উক্তি হইতে মনে হয় আর্য ঋষিগণ এই সকল স্থানকেই আর্যোপনিবেশের উপযুক্ত উত্তমস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। অথর্ব ৬.৩০.১ মন্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্যগণ সরস্বতী তীরে ভূমিকর্ষণ করিয়া যব-উৎপাদন করিতেন।

ভারতবর্ষে তিনটী নদী প্রধানতঃ সরস্বতী নামে প্রবাহিত। তন্মধ্যে বেদোক্ত পুণ্যতোয়া সরস্বতী পঞ্জাবে অক্ষা° ৩০°২৩″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°১৯″ পূর্বে সিরমুর রাজ্যের ক্ষুদ্র শৈলমালা হইতে বাহির হইয়া অম্বালায় অধবদরী নামক প্রান্তর দিয়া থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র ভেদ করিয়া কর্ণাল জেলা ও পাতিয়ালা রাজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে শির্সা জেলায় (অক্ষা ২৯°৫১″ উঃ ও দ্রাঘি ৭৬°৫″ পূ°) কাগার (দৃষদ্বতী") নদীতে আসিয়া বিলীন হইয়াছে। এদিকে প্রয়াগের নিকট গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিত হইরা ত্রিবেণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল স্থান হইতে সরস্বতী তিরোহিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক গ্রন্থে 'বিনসন' নামে খ্যাত। সাধারণের বিশ্বাস, প্রয়াগে সরস্বতী অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

এই সু-প্রাচীন নদী পারসীকদিগের 'জন্দ অবেস্তায়' 'হরকুইতি' ও চীনদিগের নিকট 'চৌকুত' নামে পরিচিত ছিল।

আর একটী সরস্বতী রাজপুতনার আবু পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পালনপুর ও রাধনপুর রাজ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। স্কন্দ-পুরাণে রেবাখণ্ডে এই সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বাঙ্গালার হুগলী জেলায় একটী সরস্বতী নদী প্রবাহিত আছে। পূর্বে ইহাই গঙ্গার মূল স্রোত বলিয়া পরিচিত ছিল। খ্রীস্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত সপ্তগ্রাম অবধি এই নদী দিয়া বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিত। এখন সম্পূর্ণ মজিয়া গিয়া একটী খাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। প্রয়াগের ন্যায় নৈহাটীর নিকটও এক ত্রিবেণী আছে।

উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ-যুগে আমরা সরস্বতীকে বাগ্‌দেবীরূপে প্রকটিতা হইতে দেখিতে পাই, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন আমরা এই বাগ্‌দেবীর পূজার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। সরস্বতী পূজা পঞ্চমী তিথিতে হইয়া থাকে। কতদিন হইতে ঐ তিথিতে বাগ্‌দেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে পুরাণের একটী দোহাই আছে। কৃষ্ণ যোষিতের মুখ হইতে বাগ্‌দেবী আবির্ভূতা হইলেন। অমনি বাগ্‌-দেবীর প্রবল ইচ্ছা হইল, যেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পান; 'ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিনী"।—(ব্রহ্ম-বৈ° পু° প্রকৃতি' খে ৪ অঃ ১১ শ্লোক)। কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ; তিনি অন্যদার হন কেমন করিয়া? কাজেই বাগ্‌দেবীকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাওয়াও যা, বিষ্ণুকে পাওয়াও তাই—বিষ্ণু কৃষ্ণেরই স্বরূপ; তিনি বিষ্ণুকে পতিত্বে বরণ করুন। সরস্বতীর হাত হইতে নিজে রক্ষা পাইয়া, তাঁর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্যই বোধ হয় বলিলেন—

"পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরংসুখম্।" (ব্র-বৈ-পু প্রকৃতি খঃ ৪ অ. ১৯ শ্লোক)

আরও বলিলেন, লোকে সরস্বতীর পূজা করিবে—

"মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভেষু সুন্দরি" (ব্র-বৈ-পু প্রকৃতি খঃ ৪ অ. ২২ শ্লোক)

পুরাণ বলিয়াছেন—

আদৌ সরস্বতী পূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্মিতা।

যৎপ্রসাদাদ্ মুনিশ্রেষ্ঠ মুর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥' (ব্র-বৈ পুঃ প্রকৃতি খঃ ৪ অঃ ১০ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হউক বা পরে যে কোন সময় থেকে হউক—মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতীদেবীর পূজা আরম্ভ হইল।

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে যে অনন্ত শক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী এই তিনটী শক্তি প্রদান করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্ত শক্তি পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মণ! তুমি এই বিদ্যারূপা চারু-হাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বর-ধারিণী, শ্বেত-সরোজ-বাসিনী মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে ক্রীড়া সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই অনুত্তমা ললনা তোমার প্রিয় সহচরী হইবেন। ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে; কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইহার সহিত সত্য লোকে গমন কর এবং তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর। (দেবী ভাগ ৩।৬ অ°)

দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে লক্ষ্মী, সরস্বতী উভয়েই চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে সরস্বতী ব্রহ্মার মানস কন্যা। কোন এক সময়ে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া কাম মোহিত হন। পরে অতি কষ্টে কামবেগ দমন করিয়া কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন, ব্রহ্মার এই শাপে পরে মহাদেবের নয়নানলে কামদেব ভষ্মীভূত হন।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হয়, একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই দিন সারস্বত উৎসব। এই তিথির একটী বিশেষ নাম—শ্রীপঞ্চমী। শ্রী মানে কিন্তু লক্ষ্মী। অতএব শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মীপঞ্চমীর দ্যোতক। শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীরই পূজার বিধি হওয়া উচিত। যাহা হউক বাঙ্গালার নিবন্ধকার রঘুনন্দন 'সংবৎসর প্রদীপ' উদ্ধার করিয়া শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী পূজা ও মস্যাধার লেখনী ইত্যাদি পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভবিষ্য পুরাণ শ্রীপঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীর ছয় বৎসর ব্যাপী একটী ব্রত করিবার উপদেশ দিয়াছেন—"মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া। তস্যামারভ্য কর্তব্যং বৎসরান্ ষট্ ব্রতোত্তমম্ ॥" এই সব কারণে শ্রীপঞ্চমীর দিনে অনেক স্থলে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দুই দেবতারই পূজা করা হয় দেখা যায়। অমর সিংহের সময় পর্যন্ত প্রাচীন কোন কোষ গ্রন্থে 'শ্রী' শব্দের অর্থ সরস্বতী না থাকিলেও, মধ্য যুগের আচার্য মেদিনীকর, হেমচন্দ্র, জটাধর প্রভৃতির অভিধানে সরস্বতীর একটী নাম হইল 'শ্রী'। এদিকে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা; কাজেই ক্রমশঃ শ্রীপঞ্চমী নামও বেশ খাপ খাইয়া গেল।

আজকাল সরস্বতী পূজা মাঘী পঞ্চমী তিথিতে হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন যুগে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিলনা। কৃষ্ণযজুর্বেদে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে নবমীতে সরস্বতীকে উৎসর্গ করিবার বিধি। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে পূর্বকালে পূর্ণিমা তিথিতে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দেওয়া হইত।

বঙ্গদেশে শ্রীপঞ্চমীর দিন কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজা হয়। বৈদ্যনাথ প্রভৃতি বঙ্গের বাহিরে কোন কোন জায়গায়, আশ্বিন শুক্লা অষ্টমীতে সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অপ্রচলিত হইলেও আশ্বিনে সরস্বতীপূজার শাস্ত্রবিধি আছে। রুদ্রযামলে আছে—'আশ্বিনের শুক্লপক্ষে মূলা নক্ষত্রে সরস্বতীকে আবাহন করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে বিসর্জন দিতে হয়।'

সেকালে সরস্বতীর পূজা হইত দুই রকমে—এক দেবীর মৃন্ময় প্রতিমা গড়িয়া, আর মূর্তি না রাখিয়া—বই, মাটির দোয়াত, শরের কলম, কাগজ ও অন্যান্য সারস্বত প্রতিনিধি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করা হইত। পূজায় শ্বেত উপচারের ব্যবস্থা, সাদা চন্দন, সাদা ধান ও সাদা ফুল। দেবী নিজে শ্বেতবর্ণা—তাঁর বীণা শুভ্র; হস্ত শুভ্র, চক্ষু শুভ্র; বস্ত্রালঙ্কার শুভ্র; পদ্ম শুভ্র। কাজেই তাঁর পূজোপহারে শুভ্রবর্ণের এত বাড়াবাড়ি। দেবীর পূজায় কাঞ্চন ফুলের দরকার। আম্রমুকুল ও অভ্রও দেওয়া হইত।

সরস্বতীর কয়েক রকমের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়:—কোথাও তিনি একক বসিয়া থাকেন, কোথাও তিনি একক দাঁড়াইয়া থাকেন। কোন স্থলে তিনি ব্রহ্মার পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা, আবার কোন স্থানে তিনি বিষ্ণুর পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা। পদ্মাসীনা সরস্বতী, হংসবাহিনী সরস্বতী, ময়ূরবাহনা সরস্বতী, সিংহবাহনা সরস্বতী, মেষবাহনা সরস্বতী, ললিতাসনে আসীনা সরস্বতী প্রভৃতি অনেক প্রকার সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। তন্ত্রে সরস্বতীর নানাপ্রকার রূপ কল্পনা আছে। কিন্তু সকলরূপেই তিনি মাতৃকামূর্তিতে প্রকটিত। হিন্দুতন্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতীর এই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ যে মহা সরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্যবজ্র সরস্বতী মূর্তির ধ্যান দিয়াছেন সেগুলিরও মূল মাতৃকামূর্তি। হিন্দুতন্ত্রে অষ্ট তারিণীগণের মধ্যে সরস্বতী স্থান পাইয়াছেন। তন্ত্র সরস্বতীকে মাতৃকামূর্তি বলিয়া থাকেন। তন্ত্রের নীলসরস্বতীও মাতৃকামূর্তি, ইনি দ্বিতীয়া বিদ্যা তারা।

দেবী সরস্বতীকে লইয়া এক উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। এই উপনিষদের নাম সরস্বতী রহস্যপনিষৎ। এই উপনিষদ্খানি যে খুব প্রাচীন উপনিষদ্ নয় এই উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরপুরবাসিনী সারদাধ্যানই তাহার প্রমাণ। সরস্বতী যখন দেবী, তখন তাঁহার ধ্যান, মন্ত্রচাই। মন্ত্র হইলে আবার ঋষি, ছন্দঃ দেবতা বীজ প্রভৃতিরও আবশ্যক। এই উপনিষদ্ বেদের দশটী মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সরস্বতীর ঋষি, ছন্দঃ বীজ প্রভৃতির নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এখন শেষে সরস্বতীতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এই জগৎ একদিকে যেমন শব্দপ্রভব, অপর দিকে তেমনি বাঙ্ময়। এই বাক্ই সরস্বতী, বাক্ ও সরস্বতী

অভিন্না। শাস্ত্রও উপদেশ করিয়াছেন—বাগ্বৈ সরস্বতী”। শতপথ ব্রাহ্মণ (৫.২.২.১৩) এই জন্য সরস্বতীকে 'সরস্বতীবাক্' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

জগৎ কেমন করিয়া হইল এবং ইহার সৃষ্টি প্রক্রিয়াই বা কিরূপ এই সমস্ত তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে গিয়া হিন্দু আর একদিক্ দিয়া দেবদেবী তত্ত্ব আনিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভাব লইয়া যাঁহারা দেব হইলেন তাঁহারা কর্ম্মবিধির নিয়ন্তা হইলেন, আর যাঁহাদিগকে দেবী বলিয়া গনণা করা হইল, তাঁহারা হইলেন ইঁহাদের অচ্ছেদ্য শক্তি বা শক্তি ধাতু। এইরূপে ব্রহ্মা সৃষ্টির অধীশ্বর হইলেন এবং তাঁহার অচ্ছেদ্য শক্তি সরস্বতী তাঁহার মুখে বসতি করিলেন। তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি আবার সৃষ্টির আদিকারণ বাক্ বা শব্দ ব্রহ্ম (Logos)। অপর দিক্ দিয়া দেখিলে তিনিই হইয়া দাড়ান 'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম'।*

সৃষ্টির আদিকারণ এই শক্তিকে পুরাণ আর এক চক্ষুতে দেখিলেন। এই অব্যক্ত শক্তিকে পুরাণ 'গুপ্তরূপিদেবী' বলিয়া ধারণা করিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেখিলেন, এই 'গুপ্ত রূপিদেবী' লক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতী ত্রিবিধরূপে বিরাজিতা। লক্ষ্মী যিনি তিনি প্রকৃতির রাজস গুণাত্মিকা, মহাকালী তামসগুণাত্মিকা এবং সরস্বতী সত্ত্বগুণাত্মিকা। ইনি চন্দ্র-সমপ্রভ সত্ত্বমূর্তি অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক ধারিণী। মহালক্ষ্মী ইঁহার জনয়িত্রী।

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪. ১. ২.

যজ্ঞবেদি ও যজ্ঞাগ্নি

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্‌-এ.

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বেদপন্থী দ্বিজদিগকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইত—এই ক্রিয়াগুলির নাম যজ্ঞ; যেমন, পাকযজ্ঞ, দার্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ, নিরূঢ়পশুবন্ধ যজ্ঞ, পিত্রেষ্টি যজ্ঞ, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ইত্যাদি। যজ্ঞ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য এবং কাম্য। যে যজ্ঞ কোন বিশেষ কাম্যের জন্য অনুষ্ঠিত হইত তাহাকে কাম্য যজ্ঞ বলা হইত। কোন বিশেষ কাম্যব্যতিরেকে যে যজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান করিতে হইত তাহার নাম নিত্য যজ্ঞ।

যজ্ঞ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ বেদ, ব্রাহ্মণ, এবং শ্রৌতসূত্র হইতে এবং বঙ্গভাষায় লিখিত স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "যজ্ঞকথা" হইতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন; বিশেষতঃ ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় আর কেহ অল্পের মধ্যে এত সুন্দর ও সরল করিয়া এই বিষয়টী বলিতে পরিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

যজ্ঞ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। তবে যজ্ঞ করিতে হইলে কতকগুলি বেদি এবং অগ্নি (অর্থাৎ অগ্নি সংস্থাপনের জন্য উচ্চ চিতি) নির্মাণ করিতে হইত। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যজ্ঞবেদি এবং যজ্ঞাগ্নির কথাই বলিতে চাই।

যজ্ঞানুষ্ঠানের যে সব নিয়মাদি বেদ এবং ব্রাহ্মণে বিক্ষিপ্তভাবে আছে তাহাই সূত্রাকারে সংগৃহীত হইয়া শ্রৌতসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রৌতসূত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী সংক্ষিপ্ত গ্রন্থমাত্র। প্রত্যেক বেদের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন এবং একাধিক ব্রাহ্মণ আছে, সেইরূপ ঋক্ ও যজুর্বেদের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন এবং একাধিক শ্রৌতসূত্র আছে।

যজ্ঞবেদি ও যজ্ঞাগ্নি নির্মাণের নিয়মাবলী শ্রৌতসূত্রের অঙ্গীভূত। উক্ত বিষয়ের সূত্রগুলিকে শুল্বসূত্র বলে। কখনও বা এই শুল্বসূত্রগুলি শ্রৌতসূত্রের এক বা একাধিক অধ্যায়রূপে (যেমন আপস্তম্ব শুল্বসূত্র) অথবা পরিশিষ্টরূপে (যেমন কাত্যায়ন শুল্বসূত্র) সন্নিবিষ্ট, আবার কখনও বা শুল্বসূত্রগুলি একত্র করিয়া একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে (যেমন বৌধায়ন শুল্বসূত্র, মানব শুল্বসূত্র ইত্যাদি)।

মান

বেদ এবং অগ্নি নির্মাণে ব্যবহৃত মানদণ্ডের মধ্যে নিম্নলিখিত মানগুলি অন্যতম :—

১ অঙ্গুলি = ১৪ অণু

= ৩৪ তিল (পৃথু সংশ্লিষ্ট)

= ৮ যব (মানব শুল্বসূত্র)

১ ক্ষুদ্র পদ = ১০ অঙ্গুলি
১ পদ = ১৫ অঙ্গুলি
১ প্রাদেশ = ১২ অঙ্গুলি
১ পৃথা বা উত্তর যুগ = ১৩ অঙ্গুলি
১ ঈষা = ১৮৮ অঙ্গুলি
১ অক্ষ = ১০৪ অঙ্গুলি
১ যুগ = ৮৬ অঙ্গুলি
১ জানু = ৩২ অঙ্গুলি
১ শম্যা বা বাহু = ৩৬ অঙ্গুলি
১ প্রক্রম = ২ পদ = ৩০ অঙ্গুলি
১ অরত্নি = ২ প্রাদেশ = ২৪ অঙ্গুলি (= ১৮ইঞ্চি)
১ শয় = ২৪ অঙ্গুলি (মানব শুল্বসূত্র)
১ পুরুষ বা ব্যাম = ৫ অরত্নি = ৫ শয় = ১২০ অঙ্গুলি
১ ব্যায়াম = ৪ অরত্নি = ৯৬ অঙ্গুলি

(মানব শুল্বসূত্র):

১ প্রক্রম = ২ পদ (ইষ্টি যাগে)
১ প্রক্রম = ৩ পদ (পশু যাগে)
১ প্রক্রম = ২½ পদ (সোমযাগে)
১ প্রক্রম = ৫ পদ (সাগ্নিক যজ্ঞে)
১ প্রক্রম = (১০ রথাক্ষ ৭ অরত্নি-অঙ্গুলি) / ২৪ (যুপৈকাদশিনী বেদি-পক্ষে)
১ রথাক্ষ = ৪ অরত্নি = ১ পুরুষ (অনগ্নিক যজ্ঞে)
১ প্রক্রম = ৪৮ অঙ্গুলি

সাধারণ নিয়ম

বেদি এবং অগ্নির অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্যক প্রণিধান করিতে হইলে বেদি এবং অগ্নি সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম জানা আবশ্যক।

প্রত্যেকটী বেদি এবং অগ্নি প্রাচীর উভয়দিকে প্রতিসমভাবে (Symmetrically) অবস্থিত হইবে। এই প্রাচী পূর্ব পশ্চিমে অবস্থিত একটী সরল রেখা এবং ইহাকে পৃষ্ঠ্যা (Backbone) বলা হয়। বেদিকে পশুধর্মী বলা হয়, এবং যেমন একটী পশু উহার পৃষ্ঠ্যার উভয় দিকে প্রতিসমভাবে অবস্থিত থাকে সেইরূপ বেদিও পৃষ্ঠ্যার উভয় দিকে, প্রতিসমভাবে থাকিবে।

বেদির আকার একটী সমভুজ ট্রাপিজিয়াম (Isosceles Trapezium) ; সমান্তরালবর্তী পার্শ্ব দুইটীর বৃহত্তরটী পশ্চিম দিকে এবং ক্ষুদ্রতরটী পূর্বদিকে অবস্থিত থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের মধ্য দিয়া লম্বভাবে অবস্থিত সরল রেখার নাম প্রাচী।

অন্য (দক্ষিণ এবং উত্তর) পার্শ্ব দুইটী কখন কখন বৃত্তাকারে পরিণত করা হয় ; উহাদের ন্যুব্জতা (Convexity) বেদির ভিতরের দিকে থাকে।

বেদি

প্রত্যেক যজ্ঞের জন্য বিশিষ্ট বেদি আছে। যেমন :—পাকযাজ্ঞিকী বেদি (পাকযজ্ঞের জন্য), দার্শ-পৌর্ণমাসিকী বেদি (দর্শ-পূর্ণমাস যজ্ঞের অর্থাৎ অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের জন্য), মারুতী ও বারুণী বেদি, পিত্রেষ্টী বেদি, পাশুকী বেদি, সৌমিকী বেদি প্রভৃতি।

বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও মানব শুল্বসূত্রে নিম্নলিখিত বেদিগুলির উল্লেখ ও মানাদির নির্দেশ আছে :—

	পূর্ব-পার্শ্ব	পশ্চিম-পার্শ্ব	প্রাচী
	অঙ্গুলি	অঙ্গুলি	অঙ্গুলি
বৌধায়ন শুল্বসূত্র			
দার্শ-পৌর্ণমাসিকা বেদি	৬০	৮০	১২০
পাশুবন্ধিকা বেদি	৯৬ বা ৮৬	১২০ ১০৪	১৪৪ ১৮৮
উত্তর বেদি	৩৬ বা ১৫০	৩৬ ১৫০	৩৬ ১৫০
পৈত্রিকী বেদি	৯৬ বা $\frac{২৭০}{\sqrt{৩}}$	৯৬ $\frac{২৭০}{\sqrt{৩}}$	৯৬ $\frac{২৭০}{\sqrt{৩}}$
সৌত্রামণি বেদি	২৪০	২৪০	২৪০
প্রাগ্বংশ	৩৬০ বা ৩০০	৩৬০ ৩০০	৪৮০ ৩৬০
মহাবেদি বা সৌমিকী বেদি	৭২০ বা ৩৬০	৯০০ ৪৫০	১০৮০ ৫৪০
অশ্বমেধ-বেদি	২৪প্র	৩০ প্র	৩৬ প্র

[অশ্বমেধ-বেদি নির্মাণের জন্য প্রক্রমের মান :—

$$\text{প্রক্রম} = \frac{\text{২০ রথাক্ষ ২১ পদ ৮ অঙ্গুলি}}{\text{২৪}} = \text{প্রায় ১০০ অঙ্গুলি}$$]

	পূর্ব-পার্শ্ব	পশ্চিম-পার্শ্ব	প্রাচী
	অঙ্গুলি	অঙ্গুলি	অঙ্গুলি
আপস্তম্ব শুল্ব-সূত্র			
প্রাগ্বংশ—			
(ব্রাহ্মণের জন্য)	১৬০	১৬০	২৪০
(ক্ষত্রিয়ের জন্য)	২২০	২২০	৩৩০
(বৈশ্যের জন্য)	২৪০	২৪০	৩৬০
দার্শ-পৌর্ণমাসিক-বেদি	যেরূপ আবশ্যক	যেরূপ আবশ্যক	৯৬
	যাহাতে আসন্ন হবির্দ্রব্যাদি রাখা যায় এইরূপ মান হইবে)		
সৌমিকী বেদি	৭২০ বা ৩৬০	৯০০ বা ৪৫০	১০৮০ বা ৫৪০
সৌত্রামণি বেদি	$\frac{২৭০}{\sqrt{৩}}$	$\frac{২৭০}{\sqrt{৩}}$	$\frac{২৭০}{\sqrt{৩}}$
নিরূঢ় পশুবন্ধ বেদি	৮৬ বা ৭২	১০৪ বা ৯৬	১৮৮ বা ১৪৪
পৈত্রিকী বেদি	৯৬	৯৬	৯৬
উত্তর-বেদি	১৫০	১৫০	১৫০
মানব শুল্বসূত্র			
পাকযাজ্ঞিকী বেদি	৬০	৭২	৯৬
লক্ষহোম বেদি	১২০	১৪৪	১৮০
কোটিহোম বেদি	৩০০	৩৬০	৪৫০
দার্শ-পৌর্ণমাসিকা বেদি	৪৮	৬৪	৯৬
মারুতী বেদি	৭২	৯৬	১৪৪
বারুণী বেদি	৩৬	৪৮	১৪৪
পাশুকী বেদি	৭২	৯৬	১৪৪
সৌমিকী বেদি—			
বলিশাল	৯৬	৯৬	৯৬
প্রাগ্বংশ	২৪০	২৪০	২৪০
মহাবেদি	৭২০	৯০০	১০৮০
উত্তর বেদি	৭৬	৭৬	৭৬

পিত্রেষ্টি বেদি—সমচতুরস্র, প্রতিপার্শ্ব ৯৬ ; কিন্তু ইহার কোণগুলি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত, কাজেই প্রাচী $= ৯৬\sqrt{২} = ১৩৬$ অঙ্গুলি।

অগ্নি

প্রত্যেক যজ্ঞ এবং বেদির সহিত বিশিষ্ট "অগ্নি" চয়নের ব্যবস্থা আছে। অগ্নিচিতিকে সংক্ষেপে "অগ্নি" এবং তাহার নির্মাণ কৌশলকে অগ্নিচয়ন বলা হয়। দার্শ-পৌর্ণমাসিকী বেদির পূর্বদিকে আহবনীয় "অগ্নি," পশ্চিমে গার্হপত্য "অগ্নি" এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি অবস্থিত। পূর্বদিকের অগ্নিকে আহবনীয় অগ্নি বলা হয়। কারণ যজ্ঞে অধিষ্ঠান করিবার জন্য দেবতাদিগকে পূর্বদিকে আহ্বান করিতে হয়। অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত এবং প্রতিনিধি। সেইজন্য আহবনীয় অগ্নিকে পূর্বদিকে স্থাপন করিয়া এই অগ্নিতে আহুতি দিলে সেই আহুতি দেবতাদিগকেই দেওয়া হয়।

আহবনীয় অগ্নি সম-চতুরস্রাকৃতি, গার্হপত্য অগ্নি বৃত্তাকার এবং দক্ষিণাগ্নি অর্দ্ধবৃত্তাকার। কিন্তু এই তিনটী অগ্নিরই ক্ষেত্র-পরিমাণ এক হওয়া চাই, ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। কাজেই নিম্নলিখিত জ্যামিতিক প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক :—

"একটী সম-চতুরস্র ক্ষেত্রকে কিরূপে বৃত্তাকারে বা অর্ধবৃত্তাকারে, অথবা একটী বৃত্ত বা অর্ধবৃত্ত ক্ষেত্রকে কিরূপে সম-চতুরস্র ক্ষেত্রে পরিণত করা যায়?"

শুল্বসূত্রে এই প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের জন্য নির্মিত সৌমিকী বেদির স্থান আহবনীয় অগ্নির ১৮০ আঙ্গুলি পূর্ব দিকে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (কৃষ্ণযজুর্বেদে) এই মহাবেদির মান এইরূপ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে—পূর্বপার্শ্ব ২৪, পশ্চিম পার্শ্ব ৩০, এবং পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের মধ্যদিয়া লম্বভাবে (Perpendicularly) অবস্থিত প্রাচী বা পৃষ্ঠ্যা ৩৬। ছোট মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করিয়া নির্মাণ করিলে ছোট বেদি হইবে এবং বড় মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করিয়া নির্মাণ করিলে বড় বেদি হইবে, কিন্তু পূর্ব এবং পশ্চিম পার্শ্বদ্বয় এবং প্রাচীর পরিমাণ উপরোক্ত অনুপাত (২৪,৩০,৩৬) অনুযায়ী হইবে। এই সৌমিকী বেদির মধ্যে পূর্বদিকে একটী অগ্নি স্থাপন করিবার জন্য ক্ষুদ্রতর বেদি নির্মাণ করা হয়, তাহার নাম উত্তরবেদি। ইহা ব্যতীত আরও দুইটী অগ্নি সৌমিকী বেদির উত্তরে এবং দক্ষিণে স্থাপন করিতে হয়, তাহাদের নাম মার্জালীয় ও আগ্নিধ্রীয় অগ্নি।

যদি কোন বিশেষ কাম্যের জন্য (অর্থাৎ বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য) যজ্ঞ করা হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত উত্তরবেদির স্থানে শাস্ত্র নির্দেশিত কাম্য অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। আপস্তম্ব ও বৌধায়ন শুল্বসূত্রে নিম্নলিখিত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কাম্য অগ্নি চয়নের বিধি আছে। যথা :—

আপস্তম্ব শুল্বসূত্র

কাম্য অগ্নি	কাম্য
প্রৌগচিৎ	ভ্রাতৃব্যধ্বংশ
উভয়তঃ প্রৌগচিৎ	প্রজাত এবং প্রতিজনিষ্যমান ভ্রাতৃব্য ধ্বংশ
রথচক্রচিৎ	ভ্রাতৃব্য ধ্বংশ
দ্রোণচিৎ	অন্ন

কাম্য অগ্নি	কাম্য
সমুহ্যচিৎ	পশু
পরিচায্যচিৎ	গ্রাম
শ্মশানচিৎ	পিতৃলোকপ্রাপ্তি
ছন্দশ্চিৎ	পশু
শ্যেনচিৎ	সুবর্গ
কঙ্কচিৎ	সুবর্গ
অলজচিৎ	সুবর্গ

বৌধায়ন শুল্বসূত্র

কাম্য অগ্নি	কাম্য
শ্যেনচিৎ	সুবর্গ
কূর্মচিৎ	ব্রহ্মলোক অভিজয়

বিভিন্ন কাম্যের জন্য কাম্য অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির নির্দেশ আছে। কিন্তু আকৃতি যাহাই হউক, কোন নির্দিষ্ট (যেমন সপ্তম) যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন আকৃতির অগ্নিগুলির ক্ষেত্রমান একই হইবে। যদি বিভিন্ন যজমান বিভিন্ন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে তাহাদের কাম্য অগ্নিগুলির আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইবে, কিন্তু প্রত্যেকটীর ক্ষেত্র ফল ৭½ বর্গ পুরুষ হইবে। একটী পুরুষ ১২০ অঙ্গুলি অথবা ৫ অরত্নি অথবা ৯০ ইঞ্চিতে হয়, এবং একবর্গ পুরুষ এমন একটী বর্গক্ষেত্র যাহার দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার উভয়ই এক পুরুষের সমান। দ্বিতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য কাম্য অগ্নির আকৃতি অভীষ্টানুযায়ী ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আকৃতি একই হউক বা ভিন্নই হউক, উহার ক্ষেত্রফল ৮½ বর্গ পুরুষ হওয়া চাই। এইরূপে তৃতীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য কাম্য অগ্নির ক্ষেত্রফল ৯½ বর্গ পুরুষ হইবে এবং পরবর্তী প্রত্যেক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কাম্য অগ্নির ক্ষেত্রফল ১ বর্গ পুরুষ করিয়া বাড়াইতে হইবে। এই-রূপে কাম্য অগ্নির ক্ষেত্রফল ১০১½ বর্গ পুরুষ পর্যন্ত বাড়াইবার বিধি আছে; তাহার পর আর ক্ষেত্রফল বাড়াইবার নিয়ম নাই। কিন্তু আকৃতির বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া অগ্নির আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে কোন একটী অংশ অস্বাভাবিক রূপে বর্ধিত করিলে চলিবে না।

ইহা হইতে আরও দুইটী জ্যামিতিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়:—

(১) কিরূপে বিভিন্ন আকৃতির (সম-চতুরস্র, দীর্ঘচতুরস্র, বৃত্তাকার, দ্রোণাকার, শ্যেনাকার, চক্রাকার ইত্যাদি আকৃতির) অগ্নিচয়ন করা যাইতে পারে যাহাদের ক্ষেত্রফল সমান?

(২) কিরূপে একই রূপ আকৃতির অগ্নিচয়ন করা যাইতে পারে যাহাদের আয়তন বা ক্ষেত্রফলের পরিমাণ বিভিন্ন। শুল্বসূত্রে এই প্রশ্নগুলির সমাধান করা হইয়াছে।

প্রত্যেক কাম্য অগ্নির উচ্চতা জানু পর্যন্ত (৩২ অঙ্গুলি বা ২৪″) অথবা নাভি পর্যন্ত (৬৪ অঙ্গুলি বা ৪৮″) অথবা আস্য (মুখ) পর্যন্ত (৯৬ অঙ্গুলি বা ৭২″) হইবে। অগ্নি ইষ্টক দ্বারা নির্মাণ

করিতে হইবে। ইষ্টকগুলি বিশেষভাবে নির্বাচিত হওয়া চাই। ইষ্টক ব্যবহারের নিষেধ বিধিগুলি এইরূপ :—(ক) জীর্ণ ইষ্টক ব্যবহার করিবে না, (খ) কৃষ্ণবর্ণের ইষ্টক (ঝামা) ব্যবহার করিবে না, (গ) ভিন্ন (Cracked) ইষ্টক ব্যবহার করিবে না, (ঘ) খণ্ড (ভগ্ন) ইষ্টক ব্যবহার করিবে না, (ঙ) লক্ষ্মাণ ইষ্টক ব্যবহার করিবে না অর্থাৎ এইরূপ ইষ্টক ব্যবহার করিবে না যাহাতে কোন অনভিপ্রেত চিহ্ন বা বস্তু মিশ্রিত আছে। ভগ্ন ইষ্টক ব্যবহার নিষেধের জন্য বিভিন্ন আকৃতির ইষ্টক তৈয়ারী করিবার বিধি আছে।

অগ্নির উচ্চতা ৩২ অঙ্গুলি, অথবা ৬৪ অঙ্গুলি, অথবা ৯৬ অঙ্গুলি অনুসারে যথাক্রমে প্রত্যেক কাম্য অগ্নি ৫টি প্রস্তারে ১০০০ ইষ্টক দ্বারা, অথবা ১০ প্রস্তারে ২০০০ ইষ্টক দ্বারা, অথবা ১৫ প্রস্তারে ৩০০০ ইষ্টক দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রস্তারে ২০০ করিয়া ইষ্টক স্থাপন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ইষ্টকের উচ্চতা ৩২/৫ অঙ্গুলি হইবে।

কিন্তু ধারাবাহিক (consecutive) দুইটি প্রস্তারে ইষ্টকগুলিকে এরূপভাবে বসাইতে হইবে যেন "ভেদ" বর্জিত হয়, অর্থাৎ কোন স্তরের ২টী ইষ্টকের সন্ধিস্থল যেন তাহার উপরের বা নীচের স্তরের ২টী ইষ্টকের সন্ধিস্থলের সহিত আংশিকভাবেও না মিলিয়া যায়। অগ্নির বহির্দেশের আকৃতি একরূপ রাখিবার জন্য বিভিন্ন স্তরের বাহিরের ইষ্টকগুলির সীমা (Boundary) অবশ্য মিলিয়া যাইবে। এইরূপ মিলনকে 'ভেদ' বলে না অর্থাৎ এরূপ মিলন পূর্বোক্ত নিয়মের বিরোধী নহে। অবশ্য এই নিয়মটী অগ্নিচিতির দৃঢ়তা (Solidarity) রক্ষার জন্য করিতে হইয়াছে। এই কারণেই একটী অগ্নি নির্মাণের বর্ণনা প্রসঙ্গে শুল্বসূত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে :—

(১) অগ্নির আকৃতি নির্মাণ, (২) বিভিন্ন আকৃতির ইষ্টক নির্মাণ,
(৩) প্রথম প্রস্তারে ইষ্টক স্থাপনের রীতি, এবং (৪) দ্বিতীয় প্রস্তারে ইষ্টক স্থাপনের রীতি।

এইরূপে ব্যত্যাসভাবে (alternately) অভীষ্ট সংখ্যক প্রস্তার স্থাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ ১ম, ৩য়, ৫ম ইত্যাদি একান্তর (alternate) প্রস্তার ইষ্টক স্থাপনের বিধি একই প্রকার, এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম ইত্যাদি একান্তর প্রস্তারে ইষ্টক স্থাপনের বিধি একই প্রকার। পরবর্তী চিত্রগুলিতে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশগুলি দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক অগ্নির চিত্র দুইটী ১ম এবং ২য় প্রস্তারে ইষ্টক স্থাপনের রীতি এবং কিরূপে "ভেদ" বর্জিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতেছে। যে কোন শ্যেনচিৎ (অর্থাৎ যাহার আকৃতি পক্ষীর ন্যায়) অগ্নির মস্তক এবং আত্মার (শরীরের) সন্ধিস্থলে, আত্মা এবং পক্ষ দুইটীর সন্ধিস্থলে, এবং আত্মা ও পুচ্ছের সন্ধিস্থলে কি কৌশলে ইষ্টক গুলির স্থাপনা দ্বারা এই সকল সন্ধিস্থলে "ভেদ" বর্জিত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পরবর্তী সংখ্যায় বেদি এবং অগ্নির চিত্রাবলী দেওয়া হইবে এবং তৎসম্পর্কে পূর্বোক্ত বিষয়েরও আলোচনা করা হইবে। (ক্রমশঃ)

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

(পূর্বানুবৃত্তি)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে সর্বজ্ঞাত্মমুনিকে বেদান্তের অদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রথম যুগের শেষ আচার্য বলা যাইতে পারে। এই প্রথম যুগের পূর্বে বৌদ্ধমত, জৈনমত প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ আচার্য শঙ্কর খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্মমুনির পরে ২জন বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত এই অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেন—ইঁহারা শান্ত রক্ষিত ও তাঁহার শিষ্য কমলশীল। শান্তরক্ষিতের গ্রন্থ 'তত্ত্ব সংগ্রহ' ও ইহার উপর কমলশীলের টীকা সম্প্রতি বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ২জন জৈন পণ্ডিত বিদ্যানন্দ ও মাণিক্য নন্দী, ২জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত শিবাদিত্য (বা বোম-শিবাচার্য) এবং জয়ন্ত ভট্ট তাঁহাদের গ্রন্থে অদ্বৈতমত খণ্ডনের চেষ্টা করেন। বিশেষরূপে এই সময়ে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ভাস্করাচার্য তাঁহার বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে শঙ্করমত খণ্ডনের চেষ্টা করেন। এই সকল বাধা প্রতীকারের চেষ্টা করিলেন ৪ জন বেদান্তাচার্য—ইঁহারা সকলেই ৯ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হ'ন। এই ৪ জনের নাম ও গ্রন্থের বিবরণ যথা—(৬) অবিমুক্তাত্ম ভগবান—ইনি অব্যয়াত্ম ভগবানের শিষ্য এবং ইঁহার গ্রন্থের নাম 'ইষ্টসিদ্ধি'। (৭) বোধঘনাচার্য ইনি সুরেশ্বরাচার্যের শিষ্য এবং 'তত্ত্বসিদ্ধি' নামক গ্রন্থ রচয়িতা (৮) প্রকাশাত্মযতি ইনি অনন্যানুভবের শিষ্য ও পদ্মপাদাচার্য কৃত পঞ্চপাদিকার উপর 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' নামক টীকার রচয়িতা। (৯) বাচস্পতি মিশ্র (ইঁহার সময় প্রায় ৮০১-৮৮১ খ্রীঃ অব্দ)। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার কৃত শঙ্কর ভাষ্যের উপর 'ভামতী' টীকা চিরকাল তাঁহার প্রতিভার খ্যাতি প্রচার করিবে। ইঁহার লিখিত অন্যান্য গ্রন্থও আছে যথা—সুরেশ্বরাচার্যের ব্রহ্মসিদ্ধির উপর 'ব্রহ্মতত্ত্ব সমীক্ষা' নামক টীকা; ও সুরেশ্বর রচিত বিধিবিবেকের উপর 'ন্যায় কণিকা' টীকা; ন্যায়দর্শনের ভাষ্য-বার্তিকের উপর 'তাৎপর্য টীকা' ও 'ন্যায়সূচী নিবন্ধ টীকা'; ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর টীকা ও পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যের টীকা।

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর এই গ্রন্থগুলি নব্যন্যায়ের ভাষা ও পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত ও অকাট্যযুক্তির উপর স্থাপিত। (১০) দশম শতাব্দীতে লিখিত অদ্বৈত বেদান্তের গ্রন্থের মধ্যে কেবল নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীধরাচার্য লিখিত 'অদ্বয়সিদ্ধি'র পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার লিখিত অন্য ৩খানি ন্যায় ও পূর্ব মীমাংসার গ্রন্থ আছে—প্রশস্তপাদভাষ্য টীকা 'ন্যায়-কন্দলী', 'তত্ত্বপ্রবোধ', ও 'তত্ত্বসম্বাদিনী।'

ইহার পরেই আমরা খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বেদান্ত দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের

প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই—যেমন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠাচার্য ও শ্রীকরাচার্য, প্রত্যভিজ্ঞাবাদী অভিনব গুপ্ত এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য। ইঁহাদের মতবাদের ও গ্রন্থের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। বর্তমানে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের ধারার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইতেছে।

(১১) শ্রীহর্ষাচার্য—কান্যকুব্জে প্রায় ১১৫০ খ্রীঃ অব্দে ইনি আবির্ভূত হ'ন। ইঁহার রচিত প্রকরণ গ্রন্থের নাম 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'। এই গ্রন্থে ইনি বিভিন্ন মতবাদকে বিশেষরূপে খণ্ডনের চেষ্টা করেন। ইঁহার রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থের নাম 'নৈষধ রচিত' এবং ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ অর্ণববর্ণন, শিবশক্তিসিদ্ধি, বিজয় প্রশস্তি, ছন্দঃপ্রশস্তি, শিবশক্তিসিদ্ধি, সাদৃসাঙ্ক চরিত, গৌড়োর্বশী কুলপ্রশস্তি, স্থৈর্যবিচারণপ্রকরণ, ঈশ্বরাভিসন্ধি প্রভৃতি। (১২) শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রযতি—ইনি অদ্বৈতমতপর একখানি নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' রচনা করেন।

(১৩) চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দ। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে ইঁহার আবির্ভাব হয় ও ইনি শঙ্কর ভাষ্যের উপর 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণ' নামক ১ খানি টীকা রচনা করেন। 'শান্তিবিবরণ' ও 'গুরুপ্রদীপ' নামক ইঁহার আরও ২ খানি গ্রন্থ আছে।

ইহার পরে খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ-উপাধ্যায় (ইনি নব্যন্যায়ের প্রবর্তক), এবং নিম্বার্ক ও রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য কর্তৃক অদ্বৈত বেদান্তের ধারা প্রতিহত হয়। ইঁহাদের বাধা ও আপত্তি খণ্ডনের জন্য খ্রীঃ ১৩ শতাব্দীতে শঙ্কর সম্প্রদায়ের কয়েকজন মনীষির আবির্ভাব হয়। ইঁহারা (১৪) বাদীন্দ্র বা বাগীশ্বরাচার্য (ইঁহার অন্য নাম সর্বজ্ঞ ও মহাদেব)। ইনি খ্রীঃ ১৩-১৪শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হ'ন। ইঁহার গ্রন্থ 'মহাবিদ্যাবিড়ম্বন'। ইহার উপর জৈন ভুবন সুন্দর কৃত 'ব্যাখ্যান দীপিকা' নামক ১টী টীকা আছে। (১৫) আনন্দ বোধেন্দ্র ভট্টারক—ইনি ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই স্বীয় মত প্রচার করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ (ক) ন্যায়-মকরন্দ (খ) প্রমাণমালা (গ) ন্যায়দীপাবলী (ঘ) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকা।

(১৬) আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর—ইঁহার সময় আনুমানিক ১২৫২-১৪০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে। ইঁহার লিখিত গ্রন্থ যথা—(ক) শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের উপর 'ফক্কিকা বিভঞ্জন' টীকা (খ) পদ্মপাদের 'পঞ্চপাদিকা'র উপর টীকা (গ) সুরেশ্বরের 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র উপর 'ভাবশুদ্ধি' নামক টীকা (ঘ) প্রকাশাত্মযতির 'পঞ্চপাদিকা বিবরণের' উপর 'সমন্বয় সূত্রবিবৃতি' নামক টীকা (ঙ) সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক বার্তিকের উপর 'ন্যায়কল্পলতিকা' নামক টীকা (চ) বাদীন্দ্রের 'মহাবিদ্যা বিড়ম্বনে'র উপর টীকা (ছ) বৈশেষিক দর্শনের 'ন্যায়চন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থ।

(১৭) জ্ঞানোত্তমাচার্য (বা গৌড়েশ্বরাচার্য) ইনি চিৎসুখাচার্যের গুরু ও খ্রীঃ ১২শ-১৩শ অব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার গ্রন্থ যথা—(ক-খ) সুরেশ্বরাচার্য কৃত 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'র উপর 'চন্দ্রিকা' টীকা এবং 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র উপর 'বেদান্ত ন্যায় সুধা' টীকা (গ) জ্ঞানসিদ্ধি নামক ১টী প্রকরণ গ্রন্থ। ইঁহাদের পরেই দ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহামতি মধ্বাচার্যের আবির্ভাব। মধ্ব ও তাঁহার শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য ও পদ্মনাভাচার্য অদ্বৈত বেদান্তের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। ইঁহাদের যুক্তি খণ্ডনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন—

(১৮) চিৎসুখাচার্য—ইনি খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন। ইনি দক্ষিণ ভারতের কামকোটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। নব্য ন্যায়ের অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া ইনি অদ্বৈতমত স্থাপনে কৃতসংকল্প হ'ন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ যথা—(ক) প্রত্যক্‌তত্ত্ব প্রদীপিকা বা চিৎসুখী (খ) শঙ্কর-ভাষ্যের 'ভাবপ্রকাশিকা' টীকা (গ) খণ্ডনখণ্ডখাদ্য টীকা (ঘ) বিবরণ তাৎপর্য দীপিকা (ঙ) ব্রহ্মসিদ্ধি টীকা (চ) বিষ্ণুপুরাণের টীকা (ছ) আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারকের 'ন্যায় মকরন্দের' উপর টীকা (জ) প্রমাণমালা ব্যাখ্যা (ঝ) অধিকরণমঞ্জরী সঙ্গতি (ঞ) শঙ্কর চরিত।

(১৯) শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর। ইনি ১২২৮-১৩৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি একাধারে অসাধারণ সাধক ও পণ্ডিত ছিলেন এবং দ্বৈতসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্যকে তিনবার বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ (ক) ১০৮ খানি উপনিষদের উপর টীকা (খ) বেদান্ত সূত্রবৃত্তি (গ) গীতার টীকা (ঘ) আত্মপুরাণ (প্রকরণ গ্রন্থ)।

(২০) শ্রীধর স্বামী—ইনি গুর্জর দেশীয় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। ইঁহার গ্রন্থ—(ক) গীতার টীকা (খ) ভাগবতের টীকা (গ) বিষ্ণুপুরাণের টীকা। ইনি খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর লোক।

(২১) প্রত্যক্ স্বরূপ ভগবান—ইনিও খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন। ইঁহার গ্রন্থ—চিৎসুখীর উপর 'মানসনয়ন প্রসাদিনী' টীকা।

(২২) অমলানন্দ যতি—(ইঁহার অন্য নাম ব্যাসাশ্রম)। ইনি চিৎসুখের শিষ্য সুখপ্রকাশের শিষ্য। দেবগিরির রাজা কৃষ্ণরাজার সময় (১২৪৭-১২৬০ খ্রীঃ) ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) ভামতীর উপর 'কল্পতরু' টীকা (খ) পঞ্চপাদিকার উপর 'দর্পণ'-টীকা (গ) শাস্ত্র দর্পণ (ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণমালা)।

ইঁহাদের পরেই মধ্ব ও রামানুজ সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট আচার্য অদ্বৈতমত-খণ্ডনে চেষ্টা করেন। আর তাঁহাদের মত পুনঃ খণ্ডনের জন্য আবির্ভূত হইলেন—

(২৩) ভারতী-তীর্থ—(১৩২৮-১৩৮০ খ্রীঁ অ°) ইনি শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ বেদান্তসূত্রের সটীক অধিকরণমালা।

(২৪) সায়ণাচার্য। ইনি অসাধারণ বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন এবং প্রায় সমস্ত বেদেরই ভাষ্যরচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। অবশ্য অদ্বৈত বেদান্তের উপর ইঁহার কোন গ্রন্থ নাই।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী

প্রাচীন ভারতে যে স্ত্রী-শিক্ষা বহুলরূপে প্রচলিত ছিল এবং স্ত্রীলোকেরাও যে উপনয়ন সংস্কারের অধিকারিণী হইয়া বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ৩।৫।৫৫।১৬ মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাল্যবিবাহ একেবারেই অনুমোদিত হয় নাই এবং কন্যাকে শিক্ষিতা করিয়া শিক্ষিত পাত্রের সহিত বিবাহ দানের জন্য বলা হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে যে কন্যাদিগকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকিতে হইত তাহাও যজুর্বেদের ৮।১ মন্ত্র হইতে জানা যায়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১।১১), গোভিল গৃহ্যসূত্র (১।৩), আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (১২।৫।১২) প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেরাও অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞকার্যে বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেন। জৈমিনিও তাঁহার পূর্বমীমাংসায় (১৮।৪।৩ সূত্র) এবিষয় বলিয়াছেন। শবর স্বামীও তাঁহার মীমাংসা ভাষ্যে এবং মাধবাচার্যও তাঁহার 'ন্যায়মালা বিস্তারে' স্ত্রীলোকেরা যে যজ্ঞাদিকার্যে ও বেদাধ্যয়নে পুরুষদিগেরই সহিত সমান অধিকারসম্পন্না তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের যে উপনয়ন হইতে তাহা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৩।২।৩৭) ও অন্যান্য বৈদিকগ্রন্থ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীকদিগের মধ্যে এইপ্রথা এখনও বর্তমান। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও যে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই ৪টী আশ্রম ছিল তাহা মহর্ষি হারীতকৃত 'হারীত বচনম্' হইতে জানা যায়। শুধু তাহাই নহে ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রদ্রষ্টৃ ছিলেন প্রাচীন ভারতের বহু ঋষি-রমণী। যেমন ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৪র্থ অষ্টকের ২৮শ সূক্তের দ্রষ্টৃ মহীয়সী নারী বিশ্ববারা, লোপমুদ্রা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২য় অষ্টকের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৭৯তম সূক্তের দ্রষ্টৃ। তদ্ব্যতীত অপলা, শাশ্বতী, ঘোষা, আত্রেয়ী, পৌলমী প্রভৃতি বহু নারী ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টৃ ও ঋষি পর্যায়ভুক্তা।

প্রাচীন ভারতের স্ত্রীলোকেরা যে কেবল বৈদিককার্যে যোগদান ও মন্ত্রোচ্চারণ ও বেদাধ্যয়ন করিতেন তাহা নহে পরন্তু তাঁহারা দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও করিতেন এবং অনেক বিশিষ্ট জ্ঞানীদের সভায় আলোচনায় যোগদান করিতেন। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ জনকঋষির সভায় গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ঋষিকন্যাদের আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আর্যকন্যাদের অনেকে আবার স্বগৃহ হইতে বহুদূরে কোন গুরুকুলে গিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই কৌষতিকী ব্রাহ্মণে (৭।৬)—পথ্যাবস্তি নাম্নী কোন আর্যকন্যা উত্তরাঞ্চলে গমন করিয়া অধ্যয়নান্তে 'বাক্' বা সরস্বতী উপাধি গ্রহণ করে ফিরে এলেন। প্রাচীন বৈদিক যুগেই

স্ত্রীলোকেরা যে গীত বাদ্যাদি শিল্পকলা শিক্ষা করিতেন তাহা আমরা তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫।১।৬।৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (৩।২।৪।৩-৬) প্রভৃতি হইতে দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ সে সময়ে অনেক গুরুকুলে সহশিক্ষা (Co-education), প্রচলিত ছিল। কারণ আমরা দেখি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।১৩), ঐতরেয় উপনিষদে (৩) উক্ত হইতেছে যে কোন কোন শরীর-বিদ্যাদি শিক্ষা দিবার সময় স্ত্রীলোক দিগকে বাহিরে চলিয়া যাইতে বলা হইত।

স্ত্রীলোকদিগের এই সমান অধিকার পরবর্তী পৌরাণিক যুগেও দেখিতে পাই। রামায়ণে কৌশল্যা, সীতা, তারা (বালিপত্নী) বেদ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। মহাভারতে শান্তি পর্বে জনক মহিষী রাজর্ষিকে বেদাদিশাস্ত্র ইহাতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে নিবৃত্ত করিতেছেন।

পরবর্তীকালে মনুসংহিতার সময় হইতে স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদের এইসব কার্য্যে যোগদান নিষিদ্ধ হইতেছে দেখিতে পাই। ক্রমে স্ত্রীলোকেরা যে কেবল গৃহকার্যে পুরুষদিগকে সহায়তা করিবেন যেমন রন্ধন, বস্ত্র বয়ন, বৃক্ষাদি রোপণ ও কৃষি ইত্যাদি—তাহা আমরা শুক্রনীতিসার, বাৎসায়ন কৃত কামসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। স্ত্রীলোকেরা সংসারের আয় ব্যয় হিসাবও করিবেন। এই সময়েই নানাপ্রকার (৬৪ প্রকার) শিল্প ও কলাবিদ্যা স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হইল। বাৎসায়ন মুনি তাঁহার কামশাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক কিছু উপদেশ দিয়াছেন ও তাঁহার উদার মতের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার মতে যদিও স্ত্রীলোকের বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার নাই (কারণ সে সময় ইহার বিরুদ্ধে স্মৃতিকারেরা মত দিয়াছেন) তথাপি স্ত্রীলোকদিগকে এই সব শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। (১।৩।২-৫)। তাঁহার মতে বিবাহের পূর্বেই কন্যাদিগকে কামশাস্ত্রে শিক্ষাদান করা উচিৎ, আর এই শিক্ষার শিক্ষয়িত্রীরূপে কন্যার বিবাহিতা ধাত্রীকন্যা, বিবাহিতা বান্ধবী প্রভৃতিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বাৎসায়ন কৃত ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যার উল্লেখ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী-নির্দেশকে আমরা আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতিরূপে গণনা করিতে পারি। অবশ্য এইসব কলাবিদ্যার প্রচলন বৈদিকযুগ হইতেই ছিল। আর বহু অভিজাত কন্যারা ও রাজপরিবারের মহিলারা এই সব বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। আমরা মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি হইতেও ইহার বহু প্রমাণ পাই। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে এবং সংস্কৃত কাব্যেও (যেমন মালবিকাগ্নিমিত্রম্, রঘুবংশম্, রত্নাবলী) ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যুগে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে অনেক কবিও ছিলেন তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের রচিত অনেক কাব্যগ্রন্থও এখনও পাওয়া যায়। কর্ণাটদেশের বিজয়াঙ্কা, শীলা ভট্টারিকা, প্রভুদেবী প্রভৃতি বহু স্ত্রীকবির বিষয় শুক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে স্ত্রীলোকেরা তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন এবং অনেক স্ত্রীলোক তান্ত্রিক গুরুরূপে অবস্থান করিতেন।

স্ত্রীলোকেরা যে কেবল কলাবিদ্যাদিতে পারদর্শিনী ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অনেক মহিয়সী আর্য্যনারীর অবদান আজও শিক্ষা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বীজগণিত কর্ত্রী লীলাবতী ও জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদা খনার নামোল্লেখ করিতে পারি।

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক আশ্রম (মঠ) প্রভৃতি ছিল কি না বলিতে পারি না। বৌদ্ধযুগে এই প্রকার ভিক্ষুণীসংঙ্ঘ প্রবর্তিত হইল। বুদ্ধের মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতিই প্রথমে এই সঙ্ঘের বীজ বপন করেন, তাহার পর গৌতমের স্ত্রী গোপা ও অন্যান্য অনেক রাজকন্যা ইহাতে যোগদান করেন। বিনয়পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে ভিক্ষুণী সংঘের শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবন যাপন প্রণালী বিষয়ক বহু নিয়ম সংবদ্ধ আছে। থেরীগাথার রচয়িত্রী অনেক ভিক্ষুণী। বুদ্ধদেবের মতে স্ত্রী শূদ্র সকলেরই বেদাদি ও অন্য বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে সমান অধিকার আছে। কোন কোন রাজ্য-শাসন কার্যে স্ত্রীলোকেরাও নিযুক্ত হইতেন ইহা আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে দেখিতে পাই। নৃত্য বিশারদা স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে দেবদাসী নিযুক্তা হইতেন। বর্ত্তমান সময়েও ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরে এই দেবদাসী প্রথা আছে। স্ত্রীলোক-দিগকে যে যুদ্ধবিদ্যা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদান করা হইত তাহা আমরা ঋগ্বেদ ও রামায়ণ মহাভারতাদি হইতে দেখিতে পাই। আধুনিক যুগের ইতিহাসও রাজপুত ও মহারাষ্ট্রকন্যারা যে বীর যোদ্ধারমণী ছিলেন তাহার পরিচয় দান করে। রাজান্তঃপুরে বহু রমণী তীর-ধনু-ঢাল-তরবাল প্রভৃতি সুসজ্জিতা হইয়া অন্তঃপুর ও রাজাকে রক্ষা করিতেন—এ বিষয় আমরা কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র হইতে দেখিতে পাই।

স্ত্রীলোকেরা যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও শিক্ষা করিতেন তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় অনেক স্ত্রী বৈদ্য ছিলেন এবং আয়ুর্বেদের মধ্যে ধাত্রী-বিদ্যাতেই অনেকে বিশেষ পারদর্শিনি ছিলেন। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে কোন স্ত্রীলোক কর্তৃক রচিত (ইঁহার নাম আরবী অনুবাদে রুশা) একখানি ধাত্রী বিদ্যার পুস্তক আরবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল।

আর দু' একটী কথার অবতারণা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী শেষ করিতেছি। প্রাচীন কালের গুরুগৃহবাসী ছাত্রদের মধ্যে দুই রকমের ব্রহ্মচারী থাকিতেন—উপকুর্বন্ ও নৈষ্ঠিক। প্রাচীন যুগের ছাত্রীদের মধ্যেও সেইরূপ দুইশ্রেণীর ব্রহ্মচারিণী—(ক) সদ্যোদ্বাহা ও (খ) ব্রহ্মবাদিনী থাকিতেন। যাঁহারা অধ্যয়নান্তে বিবাহাদি করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন তাঁহাদিগকে সদ্যোদ্বাহা বলা হইত ও যাঁহারা আজীবন অধ্যয়ন করিতেন ও ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিতেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। এইসব ব্রহ্মবাদিনী রমণীর সংখ্যাও নিতান্ত বিরল ছিল না। ইঁহারা কি করিতেন? নিশ্চয়ই ইঁহাদের অনেকে অধ্যাপন ও অন্যান্য ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতেন। এই সব অধ্যাপিকাদিগকে উপাধ্যায়া বলা হইত। সুলভা, বড়বা, প্রাথীতেরী, গার্গী প্রভৃতি রমণী এই শ্রেণীর ছিলেন। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী যে সে যুগে যথেষ্ট ছিল তাহা বলা যাইতে পারে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজের অন্য স্তরের কার্যে এবং কলাবিদ্যাতেই যে প্রাচীন কালের আর্য রমণীরা উৎকর্ষ লাভ করিয়া ছিলেন তাহা নহে, রাজ্য পরিচালনাতেও অনেক রমণী সুদক্ষা ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে সাতবাহন বংশের রাণী নয়নিকা,

খৃ ৪র্থ শতাব্দীতে বাকাটক বংশের রাণী প্রভাবতী গুপ্তা, কাশ্মীরের সুগন্ধা ও দিদ্দা, এবং কুঙ্কুমদেবী, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি অনেক রমণীর নামোল্লেখ করিতে পারি। রাণী ভবানী ও অহল্যাবাঈএর নামও বর্তমান যুগে উল্লেখ যোগ্য।

কি কারণে ভারতীয় আর্যরমণীদিগকে তাঁহাদের উচ্চাসন হইতে, তাঁহাদিগকে উপনয়নাদি সংস্কার ও বেদাধ্যয়নাদি হইতে বঞ্চিতা করিয়া পরবর্তী স্মৃতিকারেরা তাঁহাদের স্মৃতিশাস্ত্রে নিয়ম রচনা করিলেন তাহার বিষয় বলিতেছি। ভারতীয় আর্যসভ্যতা ও সমাজ যখন বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল, তখন অনেক আর্য, অনার্য কন্যাদিগকে বিবাহাদি করিতে লাগিলেন। দ্বিজাতিরা শূদ্রকন্যাদেরও বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই সব শূদ্রা ও অনার্য কন্যাদের দ্বারা বৈদিক কার্যে সহায়তা লাভ হইত না। অনেক স্থলে যজ্ঞকার্যে ইঁহারা মন্ত্রোচ্চারণ ভুল করিতে লাগিলেন। সেজন্য ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের উপনয়ন প্রথা ও বেদাধ্যয়ন বন্ধ করা হইল। স্ত্রী শিক্ষাও ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। অতিসায়ন নামক একজন ঋষি প্রথমে এ বিষয়ে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার অন্যতম প্রধান কারণরূপে ক্রমশঃ অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দানের ব্যবস্থা হইল।

বর্তমান যুগে যখন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি প্রত্যেক স্তরের উন্নতির জন্য রামমোহন, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষিরা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করিয়া দিয়াছেন, তখন কি আবার প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারেনা? নবীন ভারতে কি আবার গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখ ব্রহ্মবাদিনী, খনা, লীলাবতী প্রমুখ মেধাবিনী ও অহল্যা, ভবানী প্রমুখ মহীয়সী রমণী আবির্ভূতা হইয়া ভারতের আদর্শ, ইহার সুপ্ত নারীজাতিকে শুনাইতে পারে না?

(২)

প্রাচীন ভারতীয় মানমন্দির

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম. এ.

বেধশালা বা মানমন্দির (Astronomical Observatory) ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্‌গণ গ্রহগণিতে তৎকালে যে অত্যুচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বহুকালব্যাপী গ্রহবেধ ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ কি প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহসন্দর্শন দ্বারা গ্রহ-গতির তত্বসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এখন বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত। জ্যোতির্বিদ্‌-শিরোমণি আর্যভটের গ্রন্থেও কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর্যভটের পরেও কয়েকবার গ্রহগতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং

তৎকালে পূর্ব হইতে গণিতসময়ে গ্রহণাদি প্রায়ই সংঘটিত হইত। ইহাতে মনে হয় তৎকালে নিরন্তর বেধযন্ত্র দ্বারা গ্রহাবস্থান পরীক্ষিত হইত। হয়ত বর্তমান কালের ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ কোন প্রকার মানমন্দির তৎকালে ছিল না, কিন্তু অতি সরল যে সকল যন্ত্র ছিল তাহা দ্বারাই তাঁহাদের ধী-যন্ত্র প্রয়োগে বিশুদ্ধ গ্রহাবস্থান তাঁহারা অবগত হইতে পারিতেন। বেধ-যন্ত্রের অপূর্ণতা আর্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ ধী-যন্ত্র দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের অসাধারণ ধী-শক্তিই সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করিয়া দিত।

বর্তমানে দিল্লী, কাশী, মথুরা, জয়পুর ও উজ্জয়িনীতে ভারতীয় পদ্ধতিতে গঠিত কয়েকটি মানমন্দিরের অবশেষ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার কোনটিই আর্যভটাদি সুপরিচিত জ্যোতির্বিদ্‌গণের সমকালিক নহে। ইহার সকলগুলিই মুসলমান রাজত্বকালে মহারাজ জয়সিংহ দ্বারা পরিকল্পিত ও নির্মিত। মহারাজ জয়সিংহ ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অম্বররাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আওরঙ্গজেব তৎকালে দিল্লীশ্বর ছিলেন। জয়সিংহ বিশেষ বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন এবং নিজে বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতের গৌরবস্থল ছিলেন। তৎকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্যোতিষিক জ্ঞান আহরণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মানুয়েল নামক এক পর্তুগীজ পাদরির সহিত কয়েকজন পণ্ডিতকে ইউরোপে প্রেরণ করেন, এবং কথিত হয় যে, তিনি মহম্মদ সরিফ নামক এক ব্যক্তিকে দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী দেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি কয়েকখানি ইউরোপীয় গ্রন্থের (টলেমি প্রভৃতির) সংস্কৃত অনুবাদ করেন। ইউক্লিডের গ্রন্থ সম্বন্ধে ও লগারিথম্ (Logarithm) সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। জয়সিংহের প্রধান জ্যোতির্বিদ জগন্নাথ গণকদিগের সুবিধার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত সম্রাট * নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথ বলিয়াছেন যে, জয়সিংহ তাঁহার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নব নব কৌশলে বেধ-যন্ত্র সকল নির্মাণ করিতেন। তৎকালে মানমন্দিরের জন্য নিম্নোক্ত যন্ত্র সকল আবশ্যক হইত :— ১। নাড়ী যন্ত্র (সূর্যঘড়ি), ২। গোল যন্ত্র (সুবৃহৎ গোলক), ৩। দিগংশ যন্ত্র (ক্ষিতিজবৃত্তে দিগংশ পরিমাপক যন্ত্র), ৪। দক্ষিণোবৃত্তি যন্ত্র, ৫। বৃত্ত ষষ্ঠাংশক, ৬। সম্রাট যন্ত্র, ৭। জয় প্রকাশ। ইহা ব্যতীত আরও বহু প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার তৎকালে ছিল। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে সম্রাট যন্ত্র ও জয়প্রকাশই সুবৃহৎ ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

জয়সিংহ যে সকল গণনা করিয়াছিলেন ও পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়াছে। তিনি বার্ষিক অয়নগতি ৫১·৬″ বিকলা নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্তের অন্তর্গত কোণের পরিমাপ করিয়াছিলেন ২৩°২৮′। ইহা প্রকৃত মানের অতি সন্নিহিত।

জয়সিংহের নির্মিত মানমন্দিরগুলি বর্তমানে অনাদর বশতঃ প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার

* ইহার অন্য নাম সিদ্ধান্তসারকৌস্তুভ।

বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। তবে উজ্জয়িনীর মানমন্দিরে কিছু কিছু কাজ হইয়া থাকে। সদাশিব আপ্তে (অধুনা স্বর্গগত ?) মহাশয় অনেকদিন উক্ত মানমন্দিরের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। এই মানমন্দিরগুলির পুনরায় সংস্কার সাধন করিতে পারিলে দেশীয় পঞ্জিকার সংস্কার কার্য, আশা করি, কিছু সহজসাধ্য হইতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় বেধশালার সামান্য পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইল। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(৩)

স্মৃতির গবেষণায় যোগেন্দ্র পুরস্কারের স্থান

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এম্. এ, বি. এল., কাব্যতীর্থ

আইন ও স্মৃতিশাস্ত্রের গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তিন প্রকার বার্ষিক পুরস্কার আছে, যথা ঠাকুর আইন বক্তৃতা, অনাথনাথ গবেষণা পুরস্কার ও যোগেন্দ্র গবেষণা পুরস্কার। প্রথমটির আর্থিক মূল্য দশ হাজার টাকা, দ্বিতীয়টির হাজার টাকা, ও তৃতীয়টির সাড়ে তিন শত টাকা। প্রথমটির সৃষ্টি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে, দ্বিতীয়টির ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ হইতে এবং তৃতীয়টির ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ হইতে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, টাকার দিক্ দিয়া যোগেন্দ্র পুরস্কার সর্বকনিষ্ঠ হইলেও বয়স অর্থাৎ সৃষ্টির সময়ের দিক্ দিয়া ইহা মধ্যম। ইহার স্রষ্টা পরলোকগত বিশ্ববিদ্যালয়-সভ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়।

ঠাকুর আইন বক্তৃতা প্রথমে ইংরেজীতে প্রদত্ত হইয়া পরে ইংরেজী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অনাথনাথ পুরস্কারের প্রবন্ধও ইংরেজীতেই লিখিত হয়। কিন্তু পুরস্কার স্রষ্টার নির্দেশ অনুসারে, যোগেন্দ্র পুরস্কারের প্রবন্ধ ইংরেজী বা বাঙ্গলায় লিখিত হইয়া থাকে। ঠাকুর-আইন-বক্তৃতা ও অনাথনাথ পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয় সমগ্র ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববিধ আইনের মধ্য হইতে নির্ধারিত হয়। কিন্তু যোগেন্দ্র পুরস্কারের উপজীব্য বিষয় মাত্র হিন্দুর সমগ্র ব্যবহার-শাস্ত্র। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইনের ন্যায় অধুনা অপ্রচলিত হিন্দু আইনও ইহার অন্তর্ভুক্ত। "বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইন" বলিতে মাত্র হিন্দুর বিবাহ, দত্তক ও উত্তরাধিকার বুঝায়। এবং "অধুনা অপ্রচলিত হিন্দু আইন" বলিতে হিন্দুর দণ্ডবিধি, সাক্ষ্যবিধি প্রভৃতি বুঝায়।

এই দীর্ঘ ৩৮ বৎসরের মধ্যে (১৯০২-১৯৩৯) মাত্র নিম্নলিখিত নয় জন পণ্ডিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়া এই যোগেন্দ্র পুরস্কার পাইয়াছেন :—

খ্রীষ্টাব্দ	পণ্ডিতের নাম	বিষয়	ভাষা
১৯০৯—	(১) রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ	—দত্তকের মূলনীতি	—বাঙ্গালা
	(২) দুর্বশূল শ্রীরাম শাস্ত্রী	— ,, ,,	—ইংরেজী
	(৩) এম্. সুব্রমণ্যন্	—হিন্দু আইনে অসতীত্বের আইনগত পরিণাম	—ইংরেজী
১৯২৬—	(৪) মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি	—প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি	—বাঙ্গালা
১৯২৭—	(৫) মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ	—প্রাচীন ভারতে সাক্ষ্যবিধি	— ,,
	(৬) ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর	— ,, ,, ,,	—ইংরেজী
১৯৩৩—	(৭) বটুকনাথ ভট্টাচার্য	—কলিবর্জ্য	—ইংরেজী
১৯৩৪—	(৮) নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	—হিন্দু স্ত্রীধনাধিকার	—বাঙ্গালা
১৯৩৫—	(৯) কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী	—হিন্দুবিবাহ	—ইংরেজী

ইহাদের মধ্যে "কলিবর্জ্য" ও "হিন্দুবিবাহ" ব্যতীত সব প্রবন্ধগুলিই প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোনগুলি নিজেরাই ছাপাইয়াছেন এবং অন্যত্র মুদ্রিত হইলে তাঁহারা সেগুলির মুদ্রণ-ব্যয় বহন করিয়াছেন।

উপর্যুক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পুরস্কারস্রষ্টা যোগেন্দ্রচন্দ্রের উদ্দেশ্য এই দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসরে, পূর্ণভাবে না হউক, আংশিকভাবেও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ বিবাহ, দত্তক, অসতীত্ব ও স্ত্রীধনাধিকারের প্রবন্ধগুলি "বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দু আইনেরই" অংশচতুষ্টয় এবং দণ্ডনীতি, সাক্ষ্যবিধি ও কলিবর্জ্য "অধুনা অপ্রচলিত হিন্দু আইনেরই" অংশবিশেষ। দুই এক বৎসর প্রেরিত প্রবন্ধ মনোনীত না হইলেও, আটত্রিশ বৎসরে মাত্র নয়টি প্রবন্ধ মনোনীত হওয়ার আর একটি কারণ আছে। সেটি হইতেছে এই যে, এই পুরস্কারের প্রবন্ধ পুরস্কারস্রষ্টার নির্দ্দেশ অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতদের দ্বারা লেখনীয় বলিয়া এবং ঐ পণ্ডিতগণ প্রায়ই ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ বলিয়া, সরকারী "কলিকাতা গেজেটে" ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত এই পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের শেষ তারিখের বিজ্ঞাপন পল্লীবাসী ঐ পণ্ডিতগণের নিকট গিয়া পৌঁছে না। সেইজন্য মফঃস্বলে অভিজ্ঞ পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও, মাত্র কলিকাতা সহর ও তাহার উপকণ্ঠের পণ্ডিতগণই এই প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন এবং অধিকাংশ বৎসরেই এই প্রবন্ধ লিখিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় না। এই পুরস্কারের বিষয়ের ও প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের শেষ তারিখের বিজ্ঞাপন বাঙ্গলা সংবাদপত্রাদিতে বাঙ্গলাভাষায় প্রকাশের জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিতেছি।

আমাদের কথা

গত সংখ্যায় আমরা ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের জ্যোতিষ বিভাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমানে এবিষয়ের বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রদত্ত হইতেছে।

(১) যাঁহারা ইন্‌স্টিটিউটের সভ্য নহেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মাত্র জ্যোতিষ বিভাগের সভ্য হইতে পারেন। বার্ষিক চাঁদা ৩৲ অগ্রিম দেয়। জানুয়ারী মাস হইতে বৎসর গণনা করা হইবে। বার্ষিক বা যাণ্মাসিক চাঁদা অগ্রিম দেয়।

(২) জ্যোতিষ-বিভাগের সভ্যগণ ইন্‌স্টিটিউট্ লাইব্রেরীর জ্যোতিষসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে পারিবেন বা ইচ্ছা করিলে গ্রন্থের জন্য মূল্য জমা রাখিয়া তাহা বাড়ীতেও লইয়া যাইতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষ সংক্রান্ত যে সব প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবে, সেগুলি সভ্যগণ বিনামূল্যে পাইবেন।

(৩) ইন্‌স্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থাবলী সভ্যগণের নিকট শতকরা ২৫৲ টাকা হ্রাসে বিক্রয় করা হইবে।

(৪) এই বিভাগে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি সভ্য তালিকাভুক্ত হইলে জ্যোতিষ বিষয়ক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। উক্ত পত্রিকা সভ্যগণ অর্ধমূল্যে পাইবেন। বর্তমানে জ্যোতিষ বিষয়ক যে সকল পত্রিকা ইন্‌স্টিটিউটে আসিয়া থাকে তাহা ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিও লইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৫) মাসে অন্ততঃ একটি করিয়া সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং তাহাতে জ্যোতিষের আলোচনা বা প্রবন্ধ পঠিত হইবে। মধ্যে মধ্যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্বারা গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

যাঁহারা জ্যোতিষ-বিভাগের কার্যকরী সমিতির সদস্য হইবেন, তাঁহাদিগকে ইন্‌স্টি-টিউটের অন্ততঃ সাধারণ সভ্য হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী জ্যোতিষ-বিভাগের সম্পাদকরূপে কার্য করিতেছেন।

যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শানুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ মানমন্দির স্থাপিত হয় এই জ্যোতিষ বিভাগ তাহারও চেষ্টা করিবে।

আমরা জ্যোতিষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে এই সকলকার্যে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছি।

* * * *

মান্দ্রাজের উপকণ্ঠ আদিয়ারে (Adyar) থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীর (Theosophical Society) প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। ইহার পুস্তকাগার বহু মূল্যবান্। সম্প্রতি এই সমিতি

Ancient Indian Civilisation Series (প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূলক গ্রন্থমালা) নামে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে ভারতীয় জ্ঞান ও কৃষ্টির প্রচার উদ্দেশ্যে বর্তমানে ৩০ খণ্ডে কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য ও বিবরণীপাঠে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইতেছি। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই স্ব স্ব গৃহে একটী আদর্শ গ্রন্থের পুস্তকাগার (Home Libary) স্থাপন করিতে পারেন সেই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশের একান্ত আবশ্যকতা আছে।

* * * *

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরিচালনা ও পরিকল্পনায় 'বিশ্বভারতী' জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষা-পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্তমানে বাংলা ভাষা কেবল উপন্যাস, গল্প ও কবিতায় পরিপুষ্ট হইতেছে ; যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার হয় তাহাও এই সব গ্রন্থাবলীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আশাকরি এই কার্যে প্রত্যেক বাঙালীই আনন্দিত হইবেন।

* * * *

ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করা, প্রচার করা, অপ্রকাশিত বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করা এবং ভারতীয় জ্ঞান ও কৃষ্টির সর্ববিষয়ে গবেষণা করা। কিন্তু বাংলাভাষায় সাধারণ পাঠকদিগের জন্য সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের, ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের, ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টিমূলক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে। সেজন্য ইহারই তত্ত্বাবধানে এই কার্যের জন্য ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণের জন্য আদর্শ পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রীভারতী পাবলিসিং কোং নামক একটি পুস্তকপ্রকাশ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রতি বিষয়ের পুস্তকের ৩ খানি করিয়া খণ্ড থাকিবে—১ম খণ্ডখানি প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, ২য় খণ্ড মধ্য শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্য, ও ৩য় খণ্ড উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রচিত হইবে। সাধারণ পাঠক এই ৩ শ্রেণীর পুস্তকেই বিশেষ লাভবান হইবেন। এবিষয়ে আমরা সকলেরই সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করি।

* * * *

৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের গত বাৎসরিক উৎসবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বর্তমানে পৃথিবীর দানবীয় ধ্বংসলীলায় প্রত্যেক নরনারীরই মনে যে বেদনা ও দুঃখ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহারই একটী ছবি তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গকে তাঁহার এই বাণী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পুস্তক সমালোচনা

বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ প্রণীত ও কলিকাতা বুক হাউস্ হইতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল বি. এ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩২+৫২৭। মূল্য—৪৲ টাকা।

গ্রন্থকার বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি এই পুস্তক রচনার সম্বন্ধে তাঁহার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. ও অনার্স শ্রেণীতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যাপনা করিতে তিনি যে সমস্ত উপকরণ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মূলতঃ তাহারই কতকাংশের উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহাতে মধ্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। বাংলা মঙ্গল সাহিত্য সম্বন্ধে এই সকল পুস্তকের স্থানে স্থানে সামান্য মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার তাঁহার আলোচ্য সুবৃহৎ পুস্তকখানি রচনা করিয়া একটী চির-অনুভূত অভাবের অনেকটা পূরণ করিয়াছেন। বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনা একটী কঠিন ব্যাপার। এই কাব্যগুলি বাংলার নিজস্ব জিনিস। এইগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মাচার ও দেবতা লইয়া রচিত; ইহাদের সহিত পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের আলোচনা দ্বারা বাংলার মধ্য যুগের একটী সামাজিক ইতিহাসের চিত্র কল্পনা করিতে পারা যায়; গ্রন্থকারের বর্তমান পুস্তক রচনার ইহাও একটী উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সমস্ত কাব্যগুলির ইতিহাস ত দূরের কথা ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ আজ পর্যন্ত আমরা পাইনা। এই সকল মঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে আমরা দুই একটী মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত যাত্রা ও কবিওয়ালাদের গানের মধ্য দিয়া এবং কতকগুলি লৌকিক ছড়া ও প্রথার দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি। অনেক সময় মনে কৌতূহল জন্মিয়াছে বটে যে এই সমস্ত গানের বা প্রথার মূল কোথায়, কিন্তু এই কৌতূহল নিরসনের কোনও উপায় আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। আলোচ্য পুস্তক খানি পড়িয়া আমাদের এই কৌতূহলের অনেকটা সন্তোষ বিধান হইয়াছে। "ধান ভানতে শিবের গীত" এই সামান্য একটি প্রবাদ বাক্য আমরা জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছি এবং ইহার একটী সুন্দর অর্থও করিয়াছি, কিন্তু এই প্রবচনটীর উদ্ভব কোথা হইতে হইল, তাহার ইতিহাস আমরা খুঁজিয়া পাইনা। আজ পর্যন্ত এই শিবের গীত আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু এই সামান্য প্রবচনের দ্বারা আমরা এই আভাস পাইতে পারি যে এক সময়ে শৈব সাহিত্যের বা শিব মঙ্গলের এরূপ প্রচলন ছিল যে বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত তাহাদের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যেও শিবের গান করিয়া থাকিত। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে মনসা মঙ্গল বা মনসার ভাসান আমাদের নিকট সুপরিচিত। মনসা মঙ্গলের বর্ণিত বিষয় আমাদের জানা আছে, কিন্তু এ দেশে মনসা পূজার প্রবর্তন কিরূপে হইল তাহার ঐতিহাসিকতা আমাদের জানা ছিল না। গ্রন্থকার সেই বিষয়ে তাঁহার গবেষণার

ফলাফল গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থখানিকে আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান করিয়াছেন। বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে প্রচলিত ধর্ম পূজায় বৌদ্ধপ্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার প্রথম পরিচয় আমরা মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "Discovery of Living Buddhism in Bengal" নামক ইংরেজি পুস্তিকা হইতে পাইয়াছি, গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে সেই সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকমধ্যে গ্রন্থকার মঙ্গলচণ্ডীর ইতিহাস, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকা মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, রায় মঙ্গল, বাসুলী মঙ্গল প্রভৃতি আমাদের জ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত সমস্ত মঙ্গল কাব্যেরই পরিচয় দিয়া সেই সঙ্গে ঐ সকল দেবতার পূজার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক আলোচনা করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে, এম্-এ, বি-এল্, ডি-লিট মহাশয় পুস্তকখানির একটী 'পরিচায়িকা' লিখিয়া এবং অধ্যাপক ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্-এ, বি-এল্, মহাশয় 'প্রবেশক' লিখিয়া পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁহার প্রবেশকের শেষে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান অংশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চান, তাঁহাদের নিকট পুস্তকখানি উপাদেয় ও মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে।" আমরাও তাঁহার এই মতের সহিত একমত হইয়া তাঁহারই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছি।

ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীল রচনাভঙ্গী পুস্তকখানিকে বেশ সুখপাঠ্য করিয়াছে।

শ্রীযুগল কিশোর পাল

The Calcutta Municipal Gazette—Fifteenth Anniversary Number—মূল্য আটআনা।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পঞ্চদশ বার্ষিক সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাওয়া গেল। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখকগণের লিখিত প্রবন্ধ সম্বলিত এই বার্ষিক সংখ্যাটী মিউনিসিপ্যাল গেজেটের পূর্বখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে এবং সেই সঙ্গে মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যে বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া পত্রিকাখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতেছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস ইত্যাদি নানাবিধ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় পত্রিকাখানি শুধু কলিকাতাবাসীর কেন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেরই পঠিতব্য।

শ্রীগৌরচন্দ্র সেন

শ্রীসীতারামনাম-বৈভব—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল্ কর্তৃক অনূদিত ও ১২৭নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

অযোধ্যার স্বামী শ্রীযুগলানন্দ শরণ মহারাজ "শ্রীসীতারাম নাম প্রতাপ-প্রকাশ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদির সহিত শ্রীরামনামমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। স্বামীজি মহারাজ ঐসব শাস্ত্রোদ্ধৃত অংশগুলির হিন্দীভাষায় অনুবাদ করেন। বর্তমান গ্রন্থকার ঐগুলিই মূল সংস্কৃত সমেত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের প্রচার কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

বেদ

১। কৃষ্ণ যজুর্বেদ প্রকরণ কৌমুদী—প্রথম খণ্ড। ed. by M. Vaman Shastri Kinjavadekar and Ram Dikshit Hangal, wiih Eng. Trans. by Dr. S. M. Katre.—পুণা।

২। L' Agnihotra. Description de L' Agnihotra dans le retuel Vediqne by P. E. Dumont. D' apres us Srautasutras. de Kātyāyana (Yajur deva Blanc); Apastamba, Hiranyakesi, Baudhāyana, Manu (Yajurveda Novi) Aśvalāyana; Saṅkhyayāna (Rig Veda) et-la Vaitāna sutra (Athar vaveda). Baltimore.

দর্শন ও ধর্ম

৩। অপরোক্ষানুভূতিঃ or Self-realisation of Sankarācārya—স্বামী বিমুক্তানন্দ। কলিকাতা।

৪। Studies in Tantras—Dr. P. C. Bagchi, কলিকাতা।

৫। হিমাংশুবিজয়জীনোলেখো—শ্রীবিদ্যা বিনয়জী। উজ্জয়িনী।

প্রত্নতত্ত্ব

৬। A quide to Rajgiri—Mohammad Hamid Kuraishi & A. Ghosh. দিল্লী

সাহিত্য

৭। দয়ানন্দ-দিগ্বিজয়ম্—with Hindi translation by Pt Medhavratācārya. বরোদা।

৮। গঙ্গালহরী—of Pandit Jagannath—D. G. Padhye.

৯। ধ্বন্যালোকঃ with Sanskrit Comen. by—
Sri Ananda Misra, পুরী।

জ্যোতিষ

১০। স্কান্দশারীরকম্—with Sanskrit Commentary.
ed. by K. Sambasiva Sastri.

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কর্তৃক সংকলিত

বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)

১৪শ বর্ষ, ১৩২১।

চন্দ্রের জন্মকথা—শ্রীজগদানন্দ রায়।

সাধারণের জন্য চন্দ্র সম্বন্ধে একটী তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সাহিত্য বলিতে কি বুঝায় এবং সাহিত্যকে কিরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে লেখক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বৈদেশিক সাহিত্যের আলোচনা এবং ঐ সমস্ত দেশে কিরূপে উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ইহাতে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শব্দ প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

চিত্র-পরিচয়—প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ও 'ভারতীতে' প্রকাশিত 'পরিচয়' প্রবন্ধের সমালোচনা। ইহাতে ভারতের প্রাচীন আলেখ্য-বিধানের সহিত চীনের চিত্র-কলার তুলনা আছে। অবনীবাবুর মতে আলেখ্যের ছয় অঙ্গ যথা—(১) রূপভেদ, (২) প্রমাণ (৩) ভাব, (৪) লাবণ্য যোজন (৫) সাদৃশ্য (৬) বর্ণিকা ভঙ্গ।

বাংলায় বৈদেশিক শব্দ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বাংলাভাষায় যে সমস্ত বৈদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হয়, ইহাতে তাহাদের বর্ণানুক্রমিক একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

রসের রূপ—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ইহাতে নায়ক-নায়িকার স্বরূপ বিচার ও শ্রেণী বিভাগ আছে।

কালিদাসের কাল—শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কালিদাসের কাল-নির্ণয় একটী কঠিন ব্যাপার। এবিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করেন। লেখক বলিতেছেন, 'জ্যোতির্বিদাভরণ' কালিদাসের নামে প্রচলিত। ইহা কলিযুগের ৩০৬৮ অব্দে অর্থাৎ খ্রীস্ট জন্মের ৩৩ বৎসর পূর্বে লিখিত বলিয়া প্রকাশ। এই গ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের ও তাঁহার নবরত্নের পরিচয় আছে। কিন্তু এই পুস্তকের প্রামাণিকতা সর্ববাদী সম্মত নহে।

বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও নবরত্নের উল্লেখ আছে।

অধ্যাপক কারন্ সাহেবের মতে বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতিষী ছিলেন। তাহা হইলে কালিদাসও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এমতও প্রামাণ্যরূপে ধরা যায় না।

The Indian Antiquary, Vol 111, 1874.

The Date of Sri Harsha—P. N. Purnaiya, B. A. Attache, Mysore Commission, Bangalore. শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। Dr. Buhler দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ সময়ে তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্ধারিত করেন। তিনি রাজশেখরের প্রবন্ধকোষের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত মত প্রচার করেন। কিন্তু Kasinath Trimbak Telang এই মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন, শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল আরও দুইশত বৎসর পূর্বে। বর্তমান প্রবন্ধকার বলেন শ্রীহর্ষের জন্মকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে। নৈষধচরিত ব্যতীত শ্রীহর্ষের লিখিত আরও ৭ খানি পুস্তক আছে—(১) বিজয়প্রশস্তি (২) খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য (৩) গৌড়োর্বিশীকুল প্রশস্তি (৪) অর্ণববর্ণণ (৫) ছন্দঃপ্রশস্তি (৬) শিবশক্তিসিদ্ধি বা শিবশক্তিসাধন (৭) সাহসাঙ্কচরিত।

Note on Paundha-Vardhana—E. Vesey Westmacott.

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং যে পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সেই পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্য বলিতে বর্তমানে কোন্‌স্থানকে বুঝায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা আছে। Mr. Fergusson পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহার পশ্চিমদিকে কুশীনদ, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং দক্ষিণে গঙ্গানদী। এই সীমাবদ্ধ স্থানটী বর্তমানে দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, পূর্ণিয়ার কিয়দংশ ও রাজসাহীর কিয়দংশ বুঝায়। প্রবন্ধকারের মতে 'আইন আকবরীতে' উল্লিখিত আকবর বাদশাহের যে 'পিঞ্জর' বা 'পঞ্জর' সরকার ছিল, এই 'পঞ্জর' নাম পৌণ্ড্র হইতে উৎপন্ন এবং বর্ধনও উহার নিকটবর্তী একটী স্থানের নাম। এই দুইটী স্থানই দিনাজপুরের মধ্যে অবস্থিত। অতএব দিনাজপুরের অধিকাংশই পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। বাংলার প্রাচীন মুসলমান রাজা, গিয়াসুদ্দিন ফিরোজপুর বা ফিরোজা-বাদে বাংলার রাজধানী স্থাপিত করেন, সেইস্থানের নাম ছিল পংহুয়া (Ponrowa), ইহা বোধ হয় পৌণ্ড্র নামেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

Prof. H. Kern's dissertation on the Era of Buddha and the Asoka Inscriptions—J. Muir, D.C.L, LL.D., Ph.D., Edinburgh.

দক্ষিণাত্যের বৌদ্ধগণ বলেন যে খ্রী° পূ° ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধদেব মহানির্বাণ লাভ করেন, Prof. Kern-এর মতে ইহাই বিশ্বাসযোগ্য তারিখ বলিয়া বিবেচিত। Turnour এবং Lessen বলেন, রাজা চন্দ্রগুপ্তের কাল লইয়া বুদ্ধের মহানির্বাণের সময় নির্ধারণ করিতে গেলে পূর্বোক্ত গণনায় ৬০ বৎসর ভুল থাকিয়া যায়। অশোকের Inscription সকল পরীক্ষা করিয়া উক্ত তারিখের কোন্‌টি সঠিক সেই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

সাময়িক সাহিত্য, পৌষ—১৩৪৬

সাহিত্য

প্রবাসী—"চণ্ডীদাস-চরিতে"র পুঁথি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি।

,, হিন্দুসমাজে নারীর স্থান—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

ভারতবর্ষ—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা মহাকাব্যের আন্তর রূপ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী তর্কতীর্থ

,, আধুনিক জগত ও হিন্দুজাতি—অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি এস্-সি, এফ্-আর-এস্.

বঙ্গশ্রী—শিবসঙ্কীর্তন, চণ্ডিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল—শ্রীত্রিদিব নাথ রায়

উদয়াচল—রবীন্দ্র কাব্যে অতীন্দ্রিয়তা—শ্রীবেলা সোম।

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—বেদ ও বৈদিক শাখা—ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম্-এ, পি-এইচ-ডি. পি-আর-এস্. কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

,, গীতা ও বাইবেল—শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান সম্বন্ধে বক্তব্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

পরিচয়—পরলোকে 'তর-তম'—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উদ্বোধন—ভাগবত—স্বামী গিরিজানন্দ।

,, পঞ্চদশী—পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষদের আখ্যায়িকা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, শ্রীচণ্ডী ও বেদান্ত—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী।

,, ভগবান্ ও ভজন—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গশ্রী—শ্রীরাধার প্রাচীনত্ব—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উদয়াচল—শ্রীদুর্গার সিদ্ধ মহামন্ত্র—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এইচ্-ডি।

পরিচয়—গ্রীক্ সমাজ ব্যবস্থার ভূমিকা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ

প্রবাসী—খাদ্য ও পুষ্টি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

,, বিদ্যাসাগর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষ—বাংলার খনিজসম্পদ ও বৈজ্ঞানিক শিল্প—

অধ্যাপক শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

,, বাংলার শিল্পবাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা—শ্রীসুনীলকুমার সেন এম্-এ।

,, বিজ্ঞানে আকস্মিকতা—শ্রীভবেশচন্দ্র রায় এম্-এস্-সি ।

উদ্বোধন—জাতীয়তায় স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীবীরেশ্বর পাল, সাহিত্যরত্ন।

ব্রহ্মবিদ্যা—অভিব্যক্তিবাদ—শ্রীতুলসীদাস কর।

উদয়াচল—প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য-বাদিতা – শ্রীমোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ,বি-এল্

সাময়িক সংবাদ

নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—বড়দিনের অবকাশে রেঙ্গুণে নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তৃগণ কর্মীব্যক্তি। তাঁহারা প্রবাসে থাকিয়া বঙ্গবাণীর সেবাসূত্রে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসার সাধন করিতেছেন, জাতিকে বড় করিতেছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন শিক্ষক সম্মেলন—২১শে জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশন শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশনে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা—গত ৭ই মাঘ রবিবার হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে দেবানন্দপুরে যে মহতী সভার অধিবেশন হয় তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে একটী স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

নিখিল ভারত ছাত্রী সম্মেলন—নিখিল ভারত ছাত্রী সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু নারীর দায়িত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব মূল্যবান্। তিনি বলিয়াছেন—ছেলেবয়েসের শিক্ষার ভার নেবার যোগ্যতা মেয়েদেরই সব চেয়ে বেশী, কারণ শিশুরা মেয়েদেরই কোলে পিঠে মানুষ হয়।

শোক সংবাদ

পরলোকে সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়—'ভারতবর্ষের' অন্যতম সম্পাদক সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্য একজন অকৃত্রিম সেবক হারাইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই নিদারুণ শোকে তাঁহার শোকার্ত পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। একমাত্র ভগবানই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারেন।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ | সপ্তম সংখ্যা

সংসার

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি *

মনুষ্যগণ পুত্র-পরিজনাদিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, গৃহস্থালীর তৈজসপত্রসহ যে স্থানে গৃহাদি নির্মাণ করতঃ নিয়ত বাস করে, চলিত ভাষায় তাহার নাম সংসার! জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের সংসার স্বতন্ত্র। আবার সেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংসারগুলি লইয়া যে সমষ্টি-সংসার রচিত হয়, তাহার নাম বিরাট-সংসার। বিরাট নামক প্রজাপতি বা ব্রহ্মার সংসারের নাম বিরাট-সংসার বা সমষ্টি-সংসার অথবা মর্তভূমি। আর মনুষ্যগণের ব্যক্তিগত সংসারের নাম হইল ব্যষ্টি-সংসার। আমি এক্ষণে সমষ্টি-সংসারের বিবরণ বিবৃত না করিয়া, ব্যষ্টি সংসারের কথাই আলোচনা করিব, যেহেতু ব্যষ্টি সংসারের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনায় সংসারের যে নিগূঢ়তত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়, তাহা অতীব রহস্যময়। পৌরাণিকেরা বলেন, 'সং'—সার যেখানে, তাহাই সংসার। আমরা দেখিতে পাই অভিনয়ে একজন লোক হনুমান সাজিয়া আসিল;—বাস্তবিক সকলেই মনে মনে জানিতেছি যে, এটা প্রকৃত হনুমান নয়, একটা মানুষ হনুমান সাজিয়া আসিয়াছে; এরূপ জানা থাকা সত্ত্বেও যে আমরা উহাকে হনুমান মনে করিয়া, তাহার হাবভাব অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া, হনুমান বলিয়া মানিয়া লই,—এরূপ ব্যবহারের নাম 'সং'—অর্থাৎ মিথ্যা। যে জায়গায় সমস্ত বিষয়ই ঐরূপ 'সং'-সদৃশ,—সেই ক্ষেত্রের নাম 'সংসার'।

আমরা সকলেই মাতৃকুক্ষী হইতে নির্গত হইয়া এহেন সংসারের আতিথ্য গ্রহণ করি। এবং ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত খেলনা, চুষি প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত পরিচিত হইতে অভ্যস্ত হই। ক্রমশঃ মাতা, পিতা, ভগ্নী, ভ্রাতা প্রভৃতিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়, এবং কালে পাড়া প্রতিবেশী লোক জন, এবং গ্রামবাসী অপরাপর সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত লোকের

---

* শ্রীগোবর্ধন পীঠাধীন শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী১০৮ স্বামী শ্রীশঙ্করতীর্থ যতি মহারাজ।

সহিত পরিচয় ঘটে। ক্রমশঃ তাহা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সংসারের প্রতি দৃঢ় মমতায় আবদ্ধ হইয়া পড়ি। শৈশবে শিক্ষার সময়ে, আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, আমার ভগিনী ইত্যাদির সহিত ক্রমে আমার মন, নিয়ত অভ্যাসের ফলে, একীভূত হইয়া যায়। তখন মাতা বা পিতা অথবা ভগ্নী বা ভ্রাতার মধ্যে কাহারও অভাব ঘটিলে, তাহাদের জন্য মনে দুর্বিসহ পরিতাপ ঘটে; সেই পরিতাপের মূলে থাকে আমার আমিত্বের কিয়দংশের অপচয়। পিতা ছিলেন,—পিতার অভাবে, আমাকে আমি এখন নিঃসহায় নিরলম্বন দেখিতেছি; ভ্রাতা ছিলেন,—ভ্রাতার অভাবে আমি আমাকে বলহীন দেখিতেছি; মাতার অভাবে, আমি আমাকে সম্পূর্ণ আশ্রয়শূন্য বলিয়া মনে করিতেছি। এরূপে আমাদের মমতার একটি জিনিষ হারাইলে, বা নষ্ট হইলে, আমরা শোকে দুঃখে একান্ত অধীর হইয়া পড়ি। কেন?—না, ঐ সকল সম্পর্কিত ব্যক্তির সহিত আমার আমিত্বের যতটুকু বিস্তৃতি ছিল, সেই বিস্তৃতির সঙ্কোচন হয় বলিয়া। আমার আমিত্ব কেবল আমার এই সীমাবদ্ধ দেহটি লইয়া নহে। দেহটি ত আমি আছিই, তদতিরিক্ত, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, মান, যশঃ, ইত্যাদি যতকিছু পদার্থ সংসারের প্রয়োজনে আসে, তত্তাবৎ সমবেত পদার্থেরও অন্তরে বাহিরে আমি। ধনের অপচয় হইল, তখন বলি, হায়, হত হইলাম; পুত্রের বিয়োগ হইল, তখন বলি, হায় এতদিনে আমি মরিলাম, মানের হানি হইল, জীবনে ধিক্ দিয়া আমি ম্রিয়মান্ হই। এইরূপে বিশেষ বিচার অবলম্বনে দেখা যায় যে,—আমি কেবল এই সাড়ে তিন হাত শরীরটা নহি—শরীরের বাহিরের যতকিছু মমতার পদার্থ, তাহাও আমি। এই যে ব্যাপক আমি, ইহাই আমার সংসারের জীবন্ত মূর্তি; এবং সংসারের ইহাই স্বরূপ। প্রত্যেক মনুষ্যহৃদয় এরূপ ব্যাপক সংসারের এক একটি উপবন বিশেষ। অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্য ওতপ্রোত ভাবে সংসারের সহিত দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং সংসারকে বাদ দিলে সংসারী মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকে না।

উপরের কথাগুলি আলোচনা করিয়া ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, আমিত্বের অতি বিস্তৃতির নাম 'সংসার'; আর আমিত্বের একান্ত সঙ্কোচের নাম 'অসংসার।' আমিত্বের একান্ত সঙ্কোচ যে কিরূপে করিতে হয়, এবং কেন করিতে হয়, সংসারী যাহারা, তাহা সহজে বুঝিবে না। সুতরাং ইহা তাহাদের কাছে একরূপ প্রহেলিকাবৎ অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে।

সাংসারিক মনুষ্য বলিয়া থাকে,—আমি সংসারী, আমার আমিত্বের অতি বিস্তৃতিই আমার স্বাভাবিক ব্যবহার, আমি তাহার সঙ্কোচ করিয়া থাকিব কি প্রকারে? এরূপ নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়া আমার আমিত্বের একান্ত সঙ্কোচের পথে বাধা দেয়। কাজেই ঘর গৃহস্থালী ছাড়িয়া দিয়া, কেনই বা আমি আমার আমিত্বের প্রসারণ ক্ষমতা খর্ব করিব? আর তাহাতে আমার প্রয়োজনই বা কি? এবংবিধ নানারূপ যুক্তি আসিয়া

আমার আমিত্বের প্রসারণ জন্যই আমাকে উদ্‌যুক্ত করে। সুতরাং আর আমার আমিত্বের সংকোচন জন্য প্রবৃত্তির উন্মেষ হয় না। ইহাই সাংসারিকের কথা।

মর্ত্যলোকবাসী গৃহস্থ যাহারা, তাহাদের ঐরূপ যুক্তি খণ্ডন জন্য পৌরাণিকগণ এইরূপ আখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। বলিয়া রাখা ভাল,—পুরাণগুলি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের ন্যায় নহে। আমাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ রহিয়াছে,—পুরাণেতিহাস তেমন সত্যমিথ্যার মিশ্রণে তৈয়ার হয় নাই। মন্ত্রার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ, আপনাপন তপস্যাসম্ভূত বলদ্বারা ত্রৈকালিক ঘটনাগুলি বর্তমানের ন্যায় হৃদয়ে প্রতিফলিত দেখিয়া তাহাই শিষ্যদিগকে অভ্যাস করাইতেন। মহাভারত শান্তিপর্বের ৩৪০ অধ্যায়ে তেমন বর্ণনা রহিয়াছে। তবে, এক্ষণে—কলিকালে, কোনও কোনও পুরাণে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে—যেমন শৈবদিগকে জব্দ করার মতলবে বৈষ্ণবেরা, আবার বৈষ্ণবদিগকে পরাভূত করার জন্য শাক্তগণ কর্তৃক—নানা কৃত্রিম কথা পুরাণের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া পুরাণগুলিকে অপুরাণ অর্থাৎ নূতন করিয়া তুলিয়াছে। আমি অবশ্য তেমন পুরাণের প্রসঙ্গ এখানে করিতেছি না ;—যেখানে ঐরূপ কোনও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নাই, ইহা তেমন পুরাণের কথা। সুতরাং তাহা প্রক্ষিপ্ত বা নূতন বলিয়া অবজ্ঞা করিলে চলে না।

কোনও আঢ্য জনপদে জনৈক সঙ্গতিশালী কৃষিজীবি গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। ঐ গৃহস্থের গোলাভরা শস্য এবং গোশালাতে বহু দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এভাবে বহুদিন চলিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে ঐ কুসীদজীবির এক তত্ত্বদর্শী গুরু লাভ হইয়াছিল। তিনি সময় সময় আসিয়া শিষ্যকে সংসারের মমতা হ্রাস করার জন্য উপদেশ দিয়া চলিয়া যাইতেন। দৈবাৎ একদিন আসিয়া গুরু, শিষ্যকে কহিলেন, 'ওরে, তোর সময় কি হইবে না,—আমার আমিত্বের সঙ্কোচ করিতে এখনও অভ্যাস করিলি না? দিন ত নিকটে আসিল'। শিষ্য কহিল, 'হাঁ ঠাকুর, এইবার ক্ষেত্রপক্ক শস্যগুলি গোলাজাত করিয়া আগামী মাঘী পূর্ণিমার পূর্বেই যাত্রা করিব।' ঠাকুর বলিলেন, 'বেশ; মনে থাকে যেন, মাঘী পূর্ণিমার আগেই আমি আসিয়া তোকে লইয়া যাইব।'—এই বলিয়া ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে কুসীদজীবির বহু অর্থ কলসী পূর্ণ হইয়া ঘরের ভিত্তিতে পোতা ছিল। সে সকল কথা, এবং তাহার অভাবের পর ছেলেরা কিরূপে কুসীদ ব্যবসা চালাইয়া, গবাদি পশু রক্ষা করতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, এবং কিরূপেই বা ক্ষেত্রপক্ক শস্য গৃহে আনিয়া রক্ষা করিবে, এবংবিধ বহুতর চিন্তায় ঐ গৃহস্থ অতি অশান্ত মনে কাল কাটাইতে লাগিল। তখন উহার অবস্থা হইল, উন্মাদের মত। একবার ভাবে, আমার রক্ষিত ধনের সংবাদ উহারা কেহ জানে না, তাহা যদি চোরে নেয়, তবে উহাদের কি গতি হইবে? গাভীগুলিকে যদি জল ঘাস দিয়া পালন না করে, তবে তখন ইহাদের অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইবে। অধমর্ণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা বুঝিয়া লইতে

উহাদের যোগ্যতা এখনও হয় নাই, শস্যগুলি যথা সময়ে গৃহে আনিয়া রক্ষা করিতে উহারা আজও শিখিলনা,—এ অবস্থায় আমার অভাবের পর উহাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। অহর্নিশ এইরূপ দুর্ভাবনায়, অতিকষ্টে গৃহস্থ দিন কাটাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঘী পূর্ণিমার দিনও ক্রমে সন্নিহিত হইয়া আসিল। কিন্তু ছেলেদের কাছে, ধন সম্পত্তি কোথায় কিভাবে আছে, এই কথা আজ বলি, কাল বলি বলিয়া কোন কথাই বলা হইল না। ইত্যবসরে মাঘী পূর্ণিমার অব্যবহিত পূর্বে আসিয়া গুরুদেব সেই গৃহস্থকে লইয়া গেলেন। অন্তিমকালে গৃহস্থ যত্নরক্ষিত সঞ্চিত ধনের, ক্ষেত্রপক্ক শস্য গৃহে আনয়নের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুর কিছুদিন পর এক কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। কুকুর সারাদিন গ্রাম ঘুরিয়া এবাড়ী ওবাড়ী খায়, রাত্রি হইলে পূর্বদেহের বাস্তভিটার প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত হয়। বহুদিন এভাবে গেল। ঠাকুর একদিন দেখা দিয়া কুকুরকে বলিলেন, 'হতভাগ্য,—মৃত্যুর সময় বিষয় বৈভবের মমতা ছাড়িতে পার নাই, তাই অন্তিম কালের মনোবৃত্তির অনুরূপ এই অপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম লইয়াছ। ধিক্ তোর জীবনে! আমি কতবার তোকে সংসারের মমতা কমাইতে উপদেশ দিলাম, কিছুতেই সেদিকে তোর মন গেল না,—এখন কর্মানুরূপ ফল ভোগ কর, আমি আর কি করিব?' এইরূপে কুকুরকে বহুবিধ তিরস্কার করায় কুকুরের আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। ইহার কিছুকাল পর কুকুর-দেহের বিনাশ ঘটিল। তখন সেই কুকুর আবার একটা ষাঁড় হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এবারও পুত্রাদিস্নেহকাতর সেই কুকুরের ন্যায়, ষাঁড় নানাস্থানে ঘাস জল খাইয়া প্রাণধারণ করে, যেই পুত্রদের পক্ক শস্য ঘরে নেওয়ার সময় হয়, তখন ষাঁড় আসিয়া অতিথির ন্যায় পুত্রদের কাছে উপস্থিত হয়। পুত্রেরা তদ্দর্শনে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া ঐ বলবান্ বৃষভকে তাহাদের ক্ষেত্রস্থ পক্ক শস্য গৃহে বহন করিয়া লইবার কাজে নিয়োগ করে। বৃষভও অকাতরে সেই শস্য বহন করিয়া গৃহে লইয়া আইসে। পুত্রেরা জানেনা যে এই বৃষই তাঁহাদের পিতা। বৃষভ মনে মনে তাহা জানিলেও সে মনুষ্য ভাষাবিদ্ নহে বলিয়া কোন কথা পুত্রদিগকে বলিতে পারে না। এরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। সহসা একদিন গুরুদেব আসিয়া বৃষকে কহিলেন,—'রে বর্বর! এখনো তোর চৈতন্য হইল না,—এখনো বিষয়-তৃষ্ণা ছাড়িতে পারিলি না। পুত্র যদি তোর,—তুই যদি পুত্রদের পিতা,—তবে এমন পশু কে আছে যে, পিতা দ্বারা শস্য বহন করাইয়া গৃহজাত করে! তোর শারীরিক ক্লেশের কথা চিন্তা করিয়াও কি একবার বুঝিতে পারিস্ না যে, কে কার পিতা, কে কার পুত্র। তোর কর্মের ফল তুই ভুগিবি, আমি আর কি করিব?' গুরুদেবের তিরস্কারে ষাঁড়রূপী গৃহস্থের বড় পরিতাপ হইল। ইহার কিছুদিন পরে ষাঁড়দেহের পতন হওয়াতে, ঐ ষাঁড় সর্পরূপে জন্ম লইয়া পূর্ব দেহের সঞ্চিত ধনরাশি যেখানে কলসীপূর্ণ হইয়া ভিত্তিতে পোতা ছিল, তাহা বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

এদিকে ধনবান পিতার মৃত্যুর পর হইতেই, সুব্যবস্থার অভাবে, পুত্র চতুষ্টয়ের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল, গোলাতে শস্য নাই, গোশালাতে গাভী নাই,

অধমর্ণের কাছে টাকা নাই,—এখন অতি হীন দশায় আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। সুবৃহৎ গৃহ আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না, ক্রমশঃ বড় গৃহের ভিটা কাটিয়া ছোট করিয়া তদুপরি ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণের অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমবেত হইয়া সুবৃহৎ ঘরের ভিত্তি ছোট করিবার মানসে ভিত্তি খনন কার্যে প্রবৃত্ত হইল। মাটি কাটিতে কাটিতে সহসা একস্থলে ঝণাৎ করিয়া শব্দ হওয়াতে সকলে দেখিল, একটি তামার সুবৃহৎ কলসীর গায়ে কোদাল ঠেকিয়া ঐরূপ শব্দ হইয়াছে। তখন কৌতূহলী হইয়া ঐ স্থানের মাটি আরও কাটিয়া ফেলিতে ফেলিতে দেখিতে পাইল, এক বিশাল কৃষ্ণসর্প ঐ তামার কলসীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃচতুষ্টয় একত্র হইয়া লাঠি দ্বারা সর্পকে প্রহার করতঃ অর্ধমৃত অবস্থায় গর্ত হইতে বাহির করিল। সর্প, জাতীয় স্বভাববশতঃ তখনও ফণা বিস্তার করিয়া একবার এদিকে আর বার ওদিকে দুলিতেছিল। তখন ছেলেরা সকলে মিলিয়া পিতৃরূপী সর্পের মাথায় পুনঃ পুনঃ আঘাত্ করিয়া আট অঙ্গুলী বিস্তৃত ফণাকে বার অঙ্গুলী বিস্তৃত করিয়া দিল। ঠিক এই সময়ে গুরুদেব আবার আসিয়া সর্পের কাণে কাণে কহিলেন,—'রে হতভাগ্য জীব, পুত্রদের কাছে আজ যে শিক্ষা পাইলি, তাহা কি তোর মনে থাকিবে? তোর পূর্ব দেহে যখন তুই গৃহস্থ ছিলি,—তখন তোর জীবদ্দশায় আমি বার বার তোকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, যে সংসার হইতে তোর মমতা ক্রমে খর্ব করিয়া আনিতে অভ্যাস কর;—তোর গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে অবশ্যই তুই তাহা করিতে পারিতিস—কিন্তু এখন, গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধার ফল হাতে হাতে লাভ হইল। আর কি কখন পুত্রাদির মমতায় আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে সংসারময় ছড়াইয়া রাখিবি? বার বার তিনবার তোকে সাবধান করিলাম। অতঃপর যে দেহ লাভ হইবে, সে দেহে আমার দর্শন পাইবি না, সাবধান! আর আপনাকে সংসারময় ছড়াইয়া রাখিস না। কেবল আমার এই কথাটা তোর মনে থাকিলে ক্রমে সুপথ পাইবি।' এই বলিয়া তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ তিরোহিত হইলেন।

সংসারে আসিয়া আমার আমিত্বের সঙ্কোচন করা আবশ্যক হয় কেন, পাঠক, উপরের বর্ণিত ইতিহাস পাঠে তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অবশ্যই অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই মরণ-ধর্মশীল মরজগতে যখন কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নয়, তখন অচিরস্থায়ী বিষয় সম্পদ ও পুত্র পরিজনাদিকে 'আমার' ভাবিয়া নিয়ত তচ্চিন্তনমননে আজীবন কাটাইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম নহে। মনুষ্যেতর সকল জন্তু অপেক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তিটি মনুষ্যের বেশী আছে। বাহ্য জগতে যখন মনুষ্যেরা ভালমন্দ বিচার করিয়া চলিতে পারে, তখন অন্তর্জগতের মধ্যেও তদ্রূপ ভাবে ভালমন্দের বিচার করিতে কেন না পারিবে? এরূপ দৃঢ়তা দেখান কি গৃহী মাত্রেরই কর্তব্য নয়?

আমাদের একটি মহৎ দোষ এই যে, বানান করিবার সময় বলি ট'য় আকার দিলে টা, ক'য় আকার দিলে কা,—পড়িবার সময় পড়ি টাকা—টেহা। ঠিক্ এইরূপ, আমরা জানি যে, মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ, চুরী করা মহাপাপ,—ইহা জানিয়া শুনিয়াও ত চুরী না করিয়া, মিথ্যা

না বলিয়া পারি না। বলত এ রোগের ঔষধ কোথায়? জানি যে, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী প্রভৃতি যত কিছু সম্পর্কিত লোকজন আমরা সংসারে আসিয়া পাই, —তাহারা ত সকলেই মরণ-ধর্মশীল; ইহাত চক্ষের উপর অপর দশদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, বুঝিতেছি, তথাপি কেন, বন্ধু-স্বজনাদি বিয়োগে শোক-বিহ্বল হই! আর ঐ সকল নশ্বর জিনিষের উপর 'আমি মমতা' বসাইয়া এতটা স্থান জুড়িয়া বসি? আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কাজ কি আমার সাম্রাজ্য লাভ করিয়া? সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে, আমার আমিত্বেরও অতি প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী, তাহা কেন আমি ভুলিয়া যাই? যাঁহারা নিয়ত এরূপ বিচার দ্বারা সংসারের নশ্বরত্ব স্পষ্টরূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা সার্থকজন্মা পুরুষ। আমিত্বের অতি বিস্তৃতির ফল যখন এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার, তখন তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাই কি আমাদের পক্ষে পরিণাম-দর্শীর চিহ্ন নয়?

এই সংসার আমার লীলাক্ষেত্র, সুতরাং শিক্ষার স্থান। ভূমিষ্ঠ হইয়া, দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত কেবল শিক্ষা করিয়া যাইবার জন্যই প্রথম আমরা সংসারে জন্মগ্রহণ করি। যাঁহারা উপরের বর্ণিত প্রণালী অনুসারে নিয়ত তত্ত্ববিচার দ্বারা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখিতে পান, তাঁহারা আর সংসারে সমাসক্ত হইয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা তখন সংসারে যাহা মিলে না, এমন রত্ন আহরণ জন্য ব্যস্ত হন। তদবস্থায়, আর তাঁহারা সংসারী বলিয়া অভিহিত হন না। এমন লোকের সংখ্যা কি জগতে কম? আমি একবার হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি যে, পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোক, গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নানাবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, অনিকেত অবস্থায়, যদৃচ্ছলাভ দ্বারা হৃষ্টচিত্তে জীবন যাপন করিতেছে। অবশ্য ইহারা সকলেই যে যথাযথরূপে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আমি অবস্থা দেখিয়া তেমন মনে করি নাই। কিন্তু একথা পুনঃপুনঃ মনে উঠিয়াছে যে, কি এক অনির্বচনীয় সুখের লালসায় ইহারা সর্ববিধ সুখের একমাত্র আধার গার্হস্থ্য-আশ্রম ত্যাগ করিয়া এই বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ-আশ্রমের আশ্রয় লইয়াছেন! আমি তখন বিদ্যার্থী, আমার মনে ঐরূপ আন্দোলন উপস্থিত হওয়া খুব স্বাভাবিক।

তারপর আপাততঃ মনোরম, পরিণাম-বিরস এই শোভনীয় সংসারে যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ হইতে মনকে সরাইয়া রাখা সহজ সাধ্য কর্ম নহে। এবং উহা দুই দশ দিনের চেষ্টার ফল নহে। তত্ত্ববুদ্ধির উন্মেষ না হইলে হৃদয়ে পরিষ্কার বিচারের ভাব আগত হয় না, পরিষ্কারবিচার ব্যতিরেকে, সংসারের প্রতি স্বতঃ এব বিরক্তি উপস্থিত হয় না। সংসার-বিরক্তির চরম অবস্থার নাম বৈরাগ্য বা সংসারে আসক্তিহীনতা। সুতরাং সংসারাসক্ত লোকের মধ্যে সুকৃতিবশাৎ যদি কাহারো কখন সংসার ভোগে বিতৃষ্ণার অবস্থা আগত হয়, তবে, তন্মুহূর্ত হইতে সংসারের যাবতীয় বিষয় ভোগের তৃষ্ণা হইতে চিরদিনের নিমিত্ত অব্যাহতি লাভ করার জন্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত কঠোর সাধনা দ্বারা, যাহাতে সেই অবস্থাটি দৃঢ়রূপে হৃদয়ে বসিয়া যায়, তেমন তীব্র চেষ্টা করা আবশ্যক। ঐরূপ তীব্র চেষ্টার নাম সদসদ্-বস্তু-বিবেক। জগতের কোন্ পদার্থটি সৎ অর্থাৎ

স্থায়ী আর কোন্ পদার্থটি অসৎ অর্থাৎ অস্থায়ী, নিরন্তর মনোমধ্যে এতদ্বিষয়ক বিচার চলিতে আরম্ভ হইলে, কালে, তাহার ফল স্বরূপ সংসার-বিরক্তির ভাব আসিয়া দেখা দেয়। ঐ যে বিরক্তি, তাহা পাকা বিরক্তির অবস্থা মনে করা ঠিক নহে। কারণ, অবস্থা বিশেষে, এই অবস্থা হইতেও পতনের আশঙ্কা আছে; এ জন্য দৃঢ়তা সহকারে তদবস্থা হৃদয়ে বদ্ধমূল করার জন্য, দীর্ঘকাল সাধনা করা আবশ্যক। একে ত আমাদের আয়ুষ্কাল কম, তদুপরি বৃদ্ধদশায় সাধন আরম্ভ করিলে, তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়ার আশা করা যায় না;---সুতরাং প্রথম বয়সেই এ সকল বিষয়ের সাধন আরম্ভ করা বিধেয়। সময়ের কাজ সময়ে অনুষ্ঠিত না হইলে কোন ফল লাভের আশা নাই; বরং তাহা নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রম মাত্র সার হয়। এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য পৌরাণিকেরা এই ইতিহাস কীর্তন করেন যে,---একদা, দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যাবতীয় বৃক্ষ, লতা, ওষধি বিশুষ্ক, ও নদ, নদী, খাল, বিল ও পল্বলাদি একেবারে জলশূন্য হইয়াছিল, জীব জন্তু অধিকাংশ জলাভাবে মরিয়া গিয়াছিল, কেবল কূপোদক পান করিয়া কতক মনুষ্য অতিকষ্টে জীবিত রহিয়াছিল। তদবস্থায় এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ মর মর অবস্থায় কোনরূপে জীবিত ছিল, ঐ বৃক্ষের পত্র পুষ্প ফলাদি কিছুই ছিল না। এমন সময়ে একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল। বহুদিনের পর মেঘ দর্শনে বটবৃক্ষের আনন্দের সীমা রহিল না। মেঘ যখন তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন মেঘকে লক্ষ্য করিয়া বৃক্ষ কাতর কণ্ঠে কহিল,---হে জলদ, তোমার অবয়ব কঠোর ও কোমল পদার্থের দ্বারা গঠিত। যখন তোমা হইতে অশনি সম্পাত হয়, তখন তুমি কঠোর আর যখন বারিবর্ষণ কর, তখন তুমি কুসুমকোমল। আমি তোমার প্রথম ব্যবহার পাইবার প্রার্থনা করি না,---তোমায় স্বাভাবিক কোমলতার স্বভাব স্মরণ করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, --একটু জল সিঞ্চন করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। দেখ, জীবন অপেক্ষা জগতে প্রিয়তম কিছু নাই। একথা শুনিয়া মেঘের হৃদয় আর্দ্র হইল কি না জানি না,---বায়ু বিতাড়িত মেঘ কহিল আমার সময় নাই, আমার পশ্চাদাগত মেঘকে তোমার প্রার্থনা জানাইও। এই বলিয়া বায়ুরূপী বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া মেঘরূপী রাজপুত্র দৃষ্টির অন্তরাল হইল। পুনরায় কিছুকাল পরে আর একখণ্ড মেঘ আসিল। বৃক্ষ তাহাকেও কিঞ্চিৎ বর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল;--কিন্তু সেও প্রথমোক্ত মেঘের ন্যায় প্রত্যুত্তর দিয়া সরিয়া পড়িল। ইহার কিছুক্ষণ পর, আর একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। বৃক্ষ এবারও অতি কাতর কণ্ঠে প্রাণের দায়ে ঠেকিয়া, তৃতীয় মেঘখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'পিতঃ বারিদ, কিঞ্চিৎ বর্ষণ করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। এখনও যদি এক ফোঁটা জল পাই, তবে তাহা চুষিয়া লইলে আমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। যেহেতু এখনও মৃত্তিকা হইতে রস চুষিয়া লইবার শক্তি আমার আছে, হয়ত পরমুহূর্তে থাকিবে না।' মেঘ, পরানুগৃহীত, বায়ুর দ্বারা পরিচালিত, সুতরাং তাহার সাধ্য কি যে আপন ইচ্ছায় বর্ষণ করিতে পারে। কাজেই সে পূর্বগামী মেঘদিগের ন্যায় বলিয়া গেল—আমি

এখন বড় ব্যস্ত, পারিত যাওয়ার সময় কিছু জল দিয়া যাইব। আমার পশ্চাদ্ আগত মেঘকে বলিও, সে যদি দেয়। এই বলিয়া তৃতীয় খণ্ড মেঘও চলিয়া গেল। তৃতীয় খণ্ড মেঘ অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিবার শক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই ঘটনার কিছুকাল বাদে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন বটবৃক্ষ এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল যে, রে বারিদ, সেই জল বর্ষণ করিলি, কিন্তু আমার প্রাণ থাকিতে নয়।

কাজেই যে কাজ যে কালে আরম্ভ করা বিধেয়, তাহা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আরম্ভ না করিলে কদাচ ফলদায়ক হয় না। সাধকদিগকে সর্বদা এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ও সাবধান থাকিতে হইবে যে, যেন সঙ্কল্পিত কার্যে কদাচ ঔদাস্য আসিয়া দেখা না দেয়। এই যে ঔদাস্য ইহাই সাধকদিগের প্রমাদ। সাধকদিগের পক্ষে প্রমাদ সর্বদা পরিহর্তব্য। যেহেতু প্রমাদে পতন অনিবার্য, এবং অপ্রমাদে উত্থানও তেমনি অবশ্যম্ভাবী।

সংসারের স্বাভাবসিদ্ধ ধর্ম এই—সে সর্বদা আপন কুহক জাল বিস্তার করিয়া মনোহারী দোকানির ন্যায় যাবতীয় জীবদিগকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। কাজেই জীবেরা আপনাপন সহজ সাধ্য চেষ্টা দ্বারা সংসাররূপী মায়াবিনীর হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। কেবল যাহাদিগের জন্মার্জিত তপস্যালব্ধ বল অধিক, তাহারাই অতি সহজে সংসার-বারবণিতার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে; অন্যদের পক্ষে সে সুবিধা নাই।

তত্ত্ববুদ্ধির উন্মেষ হইলে, যাহারা প্রতিনিয়ত পার্থিব বিষয়-সম্পদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে অভ্যস্ত হয়েন, তখন তাহাদের রসনা ও উপস্থেন্দ্রিয়ের ভোগ তৃষ্ণা নিঃশেষরূপে ক্ষয় হইয়া যায়,—এ বিষয়ে ইহাই পরীক্ষা। তদবস্থ পুরুষের চরিত্র অতি বিচিত্র। তখন তাহাকে মর্তভূমির সংসারের জীব বলিয়া চেনা যায় না। তাহার চাল চলন, বাক্যভঙ্গি, হাবভাব অন্য প্রকারের হইয়া যায়। সংসারের সাধারণ মনুষ্যগণ যে কাজ অবজ্ঞা করিয়া থাকে, হয়ত, বিষয়ভোগ-বিতৃষ্ণ পুরুষ, বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহারই অনুষ্ঠান করেন। আবার তিনি যে কাজ ঘৃণিত বলিয়া অনুষ্ঠান করেন না, সংসারের তাবল্লোক হয়ত সে সকল কাজ লইয়াই পরমানন্দে দিন কাটায়। কদাচিৎ কাহারও ঐরূপ অবস্থা আগত হইলে, তিনি আর সংসারের কোলাহলের মধ্যে থাকিতে ভালবাসেন না। তখন নির্জন নিবাসেই তাঁহার অধিকতর রুচি হয়। জনসংসর্গ হইতে বিরতি অবস্থাটি জ্ঞানের একটি লক্ষণ বটে। গীতায় সে কথা পরিষ্কার ভাবে উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুপাঠক, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য বুঝিয়া লইবেন।

এই সংসারে অসংখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জীব শ্রেয়োলাভার্থ যত্ন করে না। সেই মনুষ্যদিগের মধ্যেও বহুসহস্র মনুষ্য আত্মজ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করেন সত্য,—কিন্তু সেই বহুসহস্র প্রযত্নকারী মনুষ্যদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জন্মান্তরীয়

সুকৃতিবশে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তদ্রূপ আত্মজ্ঞানলব্ধ বহু সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পরমাত্মস্বরূপ যথার্থরূপে জানিতে পারিয়া কৃতকৃত্য হন। এবংবিধ পুরুষেরাই সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সংসারের আকর্ষণ হইতে বহুদূরে অবস্থিত রহিয়াছেন। তদিতরেরা সংসাররূপ মোহগর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"এই সংসার ধোঁকার টাটি, সার জেনো রে একথাটি
শাঁস নাই তার খোসা আছে, যেন একটি আমড়ার আটি।"

গৃহস্থ যে, সংসারী যে, সে ইহা বুঝিতে পারে না। রামপ্রসাদ তত্ত্ববুদ্ধির আশ্রয় লইয়া, সংসারকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন—সংসারের যাবতীয় পদার্থ অন্তঃসার শূন্য, কোনটিই পরিণামস্থায়ী নহে। লোক যেমন ধাঁধায় পড়িয়া মানুষদশকের গণনায়. আপনাকে বাদ দিয়া, ৯জন গণনা করে,----সংসারের তাবৎ পদার্থই তেমন ধাঁধার ন্যায়। অর্থাৎ সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ অস্তিত্বহীন।

যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃগণ, আপনাপন স্বরূপ গোপন করিয়া কেহ দুষ্মন্ত কেহ শকুন্তলা, কেহ কণ্ব প্রভৃতি সাজে সাজিয়া আপনাকে তত্তন্নামাভিধেয় কল্পনা করিয়া অভিনয় প্রদর্শন করে তদ্রূপ সংসারের তাবৎ লোভনীয় পদার্থই তাদের আপনাপন প্রকৃত স্বরূপ গোপন করিয়া, অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করতঃ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়।---এই অবস্থা আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধ লেখক একস্থলে লিখিয়া রাখিয়াছেন,---

সংসার সঙের হাট, মানুষের কর্মভূমি,—
এ অনিত্য রঙ্গমঞ্চে, অভিনেতা তুমি আমি।

বস্তুতঃ একথা খুব সত্য যে,—রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় আমরা প্রত্যেক জীব এই সঙের হাটে অভিনয় দেখাইবার জন্য সমবেত হইয়াছি। আমি এবার যাহার পিতা, যাহার পুত্র, যাহার ভাগিনেয় সাজিয়াছি, হইতে পারে আগামী জন্মে আমি তাহাদের কেহই থাকিবনা। অথবা এমনও হইতে পারে যে, আমি আগামী জন্মে তাহাদের পুত্র, ভ্রাতা কিংবা মাতুলরূপে আবির্ভূত হইতে পারি। তবেই পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের ইহ জীবনের এই যে ক্ষণিক সম্পর্ক বা সম্বন্ধ, তাহা পথিকগণের পথের পরিচয়ের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। সংসারাসক্ত লোকেরা এ সকল কথার আলোচনা দ্বারা যদি সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া, ক্রমশঃ সংসার হইতে মমতার সঙ্কোচন করিয়া লইতে পারে, তবেই তাহাদের জন্ম ও জীবন সার্থক।

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌ করণে॥"

"ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

ভক্তের বিরহ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ ঘোষ

এক্ষণে ভক্তের আর আত্মসুখদুঃখবিচার নাই। যাঁহার চরণোদ্দেশে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া 'দাসী' হইয়াছেন, তাঁহার সুখেই ভক্তের সুখ। ভক্ত ভাবেন, 'দাসী'কে সুখে বা দুঃখে রাখা প্রভুর ইচ্ছাধীন। প্রভু ইচ্ছাময়—তাঁহার কী ইচ্ছা, আমি কী জানি এবং আমার কণাপরিমাণ বুদ্ধিতে কী বুঝি? তিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন তাঁহার লীলার জন্য। এই লীলায় তিনি আমায় রাখিবেন—কখন সুখে, কখন দুঃখে, কখন হর্ষে, কখন বিষাদে, কখন আনন্দে, কখন নিরানন্দে, কখন হাসিতে, কখন কান্নাতে। কেবলই যে তিনি আমায় নিরবচ্ছিন্ন সুখে রাখিবেন, তাহা নয় এবং কেবলই যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে রাখিবেন, তাহাও নয়। তবে তিনি আমায় সুখে রাখুন বা দুঃখে রাখুন, আমি যে তাঁর দাসী ইহা যেন কখন না ভুলি এবং হাসি মুখে সর্বদা তাঁহার সেবা করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে mystic কবি Blakeএর নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী ছত্র প্রণিধান যোগ্য—

Joy and woe are woven fine,
A clothing for the soul divine;
It is right it should be so,
Man was made for joy and woe;
And when this we rightly know,
Thro' the world we safely go.

ভক্ত বলেন, আমাকে দুঃখ দিয়া আমার প্রাণবল্লভের যদি সুখ হয়, আনন্দ হয়, তবে সে দুঃখ আমার দুঃখের নয়, সুখের, আনন্দের। আমি তাঁহার শ্রীচরণরেণু প্রার্থী—আমাকে তিনি দর্শন দিয়া পরমানন্দে রাখুন, অথবা অদর্শনজনিত দুঃখে অহরহ পীড়িত করুন বা আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, তবুও তিনিই আমার প্রাণেশ্বর[১]। ইহা যেন চাতকের ভাষা মেঘের প্রতি। চাতক জলধরকে বলে—হে প্রিয়! তুমি তর্জনগর্জনে আমাকে ভয় দেখাও বা হিম-শিলা বর্ষণে আমাকে পীড়া দাও কিম্বা বজ্র হানিয়া আমাকে সংহার কর, তথাপি আমার তৃষ্ণা-তাপহারী একমাত্র তুমি।

ভক্ত আরও বলেন—সুখ দুঃখে ভেদ করি কেন? সুখ যাঁহার দেওয়া, দুঃখও তাঁহার

---

১ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্' শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দেওয়া। যে হাত হইতে সুখ আসে, সেই হাত হইতেই তো দুঃখ আসে। যাহা বিপদ, সম্পদ; জয়, পরাজয়; মান, অপমান; লাভ, ক্ষতি; জনম, মরণ—আসে তাঁহার হাত হইতে যিনি আমার প্রাণসখা। তাঁহার ভালবাসাতে আমার কোন সংশয় নাই, সন্দেহ নাই। আমার প্রয়োজনসাধনের জন্য দানে তাঁহার মত মুক্তহস্ত আর কে আছেন? এই দেহ, এই প্রাণ, এই মন, এই বুদ্ধি, এই দেহস্থিত আত্মা; এই সব—'আমার' বলিতে যা' কিছু তিনিই দিয়াছেন। তাঁহার শক্তিতে জীবিত আছি, তাঁহার প্রসাদে মাতৃগর্ভে বাসের সময় হইতে অদ্যাপি নিরাপদে রহিয়াছি। আমার কল্যাণের জন্য তিনি প্রতিক্ষণে কত যত্ন লইয়া আসিতেছেন! ইহার উপর, আমি কী আর তাঁহার নিকট সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি? আমার তিনি যেমন, আর কে আছেন তেমন? তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত স্মরণে রাখিয়া, সুখ দুঃখের পার্থক্য ভুলিব[২]। স্নেহময়ী জননী যে হস্তে সুস্থ পুত্রকে সুস্বাদু আম্রফল ভোজন করান, সেই হস্তে অসুস্থ পুত্রকে তিক্ত নিম্বপত্ররস বলপূর্বক পান করান। যাঁহার স্নেহের এক কণিকা পাইয়া, জননী হইয়াছেন স্নেহময়ী, তাঁহার পূর্ণ স্নেহের পরিমাণ নির্ণয় কে করিবে? আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকল দুঃখ নির্যাতন তাঁহার আশীর্বাদ বলিয়া মাথা পাতিয়া লইব। জীবনে দুঃখ, বিপদ, রোগ, শোক, মৃত্যু—যাহাই আসুক, ইহাদের সকলের উর্দ্ধে আমার এই বিশ্বাস অচল থাকুক যে তিনি মঙ্গলময়।

এতদবস্থায় ভক্তের বিষয়চিন্তা ও ভোগবাসনা তিরোহিত হইয়াছে। তিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট। মাত্র প্রাণরক্ষা হেতু যে দিন যাহা আহারের জন্য উপস্থিত হয়, সে দিন তাহা মনে মনে প্রাণবল্লভকে শ্রদ্ধার সহিত নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। তিনি জানেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের ইচ্ছায় 'কভি ঘি ঘনা, কভি মুটি ভর চানা, কভি চানা ভি মানা' অর্থাৎ কখন ঘৃত-পক্ক খাদ্য, কখন একমুঠা ছোলা, কখন ঐ একমুঠা ছোলাও বারণ। লজ্জা নিবারণের জন্য যাহা পরিধান না করিলে নয় তাহাই পরিধান করেন। কর্মফলের কামনাও তাঁহার নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র জীবনসখার প্রীত্যর্থে 'জনহিতায়', 'জন সুখায়' অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করেন। এইরূপে ভক্ত সর্ববিষয়ে তদ্গত চিত্ত হইতেছেন—তথাপি তিনি তাঁহার প্রাণের আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইতেছেন না। তজ্জন্য তাঁহার 'চিত করে আন্ ছান্ ধক্ ধক্ করে প্রাণ'[৩]। এই বিষম সময়ে তাঁহার প্রিয়তমের নামই একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার বিরহতাপ জুড়াইবার উপায়। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে নামৈব কেবলম্। নিজে নাম করেন এবং যাহাকে দেখেন—তরু, লতা; নদ, নদী; বন, উপবন; গিরি, পর্বত; নর, নারী; পশু, পক্ষী; চন্দ্র, সূর্য; গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সকলকে বলেন,—তোমাদের মিনতি করি, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার কথা রাখ,—তোমরা প্রাণপ্রিয়তমের নাম কর, নাম করিয়া জনম সফল কর, আর অলস হইয়া থাকিও না, এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাইও না। কখন কখন তাঁহার বোধ হইতেছে যেন শ্রুত শব্দ মাত্রেই

২ প্রহ্লাদের উক্তি—সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য—বিষ্ণুপুরাণ

৩ রাম্ ঘোষ।

তাঁহার জীবনবল্লভের নাম হইতেছে---অলির গুঞ্জনে, পক্ষীর কূজনে, পবনের স্বন্ স্বনে, নদ নদীর কলতানে, মনুষ্যের ভাষণে, সমুদ্রের গর্জনে, মেঘের বর্ষণে।

যাঁহার নাম করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভক্ত অত্যধিক ব্যাকুল হইলেন। বিরহ ব্যথায় তাঁহার 'হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নী', ভাবিতেছেন, 'কি দিলে হইবে ভাল'[৪]। তিনি হইলেন নিরুপায়—ভাঙ্গিল তাঁহার ধৈর্যের বাঁধ। তিনি হইলেন উন্মাদ--প্রেমোন্মাদ। এক্ষণে স্থাবরজঙ্গমের যাহাকে দেখিতেছেন, ব্যাকুল হইয়া তাহাকে প্রাণবল্লভের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন---সূর্য! চন্দ্র! তোমরা অত 'উচ্চে,' আকাশে রহিয়াছ—তোমাদের দৃষ্টি বহুদূরব্যাপী। বোধ করি তোমরা আমার প্রাণসখাকে দেখিয়াছ। যদি দেখিয়া থাক, আমায় বল, তিনি কোথায় রহিয়াছেন। মাতর্গঙ্গে! তুমি বহু বহু জনপদ অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছ। তুমি, বোধ হয় তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবে, যাঁহার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল। যদি তিনি তোমার নয়নগোচর হইয়া থাকেন, আমায় বলিয়া দাও, কোথা গেলে আমি তাঁহাকে পাইব! পবনদেব! তোমার গতি তো সর্বত্র। তুমি নিশ্চয় জান আমার জীবননাথ কোথা। তুমি নীরব হইয়া থাকিও না। আমার জীবন সখার সন্ধান বলিয়া দাও। বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও। হায়! তুমি উত্তর দিলে না। বিহঙ্গমগণ! তোমাদের আনন্দকাকলিতে অনুমান হইতেছে যে তোমরা আমার প্রিয়তমকে দেখিয়াছ; তোমরা আমাকে বলিয়া দাও—তাঁহাকে কি নামে ডাকিব—দেখ, বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে ডাকিতেছি,—তথাপি তাঁহার দেখা পাই নাই। কুসুমগণ! তোমাদের মুখে কি প্রফুল্লতা! কি স্বর্গীয় শোভা! তোমরা নিশ্চয়ই আমার পরাণ প্রিয়কে দেখিয়াছ! আমায় বল, বল, তোমরা কি সাধনায় তাঁহার দেখা পাইলে।

ব্রজলীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজধাম ত্যাগ করিলে, প্রেমোন্মাদিনী শ্রীমতী রাধা, যিনি সকল প্রেমিক ভক্তের প্রতীক, বৃন্দাবনের তরু, লতা; পশু, পক্ষী; যমুনা, কুঞ্জবন; মলয়মারুত, গোবর্দ্ধন গিরি প্রভৃতি সকলকে তাঁহার প্রাণবঁধুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল না—ইহাতে তিনি মর্মাহতা হইলেন। তদনন্তর সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন—তোমরা আমার মরমসখী, তোমরা আমাকে বলিয়া দাও—আমি কি উপায়ে আমার প্রাণবঁধুকে পাইব। সখি! যাঁহার জন্য লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, কুল, মান, ধর্ম—সব বিসর্জন দিয়াছি, তাঁহাকে হারাইয়াও আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি[৫]! আমার জীবনে ধিক্। সখি! আমার শ্যামমণি কি সত্যই আমায় ত্যাগ করিলেন? সখি!

---

৪ জ্ঞানদাস

৫ বিরহকাতরা Mariana সম্বন্ধে Tennyson লিখিত এইকয়টী ছত্র তুলনীয়—

She only said, "My life is dreary,
He cometh not," she said;
She said, "I am aweary, aweary,
I would that I were dead,"

আমি 'হরি লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে'৬। শ্রীমতী এই কথা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছা গেলেন। যে সখি অতি-সন্নিকটে ছিলেন, তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"রাই কেন এমন হ'ল, এই তো কৃষ্ণকথা কইতেছিল, রাই বুঝি প্রাণে ম'ল।" সখীরা সকলে তৎক্ষণাৎ শ্রীমতীকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং তাঁহার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কাণে মধুর কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। প্রাণবঁধুর নামে শ্রীমতীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল—তিনি আঁখি উন্মিলন করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে তথায় না দেখিয়া 'প্রাণনাথ', 'প্রাণনাথ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার কৃষ্ণানুরাগ এত অধিক যে কুঞ্জের দ্বারের অদূরে অবস্থিত একটি তমাল বৃক্ষ দেখিবামাত্র তাঁহার কৃষ্ণভ্রান্তি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তমালের নিকটে ছুটিলেন, বলিতে বলিতে—'বঁধু! তুমি এসেছ! তুমি তো ভাল ছিলে? তুমি ভাল সময়ে আসিয়া আমায় দেখা দিলে—এস তোমাকে স্পর্শ ক'রে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি'৭। কিন্তু হায়! স্পর্শমাত্রে জানিলেন, সে তাঁর প্রাণপতি নয়, তমাল—তাই খেদ করিয়া বলিলেন—'সখি! আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি আমার শ্যামচাঁদকে দেখিলাম, কিন্তু আমার স্পর্শে শ্যাম তমাল হ'ল'। পরক্ষণে শ্রীমতী ছুটিলেন মাধবীলতার নিকট। তাহার তলে দাঁড়াইয়া উন্মত্তা বলিলেন—'এই মাধবীতলে আমি মাধবকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখেছিলাম, কিন্তু আমাকে এখানে আসিতে দেখিয়া, মাধব কোথায় লুকাইলেন! মাধবি! তুই নিশ্চয়ই আমার মাধবকে লুকিয়ে রেখেছিস্। মাধবি! তোর পায়ে ধরি, আমার মাধব, আমায় দে। আমি মাধবপ্রাণা, মাধব বিনা আমি বাঁচি না—আমাকে বধ ক'রে তোর কি লাভ হবে, মাধবি!' তখন সখীরা শ্রীমতীকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া কুঞ্জে আনিলেন। আলুলায়িতকুন্তলা, মলিনবসনা, শীর্ণদেহা শ্রীমতী ধরাসনে পড়িয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—সখি! তিনি কি আর এ অভাগিনীকে দেখা দিবেন? তিনি আর আসিবেন না—ইহা তো আমি মনে আনিতে পারি না, সখি! তিনি তো এলেন না, কি হবে, সখি! তাঁহার বিহনে আমি যে আর প্রাণ ধারণ করতে পারছি না—আমি যে আর ধৈর্য ধরিতে পারি না। সখি! তিনি এ দাসীকে যে যত্ন যে আদর, যে ভালবাসা দিয়াছেন—তাহার স্মরণে, আমাতে আমি থাকি না। পূর্বে প্রত্যহ, রাত্রিতে কুঞ্জে আসিয়াই তিনি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার পর আপন হস্তে এ হতভাগিনীর কেশ ও বেশ বিন্যাস করিতেন এবং নানাবিধ ফুলে এ দাসীকে সাজাইতেন। তাহার পর, জ্যোৎস্নাপুলকিতা যামিনীতে আমার হস্ত ধারণ করিয়া যমুনাপুলিনে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রকৃতির শোভা দেখিতেন ও এ দাসীকে দেখাইতেন, আর তোমরা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে। প্রকৃতির নৈশ শোভা দর্শন করিয়া কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আপন হস্তে কোমল নব কিসলয়ে আমার জন্য শয্যা রচনা করিতেন,

৬ শশিশেখর

৭ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "রাই উন্মাদিনী" ও "স্বপ্নবিলাস" দ্রষ্টব্য।

পাছে আমার অঙ্গে ব্যথা লাগে। শয্যায় আমাকে শয়ন করাইতেন—আমি নিদ্রিত হইলে আমার মুখপানে চাহিয়া সারারাত্রি অশ্রুধারা ফেলিতেন। সখি! এমন গুণের প্রিয়তমকে ছাড়িয়া আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি! সখি! আমার এমন জীবনধারণে শত ধিক্। সখি! একে একে পূর্বের সকল কথা স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে—আর আমাতে আমি থাকি না। সখি! মনে হয় শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া এ দুঃখময় জীবনের অবসান করি। কিন্তু তখনই কে যেন বলে—এ দেহ, এ প্রাণ শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদিত, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের বস্তু—ইচ্ছামত নষ্ট করিলে মহাপরাধ হইবে।' সখি! তাই আমি মরিতে পারি নাই।

ভগবৎপ্রসাদে ভক্তের এমন একটি অবস্থা আসিল যে তাহা অসাধারণ—তিনি একেবারে প্রকৃতি ভাবাপন্ন—তিনি শ্রীভগবান্‌কে পতিভাবে ভজন করিতেছেন, আপনাকে কায়মনোবাক্যে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী জ্ঞান করিয়া। এ সম্বন্ধে অধ্যাত্ম জগতের একটি মূল্যবান্ কথা, যাহা Emerson বলিয়াছেন, উদ্ধৃত করা যাইতেছে—In fact in the spiritual world, we change sexes every moment. You love the worth in me, then I am your husband : but it is not me but the worth, that fixes the love : and that worth is a drop of the Ocean of worth that is beyond me. Meantime, I adore the greater worth in another, and so become his wife. He aspires to a higher worth in another spirit, and is wife or receiver of that influence. তাহা হইলে যিনি সর্বশক্তির আধার, সর্বগুণাকর, সর্বরূপাধার, প্রেমপারাবার, 'ocean of worth', তিনি জীবমাত্রের পতি এবং জীবমাত্র তাঁহার পত্নী। মীরাবাইও শ্রীরূপগোস্বামীপাদকে বলিয়াছিলেন যে শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহার গিরিধারীলালই একমাত্র পুরুষ এবং আর সকলেই প্রকৃতি। যাহা হউক, ভক্ত এক্ষণে প্রসন্নমুখ, প্রশান্তচিত্ত। কিন্তু তাঁহার মুখখানি নয়নধারায় প্লাবিত, যেন বর্ষাধারাসিক্ত প্রসূন। তিনি নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ধরাসনে উপবিষ্ট এবং ওষ্ঠ দুটী মৃদু মৃদু নড়িতেছে; এই কথা বাহির হইতেছে—প্রাণেশ্বর! কবে তুমি আসিবে? কবে তুমি আমায় দেখা দিবে? তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে আমার কত দুঃখ তাহা কী তুমি জান না? আমার কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতে শান্তি পাই না। তোমায় কত ডাকিতেছি, তুমি এস না কেন? আমার উপর কী তোমার ভালবাসা নাই। যদি থাকে, তবে তুমি এস না কেন? তোমার অদর্শনে কত ক্লেশ, কত বেদনা, কত যাতনা, কত জ্বালা তাহা ত মুখে বলিতে পারি না। কবে আসিবে? কবে আমাকে তোমার করিয়া লইবে? তোমার কাছে সর্বদা আমায় রাখিবে? জীবনবল্লভ! শুনিয়াছি—"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে।" তবে কেন তোমায় পাই না? তোমা ছাড়া হইয়া থাকা আমার জীবনান্ত—তুমি কী তাহা জানিতে পারিতেছ? দিবারাত্রি তোমায় ডাকিতেছি—তুমি দেখা দিবে—এই আশায় এখন তখন করিয়া দিন কাটিয়াছে—দিনের পর দিন গণিয়া মাস কাটিয়াছে—মাসের পর মাস গণিয়া বৎসর কাটিয়াছে—কত দুঃখে তাহা কি বলিব? প্রিয়তম! সূর্যোদয়ে জগতের আঁধার

দূর হয়, কিন্তু আমার মনের আঁধার ত যায় না—তোমা বিহনে। চন্দ্রোদয়ে সকলের আনন্দ হয়, কিন্তু আমার তা হয় না তোমা হারা হ'য়ে। তোমার আদরে আদরিণী, তোমার গৌরবে গৌরবিনী, এ দাসীর এখন কী অবস্থা তাহা কী তুমি জানিতে পারিতেছ? প্রতিদিন কুটির দ্বারে তোমার পা ধুইবার জল রাখি, তোমার জন্য মালা গাঁথি, তোমার পানের জন্য সুবাসিত জল রাখি, তোমার জন্য তাম্বুল সাজিয়া রাখি, তোমার জন্য শয্যা রচনা করি—এই সব করিয়া, কুটিরে আলো জ্বালিয়া তোমার প্রতীক্ষায় থাকি। কই, তুমি তো এস না। কেন এস না? আমি অপরাধিনী বলিয়া? প্রভু, সত্য বটে, আমার বহু অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু তুমি তো জান, আমি বুদ্ধিহীনা অবলা—তাই "অবলার ত্রুটী হয় শত কোটী"। তুমি ত ক্ষমানিধি, তুমি কী দাসীকে ক্ষমা করিবে না? তুমি দাসীর অপরাধ যদি গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাহার কী উপায় হইবে? না, না তাহা হইতে পারে না। তুমি যে আমায় ভালবাস, তুমি অবশ্যই দুঃখিনীকে ক্ষমা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবে। হে নাথ! হে প্রাণেশ্বর! হে প্রাণবল্লভ! হে ব্যথারব্যথি! প্রাণ আজ বড় কাতর—তোমাকে ডাকিতেছি—এই ডাকা সার্থক করিয়া দাও—আমায় দেখা দাও!

ভক্তের এই কান্না, মরমের কান্না—এ ডাক, মরমের ডাক—এ বেদনা, মরমের বেদনা। এই কান্না, এই ডাক, এই বেদনা আরাধ্য দেবতার নিকট পৌঁছিল, তাঁহার আসন টলিল। তিনি ভক্তের ভগবান্, তিনি ভক্তবৎসল—তিনি ভক্তের কাছে আসিলেন ৮।

আসিবারই কথা, কেন না গীতাতে তিনিই বলিয়াছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

ভক্তের চিরাকাঙ্ক্ষিত মূর্তিতে দেখা দিলেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।

* * *

হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন,
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

পারস্য মরমী সাধক কবি রুমি বলিয়াছেন—

When the love of God arises in thy heart,
Without doubt God also feels love for thee.

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন

---

৮ শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন—When the soul gives up its ego and it works to the Divine, God himself comes to us and takes up our burden.

সাগরের জল বরফ হ'য়ে ভাসে, নানারূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার[৯]।

ভক্তের অন্তর বাহির দিব্যালোকে আলোকিত হইল—তাঁহার হৃদয়ের গ্রন্থি দূর হইল, সকল সংশয় ছিন্ন হইল, কর্মফল সমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল[১০]। তিনি বলিয়া উঠিলেন "ধন্যোঽহম্ কৃত কৃত্যোঽহম্ সফলম্ জীবিতম্ মম।"

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥"—বিদ্যাপতি

আজ আমরাও ধন্য যে আমরা ভক্তের বিরহের চরম ফল—ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের মিলন কথা বলিতে পাইলাম। এখন সকলে মিলিয়া বলি—জয় ভক্তের জয়, জয় শ্রীভগবানের জয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

---

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

১০ মুণ্ডকোপনিষদের "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কার্য ও কারণ *

(২)

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

কার্য যে কেন কারণের সহজাত হইতে পারে না তাহা বুঝাইবার জন্য এইবার শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

অসতঃ প্রাগসামর্থ্যাৎ সামর্থ্যে কার্যসংভবাৎ।
কার্যকারণয়োঃ স্পষ্টং যৌগপদ্যং বিরুধ্যতে ॥ ৫১৫ ॥

অর্থাৎ, যাহার অস্তিত্বই ছিল না, পূর্বে তাহার কার্যোৎপাদনের সামর্থ্যও ছিল না; সামর্থ্য থাকিলেই কার্যোৎপত্তি ঘটে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কার্য ও কারণের সহভাব যুক্তি-বিরুদ্ধ।—কার্য যদি সহভূতই হয়, তাহা হইলেও তাহার হেতু অনুৎপন্ন বা উৎপন্ন ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের হইতে পারে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অনুৎপন্ন হেতু সম্ভব নহে, কারণ কার্যোৎপত্তির পূর্বে হেতুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ যাহা সম্পূর্ণরূপে সামর্থ্যশূন্য তাহা অসৎ। যদি বলা যায় যে হেতু উৎপন্ন হইয়া তবে সামর্থ্যশালী হয় এবং তখনই কার্যোৎপত্তি ঘটে, তবে উত্তর "সামর্থ্যে কার্যসংভবাৎ।" অর্থাৎ, উৎপত্তির অবস্থাতেই যদি হেতুর সামর্থ্য থাকে তবে হেতুর সেই স্বভাব হইতেই কার্যোৎপত্তি হইয়া যাইবে এবং পূর্ণ হেতুটি স্বসামর্থ্য প্রয়োগের আর অবকাশই পাইবে না। সুতরাং কার্য ও কারণের সহভাব অনুমানবিরুদ্ধ।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতেছেন যে কার্যকারণ ভাব হইল কর্মকর্তৃভাব; সুতরাং এতদ্দ্বয়ের ভিন্নকালত্ব অযৌক্তিক। ঘট ও কুলালের যৌগপদ্য ব্যতিরেকে কর্মকর্তৃভাব সম্ভব হইত না; সুতরাং হেতু ও কার্যের মধ্যে অনুরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে এতদ্দ্বয় সমকালীন। ইহার উত্তর :—

ন হি তৎ কার্যমাত্মীয়ং সংদংশেনেব কারণম্।
গৃহীত্বা জনয়ত্যেতদ্যৌগপদ্যং যতো ভবেৎ ॥ ৫১৬ ॥
নাপি গাঢ়ং সমালিঙ্গ্য প্রকৃতিং জায়তে ফলম্।
কামীব দয়িতা যেন সদ্ভাবস্তয়োর্ভবেৎ ॥ ৫১৭ ॥

অর্থাৎ, কারণ সংদংশের ন্যায় কার্যকে টানিয়া বাহির করে না যে এতদ্দ্বয়ের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হইবে; আবার কামী যেমন দয়িতাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে, কারণ ও কার্যের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধও নাই যে কারণ ও কার্যের সহভাব সম্ভব হইবে।—শান্তরক্ষিত এই

---

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, No. 20.

কারিকাদ্বয়ে প্রকৃত কারণ ও কার্যের মধ্যে যে দুই প্রকারের সম্বন্ধ সম্ভব তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই দুইটি সম্ভব সম্বন্ধের কোনটিই কেন সম্ভব হয় না তাহা বুঝাইবার জন্য কমলশীল বলিয়াছেন যে পারমার্থিক অর্থে সমস্ত বিশ্বই যখন নির্ব্যাপার (eventless) তখন প্রকৃত কোন কর্তা বা কর্মের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।*

কিন্তু তাহাই যদি হয়, যদি কারণ ও কার্য উভয়েরই ব্যাপার কিছু না থাকে, তবে লোকে বলে কেন যে অগ্নি ধুম উৎপাদন করিয়া থাকে, অগ্নিকে আশ্রয় করিয়াই ধুম উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি ? ইহার উত্তর :—

নিয়মাদাত্মহেতূত্থাৎ প্রথমক্ষণভাবিনঃ।
যত্ততোঽনন্তরং জাতং দ্বিতীয়ক্ষণসন্নিধিঃ ॥ ৫১৮ ॥
তত্তজ্জনয়তীত্যাহুরব্যাপারেঽপি বস্তুনি।
বিবক্ষামাত্রসংভূতসংকেতানুবিধায়িনঃ ॥ ৫১৯ ॥

অর্থাৎ, আপন হেতু হইতে উৎপন্ন কার্য প্রথম ক্ষণে নির্দিষ্টরূপে নিয়ন্ত্রিত থাকার ফলে (নিয়মাৎ) দ্বিতীয় ক্ষণে তদনন্তর যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকেই লোকে প্রথম ক্ষণের কার্যের উৎপন্ন ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, যদিও বস্তু প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার ব্যাপারের বিষয়ই নহে ; মানুষের যুক্তিহীন ইচ্ছা ভিন্ন এখানে আর কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পূর্বপক্ষী যদি এখন প্রশ্ন করেন যে যাহা উৎপত্তির পর বৈশিষ্ট্য উৎপাদনে ব্যাপৃত হয় না তাহাকে হেতু বলিয়া স্বীকার করা হইবে কেন, তবে তাহার উত্তর : -

জন্মাতিরিক্তকালেন ব্যাপারেণাত্র কিং ফলম্।
সত্তৈব ব্যাপৃতিস্তস্যাং সত্যাং কার্যোদয়ো যতঃ ॥ ৫২০ ॥

অর্থাৎ, বস্তুর স্বীয় জন্মের সময়ে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে কার্যে ব্যাপৃতি সম্পূর্ণ নিষ্ফল ; সত্তাই হইল বস্তুর কার্য, যে-হেতু বস্তুর সত্তা থাকিলে তাহার কার্য আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়।— কারণ-সত্তার অব্যবহিত পরেই যখন কার্যের নিষ্পত্তি তখন কার্যোৎপত্তির জন্য কারণের জন্মোত্তর সর্বপ্রকার ব্যাপারই অকিঞ্চিৎকর। এখন কারণের ব্যাপার বলিতে কি বুঝায় ? যাহার অনন্তর কালেই কারণসম্ভূত কার্য উৎপত্তি লাভ করে তাহাই হইল কারণের ব্যাপার (activity)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কারণ-সত্তা মাত্র উপস্থিত থাকিলেই কার্যোৎপত্তি ঘটে। সুতরাং কারণের সত্তাকেই কারণের ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করা হউক, জন্মের অতিরিক্ত কারণের অপর কোন ব্যাপার কল্পনা করাই নিরর্থক।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, ভাবাবলীর ব্যাপার যদি কিছু না থাকে তবে কেন বলা হয় যে কার্য কারণসাপেক্ষ এবং কার্যেই কারণের ব্যাপার ? তাহার উত্তর :—

য আনন্তর্যনিয়মঃ সৈবাপেক্ষাভিধীয়তে।
কার্যোদয়ে সদা ভাবো ব্যাপারঃ কারণস্য চ ॥ ৫২১ ॥

* যাবতা নির্ব্যাপারমেবেদং বিশ্বং ন হি পরমার্থতঃ কশ্চিৎ কর্তা কর্ম বাস্তি।

অর্থাৎ, তথাকথিত কারণ ও কার্যের মধ্যে যে আনন্তর্য পরিলক্ষিত হয় তাহা হইতেই বলা হইয়া থাকে যে কার্য কারণের মুখাপেক্ষী; এবং কার্য উদ্ভূত হইলে যে তাহাকে কারণের ব্যাপার বলা হয় তাহাও প্রকৃত পক্ষে আর কিছুই নহে।—এখানে নূতন কথা কিছুই নাই; যাহা post hoc তাহাই যে propter hoc হইতে বাধ্য নয় শান্তরক্ষিত এখানে তাহাই বলিতেছেন মাত্র।

উপরন্তু আরও বিবেচ্য এই যে, কার্যের প্রতি ব্যাপারের অথবা ব্যাপারবান্ ভাববস্তুর হেতুত্ব, এতদ্দ্বয়ের একটি ঘটিলে আর একটি ঘটিতেছে—এইরূপে নির্ধারণের উপরেই নির্ভর করিতেছে। সর্ব বিষয়ের ন্যায় এ-ক্ষেত্রেও অন্বয় ও ব্যতিরেক * ভিন্ন অপর কোন উপায়ে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। এই অন্বয় ও ব্যতিরেকের উপর বাস্তবিক যদি নির্ভর করা যায় তবে স্বয়ং বস্তুটিতেই কারণত্ব আরোপ করিতে দোষ কি? সে-জন্য বস্তুর ব্যাপারাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই নিষ্প্রয়োজন! মূল বস্তুটির সহিত কার্যটির অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ যে অবিজ্ঞাত তাহাও নহে। সুতরাং মূল বস্তুটির সহিত যখন কার্যের অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ অনস্বীকার্য তখন সেইটিকে কারণ বলিয়া স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ—এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বলা হইতেছে:—

তদ্ভাবভাবিতামাত্রাদ্ব্যাপারোঽপ্যবকল্পিতঃ।
হেতুত্বমেতি তদ্বান্বা তদেবাস্তু ততো বরম্॥ ৫২২॥

অর্থাৎ, বস্তুর পরিবর্তে যে বস্তুর ব্যাপারকেই (activity) প্রকৃত হেতু বলা হয় তাহারও কারণ এই যে ব্যাপারটি না ঘটিলে কার্যটি ঘটে না; সুতরাং তৎপরিবর্তে আদি বস্তুটিকেই হেতুরূপে স্বীকার করাই ভাল।

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিতে পারেন, মূল বস্তুটির হেতুত্ব স্বীকার করিলে এমন কি লাভ হইল যে-জন্য এই সিদ্ধান্ত সঙ্গততর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? তাহার উত্তর:—

ভাবে সতি হি দৃশ্যন্তে বীজাদেবাঙ্কুরোদয়াঃ।
ন তু ব্যাপারসদ্ভাবে ভবৎ কিঞ্চিৎ সমীক্ষ্যতে॥ ৫২৩॥

অর্থাৎ, হেতু বীজের অস্তিত্বই হইল কার্য অঙ্কুরের উৎপত্তির সম্যক্ কারণ; কিন্তু হেতুর "ব্যাপারের" অস্তিত্ব হইতে কার্যোৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধ হেতুর ব্যাপারের অপেক্ষা স্বয়ং হেতুটির সহিত স্বীকার করাই ভাল।

পূর্বপক্ষী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নৈয়ায়িক-সুলভ কূট তর্ক উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, হেতুর ব্যাপারের সহিত কার্যের অন্বয় সম্বন্ধ সিদ্ধ না হইলেও ব্যাপারের কারণত্ব অসম্ভব নহে। এ-কথার উত্তর:—

* তস্মিন্ সতি ইদং ভবতি—এইরূপ নির্ধারণ হইল অন্বয়; এবং তস্মিন্নসতি ইদং ন ভবতি—এইরূপ নির্ধারণের নাম ব্যতিরেক।

অদৃষ্টশক্তের্হেতুত্বে কল্প্যমানেঽপি নেষ্যতে।
কিমন্যস্যাপি হেতুত্বং বিশেষো বাস্য কস্ততঃ ॥ ৫২৪ ॥

অর্থাৎ, বিশেষ কার্যের প্রতি বিশেষ হেতুর শক্তি (potency) পরিলক্ষিত না হইলেও যদি সেই হেতুর সেই কার্যে কারণত্ব স্বীকার করা হয় তবে তাহা অন্য যে-কোন কার্যের কারণ রূপেই বা পরিগণিত হইবে না কেন?—আরও বিবেচ্য, হেতুর পরিবর্তে ব্যাপারকে কার্যের কারণরূপে স্বীকার করিলেও সেই ব্যাপারের আবার হেতু অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং এইরূপে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। প্রকৃত কথা এই যে, শুদ্ধ সত্তা ব্যতিরেকে পদার্থের অপর কোন ব্যাপারই নাই—যদি থাকিত তবে তাহা উপলব্ধিও করা যাইত। কিন্তু শুদ্ধ সত্তা ভিন্ন পদার্থের আর কিছুই যখন উপলব্ধ হয় না তখন সত্তাতিরিক্ত কোন ব্যাপারই বা পদার্থে স্বীকৃত হইবে কেন?

দৃশ্যত্বাভিমতং নৈবং বয়ং চোপলভামহে।
তৎ কথং তস্য সম্বন্ধমঙ্গীকুর্মো নিবন্ধনম্ ॥ ৫২৭ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যদিও বলেন যে হেতুর ব্যাপার সুস্পষ্ট, তথাপি আমরা তাহা কোথাও দেখিতে পাই না, এবং সেইজন্য এই ব্যাপারকে হেতু ও কার্যের সম্বন্ধের ভিত্তিরূপে স্বীকারও করিতে পারি না।—কমলশীলের টিপ্পনী হইতে বুঝা যায় যে স্বয়ং কুমারিল ভট্ট হইলেন এখানে শান্তরক্ষিতের পূর্বপক্ষী; কারণ কুমারিলই বলিয়াছেন, "প্রাক্ কার্যনিষ্পত্তের্ব্যাপারো যস্য দৃশ্যতে" তাহাই হইল হেতু। বৌদ্ধ কিন্তু উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকদের অতিপ্রিয় schematic dichotomy-র সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে শুদ্ধসত্তা ভিন্ন পদার্থের অপর কোন ব্যাপারই নাই।

আরও বিবেচ্য এই যে, বুদ্ধির দ্বারা বিষয়বস্তু গৃহীত হইলে বুদ্ধির কোন ব্যাপার ব্যতিরেকেও তাহার শুদ্ধসত্তার বলেই যেমন বিষয়বস্তুর গ্রহণরূপ কার্যটি সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্য সর্বপ্রকার ভাববস্তুরও হেতুত্ব উত্তরকালীন কোন ব্যাপারের মুখাপেক্ষা ব্যতিরেকেও সম্ভব হওয়া উচিত। এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বলা হইয়াছে :—

বুদ্ধের্যথা চ জন্মৈব প্রমাণত্বং নিরূপ্যতে।
তথৈব সর্বভাবেষু তদ্ধেতুত্বং ন কিং মতম্ ॥ ৫২৮ ॥

অর্থাৎ, বুদ্ধির জন্মই যেমন তাহার প্রমাণত্বের বিধায়ক, সেইরূপ বিশেষ ব্যাপার ব্যতিরেকেও সর্বপ্রকার ভাববস্তুতে হেতুত্ব আরোপ করিতে বাধা কি?—বুদ্ধির যে জন্মাতিরিক্ত অপর কোন ব্যাপার নাই তাহা "সৎসংপ্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষম্"—এই সূত্রে "জন্ম" কথাটি গ্রহণ করার সার্থকতা বুঝাইতে গিয়া কুমারিলই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন :—

বুদ্ধিজন্মেতি চ প্রাহ জায়মানপ্রমাণতাম্।
ব্যাপারঃ কারণানাং হি দৃষ্টো জন্মাতিরেকতঃ।
প্রমাণেঽপি তথা মা ভূদিতি জন্ম বিবক্ষ্যতে ॥

অর্থাৎ, সূত্রে বুদ্ধির "জন্মে"র বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা দেখান যে কেবলমাত্র জন্মের ফলেই বুদ্ধি প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়। অন্যান্য কারণ জন্মের পর তদতিরিক্ত বিশিষ্ট ব্যাপার ব্যতিরেকে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধির বেলায় জন্মভিন্ন আর কোন ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না। পাছে লোকে মনে করে যে বুদ্ধির ন্যায় অন্যান্য কারণও জন্মমাত্রই প্রমাণে পরিণত হয় এইজন্যই সূত্রে বুদ্ধির সম্পর্কে বিশেষ করিয়া "জন্ম" কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতেছেন, বুদ্ধির সত্তাই যে তাহার ব্যাপার তাহার কারণ বুদ্ধি ক্ষণিক এবং উত্তরকালে তাহার কোন অবশেষ থাকে না। এ কথার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন :—

ক্ষণিকা হি যথা বুদ্ধিস্তথৈবান্যেঽপি জন্মিনঃ।
সাধিতাস্তদ্বদেবাতো নির্ব্যাপারমিদং জগৎ ॥ ৫২৯ ॥

অর্থাৎ, বুদ্ধির ন্যায় সর্বপ্রকার জাতবস্তুই যে ক্ষণিক তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার (activity) বলিয়া কিছুই নাই।—এই অনুমানটির প্রয়োগ এইরূপ :—যাহা ক্ষণিক তাহার জন্মব্যতিরিক্ত অপর কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না, যেমন বুদ্ধি; বীজাদি যে ক্ষণিক তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে বীজাদি বস্তুর স্বজন্ম ভিন্ন অপর কোন ব্যাপার নাই। অতএব জন্মের পর বস্তুর যখন অস্তিত্ব থাকে না, এবং ব্যাপারও যখন বস্তুরূপ কোন আধার ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে কার্যকারণ ভাব প্রকৃতপক্ষে আনন্তর্যমাত্র—ইহার মধ্যে কোন ব্যাপারের (activity) স্থান নাই (আনন্তর্যকমাত্রমেব কার্যকারণভাবব্যবস্থানিবন্ধনং, ন ব্যাপার ইতি স্থিরমেতৎ)।

পূর্বপক্ষী (৪৮৬ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন, কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি বাস্তবিকই আনন্তর্য ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধ না থাকে তবে রূপের পর গন্ধের উপলব্ধি ঘটিলে রূপকেই কি গন্ধের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? বৌদ্ধ এক্ষণে তদুত্তরে বলিতেছেন যে রূপ ও গন্ধের মধ্যেও তথাকথিত কার্যকারণ সম্বন্ধ সমভাবে বর্তমান (তত্রাপি ন ব্যভিচারঃ) :—

প্রবন্ধবৃত্ত্যা গন্ধাদেরিষ্টৈবান্যোন্যহেতুতা।
তদবাধকমেবেদং তদ্ধেতুত্বপ্রসঞ্জনম্ ॥ ৫৩০ ॥

অর্থাৎ, প্রবন্ধক্রমে (in a continuous chain of discrete moments) রূপ ও গন্ধের মধ্যে হেতুফল সম্বন্ধ (=আনন্তর্য) আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত; প্রথম ক্ষণকে হেতুরূপে স্বীকার করিলে বৌদ্ধমত কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন হয় না।—পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে বৌদ্ধ পরস্পর নিরপেক্ষ নিরন্তর দুইটি ক্ষণের প্রথমটিকে কারণ এবং দ্বিতীয়টিকে কার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে আরও বিশেষ করিয়া দেখান হইতেছে যে এই ক্ষণদ্বয় যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় হয়— যেমন প্রথমটি দৃষ্টিক্ষণ কিন্তু দ্বিতীয়টি গন্ধক্ষণ—তাহা হইলেও বৌদ্ধের নিকট এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। কমলশীল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে রূপক্ষণের পর যখন রসক্ষণ

উপস্থিত হয় তখন রূপক্ষণের অবয়বাবলী বাস্তবিকই রসক্ষণে সহকারী কারণ রূপে কার্যকরী হয়; সুতরাং রূপক্ষণকে রসক্ষণের কারণ বলিয়া স্বীকার করা আর বিচিত্র কি?

পূর্বপক্ষী এইবার আপত্তি করিতেছেন, ধূম যে কেবল অগ্নির অনন্তরই দেখা যায় তাহা নহে, কখন কখন গবাশ্বাদির অনন্তরও ধূম দেখা যায়; সুতরাং কেবলমাত্র আনন্তর্য আশ্রয় করিয়া কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার চেষ্টা করিলে নিয়মের ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। ইহার উত্তর :—

অন্যানন্তরভাবেঽপি কিঞ্চিদেব চ কারণম্।
তথৈব নিয়মাদিষ্টং তুল্যং চৈতৎ স্থিরেষ্বপি ॥ ৫৩১ ॥

অর্থাৎ, একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার অনন্তর ঘটিলেই যে সর্বত্র কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইবে তাহা নহে; অক্ষণিক পক্ষে যেমন যে-কোন কারণ যে-কোন কার্যের কারক হইতে পারে না, এখানেও সেইরূপ কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণ পরস্পর প্রতিনিয়ত (homologous) না হইলে তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই।—পরবর্তী কারিকাতেই শান্তরক্ষিত এই আলোচনা শেষ করিয়াছেন :—

যো যত্র ব্যাপৃতঃ কার্যে ন হেতুস্তস্য চেন্মতঃ।
যস্মিন্নিয়তসদ্ভাবো যঃ স হেতুরিতীষ্যতাম্ ॥ ৫৩২ ॥

অর্থাৎ, যে-বস্তু যে-কার্যে ব্যাপৃত সেই বস্তু যখন সেই কার্যের কারণ হইতে পারে না তখন স্বীকার করিতে হইবে যে যাহার সদ্ভাব ঘটিলেই কার্য ঘটে তাহাই হইল হেতু।—ইহা হইল অনাবিল প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ (তস্মিন্ সতি ইদং ভবতি), যাহা পূর্বেই একাধিক বার আলোচিত হইয়াছে।

এইরূপে প্রমাণিত হইল যে প্রথম ক্ষণকে কারণ ও দ্বিতীয় ক্ষণকে কার্যরূপে স্বীকার করিলে ক্ষণিকবাদের পক্ষ হইতেও কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রতিপাদন করা যায়। এইবার তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

ভাবাভাবাবিমৌ সিদ্ধৌ প্রত্যক্ষানুপলম্ভতঃ।
যদি সাকারবিজ্ঞানবিজ্ঞেয়ং বস্তু চেন্মতম্ ॥ ৫৩৩ ॥
যদানাকারধীবেদ্যং বস্তু যুষ্মাভিরিষ্যতে।
তৎক্ষণস্থাদিপক্ষেঽপি সমানমুপলভ্যতে ॥ ৫৩৪ ॥
পূর্বকেভ্যঃ স্বহেতুভ্যো বিজ্ঞানং সর্বমেব হি।
সমাংশকালরূপাদি বোধরূপং প্রজায়তে ॥ ৫৩৫ ॥

অর্থাৎ, বস্তুর ভাব এবং অভাব যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও অনুপলম্ভ দ্বারাই সিদ্ধ হয়—যদি অবশ্য স্বীকার করা হয় যে বস্তু সাকার বিজ্ঞানের* দ্বারাই বিজ্ঞেয়; কিন্তু পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে

* "সাকারবিজ্ঞান" বলিতে বুঝায় knowledge in the form of a particular concept. অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার Nyāya Theory of Knowledge নামক গ্রন্থে সাকার ও অনাকার বিজ্ঞান সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।

বস্তু যে-বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞাত হয় তাহা অনাকার (formless) তবে বক্তব্য, সেরূপ বিজ্ঞান ক্ষণিক-বাদের পক্ষ হইতেও সম্ভব। কারণ পূর্বগামী স্বহেতু হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞান সর্বত্রই সমকালীন রূপাদির বোধের আকারেই দেখা দেয়।—পূর্বপক্ষীর মতে স্থিরপদার্থের বিজ্ঞান যে-রূপে সিদ্ধ হয়, বৌদ্ধ মতে ক্ষণিক পদার্থের বিজ্ঞানও সেইরূপেই সিদ্ধ হইবে। পদার্থের উপলম্ভ (apprehension) সাকার বা অনাকার বিজ্ঞানের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। এই উপলম্ভ সাকার বিজ্ঞানের দ্বারা ঘটিলে সেই বিজ্ঞানের স্বাকারের অনুভবই হইবে বিজ্ঞেয়ার্থের অনুভূতি, এবং তজ্জন্য এই পক্ষে স্থিরত্ব বা ক্ষণিকত্ব বশতঃ কোন পার্থক্য দেখা যাইবে না। আর যদি বলা যায় যে উপলম্ভ অনাকার বিজ্ঞানের দ্বারা ঘটে, তাহা হইলেও উভয় পক্ষে ভেদের কোন কারণ ঘটিবে না। সুতরাং জ্ঞান যখন সমকালীন রূপাদির বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন বস্তু স্থিরই হউক আর ক্ষণিকই হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে সমকালীন প্রতিনিয়ত (homologous) রূপাদির গ্রহণই হইল জ্ঞানের স্বভাব। ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, সমকালীন পদার্থাবলীর মধ্যে যে-গুলি বাস্তবিকই দৃষ্টিজ্ঞানাদির বিষয়ীভূত সেইগুলির সম্বন্ধেই কেবল জ্ঞান সম্ভব হইবে, কিন্তু সমকালীন যে পদার্থেই ইন্দ্রিয়সংযোগ সম্ভব সেই পদার্থকেই এই মতে বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়া মনে করা যাইবে না।

পূর্বপক্ষী এখন সাকার ও অনাকার জ্ঞান সম্বন্ধে আপত্তি করিতেছেন :—

সাকারে ননু বিজ্ঞানে বৈচিত্র্যং চেতসো ভবেৎ।
নাকারানঙ্কিতত্বেঽস্তি প্রত্যাসত্তিনিবন্ধনম্ ॥ ৫৩৬ ॥

অর্থাৎ, বিজ্ঞান যদি সাকার হয় তবে চৈতন্যেরও বৈচিত্র্য দেখা যাইবে ; অপর দিকে, বিজ্ঞান যদি কোন প্রকার আকারের দ্বারাই চিহ্নিত না হয় তবে কোন বিজ্ঞানেরই কোন বৈশিষ্ট্য থাকিবে না।—বিজ্ঞানের সাকারত্ব স্বীকার করিলে কিরূপ বিপত্তির সম্ভাবনা তাহা কমলশীল বুঝাইয়া দিয়াছেন। একটি আস্তরণ যদি নানা রঙের হয় তবে কি তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানও নানা প্রকারের হইবে ? আর যদি বিজ্ঞান অনাকার হয় তাহা হইলে কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এরূপ কথা বলা চলিবে না যে তাহা নীলের অনুভূতি, পীতের নহে। বিজ্ঞান এ-অবস্থায় বোধমাত্রে পরিণত হইয়া সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবে।—বৌদ্ধ এতদুত্তরে বলিতেছেন :—

ভবদ্ভিরপি বক্তব্যে তদস্মিন্ কিঞ্চিদুত্তরে।
যচ্চাত্র বঃ সমাধানমস্মাকমপি তদ্ভবেৎ ॥৫৩৭ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যে-আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তদুত্তরে তাঁহাকেও কিছু বলিতে হইবে, এবং এই সম্পর্কে পূর্বপক্ষী যাহা বলিবেন বৌদ্ধও তাহা স্বপক্ষের সমাধান বলিয়া মানিয়া লইবেন।—শান্তরক্ষিতের এই অদ্ভুত উক্তির অর্থ এই যে পূর্বপক্ষীর আপত্তি উভয় পক্ষের প্রতিই প্রযুজ্য, কারণ বিজ্ঞানের সাকারত্ব বা অনাকারত্ব উভয় পক্ষকেই স্বীকার করিতে হইবে। নহিলে জ্ঞানের অর্থগ্রাহিত্বই সিদ্ধ হয় না। এখন বিজ্ঞানের সাকারত্ব পক্ষে পূর্বপক্ষী হয় বলিবেন যে এইরূপ আকার হইল অলীক ; অথবা বস্তুর বিজ্ঞান ও সেই বিজ্ঞানের উপলব্ধি একই সঙ্গে ঘটিয়া

থাকে (সহোপলম্ভ)—এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি বলিবেন যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের আকার ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে একই; বৌদ্ধ এই দুই মতই স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আর বিজ্ঞানের অনাকারত্ব পক্ষে পূর্বপক্ষী বলিবেন জ্ঞানের স্বভাব হইল এই যে তাহা পূর্বহেতুর দ্বারা উৎপন্ন এবং প্রতিনিয়ত অর্থের অববোধক; এই উত্তরও নিরাকার-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের অভিসম্মত।

এইরূপে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক প্রমাণ প্রতিপাদন করিয়া বৌদ্ধ এইবার দেখাইতেছেন যে কার্য ও কারণ বিভিন্ন নিরন্বয় ক্ষণের অন্তর্গত হইলেও কৃতনাশ বা অকৃতাভ্যাগমের আশঙ্কা নাই:—

কৃতনাশো ভবেদেবং কার্যং ন জনয়েদ্যদি।
হেতুরিষ্টং ন চৈবং যৎ প্রবন্ধে নাস্তি হেতুতা ॥ ৫৩৮ ॥
অকৃতাভ্যাগমোঽপি স্যাদ্যদি যেন বিনা কচিৎ।
জায়েত হেতুনা কার্যং নৈতন্নিয়তশক্তিতঃ ॥ ৫৩৯ ॥

অর্থাৎ, হেতু যদি কার্য উৎপাদন না করে তাহা হইলেই কেবল কৃতনাশের আশঙ্কা; আমরা কিন্তু বলি না যে হেতু কার্য উৎপাদন করে না, কারণ তাহাতে হেতুত্বেরই হানি হয়। নিয়ত শক্তি হইতে উৎপন্ন না হইয়া হেতু ব্যতিরেকেই যদি কার্য হয় তবে অকৃতাভ্যাগম (অকৃত কর্মের ফলপ্রাপ্তি) দুর্বার হইয়া পড়িবে।—কমলশীল কারিকাদ্বয়ের উপর এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:—যদি বাস্তবিকই কোন কর্তা বা ভোক্তা থাকিত তাহা হইলেই কেবল কৃতনাশাদির আপত্তি সম্ভব হইত; কিন্তু আমাদের মতে সমগ্র বিশ্ব যখন একটি প্রত্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন আমরা অবশ্যই স্বীকার করি না যে কোন কর্তা প্রকৃতপক্ষে কিছু করিয়া থাকে, এবং এইজন্য কৃতনাশাদির আপত্তিও আমাদের পক্ষে অবান্তর।

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে চিত্ত (অর্থাৎ বিজ্ঞান) অস্থির হওয়াতে তাহা কর্মাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত (বাসিত) হইতে পারে না। এ-কথা কিন্তু অযৌক্তিক, কারণ যাহা স্থির এবং সেইজন্য পূর্বপ্রকৃতি পরিত্যাগ করে না, তাহাকেই বরং প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হয় না। অবশ্য শাস্ত্রে স্থির ও অব্যাকৃত পদার্থকেই বাস্য (impressionable) বলা হইয়াছে (স্থিরমব্যাকৃতং বাস্যং); কিন্তু এখানে বিজ্ঞানসন্তানের একত্বই শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত, প্রকৃত স্থিরত্ব নহে। যে-সন্তান প্রতি ক্ষণেই উচ্ছিন্ন হইতেছে সেই সন্তান কখনই বহুকাল পরে যে-ফল প্রসূত হইবে তাহার কারণ রূপে পরিগণিত হইতে পারে না, এবং সেইজন্য সুদূর কালে যে-ফল উৎপন্ন হইবে তাহাকে বাসিত করার সামর্থ্যও এই সন্তানের নাই। সুতরাং বৌদ্ধ বিপক্ষবাদীর প্রকৃত মত সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ উদ্দ্যোতকর যাহা বলিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয়।

কুমারিল বলিয়াছেন:—"কোন কর্তার কৃত কর্মের বিনাশ আশঙ্কা করিয়াই যে আমরা কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমের কথা বলিয়া থাকি তাহা নহে, কারণ আপনারা (বৌদ্ধগণ (কোন কর্তার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। আমরা বলি, কর্ম ও তৎফলের যথাক্রমে নিরন্বয়

বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম আসিয়া পড়েই।" কিন্তু এই প্রকারের কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম যখন বৌদ্ধেরও ইষ্ট তখন তদ্দ্বারা বৌদ্ধের অনভিপ্রেত কিছুই প্রতিপন্ন হইল না :—

ক্ষণভেদবিকল্পেন ক্ষণনাশাদি চোদ্যতে।
যচ্চৈব নৈবানিষ্টং তু কিঞ্চিদাপাদিতং পরৈঃ ॥ ৫৪০ ॥

অর্থাৎ, পূর্বের কর্মক্ষণের যখন নিরন্বয় বিনাশ ঘটিতেছে তখন তাহা কৃতনাশ ভিন্ন আর কি? আর পূর্বক্ষণের সহিত সম্বন্ধহীন ফলক্ষণের উৎপত্তি ও যে অকৃতাভ্যাগম তাহাও আমরা স্বীকার করি।

পূর্বপক্ষী (৪৮১ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে কর্ম ও ফলের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকিলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কর্মে প্রবৃত্ত হইবে না। এ-কথার উত্তর :—

অহীনসত্ত্বদৃষ্টীনাং ক্ষণভেদবিকল্পনা।
সন্তানৈক্যাভিমানেন ন কথঞ্চিৎ প্রবর্ততে ॥ ৫৪১ ॥
অভিসংবুদ্ধতত্ত্বাস্তু প্রতিক্ষণবিনাশিনাম্।
হেতূনাং নিয়মং বুদ্ধা প্রারভন্তে শুভাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫৪২ ॥

অর্থাৎ, যাঁহাদের দৃষ্টি কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাঁহাদের নিকট সন্তানের ঐক্যই যথেষ্ট, ক্ষণাবলীর বিভিন্নতা তাঁহাদের মতে হানিকর নহে। যাঁহাদের পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে হেতু ক্ষণবিধ্বংসী হইলেও তাহা সর্বদা বিশিষ্ট ফলের সহিত নিয়ত (homologous), এবং এই জ্ঞান বশতই তাঁহারা শুভকর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হইয়া থাকেন।—কমলশীল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে এই সকল তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি বিজ্ঞানক্ষণসন্তানের একত্ব অনুধাবন করিয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশায় পরম পরিতোষ সহকারে শুভ কর্মে প্রবৃত্ত হন। যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি জনসাধারণের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা এইরূপেই যুক্তি ও আগমের সাহায্যে ক্ষণিকত্ব ও অনাত্মতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদধর্মের (law of dependent origination) যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে করুণাদিপ্রসূত দানাদি হইতে পরম্পরাক্রমে সঞ্জাত সংস্কারাবলী ক্ষণিক হইলেও তাহা হইতে স্বীয় ও পরকীয় কল্যাণ সাধিত হয়; হিংসাদি হইতে কিন্তু এরূপ কোন শুভ সংস্কার জন্মায় না। কর্ম ও ফলের এই পারস্পরিক নিয়ম অবধারণ করিয়া প্রবুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।—কমলশীল এখানে যাহা বলিয়াছেন তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৎপদার্থ কিছুই নাই, সবই তাঁহার নিকট প্রত্যয় (idea) মাত্র। কিন্তু যাহার সত্তাই নাই তাহাতে নিয়মও কিছু থাকিতে পারে না, সুতরাং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতাই সদ্ধর্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে! বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যে এই চিন্তাধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পরে বহু অনাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু

প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মে যে এই প্রকার অনাচারের কোন স্থান ছিল না তাহার যদি কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় তবে তাহা কমলশীলের এই সুস্পষ্ট উক্তির মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

পূর্বপক্ষী (৪৯৩ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে ক্ষণিকত্ব সত্য হইলে প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় না। তাহার উত্তরে শান্তরক্ষিত এখন বলিতেছেন :—

কেষাঞ্চিদেব চিত্তানাং বিশিষ্টা কার্যকার্যিতা।
নিয়তা তেন নির্বাধাঃ সর্বত্র স্মরণাদয়ঃ ॥ ৫৪৩ ॥

অর্থাৎ, কার্যকারণতা কতকগুলি চিত্তের বৈশিষ্ট্য মাত্র; প্রতিনিয়ত স্মৃত্যাদি সেইজন্য সর্বত্র নির্বাধ।—পারমার্থিক অর্থে বাস্তবিক কোন স্মর্তা বা অনুভবিতা নাই যে বলা যাইতে পারে যাহার অনুভূতি তাহার পক্ষেই কেবল স্মৃতি সম্ভব। প্রকৃত কথা এই যে, তীক্ষ্ণ অনুভূতির বাসনার (impression) ফলে উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর ক্ষণাবলীর উৎপত্তিবশতঃ বিজ্ঞানসন্তানে যে-স্মৃত্যাদির বীজ সমাহিত হয় তাহা হইতেই স্মরণাদি জন্মিয়া থাকে; স্মৃতি যত্রতত্র সম্ভব হয় না, কারণ হেতু ও কার্য সর্বত্র প্রতিনিয়ত * (homologous)। কথিত হইয়াছে :—

অন্যস্মরণভোগাদিপ্রসঙ্গশ্চ ন বাধকঃ।
অস্মৃতেঃ কস্যচিত্তেন হ্যনুভূতে স্মৃতোদ্ভবঃ ॥

অর্থাৎ, একের অনুভূতি অন্য স্মরণ করিবে—এই প্রকারের আপত্তি সম্পূর্ণ নিষ্ফল (কারণ আমরা এ-কথা বলি না); ব্যক্তি স্বয়ং যাহা অনুভব করিয়াছে তাহারই কেবল স্মৃতি সম্ভব, অপর কোন ব্যক্তির অনুভূত বিষয়ে স্মৃতি সম্ভব নহে।—অতএব ক্ষণিকত্ব সত্ত্বেও স্মৃতি যখন সম্ভব তখন প্রত্যভিজ্ঞার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পূর্বপক্ষী (৪৯৬ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে ক্ষণভঙ্গ সত্য হইলে বদ্ধের মুক্তি বা মুক্তের বন্ধন কখনও সম্ভব হয় না। এ-কথার উত্তর :—

কার্যকারণভূতাশ্চ তত্রাবিদ্যাদয়ো মতাঃ।
বন্ধস্তদ্বিগমাদিষ্টো মুক্তির্নির্মলতা ধিয়ঃ ॥ ৫৪৪ ॥

অর্থাৎ, আমাদের মতে কার্যকারণভাবে পর্যবসিত অবিদ্যাদিই হইল বন্ধন; এই অবিদ্যাদি অপসৃত হইলেই চিত্তের নির্মলতা আসে ও মুক্তিলাভ হয়।—কোন বিশেষ ব্যক্তির বন্ধন বা মুক্তি যে সম্ভব তাহাই আমরা স্বীকার করি না, কারণ আমাদের মতে ব্যক্তিসত্তাই অসিদ্ধ। অবিদ্যাদি সংস্কার জরামরণ পর্য্যন্ত দুঃখোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে বলিয়াই আমরা বলি যে এ-গুলি বন্ধন। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে এই অবিদ্যাদি অপসৃত হইলে চিত্তের যে নির্মলতা লাভ হয় তাহাই হইল মুক্তি।

---

* যত্র সন্তানে পটীয়সানুভবেনোত্তরোত্তরবিশিষ্টতরতমক্ষণোৎপাদাৎ স্মৃত্যাদিবীজমাহিতং তত্রৈব স্মরণাদয়ঃ সমুৎপদ্যন্তে নান্যত্র, প্রতিনিয়তত্বাৎ কার্যকারণভাবস্যেতি সমাসার্থঃ।

কমলশীল এই সম্পর্কে অতি সুন্দর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :-

চিত্তমেব হি সংসারো রাগাদিক্লেশবাসিতম্।
তদেব তৈর্বিনির্মুক্তং ভবান্ত ইতি কথ্যতে ॥

অর্থাৎ, রাগাদি ক্লেশের (impurity) দ্বারা অনুবিদ্ধ চেতনাই হইল বিশ্বসংসার; চেতনার এই রাগাদি হইতে মুক্ত অবস্থার নামই ভবান্ত।

পূর্বপক্ষী (৪৯৯ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে বন্ধন ও মুক্তি একই অধিকরণে না হইলে সমস্তই নিষ্ফল হয়, অথচ বিপরীত এই দুই ধর্ম একাধিকরণে সমন্বিত হইতে পারে না। এ-কথার উত্তরে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

একাধিকরণৌ সিদ্ধৌ নৈবৈতৌ লৌকিকাবপি।
বন্ধমোক্ষৌ প্রসিদ্ধং হি ক্ষণিকং সর্বমেব তৎ ॥ ৫৪৫ ॥

অর্থাৎ, লৌকিকার্থেও বন্ধন ও মুক্তি কখনও একাধিকরণে সিদ্ধ হয় না, সুতরাং এরূপ যুক্তি উত্থাপন করা ন্যায়সঙ্গত নহে। সবই যখন ক্ষণিক তখন একাধিকরণে বন্ধন ও মুক্তি কিরূপে সম্ভব হইবে?—কমলশীল দেখাইয়া দিয়াছেন যে পূর্বপক্ষীর দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকলতা (absence of probandum in the probans) দোষে দুষ্ট।

এইরূপে স্বপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্তরক্ষিত উপসংহারে পরপক্ষ নিরসনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :—

সর্বথাতিশয়াসত্ত্বাদ্ব্যাহতা ত্বাত্মনীদৃশী।
কর্তৃভোক্তৃত্ববন্ধাদিব্যবস্থানিত্যতান্যথা ॥ ৫৪৬ ॥

অর্থাৎ, অতিরিক্ত কোন কিছুর উৎপত্তি যখন সর্বতোভাবে অসম্ভব তখন আত্মাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, বন্ধন প্রভৃতির ব্যবস্থা অযৌক্তিক; অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মাও অনিত্য।—রাগাদি ক্লেশ অথবা ভাবনাদির দ্বারা যদি আত্মার কোন বৈলক্ষণ্য (অতিশয়) সম্ভব হইত তাহা হইলেই আত্মার বন্ধন অথবা মোক্ষ সম্ভব হইত। কিন্তু নিত্যতাবশতঃ আত্মাতে বৈলক্ষণ্যোৎপত্তি যখন সম্ভবই নয় তখন প্রতিনিয়ত কার্যকারণের লক্ষণানুযায়ী মুক্তি বা বন্ধনও আত্মাতে স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ পূর্বপক্ষীর আত্মা হইল আকাশের ন্যায় সর্ববৈলক্ষণ্যশূন্য। আর আত্মাতে যদি অতিশয়োৎপত্তি বাস্তবিক সম্ভব হয় তবে সেই অতিশয় (additional characteristic) হইবে আত্মারই অংশবিশেষ এবং আত্মাকেও সেই অতিশয়াংশ হইতে পৃথক্ করা যাইবে না; ফলে আত্মাই হইয়া পড়িবে অনিত্য। পূর্বপক্ষী একথাও বলিতে পারিবেন না যে উৎপন্ন অতিশয় আত্মা হইতে পৃথক্, কারণ সে-অবস্থায় যে আত্মার সহিত উৎপন্ন অতিশয়ের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না তাহা পূর্বেই বহুবার দেখান হইয়াছে (শতধা চর্চিতম্)।

ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয়

[আলোচনা]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

'মহাভারতীয় প্রমাণ এবং জ্যোতিষিক কল্যাদি বৎসরের অসামঞ্জস্য' দেখাইতে গিয়া প্রবোধ বাবু স্বীকার করিয়াছেন '৩১০২-০১ খ্রী° পূ° অব্দ ১৯৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দের তিথি নক্ষত্রানুসারে সদৃশ। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের জ্যেষ্ঠা অমাবস্যার তারিখ ২৫এ নভেম্বর, ও ৩১০২ খ্রী° পূ° ভারত-যুদ্ধ বৎসর ধরিলে উত্তরায়ণ দিবস ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯এ ফেব্রুয়ারীর সদৃশ। সকলেই দেখিবেন এই দুই তারিখের অন্তর ঠিক ৯৬ দিন পাওয়া যায়।

এক্ষণে মহাভারত হইতে প্রাপ্ত যুদ্ধ-বর্ষের প্রমাণগুলি সাজান হইতেছে :—

১। (১ম) রেবতী নক্ষত্র—শ্রীকৃষ্ণের সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরব শিবিরে গমন।

২। (৯ম) পুষ্যা „ —সন্ধির চেষ্টা ব্যর্থ ও দুর্যোধনের কুরুক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণের আদেশ।

৩। (১৬শ) স্বাতী „ —অমাবস্যা।

৪। (১৮শ) অনুরাধা „ —বলদেবের শ্রীকৃষ্ণকে কৌরবপক্ষ অবলম্বনে সম্মত করাইতে অসমর্থ হইয়া পাণ্ডব শিবির পরিত্যাগ।

৫। (২৩শ) শ্রবণা „ —বলদেবের যাদবগণ সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রা।

৬। (৩৬শ) পুষ্যা „ —পাণ্ডব সৈন্যগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান।

৭। (৪৬শ) জ্যেষ্ঠা „ —অমাবস্যা যুদ্ধারম্ভ।

৮। (৬৩তম) পুষ্যা „ —যুদ্ধের শেষ দিবস ও বলদেবের আগমন।

এখানে অন্য সমস্ত প্রমাণই মহাভারতোক্তির সহিত মিলিয়াছে। কেবলমাত্র যুদ্ধের চতুর্দশ রাত্রিতে রাত্রিযুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহাতে বর্তমান মহাভারতে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষে চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বর্ণনাটুকুই ভারত সাবিত্রী বচনের স্বপক্ষে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। যে শ্লোকটি দ্বারা ইহা যে প্রক্ষিপ্ত প্রমাণিত হয় তাহা এই :—

'হরবৃষোত্তমগাত্রসমদ্যুতিঃ স্মরশরাসনপূর্ণ সমপ্রভঃ।
নববধূস্মিতচারুমনোহরঃ **প্রবিসৃতঃ** কুমুদাকরবান্ধবঃ ॥' (দ্রোণ-১৮৫-৪৮)

এখানে শব্দটি স্পষ্ট আছে 'প্রবিসৃতঃ' (প্র-প্রকর্ষেণ, বিসৃতঃ-বিগতঃ-সৃগতো) অর্থাৎ চন্দ্র অস্ত গেলেন। তারপর চন্দ্রের যে বর্ণনা এখানে আছে তাহা কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর (বা চতুর্দশীর) অতি ক্ষীণ চন্দ্রের বর্ণনা কখনই হইতে পারে না। ইহা শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীর অর্থাৎ প্রায় পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনা বলিয়া বুঝা যাইবে। তারপর প্রশ্ন এই—

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী রাত্রিতে রাত্রিযুদ্ধ কিভাবে সম্ভব হয়? সেকালে যেভাবে যুদ্ধ হইত তাহাতে একপক্ষ অপর পক্ষকে চিনিবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীর চন্দ্রের আলোকে বরং উভয় পক্ষকে চিনিয়া যুদ্ধ করার সম্ভাবনা থাকে। প্রবোধ বাবু বলিবেন 'যথাচন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ ক্ষুভিতঃ সাগরোঽভবৎ। তথা **চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ** স বভূব বলার্ণবঃ ।।' (দ্রোণ ১৮৫-৫৫) এই শ্লোকটি চন্দ্রোদয়ের প্রমাণ। অর্থাৎ এখানে বলা হইয়াছে যেমন চন্দ্রোদয় হইলে সমুদ্র উদ্ধূত ও ক্ষুভিত হয় তদ্রূপ চন্দ্রোদয় হেতু এই বলসমুদ্র (সেনাসমূহ) উদ্ধূত হইয়া উঠিল। এখানে দেখিবার বিষয় যেমন চন্দ্রোদয়োদ্ধূত সাগরের অবস্থা তদ্রূপ চন্দ্রোদয়োদ্ধূত সৈন্যসমূহের অবস্থা। প্রথম উপমাটি চন্দ্রবিষয়ক। দ্বিতীয় উপমাটিও চন্দ্রবিষয়ক হইতে পারে না, ইহা চন্দ্রোদয়ের ন্যায় অপর কোন বিষয়ের হইবে। চন্দ্রোদয়ের সহিত বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর অতি ক্ষীণ চন্দ্রোদয়ের সহিত নিদ্রিত সৈন্যগণের বল লাভের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ কিছু সময় নিদ্রিত ও বিশ্রাম লাভের পর সৈন্যগণ বল লাভ করিল—ইহাই প্রকৃত বক্তব্য বুঝা যাইবে। সুতরাং দ্বিতীয় 'চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ' শব্দটি 'নিদ্রোত্থিতোদ্ধূতঃ' বা এরূপ কোন শব্দ হইবে মনে হয়। ভারত সাবিত্রীকার-মতে কৃষ্ণপক্ষের প্রমাণ স্বরূপ কেহ এই পরিবর্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আমার এই অনুমান কতদূর সঙ্গত তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

এক্ষণে জ্যোতিষিক প্রমাণের সাহায্যে ভারতযুদ্ধবর্ষ যে ৩১০০ খ্রীঃ পূঃর আসন্ন আইসে তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

পুরাণ হইতে আমরা পাই যেদিন শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন সেইদিন হইতে কলিযুগের আরম্ভ। 'যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবম্যাতঃ তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নম্ কলিযুগম্ ইতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ।।' এ মতে 'ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূৎ' অর্থাৎ ভারতযুদ্ধ দ্বাপরের শেষে ও কল্যারম্ভের অল্প পূর্বে সংঘটিত হয়। অপর অনেকের মতে কল্যারম্ভ বর্ষেই ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভান্তে ৩৬ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করণানন্তর পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। 'ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজন্ সাগরান্তাং বসুন্ধরাং। মাসৈঃ ষড়্ভিঃ মহাত্মানঃ সর্বে কৃষ্ণ পরায়ণাঃ। রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্ট্যাংগতিমবাপ্নুবন্।।' (আদিপর্ব ১২০ অ)। সর্বভারতীয় কিম্বদন্তীমতে ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ কল্যারম্ভকাল। প্রথম মতে ৩১৩৯ খ্রীঃ পূঃ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধকাল। দ্বিতীয় মতে ৩১০২ খ্রীঃ পূঃই ভারতযুদ্ধবর্ষ। আমরা জানি ১৯ বা ১৯×২, ইত্যাদি বর্ষানন্তর তিথি নক্ষত্রের পুনরাবৃত্তি হয়। সুতরাং ৩১০২ খ্রীঃ পূঃর ও ৩১৪০ খ্রীঃ পূঃ র তিথি নক্ষত্রের অবস্থান একই। ৩১৪০ খ্রীঃ পূঃ ভারতযুদ্ধবর্ষ হইলে ঐ বর্ষের শেষে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ। সুতরাং ৩১০৩ খ্রীঃ পূঃর প্রায় শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেন। তৎপরেই ৩১০২খ্রীঃ পূঃ হইতে কল্যারম্ভ।

এক্ষণে ৩১৪০-৩৯ খ্রীঃ পূঃ ও ৩১০২-০১ খ্রীঃ পূঃ উভয় বর্ষেরই ভারতযুদ্ধ সংক্রান্ত দিন **সমূহের সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির অবস্থান পর পৃষ্ঠায় tabular form এ দেখান হইতেছে :—**

৩১৪০-৩৯ খ্রীঃ পূঃ

১। ৩১৪০ খ্রীঃ পূঃ ১১ই সেপ্টেম্বর **পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণ**—সূর্যের সায়নস্ফুট ১৪৩°.৮

২। " " " ১৮ই " (ভোর ৬টা), চন্দ্র সায়নস্ফুট ২৩৮°.৩ ; "
(চন্দ্র শ্রবণা যোগ) শ্রবণা তারার সায়ন স্ফুট—২৩০°.০ }
" " ধ্রুবক – ২৩৭°.৭ }

৩। " " ২৬এ সেপ্টেম্বর (বেলা ৫টা বৈকাল)—**খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ**—
(পূর্ণিমা) চন্দ্রস্ফুট—৩৩৯°
সূর্যস্ফুট – ১৫৯°
চন্দ্র সায়ন ধ্রুবক – ৩৪০°
কৃত্তিকা (Alcyone) তারার সায়ন ধ্রুবক – ৩৪৭°.৫

৪। " " খ্রীঃ পূঃ ১১ই অক্টোবর (ভোর ৬টা)—সূর্য সায়ন স্ফুট—১৭৪°.০
(যুদ্ধারম্ভ দিন) (অমাবস্যা) চন্দ্র " " —১৭৬°.১
জ্যেষ্ঠা (Antares) তারা-সায়ন স্ফুট – ১৭৭°.৭ }
" সায়ন ধ্রুবক—১৭৭°.০ }
অমান্ত গত রাত্রি ২টা ৪৭ মিঃ। 'মধ্যম' অমান্ত বেলা ৯টা ৩০ মিঃ।

৫। " " ১২ই অক্টোবর—যুদ্ধের প্রথম দিবস।

৬। " " " ২১এ অক্টোবর—যুদ্ধের দশম দিবস—ভীষ্মের পতন।

৭। " " " ২৯এ অক্টোবর—যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস—চন্দ্রসায়ন ধ্রুবক – ৫৩°.০ }
(অপরাহ্ণ ৬টা) পুষ্যা (ε Cancri) তারা সায়ন ধ্রুবক—৫৬°.২ }

৮। ৩১৩৯ খ্রীঃ পূঃ ১৫ই জানুয়ারী – সূর্য সায়ন স্ফুট—২৭১°.৪ } শুক্লাষ্টমী আরম্ভ ;
(ভোর ছয়টা) চন্দ্র " " —৩৫৫°.৪ } উত্তরায়ণ।
ভীষ্মপ্রয়াণ।

খ্রীঃ পূঃ ৩১০২—০১

১। ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ—২৭এ আগষ্ট **খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ** (কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট)।
পূর্ণিমান্তকালে চন্দ্রস্ফুট ৩০৮°.৮ ; সূর্যস্ফুট ১২৮°.৮।

১ক। ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ ১২ই সেপ্টেম্বর **পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ**—সূর্যস্ফুট—১৪৪°.৪।

২। ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ—১৮ই সেপ্টেম্বর – সায়ন চন্দ্র স্ফুট—২৩০°.৮
(সন্ধ্যা ৬টা চন্দ্র শ্রবণা যোগ)। শ্রবণা (Altair) তারা স্ফুট—২৩০°.৫

৩। ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ—২৬এ সেপ্টেম্বর – (সন্ধ্যা ৬টা) চন্দ্র সায়ন স্ফুট ৩৪২°.৪
(পূর্ণিমা) কৃত্তিকা (Alcyone) তারা সায়ন স্ফুট—৩৪৮°.৮

৪। ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ ১১ই অক্টোবর অমাবস্যা।

৫। ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ ১২ই অক্টোবর সূর্য সায়ন স্ফুট ১৭৪°.৮ } অমান্ত গত রাত্রি
যুদ্ধের প্রথম দিবস (ভোর ছয়টা) চন্দ্র „ „ ১৭৭°.০ } ১টা ৫০ মিঃ।
জ্যেষ্ঠা (Antares) তারা সায়নধ্রুবক ১৭৭°.৫

৬। ... ... ২১এ অক্টোবর—যুদ্ধের দশম দিবস—ভীষ্মের পতন।

৭। ... ... ২৯এ অক্টোবর—যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস
(সন্ধ্যা ৬টা) চন্দ্র সায়ন ধ্রুবক ৫৫°.৩
পুষ্যা (ε Cancri) তারা সায়ন ধ্রুবক ৫৬°.৮

৮। ৩১০১ খ্রীঃ পূঃ ১৫ই জানুয়ারী সূর্য সায়ন স্ফুট—২৭১°.১ } শুক্লাষ্টমী।
(ভোর ছয়টা) চন্দ্র ... ... ০°.৯ } উত্তরায়ণ।
ভীষ্মপ্রয়াণ।

উপরোক্ত গণনা সমূহ হইতে দেখা যাইবে ৩১৪০ বা ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ ১২ই অক্টোবর হইতে প্রকৃত যুদ্ধারম্ভ। ১১ই অক্টোবর প্রকৃত পক্ষে the eve of the battle. যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের পতন হইলে তিনি মাত্র ৯ রাত্রি যুদ্ধ করেন। কিন্তু ভীষ্ম দেবের পতনের পরই ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় আসিয়া বলিতেছেন—'আজি সেই বীরঘাতী মহাবীর ভীষ্ম দশরাত্র আপনা সেনাগণকে রক্ষা ও দুষ্কর কর্ম সমূহ সম্পাদন করিয়া......'। ('পরিরক্ষ্য স সেনাংতে দশরাত্রং অনীকহা। জগামাস্তমিবাদিত্যঃ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্॥'—ভীষ্মপর্ব ১৩-১১)। সুতরাং ১১ই অক্টোবর অমান্ত দিবস হইতেই যুদ্ধের আরম্ভ, পরদিন প্রভাত হইতেই প্রকৃত যুদ্ধারম্ভ—actual clash. ২১এ অক্টোবর ভীষ্মের পতন দিন। ২৯এ অক্টোবর যুদ্ধের শেষ দিন। ঐ দিন বলদেব দুর্য্যোধন ও ভীমের গদা যুদ্ধ দর্শন করিতে আসেন। সন্ধ্যায় দুর্যোধন নিহত হন ও সে সময় চন্দ্র পুষ্যা-যোগ হইয়াছিল। ১৮ই সেপ্টেম্বর চন্দ্র শ্রবণা যোগ দিবসে বলদেব তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। সুতরাং ঠিক দ্বাচত্বারিংশ দিবসে ২৯এ অক্টোবর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫ই জানুয়ারী উত্তরায়ণ দিবসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেবের মহাপ্রয়াণ। আরও দেখিবার বিষয়, মহাভারত যুদ্ধকাল সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনাকারীই স্বীকার করিয়াছেন যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বেই একপক্ষ ব্যবধানে একটি চন্দ্র ও একটি সূর্য গ্রহণ হইয়াছিল। (It has generally been considered that there were two eclipses before the great battle, one at time of new-moon, and the other at the time of full-moon.) ৩১৪০ খ্রীঃ পূঃ যুদ্ধ বৎসর হইলে দেখা যাইবে যুদ্ধারম্ভ দিন ১১ই অক্টোবরের পূর্ব পূর্ণিমায় ২৬এ সেপ্টেম্বর বর্তমান জ্যোতিষিক সারণী দৃষ্টে গণনায় একটি খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল পাওয়া যায়। Oppolzer সাহেবের বিখ্যাত সারণী (Syzygien Tafeln Furden Mond) সাহায্যে গণনায় ঐ দিন পূর্ণিমান্ত কুরুক্ষেত্রকাল ৪টা ২২ মিনিট পাওয়া যায়। চন্দ্র গ্রহণের গ্রাসমান ৭.৪ অঙ্গুল ও স্থিত্যর্ধ—১ ঘণ্টা ২৩ মিঃ। কিন্তু ঐ দিন সূর্যাস্ত ৬টা ২১ মিনিটে হওয়ায় এই গ্রহণ কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল না। পূর্ণিমান্তকাল ও

চন্দ্রপাতের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই এই গ্রহণ পূর্ণগ্রাস ও কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই সব প্রচীন কালের গ্রহণাদি গণনা সম্বন্ধে দুই এক কথা সংক্ষেপে বলিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিব। প্রাচীন কালের যে সব গ্রহণের প্রমাণ জ্যোতিষীগণ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, সেই সব গ্রহণের কাল, দেশ প্রভৃতি স্থির করিয়া বর্তমান কালের গ্রহণ প্রমাণের সহিত মিলাইয়া তাঁহারা চন্দ্র, সূর্য ও চন্দ্রপাত প্রভৃতির গতি নির্ণয় করিয়া তাহার সাহায্যে প্রাচীন ও ভবিষ্যৎ কালের অবস্থান প্রভৃতি গণনা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপরোক্ত পূর্ণিমান্তকাল Oppolzer মতে বেলা ৪টা ২২মি: (কুরুক্ষেত্রকাল) Dr. Schram ও Ginzel এর সারণীমতে ঐ পূর্ণিমান্তকাল বেলা ১২টা। আধুনিককালে Dr. Neugebauer ও পরলোকগত Schoch (বিখ্যাত জার্মাণ দেশীয় গাণিতক জ্যোতিষী) সাহেবদের মতে ঐ পূর্ণিমান্ত প্রায় বেলা ২টায় হইয়াছিল। জ্যোতিষী হিপার্কাসের গ্রন্থে একটি সূর্য গ্রহণের সংস্থানাদির উল্লেখ আছে। কিছুকাল পূর্বের পাশ্চাত্য জোতিষীগণ এই গ্রহণটি হিপার্কসের শেষ জীবনে ১২৯ খ্রী: পূ: তে সংঘটিত হইয়াছিল ও তিনি উহা Hellespont হইতে পূর্ণগ্রাস-রূপে দেখিয়াছিলেন স্থির করেন। ফলে Newcomb সাহেবের সারণীও এই সব প্রমাণের বলে প্রস্তুত হয়। পরলোকগত Schoch বহু ব্যাবিলোনীয় প্রভৃতি প্রমাণের বলে হিপার্কাসের দৃষ্টান্তে সন্দেহ করেন। বর্তমান Dr. Neugebauer সাহেবের বিশ্বাস গ্রহণ সংস্থান ৩১০ খ্রী: পূ: অব্দের Timocharis এ প্রদত্ত Agthocles এর সময়ের এই গ্রহণ-সংস্থান। হিপার্কাস ইহা নিজ গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। Schoch প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ এই মত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে চন্দ্রপাতের অবস্থানে সংস্কার প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। বর্তমান কালের বিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতিষী Brown সাহেবের সারণীতেও নানা কারণে Neugebauer সাহেব প্রাচীন কালের গ্রহণাদি গণনা বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। ব্যাবিলোনীয় কতকগুলি প্রাচীন (অনুমান ৪০০ খ্রী: পূ: অব্দের) প্রমাণের (cuneiform text) গণনায় Brown সাহেবের সারণীমতে অমান্ত পূর্ণিমান্ত প্রভৃতি গণনায় তিনি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার ভুল পাইয়াছেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমাকে একটি দৃষ্টান্ত জানাইয়াছেন। ব্যাবিলোনীয় একটি লিপিতে ৪১৯ খ্রী: পূ:তে শুক্রগ্রহ ও চন্দ্রের যোগের বিষয় উল্লিখিত আছে। Brown সাহেবের সারণী সাহায্যে গণনায় এই যোগ ব্যাবিলন হইতে মোটেই দৃষ্ট হয় না—সূর্যোদয়ের ৪৫ মিনিট পর সংঘটিত হয়। সুতরাং এই সব অতি প্রাচীন কালের গণনা যে কতদূর সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে। মহাভারতে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যে বর্ণনা আছে—'অলক্ষ্যঃ প্রভয়া হীনাং পৌর্ণমাসীং চ কার্তিকীং। চন্দ্রোঽভূদ্ অগ্নিবর্ণশ্চ পদ্মবর্ণে নভস্তলে'। ইহা হইতে সে সময় যে একটি চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল এ অনুমান অনেকেই করিয়াছেন। পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণেই চন্দ্র অগ্নিবর্ণ copper hued দৃষ্ট হয়। ইহা ৩১৪০ খ্রী° পূ° ২৬এ সেপ্টেম্বর চন্দ্র গ্রহণটি হওয়ার সম্ভব। আবার এই পূর্ণিমার পূর্বে অমাবস্যায় ১১ই সেপ্টেম্বর পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণ হইয়াছিল। এই অমান্ত কুরুক্ষেত্রকাল।

৩টা ৪৩ মিনিটে হইয়াছিল ও এই গ্রহণ কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় কুরুক্ষেত্র হইতে এই গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল না, এরূপ পাওয়া যায়। আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে ২৬এ সেপ্টেম্বর কার্তিকী পূর্ণিমা গেল। পরবর্তী ১০ই অক্টোবর অমাবস্যা চলিতেছে। সুতরাং ২৭এ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত ১৩ দিন। ভারতযুদ্ধের পূর্বে নানাবিধ দুর্নিমিত্তের মধ্যে ত্রয়োদশ দিনে পক্ষের বিষয় উল্লেখ আছে। ৩১০২ খ্রী° পূ° তে ২৬এ সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা দিবসে গণনায় কোন গ্রহণ পাওয়া যায় না। তবে ঠিক পূর্ব আশ্বিন অমান্তে ১১ই সেপ্টেম্বর একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। Oppolzer এর সারণী মতে গণনায় এই সূর্য গ্রহণ কুরুক্ষেত্র হইতে খণ্ডগ্রাস (গ্রাসমান ৪.৫ অঙ্গুল) রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। আবার ঠিক এই অমান্তের পূর্ব আশ্বিন পূর্ণিমায় ২৭এ আগষ্ট একটি খণ্ডগ্রাস চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল ও ইহা কুরুক্ষেত্র হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ভীষ্ম—পর্বে এই সূর্য গ্রহণ ও রাহুর অবস্থান যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর মিলিয়া গিয়াছে। শ্লোকার্থ এই:— 'অভীক্ষ্ণং বর্ততে ভূমিরর্কং রাহুরুপৈতি চ। শ্বেতোগ্রহস্তথাচিত্রাং সমতিক্রম্য তিষ্ঠতি॥' (ভীষ্মপর্ব ৩ ১১)। নীলকণ্ঠ টীকায় লিখিতেছেন 'কার্তিক্যাপরংহি সংগ্রামারম্ভস্তত্রতুলাস্থমর্কং রাহুরুপৈতি; তদেব শ্বেতো গ্রহ: কেতু: চিত্রামতিক্রামতি স্বাত্যাদৌ বর্ততে।' ৩১৪০ খ্রী' পূ° ১১ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রপাত সায়ন স্ফুট ১৫২°, স্বাতী (Arctures) তারার সায়ন ধ্রুবক ১৪৮°.২; সূর্যের সায়নস্ফুট ১৪২°.৯; চিত্রা (Spica) তাহার সায়ন স্ফুট ১৩২°.৭। ৩১০২ খ্রী° পূ° ১২ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রপাতের সায়ন স্ফুট ১৩৭°; সূর্যের সায়ন স্ফুট ১৪৩°.৫; চিত্রা (Spica) তারার সায়ন স্ফুট ১৩৩°.৩। সুতরাং উভয় বর্ষেই ঐ তারিখে রাহু বা চন্দ্র পাতের স্থান চিত্রা তারার পর 'চিত্রামতিক্রাম্য তিষ্ঠতি।' চিত্রা স্বাত্যন্তরে চৈবধিষ্ঠিত: পরুষগ্রহ:' (ভীষ্মপর্ব-৩-২৭) (পরুষগ্রহ: রাহু: ইতি নীলকণ্ঠ:)। স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে প্রবোধ বাবুর অনুমিত ২৪৪৯ খ্রী: পূ: তে যুদ্ধারম্ভ দিনের পূর্বে তিন মাসের মধ্যেও কোনই গ্রহণ হয় নাই, রাহু প্রভৃতির সংস্থানে মোটেই মিল নাই ও বহু-পার্থক্য। এ কারণ প্রবোধ বাবুর অনুমিত ভারত যুদ্ধকাল যে গ্রহণীয় নহে তাহা বেশ বুঝা যায়। যুদ্ধের প্রাক্‌কালের কয়েকটি গ্রহের সংস্থান যাহা মহাভারতে পাওয়া যায় তাহা ৩১০২ খ্রী: পূ°তে মিল পাওয়া যায়। ৩১০২ খ্রী° পূ° ২৬এ সেপ্টেম্বর কার্তিকী পূর্ণিমা দিনের কুরুক্ষেত্র কাল বেলা ১২টায় বিভিন্ন গ্রহাদির সায়ন স্ফুট এই—সূর্য ১৫৯°.১; চন্দ্র ৩৩৯°.১; শুক্র ১৮৩°.৩; মঙ্গল ৮৪°৪; বৃহস্পতি ৩৪০.°২; শনি ২৭৫°.০; মঘা (Regulus) তারা ৭৯°৭; পূর্ব ফল্গুনী (δ Leonis) তারা ৯০°.৫। পূর্বোক্ত সংস্থান হইতে দেখা যাইবে মঙ্গল গ্রহ মঘা নক্ষত্র বিভাগে রহিয়াছেন। ভীষ্মপর্ব ৩ অ ১৪ শ্লোকে আছে 'মঘাস্বঙ্গারকো বক্র: শ্রবণে চ বৃহস্পতি:। ভগম্ নক্ষত্রমাক্রম্য সূর্য পুত্রেণ পীড্যতে'॥ মঘা নক্ষত্রে মঙ্গল ইহা সুন্দর মিলিয়া গেল। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত এই শ্লোকের অর্থ মঙ্গল মঘা নক্ষত্রে ও বক্র এরূপ অর্থ ধরিয়া ৩১০২ খ্রী: পূ: তে কার্তিক অমাবস্যার ধারে কাছে ইহা সংঘটিত হয় নাই—অতএব এই সব প্রমাণ

অবিশ্বাস করিয়াছেন। পরলোকগত দেওয়ান বাহাদুর স্বামী কান্ত পিলাই তাঁহার 'Astronomical References in the Mahabharata' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : "Certain well-known passages quoted above especially no. 5 state that Mars was retrograde in the Magha nakshatra or shorty before the time of the great battle ... ... So far as the writer is aware neither Mr. Vaidya in his 'Mahabharata---a criticism...nor any of the writers on the subject of Mahabharata chronology, have adverted to the circumstance that it is not astronomically possible for the planet Mars to retrograde in the Maghā nakshatra about the time of Kārtika amāvāsyā or for some days later (in 3102 B. C.)." বস্তুতঃ এই শ্লোকের 'বক্র' পরবর্তী উল্লিখিত বৃহস্পতি গ্রহের সম্বন্ধেই হইবে। ভীষ্মপর্বের এই অধ্যায়ের ২৭ শ্লোক দৃষ্টে বুঝা যাইবে শনি ও বৃহস্পতি সে সময় বক্রী ছিলেন। 'সংবৎসর স্থায়িনৌ······বৃহস্পতিশনৈশ্চরৌ।' নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন 'বিশাখায়াং বেধেন বৃহস্পতিশ্চাস্তি।' ভরণী নক্ষত্রে বৃহস্পতি থাকিলে ঠিক বিপরীত ভাগে (diametrically opposite স্থানে) বিশাখা নক্ষত্র পাওয়া যায়। গণনায়ও পাওয়া যায় ৩১০২ খ্রীঃ পূঃতে এ সময় বৃহস্পতি ও শনি বক্রী ছিলেন। শনৈশ্চর ২৬ এ সেপ্টেম্বরের ৯ দিন পর বক্রত্যাগ করেন। বৃহস্পতি গ্রহ ২৬এ সেপ্টেম্বরের প্রায় দুই মাস পূর্বে বক্রী হন ও ঐ তারিখের প্রায় দুই মাস পরে বক্রত্যাগ করেন। অপর বৃহস্পতি তখন ভরণী নক্ষত্রে ছিলেন। সুতরাং আমার মনে হয় শ্লোকটি এরূপ হইবে:—'মঘাস্বঙ্গারকো। বক্রো ভরণ্যাঞ্চ বৃহস্পতিঃ।' অথবা 'মঘাস্বঙ্গারকো। বক্রৌ শনৈশ্চর বৃহস্পতী।' পরের ছত্রে 'ভগম্ নক্ষত্রমাক্রম্য সূর্যপুত্রেণ পীড্যতে॥' শনি পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া পীড়া দিতেছে—ইহা ফলিত জ্যোতিষের একটি cross aspect-বিরুদ্ধ অবস্থান diametrically opposite position এ থাকার ফল। ঐ সময় শনির সায়ন স্ফুট ২৭৫°.০। ইহা হইতে ১৮০° অংশ দূরে পূর্বে ফল্গুনীনক্ষত্র (δ Leonis) তারার সায়ন স্ফুট ৯০°.৫। পরের শ্লোকের 'শুক্র প্রোষ্ঠপদে পূর্বে সমারুহ্য বিরোচতে।' ইহাও ঐরূপ ফলিত জ্যোতিষের অবস্থান বলিয়া মনে হয়। ঐ দিনের শুক্রের অবস্থান ১৮৩°.৩। ইহার ঠিক ৯০° অংশ পরের স্থানই উচ্চ স্থান। এই স্থানের স্ফুট ২৭৩°.৩। শতভিষা (λ Aquarius) তারার ৩১০২ খ্রীঃ পূঃর সায়ন স্ফুট ২৭১°.০। সুতরাং ২৭৩°.৩ অংশ পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে। নীলকণ্ঠের টীকা পড়িলেও বুঝা যাইবে এখানে অনেকগুলি ফলিত জ্যোতিষের অবস্থান উল্লিখিত হইয়াছে। সি, ভি, বৈদ্যও এই মত সমর্থন করেন।

সুতরাং পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ভারত যুদ্ধ কাল যে অনুমান ৩১০০ খ্রীঃ পূঃতে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অবিশ্বাসের কোনও সঙ্গত কারণ আছে কিনা সুধীবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন।

প্রবোধ বাবু ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ অব্দকে জ্যোতিষিক কল্প্যাদি ও উহা একটি কল্পনা মাত্র

বলিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি Burgess সাহেবের সূর্য সিদ্ধান্তানুবাদ যাহাতে Bailly, Bentley ও Burgess-এর গণনার ফল দেখান আছে, তাহা দেখিতে বলিয়াছেন। Burgess সাহেবের মত 'It seems hardly to admit of a doubt that the epoch was arrived at by astronomical calculation arried backwardই উদ্ধার করিয়া প্রবোধ বাবু বলিতেছেন 'আমরা অবশ্য পুনরায় গণনা করিয়া এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। তাহা অনাবশ্যক মনে করি যেহেতু তিন ব্যক্তিই যখন গণিয়া একই ফল পাইয়াছেন তখন পুনরায় গণনা অনাবশ্যক।' প্রবোধ বাবুর এই মন্তব্য পড়িয়া দুঃখিত হইয়াছি। এই তিনজনের গণনায় কয়েকস্থানে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ইহা দেখিয়া Burgess সাহেব নিজেই বলিতেছেন 'The want of agreement between the results of the three different investigations illustrate the difficulty and uncertainty even yet attending inquiries into the position of the heavenly bodies at so remote an epoch.' যে সব কারণে এই সব অতি-প্রাচীন কালের গণনায় পার্থক্য হওয়ার সম্ভব তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই কলিযুগাদি দিবসের (৩১০২ খ্রীঃ পূঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী) গ্রহ সংস্থানের গণনা পরলোকগত প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী Schoch সাহেবও করিয়াছেন। তাঁহার গণনামতে কুরুক্ষেত্রকালে ঐ দিবসারম্ভের (মধ্য রাত্রি) বিভিন্ন গ্রহাদির সায়ন স্ফুট এই :— সূর্য—৩০৩°.৮ ; চন্দ্র-৩০১°.৪ ; বুধ-২৮৮°.৪ ; শুক্র—৩১৬°.৩ ; মঙ্গল-৩০০°.৩ ; বৃহস্পতি ৩১৭°,'৫ ও শনি ২৭৫°.৬। এই দিবস দেখা যাইবে একমাত্র শনৈশ্চর ব্যতীত প্রায় সমস্ত গ্রহই সূর্যের অতি নিকটে আসিয়াছে। শনৈশ্চর সূর্য হইতে একরাশির অভ্যন্তরে আছে। সুতরাং সমস্ত গ্রহের সম্বন্ধেই 'একরাশৌ সমেষ্যন্তি' বলা যায়। এই অমান্ত দিবসের ঠিক একপক্ষ পর ৩১০২ খ্রী° পূঃ ৪ঠা মার্চ মধ্য রাত্রির বিভিন্ন গ্রহাদির সায়ন স্ফুট Neugebauer-Schoch সাহেবদিগের সারণী অনুসারে এরূপ পাওয়া যায়। সূর্য-৩১৯°.২ ; চন্দ্র-১৩৯°.২ ; চন্দ্রপাত ১৪৬°.৬ ; বুধ-৩১৯°.৮ শুক্র-৩৩৫°.৬ ; মঙ্গল-৩১২°.২ ; বৃহস্পতি-৩২১°.৩ ; শনি-২৭৭°.৩। গণনায় ইহাও পাওয়া যায় যে ঐ রাত্রিতে ভারতবর্ষ হইতে দৃষ্ট একটি খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। এই সময়ে অশ্বিনী (β Arietis) তারার সায়ন স্ফুট-৩২৩°.৪ ; (সায়ন ধ্রুবক ৩২০°.৭)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সময় শনি ব্যতীত সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের অশ্বিনীর আদিতে একত্র সমাবেশ হইয়াছে ও চন্দ্র ঠিক বিপরীতভাগে চিত্রার আদিতে অবস্থিত (এই সময় চিত্রা তারার সায়ন স্ফুট-১৩৩°.৩)। সুতরাং এই চৈত্র পূর্ণিমা দিবসে গ্রহগণের যেরূপ সমাযোগ দৃষ্ট হয় তাহাতে এই দিবস হইতেই সেই প্রাচীন কালে কলিযুগারম্ভ হয়ত ধরা হইয়াছিল। পরে হয়ত কোনও কারণে পূর্ব অমান্ত হইতে যুগারম্ভের কিম্বদন্তী প্রচলিত হইয়াছে।

আর এই ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ তে মঘা (Regulus) তারার সায়ন স্ফুট ৭৯°.১ অর্থাৎ এই তারার ১০°,৫ অংশ পূর্বেই দক্ষিণায়ন স্থান। সুতরাং অনুমান ৩১০০ খ্রী° পূ° তে মঘা তারার

অতি আসন্ন পূর্ববর্তী স্থানে পূর্ণিমান্তকালে চন্দ্র থাকিলে তাহার প্রায় ৮দিন পর উত্তরায়ণ দিন ও ইহাই প্রকৃত মাঘী অষ্টকায় উত্তরায়ণ। প্রবোধ বাবুর অনুমিত ২৪৪৯ খ্রীঃ পূঃ তে মঘা তারার সায়নস্ফুট—৮৭°.১ অর্থাৎ মঘা তারার পূর্ণিমার মাত্র তিনদিন পর উত্তরায়ণ।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের বিমাতা রোহিণী। রোহিণী (Aldebaran) তারাই বৈদিক সাহিত্যের সেই গাভী। এই গাভী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অনুমান ৩১০০ খ্রী: পূঃ তে রোহিণী তারাতেই বিষুবন্ অবস্থিত ছিল। অপর দক্ষিণায়ন ঠিক সেই সময় পূর্ব ফল্গুনী (δ Leonis) তারায় অবস্থিত। ফল্গুনী নক্ষত্রের অপর নাম অর্জুনী নক্ষত্র অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় সখা। এই সব রূপক হইতেও শ্রীকৃষ্ণাজুর্নের প্রকৃত সময় যে অনুমান ৩১০০ খ্রী: পূ: তাহা বুঝা যাইবে। রোহিণী (Aldebaran) তারা Hyades group এর প্রধান তারা। এই Hyades groupই হিন্দু জ্যোতিষে রোহিণীর শকটরূপে কল্পিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে খ্রীস্টাব্দের আরম্ভকালে যখন মেষের আদিতে বিষুবন্ অবস্থিত তখন যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাব ও মেষ (Aries Lamb) যীশুর অত্যন্ত প্রিয়। এই সব রূপকও কাল নির্ণয়ের সহায়ক বলিয়াই মনে হইবে।

এতাবৎ যাহা উক্ত ও প্রমাণাদি সংগৃহীত হইল তাহাতে ৩১০২ খ্রী° পূ°ই ভারত যুদ্ধের প্রকৃত কাল ইহা সমর্থিত হইয়াছে কিনা তাহা সত্যান্বেষী সুধীবর্গ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া মতামত প্রকাশ করিবেন এই অনুরোধ।

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২৫) বিদ্যারণ্য—ইনি বিখ্যাত সায়ণাচার্যের ভ্রাতা এবং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ (১) বেদান্তে—(ক) পঞ্চদশী (খ) সর্বদর্শন-সংগ্রহ (গ) বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ (ঘ) অনুভূতি-প্রকাশ (ঙ) জীবন্মুক্তি বিবেক (চ) অপরোক্ষানুভূতির টীকা (ছ) ১০৮ উপনিষদের টীকা (জ) সুত সংহিতার টীকা (ঝ)ঐতরেয় উপনিষদ্ দীপিকা (ঞ) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ দীপিকা (ট) ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দীপিকা (১) বৃহদারণ্যক বার্তিকসার (৬) শঙ্কর বিজয় (শঙ্করের জীবনী)।

(২) মীমাংসায়—জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

(৩) ব্যাকরণে—মাধবীয় ধাতুবৃত্তি।

(৪) স্মৃতিতে (ক) পরাশর মাধব (খ) কালমাধ। ইনি শঙ্করানন্দের সমাধিমন্দির এরূপভাবে নির্মাণ করাইয়া ছিলেন যে সূর্যালোকপাতে মাস, তিথি প্রভৃতি সব নির্ণীত হইবে।

ইঁহাদের পরেই মাধ্ব ও রামানুজ সম্প্রদায়ের কয়েকজন পণ্ডিত স্ব স্ব মত স্থাপনে চেষ্টা করেন। আর তাঁহাদের পরে আবির্ভূত হইলেন—

(২৬) অনুভূতি স্বরূপাচার্য—ইঁহার সময় ১৩-১৪ শ খ্রী: অ:। ইঁহার রচিত গ্রন্থ (ক) গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্যভাষ্যের টীকা (খ-গ) আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দের উপর 'সংগ্রহ' টীকা ও ন্যায়দীপাবলীর উপর 'চন্দ্রিকা' টীকা (ঘ) প্রমাণামালার উপর নিবন্ধ-টীকা (ঙ) সারস্বতসূত্রের উপর সারস্বত প্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ।

(২৭) আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি—ইনি শঙ্কর সম্প্রদায়ের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও টীকাকার। মাধ্ব সম্প্রদায়ের যেমন বিশিষ্ট টীকাকার ছিলেন জয়তীর্থ, ইনিও শঙ্কর সম্প্রদায়ের তদ্রূপ ছিলেন। ইনি ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হ'ন। সম্ভবত: ইনি গুজরাট দেশবাসী ও দ্বারকামঠের অধীশ ছিলেন। ইঁহার রচিত ৩২ খানি গ্রন্থ পাওয়া যায় (১-৪) শঙ্করকৃত ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় ভাষ্যের টিপ্পন (৫) কেনোপনিষদ্ বাক্য-বিবরণব্যাখ্যা (৬) মাণ্ডুক্য ভাষ্য ব্যাখ্যা (৭) মাণ্ডুক্য গৌড়পাদীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা (৮) তৈত্তিরীয় ভাষ্য বার্তিক টীকা (৯) ছান্দোগ্য ভাষ্য টীকা (১০) বৃহদারণ্যক ভাষ্য বার্তিক টীকা 'শাস্ত্র প্রকাশিকা' (১১) বৃহদারণ্যক ভাষ্য টীকা 'ন্যায় নির্ণয়' (১২) শারীরক ভাষ্য টীকা 'ন্যায় নির্ণয়' (১৩) গীতাভাষ্য বিবেচন (১৪) প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্য টীকা (১৫) ঐতরেয় ভাষ্য টীকা (১৬) পঞ্চীকরণ বিবরণ (১৭) বেদান্ততর্ক সংগ্রহ (১৮) উপদেশ সাহস্রী-টীকা (১৯) বাক্যবৃত্তি টীকা (২০) বেদান্ত-তত্ত্বালোক (২১) শতশ্লোকী টীকা (২২) আত্মজ্ঞানোপদেশ বিধি টীকা (২৩) শঙ্কর কৃত স্বরূপ

নির্ণয়ের টীকা (২৪) ত্রিপুরী বা ত্রিপুটী প্রকরণ টীকা (২৫) গঙ্গাপুরী ভট্টারক কৃত পদার্থ তত্ত্ব নির্ণয়ের উপর বিবরণ (২৬) চুলুকোপনিষদ্ টীকা (২৭) গুরুস্তুতি (২৮) শঙ্কর বিজয় (২৯) বৃহৎ শঙ্কর বিজয় (৩০) মিতভাষিণী (৩১) শঙ্করাবতার কথা (৩২) হড়িমীড় স্তোত্র টীকা।

(২৮) নরেন্দ্রগিরি—ইনি আনন্দজ্ঞানের সতীর্থ। ইঁহার গ্রন্থ যথা (ক) ঈশাভাষ্য টীপ্পন (খ) পঞ্চপাদিকা বিবরণ (গ) সারস্বত প্রক্রিয়া টীকা।

(২৯) প্রজ্ঞানানন্দ—ইনিও আনন্দজ্ঞানের সতীর্থ ও তাঁহার রচিত বেদান্ত তত্ত্বালোকের উপর 'তত্ত্ব প্রকাশিকা' টীকা লিখিয়াছেন।

(৩০) অখণ্ডানন্দ—ইনি আনন্দগিরির শিষ্য। পঞ্চপাদিকার উপর 'তত্ত্বদীপন' নামে ১টী টীকা ইনি লিখিয়াছেন।

(৩১) প্রকাশানন্দ সরস্বতী—ইঁহার সময় সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ১৫শ শতাব্দীর ১ম ভাগ। ইনি কাশীধামে থাকিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই সহিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বিচার হইয়াছিল। ইঁহার গ্রন্থ—বেদান্তসিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।

(৩২) রঙ্গরাজঅধ্বরী (বা বক্ষস্থলাচার্য)। ইনি বিখ্যাত অপ্পয় দীক্ষিতের পিতা এবং ইঁহার সময় আনুমানিক ১৫শ খৃঃ অঃ। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) অদ্বৈতবিদ্যামুকুর (খ) পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর দর্পণ টীকা।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বল্লভাচার্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, নীলকণ্ঠ শিবাচার্য প্রমুখ অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণের আবির্ভাব হয় ও অদ্বৈতবেদান্তের ধারায় বহু বাধার সৃষ্টি হয়। এই সব বাধার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিলেন—

(৩৩) মল্লনারাধ্যাচার্য—ইনি দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হ'ন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ অদ্বৈতরত্ন বা অভেদরত্ন।

(৩৪) নৃসিংহ আশ্রম—ইনি আনুমানিক ১৫২৫—১৬০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে আবির্ভূত হ'ন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ যথা—(ক) পঞ্চপাদিকাবিবরণের ভাবপ্রকাশিকা টীকা (খ) সংক্ষেপ শারীরকের ব্যাখ্যা (গ) তত্ত্ববোধিনী (ঘ) মল্লনারাধ্যের অভেদরত্নের উপর 'তত্ত্বদীপন' টীকা (ঙ) ভেদধিক্কার (চ) বৈদিক সিদ্ধান্ত সংগ্রহ (ছ) অদ্বৈতদীপিকা।

(৩৫) নারায়ণ আশ্রম—ইনি নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—গুরুকৃত (ক) অদ্বৈতদীপিকার উপর 'বিবরণ' টীকা (খ) ভেদধিক্কারের উপর 'সৎক্রিয়া' টীকা (এই সৎক্রিয়া টীকার উপর আবার শুদ্ধানন্দ শিষ্যকৃত সৎক্রিয়োজ্জ্বলী নামক ১ টীকা আছে।

(৩৬) অপ্পয় দীক্ষিত—ইনি রঙ্গরাজ অধ্বরীর পুত্র এবং দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীর নিকটস্থ অডপ্পয়ন্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অদ্বৈতবেদান্তের একজন সর্বশাস্ত্রবিদ্ ধুরন্ধর ছিলেন। প্রথমে ইনি শৈববিশিষ্টাদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন এবং নৃসিংহ আশ্রম ইঁহাকে অদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। ইঁহার সময় প্রায় ১৫২০—১৫৯৩ খৃঃ অঃ। ইঁহার রচিত ১০৮ খানি গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে প্রধানগুলি যথা—(ক) ন্যায় রক্ষামণি (খ) সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ

(গ) বেদান্তকল্পতরুর উপর পরিমল টীকা (ঘ) ন্যায়মঞ্জরী (ঙ) ন্যায়ময়ূখমালা (ইহা বৈষ্ণব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ গ্রন্থ)। শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের গ্রন্থ—(চ) শিবার্কমণি দীপিকা (ছ) রত্নত্রয় প্রকাশিকা (সভাষ্য) (জ) মণিমালিকা। দ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থ (ঝ) ন্যায়মুক্তাবলী (সভাষ্য)। অলঙ্কারের গ্রন্থ (ঞ) চিত্র-মীমাংসা (ট) বৃত্তিবার্তিক (ঠ) জয়দেবের চন্দ্রালোক টীকা (ড) কুবলয়ানন্দ। মীমাংসার গ্রন্থ (ঢ) বিধিরসায়ন (ণ) উহার ভাষ্য—সুখোপযোজনি (ত) উপক্রম পরাক্রম (থ) বাদনক্ষত্রাবলী (দ) চিত্রকূট। কাব্য—(ধ) মহাভারত তাৎপর্য-নির্ণয় (ন) রামায়ণ তাৎপর্য-নির্ণয়। প্রাকৃত ব্যাকরণ—(প) প্রাকৃত চন্দ্রিকা (সভাষ্য) সাধারণ দর্শন—(ফ) মতসারার্থ সংগ্রহ (ব) মধ্বতন্ত্রমুখমর্দন। স্তোত্রাদি—বরদরাজ স্তব, শ্রীকৃষ্ণধ্যান পদ্ধতি, শিবানন্দলহরী, শিখরিণীমালা, শিবতত্ত্ববিবেক ও শিখরিণী ভাষ্য, দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতি, আদিত্যস্তোত্ররত্ন প্রভৃতি।

(৩৭) সদানন্দ যোগীন্দ্র—ইনি প্রায় ১৫০০ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হ'ন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—বেদান্তসার। ইহাকে অদ্বৈতবেদান্তের সরলভাষায় লিখিত প্রাথমিক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইহার উপর রামতীর্থ, নৃসিংহ সরস্বতী ও আপোদেব-কৃত ৩ খানি টীকা আছে। ইনি কাশীতে থাকিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেন।

(৩৮) রামতীর্থ স্বামী—ইনি আনুমানিক ১৪৭৫-১৫৭৫ খৃঃ অঃ মধ্যে আবির্ভূত হ'ন; ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) বেদান্তসারের উপর বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা (খ) উপদেশ সাহস্রীর টীকা (গ) পঞ্চীকরণের উপর আনন্দ জ্ঞানের যে টীকা আছে তাহার টীকা।

(৩৯) ভট্টোজী দীক্ষিত—ইনি অপ্পয় দীক্ষিতের শিষ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—ব্যাকরণের উপর (ক) সিদ্ধান্ত কৌমুদী (খ) শব্দ-কৌস্তভ। বেদান্তের উপর (গ) তত্ত্ব-কৌস্তভ (ঘ) নৃসিংহাশ্রমের বেদান্ত তত্ত্ব বিবেকের উপর ---"বিবরণ" টীকা। ইঁহার সময় ১৫৫০-১৬৫০ খৃঃ অব্দ মধ্যে।

(৪০) রঙ্গোজী ভট্ট--ইনি ভট্টোজী দীক্ষিতের ভ্রাতা এবং নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য। ইঁহার গ্রন্থ—অদ্বৈত চিন্তামণি।

(৪১) নীলকণ্ঠসূরি---ইনি মহাভারতের অদ্বৈতমতপর বিখ্যাত টীকাকার এবং শিব তাণ্ডবতন্ত্রেরও টীকাকার।

(৪২) সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র—ইনি অপ্পয় দীক্ষিতের সমসাময়িক। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) অদ্বৈত বিদ্যাবিলাস (খ) বোধার্যাত্ম নির্বেদ (গ) গুরুরত্ন মালিকা (ঘ) ব্রহ্ম কীর্তন-তরঙ্গিণী।

ইহার পরেই—অন্যান্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্য এবং বিশেষতঃ মাধ্ব সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ব্যাসরায়াচার্য আবির্ভূত হ'ন। ইঁহার রচিত 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থে অদ্বৈত বেদান্তের বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি হইতে পারে তাহার একত্র সমাবেশ আছে, আর এই প্রবলতম বাধা প্রতীকারের জন্য আবির্ভূত হইলেন মহামতি মধুসূদন সরস্বতী।

[ক্রমশঃ]

ন্যায় প্রবেশ

পূর্বানুবৃত্ত

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

ইতর-ব্যাবর্তক—যে-লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য বস্তুকে অন্য অলক্ষ্য সমুদায় হইতে পৃথক্ করা যায় তাহা **ইতর ব্যাবর্তক** লক্ষণ।

যেমন—গরুর লক্ষণ গলকম্বল। 'লক্ষণ' কথাটী প্রধানতঃ ইতর-ব্যাবর্তক লক্ষণকে বুঝায়। কোন কোন লক্ষণ দ্বারা ব্যবহারসিদ্ধি ও ইতরব্যাবৃত্তি উভয়ই হইয়া থাকে। যেমন—গোত্ব। ইহার দ্বারা 'এইটা গরু' এইরূপ ব্যবহারসিদ্ধি এবং অশ্বাদি হইতে ভেদসাধন এই দুই কাজই চলে।

লক্ষণ ঠিক হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য লক্ষণের দোষ বিষয়ে পরিজ্ঞান আবশ্যক।

লক্ষণের দোষ

অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি ও অসম্ভব প্রধানতঃ এই তিনটী দোষ লক্ষণে ঘটিয়া থাকে।

অতিব্যাপ্তি—লক্ষণ যদি কোন অলক্ষ্য বস্তুতে থাকে তাহা হইলে **অতিব্যাপ্তি** দোষ হয়।

মনে কর গরুর লক্ষণ করিতে হইবে। গো-মাত্রই লক্ষ্য। সকল গরুরই লাঙ্গুল আছে দেখিয়া যদি কেহ বলেন—লাঙ্গুল গরুর লক্ষণ (লাঙ্গুলবান্ গৌঃ) তবে অলক্ষ্য অশ্বাদিরও লাঙ্গুল থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। ফলে লাঙ্গুল গরুর লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অব্যাপ্তি—লক্ষণ যদি কোনও লক্ষ্যে থাকে অথচ কোন লক্ষ্যবিশেষে না থাকে, তবে **অব্যাপ্তি** দোষ হয়।

মনে কর পৃথিবীর লক্ষণ করিতে হইবে। মনুষ্যশরীর, কৃষিক্ষেত্র, ইষ্টক, প্রস্তর, বৃক্ষ, কাচ, তৈল, ঘৃত, তুলা প্রভৃতি সকল পার্থিব বস্তু লক্ষ্য। এক্ষণে যদি কেহ বলেন—কাঠিন্য পৃথিবীর লক্ষণ (কাঠিন্যবতী পৃথিবী) তবে বৃক্ষ প্রস্তর প্রভৃতি লক্ষ্য বস্তুতে "কাঠিন্য" আছে বলিয়া ঐগুলিতে লক্ষণ-সমন্বয় হইল, কিন্তু ঘৃত, তুলা প্রভৃতিতে কাঠিন্য না থাকায় অব্যাপ্তি দোষ হইবে। অতএব "কাঠিন্য" পৃথিবীর লক্ষণ হইতে পারে না।

অসম্ভব—যদি কোন একটি লক্ষ্য স্থলেও লক্ষণ না থাকে তবে **অসম্ভব** দোষ হয়।

কেহ বলিল—লাঙ্গুল মনুষ্যের লক্ষণ (লাঙ্গুলবান্ মনুষ্যঃ)। সকল মানুষই লক্ষ্য। কিন্তু কোন মনুষ্যেরই লাঙ্গুল নাই। সুতরাং অসম্ভব দোষ হইল। অতএব লাঙ্গুল মনুষ্যের লক্ষণ নহে।

এইরূপ দোষাক্রান্ত ধর্মগুলি লক্ষণ নহে, উহারা লক্ষণাভাস। লক্ষণাভাসে উক্ত দোষত্রয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটী দোষ ঘটিবেই[১]।

---

১ এতদ্ব্যতীত বৈয়র্থ্য গৌরব প্রভৃতি আরও অনেক লক্ষণের দোষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পদার্থ

যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা সকলই পদার্থ। এমন কিছুই কল্পনা করা যায় না, যাহার কোনও নাম নাই। কারণ, নামের সহযোগেই বস্তু সকল বুদ্ধির বিষয় হয়[১]। যে সকল বস্তু নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে আবিষ্কর্তা নিজেই তাহার কোন নাম দিয়া থাকেন। তিনি কোন বিশেষ নাম না দিলেও উহা নিশ্চয়ই 'বস্তু' এই সাধারণ নামের যোগ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি বিশেষ নাম না থাকিলেও 'বস্তু' এই সামান্য নামের যোগ্য নহে এমন কিছুই হইতে পারে না। ঐ সকল বিশেষ ও সামান্য নামকে 'পদ' বলে। নাম বা পদ শব্দ বিশেষ, উহা আমরা কাণে শুনিয়া থাকি। নাম শুনিবার পরে যে-সার একটি বস্তুর জ্ঞান হয় উহা ঐ নাম বা পদের অর্থ[২]। অতএব যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাই পদার্থ। পদ+অর্থ=পদার্থ।

লক্ষণ। প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি পদার্থের লক্ষণ[৩]।

'প্রমা' শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। যাহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় তাহা প্রমেয় (প্র+মা+য, কর্ম্মবাচ্যে) প্রমেয়ের ধর্ম প্রমেয়ত্ব। যাহাতে পদের শক্তি থাকে তাহা পদশক্য বা অভিধেয়। অভিধেয়ের ধর্ম অভিধেয়ত্ব বা পদশক্যত্ব।

লক্ষ্য। পদার্থ লক্ষণের অলক্ষ্য কিছুই নাই, সকলই লক্ষ্য। বিভাগ দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে।

সমন্বয়। 'বৃক্ষ' এই শব্দটী শুনিবার পরে শাখা, পল্লব, পুষ্প, ফল শোভিত ভূমির উপরে অবস্থিত যে বস্তুটী যথার্থ বুদ্ধির বিষয় হয় উহা ঐ শব্দের ('বৃক্ষ' শব্দের) অর্থ শক্য বা বাচ্য। অতএব শাখা-পল্লবাদিবিশিষ্ট ঐ বস্তুটী বৃক্ষপদার্থ।

ভাব সমূহের ন্যায় অভাবগুলিও পদার্থ। কারণ, ঘটে জল নাই (ঘটে জলং নাস্তি) অগ্নি উষ্ণ, শীতল নহে (অগ্নিরুষ্ণঃ, ন শীতলঃ) ইত্যাদি স্থলে 'নঞ্' পদ হইতে অভাবের স্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে। বিশেষ এই যে, অভাবগুলি কোনও ভাবের অপেক্ষা না রাখিয়া কখনও স্বতন্ত্র-রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় না। উক্ত উদাহরণে যথাক্রমে (জলের) অত্যন্তাভাব ও (শীতলের) অন্যোন্যাভাব বা ভেদ 'নঞ্'পদের অর্থ। অতএব 'অভাব পদার্থ নহে' ইহা বলা অসঙ্গত।

কেবলমাত্র "নাই, নাই; নহে, নহে" ইত্যাদি শব্দ হইতে কোন ও জ্ঞান হয় না

১। ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
'অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন ভাসতে॥ বাক্যপদীয়,—১ম কাণ্ড, ১২৪ শ্লোক।

২। পদ ও উহার অর্থ অভিন্ন ইহা অতি প্রাচীন মত। ন্যায়শাস্ত্রে এই মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। রূপ-রস, ঘট-পট প্রভৃতি শব্দই শুক্ল, তিক্তাদি গুণ এবং ঘট বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাকারে পরিণত হয় এইরূপ শব্দ পরিণামবাদও খুব পুরাতন। দ্রব্য গুণাদি পদার্থ সকল শব্দের দ্বারাই আরব্ধ হয় স্বতন্ত্র রূপে উহাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই ইহা অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত।

৩। 'প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ' সপ্তপদার্থী।

সত্য, কিন্তু যখন অন্য কোন ভাব বস্তুর সহিত উহার যোগ হয় তখনই উহা (নঞ্-পদ) হইতে অর্থ বোধ হইয়া থাকে ইহা অনুভবে বুঝা যায়। এইরূপ ভাবপরতন্ত্রতা অভাবের স্বাভাবিক ধর্ম।

পদার্থের সামান্য লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিভাগ প্রদর্শিত হইবে ১।

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে বিভাগ বিষয়ে গ্রন্থকারগণ স্বাধীন। অতএব একই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থকারগণের পদার্থ-বিভাগ একরূপ হইবে ইহা আশা করা যায় না।

মহর্ষি গৌতম পদার্থ সমূহকে প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি প্রকারে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। উক্ত বিভাগে অভাবের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বৈশেষিকদর্শনের অন্য অনেক সূত্রে অভাবের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। অতএব কণাদ মতে পদার্থ সাত প্রকার।

বিভাগসূত্রে অভাবের নির্দ্দেশ না থাকার কারণ বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে, অভাব সকল ভাবপরতন্ত্র বলিয়া মহর্ষি উহার স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ আবশ্যক মনে করেন নাই। সেজন্য কেবল ষড়্বিধ ভাব-পদার্থই সূত্রে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

(বৈশেষিক দর্শন ১অ ১আ ৪র্থ সূত্র টীকা)

মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভবদেব ভট্ট শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি কণাদের পদার্থ বিভাগ প্রদর্শক সূত্রের "দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায়াভাবানাং" এই প্রকার পাঠ গ্রহণ করিয়া পদার্থবিভাগে অভাবও কণাদের পরিগণিত বলিয়াছেন। কণাদ মত অনুসরণ করিয়া বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন পদার্থ সমূহকে সাতপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন।

নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কামৃত গ্রন্থে 'পদার্থ ভাব ও অভাব ভেদে দ্বিবিধ' এই প্রকার বিভাগ করিয়া 'ভাব পদার্থ দ্রব্য, গুণ ইত্যাদিরূপে ষড়্বিধ' এইরূপ প্রবিভাগ করিয়াছেন। ফলতঃ তর্কামৃতে বৈশেষিক মতই অনুসৃত হইয়াছে। উপরে জগদীশের পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে।

বিভাগ ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকিলেও গ্রন্থকারগণ সাধারণতঃ বিভক্তবস্তুর বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিভাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বস্তুর বৈচিত্র্য প্রয়োজনানুসারে গৃহীত হয়। সুতরাং বিভাগবিষয়ে মতভেদ থাকিলে উহার মূলে কোনও প্রয়োজন থাকা সম্ভব। অতএব ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের পদার্থ বিভাগে মতভেদের প্রয়োজন অনুসন্ধান করিতে হইবে।

উল্লিখিত দুইটী শাস্ত্রের পদার্থ বিভাজক সূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে বৈশেষিক দর্শন প্রমেয়প্রধান এবং ন্যায়সূত্র প্রমাণপ্রধান অর্থাৎ কি কি বস্তু প্রমাণসিদ্ধ প্রধানতঃ তাহা বুঝাইবার জন্য মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্র রচনা করিয়াছেন প্রমাণাদির আলোচনা উহার প্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রমেয় নিরূপণই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ন্যায় সূত্রের প্রধান উদ্দেশ্য প্রমাণ নিরূপণ। বস্তু সকল কিভাবে প্রমাণিত করতে হয়, প্রমাণের দোষ কিভাবে ঘটিয়া থাকে, দুষ্ট প্রমাণ কিরূপে বস্তু সাধনে অক্ষম হয় ন্যায়দর্শনে এই সকল আলোচনাই সমধিক। এই প্রসঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রে অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পদার্থ বিভাগ

পদার্থ দ্বিবিধ২ —ভাব ও অভাব

পদার্থতত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াও উভয় শাস্ত্রকারের প্রয়োজনগত এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় দুই শাস্ত্রে কচিৎ মতভেদও উপস্থিত না হইয়াছে এমন নহে, তবে বহু বিষয়েই ইহারা সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং ন্যায় সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থ কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের সীমা অতিক্রমণ করে নাই। এই জন্যই ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র 'সমান তন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাব কিরূপে সম্ভব হয় পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

সাংখ্য শাস্ত্রের পদার্থ বিভাগ অনেকটা নূতন ধরণের। উহাতে কার্য কারণ ভাবই পরিস্ফুট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যাবতীয় সৃষ্টির মূল কারণ। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্র এই ষোলটী অহঙ্কারের কার্য। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের মধ্যে শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশের, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর, রূপতন্মাত্র হইতে তেজের, রস-তন্মাত্র হইতে জলের এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের পদার্থ নিরূপণ এই ভাবে মূল প্রকৃতি হইতে কার্যাভিমুখে নামিয়া আসিয়া পঞ্চ মহাভূতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। উক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং এতদ্ব্যতীত চেতন পুরুষের গণনায় উক্ত মতে পদার্থ পঞ্চবিংশতি। সাংখ্যশাস্ত্রে উহারা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই শাস্ত্রে পরিণাম ও বিকার একই বস্তু।

পাতঞ্জল দর্শনেও সাংখ্যের এই প্রণালী গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর নামে নির্দেশ করায় ঈশ্বর ও তদ্ভিন্ন (অর্থাৎ জীব) এইরূপে চেতনের দ্বিবিধ বিভাগ পাতঞ্জল মতে স্বীকার্য।

বেদান্ত শাস্ত্রের পদার্থ বিভাগও সাংখ্য শাস্ত্রের ন্যায় কার্য কারণ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পঞ্চ-মহাভূতে সমাপ্ত করা হইয়াছে। বিশেষ এই যে ইহার সৃষ্টিক্রম চেতন হইতে আরব্ধ এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর প্রাজ্ঞ, তৈজস, ও বিশ্ব প্রভৃতি চেতন বস্তুর বিভাগে বিস্তৃত। ইহাতে মায়া বা অবিদ্যা ব্যতীত বৈশেষিক বহির্ভূত নূতন পদার্থের স্বীকার দৃষ্টহয় না।

২। গুরুমতে অর্থাৎ প্রভাকর আচার্যের মতে 'অভাব' নামে কোন পৃথক্ পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। ভাব পদার্থ গুলিই অবস্থা বিশেষে অভাব বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং এই মতে পদার্থের উক্ত প্রকারে বিভাগ সম্ভব হয় না।

তুতাতভট্ট মতে পদার্থ চতুর্বিধ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্য।

জয়নারায়ণ বিবৃতি (বৈশেষিক সূত্রটীকা) ৩৮৩ পৃঃ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে যে যুগাবতার মহাপুরুষ শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন—যাঁহার পূত চরিতকথা ও অপূর্ব মানবলীলা লক্ষ লক্ষ নর নারীর প্রাণে অপরূপ ধর্মপ্রেরণা জাগাইয়া দেয়—আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমা তাঁহার শুভ আবির্ভাব-তিথি। শ্রীচৈতন্যের জন্মকথা ও জীবন-লীলা এবং উপদেশ ভারতের ও ভারতেতর স্থানের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই অবগত; বিশেষতঃ বাংলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারী সকলেই শ্রীচৈতন্যের চরিত-কথা শুধু অবগত নহে—তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের অবতাররূপে পূজা করে। তাঁহার জন্ম-তিথি মাসে তাঁহার দেবচরিত কথা ও উপদেশের সামান্য আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খৃঃ অব্দ. ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে) সন্ধ্যা ৬।৭ টার সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে যখন ভারতবাসী দোললীলা বা হোলি উৎসবে মগ্ন, আর চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তনে মাতোয়ারা, সেই শুভ মুহূর্তে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ-ধামে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন শ্রীহট্টবাসী পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মাতা ছিলেন নবদ্বীপ নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর গুণবতী কন্যা শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষের বাস ছিল উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর। সেখান হইতে রাজা ভ্রমরের ভয়ে ইঁহারা শ্রীহট্টে বাস স্থাপন করেন। ইঁহার পিতা উপেন্দ্র মিশ্রের ৭টী পুত্র। জগন্নাথ মিশ্র তৃতীয়। নবদ্বীপ ছিল সে সময়ে বাংলা দেশের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। জগন্নাথ মিশ্র পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে আসেন। নবদ্বীপে সে সময় রামভদ্র ভট্টাচার্য, নীলাম্বর চক্রবর্তী ও মহেশ্বর বিশারদ এই ৩জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। জগন্নাথ বিশারদের টোলে ভর্তি হইলেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া 'পুরন্দর' উপাধি লাভ করেন। ইঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী স্বীয় কন্যা শচীদেবীকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। ইঁহাদের ৭টী কন্যা ও ২টী পুত্র হয়। সকল কন্যাগুলিরই অকাল মৃত্যু হয়। তারপর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ শাস্ত্রচর্চা করিয়া ১৬ শ বর্ষ বয়ঃক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম হইল শ্রীশঙ্করারণ্য পুরী। অবশিষ্ট ২য় পুত্র নিমাই (শ্রীচৈতন্যের বাল্যনাম) শোকাতুর পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন রহিলেন। পুত্রের (বয়স তখন মাত্র ৫।৬ বৎসর) লেখাপড়ার জন্য পিতা তত মনোযোগ করিলেন না—কারণ তাঁহার মতে "এহ যদি সর্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে প্রয়াণ॥" (চৈতন্য ভা, আদি)। পিতামাতার আদরের জন্য বাল্যকালে নিমাই অশান্ত-প্রকৃতি হইলেন। শিশুসুলভ দুষ্ট প্রকৃতির অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনীতে দেখিতে পাই। পিতা বাধ্য

হইয়া দুরন্ত ছেলেকে পাঠশালায় পাঠালেন। প্রথমে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার তিনজন শিক্ষাগুরুর নাম পাওয়া যায়---গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন। অতিমানব নিমাই-এর তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও একাগ্রতা শীঘ্রই তাঁহাকে সংস্কৃত সাহিত্যে, ব্যাকরণে ও ন্যায়ে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত করিয়া তুলিল। যখন নিমাই-এর বয়স এগার বৎসর তখন জগন্নাথ মিশ্রের দেহত্যাগ হয়। পিতৃকৃত্য সমাপান্তে তিনি পুনরায় গঙ্গাদাস ভট্টাচার্যের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন মুরারী গুপ্ত। এই মুরারী গুপ্তই ভবিষ্যতে "মুরারী গুপ্তের কড়্চা" নামক সংস্কৃতে শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। এই সময়ে নিমাই সংস্কৃত ব্যাকরণের একখানি টীকা রচনা করেন, আর শীঘ্রই এই টীকা [illegible]শের বহু চতুষ্পাঠীতে সমাদৃত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই টীকার কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় নিমাইএর দেহের বর্ণ। সেজন্য ইঁহার অন্যনাম ছিল শ্রীগৌরাঙ্গ। ১৪শ বর্ষ বয়সে গৌর ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে ন্যায়পাঠ আরম্ভ করেন। এই স্থানেই বাংলার গৌরবমণি রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় অধ্যয়ন করিতেন। ইনি নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত 'অনুমান চিন্তামণি'র উপর 'দীধিতি'-টীকা রচনা করেন। নিমাইও ইহার উপর এক টীকা রচনা করিলেন। পরিশেষে একদিন রঘুনাথ যখন নিমাই-কৃত টীকার কিয়দংশ শুনিলেন, তখন তাঁহার "অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক' হইবার আশা নির্মূল হইল। নিমাইকে অকপটে সব কথা বলায় নিমাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার রচিত এই অপূর্ব ও উৎকৃষ্ট টীকা গঙ্গায় বিসর্জন দেন। গভীর পাণ্ডিত্যের খনি নিমাই যে উদারতার শিরোমণি।

এইরূপে নিমাই-এর ন্যায় পাঠ শেষ হইল। তখন তিনি মুকুন্দ সঞ্জয় নামক একজন ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে মাতা শচীদেবী বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাই-এর বিবাহ দেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌরাঙ্গের বয়স যখন ১৫ কি ১৬ তখন মাতার নিকট অনুমতি লইয়া পূর্ববঙ্গে তাঁহার ব্যাকরণের টীকা প্রচারের জন্য যাত্রা করেন। পূর্ববঙ্গে কোন্ কোন্ স্থানে তিনি গিয়াছিলেন তাহার কোন বিবরণ জানা যায় না। সেখানে গিয়া তিনি তাঁহার রচিত টীকাখানি অধিকাংশ টোলে পঠিত হইতেছে দেখেন। তাঁহার একটি উপাধি ছিল 'বিদ্যাসাগর'। 'বিদ্যাসাগর টীকা' নামে ইহা তখন প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ববঙ্গে অবস্থান কালে নিমাই-এর সহধর্মিণী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ হয়। তিনি কতিপয় শিষ্যসহ পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া এই সংবাদে মর্মাহত হইলেন। ক্রমে নিমাই নবদ্বীপের একজন প্রধান অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হইলেন এবং শচীমাতারও অর্থকষ্টের অবসান হইল। এই সময়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের কেশব নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসেন ও নিমাই-এর সহিত শাস্ত্রতর্কে পরাজিত হ'ন। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার

কিছুদিন পরেই বুদ্ধিমন্ত খাঁর অর্থব্যয়ে নবদ্বীপের সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইএর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। নিমাইএর কিন্তু এই বিবাহে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি অতি সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই মাতার নিকট আদেশ লইয়া গৌরাঙ্গ মাতৃস্বসাপতি চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন ও কয়েকটী শিষ্যসহ পিতৃপিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে যাত্রা করেন। গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনাবধি গৌরের মানসিক ভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলেন। দৈবক্রমে সে সময়ে সাধকপ্রবর ঈশ্বরপুরীও গয়াতে উপস্থিত হ'ন। এখানে বলা প্রয়োজন ঈশ্বর পুরীর সহিত কিছুকাল পূর্বে গৌরের নবদ্বীপে একবার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল ও পুরীমহারাজ তাঁহার কৃত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক একখানি কাব্য শুনাইয়াছিলেন। নিমাই যে এক[illegible] অতিমানব মহাপুরুষ ঈশ্বরপুরী সে সময়েই বুঝিয়াছিলেন। এই গয়াধামেই এক শুভদিনে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন। ইহার পর হইতে আর গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন। এ-সময় হইতে অলৌকিক ভাবপূর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরত কৃষ্ণ-প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে—কৃষ্ণপ্রেমে তিনি মাতোয়ারা। বলা প্রয়োজন, সে সময় শ্রীবাস, মুকুন্দ, শ্রীমান্ পণ্ডিত, গদাধর, মুরারী, সদাশিব প্রমুখ কতিপয় পরম বৈষ্ণব নবদ্বীপে বাস করিতেন এবং শ্রীবাসের বাসগৃহ ইঁহাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রালোচনা ও সাধনার একটি কেন্দ্র ছিল। নিমাইও এই দলে যোগ দিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় শৈথিল্য আসিল। তাঁহার মুখে যে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু আসে না—তাঁহার অন্তর যে কৃষ্ণময়; সুতরাং অধ্যাপনা তাঁ'র পক্ষে অসম্ভব। তিনি শিষ্যগণ সহ কৃষ্ণকীর্তন করেন। এইরূপে তাঁহার অধ্যাপনা কার্য শেষ হইল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সহিত গৌরের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। এই অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণবকুলের শিরোমণি। ইনিই প্রথম চিনিলেন গৌরাঙ্গ—কে। প্রবীন বৈষ্ণব গৌরাঙ্গের পাদপূজা করিলেন ও সেদিন হইতে বৈষ্ণব সমাজ গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে বরণ করিলেন। শ্রীবাসের অঙ্গন ইঁহাদের কীর্তনক্ষেত্র হইল। গৌরের দেহে চতুর্দশ প্রকার মহাভাবের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল।

মহাবৈষ্ণব শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবধূত পরিব্রাজক রূপে একসময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হ'ন। ইঁহার বাটী বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে। বৃন্দাবনে ইঁহার সহিত ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার নিকট গৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ এই সময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও নন্দনাচার্যের গৃহে অতিথি হ'ন। তাঁহার আগমন বিষয় পূর্বেই গৌরাঙ্গ ভাবাবেশে জানিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মিলন হইল। কিছুদিন পূর্বে অদ্বৈতাচার্য নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও সেখান হইতে আনীত হইলেন। ক্রমে চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবর্গ একে একে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ তাঁহার মধ্যে একাধারে ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব দেখিতে

লাগিলেন। শ্রীবাসের গৃহে সারারাত্রিব্যাপী কীর্ত্তন হইতে লাগিল। জগাই, মাধাই, চাঁপাল গোপাল (গোপাল চক্রবর্তী) প্রমুখ পাষণ্ডদিগের উদ্ধার সাধন হইল। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ পারিষদবর্গসহ নগর কীর্তনে বাহির হইতে লাগিলেন—সে এক মহা সমারোহ ব্যাপার। কাজীর নিকট এই সব সংবাদ পৌঁছিল। তিনি প্রথমে ইহার বাধাদানে চেষ্টা করেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের স্পর্শে তাঁহার নব ভাবের উদয় হয়। শ্রীবাসের গৃহপ্রাঙ্গন হইতে সমস্ত নগরে কীর্তনানন্দ ব্যাপ্ত হইল। সমগ্র ভারত এই কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় ভাসাইবার জন্য যে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব! তিনি গৃহত্যাগের সংকল্প করিলেন। শচীমাতার নিকট বিদায় ভিক্ষা করিলেন। স্নেহাতুরা জননীর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। তখন শ্রীচৈতন্য দিব্যশক্তির প্রভাবে মাতাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানযুক্তা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের আদেশ পাইলেন। প্রিয়তমা বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটেও এইভাবে সম্মতি গ্রহণ করিলেন। প্রায় ২৪শ বর্ষ বয়সে জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় গমন করেন ও শ্রীকেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসীপ্রবর মহাপুরুষের নিকট কাটোয়ায় মস্তক মুণ্ডনাদি করিয়া সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হ'ন—শ্রীগৌরাঙ্গ হইলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কাটোয়া হইতে শ্রীচৈতন্য কয়েকটী বনভূমি অতিক্রম করিয়া পুনরায় নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বাটীতে উপস্থিত হ'ন। এখানে শচীমাতার সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তারপর শ্রীচৈতন্য চলিলেন নীলাচল (পুরী) অভিমুখে। পথে সুবর্ণরেখা, মহানন্দী, বিন্দুসরোবর প্রভৃতিতে স্নান ও তীর্থস্থান সকল দর্শন করেন। কটক হইয়া অবশেষে পুরীধামে উপনীত হইলেন। সঙ্গে আছেন নিত্যানন্দ। শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনমাত্র ভাবাবেশে তিনি সমাধিস্থ হ'ন। প্রায় ৯ ঘণ্টার পর তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয়। তখন তাঁহাকে বাসুদেব সার্বভৌমের বাটীতে আনা হইয়াছে। এইস্থানে শাস্ত্রচর্চা ও কীর্তনানন্দে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের দার্শনিক মতবাদ কি তাহার কতকাংশ তাঁহার সহিত বাসুদেব সার্বভৌমের আলোচনা হইতে জানা যায়। তথা হইতে তিনি পুনরায় গৌড়দেশে যাত্রা করেন ও পুনরায় নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে পরিষদবর্গ সহ তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান বৃন্দাবন ও মথুরা দর্শনে বহির্গত হ'ন। কিন্তু তিনি গঙ্গাতীর দিয়া ফুলিয়া, রামকেলি প্রভৃতি কয়েকটী স্থান অতিক্রম করিয়া পুনরায় নীলাচল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। হালিসহর, পাণিহাটী, বরাহনগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পুনরায় পুরীধামে উপনীত হ'ন। সেখানে কটক হইতে রাজা প্রতাপরুদ্র আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দকে পুনরায় তিনি হরিনাম প্রচারের জন্য গৌড়দেশে পাঠান। কিছু দিন পরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রমুখ শিষ্যবর্গ নীলাচলে রথযাত্রা দর্শনে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হ'ন। এই নীলাচলে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে জগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যের কীর্তন ও ভাবাবেশে নর্তন এক অপূর্বলীলা!

ইতিপূর্বে প্রথমবার নীলাচলে আগমনের সময় শ্রীচৈতন্য রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ,

সাক্ষিগোপাল, কপোতেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আসিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। বৈশাখের প্রথমে (১৫১০ খৃঃ ৭ই বৈশাখ) সঙ্গে মাত্র কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ভক্ত লইয়া শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যের বহুতীর্থস্থান দর্শন করিলেন ও বহু নাস্তিক ও বিপক্ষবাদীকে স্বমতে আনয়ন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়েই গোদাবরী তীর্থের নিকট রায় রামানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয় ও ভক্তিমার্গের অনেক গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা হয়। পুরী হইতে গোদাবরীতীর্থ—সিদ্ধবটেশ্বর—বেঙ্কটনগর—বিষ্ণুকাঞ্চী, তাঞ্জোর—শ্রীরঙ্গম্—রামেশ্বর—কন্যাকুমারী—ত্রিবাঙ্কুর—হায়দ্রাবাদ—পুনা—নাসিক—বরোদা—আহমাদাবাদ—দ্বারকা—রায়পুর প্রভৃতি প্রধান স্থান তিনি দর্শন করেন। যাহা হউক দাক্ষিণাত্য হইতে তিনি নীলাচল হইয়া বৃন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিনি কাশীধামে উপনীত হ'ন। এইখানে প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-বেদান্তী প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার বিচার হয় ও স্বামীজি শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া তিনি ৩ দিন সেখানে অবস্থান করেন ও তারপর মথুরায় পৌঁছিলেন। মথুরায় যমুনার ২৪ ঘাটে স্নান করিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবনের তালবন, তমালবন, মধুবন প্রভৃতি দর্শনে চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা সহচর বৃন্দাবনের তরুগুল্মলতাদি দর্শনে মহাভাবময় শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণ লীলার প্রতি বিশিষ্ট স্থানে সেই সেই লীলার ভাব উদ্রেক হইতে লাগিল। বলা প্রয়োজন বৃন্দাবন তখন অরণ্যানী পরিবৃত। এইভাবের স্ফুরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ লীলাকেন্দ্র গুলি—বংশীবট, কেশিঘাট, নিকুঞ্জকানন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থিরীকৃত করিলেন। এইরূপে বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায় প্রয়াগে আগমন করিলেন। এইস্থানে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন হয় ও শ্রীরূপকে তিনি বৃন্দাবনধাম পুনঃস্থাপনের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। পুনরায় কাশীধাম হইয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন তিনি নীলাচলেই ভক্তগণ সঙ্গে কীর্তনানন্দে ও ভক্তিতত্ত্বানুশীলনে অতিবাহিত করেন। শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া এই স্থানেই একদিন তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন ও জালিয়া কর্তৃক তীরে আনীত হইয়াছিলেন। তারপর ক্রমে সেই মহাদুর্দিন উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৪৮ বর্ষ। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দের আষাঢ়ের শুক্লপক্ষীয় ৭মী তিথিতে রবিবারে প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তবৃন্দকে দুঃখসাগরে মগ্ন করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। কিভাবে যে তাঁহার দেহত্যাগ হইল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

তাঁহার অপরূপ লীলার বিস্তৃতকাহিনী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দান করা হইল। তাঁহার উপদেশ ও মতবাদের সামান্য আভাস দিয়া ইহার উপসংহার করিব। বেদান্তদর্শনকে ভিত্তি করিয়া হিন্দুধর্মের যে সব সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ৫টী বৈষ্ণব সম্প্রদায়—শ্রীসম্প্রদায় (রামানুজাচার্য প্রবর্তিত), মাধ্ব সম্প্রদায় (মধ্বাচার্য প্রবর্তিত), নিম্বার্ক সম্প্রদায় (নিম্বার্কাচার্য প্রবর্তিত), বল্লভীয় সম্প্রদায় (বল্লভাচার্য প্রবর্তিত) এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত)। অন্য ৪টী বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য ও উপনিষদ্ এবং গীতাভাষ্যাদি রচনা করিয়া তাঁহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-রচিত কোন ভাষ্যগ্রন্থ বা প্রকরণগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার মতবাদ জানিতে হইলে তাঁহার উপদেশ হইতে ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যদ্বয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী-কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে এবং প্রশিষ্য শ্রীজীব-রচিত গ্রন্থাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। ইঁহাদের গ্রন্থে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে তাহার নাম 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ লইয়া যে সব তর্কবিতর্ক আছে তাহা চিন্তার অতীত। এই মতকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্তী কালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদরূপে বেদান্ত দর্শনের 'গোবিন্দভাষ্য' ও গীতা উপনিষদাদির ভাষ্য রচনা করেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে শ্রীচৈতন্যের দার্শনিক মতবাদ মধ্বাচার্যের স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ ও নিম্বার্কের মতবাদের সংমিশ্রণ। তদ্ব্যতীত বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গ সাধনাও শ্রীচৈতন্যের মতবাদকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই পুষ্টিমার্গই মধুরভাব সাধনা। বলা প্রয়োজন বল্লভাচার্য শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং এক সময়ে উভয়েই মথুরায় বাস করিয়াছেন। এই সময় বল্লভাচার্য বিচারে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক পরাজিতও হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে জীব অণু, ভগবানের নিত্য সেবক এবং জীবজগৎ সত্য। নিম্বার্কমতে ঈশ্বরের 'অচিন্ত্যশক্তিই জগতের কারণ।' এবং শ্রীচৈতন্যও নিম্বার্কের এই মতবাদ পোষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়। তিনি অনন্ত রসের, অনন্ত সৌন্দর্যের খনি—তিনি আনন্দঘন, প্রেমঘন মূর্তি। জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি মায়াযোগে দেহধারণ করেন এবং কৃষ্ণ, গুরু, শক্তি, ভক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ষড়বিধরূপে বিলাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তি তিন প্রকার—নিত্যত্ব-প্রকাশিকা বা সন্ধিনী, চৈতন্য-প্রকাশিকা বা সম্বিদ্ এবং আনন্দ-প্রকাশিকা বা হ্লাদিনী। শ্রীরাধাই মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। লীলাপরায়ণা শ্রীরাধার মধুর রস শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন আর এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অপূর্ব আস্বাদন মানবকে প্রদানের জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। ইহার পূর্বে বৈষ্ণব আচার্য ও প্রবর্তকগণ ঈশ্বর প্রেমের পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে শান্ত, দাস্য ও বাৎসল্য রসেরই অনুভূতি প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যে আমরা অবশিষ্ট সখ্য ও মধুর প্রেমের প্রচারও দেখিতে পাই। জগতে কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও আদর্শ প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশ ও কালে বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও আবির্ভাব জগতে ভক্তিমার্গ স্থাপনের জন্য। সুতরাং তাঁহার বেদান্তদর্শনের উপর মতবাদ এই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে হইবে। বিভিন্ন দিক দিয়া শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকটীর (যাহা 'আত্মারাম শ্লোক' বলিয়া পরিচিত) ৬১ প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মতানুযায়ী বৈষ্ণবের আদর্শ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তাঁহার মতে বর্তমান যুগে মুক্তির প্রধান ও সুগম সাধনা নামসংকীর্তন বা মন্ত্রজপ।—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"।

শ্রীচৈতন্য বহিরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে নামকীর্তন করিতে ও অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর প্রেম বিষয়ক পদাবলী কীর্তনের আদেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দার্শনিক মতবাদের কিছু পরিচয় আমরা পাই কাশীধামে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে ও বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতির সহিত বিচারে ও কথোপ-কথনে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এইসব বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা তাঁহার জীবনী, মতবাদ ও উপদেশের বিষয় বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি* পাঠের জন্য অনুরোধ করি।

হিংসাদ্বেষ-মলিনতা-দুষ্ট বর্তমান জগৎ ধর্মমার্গ হইতে বিচ্যুত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শুভ জন্মতিথি মাসে প্রার্থনা করি যেন ভক্তির মন্দাকিণী ধারায় মানব-হৃদয়ের সংকীর্ণতা, মলিনতা বিধৌত হইয়া ভগবৎ প্রেমের শুভ্র কিরণে তাহার হৃদিরাজ্য আলোকিত হয়—মানব যেন অমৃতত্বের, পরাশান্তির মার্গে যাত্রা করে।

* (১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত।
(২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস-বিরচিত।
(৩) মুরারি গুপ্তের কড়্চা—(সংস্কৃত)।
(৪) গোবিন্দ দাসের কড়্চা।
(৫) চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ-কৃত।
(৬) চৈতন্যমঙ্গল—লোচনদাস-কৃত।
(৭) চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক (সংস্কৃত)—কবি কর্ণপূর-কৃত
(৮) গৌর চরিত চিন্তামণি—নরহরি চক্রবর্তী-কৃত।
(৯) শ্রীচৈতন্য মঙ্গল—জয়ানন্দ দাস-কৃত।
(১০) বংশীশিক্ষা—প্রেমদাস-কৃত।
(১১) শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—ঈশান নাগর-কৃত।
(১২) চৈতন্য লীলামৃত—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত-কৃত।
(১৩) ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-কৃত।
(১৪) অমিয় নিমাই চরিত—শিশির কুমার ঘোষ-কৃত।
(১৫) যুগাবতার—নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত।
(১৬) শ্রীগৌরাঙ্গতত্ব ও গৌরাঙ্গ চরিত—প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন-কৃত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

জীবে সম্মান

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

কলিহত জীবকে যিনি প্রেমের মোহন ফাঁদে আবদ্ধ করিয়া ধর্মের পথে, সত্যের পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন, অমানীকে যিনি মান দান করিতে কখন কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, যাঁর শিক্ষা দীক্ষায় দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে, আচণ্ডালকে যিনি সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন সেই প্রেমের ঠাকুর, কাঙ্গালের নাথকে কোটী কোটীবার প্রণাম করি।

জগতে অনেক ধর্ম-সংস্কারক আসিয়াছেন, আবার আসিবেন, অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, আবারও হইবে; কারণ আমরা ভগবানের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, ধর্মের গ্লানি হইলেই তিনি আবার দেহী হইয়া সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দুস্কৃতাচারীদের বিনাশের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দেশে সমাজ-সংস্কারক মহাপ্রভুর পূর্বেও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরেও করিয়াছেন ও করিবেন; কিন্তু একাধারে ভারতের সর্ব সংস্কারের মূল সত্য যিনি প্রচার করিয়া জগতে বরেণ্য হইয়াছেন—সু-ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়বন্ধনে, একতার হেমহারে যিনি আচণ্ডালকে বন্ধন করিয়াছেন, সহধর্মিতার গুণে যিনি ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম।

বাঙ্গালাদেশে সেবা-ধর্মের ও প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা ষড়ৈশ্বর্যশালী ভক্তিভাজন কাঙ্গালের ঠাকুরকে প্রণাম না করিয়া কে থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণ্য-সেবিত বাঙ্গালাদেশে যখন ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত, সমাজের নিম্নশ্রেণীর জাতিকে যখন উচ্চবর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল, তখন কে তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া নির্জনে কত না অশ্রু ফেলিয়াছেন? কে তাহাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য, সমাজে তাহাদের ন্যায্য দাবী যাহাতে উপেক্ষিত না হয় তাহার জন্য, কে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন? চারিশত বৎসরের কিছু পূর্বে এ কার্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন ভাব-ভোলা আমার শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সদ্ভাব-স্থাপনের জন্য কে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন? সেই ভেদ বুদ্ধির দিনে কে বুঝিয়াছিলেন একতাই বল? এক প্রাণ, এক চিন্তা, এক ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ না হইলে, একই দেশ-মাতার সেবা না করিলে, সংহত শক্তির উদ্বোধন না করিলে, দেশমাতার পূজা সার্থক হইতে পারে না—জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় হইতে পারে না। তখনকার দিনে কোন্ অসমসাহসী বীরপুরুষ এই দুরূহ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন? রাজনৈতিক সংস্কার-রূপে কার মোহন চিত্র দেখিয়া আমরা হৃদয়ে বল পাই? কে জাতিকে প্রেমের ভিতর দিয়া-প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ টানিতে পারিয়াছেন? সে আমার প্রেমের দরদী ঠাকুর প্রাণ-গোরা।

অত্যাচার-প্রপীড়িত, জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জরিত বাঙ্গালার মূক নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যখন অত্যাচারে দাঁড়াইতে পরিতেছিল না—শত লাঞ্ছনা, শত গঞ্জনা, শত ধিকার যখন তাহাদিগকে

চেতনায় সজাগ করিতে পারিতেছিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা উপায় নির্ধারণে অক্ষম হইয়া কেবল ভাবিতেছিল 'কি করা যায়?' যখন নিরুপায় হইয়া দুর্বলের অশ্রুমোচনই তাহাদের সম্বল হইয়াছিল, তখন কে তাহাদের জাতীয় সংবিৎকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন? যখন মুসলমান ধর্ম-প্রচারকদিগের, সাম্যনীতির প্রভাবে, এক সত্যধর্মের প্রচার-চেষ্টার ফলে দেশের এই সহনশীল সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা যখন দলে দলে মুসলমান ধর্মের পতাকাতলে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল – যখন সেই স্রোতে সকলে গা-ভাসান দিতে লাগিল, তখন কে সেই বন্যার জলতরঙ্গকে রোধ করিতে পারিয়াছিলেন? সে আমার জীব-প্রীতির প্রতিষ্ঠাতা, সহানুভূতির পূর্ণ প্রতীক শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব।

সেই চৈতন্য, এই সংবিৎ কি করিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন, ইঙ্গিতে সেই কথাটারই একটু আলোচনা করিব ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করিব নাম ও প্রেমধর্মের মাহাত্ম্য। কি করিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতিকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন? আবার তখনকার দিনের অনুরূপ দিন আসিয়াছে, যখন হিন্দু-মুসলমানের ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়াছে, আবার যখন জাত্যভিমান, ধনাভিমান প্রভৃতি বলদৃপ্ত অতিকায় হস্তিরূপী অভিমানগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এস্থলে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত কথা আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বর্ণাশ্রমধর্মী ঠাকুর আবার যখন দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণ বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে গিয়া ভেদ-বুদ্ধিবশে বিদ্বেষের অনল উদ্গীরণ করিতেছেন, সমাজসংস্থিতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ধ্বংসের পথে সমাজকে লইয়া যাইতেছেন, তখন ব্যথিতহৃদয়, পরম কারুণিক দয়াল ঠাকুর আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম বুঝাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আমার কুশাগ্রবুদ্ধি ঠাকুর সংসারাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে বুঝাইবার অবকাশই দিলেন না যে, তিনি সমাজে কি পরিবর্তনই আনিতেছেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের মতবাদে বাঙ্গালা দেশে তথা সারা ভারতবর্ষে কি নূতন ধারণার সৃষ্টি করিল; তাঁহাদের মতবাদ বন্যার মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। তিনি জলদ-গম্ভীরমন্ত্রে বলিলেন,—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তমঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

তিনি বলিলেন হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জন্মগত অধিকার অপেক্ষা, ধর্মগত অধিকার প্রশংসনীয় – শ্রেষ্ঠ। তিনিই বাঙ্গালাদেশে প্রথম শুনাইলেন,—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজতে নাই জাতি-কুলাদি-বিচার॥"

জাতি, কুলের বিচার মানবের শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক নয়—প্রকৃত মনুষ্যত্বই – প্রকৃত ধর্মই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিচায়ক।

ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তথা-কথিত বর্ণাশ্রমধর্মের স্থলে স্থাপন করিলেন ধর্মাশ্রয়ী বর্ণ।

জগতের এক বর্ণের স্থান থাকিবে—সে বর্ণ নিরূপিত হইবে ধর্মের ভিতর দিয়া। এক কথায় ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। জগদ্বাসীকে নূতন শিক্ষা দান করিলেন; ভ্রান্ত মানব, ধর্মের পথে অগ্রসর হও, অনন্যশরণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও। তাঁহারই শ্রীমুখে আমরা শুনি,—

'এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥'

আর শ্রীকৃষ্ণই ত স্বয়ং ভগবান্—

'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব অবতারী সর্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥'

আর তিনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

'ভগবান প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায় ॥
সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥'

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে নাম সম্বন্ধে স্পষ্টই ত প্রমাণ রহিয়াছে:—

"নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিনি একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ-বিভেদ ॥"

আবার হরিভক্তি বিলাসে একাদশ বিলাসে বিষ্ণুধর্মোত্তর বচনে পাই—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ ॥

নাম-চিন্তামণিই কৃষ্ণ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, রসস্বরূপ, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ; তিনি নাম ও নামধারী উভয়ের অভিন্নাত্মা বলিয়া অভিহিত।

কলিযুগের ধর্মই হইল কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় আমরা দেখিতে পাই—

'সত্যযুগে ধ্যানধর্ম করায় শুক্লমূর্তি ধরি।
কর্দমকে বর দিলা যেহো কৃপা করি ॥
কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥

কৃষ্ণপদার্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চনাকর্ম।

এই মন্ত্রে ('নমস্তে বাসুদেবায়' ইত্যাদি) দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চন।

কৃষ্ণনাম সংকীর্তন কলিযুগের ধর্ম॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন।
প্রেমভক্তি দিয়া লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্মপ্রবর্তন করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্তন॥
আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥'

নামের বন্যায় সারা বাঙ্গালাদেশ ভাসিয়া গেল—পাষণ্ডগণ দলিত হইল—প্রেমের ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় বাঙ্গালার—বাঙ্গালার কেন, সারা ভারতের লোক ভক্তি-রসাস্বাদনে ধন্য হইল—কৃতার্থ হইল। বুঝিল—

"ভক্তি বিনু কৃষ্ণে কভু নাহি প্রেমোদয়।
প্রেমবিনু কৃষ্ণ-প্রাপ্তি অন্য হইতে নয়॥"

আর বুঝিল—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে কৃষ্ণ ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন।
নিরপরাধ নাম হইতে হয় প্রেমধন॥"

নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে মানস-কমলে প্রেমের উদ্ভব হয়। কি করিয়া এই প্রেম জন্মিতে পারে তাহাও আমরা অন্ত্যলীলায় এইভাবে দেখিতে পাই :—

'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষে যেন কাটিলেই কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মেলে কারে পাণী না মাগয়॥
যেই সে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥'

সমাজে হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষের স্থান কোথায় ভাই—জীব যখন কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান—জীবে যখন শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত তখন জীবকে ঘৃণা করিবার তুমি আমি কে ভাই? "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"—এই মূলমন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা কোথায় পলাইয়া যাইবে! হে ভারতবাসী, তুমি আবার উঠিবে, যদি তুমি মহাপ্রভুর বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া জীবে সম্মান দিতে পার। হে, হে ব্রাহ্মণ-ভারত, আচণ্ডাল নীচ জাতিদের সম্মান দিতে শিক্ষা কর---মহাপ্রভুর ধর্ম আচরণ কর, নিজে ধন্য হইবে—একতায় বল পাইবে—জীবের ভিতর শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া অননুভূতপূর্ব আনন্দ পাইবে---প্রেম-রসে মশ্‌গুল হইয়া যাইবে। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণীতে তোমার শাস্ত্রের অন্যথাচরণ করে নাই---ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ স্পষ্টই বলেন---

"কর্মণা ব্রাহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনাম্।
স্বধর্মনিরতঃ শুদ্ধ স্তস্মাদ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥"

অর্থাৎ কর্মের দ্বারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হওয়া যায়। যিনি সর্বদা ব্রহ্মচিন্তা করেন, যিনি স্বধর্মনিরত ও আপাপবিদ্ধ, শুদ্ধ, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। আবার আমরা শ্রীভগবানের মুখেই শুনিয়াছি—"চতুবর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"—জীবের সত্ত্বাদি গুণ ও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা কর্মের বিভাগানুসারেই সৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

"নামযুক্তজনাঃ কেচিৎ জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্বন্তি মে যথাপ্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ ॥"

বেদজ্ঞ বিপ্রেরাও আমার প্রিয়-সম্পাদনে সমর্থ হন না, কিন্তু হরিপরায়ণ নীচ জাতিগণ আমার প্রীতি-সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই আমরা গোরার মুখেও শুনি—

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। গীতাতেও শ্রীভগবানের শ্রীমুখে আমরা শুনিতে পাই :—

"মাং হি পার্থ! ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্ ॥"

স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা কোন পাপযোনি জাতি, আমাকে আশ্রয় করিলেই পরমাগতি প্রাপ্ত হন। সেই এক কথা—হরিভক্তিপরায়ণতার কথা—হরিভক্তিপরায়ণ হও, ভাই। নাম ও নামী অভিন্ন জানিয়া দেব, দ্বিজে ভক্তিমান্ থাকিয়া হরিভক্তিপরায়ণ হও। তাহা হইলে তুমি জীবে প্রকৃত সম্মান দিতে পারিবে।

আর আমাদের বিশ্বাস, অন্য যে কোন কারণেই ভগবানের সেই কথা—

'পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশধাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥'—

জগতে প্রচারিত হউক না কেন, এই জীব-প্রীতি ও জীবকে প্রকৃত সম্মান দিবার জন্য জগতের ভিতর তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়, চির-বরেণ্য হইয়া থাকিবে।

(২)

গীতা-কবচ*

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

যাহা পরিধান করিলে শত্রু-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহাকে কবচ বলা হয়। গীতার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, গীতা-কবচ দ্বারা সর্বপ্রথমে নিজেকে শোধন করিয়া লইতে হয়। যিনি গীতাতত্ত্ব অনুভব করিতে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার পক্ষেও বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নানা প্রবল শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গীতাতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে, গীতা-কবচ তাঁহার পক্ষে অবশ্য ধারণীয়।

দেবী-কবচে উক্ত হইয়াছে যে,—

জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।
নির্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডী জপ সমুদ্ভবা ॥

অর্থাৎ—সপ্তশতী চণ্ডী পাঠের পূর্বে এই কবচ পাঠ করিতে হয় এবং যাঁহারা এই কবচ দ্বারা আবৃত হইতে পারেন তাঁহারাই নির্বিঘ্নে চণ্ডী জপদ্বারা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। গীতাকে বুঝিবার পক্ষেও সেই বিধিই অবলম্বনীয়। সকল দুঃখ নিবারক পুণ্যপ্রদ গীতা কবচে রক্ষিত মনুষ্য নির্ভয়ে জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। গীতা কবচে ষড়ঙ্গ রক্ষা করিবার বিধি ও কৌশল বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই কবচের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্রীগীতার ৬টি মূল শ্লোকের উল্লেখ আছে। গীতা-কবচের মূলমন্ত্র হইতেছে (যাহা গীতা উপলব্ধি বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয়) যে, ইহাকে জপ স্বরূপ পাঠ করিলে, জীবনের সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার অলৌকিক রহস্য জানা যাইবে।

প্রচলিত গীতার সংস্করণে গীতা-কবচের কোনই উল্লেখ নাই। যদিও চণ্ডীর কবচ আছে, কিন্তু গীতা-কবচের উল্লেখ আমি কুত্রাপি দেখি নাই।

সুধী সমাজে ইহার প্রচার হইলে, জ্ঞানী মনুষ্যগণ ইহা আলোচনা করিলে, সাধারণের ইহার দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া, আমি ইহা প্রকাশ করিলাম।

সম্পূর্ণ কবচটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরস্তু

শ্রীভগবদ্ গীতা কবচ ॥

ওঁ অস্যাঃ ভগবদ্‌গীতায়াঃ শ্রীবেদোব্যাসো ভগবানৃষিঃ অনুষ্টুপাদি ছন্দাংসি। শ্রীকৃষ্ণো

---

* তাঞ্জোরের মহারাজা সরফোজির সরস্বতিমহল গ্রন্থাগারে তেলগু ভাষায় লিখিত পুঁথি হইতে এই গীতা-কবচটী সংগৃহীত হইয়াছে।

Burnell's catalogue No 11464, page 186.
No. of Granthas—85. Author—unknown.
এই কবচের নকল গোণ্ডালনিবাসী রাজবৈদ্য শ্রীজীবরাম কালিদাস শাস্ত্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

বাসুদেবঃ পরমাত্মা দেবতা অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীজং সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ইতি কীলকম্ মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি ইতি কবচং এবং প্রকারেণ শ্রীগোপালকৃষ্ণ বাসুদেব ভগবৎ প্রীত্যর্থং কবচজপে বিনিয়োগঃ।

শ্রীমজ্জ্ঞানাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
শ্রীমদৈশ্বর্য্যাত্মনে বৈশ্বানরায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা।
শ্রীবাসুদেবায় মধ্যমাভ্যাং বষট্।
শ্রীমদ্বলাত্মনে বলভদ্রায় অনামিকাভ্যাং হুং।
শ্রীমত্তেজসাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্।
শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাণ্ডীবধন্বিনে শ্রীমদ্ অর্জ্জুনায়
করতল কর পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।
ইত্থং হৃদয়াদি ন্যাসঃ
যো গীতানাং সমূহেন শ্রোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব।
স্বহৃদি ষষ্ঠকৈঃ শ্লোকৈঃ স্তুত এব ন সংশয়ঃ॥
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি করশুদ্ধিং কৃত্বা
মণিবন্ধে প্রকোষ্ঠে চ কূর্পরে হস্তয়োস্তলে।
করাগ্রে করপৃষ্ঠে চ করশুদ্ধি রুদাহৃতা॥
ওমিতি মূল মন্ত্রেন ত্রিঃ প্রাণায়ামং কৃত্বা
রেচক ত্রয়ং কৃত্বা।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বারংবারমনুস্মরণ্।
যঃ পরিত্যজতি দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥ ১
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ২
ইতি হৃদয়ায় নমঃ॥
শ্রীমদৈশ্বরাত্মনে ছন্দসে শিরসি স্বাহা।
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ॥ ৩
শ্রীমচ্ছক্ত্যাত্মনে শ্রীবেদব্যাসায় শিখায়ৈ বষট্।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৪

শ্রীমদ্বলাত্মনে বলভদ্ররামায় কবচায় হুং।
যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥৫
শ্রীমত্তেজসাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥৬
শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাণ্ডীবধন্বিনে শ্রীমদর্জুনায় অস্ত্রায় ফট্।
ওঁ ভূর্ভুব স্বরোমিতি দিগ্বন্ধঃ ॥
ইতি শ্রীভগবদ্ গীতা কবচং।
শ্রীকৃষ্ণায়র্পণমস্তু ॥

(৩)

বিবিধ সংবাদ

ভারতবর্ষ—

ভারতবর্ষের পরিমাণ ১,৭৭৩,১৬৮ বর্গমাইল; ইহার লোকসংখ্যা (১৯৩১ খৃঃ অঃ এর গণনানুযায়ী) ৩৫২,৮৩৭,৭৭৮, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর ⅕ অংশ। ইহার মধ্যে সমস্ত করদ রাজ্যের পরিমাণ ৬৭৫,২৬৭ বর্গমাইল ও ইহাদের লোক সংখ্যা ৮১,৩১০,৮৪৫। বাকী সব ইংরেজ শাসনের অন্তর্গত।

সমগ্র ভারতের এই লোক সংখ্যার মধ্যে কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

(১) হিন্দু—২৩৯,১৯৫,০০০ (প্রায় ২৪ কোটী) অর্থাৎ লোকসংখ্যার শতকরা ৬৮·২
(২) বৌদ্ধ—১২,৭৮৭,০০০ (প্রায় ১¼ কোটী) ৩·৬
(৩) শিখ—৪,৩৩৬,০০০ (প্রায় ৪৩½ লক্ষ) ... ১·২
(৪) জৈন - ১,২৫২,০০০ (প্রায় ১২½ লক্ষ) ... ০·৩৬
(৫) পারসীক—১১০,০০০ (প্রায় ১ লক্ষ) ... ০·০৩
(৬) মুসলমান— ৭৭,৬৭৮,০০০ (প্রায় ৮ কোটী) ... ২২·১৬
(৭) খ্রীস্টান্—৬,২৯৭,০০০ (প্রায় ৬২ লক্ষ) ... ১·৮
(৮) প্রকৃতিবাদী—৮,২৮০,০০০ (প্রায় ৮৩ লক্ষ) ... ২·৪

হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও পারসীক ধর্মাবলম্বীদিগকে আর্যধর্মেরই বিভিন্ন শাখা বলা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতে আর্যধর্মাবলম্বী লোক শতকরা ৭৩·৩৯। প্রকৃতিবাদী জড় উপাসক প্রভৃতিকে বলা হয় Animists. পাহাড়ী ও অশিক্ষিতদের মধ্যে এই ধর্ম প্রচলিত আছে। ইহাদের অনেকেই বর্তমানে হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ; অনেকে খ্রীস্টানও হইতেছে।

আমাদের কথা

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি সাধারণের পাঠোপযোগী ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়মূলক পুস্তক বাঙলা ভাষায় বিরল। এই প্রকার পুস্তক সংকলন আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তদনুযায়ী বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ কৃত 'ন্যায় প্রবেশ' নামক ন্যায়দর্শনের একখানি প্রাথমিক পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীভারতীর গ্রাহক ও পাঠক বর্গের জন্য ইহার গত সংখ্যা হইতে এই পুস্তকখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। দেবতত্ত্বমূলক এই প্রকার গ্রন্থের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিত "সরস্বতী" ১ম খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। 'গণেশ' সম্বন্ধীয় এই প্রকার পুস্তকও মুদ্রিত হইতেছে এবং ইহা ধারাবাহিক ভাবে শ্রীভারতীতে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন ২।১ মাস ইহা প্রকাশিত হয় নাই। আগামী সংখ্যা হইতে ইহার পুনঃ প্রকাশ হইবে।

* * * *

প্রাগৈতিহাসিক ভারতের ইতিহাস প্রণয়নে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল-নির্ণয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইতিপূর্বে শ্রীভারতীতে অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধে এই যুদ্ধ কাল নির্ণয় ও কলিযুগের আরম্ভের সময় নির্ধারিত করিয়াছিলেন। তারপর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয় বিষয়ে তাঁহার গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন বর্তমান সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধটি শেষ হইল। 'ভক্তের বিরহ' নামক যে প্রবন্ধটি কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল তাহাও এই সংখ্যায় শেষ হইল। ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ আচার্য শান্ত রক্ষিত ও কমল শীল নামক বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া 'কার্য ও কারণ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন তাহার দ্বিতীয় ও শেষাংশ এই সংখ্যায় শেষ হইল। এই প্রবন্ধে অনেক দার্শনিক কূট প্রশ্নের আলোচনা আছে সেজন্য সাধারণ পাঠকের নিকট হয়ত ইহার কিছু কিছু দুর্বোধ্য হইবে। স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি মহাশয় "সংসার" নামক প্রবন্ধে সংসারের অনিত্যত্ব প্রমাণ করিয়া যাহাতে সাধারণ মানবমন বৈরাগ্যের ও ত্যাগের পথে ধাবিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছেন।

* * * *

এই ফাল্গুন মাসে বর্তমান ভারতের ধর্মজগতে দুইজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন —(ক) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব বা শ্রীগৌরাঙ্গ (খ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আর এই বাঙ্গালা-দেশই এই দুইজন মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশের একটি সংক্ষিপ্ত আভাস 'শ্রীভারতী'র গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় আছে। তাঁহার পূত চরিত্রের আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ ভবিষ্যতে প্রদত্ত হইবে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনী

ও উপদেশ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনীপূর্ণিমা আবার দোল লীলা বা হোলি উৎসবের জন্য বিশেষ পুণ্যময়ী। এই 'দোললীলা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকার উৎসব প্রাচীন ও বর্তমান কালেও "বসন্ত উৎসব" রূপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন মহাশয়-সংকলিত 'গীতা কবচ' নামক একটি অপ্রকাশিত বিষয় বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। আশা করি পাঠকবর্গের নিকট ইহা আদৃত হইবে। বর্তমান সংখ্যা হইতে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র অন্তর্গত 'বিবিধ সংবাদ' নামক একটি অংশ প্রকাশিত হইবে, ইহার মধ্যে শিক্ষা, কৃষ্টি ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজিত হইবে। আশা করি, পাঠকবর্গ ইহা অনুমোদন করিবেন। 'সাময়িক সংবাদ' হইতে ইহা স্বতন্ত্র।

* * * * *

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট্ ইহার কার্যকরী সমিতির গত অধিবেশনে 'কলাবিদ্যা বিষয়ক' একটি বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিভাগ হইতে "কলাবিদ্যা" নামক একটি পত্রিকাও ইংরেজীতে প্রকাশিত হইবে। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। ধর্ম, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টি, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে যাহাতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন তাহার জন্য ইনস্টিটিউট্ ব্যবস্থা করিতেছে। যাঁহারা এই প্রকার study circle এ যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

* * * * * * * * *

ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় সম্প্রতি রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের 'ফেলো' (সদস্য) নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ভারতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টি মূলক বহুগ্রন্থের প্রণেতা। এই সব কার্যে তাঁহার প্রচেষ্টা, বদান্যতা ও উৎসাহ ভারতের জমিদারবর্গের অনুকরণীয়। ইনস্টিটিউট্ বহু বিষয়ে তাঁহার নিকট উপকৃত। তাঁহার এই সম্মানে (যদিও বহুপূর্বেই তাঁহাকে ইহা দেওয়া উচিত ছিল) আমরা আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিতেছি।

পুস্তক সমালোচনা

কবীর পন্থা—স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত। কলিকাতা ১নং গার্ডেনার লেন হইতে শ্রীশিব নাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৪১। মূল্য ।০ আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানির প্রণেতা শ্রীমৎ স্বামী ভূমানন্দ পরমহংসদেব কামাখ্যাস্থ কালীপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ। তিনি কবীরের দৌহাগুলি একত্র করিয়া তাহাদের বাঙ্গালা অনুবাদ সহ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন ও গীতার উপদেশের সহিত কবীরের উপদেশের কিরূপ মিল আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে দর্শনাদি গ্রন্থ হইতে অনুরূপ শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লেখক পুস্তিকাখানিকে পাঠকগণের নিকট বেশ আদরণীয় করিয়াছেন। কবীর তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যে সাধন প্রণালী প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহাই 'কবীর পন্থা' নামে পরিচিত। কবীরের উপদেশগুলি তাঁহার দৌহাবলীর মধ্যেই আবদ্ধ। আমরা স্বামীজি প্রণীত এই পুস্তিকাখানি হইতে কবীরের ধর্ম ও সাধনপ্রণালীর বিষয় অনেকটা জ্ঞাত হইতে পারি। স্বামীজির উদ্যম প্রশংসনীয়।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

মীরাবাঈ—স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)।

কলিকাতা, পি ৬৪ মনোহর পুকুর রোড হইতে শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ।৵০ + ১০৩। মূল্য ।।০ আনা। (১৩৪১)

মীরার জীবনী সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। স্বামীজি ইতিহাস ও নানা পুস্তক হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া মীরার জীবনী ও তৎরচিত দৌহাবলী এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বামীজি নির্ধারণ করিয়াছেন মীরার জন্মকাল ১৫৫৫ সম্বৎ বা ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে। কোন কোন লেখক মীরার জন্ম ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দে সাব্যস্ত করিয়াছেন, স্বামীজি অনেক প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই মত একেবারে অমূলক। টড সাহেব মীরাকে রাণা কুম্ভের রাণী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্তী অনেক লেখক টড সাহেবের মতকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের পুস্তকে মীরাকে রাণাকুম্ভের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বামীজি আলোচ্য পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন, মীরার স্বামী ছিলেন—মহারাণা কুম্ভের প্রপৌত্র ভোজরাজ। এই জীবনীগ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মীরার জীবন প্রেম ও ভক্তির জীবন। কেহ কেহ বলেন মীরাবাঈ পূর্বজন্মে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখী ছিলেন। মীরার দৌহাগুলি অতীব মধুর ও প্রেমভক্তিব্যঞ্জক। আমরা এই ভক্তিপূর্ণ জীবন কাহিনীর বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

বেদ

১। ঋগ্বেদ সংহিতা—শ্রীমৎসায়ণাচার্য বিরচিত ভাষ্যসমেতা। দ্বিতীয় ভাগঃ। ২-৫ মণ্ডলানি। পুণাবৈদিক সংশোধন মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত।

ধর্ম ও দর্শন

২। The Inner Life—C. F. Andrews.

৩। Bādarāyara—Tattva Tandavam; with the Nyāyadipa of Sri Raghavendratirtha, Vol 3, edit. by V. Madhvachar (University of Mysore Or. Library Pubn. Sanskrit Ser no. 79). মহীশূর।

৪। নব্যস্মৃতি প্রশ্নোত্তর বিবেক-২ খণ্ড। শ্রীআশুতোষ কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা।

৫। ব্রহ্মবিজ্ঞান—স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত। কলিকাতা।

৬। Gandhi's challenge to christianity—S. K. George, লণ্ডন।

সাহিত্য

৭। Studies in Bengali Literature—K. Mukherjee, কলিকাতা।

ইতিহাস

৮। The Supreme Court in Conflict—Indubhusan Banerjee, কলিকাতা।

৯। Verelst's Rule in India—Nandalal Chatterjee, এলাহাবাদ।

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কর্তৃক সংকলিত

The Indian Antiquary, Vol III. 1874

Kalidas, Sri Harsha, and Chand—By Kāshinath Trimbak Telang, M.A., LL.B., Advocate High Court, Bombay.

কালিদাস ও শ্রীহর্ষের আবির্ভাব কাল লইয়া আলোচনা। এই প্রসঙ্গে দণ্ডিরও সময় নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন কোন লেখকের মতে কালিদাস খ্রীস্টের জন্মের ১০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দণ্ডির জন্মসময় প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। কিন্তু এবিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। শ্রীহর্ষের জন্ম দণ্ডির পরে। শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন' নামক গ্রন্থে কুমারিল ভট্টের উল্লেখ আছে। কুমারিল ভট্টের সময় খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে শ্রীহর্ষ ও চাঁদ সমসাময়িক ছিলেন।

Dr. Leitner's Budhistic Sculptures—এই প্রবন্ধে লেখক বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য শিল্পের একটী চিত্র প্রদান করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

Notes on the Shrine of Sri Sapta-kotisvara.—By J. Gerson da chunha, M.R.C.S & C.. Bombay.

সপ্তকোটীশ্বরের মন্দির পর্তুগীজ গোয়ার অন্তঃপাতী নূতন নারভেম বা নারোগ্রামে অবস্থিত। আলোচ্য প্রবন্ধে সপ্তকোটীশ্বর স্থানের উৎপত্তি ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে।

সাময়িক সাহিত্য, মাঘ ১৩৪৬

সাহিত্য

ভারতবর্ষ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বাংলার কীর্তন

—রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম্-এ।

প্রবর্তক—বঙ্কিম-সাহিত্যে দুইটী আদর্শ নারী—শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ।

,, —পটুয়া-সঙ্গীত—৺দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট্।

—বিদ্যাসাগর স্মৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্বোধন—মেরি ম্যাগ্ডালেনের দীক্ষা—শ্রীরমনী কুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল।

উদয়াচল—ভেজাল সমস্যা—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

,, —ভ্রমণ ও ভ্রমণ-সাহিত্য—শ্রীকিশোরীমোহন রায়, বি-এ।

বঙ্গশ্রী—মানবের নব অধিকার—শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী।

,, —সভ্যতা—প্রতীচ্য ও প্রাচ্য—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

,, —শিব সংকীর্তন, চণ্ডিকা মঙ্গল ও অন্নদা মঙ্গল—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—'শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

পরিচয়—পিতৃযান ও দেবযান—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, —ক্ষণিকবাদ—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ।

উদ্বোধন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাবামৃত—অধ্যাপক শ্রীগৌরাঙ্গ গুপ্ত।

,, পঞ্চদশী—পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শিবম্—শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈত বেদান্ত—অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ,

পি আর-এস, পি-এইচ-ডি।

,, অদ্বৈত বাদীর আত্মরক্ষা—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্ত ভূষণ।

,, স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ—ডাঃ শ্রীনিশিকান্ত গাঙ্গুলী, এম-এ।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—কৌলীন্য প্রথা—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এইচ্-ডি।

প্রাচীন ইতিহাসের একপৃষ্ঠা—শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী।

পরিচয়—গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার ভূমিকা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ

প্রবর্তক—ভূত পরলোক—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ।

,,—বাংলার প্রাচীন বয়ন-শিল্প ও বাণিজ্য—শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুহ।

,,—প্রদর্শনী ও জাতিগঠন—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

বিবিধ

উদ্বোধন—স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন—স্বামী নির্লেপানন্দ।

বঙ্গশ্রী—মধ্য বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার—শ্রীহরিদাস মিত্র।

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা

৪৬শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ (তৃতীয় স্তবক)
—শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ., ডি. লিট্।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাদেবী—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন।

মন্দিরের অন্তর—শ্রী নির্মলকুমার বসু।

পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম্-এ।

গুপ্তযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া,
এম্-এ, ডি-লিট্।

বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় (৩)—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৬)—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

খোদাই কার্যে বাঙালী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাময়িক সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব—গত ২রা মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার বাঙলার গভর্ণর বাহাদুর স্যর জন হার্বাটের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মহীশূরের দেওয়ান বাহাদুর স্যর মির্জা ইস্‌মাইল এই উৎসবে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

মাতৃভাষাই মিলনের ভিত্তি—স্যর মির্জা মুস্‌মাইল কলিকাতা মুসলিম ছাত্র সমিতির এক সভাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলমান যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্র অধিকতর প্রশস্ত। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভাষা এক। * * এই মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করিয়াই হিন্দু মুসলমানের মিলন নিবিড় হইতে পারে।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচন ও অধিবেশন—মৌলনা আবুল কালাম আজাদ রামগড় কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আগামী ১৯শে মার্চ হইতে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

বঙ্কিম ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন—২৬শে ফাল্গুন রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটাল পাড়াস্থ বৈঠকখানা, যেখানে বসিয়া তিনি অনেক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, সেই বৈঠকখানা সম্পূর্ণ সংস্কৃত হইয়া তাঁহার স্মৃতি উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য দেশবাসীকে আবেদন করিয়াছেন।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ { চৈত্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ { অষ্টম সংখ্যা

গণেশ

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভকালে ফা-হিয়ান চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারত-ত্যাগের সময় তিনিই গণেশমূর্তি চীনে লইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা করিবার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ এ সময় চীনে যে মূর্তিটী গিয়াছিল, ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ যে সমুদয় দ্রব্য ফা-হিয়ান লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সেগুলির একটী হওয়াই সম্ভব। এইরূপ পঞ্চম শতাব্দীতেই যশোগুপ্ত, বুদ্ধনন্দী-প্রমুখ বৌদ্ধ শ্রমণগণ-কর্তৃক তিব্বতে গণেশমূর্তি আনীত হইয়াছিল। ইঁহারা ৪৬০ খ্রীস্টাব্দে সিংহল হইতে ভারতের মধ্য দিয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করেন*। অবশ্য সুং-য়ুন্ ও হুই-সেং নামক চীনা পর্যটকদ্বয়-কর্তৃকও চীনে গণেশমূর্তি আনা সম্ভব; ইঁহারা ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ৫২২ খ্রীস্টাব্দে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় অর্থাৎ পঞ্চম শতকে চীনে গণেশ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যে গণেশমূর্তি আনীত হইয়াছিল বা সপ্তম শতকের শেষার্ধে গণেশপূজার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। য়ুয়ন্-চোয়ঙের ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্তে গণেশের কোন উল্লেখও পাওয়া যায় না। এমন কি, য়ুয়ন্-চোয়ঙের জাপানী শিষ্য দোশো জাপানে যোগবিদ্যার প্রবর্তন করিলেও তিনি গণেশ-সংস্কৃতির কোনোরূপ প্রচার করেন নাই। সপ্তম শতকের শেষভাগে ঈ-চিঙ ভারত হইতে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। ইঁহারও বিবরণীতে গণেশ বা গণেশ-সংস্কৃতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঈ-চিঙ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন বা য়ুয়ন্-চোয়ঙ ভারতে ছিলেন, তখন গণেশ-সংস্কৃতি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা নিশ্চয়ই গণেশ-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অবশ্য বৌদ্ধ-সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁহারা এরূপ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাহার ফলে অন্য কোন সংস্কৃতির উপর

* Edkins: Chinese Buddhism, 111.

তাঁহাদের বিশেষ কোন আসক্তি না আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু গণেশ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহারা যে অশ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। তবে এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের উভয়ের কেহই চীনে গণেশ-সংস্কৃতি প্রবর্তন করেন নাই বা প্রবর্তনে সহায়তা করেন নাই।

যুয়ন্-চোয়ঙের পরে আরও অনেক চীনা পর্যটক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের অধিকাংশই যোগাচার-মতাবলম্বী। এই সমুদয় যুয়ন্-চোয়ঙ-পরবর্তী পর্যটকগণের মধ্যে যুয়ন্-চাও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই যুয়ন্-চাওই চীনে গণেশমূর্তির আমদানী করেন এবং গণেশ-সংস্কৃতির প্রবর্তনও তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি চীন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় চীনা রাজকুমারী ওয়েন্-সে'ঙ তিব্বতের শাসনকর্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে যুয়ন্-চাও তিব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিতে সমর্থ হন। ভারতে নালন্দা বিহারে তিনি কিছুকাল ছিলেন। এখানে তিনি ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন। নালন্দা তখন বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিগত শিক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুবিধাই হইয়াছিল। চতুর্থ শতকের মধ্যেই তন্ত্রযান ও উহার মন্ত্র, ধারণী ও মণ্ডলগুলি বৌদ্ধতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা হইতেই বৌদ্ধ 'গুহ্যসমাজ' রচিত হইয়াছিল। গুহ্যসমাজতন্ত্রেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার শিষ্যদিগকে অতি গুহ্য মন্ত্র 'গণপতি-হৃদয়' শিক্ষা দিয়াছিলেন। উক্ত 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' যুয়ন্-চাও নিশ্চয়ই শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে গণেশ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে।

সপ্তম শতাব্দীতেই আর একটী 'যোগাচার' তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহাতে 'সমাধি'র সাধনায় যোগাভ্যাসের অর্থাৎ 'বৈরোচন'প্রাপ্তির পন্থা প্রচলিত হয়। তন্ত্র হইতেই বৌদ্ধ দেবদেবীর আবির্ভাব হয় এবং উহার দার্শনিক পরিকল্পনা হইতেই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ দেবগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক হিন্দু দেবতাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন, তন্মধ্যে গণেশ অন্যতম।

যোগাচার ও উহার গুহ্যমত ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই বা উহার কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, যোগ বা বৈরোচনের সহিত সংযোগ জ্ঞানীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। ক্রমশঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে হিন্দুতন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটিলে যোগসাধনায় শক্তিপূজার আবির্ভাব হয়। ফলে 'গুহ্যসমাজে' শক্তি-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে এবং উহার মণ্ডলে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের প্রত্যেকের সহিত নিজ নিজ শক্তিকে দেখা যায়। এখানে হিন্দু আদর্শানুযায়ী শক্তি স্ত্রীদেবতারূপেই পরিকল্পিত হইয়াছেন। মূল দেবতার সহিত শক্তির পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত ছোট করা হয়। বৌদ্ধ তন্ত্রেও এই আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। হিন্দু তন্ত্রের সমবধারণা বৌদ্ধ তন্ত্রে গৃহীত হইবার সময় যে কয়জন হিন্দু দেবদেবী বৌদ্ধ দেবগোষ্ঠীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গণেশ অন্যতম, একথা

পূর্বেও বলা হইয়াছে। অবশ্য গণেশ মহাযান শাখার অন্তর্ভুক্ত হন নাই। বৌদ্ধতন্ত্রে গণেশের শক্তি তাঁহার বাম জানুর উপর উপবিষ্টা।

সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে তিব্বতরাজ স্রং-সন্-গম্-পো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। চীনা রাজকুমারী ওয়েন্-সে'ও ছিলেন বৌদ্ধ। এ-ছাড়া এক জন নেপালী বৌদ্ধ রাজকুমারীও মহিষী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহাদের দ্বারাই স্রং-সন্-গম্-পো বৌদ্ধ হন। সপ্তম শতকের তৃতীয় পাদে ভারতের পথে হুয়েন্-চাও তিব্বতে উপস্থিত হইবার একাদশ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতরাজ বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য তো'ন্-মি সম্ভোটকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থাদি লইয়া যাইবার সময় তো'ন্-মি সম্ভোট শক্তি-পূজা সম্বলিত বহু তন্ত্রগ্রন্থও লইয়া যান। ইহাতেই তিব্বতে প্রথম তন্ত্রের প্রবেশ-লাভ ঘটে। নেপাল হইতে হিমালয়-গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়াই যে তিব্বতে তন্ত্রকে লইয়া যাওয়া হয় তাহার প্রমাণও আমরা পাইয়া থাকি।* সপ্তম শতকের মধ্যভাগে হুয়েন্-চাও যখন নালন্দায় আসেন তখন তিনি নিশ্চয়ই ভারতে শক্তি-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, প্রত্যাবর্তনের সময় নেপাল ও তিব্বতে গিয়া ভারতীয় ও তিব্বতীয় যোগাচারের বৈশিষ্ট্য ও পরস্পরের পার্থক্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগে তিব্বতে বোন্-পো ধর্মের প্রচলন ছিল। অনেকের মতে এই বোন্-পো ধর্মের সহিত সভ্যতার সংস্রব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটা তান্ত্রিক ধর্মমত। সুতরাং যোগাচার মত অপেক্ষা শক্তিপূজার প্রভাব তিব্বতীয়দের মধ্যে অধিকতর বিস্তৃত ছিল বলিয়াই মনে হয়। তিব্বতীয় 'যব-যুম' মূর্তি হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যোগাচারিগণ-কর্তৃক গণেশ বৌদ্ধ দেবতারূপে তিব্বতে প্রচারিত হইবার পর হইতে যব-যুম মূর্তির বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পায়। হিন্দুর অন্য কোন দেবতাকে শক্তির সমভিব্যবহারে তিব্বতীয়গণ গ্রহণ করে নাই, এক্ষেত্রে শক্তি-সহ গণেশকে মাত্র গ্রহণ করিবার মূলে কোন্ কারণ থাকাই সম্ভব। অবশ্য যব-যুম মূর্তিতে গণেশের পরিকল্পনার কোন নিদর্শন আমরা পাই না। যব-যুম মূর্তি তিব্বতীয় পরিকল্পনা। তিব্বতীয় যব-যুম মূর্তিতে কোথাও কোথাও হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট দেবতা ও তাঁহার শক্তিকে দেখা গিয়াছে। এইরূপ মূর্তি যে গণেশেরই মূর্তি তাহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। তিব্বতের যব-যুম মূর্তির মত গুহ্য তান্ত্রিক দেবদেবীর মিলিত মূর্তির পরিকল্পনা চীন ও জাপানে অজ্ঞাত ছিল—ভাস্কর্যে বা চিত্রকলায় তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যভাবে এই মিলনের আদর্শ চীন-জাপানে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার পরিবর্তে দুইটী গণেশ মূর্তিকে মিলিতভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও নেপালে প্রথমতঃ তান্ত্রিক দেবতার প্রচলন ছিল। সেক্ষেত্রে চীন বা জাপানে যুগ্ম-দেবতার পরিকল্পনার আদর্শ নিশ্চয়ই উক্ত তিনটী দেশ হইতে আসিয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করা যায়। চীনে এই যুগ্ম-দেবতার

* B. Bhattacharya : Buddhist Esoterism, 50.

নাম--কুয়ন্-সি-তি'এন্, জাপানী নাম—কঙ্গি-তেন। সুয়ন-চাও চীনে কুয়ন্-সি-তি'এন্ মূর্তির প্রবর্তক। ইনি এক জন রহস্যবাদী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভারতে আগমনের পূর্বেও চীনে রহস্যবাদিরূপে ইঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইঁহার গুরু ফা-সুন্-এর ধর্মমত ছিল—ফা-সিঙ-সুঙ, অর্থাৎ প্রকৃতিবাদ। ভারতে আসিয়া সুয়ন্-চাও নালন্দার আচার্য রত্নসিংহের নিকট হইতে তন্ত্রসাধনায় শিক্ষালাভ করিয়া যোগের সপ্তদশ সিদ্ধি লাভ করেন। ফিরিবার পথে তিব্বত সীমান্ত দিয়া তিনি নেপালে আসেন। নেপালে তিনি যথেষ্ট সমাদৃত হন। অতঃপর তিব্বতের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিব্বতের শাসনকর্ত্রী ওয়েন্-সে'ঙ তাঁহাকে খুব আদর-অভ্যর্থনা করেন ও বহু উপহার-উপঢৌকন দেন। এই উপহারসমূহের মধ্যে নিশ্চয়ই যব-যুম মূর্তিতে গণেশের একটী মূর্তি ও উহার সহিত গণেশ-পূজার তান্ত্রিক গ্রন্থাদিও ছিল। ওয়েন্-সেঙ গণেশের ভক্ত ছিলেন এবং তিনি গণেশের জন্য তিব্বতে একটী মন্দিরও করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে সুয়ন্-চাওকে গণেশের মূর্তি দিবেন না, তাহা স্বীকার করা যায় না।

এখন দেখা যাইতেছে, সুয়ন্-চাওই চীনে গণেশ-মূর্তি ও তন্ত্রসম্মত গণেশ-পূজার প্রবর্তক। ৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে সুয়ন্-চাও চীনে দেশে ফিরিয়া লো-য়াঙএ উপস্থিত হন। এখানে চীন সম্রাট্ কাও-সুঙ তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী উ-সে-তি'এয়েনের হাতে রাজ্যশাসনভার ছাড়িয়া দিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। অবশ্য কাও-সুঙ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। য়ুয়ন্-চোয়ঙের একটী বৌদ্ধ অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকা তিনিই রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনিই সুয়ন্-চাওকে প্রথম ৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে আদর-অভ্যর্থনা করেন। সুয়ন্-চাও-এর নিকট হইতে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার (সুয়ন্-চাওয়ের) ভ্রমণের তান্ত্রিক অভিজ্ঞতা এবং যুগ্মমূর্তি গণেশ-পূজার সার্থকতা ও গণেশের তান্ত্রিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য শুনিয়াছিলেন। অবশ্য কাও-সুঙ সুয়ন্-চাওএর নিকট হইতে গণেশ-পূজার তান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। সম্রাজ্ঞী উ-সে-তি'এয়েনেরও ইহাতে আন্তরিকতা ছিল কি না তাহাও জানা যায় না। কিন্তু একটা প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং এই প্রচেষ্টা আরও কিছুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। কারণ ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী উ-সে-তি'এয়েনের পুত্র চুঙ-সুঙ সিংহাসনারোহণ করিলে তদীয় মহিষী উই স্বামীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণপূর্বক তান্ত্রিক গণেশ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় ও প্রচলনে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। এক্ষেত্রে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, সম্রাট্ কাও-সুঙের ইচ্ছা থাকিলেও তদীয় উপপত্নী উ-সে-তি'এনের দ্বারা গণেশ-সংস্কৃতির প্রচার সম্ভবপর হয় নাই। উ-সে-তি'এন্ অতঃপর ৬৮৪ হইতে ৭০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাজ্ঞীরূপে রাজ্য করেন। তখনও প্রবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার পুত্র চুঙ-সুঙেরও সম্ভবতঃ ইহাতে মত ছিল না। শেষে সম্রাজ্ঞী উই উহার প্রবর্তনে সহায়তা করিলেন। এইভাবে সপ্তম শতকের শেষে বা অষ্টম শতকের প্রথমে চীনে তা'ঙ রাজবংশের সহায়তায় তান্ত্রিক গণেশপূজার প্রথম প্রবর্তন হয়।

(ক্রমশঃ)

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র

অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম্. এ.

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, এ দুইজনই বৈদিক ঋষি। বশিষ্ঠ ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলের দ্রষ্টা এবং বিশ্বামিত্র ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। শুধু বেদের সংহিতাভাগে নহে, ব্রাহ্মণভাগেও এই দুই ঋষির মধ্যে কলহের সংবাদ পাওয়া যায়। বেদ ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতেও ইহাদের কলহের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই গল্পগুলি পরস্পর এত বিভিন্ন যে ইহাদের মধ্য হইতে সত্য উদ্ধার করা খুব শক্ত। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ইহাদের ইতিহাস ও আখ্যানের যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

বশিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রদত্ত হইয়াছে। "হে বশিষ্ঠ! বিদ্যুতের ন্যায় স্বীয় জ্যোতিঃবিকীরণকারী তোমাকে যখন মিত্র ও বরুণ দেখিয়াছিল, তখন তোমার এক জন্ম এবং অগস্ত্য যখন পূর্বস্থান হইতে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল তখন তোমার অন্য জন্ম হইয়াছিল। অপিচ হে ব্রাহ্মণ! তুমি বিশ্বামিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্বশীর মানস হইতে উৎপন্ন। দেবতা সম্বন্ধীয় স্তুতিদ্বারা বীজ ক্ষরিত হইয়াছিল এবং বিশ্বদেবগণ তোমাকে পুষ্করে ধারণ করিয়াছিল। সহস্রদান বা সর্বদানযুক্ত বশিষ্ঠ দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই বিশেষভাবে জানেন। তিনি যমের দ্বারা এই সংসারকে বরণ করিয়া অপ্সরা হইতে জন্মিয়াছিলেন। সত্রে অর্থাৎ বহু কর্তৃক যাগে দীক্ষিত মিত্র ও বরুণ অন্য লোক কর্তৃক স্তুতিদ্বারা প্রেরিত হইয়া কুম্ভে রেতঃসেক করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ কুম্ভ মধ্য হইতে মান অর্থাৎ অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তদনন্তর জাত ঋষি বশিষ্ঠ নামে কথিত হইয়াছিল। হে প্রতৃদ্! (তৃৎসুবংশভব) বশিষ্ঠ তোমাদের দিকে আগমন করিতেছে, ইহাকে সন্তুষ্টান্তঃকরণে বরণ কর। ইনি উকথভৃৎ (হোতা), সামভৃৎ (উদ্‌গাতা), গ্রাবাধারী (অধ্বর্যু) প্রভৃতিকে স্বীয় স্বীয় কর্মে নিযুক্ত করেন এবং তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতির সমাধান করেন। (R. V. VII. 33. 10-14)

এই মন্ত্রগুলির সম্বন্ধে কতকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত আছে; পূর্বোক্ত ১১ ঋকের ব্যাখ্যানাবসরে যাস্ক বলিতেছেন—উর্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেত পতিত হইয়াছিল, এই ঋকে সেই কথাই বলা হইতেছে। এই সম্বন্ধে সায়ণ বৃহদ্দেবতা হইতে নিম্নলিখিত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন—

তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্বশীম্।
রেতশ্চস্কন্দ তৎকুম্ভে ন্যপতৎ বাসতীবরে॥
তেনৈব তু মুহূর্তেন বীর্যবন্তৌ তপস্বিনৌ।
অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সংবভূবতুঃ॥

বহুধা পতিতং রেতঃ কলশে চ জলে স্থলে।
স্থলে বশিষ্ঠশ্চ মুনিঃ সম্ভূত ঋষিসত্তমঃ॥
কুম্ভে অগস্ত্যঃ সম্ভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ।
উদিয়ায় ততোঽগস্ত্যঃ শম্যামাত্রো মহাতপাঃ॥
মানেন সংমিতো যস্মাত্তস্মান্মান্য ইহোচ্যতে।
যদ্বা কুম্ভাদৃষির্জাতঃ কুম্ভেনাপি হি মীয়তে॥
কুম্ভ ইত্যভিধানঞ্চ পরিমাণঞ্চ লক্ষ্যতে।
ততোঽপ্সু গৃহ্যমাণাসু বশিষ্ঠঃ পুষ্করে স্থিতঃ॥
সর্বতঃ পুষ্করে তং হি বিশ্বেদেবা অধারয়ন্॥

সত্রে অপ্সরা উর্বশীকে দেখিয়া সেই আদিত্যদ্বয়ের রেত বসতীবরী নামক কুম্ভে পতিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্তেই বীর্যবান্ তপস্বিদ্বয় অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছিল। রেত নানা ভাবে বিভক্ত হইয়া কলশ, জল ও স্থলে পতিত হইয়াছিল। স্থলে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ, কুম্ভে অগস্ত্য এবং জলে মহাদ্যুতি মৎস্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহাতপা অগস্ত্য শম্যামাত্র পরিমাণ বলিয়া মান্য নামেও কথিত হইয়া থাকে, অথবা ঋষি কুম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, (কুম্ভ দ্বারাও পরিমাণ করা হয়), সুতরাং তিনি মান্য ও কুম্ভযোনি। অনন্তর জল গৃহীত হইলে বশিষ্ঠ পুষ্করে স্থিত হইলেন এবং বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে পুষ্করেই ধারণ করিলেন।

সায়ণভাষ্য, নিরুক্ত বা বৃহদ্দেবতা, কিছুতেই বশিষ্ঠের জন্মকথা সুস্পষ্ট নহে। ইহার আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও একটী অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, আমরা এখানে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বেদের মতে মিত্র সূর্যোদয়ের দেবতা এবং বরুণ সূর্যাস্তের দেবতা এবং উষা সূর্যের স্ত্রী। অপ্সরা শব্দের অর্থ যাহা জল হইতে উৎপন্ন *। রঙ্গনাথ রামায়ণের বাক্য বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অপ্সু নির্মথনাদেব রসাৎ তস্মাৎ বরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতু র্মনুজ শ্রেষ্ঠ! তস্মাদপ্সরসোঽভবন্॥

সুতরাং জলে নিপতিত সূর্যরশ্মিকে অপ্সরা অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উরূন্ মহতঃ অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ইতি উর্বশী। যিনি উৎপত্তির পর মহান্ ভূ ও ভুবর্লোককে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন তিনি উর্বশী অর্থাৎ সম্পন্ন সূর্যরশ্মি।

ঋগবেদে বশিষ্ঠ ও বাশিষ্ঠগণকে বিদ্বান্ এবং বেদবিৎ বলিয়া বলা হইয়াছে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে যজ্ঞকার্য অনুষ্ঠিত হয় সুতরাং মিত্র ও বরুণ তপের দ্বারা সমৃদ্ধ বশিষ্ঠকে দেখিয়াছিলেন। নামরূপে পরিচিত হওয়ার নামই জন্ম, অতএব যজ্ঞে মিত্র বরুণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎই বশিষ্ঠের প্রথম জন্ম।

* অদ্ভ্যঃ সরন্তীতি (অপ্‌—সৃ+অসি) অপ্সরসঃ।

ঋষি অগস্ত্য বেদে মান, মান্য ও মান্দার্য নামে বিখ্যাত; ইহার কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অগস্ত্য ভগবান্ বিষ্ণুর (সূর্যের)-ই নামান্তর *। ইনি লোপামুদ্রা (one who loses her phase) অর্থাৎ চন্দ্রের স্বামী (R. V. I. 179)। সূর্য-সিদ্ধান্তমতে ধ্রুবতারা দুইটী, একটী উত্তর মেরুতে অপরটী দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত †। খ্রীঃ পূঃ ১২শতকে দক্ষিণমেরু-স্থিত ধ্রুবতারা অগস্ত্য নামে কথিত হইত। অগস্ত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহা অগ অর্থাৎ পর্বত, বৃক্ষ বা সমুদ্রকে স্তম্ভিত করে ‡। এই অর্থ হইতে অগস্ত্যের বিন্ধ্যদমন ও সমুদ্র শোষণ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বৃহৎ সংহিতাতেও অগস্ত্যের মান্য নামের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—মানেন সম্মিতো যস্মাৎ তস্মাৎ মান্যেতি উচ্যতে। অবশ্য এখানে মানশব্দ axis অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অগস্ত্যকে মন্দরের পুত্র অর্থাৎ মান্দার্যও বলা হইয়াছে §। বিষ্ণু পুরাণের—স্বমাশ্রমং সৌম্যমুপাজগাম—হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অগস্ত্যের পূর্ব বাসস্থান উত্তর মেরু ছিল এবং তথা হইতে যে তিনি দক্ষিণ মেরুতে গমন করিয়াছিলেন উহা উক্ত পুরাণেই এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—ইত্যেব মুক্ত্বা ভগবান্ জগাম। দিশং স যাম্যাং সহসান্তরীক্ষম্।

সুতরাং উত্তর মেরুস্থিত অগস্ত্য এখন স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ মেরুতে আসিয়া পূর্ব নামেই পরিচিত রহিল এবং উত্তর মেরুস্থিত ধ্রুবতারা বশিষ্ঠ নামে কথিত হইল; ইহাই বশিষ্ঠের দ্বিতীয় জন্ম। অগস্ত্য ও বশিষ্ঠকে দুই যমজ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। মিঃ গ্রিফিৎ ততঃ সমানঃ উদিয়ায় কুম্ভাৎ প্রভৃতি ঋকের নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ করিয়াছেন---

> Born at the sacrifice, urged by adoration,
> 　　both with a common flow bedewed the pitcher.
> Then from the midst thereof, there rose up Mana,
> 　　and thence, they say, was born the sage Vaśistha.

জলে ও স্থলে (পর্বত ও সমুদ্রে) প্রকাশিত উষার সম্পন্ন রাগ হইতেই অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি। উদয়ের প্রাক্‌কালে জলে ও স্থলে; উভয়ত্রই সূর্যকে কুম্ভের ন্যায় দেখায়—মনে হয় সূর্যের রশ্মি যেন উহাতেই বিকীর্ণ হইতেছে। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যই রূপকের আবরণে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে পরবর্তী ঋক্‌গুলিও দুর্বোধ বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা এই ঋগ্‌মন্ত্রগুলির আধিদৈবিকব্যাখ্যা। ইহাদের আধিভৌতিক ব্যাখা প্রসঙ্গে যাস্ক ও বৃহদ্দেবতা পূর্বোক্ত রূপ

---

* অগস্ত্যঃ ভগবান্ বিষ্ণুঃ—A. P.

† মেরোঃ উভয়তঃ মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে—S. S. XII. 43.

‡ অগমস্তভ্নাতীতি অগস্তিঃ। অগং স্ত্যায়তি ইতি অগস্ত্যঃ।

§ এবঃ বঃ স্তোমঃ, মরুতঃ ইয়ং গী মান্দার্যস্য কারোঃ - R. V. 1. 165. 15—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে সমুদ্র মন্থনের জন্য দেবতা ও অসুরগণ মন্দর পর্বতকে স্বর্গে নিয়া গিয়াছিলেন। রূপকের আবরণে ইহা ধ্রুব তারাদ্বয়ের অবস্থিতির কথাই বলিতেছে

উপাখ্যান প্রদান করিয়াছে। তন্ত্রে মেরুকে পৃথিবীপদ্মের কর্ণিকা বলা হইয়াছে। বৃহদ্দেবতার শেষ দুই ছত্র সেই কথাই বলিতেছে।

বেদের এই আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যাখ্যাই বিকৃত হইয়া রামায়ণ ও মহাভারতে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে এবং উহাই অবলম্বন করিয়া আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদদ্রষ্টা ঋষিকে বেশ্যাপুত্র বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না।

মনুসংহিতাতে বশিষ্ঠের জন্ম বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া স্বায়ম্ভুব মনু মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন (১।৩৫-৩৬)। বিষ্ণুপুরাণের মতে সনক, সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ সংসারে বিরক্ত হইলে ব্রহ্মা সৃষ্টিরক্ষার অভিপ্রায়ে স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে তাঁহার মন হইতে সৃষ্টি করিলেন। (১।৭)। উক্ত পুরাণে (৩।১) বশিষ্ঠ সপ্তর্ষির মধ্যে গণ্য হইয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে বিশ্বামিত্রও বর্তমান রহিয়াছেন। মহাভারতের আদিপর্বে (৭৫৬৯) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও কশ্যপ ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন, কিন্তু শান্তিপর্বে বশিষ্ঠের নাম ইঁহাদের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত পর্বেরই অন্যত্র (১২৬৮৫) প্রজাপতির সংখ্যা একবিংশতি বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (২।১০) বশিষ্ঠকে আষাঢ় মাসে সূর্যের রথের একজন অধ্যক্ষ বলা হইয়াছে, ফাল্গুন মাসে এই অধ্যক্ষের কার্য বিশ্বামিত্রে অর্পিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (৩।৩) বশিষ্ঠকে একজন বেদবিভাজক ঋষি বলিয়াও বলা হইয়াছে। উপরিউক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বশিষ্ঠের জন্ম বিবরণ প্রহেলিকাপূর্ণ। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং মিত্র ও বরুণের তেজোংশসম্ভূত ও স্বয়ং (তেজঃস্বরূপ) বেদের বহুস্থানে বশিষ্ঠ ও বশিষ্ঠ পুত্রগণের বিদ্যাবত্তার কথা বর্ণিত রহিয়াছে। বশিষ্ঠের জন্ম বিবরণেও বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। যজ্ঞ সম্পাদনকারী ঋত্বিকগণের মধ্যে ব্রহ্মার স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ। বশিষ্ঠ কোন সংজ্ঞাবাচক শব্দ বলিয়া মনে হয় না, ইহা বংশের উপাধিমাত্র।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডল হইতে দেখা যায় যে বশিষ্ঠ ও তাহার পুত্রগণ দেবরাতের পৌত্র এবং পিযবনের পুত্র সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। দশরাজার বিরুদ্ধে যখন সুদাসের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন বশিষ্ঠ ইন্দ্রের নিকট সুদাসের জয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (VIII. 21) সুদাসের সহিত বশিষ্ঠের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিতে পারা যায়। তথায় উল্লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ পিযবন পুত্র সুদাসের সার্বভৌমত্বের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

বরুণের সহিত বশিষ্ঠের মিত্রতা ছিল। তাহারা এক নৌকায় ভ্রমণ করিতেন, ঘনিষ্টভাবে কথাবার্তা বলিতেন এবং সর্বদা বন্ধুভাবে অবস্থান করিতেন। কোনও কারণ বশতঃ বরুণ একসময়ে বশিষ্ঠের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ দুঃখিতান্তঃকরণে ইহার জন্য বরুণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে নিম্নলিখিত বিষয়টী উল্লিখিত হইয়াছে : "যাহারা দুষ্ট বা যাহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে সোম তাহাদের উন্নতিসাধন করেন না। তিনি রাক্ষস ও মিথ্যাবাদীকে নিহত করেন এবং মিথ্যাবাদী ও রাক্ষস উভয়ই ইন্দ্রের পাশে আবদ্ধ হয়। হে অগ্নি যদি আমি অসত্য দেবের উপাসনা করিয়া থাকি অথবা যদি আমার দেবে ধারণা অসত্য হয়, তবে হে জাতবেদা! তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হও কেন? যাহারা অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে তাহারা তোমার দ্বারা বিনষ্ট হউক। যদি আমি যাতুধান হই বা কাহারও প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকি তবে আজই আমার মৃত্যু হউক। যে আমাকে যাতুধান বলিয়া সম্বোধন করে তাহার দশপুত্রের প্রাণ বিযুক্ত হউক। যে আমি যাতু না হইলেও আমাকে যাতুধান বলে এবং নিজে রাক্ষস হইয়া আপনাকে শুদ্ধ বলিয়া প্রখ্যাপিত করে ইন্দ্র তাহার মস্তকে বজ্র নিপাতিত করুন, সে সমুদয় প্রাণীর অধম হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক।"

এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়ণ বলিতেছেন—বশিষ্ঠের শত পুত্র হত্যা করিয়া এক মায়াত্মক রাক্ষস তাহারই মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল---তুমি রাক্ষস, তুমি বশিষ্ঠ।

ইহার মূলে কোন সত্য থাক্ বা নাই থাক্ ইহা যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহের বীজ স্বরূপ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মহামতি প্রফেসর ম্যাক্সমূলরও এই অনুমানই করিয়াছেন * ।

তৈত্তিরীয় সংহিতা (Ashtaka VII) ও কৌষীতকী (4th. ch.) ব্রাহ্মণে সুদাসের পুত্রগণ কর্তৃক বশিষ্ঠের এক পুত্রের হত্যার কথা বর্ণিত আছে। সায়ণাচার্য সপ্তম মণ্ডলের আরম্ভে তদীয় ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন---শাট্যায়ন ব্রাহ্মণের মতে বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি, সুদাসের পুত্রগণ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র বশিষ্ঠের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহার পূর্বাংশ দগ্ধ হইবার পূর্বে শক্তি কর্তৃক উচ্চারিত হইয়াছিল। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের মতে ইহার সমুদয়ই বশিষ্ঠ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।

মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈযবনে নৃপে॥ মনু ৮।১১০

উপরিউক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি ও কুল্লুক ইহা বশিষ্ঠের পূর্বোক্ত ঋঙ্মন্ত্রের শপথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন † ।

---

* The verses have arisen out of Vasistha's contest with Visvamitra and it may have been the latter personage who brought these charges of heresy, and of murderous and demonical character against his rival,

† পৈজবনো রাজা বভূব তস্মিন্ কালে বিশ্বামিত্রেণাক্রুষ্টো মণ্ডলমধ্যগতঃ কামক্রোধাভ্যাং সংশোধ্যচরণোঽহমাহরো যাতুধানোঽস্মীতি শপথং গৃহীতবান্ বিশ্বামিত্রেণোক্তস্তস্য রাজ্ঞঃ সমক্ষমনেনৈব তৎপুত্রশতমশিতমেব হি রক্ষ ইতি। ততঃ স উবাচ অত্রৈব ম্রিয়ে যদি রক্ষঃ স্যাম্ ইত্যাত্মজনিষ্টাশংসনমত্র; স শপথঃ পুত্রদারাদিশিরঃস্পর্শনে প্রত্যনিষ্টাশংসনং শপথো-মন্তব্যঃ—মেধাতিথি।

বশিষ্ঠোঽপ্যনেন পুত্রশতং ভক্ষিতমিতি বিশ্বামিত্রেণাক্রুষ্টঃ স্বপরিশুদ্ধয়ে পৈযবনাপত্যে সুদাম্নি রাজনি শপথং চকার। কুল্লুক।

 (ক্রমশঃ)

স্যার আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্‌. এ., বি. এল্‌., পি. এইচ্‌. ডি., এফ্‌. আর্‌. এ. এস্‌. বি.

১৮১৪ খৃস্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী Westminster নগরে স্যার আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এ্যালেন কানিংহাম স্কটল্যাণ্ডের একজন সামান্য কবি ছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম Christ's Hospital-এ প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। পরে Addis-Combe-র সামরিক কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৩১ সালে জুন মাসে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স বিভাগের Second Lieutenant হইয়া ভারতে আসেন। ১৮৩৪ সালে তিনি তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক্ক এর এড্‌-ডি-কং নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ সালে কোন একটী বিশেষ কার্যোপলক্ষে তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ জেমস্‌ প্রিন্সেপ এর সংস্পর্শে আসেন। জেমস্‌ প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী অক্ষর সম্পূর্ণরূপে এবং খরোষ্ঠি অক্ষর আংশিকরূপে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে কানিংহাম সাহেব প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব লইয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে তিনি অযোধ্যার রাজার অধীনে ইঞ্জিনিয়ারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ সালে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিনি কোন একটী বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে Ladak দেশে গিয়াছিলেন। ১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমা নির্দেশ করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের পদে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে চিলিয়ানওয়ালা, গুজরাট ও পাঞ্জাবের যুদ্ধে তিনি সৈনিকের কার্য করেন। ১৮৩৩ সাল হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত তিনি পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টের অধীনে বহু পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে Lt. Maisey-র সহিত তিনি মধ্য ভারতের বৌদ্ধ কীর্তিস্তম্ভ দেখিতে আসেন এবং উহাদের সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার "Bhilsa Topes or Buddhist Monuments of Central India" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৫৬ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ব্রহ্মদেশের চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার এবং ১৮৫৮ সাল হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ) চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

সৈনিকের কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ভারতের বহু স্থানের সহিত তাঁহার সম্যক্‌ পরিচয় হয়। ভারতের পুরাতত্ত্বের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৬১ সালে তাঁহাকে Archaeological Surveyor-এর পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৬৫ সালের মধ্যে তিনি Archaeological Survey Reports-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। লণ্ডনে বাসকালে তিনি দিল্লী ও লণ্ডন ব্যাঙ্কের Director হইয়াছিলেন। ১৮৭১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি Archaeological

Survey-এর Director General হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ১৫ বৎসর ধরিয়া এই পদে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর ভারতের সেবা করিয়া তিনি ১৮৮৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ৭২ বৎসর বয়সে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে C. S. I., পরে C. I. E. এবং অবসর গ্রহণ করার পর K. C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে তিনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক তত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। এমন কি জীবনের শেষ ভাগে কোন একটী কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াও এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। প্রাচীন ভারতের ভূবৃত্তান্ত, মুদ্রাতত্ত্ব, শিলালিপি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গবেষণা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার সমস্ত সনাক্তকরণ (identifications) যে ঠিক তাহা মানিয়া লওয়া যায় না; তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির জরিপ করিয়া তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক তত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের চর্চায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনিই অগ্রণী এবং এই কারণে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৮৬২ সালে ভারতে প্রথম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয় এবং তিনি এই বিভাগের অধ্যক্ষ (Director) পদ লাভ করেন। পুরাতত্ত্বের ইতিহাস এবং পুরাতন গল্পসংগ্রহ করাই তাঁহার কার্য ছিল। নয় বৎসর পরে তাঁহার পদ Director-General of Archaeological Survey of India নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই উত্তর ভারতের জরিপ কার্যের অগ্রণী ছিলেন। মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে জরিপ সম্বন্ধীয় কোন কার্য তাঁহাকে করিতে হয় নাই। ২৩ বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২৩ খানি Report-এর মধ্যে যে সমস্ত বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পারদর্শিতা ও পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া ধৈর্য সহকারে জরিপ কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৬২ সালে তিনি যখন প্রথম কার্যে যোগদান করেন তখন প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আলোচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণামূলক রচনা হইতে জানা যায় যে, ঐ সকল স্থান হইতে বহু জিনিষ সংগ্রহ করিয়া যাদুঘরে রাখিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

তাঁহার রচনার মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল:—

পুস্তক:—

(1) The Ancient Geography of India, I (London, 1871).
(2) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I. (Calcutta, 1877).
(3) The Stupa of Bharhut, a Buddhist Monument, (London, 1879),

(4) Book of Indian Eras (Calcutta, 1883).

(5) Coins of Alexander's Successors in the East (London, 1884).

(6) Archaeological Survey of India, Vols. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21 (Calcutta, 1862-1885). Vols. 4. 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, তাঁহার তত্ত্বাবধানে তাঁহার সহকর্মীদের দ্বারা লিখিত হয়।

(7) Coins of Ancient India from the Earliest Times down to the 7th century, A.D. (Londan, 1891).

(8) Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Buddha Gaya. (London, 1892).

(9) Coins of the Indo-Scythians, Sakas and Kushans. (London, 1893).

(10) Later Indo-Scythians. (London, 1893).

(11) Coins of Mediæval India. (London, 1894).

(12) The Bhilsa Topes or Buddhist Monuments of Central India. (London, 1854)

প্রবন্ধ ঃ—

(1) Notice of some counterfeit Bactrian Coins (J.A.S.B., IX, 393). (2) Notes on Captain Hay's Bactrian coins (Ibid, IX, 531). (3) Description of, and Deductions from a consideration of some new Bactrian coins (Ibid, IX, 867). (4) Second notice of some forged coins of the Bactrians and Indo-Scythians (Ibid, IX, 1217). (5) Abstract journal of the route to the sources of the Punjab rivers (Ibid, X, 105). (6) Discription of some ancient gems and seals from Bactria, the Punjab and India (Ibid, X, 147). (7) A sketch of the second silver plate found at Badakshan (Ibid, X, 570). (8) Notice of some unpublished coins of the Indo-Scythians (Ibid, XIV, 430). (9) Journal of a trip through Kulu and Lahul, to the Chu Murari Lake, in Ladak, during the months of August and September, 1846 (Ibid, XVII, Pt. I, 201). (10) Memorandum detailing the boundary between the territories of Maharaja GulabSingh and British India, as determind by the Commissoners P.A. Vans Agnew, Esqr. and Capt. A. Cunningham (Ibid, XVII, Pt. I, 295). (11) Verification of the Itinerary of Hwen Thsang through Ariana and India, with reference to Major Anderson's hypothesis of its modern compilation (Ibid, XVII, P. I, 476). (12) Proposed archæological investigation (Ibid, XVII, Pt. I, 535) . (13) Verification of the itinerary of the Chinese pilgrim, Hwen Thsang, through Afghanistan and India, during the first half of the seventh century of the Christian era (Ibid, XVII, Pt. II, 13). (14) An essay on the Arian order of Architecture, as exhibited in the Temples of Kashmir (Ibid, XVII, Pt. II, 241). (15) Coins of Indian Buddhist Satraps, with Greek inscription (Ibid, XXIII, 679). (16) Memorandum on the Irawadi river, with a monthly register of its rise and fall from 1865 to

1858, and a measurement of its minimum discharge ((Ibid, XXIX, 175). (17) On the Bactro-Pali inscription from Taxila (Ibid, XXXII, 139, 172). (18) Archaeological Survey Report for 1861-62 (Ibid, XXXII, Supp. No. 1). (19) Note on the Bactro-Pali inscription from Taxila (Ibid, XXXIII, 35). (20) Remarks on the Date of Pehewa Inscriptions of Raja Bhoja (Ibid, XXXIII, 223). (21) On the Pehoa inscription of Raja Bhoja (Ibid, XXXIII, 229). (22) Archaeological Survey Report for 1863-64 (Ibid, XXXIII, Supp. No. I). (23) On Antiquities of Bairat, etc. (Proc., 1865, 97). (28) Coins of the nine Nagas, and of two other Dynasties of Narwar and Gwalior (Ibid, XXXIX, Pt. I, 115). (25) Memorandum on the operations of the Archaeological Survey for season 1873-74 (Proc., 1874, 108). (26) Notes on the gold coins found in the Ahin Posh Tope (Proc., 1879, 205). (27) Remarks on Bactian and south Indian Coins (Proc., 1880, 117). (28) Note on Coin of Shams-ud-din Kaimurs (Proc., 1881, 158). (29) Relics from anci nt Persia in gold, silver and copper (Ibid, I, Pt. 1, 151). (30) Note on Coin from Mahanada (Proc., 1882, 104). (31) Remarks on Coins from Tomluk (Proc., 1882,113). (32) On a gold Gupta Coin sent by Mr. H. Rivett Carnac (Proc., 1883, 144). (33) Relics from ancient Persia, in gold, silver and copper (lii, pt. I, 64, 258). (34) Ruins of Saukassa, J. R. A. S. (1843, 241). (35) Opening of Topes or Buddhist Mnouments of Central India. (J. R. A. S., 1852, 108). (36) Ancient Incription from Mathura, note, (J. R. A. S., 1871, 193). (37) Coin of the Indian Prince Sophytes, a contemporary of Alexander the Great (Numismatic Chronicle) (38) Coins of Alexander's Successors in the East, the Greeks and Indo-Scythians—an important series of papers (N. C., new series, Vol. viii. pp. 93-136, 181-213 and 257-83 ; Vol. ix, pp. 28-46, 121-53, 217 46 and 293-318 ; Vol. x, pp. 65-90, 205-36 ; Vol. xii, pp. 157-85 and Vol. xiii, pp. 187-219).

মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাব ও সাধনা

শ্রীঅজিত ঘোষ

আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় শিল্পসাধনায় চিত্রকলার যে চরম পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহা সর্বত্রই স্বীকৃত। ইহার যথোচিত প্রমাণাদিরও অভাব নাই। অজন্টা, বাঘ, শিগিরি, সিত্তনবশল প্রভৃতি গুহার ভিত্তিচিত্র তাহার অপূর্ব নিদর্শন; ভিত্তিচিত্র ভারতের চিত্রকলাপদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। ভিত্তিচিত্র বলিতে ইট, পাথর কাঠের দেওয়ালের উপর চুণকাম করিয়া তাহাতে চিত্রণ করাই বুঝিতে হয়। ইতালীতে এইরূপ ভিত্তিচিত্র বা fresco buono-র রীতি অনেকদিন ধরিয়াই আছে। ইতালীয়ানরা এই fresco buono-র চিত্রণ কোনও দেওয়ালের উপর খানিকটা করিয়া আঁকিয়া শেষ করে; রঙ যাহাতে চিত্রাঙ্কনের জমির সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশিবার অবকাশ পায়, তজ্জন্য দেওয়ালটী বরাবর আর্দ্র রাখা হয়। এইরূপ fresco buono-র রীতি যে আমাদের দেশে অনেক পূর্বেই ছিল, তাহা অজন্টা ও অন্যান্য গিরিগুহার চিত্রকলা হইতে স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায়। স্থায়িত্বের পক্ষে ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের বৈশিষ্ট্যও আছে—তৈলচিত্রের অপেক্ষা ইহার স্থায়িত্ব অনেক বেশী।

ভিত্তিচিত্র ব্যতীত tempera চিত্র এবং কাষ্ঠপট, চর্মপট ও গুটান দীর্ঘ পটচিত্রে (rolled canvas) চিত্রণও আমাদের দেশে অনেক দিন ধরিয়াই প্রচলিত এবং মধ্যযুগে উহাদের আদর যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। 'কামসূত্র' ও 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' উভয় গ্রন্থেই দেখা যায়, ভিত্তিচিত্র, কাষ্ঠপটচিত্র ও পটচিত্র এই তিনটীরই ব্যবহার আমাদের দেশের চিত্রকরদের দ্বারা হইত। পটচিত্র গুটাইয়া রাখা হইত এবং উহাতে পর পর বহু চিত্র অঙ্কিত থাকিত। 'কামসূত্র' খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে এবং 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' সপ্তম শতকে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ দুইটী রচিত হইবার পূর্বেই যে ইহাদের উল্লিখিত রীতিগুলি প্রচলিত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেও এরূপ একটী গুটান পটচিত্র চাণক্যের এক জন গুপ্তচর চন্দনদাসের গৃহে সমবেত জনমণ্ডলীকে সঙ্গীত-সহযোগে দেখাইয়াছিল (মুদ্রারাক্ষস ১ম অধ্যায়)। * কামসূত্রে দেখা যায়, প্রতি শিক্ষিত জনের গৃহে একটী করিয়া চিত্রণকার্যের জন্য কাষ্ঠপট এবং তুলি ও অন্যান্য আঁকিবার সরঞ্জাম রাখিবার জন্য একটী করিয়া আধার থাকিত। † অবশ্য বিষ্ণুধর্মোত্তরে কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়; উহাতে বলা হইয়াছে যে, নিজ বাটীতে নিজেই চিত্রাঙ্কণ করা নিষিদ্ধ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে দেখা যায়—সে যুগে রাজ-পরিবার, রাজসভার অভিজাতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদিগকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। শিল্পীরা চিত্রকলার অনুশীলন করিতেন বৃত্তির জন্য বা জীবনধারার একটী নির্দিষ্ট পথ তৈয়ারী করিবার জন্য। কিন্তু সম্ভ্রান্ত

নাগরিকগণ বা রাজবংশীয়েরা শিক্ষা করিতেন অবসরকালে চিত্তবিনোদনের জন্য। সাধারণ বাসগৃহে প্রণয়, গতিবিলাস ও শান্তির চিত্র আঁকিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রদর্শনী-গৃহে বা মন্দিরে অলৌকিক জীবন ও ভয়ঙ্কর চিত্র সংরক্ষণ করিতে হইত। যাহার গৃহেই চিত্র থাকিবে সৌভাগ্য তাহার অনুকূল হইবে। রত্নাবলী', 'রঘুবংশ', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে রাজপুরুষ ও ভৃত্যস্থানীয় উভয়েরই দ্বারা চিত্রাঙ্কনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে চারি প্রকার চিত্রের কথা আছে—'সত্য', 'বৈণিক', 'নাগর' ও 'মিশ্র'। 'শিল্পরত্নে' (২৬. ১৪৩-৫) ধূলিচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; ইহা অনেকটা আমাদের বাঙলাদেশের মেয়েদের আলপনার মত। অবশ্য প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রগুলিতে আমরা 'ধূলিচিত্র' ব্যতীত 'পুষ্পচিত্র' ও 'রসচিত্র' নামে আরও দুইটী চিত্রকলার সন্ধান পাই। ব্যবহৃত উপকরণের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী 'চিত্রাভাসের' প্রতিকৃতি রচনার পক্ষে ধূলিচিত্র, পুষ্পচিত্র ও রসচিত্র এই তিনটী পদ্ধতিরই ব্যবহার কথিত হইয়াছে। যে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির দ্বারা মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় কোন একটী দ্রব্যের সাদৃশ্য দেখান হয় তাহাই চিত্রাভাস। চক্ষুতেই মাত্র উহা অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু স্পর্শ করিলে কাচের মত মসৃণ মনে হইবে। ধূলিচিত্রে নানারূপ বর্ণের ধূলি (যেমন—প্রস্তরচূর্ণ) ব্যবহৃত হয়, পুষ্পচিত্রে নানারূপ পুষ্প বা পুষ্পের দল, কোরক প্রভৃতির ব্যবহার আছে এবং রসচিত্রে জলে নানা প্রকার বর্ণ মিশাইয়া চিত্রপট, কাষ্ঠপট, ভিত্তি বা ছাদে অঙ্কন করা হইয়া থাকে। রসচিত্রই সর্বাধিক আদৃত ও স্থায়ী। মধ্যযুগের চিত্রকলায় শিল্পীর সাধনা এই রসচিত্রেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। ভাব ও ছন্দের অভিব্যঞ্জনা একমাত্র এই রসচিত্রেই সম্ভবপর। শিল্পরত্নে (৪. ৪৬. ১৪৫-৬) বলা হইয়াছে—দর্পণে প্রতিফলিত মূর্তির মতই চিত্রের আকৃতি ও ভাবাভিব্যঞ্জনা হইবে, কারণ ইহাতে চিত্রের আদর্শ স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়। যাহার চিত্র আঁকিতে হইবে তাহার আকৃতি সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এজন্য বিষ্ণুধর্মোত্তরে 'দৃষ্ট' কথাটীর উপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ঋষি বিষ্ণু যখন আম্ররসের সাহায্যে দেবনর্তকী উর্বশীর রেখাচিত্র আঁকিতেছেন, সেখানে এই 'দৃষ্ট' কথার বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায় (বিষ্ণুধর্মোত্তর, ১. ১২৯. ১-১৯)। বিষ্ণু উর্বশীকে দেখিয়াছিলেন এবং তাহারই স্মৃতি হইতে ঐ চিত্রাঙ্কনের সূচনা। 'দৃষ্ট' অর্থে বাস্তব জগতে যাহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। দৃষ্ট-শব্দের সহিত অ-দৃষ্ট শব্দেরও তাৎপর্য বিষ্ণুধর্মোত্তরে দেখান হইয়াছে।

'বিষ্ণুধর্মোত্তর', 'শিল্পরত্ন', 'শুক্রনীতিসার', 'কামসূত্র' প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের অমূল্য

---

* দ্র° হর্ষচরিত (নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ) ৫. ১৫৩। ডক্টর বড়ুয়া 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রেও (জুন ১৯২৭, ৩৭০-১) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

† কামসূত্র, বারাণসী-সংস্করণ, ৩২, ৪৪।

গ্রন্থ। এগুলি মধ্যযুগের অবদান। গুপ্তযুগকে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতের renaissance যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এযুগেই ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিধ পরিণতির ব্যাপক আন্দোলন ওঠে। সেই আন্দোলন-প্রগতির মধ্য দিয়া সুকুমারশিল্পসাধনার কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগে নাগরিকদের জীবনে চিত্রকলার যে এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল বিষ্ণুধর্মোত্তরে তাহা আমরা দেখিতে পাই। দর্শকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতানুযায়ী চিত্রের গুরুত্ব গৃহীত হইত। দর্শকের মনোবৃত্তি-প্রসঙ্গে তাই দেখা যায়—শ্রেষ্ঠেরা রেখার প্রশংসা করেন, রসগ্রাহক 'বর্তনা'র (light and shade) প্রশংসা করেন, রমণী অলঙ্কারাদির বৈচিত্র্য পছন্দ করে, অবশিষ্ট সাধারণ দর্শক উপভোগ করে বর্ণ বৈচিত্র্যের লীলা। এইজন্য, চিত্র যাহাতে সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করিতে পারে সেইরূপ মনোভাব লইয়া শিল্পীকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। চিত্রের বিষয়-অনুসারে শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবেন। অবশ্য স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও শিল্পশাস্ত্রীয় রীতি ও পদ্ধতি তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইল।

মধ্যযুগে সাধারণ বাসগৃহ, প্রাসাদ ও মন্দিরের গৃহতলে, প্রাচীর ও ছাদে এবং রাজপথে স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে অলঙ্কৃত চিত্রদ্বারা জনসাধারণের মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইত বা তাহারা উপদেশাদি লাভ করিত ; এমন কি, ধর্মগুরুগণও যাহাতে তাঁহাদের বক্তব্য শিশু ও অজ্ঞের পক্ষে বোধগম্য হইতে পারে তজ্জন্য চিত্রাঙ্কন করিতেন। 'সারত্থপকাসিনী' নামক একটী গ্রন্থের শ্যামদেশীয় সংস্করণে দেখা যায়, 'নখ' নামে একটী ব্রাহ্মণ্যধর্মগুরু-সম্প্রদায় ছিল। ইহারা একটী সহজবহ আধারে নানা প্রকার চিত্র সংরক্ষণ করিতেন। এই সমুদয় চিত্রে সৎ ও দুষ্ট গ্রহাদির এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের চিত্রাদি অঙ্কিত থাকিত। ঐ আধারে রক্ষিত স্বতন্ত্র পত্রে লেখা থাকিত—'এইরূপ কার্য করিলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়', 'ঐরূপ করিলে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। মানব-জীবনে বিভিন্ন গ্রহের গতি নির্দেশ করিয়া এই সকল লিখিত পত্র অঙ্কিত চিত্রগুলিতে নানাভাবে স্থাপন করা হইত। ইহার ফলে ধর্মগুরুগণ জনসাধারণের মধ্যে অনায়াসেই ধর্মোপদেশ দিতে পারিতেন।* চিত্রের ভাষা সর্বসাধারণের ভাষা ; শতসহস্র কথায় যে বিষয় বুঝান যাইতে পারে না, একখানি মাত্র চিত্রেই সেই কথা বুঝান সম্ভবপর। এজন্য সে যুগে চিত্রবিদ্যার গুরুত্ব বিশেষভাবেই লওয়া হইত। বোধ হয় সেই জন্যই শ্রীকুমার শিল্পরত্নে (১৪ শ্লোক) বলিয়াছেন—অজ্ঞের পক্ষে চিত্র যাহাতে সুগম হইতে পারে তাহারই রীতি আমি বলিতেছি।

প্রাসাদ, রাজপথ প্রভৃতিতে যে চিত্রাঙ্কন করা হইত তাহার উল্লেখ আমরা মহাউম্মগ জাতকে দেখিতে পাই। এই জাতকে বলা হইয়াছে, কোন উৎসবের অনুষ্ঠান

---

* সারত্থপকাসিনী (শ্যামদেশীয় সংস্করণ), ২য় খণ্ড, ৩৯৮। দ্রষ্টব্য—Dr. Barua : History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, 110 ; Maskari Gosāla's Early Life, Calcutta Review, 1927, 264-6.

হইলে চিত্রাঙ্কন করা উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। এরূপ কোন উৎসবে নগরতোরণ হইতে প্রাসাদ, প্রাসাদ হইতে গৃহ, রাজপথের উভয় পার্শ্ব জাফরীর কার্যে পরিশোভিত করিয়া তাহাতে কারুকার্যশোভিত বেষ্টনী দেওয়া হইত এবং জাফরীর উপর চিত্রাঙ্কন দ্বারা উহার শোভাবর্ধন করা হইত। অতঃপর পথে ফুল ছড়াইয়া দিয়া পতাকাদি উত্তোলন করা হইত।

প্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই, শিল্পীমাত্রই স্মৃতির সাহায্যে অপরের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শিল্পীর দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিত। বিষ্ণুধর্মোত্তরে এরূপ স্থলেই 'দৃষ্ট' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র* রাজা উদয়ন ও রাজকুমার বাসবদত্তা উভয়ে প্রণয়াসক্ত হইয়া উভয়ের চিত্র কাষ্ঠপটের উপর আঁকিয়াছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে এরূপ বিষ্ণু-কর্তৃক উর্বশীর ছবি আঁকিবার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কালিদাসের 'শকুন্তলা'র ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধিকাংশই শকুন্তলার একটী চিত্র লইয়া কাটিয়াছে। রাজা দুষ্যন্ত স্বয়ং চিত্রটী আঁকিয়াছিলেন এবং সেটী ছিল তপোবনে অবস্থান সময়ে শকুন্তলার একটী চিত্র। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' গ্রন্থে রাজা অগ্নিমিত্রের চিত্রশালায় রাণী ধারিণীর পরিচারিকা সুন্দরী মালবিকার চিত্র ধারিণীরই নির্বুদ্ধিতায় অঙ্কিত হইয়াছিল। 'দিব্যাবদানে' আছে—রাজা বিম্বিসারের সভাশিল্পিগণ বুদ্ধদেবকে দেখিয়া তাঁহার চিত্র আঁকিয়াছিলেন।

শুধু যে স্মৃতির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করার আদর্শ ছিল তাহা নহে, বিষ্ণুধর্মোত্তরে উহার সহিত চিত্রকরকে নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দেবযোনির অর্থাৎ অলৌকিক বা স্বর্গীয় কোন চিত্র কল্পনার মাধুর্যে রূপান্তরিত করিতে হইলেও নৃত্যকলার প্রয়োজন। সত্য, বৈণিক, নাগর ও মিশ্র যে কোন শ্রেণীর চিত্রের নৃত্যরাগের অঙ্গাঙ্গি সংযোগ রাখিতে হইবে। সে যুগে অভিনয়ের অভিব্যক্তি যে মাত্র রঙ্গমঞ্চেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, শিল্পকলাতেও তাহার প্রভাব পড়িয়াছিল। এজন্য মানবের গতি ও ভাবের অন্তর্নিহিত ভাষা চিত্রে অনুকৃত হয়। রস ও ভাবের যে অভ্যুপগম নাট্যকলায় পরিকল্পিত হইয়াছিল, চিত্রে ও ভাস্কর্যেও সেই কল্পনা প্রয়োগ করা হইয়াছে। ফলে শিল্পীর সৃষ্টিতে রসাস্বাদনের পক্ষে যে কোন রসিকের চিত্তে আনন্দের উদ্রেক হইতে পারিত। শিল্পীর সার্থকতা সেখানেই যেখানে যে কোন রসভাবুক তাঁহার চিত্র প্রত্যক্ষ করিলে সেই ভাবুকের মনে ইহার 'ভাবনা' দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(ক্রমশঃ)

* স্বপ্নবাসবদত্তা, এস. সুব্বারাও-কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ, মাদ্রাজ, পৃঃ ৪৮।

বিদ্যাপতির উপমা

স্বামী ভূমানন্দ

(কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)

"উপমা কালিদাসস্য" বাল্যকালেই শুনিয়াছিলাম। পরে কালিদাসের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া দেখিলাম, কথাটা ঠিকই। কাব্যরসের রসিকমাত্রই অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন যে, কালিদাসের উপমার ন্যায় উপমা, অন্য কোনও কবি দিতে পারেন নাই। কালিদাস সম্বন্ধে উপরের উক্তিটি অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদিগের বাংলা সাহিত্যে যে, কালিদাসের উপমার মত উপমা পাওয়া যায় না, একথা বলা যায় না। বৈষ্ণব কবিচূড়ামণি বিদ্যাপতি, তাঁহার সুললিত পদাবলীতে, বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধিকার রূপ বর্ণনায়, যে সমস্ত উপমার অবতারণা করিয়াছেন, সে রকম উপমা অনেক কবিই আজ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই। তাঁহার কোনও কোনও উপমা কালিদাসের উপমা অপেক্ষাও উচ্চ-স্তরের। বিদ্যাপতির এই জাতীয় কয়েকটিমাত্র উপমা, সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণ নিমিত্ত, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। শ্রীমতী রাধিকার "বয়ঃ-সন্ধি" বিষয়ক পদগুলির মধ্যে দেখি, রাধিকার বদন ও চঞ্চল লোচন বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন—

"নয়ন বয়ন দুই উপমা দেল
এক কমল দুই খঞ্জন খেল" ॥

অর্থাৎ রাধিকার বদন ও যৌবনারম্ভে চঞ্চল নয়ন দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন একটি পদ্মের উপর দুইটি খঞ্জন নৃত্য করিতেছে। অনেক কবিই মুখকে পদ্মের সহিত ও নয়নকে খঞ্জনের সহিত পৃথক্‌ভাবে উপমিত করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির ন্যায় উভয়কে একত্রিত করিয়া খুব কম কবিই উপমা দিতে পারিয়াছেন। কালিদাসও অবশ্য ঠিক এই উপমাটাই তাঁহার "শৃঙ্গারতিলকে" দিয়াছেন—

"একো হি খঞ্জনবরো নলিনী-দলস্থো
দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গবলাধিপত্যম্।
কিংবা করিষ্যতি ভবদ্‌বদনারবিন্দে
জানামি নো নয়নখঞ্জনযুগ্মমেতৎ ॥"

অর্থাৎ হে সখি, পদ্মের উপরিভাগে যদি কেহ একটি মাত্র খঞ্জন-পক্ষী দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে চতুরঙ্গবলান্বিত রাজ্যসম্পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমি আজ তোমার বদনারবিন্দে নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় দর্শন করিলাম; কাজেই আমি যে কি হইব, তাহা আর বলিতে পারি না।

নয়নকে খঞ্জনের সহিত উপমা, বিদ্যাপতি আর এক অভিনব ভাবে দিয়াছেন, যাহা কালিদাসও কল্পনা করেন নাই। বিরহ অবস্থায় শ্রীমতীর বদন-কমল করতলে ন্যস্ত, নয়ন হইতে দিবারাত্রি অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে ; মনে হইতেছে, যেন খঞ্জন মুক্তার হার উদ্গীর্ণ করিতেছে—

"অহনিশি গড়ায় নয়ন জলধার
খঞ্জনে মিলি উগলিল মোতি হার" ॥

২। শ্রীমতীর পয়োধর বর্ণনা করিতে, কবি বলিতেছেন—

"মেরু উপর দুই কমল ফুটায়ল,
নাল বিনা রুচি পাই।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি,
তঁই নহি কমল শুখাই ॥"

অর্থাৎ দুইটি পয়োধর যেন পর্বতের উপরে মৃণাল-বিহীন পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যখন মৃণাল নাই, এবং পর্বতাগ্রেও জলের সম্ভাবনা নাই, তখন পদ্ম ত শুষ্ক হইয়া যাইবে। তাই কবি পুনরায় বলিতেছেন, শ্রীমতীর মণিময় হার, গঙ্গার ধারার ন্যায় তাহাদিগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে ; সেই জন্যই পদ্মযুগল শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় না। উপমার এইরূপ ভঙ্গীই বিদ্যাপতির বিশেষত্ব।

৩। নাসিকাকে গরুড়ের চঞ্চুর সহিত উপমা অনেকেই দিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন—"খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল", কেহবা বলিয়াছেন—"খগচঞ্চু জিনি নাসা" ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যাপতির উপমার ধরণ অন্য প্রকারের। শ্রীমতী রাধিকার নাসিকা বর্ণনা করিতে তিনি বলিয়াছেন—

"নাভি-বিবর সঞে লোমলতাবলী,
ভুজগী নিশাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি-চঞ্চু ভরম ভয়ে,
কুচ-গিরি-সন্ধি নিবাসা ॥"

স্ত্রীলোকের নাভি হইতে উত্থিত রোমরেখা একটি বিশেষ সৌন্দর্য। কবি বলিতেছেন, শ্রীমতী রাধিকার নাভি-বিবরে লোমলতারূপ ভুজঙ্গিনী শুইয়া ছিল। সর্প বায়ুভুক, তাই শ্রীমতীর নিশ্বাস-পবন ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত সে নিজ বিবর পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছিল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই শ্রীমতীর নাসিকার দিকে দৃষ্টি পড়ায়, উহাকে সর্পভুক গরুড়ের চঞ্চু বলিয়া ভ্রম হওয়ায়, সর্প প্রাণভয়ে নিকটবর্তী দুই পর্বতের সন্ধিস্থলে মুখ লুকাইয়া অবস্থান করিল, আর অগ্রসর হইল না। নাভিকে বিবর, লোমলতাকে সর্প, পয়োধরকে গিরি ও নাসিকাকে খগরাজচঞ্চু বলিয়া অনেক কবিই বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু সমস্ত উপমানগুলি একত্র সন্নিবেশিত করিয়া ও তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এভাবে বর্ণনা,

বোধ হয় বিদ্যাপতি ভিন্ন অন্য কোনও কবি করেন নাই। কালিদাসও অবশ্য তাঁহার "কুমার-সম্ভব" কাব্যে উমার নাভিবিবর প্রবিষ্ট রোমরাজির বর্ণনা করিয়াছেন—

"তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং
রবাজ তন্বী নবরোমরাজিঃ।
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য
তন্মেখলামধ্যমনেরিবার্চ্চিঃ॥"

কিন্তু তাঁহার এই বর্ণনা বিদ্যাপতির বর্ণনা অপেক্ষা অনেকাংশে হীন; এমন কি উভয়ের তুলনা চলে না।

৪। "শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ" সম্বন্ধীয় পদগুলির মধ্যে একটি সুন্দর উৎপ্রেক্ষা-বর্ণনা দেখিতে পাই -

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে,
মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল,
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব, দূরহি পলায়ল,
তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি॥
কুচ-ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ-ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু,
কর-ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন,
কহব মদন-পরতাপে॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনেই বলিতেছেন—"সখি তুমি আমাকে সম্ভাষণ করিয়া যাইতেছ না কেন? যদি বল, তোমার একাকী আসিতে ভয় হয়, তাহা হইলে, কাহার ভয় তুমি কর, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, দেখিতে পাই, চমরী তোমার কবরী দেখিয়া ভয়ে গিরিগুহা আশ্রয় করিয়াছে; চন্দ্র তোমার মুখের ভয়ে আকাশে অবস্থান করিতেছে; হরিণী তোমার নয়ন-ভয়ে, কোকিল তোমার মধুর স্বর-ভয়ে, ও হস্তী তোমার গতি-ভয়ে বনবাস করিতেছে। তোমার কুচ দর্শন করিয়া পদ্মের

কোরক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জলে অবস্থান করিতেছে, ঘট অগ্নি-প্রবেশ করিয়াছে, দাড়িম্ব ও শ্রীফল শূন্যে দোদুল্যমান, এবং মহাদেব গরল পান করিয়াছেন। তোমার স্বর্ণ-বর্ণ ভুজ-ভয়ে মৃণাল পঙ্কে অবস্থান করিতেছে ও তোমার করতল-ভয়ে কিশলয় কম্পিত হইতেছে। যে-তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভয়ে ভীত হইয়া ইহারা সকলে দূরে পলায়ন করিল, সেই তুমি আবার কাহার ভয়ে ভীত হইয়া আমার নিকট আসিতে পারিতেছ না?" কবিবর ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিতে বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

৫। মুখকে চন্দ্রের সহিত উপমা দেওয়া খুবই সাধারণ। কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীমতী রাধিকার বদনকে চন্দ্রের সহিত উপমা দিতে গিয়া দেখিলেন, উপমা সর্বাঙ্গসুন্দর হইল না; কারণ—

"চান্দকে আছয়ে ভেদ কলঙ্ক
ওযে কলঙ্কী তুহু নিষ্কলঙ্ক ॥"

অর্থাৎ চন্দ্রে ত কলঙ্ক আছে; কিন্তু শ্রীমতী রাধিকার বদন-শোভা যে নিষ্কলঙ্ক। কাজেই নিষ্কলঙ্ক বদনের উপমাস্থল কলঙ্কী চন্দ্র কেমন করিয়া হইবে? তাইকবি বলিলেন—

"হরিণহীন হিমধামা"

অর্থাৎ একমাত্র হরিণবিহীন চন্দ্রের সহিতই সে মুখের উপমা দেওয়া যাইতে পারে। পদটি পড়িলেই কর্ণাটরাজ-বর্ণনা মনে পড়ে। কবি কর্ণাটরাজের যশকে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া নিজেই প্রশ্ন করিতেছেন—

তুলনাং ত্বৎকীর্তের্ধত্তে কথং কলঙ্কমলিনশ্চন্দ্রমাঃ"

অর্থাৎ চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কিন্তু রাজার যশে ত কলঙ্ক নাই। কাজেই সকলঙ্ক চন্দ্র কেমন করিয়া নিষ্কলঙ্ক যশের উপমাস্থানীয় হইবে? তাই কবি পুনরায় বলিতেছেন, যদি চন্দ্র-ক্রোড়স্থিত মৃগ, কর্ণাটরাজ কর্তৃক নিহত শত্রুদিগের ভগ্ন প্রাসাদোপরে অঙ্কুরিত নব নব দূর্বাগ্র-ভাগ দর্শনে লোভপরবশ হইয়া চন্দ্রের ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করতঃ তাহার উপর পতিত হয় তাহা হইলে তদবস্থ চন্দ্রের সহিত রাজার শুভ্র যশোরাশিকে উপমা দেওয়া যাইতে পারে—

"স্যাদেব ত্বদরাতিসৌধশিখরপ্রোদ্ভূতশষ্পাঙ্কুর
গ্রাসব্যগ্রমনাঃ পতেদ্ যদি পুনস্তস্যাঙ্কশায়ী মৃগঃ ॥"

শ্রীমতী রাধিকার গ্রীবাদেশ হইতে বক্ষস্থলস্পর্শী মুক্তামালার বর্ণনাটি আরও চমৎকার। গ্রীবাকে কম্বুর সহিত উপমা, সকল কবিই দিয়াছেন। 'কম্বুগ্রীবাপ্রলম্বিত মুকুতার মালা" প্রভৃতি অনেকেই লিখিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ঠিক সেই উপমাই এমন এক অভিনব ভাবে দিয়াছেন, যাহা অন্য কবি হয়ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই—

"গিরিবর গরুয় পয়োধর পরশিত,
গীমে গজমোতি হারা।
কাম কম্বু ভরি কনক-শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনি ধারা ॥"

অর্থাৎ, শ্রীমতীর গ্রীবাদেশ হইতে প্রলম্বিত মুক্তামালা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামদেব কম্বু ভরিয়া গঙ্গার শুভ্র জলধারা কনক শম্ভুর উপর ঢালিতেছেন। পয়োধরকে কনক-শিবলিঙ্গের সহিত উপমা অন্য কোনও কবি পুর্বে দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই উপমা কবি অন্যত্রও দিয়াছেন, কিন্তু সেখানে অন্যান্য উপমানের সহিত সংযোগ করিয়া, উহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন—

(ক) "অম্বর বিঘটু অকামিক কামিনী,
করে কুচ ঝাঁপু সুছন্দা।
কনক-শম্ভু সম অনুপম সুন্দর,
দুই পঙ্কজ দশ চন্দা ॥"

অর্থাৎ, বক্ষস্থলের বস্ত্র অকস্মাৎ সরিয়া যাওয়ায়, শ্রীমতী সুন্দর ভঙ্গীতে দুই করতল দ্বারা কনক-শম্ভুর ন্যায় সুন্দর কুচযুগল আচ্ছাদন করিলেন ; মনে হইল, যেন দুইটি পদ্মের উপর দশটি চন্দ্র শোভা পাইল। এভাবে অঙ্গুলিকে চন্দ্র বলিয়া বর্ণনা কখনও দেখি নাই। করাঙ্গুলিকে চম্পকের সহিত উপমা দেওয়াই সাধারণ। কালিদাস অবশ্য তাঁহার "শকুন্তলা" নাটকে ভারতের অঙ্গুলিকে ঈষৎ বিকশিত পদ্মদলের সহিত উপমা দিয়াছেন—

"প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো,
বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্য পত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া,
নবোষয়া ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্

কিন্তু বিদ্যাপতি যে ভঙ্গীতে অঙ্গুলিকে চন্দ্রের সহিত উপমা দিয়াছেন, অন্য কোনও কবিই সেভাবে উপমা দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর কবি যদি এখানে নখকেই উপমেয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, এভাবের বর্ণনা পূর্বে অন্য কেহ করেন নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

(খ) "সুরত সমাপি শুতল বর নাগর,
পানি পয়োধরে আপি।
কনক-শম্ভু জনি পূজি পূজারে,
ধয়ল সরোরুহে ঝাঁপি ॥"

অর্থাৎ বিলাসান্তে উভয়েই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের করতল শ্রীমতীর পয়োধরোপরে ন্যস্ত। মনে হইতেছে, যেন পূজারী কনক-শম্ভুর পূজা সমাপন করিয়া তাহাকে পদ্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

(৪৩) মধুসূদন সরস্বতী—ইনি বাঙলার গৌরব। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া কাশীতে রামতীর্থের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। ইনি কৃষ্ণভক্ত হইয়াও অদ্বৈত-মতাবলম্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। ইহার গ্রন্থ (ক) অদ্বৈত সিদ্ধি—এই একখানি গ্রন্থই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাসরায়-কৃত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের খণ্ডন ও অদ্বৈত বেদান্তের শ্রেষ্ঠ রত্ন। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—(খ) গীতাটীকা (গ) সংক্ষেপ শারীরক-টীকা (ঘ) মহিম্নস্তোত্র টীকা (ঙ) ভাগবতের টীকা (চ) রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা (ছ) ভক্তি রসায়ন (জ) বেদান্ত কল্পলতিকা (ঝ) সিদ্ধান্তলেশ টীকা (ঞ) সর্ববিদ্যাসিদ্ধান্তবর্ণন (ট) অদ্বৈতরত্নরক্ষণ (ঠ) নির্বাণদশকটীকা (ড) সিদ্ধান্তবিন্দু (ঢ) ঈশ্বরপ্রতিপত্তিপ্রকাশ (ণ) প্রস্থানভেদ (ত) আনন্দমন্দাকিনী স্তোত্র (থ) কৃষ্ণকুতূহলনাটক (দ) হরিলীলাবিবেক (ধ) আত্মবোধ-টীকা (ন) বেদস্তুতি টীকা (প) অষ্টবিকৃতিবিবৃতি (ফ) শাণ্ডিল্যসূত্র টীকা। ইঁহার সময় প্রায় ১৫২৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৩২ খৃঃ অঃ পর্যন্ত। ইঁহার জীবনীর বিস্তৃত আলোচনা পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ-সম্পাদিত অদ্বৈতসিদ্ধিঃ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

ইহার পরেই রামানুজ, মাধ্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত অদ্বৈতচিন্তাধারায় বাধা দেন। বলা প্রয়োজন মধুসূদন সরস্বতী-কৃত অদ্বৈতসিদ্ধির পর আর কোন বাধাই প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। যাহা হউক ঐ বাধার প্রতিকূলতা করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—

(৪৪) বলভদ্র—ইনি মধুসূদন সরস্বতীর শিষ্য। ইঁহার গ্রন্থ—(ক) সিদ্ধিসিদ্ধান্তসংগ্রহ—ইহাকে অদ্বৈতসিদ্ধির সারসংকলন বলা যাইতে পারে (খ) সিদ্ধি ব্যাখ্যা—ইহা ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরায়ের শিষ্য ব্যাসরাম-লিখিত ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর খণ্ডন।

(৪৫) পুরুষোত্তম সরস্বতী—ইনিও মধুসূদনের শিষ্য ও স্বগুরুকৃত সিদ্ধান্ত বিন্দুর টীকাকার।

(৪৬) শেষ গোবিন্দ—ইনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজীদীক্ষিতের গুরু কৃষ্ণদীক্ষিতের পুত্র ও মধুসূদনের অন্যতম শিষ্য এবং শঙ্করাচার্য কৃত সর্ববেদান্ত সংগ্রহের টীকাকার।

(৪৭) বেঙ্কটনাথ—ইনি নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) গীতার টীকা (খ) অদ্বৈতরত্নপঞ্জর (গ) মন্ত্রসার-সুধানিধি (ঘ) তৈত্তিরীয়উপনিষদ্ ভাষ্য।

(৪৮) সদানন্দ ব্যাস—ইনি মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির সার সংকলন করিয়া পদ্যে অদ্বৈত সিদ্ধিসিদ্ধান্তসার রচনা করেন। তদ্ব্যতীত ইনি শঙ্করের একটী জীবনী "শঙ্করমন্দার সৌরভ" রচনা করেন।

(৪৯) ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র—ইনি বেঙ্কটনাথের শিষ্য। ইনি মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেলাঙ্গুড়ি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়ের ভাষাতে রচিত "বেদান্ত পরিভাষা" ইঁহার অক্ষয় কীর্তি। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—পদ্মপাদকৃত পঞ্চপাদিকার টীকা, গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ তত্ত্ব চিন্তামণির উপর বিদ্বন্মনোরমা টীকা। ইঁহার সময় আনুমানিক ১৫৭৫—১৬৭৫ খৃঃ অঃ।

(৫০) নৃসিংহ সরস্বতী—ইনি সদানন্দ যোগীন্দ্র-কৃত বেদান্তসারের উপর 'সুবোধিনী' নামে এক টীকা রচনা করেন।

(৫১) রাঘবেন্দ্র সরস্বতী—(বা রাঘবানন্দ সরস্বতী)—ইনি ১৬শ শতাব্দীর লোক। ইঁহার গ্রন্থ—(ক) ন্যায়াবলী দীধিতি—বা মীমাংসাসূত্র দীধিতি (খ) মীমাংসাস্তবক (গ) পাতঞ্জল রহস্য (ঘ) সংক্ষেপ শারীরকের উপর 'বিদ্যমৃতবর্ষিণী' টীকা (ঙ) মনুসংহিতার টীকা।

এই সময়ে পুনরায় রামানুজ ও মাধ্ব সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্য আবির্ভূত হইয়া অদ্বৈতমত খণ্ডনে চেষ্টা করেন আর এই চেষ্টায় প্রতিকূলতা করিলেন—

(৫২) রামকৃষ্ণাধ্বরী—ইনি ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের পুত্র ও পিতাকৃত বেদান্ত-পরিভাষার উপর 'শিখামণি' নামে টীকার প্রণেতা।

(৫৩) পেড্ডা দীক্ষিত (বা হৃষীকেশ দীক্ষিত)—ইনিও বেদান্তপরিভাষার উপর 'প্রকাশিকা' নামে টীকা প্রণয়ন করেন ও ছন্দোবিবৃত্তি নামে ১টী গ্রন্থ রচনা করেন।

(৫৪) নারায়ণ তীর্থ—ইনি ব্রহ্মানন্দের বিদ্যাগুরু ও বহু টীকার প্রণেতা যথা—(ক) ১০৮ উপনিষদের টীকা ; (ন্যায়ে) (খ) জগদীশতর্কালঙ্কারের শব্দশক্তিপ্রকাশিকার উপর টীকা (গ) উদয়নের কুসুমাঞ্জলির টীকা (ঘ) রঘুনাথের দীধিতির উপর টীকা (ঙ) বিশ্বনাথ-কৃত ভাষা-পরিচ্ছেদের টীকা ; (অন্যান্য দর্শনে) — (চ) সাংখ্যকারিকার টীকা (ছ)পাতঞ্জল-কৃত যোগ-সূত্রের টীকা (জ) কুমারিল মতানুযায়ী ভাট্টভাষাপ্রকাশিকা টীকা (ঝ) শাণ্ডিল্যসূত্রের 'ভক্তি-চন্দ্রিকা' টীকা (ঞ) মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকা ও (ট) বেদান্তবিভাবনা নামক প্রকরণগ্রন্থ।

(৫৫) ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী—ইনি তদানীন্তনকালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সময় প্রায় ১৫৭৫-১৬৭৫ খ্রী° অ°। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—অদ্বৈত সিদ্ধির উপর ২ খানি টীকা—(ক) লঘুচন্দ্রিকা ও (খ) বৃহচন্দ্রিকা (গ) ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি 'সূত্রমুক্তাবলী' (ঘ) অদ্বৈতচন্দ্রিকা (ঙ) অদ্বৈত-সিদ্ধান্তবিদ্যোতন (চ) মীমাংসাচন্দ্রিকা (ছ) মধুসূদন-কৃত সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকার উপর "ন্যায়রত্নাবলী" টিপ্পনী।

(৫৬) জগদীশ তর্কালঙ্কার—ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গীতার উপর ইঁহার রচিত অদ্বৈত মতে টীকা আছে। তদ্ব্যতীত ন্যায়ের শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, তর্কামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। ইঁহার সময় প্রায় ১৫৬০-১৬৬০ খ্রীঃ অঃ।

(৫৭) অচ্যুতকৃষ্ণানন্দতীর্থ—ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) তৈত্তিরীয় উপনিষদের শঙ্করভাষ্যের উপর 'বনমালা' টীকা (খ) অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের উপর 'কৃষ্ণালঙ্কার' টীকা।

(৫৮) আপোদেব—ইনি মীমাংসাশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও 'মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ' গ্রন্থের প্রণেতা। অদ্বৈত বেদান্তে ইনি সদানন্দকৃত বেদান্তসারের উপর 'বালবোধিনী' টীকা রচনা করেন।

(৫৯) রামানন্দ সরস্বতী—ইনি ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের উপর 'রত্নপ্রভা' টীকা রচনা করেন এবং তদ্ব্যতীত "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" নামক একটি বৃত্তিও রচনা করেন। 'পঞ্চপাদিকা বিবরণোপন্যাস' নামক একটী গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করেন।

(৬০) কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী—ইনি 'রত্নপ্রভা'টীকার উপর ১টি টীকা ও 'সিদ্ধান্ত সিদ্ধাঞ্জন' নামক একটি গ্রন্থ (ইহাতে শ্রীভাষ্যখণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন) রচনা করেন।

(৬১) কাশ্মীরী সদানন্দ স্বামী—ইনি 'অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি' নামক ১টি গ্রন্থের প্রণেতা।

(৬২) রঙ্গনাথাচার্য—ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর ১টী বৃত্তি রচনা করিয়াছেন।

(৬৩) নরহরি—ইনি 'বোধসার' নামক ১টী অদ্বৈত-বেদান্ত গ্রন্থের প্রণেতা।

(৬৪) দিবাকর—ইনি স্বগুরু নরহরি-কৃত বোধসারের উপর ১টী টীকা রচনা করেন।

ইহার পরেই বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদিগের আবির্ভাব হইল। ইঁহাদের কৃত বাধা প্রশমনে চেষ্টা করিলেন—

(৬৫) বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়—ইনি গুজরাটী ব্রাহ্মণ। রত্নগিরির নিকটস্থ রাজাপুরের অন্তর্গত কশলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ও নব্য ন্যায়ের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকা টীকার উপর "বিট্‌ঠলেশী" টীকা রচনা করেন।

(৬৬) উদাসীন স্বামী অমরদাস—ইনি বেদান্ত পরিভাষার শিখামণি টীকার উপর 'মণি-প্রভা' নামক টীকার রচয়িতা।

(৬৭) মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী—"তত্ত্বানুসন্ধান" ও ইহার টীকার ইনি প্রণেতা।

(৬৮) ধনপতিসূরি—ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) গীতার উপর "ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা" টীকা (খ) মাধবীয় শঙ্কর বিজয়ের টীকা (এই টীকার মধ্যে পদ্মপাদাচার্যকৃত প্রাচীন শঙ্কর বিজয়ের লুপ্তাংশ সন্নিবিষ্ট আছে) (গ) রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা।

(৬৯) শিবদাস আচার্য—ইনি ধনপতি সূরির পুত্র এবং বেদান্ত পরিভাষার উপর "পদার্থদীপিকা" নামক টীকার প্রণেতা।

(৭০) সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী—ইনি কাঞ্চী কামকোটিপীঠের মোহান্ত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ---(ক) ব্রহ্মসূত্রের উপর "ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিকা" বৃত্তি (খ) আত্মবিদ্যা বিন্যাস (গ) ১২ খানি উপনিষদের উপর দীপিকা টীকা (ঘ) সিদ্ধান্তকল্পবল্লী (ঙ) অদ্বৈতরসমঞ্জরী (চ) যোগসূত্রের উপর 'যোগসুধাসার' বৃত্তি (ছ) সিদ্ধান্ত লেশসার "কবিতা কল্পবল্লী"।

(৭১) ভাস্কর দীক্ষিত—ইনি স্বগুরু কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীকৃত 'সিদ্ধান্ত সিদ্ধাঞ্জনকার' এর উপর 'রত্নতুলিকা' টীকা রচনা করেন।

(৭২) আয়ন্নদীক্ষিত—ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে যে অদ্বৈতমতই প্রতিপাদিত হইতেছে তাহা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য ইনি "ব্যাসতাৎপর্য নির্ণয়" গ্রন্থ রচনা করেন।

(৭৩) হরিদীক্ষিত—ইনি ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মসূত্রের উপর একটি সরল বৃত্তি রচনা করেন।

ইহার পরেই খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীতে মাধ্ব ও রামানুজ মতের কয়েকজন পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। আর তাঁহাদের কৃত বাধার প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন উনবিংশ ও বর্তমান শতাব্দীর কয়েকজন পণ্ডিত।

(৭৪) মহামহোপাধ্যায় রামসুব্বা শাস্ত্রী—ইনি কুম্ভকোণের নিকটস্থ একগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ও রামানুজ সম্প্রদায়ের অনন্তাচার্য-কৃত 'ন্যায়ভাস্কর' খণ্ডন ও মাধ্ব সম্প্রদায়ের ব্যাস তীর্থকৃত 'মাধ্বচন্দ্রিকা' খণ্ডন করেন।

(৭৫) মহামহোপাধ্যায় রাজুশাস্ত্রী—ইনি তাঞ্জোরের নিকটস্থ এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ইনিও অনন্তাচার্যকৃত ন্যায়ভাস্কর খণ্ডন করিয়া 'ন্যায়েন্দু শেখর' রচনা করেন।

(৭৬) মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন—ইনি বর্দ্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বেদান্ত পরিভাষার উপর "আত্মবোধিনী" টীকা এবং স্মৃতি ও মীমাংসার কয়েকটী গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

(৭৭) তারাচরণ তর্করত্ন—ইনি ২৪ পরগণা জেলার ভট্ট পল্লীগ্রাম নিবাসী ও বর্তমান যুগের মহা পণ্ডিত ম.ম. প্রমথনাথ তর্কভূষণের পিতা। ইঁহার গ্রন্থ—(ক) কাননশতকম্ (খ) রাম-জন্মভানম্ (গ) শৃঙ্গার রত্নাকরম্ (ঘ) মুক্তিমীমাংসা (ঙ) ঈশোপনিষদের বিমলাভাষ্য (চ) খণ্ডন পরি-শিষ্টম্ (ছ) নীতিদীপিকা (জ) কলাতত্ত্বম্ (ঝ) বৈদ্যনাথস্তোত্রম্ (ঞ) সাকারোপাসনাবিচার।

(৭৮) রঘুনাথ শাস্ত্রী—ইনি বোম্বাইএর কোলাপুর নগরে থাকিতেন ও 'শঙ্কর পাদভূষণ' নামে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের এক টীকা রচনা করেন।

(৭৯) দক্ষিণামূর্তি স্বামী—ইনি কাশীতে বাস করিতেন। ইনি "অদ্বৈতসিদ্ধাঞ্জন" নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থের প্রণেতা।

(৮০) মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী—ইনি পূর্বোত্তর মীমাংসার সম্বন্ধ, অধ্যাসবাদ ও ব্রহ্মবিদ্যাধিকারি বিচারগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(৮১) মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রবিড়—ইঁহার গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধি সিদ্ধান্তসারভূমিকা ও খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী টীকার ভূমিকা।

(৮২) মহামহোপাধ্যায় ধর্মদত্ত ঝা—ইনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। ইঁহার গ্রন্থ—গূঢ়ার্থতত্ত্বালোক (বুৎপত্তিবাদের টীকা), ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য টীকার টীকা, সিদ্ধান্ত লক্ষণের ক্রোড়পত্র।

(৮৩) শান্ত্যানন্দ সরস্বতী—ইনি দ্বারকামঠের অধীশ ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—পঞ্চীকরণ টীকা ও বেদান্ত পরিভাষার টীকা। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথি সমগ্র ভারতের আর্যদিগের এক মহাপুণ্যময়ী তিথি। ঐ শুভ তিথিতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন্ সুদূর অতীতের কোন্ সময়ে যে লোকপাবন রঘুনন্দন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই কালনির্ণয় করিতে ও শ্রীরামচন্দ্রের মানব লীলার মূল ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আর্যসন্তানেরা প্রায় প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতেই রামায়ণের মূল আখ্যায়িকা অবগত হয়। নিরক্ষর লোকেরাও রামায়ণকথা শ্রবণ করে। সুতরাং তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন কি? ইহার দুইটী প্রয়োজন আছে—প্রথমতঃ অবতার বা মহাত্মাদিগের পূতচরিতের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় চিত্তমালিন্য দূরীভূত হইয়া মন এক অপার্থিব উচ্চ জগতে বিচরণ করে—দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা যে আদর্শ জগতকে দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হ'ন সেই আদর্শেরও একটা উজ্জ্বল ছবি আমাদের মানসনয়নে থাকিয়া আমাদিগকে সেই আদর্শের দিকে চালিত করিবার চেষ্টা করে। ভগবানের অবতার পরিগ্রহের কারণ কি? যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আদি কারণ, যাঁহার ইচ্ছাশক্তির সামান্য প্রভাবেই কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে পারে, তাঁহার কতকগুলি লৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য জীবন যাপনের কোন প্রয়োজন হয় না। শুধু অবতার কেন, অবতারকল্প মহাপুরুষদের যাঁহাদিগকে 'আবেশাবতার' বলা যাইতে পারে—তাঁহাদেরও জীবনী এইরূপ এক বা ততোধিক আদর্শের জলন্ত মূর্তি। বিভিন্ন দেশ ও কালে বিভিন্ন জগৎবাসীকে বিভিন্ন আদর্শ প্রদানের জন্য অবতারের আবির্ভাব হয়। আমরা ইঁহাদিগকে অবতার বলি বা অতিমানব বা আদর্শ মানব বলি তাহাতে বিশেষ যায় আসে না। তাঁহারা কি আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং ঐ আদর্শ মানবজীবনে কতটা কার্যকরী হইতে পারে তাহার সম্যগ্ জ্ঞানই প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্র কি কার্যের ও আদর্শ স্থাপনের জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন তাহা প্রথমে তাঁহার জীবনী হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব; তারপর তাঁহার জন্ম সময়ের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

রামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যানগরী। ইহা বর্তমানে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ফৈজাবাদ জেলায় সরযূনদীর (গোগ্‌রানদী) তীরে অবস্থিত। ইহার পরিস্থিতি ২৬°৪৮´ উ° এবং ৮২°১২´ পূ°। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে ইহা ভারতের মধ্যে অতি সমৃদ্ধিশালী ও বৃহৎ নগর ছিল। সে সময় ইহার ক্ষেত্র ছিল ১২ যোজন অর্থাৎ ইহার পরিধি ছিল ৮০ মাইল হইতে ১০০ মাইল। ইহা প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই কোশল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন সূর্যবংশীয় ইক্ষাকুরাজার বংশধর শ্রীরামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ। এই

সূর্যবংশীয় রাজাদের একশত ত্রয়োদশ বংশধর রাজা সুমিত্রের পতনের সঙ্গে অযোধ্যানগরী বিলুপ্ত হইল। পরবর্তী বৌদ্ধযুগে এই অযোধ্যার নাম হইল সাকেত—কোশলের রাজধানী। আরও পরবর্তী যুগে উজ্জয়িনী অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অযোধ্যা নগরী পুনঃস্থাপিত করেন। রাজা দশরথের সময় এই নগরী যে বাণিজ্যপ্রধান ও একান্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা রামায়ণে বাল্মীকির বর্ণনায় পাওয়া যায়। বর্তমান সহরের এককোণে একটী উচ্চ স্তূপ আছে উহাকে রামকোট বলা হয় এবং ঐ স্থানই রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। এই স্তূপের অধিকাংশই মুসলমান রাজা বাবর কর্তৃক নির্মিত মস্‌জিদ্‌-পরিবেষ্টিত। কেবল বাহিরের একস্থানে একটি বেদি রামচন্দ্রের জন্মস্থানরূপে রক্ষিত হইতেছে। ইহারই পাশে একটি বড় মন্দির আছে, ইহা নাকি সীতার রন্ধনশালা ছিল। যেখানে লক্ষণ স্নান করিতেন সেখানেও একটি মন্দির আছে। সহরের মধ্যে একটি মন্দির আছে ইহা—ভক্ত হনুমানজীর মন্দির। আরও কয়েকটী সুন্দর মন্দির—কণকভবন (ইহা টীকমগড়ের এক রাণী কর্তৃক নির্মিত), নাগেশ্বরনাথ মন্দির প্রভৃতি খ্রীঃ ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে নির্মিত। এই অযোধ্যা জৈনদিগেরও তীর্থস্থান। কয়েকটী জৈন মন্দিরের মধ্যে ৫টী জৈন মন্দির ৫ জন তীর্থঙ্করদিগের জন্মস্থান রূপে খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে নির্মিত। আরও ২টী স্থান—স্বর্গদ্বার—এখানে শ্রীরামচন্দ্রের নশ্বর দেহ রক্ষিত হইয়াছিল, ও ত্রেতা-কা-ঠাকুর—এখানে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর্যদের নিকট পবিত্রতীর্থ। এই স্থানদ্বয়ের উপর আওরঙ্গজেব-নির্মিত মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ আছে।

এই কোশলরাজ্যের অধিপতি রাজা দশরথ ছিলেন একজন বেদজ্ঞ, মহাতেজস্বী, বিচক্ষণ ক্ষত্রিয় রাজা। তাঁহার আটজন অমাত্য বা মন্ত্রী—ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র; এবং বশিষ্ঠ ও বামদেব নামক দুইজন প্রধান ঋত্বিক্ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ঋষিও তাঁহার যজ্ঞাদি ও রাজকার্য করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ ছিলেন প্রধান পুরোহিত ও সুমন্ত্র ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। রাজা দশরথের বিভিন্ন বর্ণের প্রায় শতাধিক রাণী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। বহুকালাবধি কোন সন্তানাদি না হওয়ায় রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়া অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান। আর এই যজ্ঞফলেই তিনি প্রধানা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র, প্রিয়তমা যুবতী মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে যমজ সন্তান—লক্ষণ ও ও শত্রুঘ্ন এই চা'র সন্তান লাভ করেন।

চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, কর্কটলগ্নে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম সময়ে রবি মেষরাশিতে, মঙ্গল মকররাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে ও শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—পাঁচটী গ্রহই তুঙ্গী থাকায় শ্রীরামচন্দ্র তদানীন্তন যুগে উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন কিন্তু সপ্তমে মঙ্গলগ্রহ থাকায় কারণে তাঁহার স্ত্রী সুখ ঘটে নাই।

যাহা হউক শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণাদি সহ বাল্যকালে বশিষ্ঠঋষির নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদ, ও কলাবিদ্যাশিক্ষা করিয়া ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিলেন ও গজ, অশ্ব ও রথারোহণে পারদর্শী হইলেন। এই সময় যখন তাঁহার বয়স ১৫।১৬ বর্ষ, রাজা দশরথ পুত্রদিগের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তখন অযোধ্যায় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া যজ্ঞবিঘ্নকারী দুইজন রাক্ষসকে—মারীচ ও সুবাহু নিধনের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া গেলেন। রাজকুমারদ্বয় যাহাতে বনভ্রমণের ও পরিশ্রমের জন্য কাতর না হইয়া কষ্টসহিষ্ণু হ'ন সেজন্য বিশ্বামিত্র পথে শ্রীরামকে বলা ও অতিবলা নামক দুই রকম বিদ্যাশিক্ষা করাইলেন। এই দুই বিদ্যার গুণ রামায়ণের ১ম খণ্ড ২৪ সর্গে আছে। পথে রামচন্দ্র মারীচের মাতা তারকা রাক্ষসীকে বধ করিলেন। এই সময়েই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তৃণশয্যায় শয়ন, নদীতে স্নানাহ্নিক প্রভৃতি কৃচ্ছতা সাধনে অভ্যস্ত করাইলেন, অনেক পৌরাণিক আখ্যান শ্রবণ করাইলেন—অনার্যদিগের (রাক্ষসদিগের) যজ্ঞ বিঘ্ন করার ঘটনা শুনাইলেন ও অনেক অস্ত্র বিদ্যা শিখাইলেন। বশিষ্ঠ-শিষ্য রাজকুমার রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট তাঁহার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করিয়া অমিততেজা, নির্ভীক, আদর্শ ক্ষত্রিয়রূপে পরিণত হইলেন। তারপর মারীচ ও সুবাহুকে নিধন করিয়া বিশ্বা-মিত্রের সিদ্ধাশ্রমে উপনীত হইলেন। সেখানে বিশ্বামিত্র কয়েক দিবসব্যাপী যজ্ঞ সমাধা করিয়া রামলক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলা নগরে জনকরাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। জনকরাজা তাঁহার পালিতা কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীর বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভা করিয়াছেন। জনকরাজের নিকট মুনি পরশুরাম একটি ধনু (হরধনু) রাখিয়াছিলেন ও আদেশ করিয়াছিলেন যিনি এই ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া ইহা ভঙ্গ করিবেন, তাঁহারই হস্তে যেন সীতাদেবীকে সমর্পণ করেন। বহু রাজকুমার ইহাতে অকৃতকার্য হ'ন। পরিশেষে রামচন্দ্র অনায়াসে এই ধনু ভঙ্গ করেন ও সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জনকের (ইঁহার প্রকৃত নাম সীরধ্বজ ও ইনি রাজর্ষি ছিলেন) নিজ কন্যা উর্মিলাদেবীকে লক্ষ্মণের হস্তে সমর্পিত করা হইল ও জনকভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যার সহিত—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সহিত—ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। এই সব পরিণয় ব্যাপারের পূর্বেই রাজা দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং অমাত্যাদি সহ মিথিলায় আসিয়াছিলেন। রাজা দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ সমারোহে অযোধ্যায় ফিরিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অভিষেক দিবসের পূর্বরাত্রে রাণী কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী দশরথের নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুত ২টী বর প্রার্থনা করেন—'রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতকে রাজ্য-দান'। দশরথের বহু কাকুতি মিনতি কুটিলা কৈকেয়ীর মন টলাইতে পারিল না। এই দুষ্টা নারী পরিশেষে অভিষেক দিবসে রামকে ডাকাইয়া পিতৃ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বলিলেন। কৈকেয়ীর আদেশে রাম অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্যা সীতাসহ জটা বল্কল পরিধান করিয়া বনে গমন করিলেন। কৌশল্যা ও সমস্ত পুরনারীর বিলাপ, লক্ষ্মণের ক্রোধ কিছুতেই রামের কর্তব্যচ্যুতি করিতে পারিল না। আনন্দ নিকেতন, উৎসব-মুখরিত অযোধ্যানগরী বিষাদ সাগরে মগ্না হইল।

যাইবার পূর্বেই রামের আদেশে লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন রত্ন দান করেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে রামের বনবাস কৈকেয়ী প্রার্থনা করিলেন কেন? এই রমণী কূটবুদ্ধিপরায়ণা—সম্ভবতঃ লোকপ্রিয় রামের সম্মুখে ভরতের রাজ্যাভিষেকে প্রজারা বিদ্রোহী হয় এই আশঙ্কায়। যাহা হউক বনগমনের প্রথমদিবস রামচন্দ্র তমসাতীরে রাত্রি যাপন করিলেন। এইস্থান হইতেই পুরবাসীরা যাঁহারা রামের অনুগমন করিয়াছিলেন সকলে রামাদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তারপর তাঁহারা ক্রমে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন ও সেখান হইতে চিত্রকূটে গমন করেন। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম সে সময় এই চিত্রকূট পর্বতে ছিল; সেখানে ভরদ্বাজসহ সকলে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহারা কুটীর নির্মাণ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এদিকে রামের বনগমনের পাঁচদিন পরেই রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভরত তখন শত্রুঘ্নসহ মাতুলালয়ে; তিনি আসিয়া অগ্নিকার্য করিবেন এইজন্য অমাত্যগণ দশরথ-দেহ তৈলদ্রোণীতে (তৈলপূর্ণ কড়াই) রাখিলেন। দূত পাঠাইয়া ভরতকে আনা হইল। কৈকেয়ীর নিকট পিতার মৃত্যু সংবাদ ও রামবনবাসের বিষয় অবগত হইয়া ভরত মাতাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া রামকে পুনরানয়নের জন্য চিত্রকূটে যাত্রা করেন। তার পূর্বে দ্বাদশ দিবসে দশরথের শ্রাদ্ধকৃত্য সমাপন করেন। বিপুল অনুচরবর্গসহ ভরত ও শত্রুঘ্ন রামকে আনিতে চলিলেন। চিত্রকূটে ভরতের নিকট রামচন্দ্র পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন—সেখানে মন্দাকিনী তীরে তিনি পিতৃপিণ্ডদান করিলেন ও ভরতের বহু অনুনয়েও বিচলিত না হইয়া পরিশেষে স্বীয় পাদুকাদানে ভরতকে প্রত্যাবর্তন করাইলেন।

তারপর রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন ও প্রথমেই বিরাধ রাক্ষসকে বধ করেন। শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি ঋষির সহিত সাক্ষাতের পর তিনি অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গমন করেন। মহামুনি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে কতকগুলি অস্ত্র উপহার দিলেন ও গোদাবরী তীরস্থ পঞ্চবটি বনের মধ্যে আশ্রম নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। এইস্থানে লক্ষ্মণ রাবণ-ভগিনী সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন। বর্তমান বোম্বাই হইতে ১২০ মাইল দূরস্থ নাসিক সহর এই পঞ্চবটিবন ও নাসিকাচ্ছেদন হেতু ইহার নাম নাসিক। তারপর রাম-লক্ষ্মণ খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করেন। সূর্পনখার নিকট হইতে লঙ্কারাজ রাক্ষস কুলাধিপতি রাবণ এই সব সংবাদ শ্রবণে সীতাহরণের জন্য সংকল্প করিলেন। মারীচ প্রথমে রাবণকে এই কার্যে নিবৃত্ত করে; কিন্তু রাবণের একান্ত অনুরোধে নিজে স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ করিল ও যখন পঞ্চবটীর নিকট দিয়া যাইতেছিল তখন সীতাদেবী এই অভিনব মৃগ দর্শনে রাম-লক্ষ্মণকে উহা ধরিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাম ঐ হরিণের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যখন তাহাকে বধ করেন তখন ঐ মায়ামৃগ রামের শব্দের অনুকরণ করে। রামের কোন বিপদ আশঙ্কা করিয়া সীতাদেবী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসন্ধানে যান। ইতিমধ্যে রাবণ ছদ্মবেশে অতিথিরূপে আসিয়া সীতাকে হরণ করে। রথারোহণে সীতাকে লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে

রাবণকে পক্ষিরাজ জটায়ু আক্রমণ করে কিন্তু রাবণের সহিত যুদ্ধে উহার পক্ষদ্বয় নষ্ট* হইল। পথে যাইবার সময় যাহাতে রামচন্দ্র এই রাবণকে অনুসরণ করিতে পারে তাহার জন্য সীতাদেবী অলঙ্কারগুলি পথ চিহ্নরূপে ফেলিতে লাগিলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণ সীতাকে অশোক বনে রাখিলেন। এইস্থানে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের পত্নী সরমা সখিরূপে সীতার নিকট থাকিয়া তাঁহার দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতেন। এদিকে রাম-লক্ষ্মণ আশ্রমে ফিরিয়া যখন চতুর্দিকের কোন স্থানে সীতাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন বিলাপ করিতে করিতে মৃতপ্রায় জটায়ুর নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ব্যাপার শুনিলেন। সেই অনুসন্ধানে যাইতে যাইতে পথে কবন্ধ রাক্ষসের হস্তচ্ছেদন করেন। এই কবন্ধই রামকে সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া রাবণ বধ করিতে বলিল ও পথ দেখাইয়া ছিল। রাম-লক্ষ্মণ তখন মনোরম পম্পাসরোবর উত্তীর্ণ হইয়া ঋষ্যমূক গিরিতে রাজ্যভ্রষ্ট বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন। সুগ্রীবের নিকট স্বীয় ভ্রাতা বানররাজ বালীর সহিত বিরোধের বৃত্তান্ত শুনিয়া বালীকেই দোষী বিবেচনা করিয়া বধ করিলেন ও সুগ্রীবকে বানররাজ পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। এই স্থানেই ভক্ত হনুমান রামচন্দ্রের দর্শন পান। তারপর সুগ্রীব কর্তৃক অগণিত বানর-সৈন্যের সমাবেশ হয়। রামচন্দ্র হনুমানকে সীতার বিশ্বাসের জন্য অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া তাহাকে সীতান্বেষণে প্রেরণ করেন। সাগর পার হইয়া হনুমান অশোক বনে সীতার সন্ধান করেন। হনুমান কি প্রকারে সাগর পার হইলেন? সম্ভবতঃ সে সময় এই সমুদ্র বিশেষ গভীর ছিল না—কোনস্থান পদব্রজে কোন স্থান সন্তরণে পার হইয়াছিলেন। লম্ফদ্বারা এক শত যোজন পার হওয়া কবির কল্পনা। তারপর হনুমান লঙ্কাদাহন করিলেন, অশোক বন ধ্বংস করিলেন; বহু রাক্ষস-সৈন্য বিনষ্ট করিয়া রাম সন্নিধানে আসিয়া সীতার বার্তা নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র তখন রাবণ নিধনে যাত্রা করিলেন। সাগরকূলে রাবণভ্রাতা ধর্মভীরু বিভীষণ রামসকাসে আসিলেন। তারপর বানর-সেনাদ্বারা সমুদ্রে সেতু নির্মিত হইল ও রামচন্দ্র স্বসৈন্যে লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

তারপর উভয়পক্ষে কিছুকাল যাবৎ প্রবল যুদ্ধ হইল। বহু বানর সেনা ও রাবণের কুম্ভকর্ণপ্রমুখ বহু সেনা ও সেনাপতি নিহত হইল। পরিশেষে রাম-রাবণের দ্বৈরত যুদ্ধে রাম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে রাবণকে বধ করিলেন। তারপর বিভীষণ দ্বারা রাবণের সৎকার্য করাইয়া রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। পরে সীতাদেবী যখন হনুমান কর্তৃক রাম সন্নিধানে আনীতা হইলেন ও রাম কর্তৃক পরগৃহবাসিনী বলিয়া তিরস্কৃতা হইলেন, তখন সীতাদেবীর অগ্নি পরীক্ষা হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি রাম কর্তৃক গৃহীতা হইলেন। তারপর সুসজ্জিত পুষ্পক-রথ আনীত হইলে রামসীতা সকলে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষ পরে পুনরায় অযোধ্যা-পুরীতে উপনীত হইলেন। শোকমলিনা কৌশল্যা দেবীর সে এক আনন্দময় দিন। রাম রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বহু মুনি-ঋষি রামদর্শনে আসিয়া তাঁহাকে রাক্ষস ধ্বংসে

---

* সম্ভবতঃ অনার্য বানর জাতিরা যেরূপ লাঙ্গুল ব্যবহার করিত, পক্ষি নামক অনার্য জাতিরাও সে সময় নিজেদের দেহ পক্ষ যুক্ত রাখিত।

করার জন্য আশীর্বাদ করিলেন। কোশলরাজ্য সুখশান্তিপূর্ণ হইল। ইহার কিছুদিন পরে সীতাদেবীর গর্ভ-লক্ষণ দেখা দিল। বহু সভাসদ্ সীতা গ্রহণে ও সীতার গর্ভসঞ্চারবার্তা শ্রবণে সীতার অপবাদ কীর্তিত করিতে লাগিল। রাম প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাবর্জনের মনস্থ করিলেন। অতিকষ্টে রাম-লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে বর্জন করিয়া আসিতে; কিন্তু সীতা এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। পথিমধ্যে লক্ষ্মণ সীতাকে সব নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তখন অন্যান্য মুনি-পত্নীগণ সাহায্যে সাদরে জন্মদুখিনী সীতাকে বরণ করিয়া লইলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরিলেন। কিছুকাল পরে সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রমে যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তানদ্বয়ের নাম হইল কুশ ও লব। বাল্মীকি যে 'রামায়ণ' নামক অপূর্ব রামচরিত রচনা করিয়াছিলেন এই কুশ ও লবকে ক্রমে লালন পালন করিয়া সেই রামায়ণ গান শিক্ষা দিলেন। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সশিষ্য বাল্মীকি কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্ঞে আগমন করেন। সেখানে এই অনুপম সুন্দর বালকদ্বয়ের মুখে রামায়ণ গান শুনিয়া সকলে ইহাদিগকে সীতাপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। রামচন্দ্রের আদেশে সীতা আনীতা হইলেন। তাঁহার সতীত্ব প্রমাণের জন্য পুনরায় অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলিলে সীতাদেবী ভগবতী বসুন্ধরাকে নিজ গর্ভে স্থান দিতে বলিলেন। সম্ভবতঃ সে সময়ে ভূমিকম্প হইয়া মাটী দ্বিধা বিভক্ত হইল ও সীতা দেবী চিরতরে অন্তর্হিতা হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে কৌশল্যার দেহত্যাগ হয়। রামচন্দ্র আরও অনেকবর্ষ রাজত্ব করেন ও ভরত ও শত্রুঘ্ন প্রভৃতি দ্বারা বহুরাজ্য বিস্তার করেন। তারপর একদিন স্বয়ং যম মুনিবেশে রামের নিকট আসিলেন ও গোপনে কাথাবার্তা কহিতে চাহিলেন। রাম লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে রাখিয়া গেলেন। এই মুনিবেশধারী কৃতান্ত সর্ত করিয়াছেন যে, যে কেহ আসিয়া এই গোপন কথাবার্তায় বাধা দিবে, রাম যেন তাঁহাকে বর্জ্জন করেন। ঠিক সেই সময়ে দুর্বাসামুনি আসিয়া রামদর্শন ইচ্ছা করিলেন। লক্ষ্মণ বাধা দিলে মুনি অভিসম্পাত করিতে চাহিলেন। লক্ষ্মণ তখন বাধ্য হইয়া রাম সমীপে গমন করিলেন ও পরে রাম কর্তৃক বর্জিত হইয়া সরযূতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রামও মর্মাহত হইয়া পরিশেষে কুশকে কোশলে ও লবকে উত্তর কোশলে অভিষিক্ত করিয়া ভরত শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য পুরজন ও বানর রাক্ষসপ্রমুখ সঙ্গীদের লইয়া সরযূনদীতে সকলে দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে রামলীলার অবসান হইল। বীর হনুমান মাত্র রামচন্দ্রের বরে ধরাধামে জীবিত হইয়া রহিলেন।

অতিসংক্ষেপে রামচন্দ্রের জীবনী বর্ণিত হইল। তিনি মনুষ্য জাতিকে কি আদর্শ দিয়া গেলেন? এক কথায় বলা যাইতে পারে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ ও প্রজারঞ্জনের তিনি মূর্তিমান আদর্শ ছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জনকারী রাজা ছিলেন। কিন্তু ধর্মপত্নী সীতাদেবীকে যখন ত্যাগ করিলেন, তখন কি তাঁহার স্বামী-ধর্ম প্রতিপালিত হইয়াছিল? না। প্রজারূপেও কি সীতাদেবীর প্রতি তাঁহার অবিচার করা হয় নাই? রাজধর্ম প্রতিপালন করিতে

হইলে লোকের মিথ্যা কুৎসাগুলির কি প্রতিবাদ করা এবং মিথ্যাবাদীদের দণ্ড দেওয়া উচিত ছিল না? নিজের যখন স্থির বিশ্বাস যে সীতাদেবী সতীর আদর্শ, তখন নিজের বিবেককে লঙ্ঘন করিয়া সীতাদেবীকে আশ্রম সন্দর্শন করাইবার প্রতারণা করিয়া বর্জন করিলেন কেন? রামচরিতের এই অংশ প্রশংসনীয় বলা চলে না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে রাজার আদর্শ সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে হইলে অসহনীয় আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। তারপর তপস্যা-নিরত শম্বুককে শূদ্র বলিয়া শিরচ্ছেদ করা রাজোচিতকর্ম কি না? রামচন্দ্র ধার্মিক ছিলেন ও তৎকালীন আচার ব্যবহার রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন; তিনি ইহা সামাজিক ধর্মের বিগর্হিত বলিয়া করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষের এ কর্ম যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়তঃ বালীবধ—রামচন্দ্র সুগ্রীবের সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় বানররাজ বালীকে বধ করিলেন। তিনি নিরপেক্ষরূপে বালীকে তাঁহার দোষ গুণ প্রমাণের জন্য সুবিধা দেন নাই। এই তিনটী কার্য ব্যতীত রামচরিতের কোন কার্যে আমরা অযুক্তি দেখিতে পাই না।

শ্রীরামচন্দ্র যে পিতৃভক্তির মূর্তিমান আদর্শ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। পিতার প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা কতকটা অন্ধভক্তি বলা যাইতে পারে; কারণ সেখানে যুক্তিতর্কের স্থান নাই। নচেৎ পিতা যখন একজন কুটিলা রমণীর কুচক্রান্তে নীতিবিগর্হিত কাজ করিতেছেন, যাহাতে পিতা নিজেও ক্ষুব্ধ এবং সমগ্র প্রজাও বিক্ষুব্ধ সেকার্যে তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন না। তিনি হয়ত ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে পিতার এই কার্য—রামকে বনবাস ও ভরতকে রাজ্যদান—পিতার ও মাতার মৃত্যু-কারণ হইতে পারে। এই ভক্তিকে অত্যধিক ধর্মভাবেরই দ্যোতক বলা যাইতে পারে। পিতৃবাক্য পালনের জন্য যে গোবধ, মাতৃবধ বা স্বয়ং বিনাশপ্রাপ্তও হওয়া উচিত, তাহা রাম মাতাকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের সগরপুত্র, পরশুরাম প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তির আদর্শ তাঁহার স্বীয় মাতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীকে বনগমনের পূর্বে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র যে আদর্শ ভ্রাতৃবৎসল, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতনে ও অন্যান্য বহুস্থানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র সে আদর্শ স্বামী তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার স্বামিত্ব ধর্ম প্রজারঞ্জন ধর্মের নিম্নে। সীতা বর্জনের পর যখন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তখন স্বর্ণ-সীতাই নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার বহুজায়া ছিল এবং তদানীন্তন কালে প্রায় প্রত্যেক রাজারই সেই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিনি এক পত্নীক ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের মুখ্যতম আদর্শ—প্রজারঞ্জন মূলক রাজধর্ম। তদানীন্তন যুগে অনার্যগণ—যাহারা রাক্ষস, দানব, বানর প্রভৃতিতে আখ্যায়িত—আর্য-দিগের ধর্মকার্যে ও যাগযজ্ঞে বাধা প্রদান করিতেছিল। তিনি সেইরূপ বৈরীভাবাপন্ন রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়া দক্ষিণভারতে আর্যধর্মের ও কৃষ্টির বিস্তার করেন। কিন্তু একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়—

তিনি বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকেই রাজা করিলেন—রাবণ বধ করিয়া বিভীষণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ইহাতে বুঝাযায় অনার্যকুলের ধ্বংসসাধন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—যাহাতে ধার্মিক অনার্যকুল ক্রমে আর্য-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ও আর্যভাবাপন্ন হয় তাহাই তাঁহার অভিপ্রায়। আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণ ও বিবাহ ইহার পর হইতেই বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু একটা কথা বলা প্রয়োজন—এই অনার্য-জাতি বিশেষতঃ রাক্ষসেরা যে অসভ্য ছিল না তাহা রাবণের লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে আর্যদের সভ্যতা দেবভাব-মূলক ইহাদের সভ্যতা অসুরভাব-মূলক।

শ্রীরামচন্দ্র যে বনবাসান্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অনেক রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও আদর্শ সম্রাট হইয়াছিলেন তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ তিনি শক্রঘ্নের দ্বারা মধুপুরে লবণরাক্ষস ধ্বংস করিয়া বর্তমান মথুরা রাজ্য স্থাপন করিলেন, ভরত কর্তৃক গন্ধর্ব রাজ্য (যাহা বর্তমান কান্দাহার) স্থাপন করাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন আদর্শ ধর্মবীর, কর্মবীর, জ্ঞানবীর এবং ক্ষাত্রধর্মের জলন্ত মূর্তি। তবে তাঁহাকে আদর্শ সমাজ সংস্কারক বলা যাইতে পারে না, নচেৎ তিনি শূদ্রতপস্বীর মস্তকচ্ছেদ করিতেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান ও পূত জীবন চরিত রচনা করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকিকে উপদেশ করিলেন। রামচরিত্র ও আদর্শ যে কত মহৎ, কত উচ্চ তাহা রামায়ণের ভূমিকা হইতেই জানা যায় (বালকাণ্ড ১।১৯ শ্লোক দেখুন)।

এই রামায়ণ একটা পৌরাণিক কাহিনী নহে—ইহা তদানীন্তন ভারতের একটী উজ্জ্বল ছবি—ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, কৃষ্টি আচার ব্যবহারের একটি মহাকোষ, আর সুললিত ছন্দের মাধুর্যে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগ্রন্থ। এই রামায়ণ বর্ণিত—প্রত্যেক চরিত্রটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি আদর্শ চরিত্র। মন্থরা কৈকেয়ী প্রমুখ সে সব চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও কুটিলতা স্বার্থপরতার নিখুঁত ছবি। দশরথ ও কৌশল্যার আদর্শ বাৎসল্যপ্রীতি, লক্ষ্মণাদির আদর্শ ভ্রাতৃভক্তি, দুঃখের মূর্তিমতী সীতাদেবীর আদর্শ সতীত্ব, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আদর্শ ঋষিত্ব-হনুমানের আদর্শ প্রভুভক্তি—প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সত্যই রামায়ণকে অমর কাব্য-শ্রেষ্ঠতম কাব্য করিয়াছে। সত্যই দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।

"যাবৎ পর্বত-নদী রবে মহীতলে। তাবৎ এ রামায়ণ পড়িবে সকলে।'

মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত এই মূল রামায়ণ রামের জীবিত কালেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে হইলে এই রামায়ণকেই অবলম্বন করিতে হইবে। রামায়ণের কাল-নির্ণয় ভাষাতত্ত্ব, মহাভারতের বিষয় ও জ্যোতিষিক বিচার দ্বারা স্থির করিতে চেষ্টা করিব।

রামায়ণ হইতে দেখা যায়—সে সময় আর্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেন (অরণ্য কাণ্ড ১১।৫৬ ও সুন্দর কাণ্ড ৩০।১৭-১৯ শ্লোক দেখুন)। কিন্তু এই ভাষা বৈদিক সংস্কৃত নহে অথচ ইহার মধ্যে অনেক শব্দ আছে যাহাদিগকে বর্তমান শুদ্ধ সংস্কৃতের ব্যাকরণানুযায়ী আর্ষ প্রয়োগ বলা হয়। সুতরাং রামায়ণের ভাষা বৈদিক যুগের শেষদিগের ও বর্তমান সংস্কৃত ভাষার পূর্বের। পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে প্রাকৃত, মাগধী, পালি প্রভৃতি কথ্যভাষা প্রচলিত হইল। বুদ্ধদেবের সময় কথ্যভাষা ছিল পালি। এই কথিত সংস্কৃত ভাষা অপ্রচলিত হইতে অন্ততঃ কয়েকশত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে অন্ততঃ ৩ হাজার বর্ষ পূর্বে (কারণ বুদ্ধদেবের সময় প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে) রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

তারপর অন্যতম মহাকাব্য মহাভারত ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় হইতে বিচার করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে প্রায় খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা বহু প্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে। মহাভারতে অনেক স্থানে রামায়ণের কথা ও আখ্যান আছে, কিন্তু রামায়ণে মহাভারত সম্বন্ধে কোন কিছুরই উল্লেখ নাই; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে রামায়ণ মহাভারতের পূর্বে রচিত। মহাভারতের যুগে দাক্ষিণাত্য আর্যদিগের বসতিতে ও সহরে পূর্ণ। আর্যসভ্যতার তখন যথেষ্ট বিস্তৃতি হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের বর্ণনায় চিত্রকুট হইতে পঞ্চবটী, কিষ্কিন্ধ্যা (ইহা বর্তমান বেলারি হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে) ও লঙ্কা পর্যন্ত স্থানে কেবল আমরা নদী, পর্বত, অরণ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই বর্ণনা দেখিতে পাই। মধ্যে কেবল বালী রাজার রাজ্য। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ লোকাবাস ও রাজ্যে পরিণত হইতে কত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। রামায়ণে আমরা দুইটি আর্য রাজার বংশ-পরিচয় পাই—ইক্ষাকুবংশীয় রাজা দশরথ ও মিথিলার রাজা জনক। অনেক পুরাণে এই দুইটী বিখ্যাত বংশের পরবর্তী রাজাগণের তালিকা আছে। বিষ্ণুপুরাণ (৪।২ অঃ) হইতে দেখা যায় রামচন্দ্র হইতে বৃহদ্বল পর্যন্ত ৩২ অধস্তন পুরুষ। ইনি কুরুপক্ষের সপ্তরথীর এক রথী ছিলেন ও অভিমন্যু কর্তৃক নিহত হন। আবার বায়ুপুরাণ (৮৮ অঃ) হইতে দেখা যায় যে বৃহদ্বল রাম হইতে ২৮ পুরুষ পরে। সুতরাং পুরাণে যে বংশাবলী সম্পূর্ণরূপে দেওয়া নাই তাহা বলা যাইতে পারে।

এইভাবে ডক্টর সীতানাথ প্রধান তাঁহার Chronology of Ancient India পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রাজা দশরথের কাল মহাভারতযুদ্ধ হইতে প্রায় ১৫টী পুরুষ উর্দ্ধ্বতন। বিভিন্ন পুরাণ হইতে সংগৃহীত তাঁহার প্রদত্ত বংশতালিকাটী এই প্রকার: দশরথ, রাম, কুশ, অতিথি, নিষাধ, নল, নভ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনগু, সহস্রাশ্ব, চন্দ্রাবলোক, তাড়াপীড়, চন্দ্রগিরি, ভানুচন্দ্র, শ্রুতায়ু। মহাভারতযুদ্ধে তিনজন শ্রুতায়ুর মৃত্যু হইয়াছিল এবং অর্জুন ইক্ষাকুবংশীয় রাজা বৃহদ্বলকে হত্যা করেন। কেহ কেহ এই বৃহদ্বলকে শ্রুতায়ু স্থির করিয়াছেন। ডক্টর প্রধান রাজর্ষি জনকের বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া-

ছেন যে তিনিও মহাভারতযুদ্ধ হইতে ১৫ পুরুষ উর্দ্ধে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে রামচন্দ্রের জন্ম আমরা ভারতযুদ্ধ হইতে প্রায় (১৫ × ৩০ =) ৪৫০ বৎসর পূর্বে ধরিতে পারি; কারণ সেকালে অনেকেই শতায়ু ছিলেন এবং এক এক রাজা অন্ততঃ ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন পুরাণে প্রদত্ত বংশতালিকায় নামের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। তদ্ব্যতীত উহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন না তাঁহাদের নাম পুরাণে না থাকারই সম্ভাবনা। ডক্টর প্রধান এই প্রকারে পুরাণের নাম তালিকা হইতেই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-কাল ১১৫১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতিষিক গনণায় ও প্রচলিত মতে মহাভারতযুদ্ধ প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে। সুতরাং এই প্রকার পুরাণের নাম তালিকায় সময় নির্ধারণ হয় না। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা মহাভারতযুদ্ধকাল যাহা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা প্রচলিত মতেরই সহিত মিলিয়া যায় (শ্রীভারতী দেখুন)।

লোকমান্য তিলক ও জেকবি সাহেব বিভিন্ন প্রকারে জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা বেদের শেষ সীমার কাল নির্ণয় করিয়াছেন প্রায় ৪০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। রামায়ণে বর্ণিত ও রামের সমসাময়িক মহর্ষি বিশ্বমিত্র রাজর্ষি জনক ও ইঁহার সভাপণ্ডিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সকলেই বৈদিক ঋষি। সুতরাং ইঁহারা যদি বৈদিক যুগের শেষদিকেও আবির্ভূত হ'ন তবে আনুমানিক ৫০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ইঁহাদের আবির্ভাব ধরা যাইতে পারে। আমাদের প্রচলিত মতে রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেদে ও মনুসংহিতাতেও এক একটি যুগের পরিমাণ ৩০০০ বৎসর এবং ১২ হাজার বৎসরে ৪টি যুগ। আর্যভট বা তাঁহার কিছুকাল পূর্বে কোন জ্যোতিষী কেন যে এই বৎসরকে দেবতার বৎসর করিয়া ইহাকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া (কারণ দেবতার ১ দিন মানবের ১ বৎসর) এক একটি যুগের পরিমাণ ৩০০০ × ৩৬০ বৎসর করিলেন তাহা বলা যায় না। আমরা কিন্তু যুগের পরিমাণ বেদ ও মনুতে যাহা আছে—তাহাই ধরিতে চাই। দ্বাপরের শেষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও মহাভারতযুদ্ধ। এই মহাভারতযুদ্ধের কাল ৩০০০ খৃ° পূ° সুতরাং ত্রেতাযুগের শেষ ৬০০০ খৃ° পূ°। রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যদি ত্রেতার শেষভাগে হয় তবে অনুমানিক ৬০০০ খৃ° পূ° হয়। বৈদিক ঋষি বিশ্বামিত্রাদির কাল নির্ণয়েও প্রায় ৫০০০ খৃ° পূ° পাওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে স্যর উইলিয়ম্ জোন্স রামের সময় ২০২৯ খৃ° পূ°, টড ১১০০ খৃ° পূ° বেণ্ট্লি ৯৬১ খৃ° পূ° এবং গরুরেসিও ১৩শ খৃ' পূ' অব্দে স্থির করিয়াছেন। শেষোক্ত পণ্ডিতের মতে রাম হইতে বিক্রমাদিত্যের (খৃ° পূ° ৫৭ অব্দ) সমসাময়িক রাজা সুমিত্রা ৫৬তম অধস্তন এবং প্রত্যেকের ২০ বৎসর করিয়া রাজত্ব কাল ধরিলে ১৩শ খৃ° পূ° অব্দ হয়। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি তদানীন্তন যুগে প্রত্যেকের রাজত্বকাল অন্ততঃ ৩০ বৎসর করিয়া ধরা উচিত; আর তাহা হইলে খৃ' পূ° ১৮শ অব্দ হয়। যাহা হউক, রামায়ণ যে মহাভারতের বহু পূর্ববর্তী তাহার অন্যতম কারণ মহাভারতে যে ভক্তিবাদের প্রাচুর্য

আছে রামায়ণে জনসাধারণে সে ভক্তিধর্ম নাই, আছে যাগযজ্ঞ তপস্যা। তারপর রামায়ণে মহাভারতের উল্লেখ নাই কিন্তু মহাভারতে রামায়ণের সমস্ত কাহিনীটাই উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণের মধ্যে ২।১টী শ্লোকে বৌদ্ধদিগকে গালাগালি দেওয়া আছে, উহা যে প্রক্ষিপ্ত তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, বহুপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যায় রামায়ণ মহাভারতের বহুপূর্ববর্তী।

এক্ষণে আমরা জ্যোতিষিক প্রমাণের দ্বারা রামচন্দ্রের জন্ম সময় স্থির করিতে চেষ্টা করিব। রামচন্দ্রের জন্মসময়ে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। কোন্ পূর্ববর্তীযুগে এই প্রকার পরিস্থিতির সম্ভাবনা ?

বেণ্ট্‌লে সাহেব (John Bentley) তাঁহার 'A Historical View of the Hindu Astronomy' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রামচন্দ্রের জন্মকাল ৯৬১ খৃ° পূ° অব্দের ৬ই এপ্রেল। কিন্তু তিনি গণনা করিয়াছেন—এইভাবে গ্রহের সন্নিবেশে যথা—রবি মেষে, চন্দ্র কর্কটে, পুষ্যা নক্ষত্রে (পুনর্বসু নহে), মঙ্গল কুম্ভে (মকরে নহে), বৃহস্পতি সিংহে (কর্কটে নহে), শুক্র মীনে, শনি তুলায় এবং বুধের কোন অবস্থান ধরেন নাই। রামচন্দ্রের জন্ম সময়ে গ্রহাবস্থান কি ছিল, রামায়ণে যাহা বর্ণিত আছে—তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। নবমীতিথি ও পুনর্বসু নক্ষত্র যোগ এবং রবির মেষে অবস্থান এই কয়টীর সংযোগ কিন্তু বর্তমান রাশিচক্র-বিভাগানুযায়ী হইতে পারে না। বহু পূর্বে যে অন্য প্রকার রাশিচক্রের বিভাগ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উক্ত বিভাগানুযায়ীই এই রামায়ণের রাশিচক্র বর্ণিত আছে। যাহা হউক, সব কয় গ্রহের স্ব স্ব স্থানে পুনরাবর্তন সাধারণতঃ ১৮০ বৎসর অন্তর হয়। বেণ্টলে সাহেবের গণনায় ঐ কয় গ্রহের সন্নিবেশ ঐ সময়ে (৯৬১ খৃ° পূ°) একবার হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। আমরা যদি ঐ সময়কে ১৮০ দিয়া পূরণ করিতে থাকি তাহা হইলে ঐ প্রকার সন্নিবেশ স্থূল ভাবে পাইব। প্রবাদ আছে রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে জন্মিয়াছিলেন। দ্বাপরের শেষে ৩১০২ খৃ° পূ° অব্দে মহাভারত যুদ্ধ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি বেদে ও মনুসংহিতায় ১২০০০ বৎসরে এক মহাযুগ। এই মহাযুগ গণনা এইভাবে হয়—সত্য সমগ্রযুগের ১০ ভাগের ৪ভাগ, ত্রেতা ৩ ভাগ, দ্বাপর ২ ভাগ ও কলি ১ ভাগ। মোট ১০ ভাগ ; সুতরাং দ্বাপরের যুগ ১২ হাজার বৎসরের ২/১০ বা ১/৫ বা ২৪০০ বৎসর। সুতরাং ত্রেতাযুগের শেষ ৩১০২ + ২৪০০ = ৫৫০২ খৃ° পূ°। ১৮০ বৎসরকে যদি ২৬ দিয়া গুণ করা যায় তাহা হইলে আমরা ৪৬৮০ বৎসর পাই। ইহাতে ৯৬১ খৃ° পূ° (বেণ্ট্‌লে সাহেবের গণনা) যোগ করিলে আমরা ৫৬৪১ খৃ° পূ° অব্দ পাই। সুতরাং জ্যোতিষিক গণনার সহিত ত্রেতাযুগের সামঞ্জস্য করিতে হইলে **৫৬৪১ খৃঃ পূঃ অব্দে রামচন্দ্রের জন্ম হয়।** আর বংশ পরম্পরার হিসাবে ধরিলে আমরা ৩২ বংশ রাম হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত পাইতেছি। প্রত্যেক রাজার অন্ততঃ ৩০ বর্ষকাল সময় ধরিলে আমরা প্রায় ১ হাজার বৎসর পাই, সুতরাং ৩১০২ + ১০০০ = ৪১০২ খৃ° পূ° হয়। এবং পূর্বোক্ত জ্যোতিষিক গণনায়-১৮০কে ১৮ দিয়া গুণ করিয়া **আমরা ৪২০১ খৃঃ পূঃ পাই।**

আমাদের মতে এই সময়েই অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় ১১ শত বর্ষ পূর্বে রামের জন্ম সময় সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আশাকরি, ভবিষ্যতে আরও গবেষণাদ্বারা ঠিক বৎসরটী নির্ণীত হইবে। আমরা রামায়ণে বর্ণিত গ্রহাবস্থান হইতে রামচন্দ্রের একটি জন্মকুণ্ডলী নিম্নে দিতেছি। তাঁহার জীবনীর সহিত এই কুণ্ডলীর গণনা মিলিয়া যায়। এখানে পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী থাকায় তিনি শ্রেষ্ঠ রাজা হইতেছেন; সপ্তমে মঙ্গল থাকায় তাঁহার পত্নীসুখ হইতেছে না; চতুর্থে শনি থাকায় তিনি পিতার কষ্টদায়ক; লগ্ন ও চন্দ্র হইতে চতুর্থে পাপগ্রহ থাকায় বহুমাতৃক হইতেছেন; এবং নবমে ও দশমে গ্রহসংযোগের ফলে মহাধার্মিক হইতেছেন।

লোকপাবন রামচন্দ্র বহুসহস্র বর্ষ হইল লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজও তাঁহার চরিত গানে ও নামসুধাপানে ভারতের অগণিত ভক্ত মাতোয়ারা। প্রার্থনা করি যেন ধর্মস্থাপনতৎপর রামের পূতজীবনী সর্বভবাময়বারকরূপে বর্তমানযুগের জনগণের মন ধর্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর করায়। তাঁহার শুভজন্মতিথিবাসরে তাঁহার মঙ্গলময় জয়গান দিকে দিকে ধ্বনিত হউক!

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়োভূয়োনমাম্যহম্।

পরিশিষ্ট

রামায়ণ

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে মোট প্রায় ২৪ হাজার শ্লোক আছে। ইহাদের অধিকাংশই সুললিত অনুষ্টপছন্দে রচিত। ইহা ৭টী কাণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক কাণ্ড আবার কতকগুলি সর্গে বিভক্ত। রামায়ণের অপর নাম রঘুবরচরিত, দশশিরঃবধ, পৌলস্ত্যবধ। ইহার তিন-প্রকার পাঠ—(ক) উদীচ্য বা উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঠ (খ) দাক্ষিণাত্য বা সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র

ও বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠ (গ) গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় পাঠ। উদীচ্য ও বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠ উৎকৃষ্ট ও প্রাচীন, এবং ইহাদের মধ্যে পাঠভেদ অপেক্ষাকৃত কম। গৌড়ীয় পাঠে বিশেষ ভেদ দেখা যায়। প্রায় ৮ হাজার শ্লোকের মধ্যে পরস্পরে পাঠের অনৈক্য আছে। গৌড়ীয় পাঠের উপর 'মনোরমা' নামে এক টীকা আছে। অন্য ২টী পাঠের উপর নিম্নলিখিত টীকা আছে—(১) ঈশ্বরদীক্ষিতের টীকা (২) উমামহেশ্বরের টীকা (৩) কতক টীকা (৪) গোবিন্দ রাজের শৃঙ্গারতিলক টীকা (৫) চতুরর্থদীপিকা (৬) ত্র্যম্বক যজ্বাকৃত ধর্মকূট (৭) দেবরাম ভট্টের টীকা (৮) নাগেশের টীকা (৯) নৃসিংহের টীকা (১০) মহেশ্বরতীর্থের রামায়ণ তত্ত্বদীপ (১১) রামানন্দতীর্থের রামায়ণতিলক বা রামায়ণকূট টীকা (১২) রামানুজের রামায়ণ ব্যাখ্যা (১৩) রামাশ্রমাচার্যের টীকা (১৪) রামায়ণবিরোধপরিহার (১৫) রামায়ণ তাৎপর্য বিরোধভঞ্জিনী (১৬) রামায়ণ সেতু (১৭) বরদরাজ-কৃত বিবেকতিলক (১৮) বাল্মীকি হৃদয় টীকা (১৯) বিদ্যানাথের টীকা (২০) বিদ্বন্মনোরমা (২১) বিমলবোধের টীকা (২২) বিশ্বনাথের বাল্মীকি তাৎপর্য-তরণি (২৩) শিবরাম সন্ন্যাসীর টীকা (২৪) শৃঙ্গার সুধাকর (২৫) সর্বজ্ঞের টীকা (২৬) সুবোধিনী (২৭) হরগ্রাবশাস্ত্রীর রামায়ণ সপ্তবিম্ব (২৮) হরি পণ্ডিতের রামায়ণী টীকা—এই মোট ২৯টী টীকার মধ্যে (১১) সংখ্যক টীকা রামবাচস্পতি নামক একজন বাঙ্গালী (ইনি পরে সন্ন্যাসী হইয়া রামানন্দ সরস্বতী নামে অভিহিত হ'ন) বিখ্যাত ও প্রচলিত। অন্যগুলির অধিকাংশই অমুদ্রিত।

এই রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য কয়েকটী রামায়ণ রচিত হইয়াছে যথা—(১) অগ্নিবেশ্য রামায়ণ (২) বৌধায়ণ রামায়ণ (সম্ভবতঃ এই ২ খানি গ্রন্থ লুপ্ত) (৩) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (৪) অধ্যাত্ম রামায়ণ (ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত) (৫) অদ্ভুত রামায়ণ (৬) আত্ম রামায়ণ (৭) আনন্দ রামায়ণ ইত্যাদি।

এই রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া প্রাদেশিক ভাষায় বহু রামায়ণ রচিত হইয়াছে। যথা—(ক) বঙ্গভাষায় ২৫ প্রকার (তন্মধ্যে কৃত্তিবাস-কৃত খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে রচিত রামায়ণই প্রধান (খ) হিন্দী ভাষায় ১১ প্রকার (তন্মধ্যে সাধকপ্রবর তুলসীদাস-কৃত রামচরিতমানসই প্রশস্ত এবং ইহা খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে রচিত) (গ) উৎকল ভাষায় ৬প্রকার (ঘ) তামিল ভাষায় ১২ প্রকার (তন্মধ্যে খৃঃ ৯ম শতাব্দীতে রচিত কম্বন-কৃত তামিল রামায়ণই প্রশস্ত) (ঙ) তেলেগুভাষায় ৫ প্রকার (৮) মারাঠীভাষায় ৮ প্রকার।

মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনেক সংস্করণ আছে। তন্মধ্যে গ্রিফীথ্ সাহেব-কৃত ইংরেজীতে পদ্যানুবাদ, ৺রাজকৃষ্ণ রায়-কৃত বাঙ্গলায় পদ্যানুবাদ, মন্মথনাথ দত্ত-কৃত ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ, রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত ইংরেজী পদ্যানুবাদ, জি, গোর্‌রেসিও-কৃত ইতালী ভাষায় অনুবাদ, এচ্ ফৌচে কৃত এবং এরোসেল কৃত ২টী ফরাসী অনুবাদ এবং এফ্ রুকার্ট কৃত জার্মাণী ভাষায় অনুবাদ বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত, জেকবি, বেবর, জে. সি. ওমান., হপ্‌কিন্স, সি. ভি. বৈদ্য প্রভৃতি কৃত রামায়ণের উপর অনেক গবেষণাও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় রাজশেখর

বসু কৃত রামায়ণ কথা অতি উপাদেয়। মূল রামায়ণের ৩টী প্রধান পাঠের মধ্যে জি. গোর্‌রেসিও (ইতালীয় পণ্ডিত) গৌড়ীয় পাঠ অবলম্বনে, কে. পি. পরাব বোম্বাই পাঠ অবলম্বনে (ইহাতে ৩টী টীকা আছে) সম্পাদিত করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম পাঠের সংস্করণ সম্ভবতঃ এখনও অপ্রকাশিত। এতদ্ব্যতীত যবদ্বীপে কবিভাষায় রচিত একটী বৃহৎ রামায়ণের সংস্করণ আছে। উহাতেও পাঠান্তর লক্ষ্য হয়। রামায়ণের ২টী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে—একটি ১১শ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র কৃত রামায়ণমঞ্জরী (ইহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঠানুসরণে) ও অপরটী ভোজরাজ রচিত রামায়ণ চম্পু (১১শ শতাব্দীতে)।

এই রামায়ণ অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী যুগে রচিত বহু সংস্কৃত কাব্যনাটকাদি সাহিত্য জগতে অমর হইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান যথা—কালিদাস-কৃত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব, ভবভূতি-কৃত উত্তররামচরিত ও মহাবীরচরিত, জয়দেব-কৃত প্রসন্নরাঘব, রাজশেখর-কৃত বালরামায়ণ, ভাসকৃত অভিষেকনাটক ও প্রতিমা নাটক, দিঙনাগ-কৃত কুন্দমালা, চক্রকবি-কৃত জানকী পরিচয় কাব্য, ভট্টিকৃত ভট্টিকাব্য, কুমারদাস-কৃত জানকীহরণ কাব্য, বেদান্তদেশিক-কৃত হংসসন্দেশ ইত্যাদি।

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

পণ্ডিত **শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ**

ভাব

লক্ষণ। যাহাতে সত্তার সম্বন্ধ[১] থাকে তাহাকে **ভাব** কহে।

লক্ষ্য। কি কি বস্তুকে ভাব বলা হয় বিভাগ দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

সমন্বয়। সত্তার সম্বন্ধ থাকিলেই পদার্থ 'সৎ' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সৎ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তার সমবায় সম্বন্ধ এবং সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে একার্থসমবায় সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাদিগকে 'সৎ' বা ভাব বলা হয়।

ভাব ছয় প্রকার[২] —
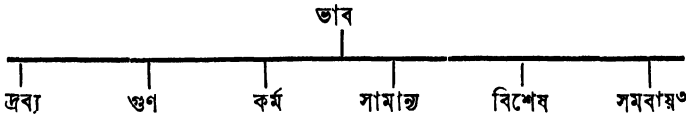
বিভাগে দ্রব্য প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে এক্ষণে দ্রব্য নিরূপণ করা হইবে।

দ্রব্য

লক্ষণ। যাহাতে গুণ থাকে তাহাই দ্রব্য। (গুণবত্ত্বং দ্রব্যত্বং)

লক্ষ্য। দ্রব্য বলিতে কি কি বুঝায় তাহা দ্রব্যের বিভাগে পরিস্ফুট হইবে।

১। 'সত্তা' সামান্য-নিরূপণে দ্রষ্টব্য। ন্যায়শাস্ত্রে অনেক সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় আলোচিত হইবে। এই লক্ষণে কিন্তু কেবল সমবায় ও একার্থসমবায় এই দুইয়ের অন্যতর অর্থাৎ দুইয়ের একটী সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। কুমারিল ভট্টের মতে ভাব পদার্থ চতুর্বিধ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতি।

(মানমেয়োদয়, প্রমেয় পরিচ্ছেদ ৬৫ পৃঃ)

প্রভাকর মতে ভাব অষ্টবিধ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, শক্তি, সাদৃশ্য, সংখ্যা ও সমবায়।

(তন্ত্র রহস্য ২০ পৃঃ, মানমেয়োদয় ১১৪ পৃঃ)

দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতে ভাব পদার্থ ত্রয়োদশ প্রকার—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, ক্ষণ, স্বত্ব, শক্তি, কারণত্ব, কার্যত্ব, সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও বিষয়তা।

৩। দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি প্রকারে পদার্থ বিভাগ চরকসংহিতায়ও দেখা যায়। তবে সেখানে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম ও সমবায় এইরূপ ক্রম গৃহীত হইয়াছে।

সমন্বয়। সকল দ্রব্যেই গুণ থাকে এবং দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থে গুণ থাকে না ; সুতরাং দ্রব্যে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

দ্রব্যের গুণ—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রূপাদির প্রত্যক্ষকালে উহাদিগের আশ্রয়[১] পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ুরও[২] প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই সময়ে উক্ত গুণসকল হইতে উহাদিগের আশ্রয়গুলির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিজাতীয়তাও অনুভূত হয়। উহাই দ্রব্যত্ব। এই প্রকারে পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি দ্রব্যে দ্রব্যত্বের প্রত্যক্ষ হয়। আকাশ প্রভৃতি অবশিষ্ট পঞ্চ দ্রব্যেও দ্রব্যত্ব আছে, ইহা অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করা যায়। অতএব 'দ্রব্যত্ব' জাতি ও দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে।

দ্রব্য বিভাগ

দ্রব্য নয় প্রকার[৩] –
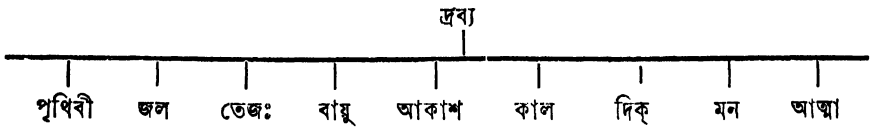
দ্রব্যের প্রবিভাগ

দ্রব্যের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে[৪] উদ্দেশানুসারে ক্রমশঃ পৃথিব্যাদি দ্রব্যের প্রবিভাগ দেখাইতে হইবে। ঐ জন্য নিত্য, অনিত্য, পরমাণু, ইন্দ্রিয় ও শরীর এই পাঁচটি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ অপরিহার্য। অতএব অগ্রে উহাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

১। প্রত্যেক দ্রব্যেই বহু গুণের সমাবেশ হয়। কেহ কেহ মনে করেন দ্রব্য গুণের সমষ্টিমাত্র, গুণ হইতে অতিরিক্ত 'দ্রব্য' বলিয়া কিছুই নাই।

এই মত যুক্তিসহ নহে। কারণ, গুণের সমষ্টি বা সমূহ বস্তুটী উহার অন্তর্গত প্রত্যেক গুণ হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন তাহা বলিতে হইবে। যদি বল ভিন্ন, তবে পৃথক বস্তু সিদ্ধ হওয়ায় "গুণসমষ্টি" ইহা দ্রব্যেরই নামান্তর হইল মাত্র। আর যদি বলা যায় অভিন্ন তাহা হইলে কোন্ গুণটা "সমষ্টি" হইবে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে। কোনও একটি গুণের পক্ষে যুক্তি না থাকায় ঐরূপ নির্দেশ কেহ নির্বিবাদে মানিয়া লইতে পারে না। অতএব গুণের অধিকরণ দ্রব্য, উহা গুণ হইতে অতিরিক্ত ইহাই স্বীকার করা উচিত। "দ্রব্য গুণ-সমষ্টি মাত্র" এই মতে আরও অনেক দোষ হয়।

২। বায়ু প্রত্যক্ষ এই মত সকল দার্শনিক স্বীকার করেন না।

৩। মীমাংসকেরা শব্দ ও অন্ধকার এই দুই পদার্থকে দ্রব্যের অন্তর্গত বলিয়াছেন। অতএব উক্তমতে দ্রব্য একাদশ প্রকার। (মানমেয়োদয় ৬৬ পৃঃ)

দীধিতিকারের মতে দ্রব্য পঞ্চবিধ—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আত্মা। এইমতে আকাশ, কাল ও দিক্ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ দ্রব্য নহে এবং শরীরস্থ বায়বীয় ত্রসরেণুবিশেষই মন। (পদার্থতত্ত্বনিরূপণ)

৪। উদ্দেশ অর্থ নাম-কথন।

নিত্য

লক্ষণ। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহাই **নিত্য**। (উৎপত্তিবিনাশরহিতত্বং, = ধ্বংসপ্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বম্)।

লক্ষ্য। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর সূক্ষ্মতম অংশ (পরমাণু), আকাশ, কাল, দিক্, মন ও আত্মা,[১] জাতি[২], বিশেষ, সমবায়, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব এই কয়টী পদার্থ নিত্য।[৩]

দার্শনিকেরা বলেন ভাব পদার্থ সকলের মধ্যে যাহার উৎপত্তি হয় কালবিশেষে তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। অভাব গুলির মধ্যে প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই কিন্তু বিনাশ হয় এবং ধ্বংসের উৎপত্তি হয় কিন্তু বিনাশ নাই। এজন্য উৎপন্ন ভাবসমূহ, প্রাগভাব ও ধ্বংস ইহারা নিত্য লক্ষণের লক্ষ্য নহে।

সমন্বয়। লক্ষ্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত বস্তুগুলি বরাবরই আছে এবং পরেও বরাবর থাকিবে, উহাদিগের জন্ম কিংবা বিনাশ নাই। অতএব লক্ষণ-সমন্বয় হইল।

"যাহার উৎপত্তি নাই তাহাই নিত্য" (প্রাগভাবাপ্রতিযোগি নিত্যং) এইটুকুমাত্র নিত্যের লক্ষণ বলিলে সকল লক্ষ্য স্থলেই লক্ষণ সমন্বিত হয়, বিনাশশীল ভাব এবং ধ্বংসের উৎপত্তি থাকায় ঐগুলিতে অতিব্যাপ্তিও হয় না; কিন্তু অলক্ষ্য প্রাগভাবে লক্ষণ সমন্বিত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয়।

উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য যদি "যাহা বিনাশশূন্য তাহাই নিত্য" (ধ্বংসা-প্রতিযোগি নিত্যং) এইরূপে লক্ষণ করা হয় তবে উল্লিখিত লক্ষ্যস্থল সমূহে লক্ষণ সমন্বিত হয়, উৎপন্নভাব পদার্থও প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তিও হয় না সত্য; কিন্তু ধ্বংসে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। অতএব নিত্যের লক্ষণে "উৎপত্তিশূন্য ও বিনাশশূন্য" এই উভয় অংশই আবশ্যক।

অনিত্য

লক্ষণ। যাহার উৎপত্তি কিংবা বিনাশ হয় তাহা **অনিত্য**। (ধ্বংসপ্রাগভাবান্যতর-প্রতিযোগিত্বম্ অনিত্যত্বম্)

লক্ষ্য। পরমাণু ব্যতীত পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যসমূহ, কতকগুলি গুণ, কর্মসকল এবং প্রাগভাব ও ধ্বংস ইহারা অনিত্য লক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয়। উল্লিখিত কর্ম পর্যন্ত বস্তু সমূহের উৎপত্তি এবং বিনাশ দুইটিই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকলে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

১। গুণের মধ্যে কতকগুলি নিত্য এবং কতকগুলি অনিত্য। উহাদের যথাযথ পরিচয় দিতে হইল। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয় এজন্য গুণের নাম এখানে উপেক্ষিত হইল। যথাস্থানে উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২। জাতি সামান্য নিরূপণে দ্রষ্টব্য।

৩। অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাব, ধ্বংস ও প্রাগভাব অভাব অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

উৎপত্তি না থাকিলেও প্রাগভাবে "বিনাশ" রূপ দ্বিতীয় অংশ থাকায় এবং বিনাশ না হইলেও ধ্বংসে 'উৎপত্তিরূপ' প্রথম অংশ থাকায় ঐ দুই পদার্থে অব্যাপ্তি দোষ ও হইল না। অতএব লক্ষণে বিকল্পবোধক "কিংবা" (সংস্কৃতে অন্যতর) কথাটী সার্থক হইল।

কোন কোন প্রাচীন দার্শনিক প্রাগভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কেহ কেহ বিনাশী পদার্থকেই 'অনিত্য বলিতেন। এই মতে ধ্বংসও 'অনিত্য' লক্ষণের লক্ষ্য নহে।

যদি কেবল ভাব-বস্তুর সম্বন্ধেই অনিত্যের লক্ষণ বলা আবশ্যক হয় তবে 'নিত্য' লক্ষণের এক একটি অংশ উল্টাইয়া লইলেই অনিত্যের নির্দোষ লক্ষণ পাওয়া যায় অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে (প্রাগভাবপ্রতিযোগি) তাহাই অনিত্য এইটুকু অথবা যাহা বিনাশযোগ্য (ধ্বংসপ্রতিযোগি) তাহাই অনিত্য এইটুকু মাত্র বলিলে লক্ষণে কোনও দোষ ঘটে না। ইহাতে পৃথক্‌ভাবে অনিত্যের দুইটি লক্ষণ হয়।

এইরূপ স্থলে যদি উল্লিখিতরূপে অর্থাৎ 'ধ্বংসের প্রতিযোগি এবং প্রাগভাবের প্রতিযোগি' এইরূপে একটি লক্ষণ বলা হয় তবে লক্ষণে এক অংশ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহাতে লক্ষণে বৈয়র্থ্য বা ব্যর্থতা দোষ ঘটে। লক্ষণ বলিতে হইলে যাহাতে বৈয়র্থ্য দোষ না আসে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

এখানে ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে "নিত্যত্ব" হইতে শুনিতে বড় হইলেও ভাবপদার্থস্থলে "অনিত্যত্ব" পদার্থটী গৌরব দোষে দুষ্ট নহে বরঞ্চ উহা লঘু। কারণ, 'নিত্য' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে ধ্বংস, প্রতিযোগিত্ব ও অভাব এই তিনটি পদার্থ আবশ্যক কিন্তু 'অনিত্য' শব্দের অর্থ ধ্বংস ও প্রতিযোগিত্ব এই দুইটী পদার্থ দ্বারাই বিশ্লেষণ করা যায়। লাঘব ও গৌরবের বিচারক্ষেত্রে অক্ষরের অল্পতায় দৃষ্টি না রাখিয়া পদার্থের অল্পতা প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ তাহাতেই যথার্থ লাঘব হয়। সুতরাং যদি কোন লক্ষণে নিত্য ও অনিত্য এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয় তবে "নিত্য" শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'অনিত্য' শব্দ প্রয়োগ করাই সঙ্গত।

পরমাণু।

পরমাণু একটি যৌগিক শব্দ। পরম+অণু=পরমাণু। অণু শব্দ ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশিষ্ট (অর্থাৎ আকারে ছোট) বস্তু এবং ক্ষুদ্র পরিমাণ এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা পরম অণু অর্থাৎ যাহার পরিমাণ ক্ষুদ্রত্বের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু কল্পনা করা যায় না তাহাই পরমাণু।

পরিমণ্ডল, পারিমাণ্ডল্য ও পারিমাণ্ডিল্য শব্দে পরমাণুর পরিমাণ বুঝায় [১]। পরমাণু সকল নিত্য এবং অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হইলেও পরমাণুর অস্তিত্ব যুক্তিদ্বারা অবগত হওয়া যায়।

একটি মাটির ঢিল ভাঙ্গিলে দুই খণ্ড হয়। উহার একটি খণ্ডকে পুনরায় ভাঙ্গিলে

১। 'নিত্যং পরিমণ্ডলং' বৈশেষিক সূত্র ২০, ৭অ, ১আ।

আরও অনেক ক্ষুদ্র অংশ বাহির হয়। ঐরূপ একটি ক্ষুদ্র অংশকে ভাগ করিলে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর অংশ পাওয়া যায়। এই প্রকার ভাগ পরম্পরার ফলে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ স্বীকার করিতে হয় যাহাকে পুনরায় আর ভাগ করা যায় না। এই অবিভাজ্য সূক্ষ্মতার বিশ্রাম স্থানই পরমাণু।[১] পরমাণু নিরবয়ব বা নিরংশ।

দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে দ্ব্যণুক বলে। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে একটি ক্রটি, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু জন্মে। আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তন্মধ্যে ত্রসরেণু সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম[২]। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এক একটি পরমাণু একটি ত্রসরেণুর ছয় ভাগের একভাগ ($\frac{১}{৬}$) মাত্র।[৩]

ত্রসরেণু স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হয়। অধুনা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। উত্তম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এখন ত্রসরেণু অপেক্ষা বহুসহস্র ভাগ ক্ষুদ্রবস্তুও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। অতএব 'গবাক্ষবিবরে প্রবিষ্ট সূর্যকিরণে পরিদৃশ্যমান সূক্ষ্মপরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তু ত্রসরেণু এবং উহাই প্রত্যক্ষের সীমা এইমত কিরূপে সমর্থন করা যায় তাহা চিন্তনীয়।

আয়ুর্বেদে পরমাণুর পরিমাণ ত্রসরেণুর ত্রিংশভাগ ($\frac{১}{৩০}$) নির্দিষ্ট হইয়াছে।[৪] এই মতে পরমাণু পূর্বের তুলনায় ক্ষুদ্র হইয়াছে বটে কিন্তু যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় ঐ পরিমাণও ন্যায়মতে মহৎপরিমাণের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুসাধক যুক্তি পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, প্রত্যক্ষের সীমা যে সূক্ষ্মবস্তুতেই পরিসমাপ্ত হউক না কেন উহার অন্ততঃ একষষ্ঠাংশ ($\frac{১}{৬}$) ক্ষুদ্র দ্রব্যকেই তাঁহারা পরমাণু বলিতেন[৫]। এই প্রকার পরমাণু কখনও প্রত্যক্ষযোগ্য হইতে পারে না।

পরমাণু সকল অনাশ্রিত অর্থাৎ সংযোগ সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন পদার্থই পরমাণুর অধিকরণ নহে এজন্য ঐ সমুদায় সম্বন্ধে পরমাণু কাহারও আধেয় হয় না।

১। ন্যায় ভাষ্য, ৪র্থ অধ্যায় ২য় আহ্নিক ১৬ সূত্র। ন্যায়কন্দলী ৩১ পৃঃ।

২। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥
মনু ৮ম অ, ১৩২ শ্লোক।

৩। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। তস্য ষষ্ঠতমো ভাগঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে॥
ন্যায়কোষ।

৪। ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয় স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ। পরিভাষাপ্রদীপ।

৫। ত্রসরেণুঃ সাবয়বাবয়বারব্ধঃ জন্যমহত্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ, ত্রসরেণোরবয়বাঃ সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ" ইত্যাদি অনুমানে পরমাণু সিদ্ধি হয়। বৈভাষিক বৌদ্ধের বাৎসীপুত্র সম্প্রদায়, কুমারিলভট্ট এবং রঘুনাথ শিরোমণি পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহাদের মতে ক্রটি অর্থাৎ ত্রসরেণুই সূক্ষ্মতার বিশ্রাম স্থান। মানমেয়োদয় ৬৯ পৃঃ, শ্লোকবার্তিক, অনু ১৮৩ শ্লোক, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ ১১ পৃঃ।

লক্ষণ। যাহার পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ আছে তাহাকে পরমাণু বলে। অথবা যাহার অবয়ব নাই অথচ স্পন্দন বা ক্রিয়া আছে তাহা পরমাণু। (নিরবয়বঃ ক্রিয়াবান্ পরমাণুঃ)

লক্ষ্য। পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ু এই চারিটি[১] মহাভূতের অতিসূক্ষ্ম অংশসমূহ এবং মন[২]।

সমন্বয়। উল্লিখিত সকল দ্রব্যেই পারিমাণ্ডল্য আছে অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় হইল। সকল পরমাণুই ক্রিয়াশীল। সুতরাং দ্বিতীয় লক্ষণের সমন্বয় সহজ।

পরমাণু দ্বিবিধ—ভূতপরমাণু ও অভূতপরমাণু। ভূতপরমাণু চতুর্বিধ[৩]—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্য। অভূত পরমাণু—মন।
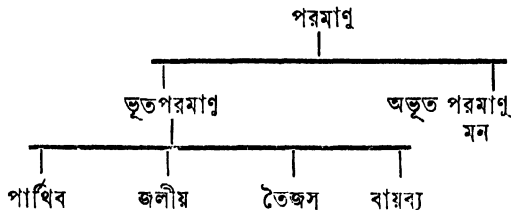
ভূতপরমাণু সমূহে যে সকল গুণ বিদ্যমান থাকে উহাদিগের স্ব স্ব কার্য—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলিতেও ঐ জাতীয় গুণের সমাবেশ হয়।

ইন্দ্রিয়

'ইন্দ্র'শব্দের অর্থ আত্মা, জীব বা জীবাত্মা। জীবাত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক ধর্ম এই অর্থে 'ইন্দ্র' শব্দের উত্তরে 'ইয়'প্রত্যয় দ্বারা 'ইন্দ্রিয়'শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ফলতঃ যে বস্তু থাকিলে ইহাতে জীব আছে অর্থাৎ 'ইহা প্রাণী' এইরূপ অনুমান করা যায় তাহাই ইন্দ্রিয়[৪]।

প্রত্যেক কার্যের উৎপত্তির জন্য কারণরূপে কতকগুলি বস্তুর অপেক্ষা থাকে। একটিমাত্র কারণ হইতে কোনও কার্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ঐ কারণ সমুদায়কে 'সামগ্রা' বলে। সামগ্রার মধ্যে অন্তত একটী কর্তা ও করণ থাকে। কর্তা স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও

১। "অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ" (১ম অঃ ২৭ শ্লোক) এই মনুবচন হইতে মনে হয় আকাশেরও পরমাণু প্রাচীন সম্মত।

২। মনের পরমাণুত্ব সর্বসম্মত নহে।

৩। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা ৯২ প্রকার 'অ্যাটম্' (Atom) এর সন্ধান পাইয়াছেন। এখন ১১২ প্রকার অ্যাটম্ স্বীকৃত হয়। ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন (Electron, Proton) উহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। কিন্তু উহাদের কোনটিই ন্যায়সম্মত পরমাণু নহে।

৪। 'ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা' পাণিনি ৫।২।৯৩ সূত্র।

চেতন। তিনি যে বস্তুর ব্যাপার উৎপাদন করিয়া প্রকৃত কার্য নিষ্পন্ন করেন তাহাকে "করণ" বলা হয়।

যেমন—দেবদত্ত কুঠারের দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করেন। এই উদাহরণে দেবদত্ত কর্তা, তিনি কুঠারে (বৃক্ষের সহিত) 'সংযোগ'স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়া ছেদন (অর্থাৎ বৃক্ষকে দুই খণ্ডে বিভাগ) কর্ম সম্পন্ন করেন, অতএব কুঠার হইল করণ।

আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল ও বিশেষ বিশেষ কার্য; সুতরাং উহার সামগ্রীর মধ্যেও অবশ্যই কেহ কর্তা এবং কোন বস্তু করণ হইবে। জীবাত্মা স্বয়ং প্রত্যক্ষকারী অতএব কর্তা। তিনি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির ব্যাপার সংঘটিত হইলে 'প্রত্যক্ষ' কার্য সম্পন্ন করেন। এজন্য প্রত্যক্ষ-কার্যে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি হয় করণ। প্রত্যক্ষকার্যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি এই করণ-বস্তু সকলের সাধারণ নাম ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার এজন্য, ইন্দ্রিয় ষড়্‌বিধ[১]।

ছেদন কার্যে দেবদত্ত কিপ্রকারে কুঠারের ব্যাপার উৎপাদন করেন তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় উহাদিগের ব্যাপার কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রাচীনগণ প্রত্যক্ষের উৎপাদনে যে প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়।

তাঁহারা বলেন—যখন কোন ইন্দ্রিয় স্বীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে ঐ সময়ে মনের সহিত উক্ত ইন্দ্রিয়ের ও আত্মার সংযোগ হইলে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব আত্ম-মনঃসংযোগ, ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ এবং বিষয়-ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ প্রত্যক্ষস্থলে ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়সকল অতীন্দ্রিয় ও প্রাপ্যকারী। অতএব অতীন্দ্রিয়ত্ব ও প্রাপ্যকারিত্ব ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ধর্ম। অতীন্দ্রিয়ত্ব—শরীরের যে সকল অবয়ব নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ উহারাই ঐ সকল নামে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রিয় নহে কিন্তু সেই অবয়ব সমুদায়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম দ্রব্য বিশেষই প্রকৃত ইন্দ্রিয়[২]। কোন ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে[৩], উহাদের গুণসমূহও প্রায়শঃ

১। প্রত্যক্ষের করণমাত্রই ইন্দ্রিয় এই ন্যায়সিদ্ধান্ত সাঙ্খ্য ও বেদান্তে স্বীকৃত হয় নাই। উক্ত দুই মতে শরীরে কর্ম বিশেষের কারণ কতিপয় বস্তুকেও ইন্দ্রিয় বলা হয়; উহারা কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চবিধ :—বাক্, পাণি (হস্ত) পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এই মতে ন্যায়সম্মত ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সকলে স্বীকার করেন নাই।

২। কোন্ ইন্দ্রিয় কি দ্রব্যের অন্তর্গত তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে।

৩। মনুষ্যাদি জীববিশেষ লক্ষ্য করিয়াই ইন্দ্রিয়গুলিকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। মার্জারাদির নেত্ররশ্মি প্রত্যক্ষযোগ্য; ইহা 'নক্তঞ্চরনয়নরশ্মিদর্শনাচ্চ' এই গৌতমসূত্রে (৪৪।১।৩) স্বীকৃত হইয়াছে।

অতীন্দ্রিয়। যুক্তির দ্বারা এই সূক্ষ্ম দ্রব্যসমুদায়ের অস্তিত্ব জানা যায়। ইন্দ্রিয়ের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়স্থান বলিয়াই ঐ সকল অবয়ব নাসিকা জিহ্বা ইত্যাদি নামে ব্যবহৃত হয়।

প্রাপ্যকারিত্ব—ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়[১] বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়াই অর্থাৎ স্বীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়াই প্রত্যক্ষ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, বিষয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না ২। মনঃসংযুক্ত চক্ষুর রশ্মি নাতিদূরস্থিত বৃক্ষাদির উপরে পড়িলেই বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হয়, উচ্চ প্রাচীরাদির ব্যবধান থাকিলে প্রত্যক্ষ হয় না।

লক্ষণ। যাহাতে শব্দ ব্যতীত অপর কোনও উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ থাকে না এবংবিধ যে বস্তু স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহা ইন্দ্রিয়।[৩]

লক্ষ্য। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌, কর্ণ ও মন এই কয়টি ইন্দ্রিয় লক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয়। নাসিকা হইতে ত্বক্‌ পর্য্যন্ত চারিটি লক্ষ্যের কোন গুণই প্রত্যক্ষযোগ্য নহে সুতরাং উহাদিগের বিশেষগুণ[৪] গুলিও অপ্রত্যক্ষ। কর্ণে শব্দ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ গুণ নাই। মনে বিশেষগুণ একেবারেই নাই। অতএব লক্ষ্য সমূহ শব্দ ব্যতীত বিশেষ-গুণ শূন্য হওয়ায় উহাতে লক্ষণের বিশেষণভাগ[৫] রহিয়াছে।

কর্ণ পর্য্যন্ত পাঁচটি লক্ষ্যবস্তু মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াই স্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে। মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্যই স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় লক্ষণের বিশেষ্য ভাগও উহাতে বিদ্যমান থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল।

যদি বিশেষণভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বিশেষ্যভাগকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা যায় তবে বৃক্ষপ্রভৃতি দ্রব্যও চক্ষুরশ্মির সহিত স্বীয় সংযোগের দ্বারা প্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় অলক্ষ্য বৃক্ষাদি বস্তুতে লক্ষণ সমন্বয় হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এজন্য লক্ষণে বিশেষণ ভাগের প্রয়োজন। ফলে বৃক্ষাদি দ্রব্যে প্রত্যক্ষযোগ্য রূপ, স্পর্শ ইত্যাদি বিশেষ গুণ থাকে বলিয়া উহারা শব্দ ভিন্ন প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষ গুণ শূন্য নহে, সুতরাং উহাতে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না।

১। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় ও সম্বন্ধের বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

২। জৈনমতে চক্ষু ও কর্ণের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

৩। 'শব্দেতরোদ্ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বং ইন্দ্রিয়ত্বং' মুক্তাবলী।

৪। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, শব্দ, জ্ঞান সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম ভাবনা (সংস্কার বিশেষ) ইহারা বিশেষগুণ। ইহাদের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৫। লক্ষণবাক্যস্থিত "এবংবিধ" কথাটির পূর্বভাগকে 'বিশেষণ' এবং পরবর্তী অংশকে 'বিশেষ্য' বলা হইতেছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

বৌদ্ধ সাহিত্যে উপনয়ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র. এম্. এ.

বৌদ্ধদিগের প্রমাণ্য ধর্মগ্রন্থসকল পালিভাষায় রচিত। ত্রিপিটকের অন্যতম বিনয়পিটকেই তাঁহাদিগের উপনয়ন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাওয়া যায়। অবেস্তীয় উপনয়ন প্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, পার্শীদের দুইটী উপনয়ন হইত[১]। বৌদ্ধ সঙ্ঘভুক্ত হইবার জন্য প্রব্রজ্যা (পালি--'পব্বজ্জা') নামক উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইত। বস্তুতপক্ষে ইহা পরবর্তী 'উপসম্পদা' দীক্ষারই প্রাথমিক অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্মে শিশু উপনয়নের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নতম বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে গুরুগৃহে গিয়া গুরুর তত্ত্বাবধানে দ্বাদশ (কিংবা তদূর্ধ্বসংখ্যক) বৎসর বাস করিতে হইত। এই জন্যই গুরুর আশ্রম বাসী ছাত্রকে বলা হইত অন্তেবাসী। 'প্রব্রজ্যা'-গ্রহণ করার অর্থও অনুরূপ। সাংসারিক জীবন হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাস বা সঙ্ঘ-জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রব্রজ্যার অর্থ। কোনও বৌদ্ধ মঠে গিয়া আচার্যের অনুগত হইয়া ব্রহ্মচর্যপরায়ণ প্রব্রজিত বৌদ্ধবালক দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যার্থি-জীবন যাপন করিত। নিম্নতম বয়স বৌদ্ধ সাহিত্যে আট বৎসর। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রত্যেক ধর্মেই উপনয়নের বয়স যথাসম্ভব কমাইবার দিকে দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মাণ্য ধর্মেও ব্রাহ্মণশিশুর জন্য আট বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রব্রজিত বৌদ্ধ বালককে বলা হইত 'শ্রামণের' ('সামণের')। এইরূপে অন্তত কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত সংযত জীবন যাপন অবশ্য করণীয় ছিল।

প্রব্রজ্যা উপনয়নের অনুষ্ঠানে বিশেষ কিছু আড়ম্বর ছিল না। মুণ্ডিত মস্তক বালক (অথবা কখনও কখনও অধিক বয়স্ক লোক) পীতবস্ত্র খণ্ড লইয়া মঠের কোনও আচার্যের নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা লইবার ইচ্ছা জানায়। তদনুযায়ী তিনি তাহাকে সেই বস্ত্র পরিধান করাইয়া দীক্ষা দেন। তারপর ত্রিশরণ মন্ত্র [বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি; ধর্মং শরণং গচ্ছামি; সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"] আবৃত্তি করাইয়া দশটী বিষয়ে (পালি—দস সিক্‌খাপদানি') অবহিত থাকিতে উপদেশ দেন। অহিংসা, অস্তেয়, সত্যকথন, আমোদপ্রমোদ ও গন্ধানুলেপন হইতে বিরতি, উচ্চাসন বা উচ্চশয্যায় অবস্থান না করা, স্বর্ণ-রৌপ্য কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ না করা, অকাল ভোজন এবং মাদকদ্রব্য সেবন ত্যাগ, এবং পবিত্র আচরণ—এই গুলিই সেই দশটী শিক্ষা।[২] এক কথায় গৃহ্যসূত্রে এবং স্মৃতিগ্রন্থে আমরা

১। শ্রীভারতী—১৩৪৬, পৌষ।

২। "বর্জয়েন্মধুমাংস গন্ধমাল্যদিবাস্বপ্নাঞ্জনাভ্যঞ্জন-যানোপানচ্ছত্র-কামক্রোধ-লোভ-মোহ-বাদ-বাদন-স্নান দন্তধাবন-হর্ষ-নৃত্ত-গীত-পরিবাদ-ভয়ানি।"—গৌতম ধর্মসূত্র, ২. ১৯.

ব্রহ্মচারীর জীবনে যে সকল কঠোরতা দেখিতে পাই, তাহাদেরই অনুবৃত্তি। ইহার পর হইতেই আচার্যের তত্ত্বাবধানে তাহার জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। প্রব্রজ্যা না হইলে উপসম্পদার অধিকার লাভ হয় না।

'উপসম্পদা' কথাটীর অর্থ 'প্রবেশ' অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা। কুড়ি বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দীক্ষা দেওয়া হইত না। প্রব্রজ্যার সহিত বৈদিক উপনয়নের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও উপসম্পদা একেবারেই ভিন্নরূপ। বৈদিক ধর্মে বিদ্যার্থী গুরুগৃহে শিক্ষান্তে স্নাতক হইয়া গৃহস্থ হইত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের নিয়ম অন্যরূপ। প্রব্রজিতের পরের অবস্থাই উপসম্পন্ন ভিক্ষুত্ব।[১] অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের পরেই সন্ন্যাস জীবনের বিধান। প্রাচীন বৈদিকধর্মে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য—এই দুই অবস্থা অতীত হইলে তবে বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস হইবে, ইহাই নিয়ম ছিল। অবশ্য উত্তরকালের উপনিষদে বিপরীত ভাবও পাওয়া যায়। যেমন, জাবালোপনিষৎ বলেন, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ", অর্থাৎ যখনই বৈরাগ্য আসিবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এই সকল গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের ছায়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

উপসম্পদার দশ বৎসর পরে স্থবিরত্ব [পালি-'থের'] প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ তখন হইতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মশিক্ষকের (উপাধ্যায়) আসন গ্রহণ করিতে পারেন। সঙ্ঘভুক্ত প্রায় সকলেই শ্রমণ ('সমণ'), ভিক্ষু (ভিক্‌খু) বিশেষত শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ (সাক্যপুত্তিয় সমন') – এই সকল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

উপসম্পদা অনুষ্ঠানের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। এই দিনে ভগবান তথাগতের জন্ম, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, এবং পরিনির্বাণ হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধগণের নিকট দিনটী বড়ই পবিত্র। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটী সমিতিতে অধ্যক্ষের সম্মুখে আচার্য উপসম্পদা-কামী শিষ্যকে উপস্থাপিত করেন। সমিতির দুইজন সন্ন্যাসী তাহাকে নাম[২], ভিক্ষাপাত্র গুরুর নাম, ও পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অনন্তর তাহাকে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া অধ্যক্ষের সম্মুখে সমিতির মত লইয়া দীক্ষার্থীকে সত্যকথনের আদেশ দেন। তারপর, কুষ্ঠ, গণ্ড, অপস্মার প্রভৃতি রোগ তাহার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। উপসম্পদার্থী প্রশ্নের 'না'-সূচক উত্তর দিলে তাহাকে ক্রমাগত অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয় যথা—সে 'মনুষ্য' কিনা, 'পুরুষ' কিনা, 'মুক্ত' কিনা, অঋণী (পালি—অনণ; সংস্কৃত—অনৃণ) কিনা, পিতামাতা তাহাকে সন্ন্যাস লইবার অনুমতি দিয়াছেন কিনা ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের বিশেষ অর্থ রহিয়াছে। যদি সে সত্য সত্যই মানুষের মতন মানুষ হইতে চাহে, তবেই তাহার 'উপসম্পদা' হইতে পারে, নচেৎ নয়। ভগবান বুদ্ধদেব প্রথমে শুধু পুরুষের জন্যই সন্ন্যাসের বিধান

১। উপসম্পদা উপনয় গ্রহণ করিলে তাহাকে 'উপসম্পন্ন ভিক্ষু' বলে।

২। "কো নামাস্যাসৌ নামাস্মি–" ইতি শাট্যায়নকম্—বোধায়ন গৃহ্যসূত্র — ২।৫।২৫। :—"কো—নামাসীত্যুক্তো···নাম ব্রূয়াদসাবস্মীতি—গৃহ্যসূত্র ২।৪।১২।

দিয়াছিলেন। তারপর মুক্ত বা অঋণী কিনা, এই প্রশ্নের তাৎপর্য হইল, দীক্ষার্থী নিজের দায়িত্ব এড়াইবার ভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, না, আন্তরিকভাবেই উপস্থিত হইয়াছে। অথবা সংসারকে ফাঁকি দিয়া, তাহার পাওনা গণ্ডা না মিটাইয়া, সন্ন্যাসী সাজিলে সমাজে অনেক অনর্থের সূত্রপাত হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন।

এইভাবে পরীক্ষা শেষ হইলে অধ্যক্ষের নিকটে আসিয়া আচার্যদ্বয় প্রশ্নগুলির উত্তর বিজ্ঞাপিত করেন। তখন 'আগচ্ছহি' বা 'এহি' বলিয়া দীক্ষার্থীকে আহ্বান করা হয়। দীক্ষার্থী আসিয়া সমিতিকে সম্বোধন করিয়া তিনবার আবৃত্তি করে "মহাশয়গণ, আপনারা আমাকে উপসম্পদা দানে চরিতার্থ করুন, দয়া করিয়া দীক্ষা দিয়া আমাকে উন্নতাত্মা করুন ('উল্লুম্পেতু')।" তারপর সমিতির সম্মুখে পুনরায় পূর্বকথিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইলে অধ্যক্ষ দীক্ষা দান সম্বন্ধে সমিতির মত (ঞত্তি-ঞপ্তি) জিজ্ঞাসা করেন। যদি দীক্ষাদান অভিপ্রেত হয়, তবে সকলে নির্বাক হইয়া অবস্থান করেন এবং অধ্যক্ষ দীক্ষার্থীর অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। আপত্তি থাকিলে সন্ন্যাসীরা তাহা জানাইতেও পারেন। ইহার পরে সূর্যের ছায়া মাপা হয়, এবং অনুষ্ঠানের একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়।

তারপর চারিটী বিধি এবং চারিটী নিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। বিধিগুলি এইরূপ—ভিক্ষান্ন-ভোজন ('পিণ্ডিয়ালোপ-ভোজন'), পশুলোম-নির্মিত কম্বলের পরিচ্ছদ ধারণ ('পংসুকুলচীবর'), বৃক্ষমূলে বাস ('রুক্খ মূল সেনাসন,) ও গোমূত্রাত্মক ঔষধ সেবন ('পুতিমুক্ত-ভেসজ্জ')। নিষেধগুলি হইতেছে—মৈথুন ('মেথুনধম্ম'), চৌর্য ('অদিন্নাদান'—অদত্ত দ্রব্যের গ্রহণ), প্রাণি হত্যা ('পাণাতিপাত') এবং অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ('উত্তরি-মনুস্স-ধম্ম')। অবশ্য এই সকল বিধিনিষেধের বিকল্পও আছে। এই উপদেশেই উপসম্পদা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

জাপানী বৌদ্ধগণ উপসম্পদার অতিমানবীয় শক্তিদাতৃত্ব স্বীকার করেন, তবে এই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক পূর্ণতার জন্য তাঁহারা 'অভিষেক' করিয়া থাকেন। আচার্য উপনয়নার্থীর মস্তকে অভিষেকের জলধারা বর্ষণ করেন। ইহার গূঢ়ার্থ হইল জ্ঞানোদক দ্বারা শিক্ষার্থীর অজ্ঞান এবং পাপ নাশ। তাঁহারা এই উপলক্ষ্যে অত্যন্ত জটিল কতকগুলি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, উদ্দেশ্য হইতেছে কোনও অদৃশ্য শক্তির বলে শিক্ষার্থীর শরীর ও মনের নিগূঢ়, অলৌকিক পরিবর্তন। অভিষিক্তের নামকরণ তাঁহাদিগের মধ্যে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তান্ত্রিকতার প্রসারের ফলেই সেখানে এত অধিক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। নেপালের প্রব্রজ্যার অনুষ্ঠানগুলির সহিত জাপানীদিগের অভিষেকের অনুষ্ঠানসমূহের আংশিক ঐক্য রহিয়াছে। তথাপি নেপালী প্রথা বৈদিক উপনয়ন প্রথার অনুরূপ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, 'অভিষেক' কেবলমাত্র রহস্যবাদী বৌদ্ধদিগের মন্ত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

'উপসম্পন্ন' যথেচ্ছ বিহার করিতে পারেন না। কারণ 'স্থবির' হইতে তখনও দশ

বৎসর বাকী। 'উপাধ্যায়' (তাহার ধর্মশাস্ত্র অধ্যেতা বা শিক্ষক) এবং 'আচার্য' (তাহার দৈনন্দিন জীবনের সমুহ আচরণ শিক্ষাদাতা)—এই দুইজনের অধীনে উত্তরকালের দশটী বৎসর কাটাইতে হইত। মহাবগ্‌গ-গ্রন্থে [১.২৫—৩৩] উপাধ্যায় এবং আচার্যের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ রহিয়াছে। এখানে তাহাদের কর্তব্যের ভিন্নতা স্বীকার করা হয় নাই। আচার্যকে অনেক সময়ে 'কর্মাচার্য' বলা হয়। মনুসংহিতা [২.১৪৫] আচার্যকেই উচ্চতর সম্মান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্যে ইহাব বিপরীত। বিনয়পিটকে বুদ্ধদেব বিধান দিতেছেন— 'উপসম্পন্ন' 'আচার্যে'র অধীনে ('নিস্‌সয়') দশ বৎসর থাকিবে; এইরূপ করিলে সে অপরের উপসম্পন্ন-জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। হিন্দুধর্মের মত বৌদ্ধধর্মেও আচার্য ও উপসম্পন্ন পিতাপুত্রের ন্যায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। স্নেহ ও শ্রদ্ধার অভাব ঘটিলে কোন শিক্ষাই সার্থক হয় না, ইহা সাধারণ বুদ্ধিগম্য।

(২)

প্রাচীন ভারতের নাগরিক জীবন

শ্রীকালিকাপ্রসাদ দত্ত, এম্‌-এ.

প্রাচীন যুগের নাগরিক জীবনের পরিচয় দিতে হইলে সর্বপ্রথমে ঋষি বাৎস্যায়নের নাম স্মরণপথে আসে। তাঁহার রচিত 'কামসূত্রম্‌' গ্রন্থটী সুধীগণের কাছে অজ্ঞাত নহে। প্রাচীন যুগের সমাজের এক অপূর্ব আলেখ্য এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই পুস্তক পাঠে আনুমানিক খৃ° পূ° ১৭০০ বৎসর পূর্বের নর-নারীর জীবনরীতি, ক্রীড়া-কৌতুক, আচার-ব্যবহার এবং অন্তঃ-পুরচারিণীদের সুখ-দুঃখ প্রভৃতির কথা জানা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে ঐ প্রাচীন কালের নাগরিক জীবন অথবা বাবুয়ানার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক সমাজের—নর-নারীগণের জীবন-যাপন প্রণালীর সহিত প্রাচীনকালের বাৎস্যায়ন বর্ণিত সমাজের নাগরক-জীবনের এক আশ্চর্যরূপ সামঞ্জস্য আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনাটীর উল্লেখও বাদ পড়ে নাই। এখন স্বতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'নাগরক' কাহাদের বলা হইত এবং তাহাদের জীবনধারা কোন্‌ প্রণালীতে বহিত? বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"গৃহীতবিদ্যঃ প্রতিগ্রহজয়ক্রয় নির্বেশাধিপতৈরর্থৈরন্বয়াগতৈরুভয়ৈর্বা গার্হস্থ্যমধিগম্য নাগরক বৃত্তং বর্তেত" অর্থাৎ বিদ্যাভাস শেষ লইলে, গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করিবার পর প্রতিগ্রহ, বিজয়, ক্রয় ও ভৃতি (চাকুরী)—এই চারি প্রকার উপায় দ্বারা অর্জিত অর্থে, কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়ে বা ঐ উভয়বিধ অর্থ দ্বারা—সৌখীন জীবন-যাপন করার অপর নাম—"নাগরকবৃত্ত"। কেবল বিত্তশালী নাগরিকগণ এইরূপ জীবন-যাপন করিতে পারিতেন। সহরে বাস করিবার মত অবস্থা যাহাদের ছিল না, বাৎস্যায়ন ঋষি তাঁহাদের

সেইখানেই থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন, যথায় তাহার নিজবৃত্তির অনুরূপ অর্থোপার্জন করিতে পারে। "যাত্রাবশাদ্বা"! অর্থাৎ জীবিকা অনুসারে অবস্থান করা!

নাগরিকগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। উহা তিন প্রকারের, যথা—'বিট্', 'পীঠমর্দ' এবং 'বিদূষক'। "ভুক্ত বিভবঃ" অর্থাৎ সর্বস্ব খোয়াইয়া যাহারা কেবলমাত্র নাগরকগণের সেবা করিয়া জীবিকা উপার্জন করিত, 'বিট্' নামে তাহারা পরিচিত। প্রচলিত চতুঃষষ্ঠী কলায় পারদর্শী (কলাসু বিচক্ষণঃ), অথচ কপর্দকহীন—এমত অবস্থায় যাহারা উক্তবিদ্যা শিক্ষাদান করিত, 'পীঠমর্দ' নামে তাহারা অভিহিত। এবং যাহারা কেবলমাত্র দু'একটী বিষয়ে কৃতবিদ্য হইয়া (একদেশ বিদ্যস্ত ক্রীড়নকঃ) শুধু নাগরকগণের মনস্তুষ্টি অথবা গোপন কার্যের সহায়তা করিত, তাহাদিগকে 'বিদূষক' বা 'বৈহাসিক' বলা হইত।

এখন নাগরিকগণের বাসগৃহ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ইহা দুই মহলে বিভক্ত। (দ্বিবাসং গৃহং কারয়েৎ) ভিতর মহল অন্তপুরিকাদের জন্য এবং বহির্মহল গৃহস্বামীর নিজস্ব কার্যকলাপের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অতিথি অভ্যাগতেরা মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া থাকিতেন। গৃহসংলগ্ন 'বৃক্ষবাটিকা' বা উদ্যানগৃহ নাগরকের বাসগৃহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ ছিল। নানাজাতীয় ফল ও পুষ্পবৃক্ষ তথাকার শোভাবর্ধন করিত। আহারোপযোগী তরীতরকারী যাহাতে সেখানে উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থাও ছিল। উদ্যানের মধ্যস্থলে পুষ্করিণীটী শোভা বাড়াইত। বিচিত্র কারুকার্য সম্পন্ন 'হর্ম্য' ও 'প্রাসাদের' উল্লেখ কামসূত্রম্ গ্রন্থে আছে। দুই একস্থানে সমুদ্রগৃহের নামও পাওয়া যায়। জলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত বিলাসগৃহকে 'সমুদ্রগৃহ বলা হইত। সাধারণতঃ উদ্যানেই এইগুলি নির্মিত হইত। শয্যার পারিপাট্য বিষয়ে গৃহস্বামীর বিশেষ নজর ছিল। সুগন্ধিযুক্ত শয্যাটী পরিষ্কার আচ্ছাদনে আবৃত রাখা হইত। শিয়রদেশে প্রাচীরে পদ্মাকৃতি একটী কাষ্ঠের আসন ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। তাহার উপরে ইষ্টদেবতার মূর্তি স্থাপনা করিয়া পূজা করিতে বাৎস্যায়ন ঋষি উপদেশ দিয়াছেন। আবার শয্যার এক পার্শ্বে নির্মিত একটী ক্ষুদ্র বেদীর উপর রাত্রির উপযোগী প্রসাধন দ্রব্য যেমন—অনুলেপন, মাল্য, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল ইত্যাদি সাজান থাকিত। "তত্র রাত্রিশেষমনুলেপনং মাল্যং পিকৃথকরণ্ডকমং সৌগন্ধিকপুটিকা মাতুলুঙ্গত্বচস্তাম্বুলানিচ স্যুঃ" ভূতলে শয্যার নিম্নে পিক্‌দানিটী (পতদ্‌গ্রহঃ) থাকিত। ইহা ব্যতীত হস্তীদন্ত নির্মিত আধারে বীণা, চিত্রফলক, আঁকিবার জন্য রঙ্ ও তুলিকা এবং প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলী রাখা হইত। দাবা ও পাশাখেলার ছক দুটীও (আকর্ষফলকং দ্যুতফলকঞ্চ) বাদ পড়িত না! গৃহের বহির্ভাগে ক্রীড়ানিপুণ শুকসারির পিঞ্জরখানি, উদ্যানে ছায়াসঙ্কুল বৃক্ষতলে দোলনাটী (প্রেঙ্খাদোলা বৃক্ষবাটিকায়াং সচ্ছাছায়া) এবং পুষ্পমণ্ডিত বেদীখানি (স্থণ্ডিল-পীঠিকা সকুসুমেতি) প্রভৃতি নাগরকগণের ভবন বিন্যাসের সহায়তা করিত।

এইবার নাগরকগণের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী সম্বন্ধে কিছুবলা হইতেছে!

অতি প্রত্যুষে তাঁহারা শয্যাত্যাগ করিতেন। হস্তপদ প্রক্ষালন এবং দন্তধাবন

ইত্যাদি নৈমিত্তিক কার্যগুলি শেষ করিয়া তাঁহারা প্রসাধনে তৎপর হইতেন। অনুলেপন, সুগন্ধি এবং মাল্য দ্বারা দেহটীর শোভাবর্ধন করিয়া অলক্তকে (একরূপ লাল রঙ্) ঠোঁট্‌টী রাঙা করিতেন দর্পণে নিজের মুখটী দেখিয়া গন্ধযুক্ত মসলা বা কখনও পান চিবাইতে চিবাইতে স্ব স্ব কার্যস্থানে যাত্রা করিতেন (কার্যানুষ্ঠানুতিষ্ঠেৎ)! 'বাস' এবং 'উত্তরীয়' ছিল দেহের পরিচ্ছদ। অঙ্গুলিতে কেহ কেহ মূল্যবান অঙ্গুরীয় ধারণ করিতেন।

প্রাতঃকালীন কার্যাদি সমাপন করিয়া নাগরকগণ গৃহে ফিরিতেন। নিত্যং স্নানম্! প্রত্যহই তাঁহারা স্নান করিতেন। ইহা ভিন্ন অঙ্গমর্দন, ফেনক প্রয়োগ (সাবান ব্যবহার), ক্ষৌরকার্য সম্পাদান ইত্যাদি দেহ সৌষ্ঠবের নানা প্রক্রিয়া দিন বিশেষে সাধিত হইত। দিনে দুইবার—পূর্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে আহারের সময় নির্দিষ্ট ছিল। যব, গম, তণ্ডুল, দাইল, দুগ্ধ এবং শাকশব্জী ইত্যাদি তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। গুড়, শর্করা এবং মিষ্টান্নও (খণ্ডখাদ্যানি) তাঁহারা ভোজন করিতেন। অতীব আশ্চর্যের কথা এই যে ঋষি বাৎস্যায়ন কুত্রাপি তাঁহার গ্রন্থে মৎস্যের নাম করেন নাই, যদিও দু'একস্থানে মাংসের উল্লেখ আছে। নানারূপ পানীয় (পানকানি) যথা—মধু, সুরা, নানাবিধ ফলের রস প্রভৃতির নির্দেশও আছে। পানপাত্রকে "চষক্" বলা হইত।

দ্বিপ্রহরে কেহবা নিদ্রা যাইতেন। আবার কেহ নানারূপ ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত থাকিতেন। শুকসারির আলাপ শুনিয়া কিংবা মোরগ-ভেড়ার লড়াই দেখিয়া তাঁহারা কাল অতিবাহিত করিতেন। সন্ধ্যায় গীত বাদ্যাদির চর্চা হইত। (প্রদোষে চ সংগীতানি)! বলা বাহুল্য এই সকল কার্যে 'বিট্' 'পীঠমর্দ্দ' ও 'বিদূষক'গণ প্রধান সহায় হইতেন।

নাগরিকগণ আবার সময় বিশেষে কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এই সকল অনুষ্ঠানগুলি আনন্দ ও উল্লাসের তীর্থক্ষেত্র ছিল। সেগুলি যথাক্রমে—"সমাজ", "গোষ্ঠী", "আপানক", "উদ্যান যাত্রা" এবং "সমস্যাক্রীড়া" নামে অভিহিত। "পক্ষস্য মাসস্য বা প্রজ্ঞাতেঽহনি সরস্বত্যাভবনে -নিযুক্তানাৎ নিত্যং সমাজঃ!" প্রতি পক্ষে বা মাসে অথবা কোন নির্দিষ্ট তিথিতে, সরস্বতীর মন্দিরে নাগরকগণ মিলিত হইতেন। ইহারই নাম 'সমাজ'। কোন কোন 'সমাজে' ভিন্ন প্রদেশ হইতে নটনটীগণ আসিয়া যোগদান করিয়া নৃত্যগীত প্রদর্শন করিত। নিপুণতার পুরস্কার স্বরূপ উপযুক্ত পারিতোষিকও তাহারা পাইত। 'গোষ্ঠীর' সংজ্ঞা ভিন্নরূপ। গণিকাগণের আলয়ে, অক্ষশালায় কিংবা কোন বন্ধুর গৃহে 'সমান বিদ্যাবুদ্ধিশীলবিত্ত বয়সাং'—অর্থাৎ বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, অর্থ এবং বয়সে সমযোগ্য বন্ধুগণের মিলন আসরকে গোষ্ঠী বলা হইত। গোষ্ঠীবিহার নাগরকদের নিত্যকর্ম ছিল। এই গোষ্ঠীতে তাহারা অধীত বিদ্যার পারদর্শিতা দেখাইবার সুযোগ পাইতেন। কখনও বা পরস্পরের মধ্যে কাব্য ও কলা চর্চার (কাব্য সমস্যা কলা সমস্যা চ) প্রতিযোগিতা চলিত। কোন কোন সময়ে নারীগণ গোষ্ঠীতে যোগ দিতেন।

'আপানক' অর্থাৎ পানীয়ের যথারীতি আয়োজন। পরস্পরের গৃহে মধু, সুরা

ইত্যাদি পানীয়ের যে ব্যবস্থা করা হইত (পরস্পর ভবনেষুচাপানকানি) তাহাকে 'আপানক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'উদ্যানযাত্রা' তদানীন্তন সামাজিক জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল। উত্তম সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নাগরকগণ বন্ধুবান্ধব এবং গণিকাগণ সমভিব্যাহারে উদ্যান যাত্রা করিতেন। জলবিহার ইহারই অন্তর্গত। উদ্যানে নানারূপ ক্রীড়াকৌশল দর্শন করিয়া এবং যথেচ্ছা আহার ও বিহারে দিন কাটাইয়া তাহারা অপরাহ্নে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। চিহ্ন স্বরূপ উৎসবের পুষ্প বা মাল্য তাহাদের অঙ্গের ভূষণ হইত।

এতদ্ভিন্ন নাগরিকগণ সমবেতভাবে কতগুলি ক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। ইহার নাম 'সম্ভূয় ক্রীড়া' বা 'সমস্যা-ক্রীড়ার' ইহার বিশদ বিবরণ কামসূত্রম্ গ্রন্থে নাই। কৌমুদী জাগর (কোজাগর) হোলাকা (হোলিখেলা) এবং 'হিন্দোলোৎসব' (বসন্তোৎসব) প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

ইহাই হইতেছে প্রাচীন যুগের নাগরিক জীবনের বা বাবুয়ানার প্রকৃষ্ট পরিচয়। হাস্য-লাস্য, ক্রীড়াকৌতুক এবং আমোদ প্রমোদে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইত। সৌখীনতায় তাহারা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, প্রাচীন যুগের নাগরকগণ সর্বসময়ে এবং সর্বকার্যে এক বাঁধাধরা নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলিতেন, তাহা হইলে মহাভুল করিবেন। ব্যতিক্রম অবশ্যই ঘটিত।

(৩)

হিন্দু আইন সংগঠনে "ঠাকুর আইন বক্তৃতা"র স্থান

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এম্. এ., বি. এল্., কাব্যতীর্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পৃথিবীর উন্নততম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম। শিক্ষায় গবেষণায় ও পুস্তকপ্রকাশে ইহার সমকক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় নাই। ইহার সৃষ্টি সরকার কর্তৃক ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে হইলেও, ইহার বর্তমান শ্রীবৃদ্ধি পরলোকগত পুরুষসিংহ স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল। কিন্তু ইহার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি স্যর্ আশুতোষের চেষ্টায় হইলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি (১৮৫৭ খৃঃ) এবং স্যর্ আশুতোষের হস্তার্পণের (১৯০৬ খৃঃ) মধ্যের অর্দ্ধশতাব্দীতে দুইটি বিদ্যানুরাগী ভারতবাসীর অকুণ্ঠ অর্থদানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। প্রথমটি কলিকাতার বাঙ্গালী ও দ্বিতীয়টি বোম্বাইএর গুজরাটী। দুইজনেই দুই লক্ষ করিয়া টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্তটি ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর সময় উইলের দ্বারা ও শেষোক্তটি ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে ভারত সরকারের মারফত ঐ টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে মাত্র পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ছিল। স্যর্ আশুতোষের চেষ্টায় ইহা শিক্ষাদানকারী ও গবেষণাপরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দশ বার বৎসরের মধ্যেই ইহা ঐ দুইটি দানের সাহায্যে বিবিধ গবেষণার অনুকূলতা করিয়া, ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা পূর্বোক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দানসাহায্যে সম্পাদিত গবেষণার কথাই আলোচনা করিব। উক্ত মহাত্মা "ঠাকুর আইন অধ্যাপক" পদ সৃষ্টির জন্য মৃত্যুকালে দুই লক্ষের কিঞ্চিদধিক টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দানের ব্যবস্থা করিয়া উইল রাখিয়া যান। তাঁহার উইলের মর্ম এই :—

তাঁহার প্রদত্ত অর্থের সুদ হইতে বার্ষিক ১০,০০০৲ টাকা বেতনে এক এক বৎসরের জন্য "ঠাকুর আইন অধ্যাপক" নামক এক একজন অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে এবং প্রথম অধ্যাপকের নিয়োগ প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পরে অন্ততঃ এক বৎসরের মধ্যেই করিতে হইবে। ঐ অধ্যাপক কলিকাতা সহরের কোনো একস্থানে আইন সংক্রান্ত বিষয়ের একটি সমগ্র বক্তৃতারাশি ইংরাজী ভাষায় দিবেন। তাঁহার বক্তৃতাদানের ছয় মাসের মধ্যেই সেই বক্তৃতারাশি পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়া মুদ্রিত হইবে এবং ঐ মুদ্রণের ব্যয়ের জন্য প্রসন্নকুমারের অর্থের সুদ হইতে আরও ২০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের অন্ততঃ পাঁচশত কপি বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে।

ঐ অধ্যাপকের পদ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ঐ অধ্যাপক অন্ততঃ বারটি বক্তৃতা দিয়া থাকেন। দীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া প্রদত্ত, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববিধ ভারতীয় আইনের গবেষণামূলক বক্তৃতার নামাবলী আমি এই প্রবন্ধে দিব না। মাত্র প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু আইন সংগঠনে এই বক্তৃতামূলক পুস্তকগুলি কিরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রথমেই বলা দরকার যে "আধুনিক হিন্দু আইন" বলিতে হিন্দুর বিরাট্ ব্যবহারশাস্ত্রের অংশবিশেষ বুঝায়। এই "আধুনিক হিন্দু আইন" আবার বিবাহ, দত্তক ও উত্তরাধিকার এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। এই "আধুনিক হিন্দু আইন" ব্রিটিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ব্রিটিশ ভারতীয় সাক্ষ্যবিধির মত ব্যবস্থাপকসভার দ্বারা বিধিবদ্ধ আইন নহে। বেদ, স্মৃতি, সদাচার প্রভৃতি ইহার মূল। "স্মৃতি" বলিতে মূল সূত্র ও সংহিতা এবং টীকা ও নিবন্ধ সবগুলিকেই বুঝায়। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ন্যায় দুই একটি ক্ষুদ্র বিধিবদ্ধ আইন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন হাইকোর্টের ও বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, প্রাচীন সংস্কৃতভাষায় নিহিত হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, "আধুনিক হিন্দু আইনের" সৃষ্টি করিয়াছে। এই "আধুনিক হিন্দু আইন" সৃষ্টির ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঠাকুর আইন বক্তৃতা" যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু আইনের কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন :—

খৃস্টাব্দ	অধ্যাপকের নাম	বিষয়
১৮৭০—	হার্বার্ট কাওয়েল	—মাত্রহিন্দুদিগের উপর প্রযোজ্য হিন্দু আইন
১৮৭১—	ঐ	— ঐ
১৮৭৮—	ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	—হিন্দু বিবাহ ও স্ত্রীধনের আইন
১৮৭৯—	ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	—হিন্দু বিধবার আইন
১৮৮০—	রাজকুমার সর্বাধিকারী	—হিন্দু উত্তরাধিকার আইন
১৮৮৩—	ডাঃ জুলীয়াস্ জলি	—হিন্দু দত্তক, উত্তরাধিকার ও বিভাগের আইন
১৮৮৫—	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য	—হিন্দু যৌথ পরিবারের আইন
১৮৮৮—	গোলাপচন্দ্র সরকার	—হিন্দু দত্তকের আইন
১৮৯১—	প্রাণনাথ সরস্বতী	—হিন্দু চিরস্থায়ীদানের আইন (Hindu Endowments)
১৯০৪—	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	—হিন্দু অবিভাজ্য সম্পত্তির আইন
১৯০৫—	কিশোরীলাল সরকার	—হিন্দু আইনের মীমাংসাশাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যাপদ্ধতি
১৯০৯—	ডাঃ প্রিয়নাথ সেন	—হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম (Hindu Jurisprudence)
১৯১৭—	ডাঃ কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল	—মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মিল ও বিরোধ
১৯৩০—	ডাঃ রাধাবিনোদ পাল	—বৈদিক যুগে হিন্দু আইন

ইহার মধ্যে শেষের চারিটি ব্যতীত সবগুলিই "আধুনিক হিন্দু আইনের" অংশবিশেষ। এবং ইহাদেরই সারসঙ্কলন করিয়া ও কিছু আধুনিক বিচার-সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করিয়া, ইংরাজী ভাষায় "হিন্দু-ল" নামধারী বহু পুস্তকের উদ্ভব হইয়াছে, যাহা পড়িয়া আইনের ছাত্রগণ "হিন্দু-ল" নামক আইনের বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন ও উকীল ব্যারিষ্টারগণ বিচারপ্রার্থীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

আমাদের কথা

শ্রীভারতীর বর্তমান সংখ্যায় ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয়-লিখিত স্যার্ আলেক্জাণ্ডার কানিংহামের একটি জীবনী ও গ্রন্থপরিচয় আছে। যে সব পাশ্চাত্য মনীষি ভারতের শিক্ষা ও কৃষ্টির উৎকৃষ্ট অবদান জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, কানিংহাম সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। এই সব ব্যক্তির জীবনী ও কার্যাবলী আমরা ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করি।

* * * *

'গণেশ' ও 'ন্যায়প্রবেশ' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং 'বেদান্তদর্শনে'র 'অদ্বৈতবাদ' সম্প্রদায়ের আলোচনা বর্তমান সংখ্যায় শেষ হইল। 'মধ্য যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাব ও সাধনা' 'বিদ্যাপতির উপমা' ও 'বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র' এই তিনটী প্রবন্ধই আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত হইবে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। আগামী ২রা বৈশাখ শ্রীরামচন্দ্রের শুভ জন্মতিথি। ঐ দিনে যাহাতে পাঠকবর্গ রামচরিত আলোচনা করেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটি এইবারে প্রকাশিত হইল।

* * * *

লাহোরের 'বিশ্বেশ্বরানন্দ বৈদিক অনুসন্ধান সমিতি' সমগ্র বেদের একটী কোষগ্রন্থ সংকলন করিতেছেন। এই সমিতি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়। প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যে উক্ত কোষগ্রন্থ সংকলন করিয়া এই সমিতি সংস্কৃত গবেষণার পক্ষে একটী দীর্ঘ অনুভূত অভাবের সমাধান করিয়াছেন। এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীবিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী এম, এ., এম. ও. এল মহাশয়ের পরিচালনায় ত্রিশজন পণ্ডিতের সমবেত প্রযত্নে উক্ত সমিতির গবেষণা কার্য চলিতেছে। সমিতির পরিচালকমণ্ডল ডাঃ কিথ, রেণো, অর্টেল, রাধাকিষেণ, সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত এবং মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা প্রমুখ প্রাচ্যজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা গঠিত। এই সমিতি যেরূপ সুবৃহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেই কারণ এই সমিতি অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত সমিতির সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটী আবেদন-পত্র প্রচার করিয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধনী ও কৃতবিদ্য লোকমাত্রেরই এই সমিতিতে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। সমস্ত টাকাকড়ি সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি ও ধনী বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে ইহার কার্যে সহানুভূতি দানে অনুরোধ করি।

* * * *

এই মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের প্রবর্তক ও দাক্ষিণাত্যের শ্রীসম্প্রদায় বৈষ্ণবদের প্রবর্তক আচার্য শ্রীরামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনী

গত বৎসর শ্রীভারতীর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ঐ দিনে পাঠকবর্গকে তাঁহার পূতজীবনী আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

*　　*　　*　　*

যথাসময়ে, মূল ও অনুবাদ না পাওয়ায় প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রীভারতীর শেষভাগে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া বর্তমানে যে 'পরমাত্মসন্দর্ভ' প্রকাশিত হইতেছিল উহা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। আগামী সংখ্যায় উহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

*　　*　　*　　*

গত ইষ্টারের ছুটির সময় মান্দ্রাজের নিকটস্থ তিরুপতি নামক স্থানে All India Oriental Conference (নিখিল ভারত কৃষ্টি-সম্মেলন) হইয়াছে। ঐ সময়েই রামগড়ে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। আমাদের মনে হয়, এই প্রকার সম্মেলন যাহাদিগকে 'নিখিল ভারত' আখ্যায়িত করা হয়, তাহা যদি এক স্থানে সকলগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসী অনেকেই সেই স্থানে যাইয়া ভারতের জাতীয় সকল প্রকার কার্যের—ধর্ম, শিক্ষা, কৃষ্টি, রাজনৈতিক সামাজিক প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারেন। ভবিষ্যতে আমরা এবিষয়ে আমাদের মত বিশদরূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করি।

*　　*　　*　　*

১৯৪০ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রেল হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক গবেষণার জন্য Board of Scientific and Industrial Research নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিতেছেন। আমরাএই সঙ্ঘ কর্তৃক শিল্পের উন্নতিমূলক ব্যবস্থাপত্র শীঘ্রই আশা করি।

*　　*　　*　　*

গত ২৩শে ফাল্গুন তারিখে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ইহার বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দু সংগঠন সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন ঐগুলিকে আশু কার্যকরী করিবার জন্য সঙ্ঘকে অনুরোধ করি।

পুস্তক সমালোচনা

Unity through Religion—পুস্তকখানি ১৯৩৮ খ্রী'অব্দে মান্দ্রাজ নগরে অনুষ্ঠিত 'International Congress of the World Fellowship of Faiths' এর চতুর্থ অধিবেশনের কার্যাবলীর Report। উক্ত অধিবেশনের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শকুন্তলা শাস্ত্রী, এম. এ., বি, লিট. বেদতীর্থা কর্তৃক পুস্তকখানি কলিকাতা, ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৫০। মূল্য লেখা নাই।

পুস্তকখানির উপক্রমণিকায় উক্ত কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্দেশ্য, এবং কিরূপেই বা ইহার আরম্ভ হইল সেই বিষয়ের সামান্য পরিচয় আছে। প্রথম অধিবেশন হয় আমেরিকার চিকাগো সহরে ১৯৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দে। দ্বিতীয় অধিবেশন Sir Francis Younghusband-এর চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয় অধিবেশনও ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন ও অক্সফোর্ড দুই সহরেই অনুষ্ঠিত হয়। মান্দ্রাজ অধিবেশন সমিতির সভাপতি মনোনীত হন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি এই পুস্তকের 'মুখপত্রে' এই কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ অধিবেশনের মূলসভাপতি ছিলেন পিথাপুরমের মহারাজা। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান্, বৌদ্ধ, গৌড়ীয় মঠ, থিওজফিক্যাল সোসাইটী, জোরাষ্ট্রিয়ান্, রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মধর্ম ও শিখ ধর্ম সমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য পুস্তক মধ্যে বিভিন্ন প্রতিনিধিগণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার বিষময় আবহাওয়ায় এবং আন্তর্জাগতিক অবস্থার উপস্থিত পরিণতিতে আলোচ্য পুস্তকখানির যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা পুস্তকখানির পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। দেশের মঙ্গলের জন্য আমরা পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ১৩৪৭ সাল। ৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র এম্.এ., বি.এল. কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵১০ আনা।

আমাদের ধর্মকৃত্যের কালনির্দেশ আকাশস্থ গ্রহাবস্থান দ্বারা ও চন্দ্র সূর্যের অন্তরাত্মক তিথি দ্বারা হইয়া থাকে। পঞ্জিকা গ্রহাবস্থান গণনাদ্বারা উক্ত কালনির্দেশ করে বলিয়াই ভারতবাসী সকলেরই বিশেষতঃ হিন্দুদের নিকট ইহা নিত্য প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রকারদের উক্তি হইতে জানা যায় যে বিশুদ্ধরূপে আকাশস্থ গ্রহাবস্থান নির্ণয় করিয়া তদনুসারে পূজাপার্বণ ও যাত্রা বিবাহের কাল নির্দেশ করিবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তন্নির্দিষ্ট গ্রহাবস্থানের সহিত গগনের গ্রহগুলির

কোনই সম্বন্ধ নাই। এই অসামঞ্জস্য নিরাকরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল হইতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের তিথি নক্ষত্র ও গ্রহসঞ্চার প্রভৃতি গ্রহদর্শন দ্বারা পরীক্ষা করিলে সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইবে। ধর্মে আস্থাবান এবং সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক হিন্দুরই এই পঞ্জিকা ব্যবহার করা উচিত। এখনও যে কেন হিন্দু সাধারণ প্রত্যেকে এই পঞ্জিকা ব্যবহার করেন না ইহা আশ্চর্যের বিষয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

বিজয়িনী—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্. এ., পি-এচ্. ডি., ডি. লিট্. প্রণীত। কলিকাতা ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্‌স্থ মিত্র এণ্ড ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১০৩; মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দাসগুপ্ত একজন দেশ বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চস্তরের দার্শনিক কবি তাহা বোধ হয় সকলে জানেন না। বর্তমান কাব্যগ্রন্থখানি উহারই পরিচয় দিতেছে। বিজয়িনী ৪০টী কবিতার পুষ্পে শোভিতা। ভাষার ধরণ ও গাম্ভীর্য হইতে সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার ভাব কবি হৃদয়ের স্বাভাবিক কাব্যরসেরই পরিচয় দেয়। গ্রন্থখানি হৃদয়গ্রাহী। আমরা সাহিত্য প্রিয় কাব্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

প্রত্নতত্ত্ব

১। Annual Report of the Archæological Dept of H. E. H. Nizam's Dominions, 1935-36—2 Vols.

২। South Indian Texts Vol IX. Part I—Kannada Inscriptions from the Madras Presidency Edited by R. Sharma Sastry with the assistance of N. Lakshminarayan Rao.

ইতিহাস

৩। English Records of Maratha History—Poona Residency Correspondence. Vol 6. Poona Affairs, 1791-1801. Palmer's Embassy. Edited by G. S. Sardesai. বোম্বাই,

৪। Travancore: A Guide for visitors, containing various information regarding the Travancore State, with a number of illustrations and Maps.—E. G. Hatch. কলিকাতা.

৫। Political History of Ancient India: from the accession of Parikshit to the extinction of the Gupta Dynasty. Fourth edit. revised and enlarged —H. C. Roychowdhury, কলিকাতা.

ধর্ম ও দর্শন

৬। Bhedabheda, or the Philosophy between Sankara and Ramanuja, —P. N. Srinivasachari, মাদ্রাজ

৭। Vedic Religion and Philosophy—Swami Prabhavananda. মাদ্রাজ

৮। Eastern Religions and Western Thoughts—Sir S. Radhakrishnan

৯। Tattvasangraha of Sāntaraksita: with the commentary of Kamalasila. Translated into English by Ganganath Jha. 2 Vols,

রাজনীতি

১০। Hindus and Mussalmans of India—Atulananda Chakravarti. কলিকাতা,

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি. এল্ কর্তৃক সংকলিত

The Indian Antiquary, Vol III, 1874

The Nagamangala Copper Plates—Lewis Rice.

ইহাতে Coorg রাজগণের বিষয় বর্ণিত আছে। লেখক এই সকল তাম্রশাসনের শুদ্ধ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। কুর্গরাজগণের উপাধি ছিল 'বীর রায়'।

Note on the Bharahut Stupa—General Cunningham এর মতে Bharahut Stupa এর কাল অশোকের সময়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা খ্রীস্টজন্মের প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে।

The Gauja Agrahara Copper Plates—V. N. Narasimmiyengar, Bangalore:—এই সকল তাম্রশাসনের একটী অনুবাদ পূর্বে Indian Antiquaryর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধে ইহা আধুনিক সংস্কৃত অক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে।

The Ajanta Caves—Jas. Burgess M.R. A.S., F.R. G.S. ইহাতে অজন্তা-গুহা সকলের বিশদ বিবরণ আছে।

The Concluding Verses of the Second or Vākya-kāṇda of Bhartrihari's Vākyapadiya—Dr. F. Kielhorn, Deccan College.—Prof. Goldstucker and Weber, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থের যে অনুবাদ প্রকাশ করেন তাহাতে কতকগুলি শ্লোকের ভুল অনুবাদ দৃষ্ট হয়। বাক্যপদীয় গ্রন্থের দুইটি সংস্কৃত টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায়—একটী টীকা পুণ্যরাজ লিখিত, আর একটী হেলারাজ লিখিত। হেলারাজ কাশ্মীরের রাজা মুক্তাপীড়ের (ললিতাদিত্য) মন্ত্রী লক্ষ্মণের বংশধর ছিলেন। পুণ্যরাজের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণে ভর্তৃহরির কতকগুলি শ্লোক প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের স্থলে পুণ্যরাজ ও হেলারাজ কর্তৃক রচিত শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে। লেখক বাক্যপদীয় গ্রন্থের বিভিন্ন হস্তলিপি পুঁথি পরীক্ষা করিয়া বিলুপ্ত শ্লোকগুলির উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ শ্লোকগুলি পুণ্যরাজ লিখিত তাহাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

সাময়িক সাহিত্য—ফাল্গুন, ১৩৪৬

ধর্ম ও দর্শন

প্রবাসী—সঙ্গ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

,, —হঠযোগ ও রাজযোগ—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

ভারতবর্ষ—কর্মজ্ঞান ও শঙ্করাচার্য—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

,, —ধর্মের অপরিহার্যতা—অধ্যাপক শ্রীগিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক।

,, —বেদ ও ভারতীয় দর্শন—ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি,

উদ্বোধন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত—অধ্যাপক শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত।

উদয়াচল—সংসার-বৃক্ষ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন।

শিবম্—শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈত বেদান্ত—অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস

,, —অদ্বৈতবাদীর আত্মরক্ষা—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ

,, পঞ্চপ্রদীপ—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দগিরি।

সাহিত্য

প্রবাসী—বিজ্ঞানে কালের ধারণা—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি।

,, —পূর্ণের সাধনা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষ—ভারতীয় সঙ্গীত—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

,, —আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম—অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি-এস-সি,

,, —বাংলার চিত্রকলা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

উদ্বোধন—"যাহা ইচ্ছা হয় কর"—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

,, —বাঙলা অভিধানের উপাদান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম-এ,

,, —রাসায়নিক পরমাণুর গঠন ভঙ্গি—অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায় এম-এস্-সি।

,, —স্বামী বিবেকানন্দ---সার মরিস্ গয়ার (চিফ্ জাষ্টিস্ ফেডারেল কোর্ট)

বঙ্গশ্রী—মানবের নব অধিকার—সত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

উদয়াচল—ধর্ম ও বিজ্ঞানের ধাঁধা—শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার পি-এইচ, ডি।

বঙ্গশ্রী—মালদাহ-পরিচিতি—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা।

,, —সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

উদয়াচল—প্রাচীন ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য—ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন, এম-এ, পি-আর-এস।

বিবিধ

প্রবাসী—উড়িষ্যার অতীত যুগের বস্ত্রালঙ্কার---শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ—চক্রাবর্তন বনাম ক্রমবিকাশ—অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এস-সি ও অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম-এস-সি. বি-টি।

সাময়িক সংবাদ

বৌদ্ধ ত্রিপিটকের হিন্দি সংস্করণ—'সম্যুওনিকায়' একটী প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইবে। সিংহলের বৌদ্ধ মিঃ জে. জয়েরদেনের বদান্যতায় এইকার্য সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগদীশ কশ্যপ কর্তৃক এই গ্রন্থ অনূদিত হইবে।

তাজমহলের চূড়া ভগ্নপ্রায়—পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম আগ্রার তাজমহলের একটী চূড়া ভগ্নপ্রায় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভারতসরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ইহার সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ক্যাক্সটন হলের হত্যাকাণ্ড—লণ্ডনে ক্যাক্সটন হলে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আততায়ী মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্যর মাইকেল ও'ডায়ারকে হত্যা করার অভিযোগে মোহন সিংকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আবেদন—গত ২৬শে ফাল্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নৈহাটীস্থ সুসংস্কৃত বৈঠকখানা বাটীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। চাঁদাদাতৃগণের অর্থানুকূল্যে উক্ত বৈঠকখানার সংস্কার কার্য সুসম্পন্ন হইল। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তগণ এই তীর্থ সদৃশ ভবনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন। এই জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যূন ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সকল বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা ভাষী ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তগণের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তাঁহারা এই বিষয়ে মুক্তহস্ত হউন এবং যাঁহার যাহা সাধ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের নামে পাঠাইয়া দিবেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়—আকস্মিক দুর্ঘটনায় অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে সারা বাংলা দেশে বিষাদের ছায়া আপতিত হইয়াছে। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। বাংলার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে শক্তির সংবেদনায় জিতেন্দ্রলালের অবদান সামান্য নহে। জিতেন্দ্রলাল বাহিরে এইরূপ দৃঢ়চেতা হইলেও কোমল স্বভাবের মানুষ ছিলেন, ছাত্র সমাজের মধ্যে তাঁহার দানশীলতাও কম ছিল না। জিতেন্দ্রলালকে হারাইয়া বাংলা এমন একজন মানুষকে হারাইল, যাহার অভাব পূরণ হইবার নহে।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মহাপ্রয়ান—গত ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি ১-৪০ মিনিটে দীনবন্ধু সি. এফ্. এণ্ড্রুজ পরোলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভারতের একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু ছিলেন এবং ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একজন মাননীয় সদস্য (Honorary Fellow) ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ { বৈশাখ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ { নবম সংখ্যা

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম্. এ.

এই সকল আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারা যায় যে যেরূপেই হউক সুদাসের কতিপয় পুত্র তাহার অজ্ঞাতসারে নিহত হইয়াছিল এবং বিশ্বামিত্র এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহারই ফলে সুদাস বা তদীয় বংশধরগণ বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি্কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিয়াছিল। এই এক পুত্রের কথাই ব্রাহ্মণে দশ পুত্র এবং পুরাণে শত পুত্রে পরিণত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে সুদাস ও বিশ্বামিত্রের কলহ (বিশ্বামিত্র প্ররোচক বলিয়া) বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কলহে পর্যবসিত হইয়াছে।

সুদাস ও বিশ্বামিত্রের কলহ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে বিশ্বামিত্রের চক্রান্তে বশিষ্ঠ সুদাসের পৌরহিত্য হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্র ঐ পদ লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র সুদাস ও তদীয় বংশধরগণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছিলেন (R. V- I1I. 53. 6 etc)।

ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৫ ও ১৬ ঋকের ব্যাখ্যার অবসরে সায়ণ ষড়্‌গুরুশিষ্যের টীকা হইতে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—এই ঋকের সম্বন্ধে পুরাবিদ্‌গণ একটী আখ্যান বলিয়া থাকেন। রাজা সুদাসের যজ্ঞে বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি্ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের বাক্য সংহৃত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের বল ও বাক্য অভিভূত হইলে তিনি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জামদগ্ন্যগণ সূর্যের আবাস হইতে সসর্পরি নামক বাক্য আনয়ন করিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বাক্য কৌশিকের বাক্যের অবোধ্যতা দূর করিয়াছিল। ঐ সূক্তেরই ২১-২৪ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিতেছেন—এই মন্ত্রসমূহে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। পুরাকালে বিশ্বামিত্রের শিষ্য সুদাস নামে এক রাজর্ষি ছিলেন; তিনি কোনও কারণবশতঃ বশিষ্ঠের আক্রোশভাজন হইয়াছিলেন। তাহার শিষ্যের রক্ষার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। উপরি-উক্ত

আখ্যান সমূহ আমরা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহের মূলে যে কারণ আরোপ করিয়াছি তাহারই পোষক।

বিশ্বামিত্র কুশিকের পুত্র বা কুশিকগোত্রোৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বেদসার গায়ত্রী মন্ত্র এই বিশ্বামিত্রের নিকটই আবির্ভূত হইয়াছিল। ইনি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঋষি হইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিশ্বামিত্র ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে ইন্দ্র তুমি আমায় প্রজাপতি করিবে? তুমি আমায় ধনের অধীশ্বর করিবে? তুমি আমায় সোমপাতা ঋষি করিবে? (R. V. III. 43)। কুশিকবংশ যে যজ্ঞ-কার্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম মণ্ডলের দশম সূক্তে ইন্দ্রকে কৌশিক বলিয়া বলা হইয়াছে। এই কৌশিকের সহিত বিশ্বামিত্রের সংঘর্ষ এড়াইবার অভিপ্রায়ে অনুক্রমণিকাতে নিম্নলিখিত আখ্যানটী প্রদত্ত হইয়াছে। ইষীরথের পুত্র কৌশিক ইন্দ্রের তুল্য পুত্র পাইবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র গাধিরূপে তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বিশ্বামিত্রের ঋষিত্ব খ্যাপনই এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য। বেনফের মতে ইন্দ্র এই বংশের প্রধান দেবতা।

বিষ্ণুপুরাণের মতে বিশ্বামিত্র পুরুরবার অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ।* বিষ্ণুপুরাণে (৪।৭) এ গাধির জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ—কুশাম্ব ইন্দ্রের মত পুত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষায় উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। পাছে তাঁহারই মত বীর্যশালী আর একজন জন্মগ্রহণ করে এই ভয়ে ইন্দ্র নিজেই কুশাম্বের গৃহে গাধি নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুরাণে বিশ্বামিত্রের জন্ম বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ—

ভৃগুবংশের ঋচিকের সহিত গাধির কন্যা সত্যবতীর বিবাহ হইয়াছিল। ঋচিকের স্ত্রী ব্রহ্মণ্য সম্পন্ন পুত্র পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি একপাত্র চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় গুণযুক্ত পুত্র পাইবার জন্য সত্যবতীর মাতার জন্য আর এক পাত্র চরু প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সত্যবতীর মাতা পাত্র পরিবর্তনের জন্য কন্যাকে অনুরোধ করেন। সত্যবতী ঐরূপ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে ঋচিক তাহাকে তিরস্কার করেন। সত্যবতী স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তিনি যেন ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন পুত্র না পাইয়া পৌত্র পান এই প্রার্থনা করিলেন। মুনি বলিলেন "তথাস্তু"। কালক্রমে সত্যবতীর মাতা বিশ্বামিত্রকে এবং সত্যবতী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। এই জমদগ্নির পুত্রই ক্ষত্রিয় কুলনাশন পরশুরাম, ভৃগুবংশজাত বলিয়া তিনি ভার্গব।

হরিবংশেও ঠিক অনুরূপ আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় কৌশিককে বিশ্বামিত্রের

* পুরূরবা—অমাবসু—ভীম—কাঞ্চন—সুহোত্র—জহ্নু—সুমন্ত—অজক—বলা—কাশ—কুশ—কুশাম্ব—গাধি—বিশ্বামিত্র।

পিতামহ বলা হইয়াছে। এমতে দেবশ্রবা বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলে দেবশ্রবা ও দেববাত ভরত বংশীয় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। হরিবংশে দেববাত বলিয়া কাহারও উল্লেখ নাই, কিন্তু দেবরাত আছে। এই দেবরাত শুনঃশেপের অন্য নাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই শেষোক্ত কথাই বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে এবং হরিবংশের ২৭শ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রকে পুরুরবার তৃতীয় পুত্র অমাবসুর বংশধর বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু হরিবংশের ৩২শ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রকে জহ্নুর বংশধর বলা হইয়াছে। এইজন্য বিশ্বামিত্র অমাবসুর পুত্র নহে, কিন্তু পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর পুত্র। রাজা পুরু আয়ুর প্রপৌত্র।

ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডল হইতে দেখা যায় ভরতবংশীয়দের সহিত বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধ ছিল এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহাকে ভারত ও কৌশিক এই দুই নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে এবং হরিবংশে ভরতকে পুরু ও আয়ুর বংশধর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও হরিবংশের ৩২শ অধ্যায়ের অনুরূপ বংশাবলী দৃষ্ট হয়। উক্ত পর্বে বলা হইয়াছে ভরত বংশে অজমীর নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অজমীর পুরোহিতও ছিলেন এবং ইহারই বংশে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।* মিঃ রথ (Roth) তাঁহার অভিধানে বিশ্বামিত্রকে ভারত বলিয়াছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেপের উপাখ্যানে (VII-13-15) বিশ্বামিত্রকে ভরতবংশীয় এবং রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের ঔরস পুত্র নহে, কৃতক-পুত্র। দেবতার অনুগ্রহে জীবন পাইয়াছিল বলিয়া তাহার অন্য নাম হইয়াছিল দেবরাত। কাপিলেয় ও বাভ্রবেরা ইহারই বংশধর। ঋচিক বা শুনঃশপের বিশ্বামিত্র বংশে প্রবেশ একটী দেখিবার বিষয়।

পূর্বে বংশ দুই প্রকারে পরিগণিত হইত, বিদ্যাবংশ ও জন্মবংশ। বহুকাল পরে বিদ্যা-বংশ ও জন্মবংশে গোলযোগ উপস্থিত হইয়া বংশ তালিকায় গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে। কোথাও বিদ্যাবংশ ও জন্মবংশ যুক্ত হইয়া পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কোথাও বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যা বা জন্মবংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে এক তালিকা হইতে অন্য তালিকায় পুরুষের সংখ্যার বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। তবে ইহা স্থির তিনি ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন। এবং জামদগ্ন্যগণ ইহার আত্মীয় ছিলেন।

মহাভারতের আদি পর্ব হইতে জানা যায় যে দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের বংশে ভুমন্যু, সুহোত্র, অজমীর এবং জহ্নু ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জহ্নুর ব্রজন ও রূপী নামে দুই ভ্রাতা ছিল। ইহাদের বংশেই কুশিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের আখ্যান হইতে জানিতে পারা যায় যে বিশ্বামিত্র

* জহ্নু, সিন্ধুদ্বীপ, বলাকাশ্ব, কুশিক, গাধি, বিশ্বামিত্র।

হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে হোতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠও ঐ যজ্ঞে ব্রহ্মার পদে বৃত হইয়াছিলেন।

মহাভারতের আদি পর্ব হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে জহ্নুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঋক্ষের পুত্র সম্বরণের রাজত্বকালে রাজ্যে নানারূপ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা শত্রু দ্বারা পরাভূত হইয়া সিন্ধুনদীর তীরবর্তী একস্থানে সপরিবারে উপস্থিত হইয়া বহুদিন তথায় বাস করিয়াছিলেন। এক সময় বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলে তদানীন্তন রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন এবং হৃতরাজ্য লাভের জন্য বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং কৌশিকগণ পুনরায় স্বীয় রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিয়া সার্বভৌম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত উপন্যাস হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে কালক্রমে বশিষ্ঠ ও কৌশিক বংশধরগণের বিবাদ দূরীভূত হইয়াছিল এবং তাহারা পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। আরও দেখা যায় যে ইহারা আদি বশিষ্ঠ বা কৌশিক নহেন, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর মাত্র।

রামায়ণ হইতে জানা যায় যে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কু ইক্ষ্বাকুর ২৮শ পুরুষ, অম্বরীশ ৪৪শ, সুদাস ৪৯শ এবং দশরথ ৬০ষ্টি পুরুষ *। রামায়ণে অম্বরীশকে ত্রিশঙ্কুর সমসাময়িক বলা হইয়াছে এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই দশরথের সময় বর্তমান ছিলেন ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ যে তাহাদের বংশধর ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও অবসর থাকে না। নতুবা ইহাদের আয়ুঃকাল অসাধারণ স্বীকার করিতে হয়। বেদে আয়ু শতবর্ষ বলিয়া বলা হইয়াছে। শতের স্থানে হাজার হওয়া খুবই অসম্ভব।

ব্রাহ্মণ এবং সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির পৌরহিত্য করিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও পৌরহিত্য করিতেন। সুতরাং বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে। বেদে অবশ্য এরূপ কোন আখ্যান নাই, তবে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে বিশ্বামিত্রের নিকট গায়ত্রী মন্ত্রের আবির্ভাব এই সকল আখ্যানের মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে। গায়ত্রী দীক্ষাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ এবং বিশ্বামিত্র স্বীয় তপস্যা বলে গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে অন্যের পৌরহিত্য করিবার অধিকার নাই, মহাভারতের শান্তিপর্বেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাপতির উপমা

পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী ভূমানন্দ (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)

(গ) "উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ,
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ ।।"

অর্থাৎ শ্রীমতীর বক্ষস্থল কেশজালে আচ্ছাদিত হইয়াছে; মনে হয়, যেন কনক-মহেশ চামর দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

(ঘ) "কনক-মহেশ কামহু পূজল
যনি সুরনদী ধারে।"

অর্থাৎ পয়োধরস্পর্শী মুক্তামালা দেখিয়া কবি বলিতেছেন, যেন কামদেব গঙ্গাধারা দিয়া কনক-শম্ভুর পূজা করিতেছেন।

(ঙ) "চন্দনে চরচু পয়োধর,
গ্রীব গজ মুকুতা হার।
ভসমে ভরল জনি শঙ্কর,
শির সুরসরি জলধার ।।"

অর্থাৎ শ্রীমতীর পয়োধর চন্দন-চর্চিত; তাহার উপরে মুক্তাহার শোভা পাইতেছে; মনে হইতেছে যেন ভস্মলিপ্ত শঙ্করের মস্তক হইতে গঙ্গাধারা প্রবাহিত হইতেছে। মুক্তামালাকে গঙ্গাপ্রবাহ বলিয়া অবশ্য কালিদাসও বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির বর্ণনার নিকট তাহা নিষ্প্রভ। "কুমার সম্ভব" কাব্যে কালিদাস লিখিয়াছেন, মহাদেব পার্বতীর কণ্ঠে মুক্তামালা স্তনদ্বয়ের উপর দিয়া লম্বিত করিয়া দিলেন; সেই মালা মেরুগিরির শৃঙ্গদ্বয়ের উপরিস্থিত গঙ্গাপ্রবাহ-যুগলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল—

"তস্যাঃ স কণ্ঠেভিঘনস্তনং যাং,
ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীম্।
স চাপমেরুদ্বিতয়স্য মূর্দ্ধ্নি,
স্থিতস্য গঙ্গৌঘযুগস্য লক্ষ্মীম্ ।।"

৭। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যে-কবি যত অধিক অংশ সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি দেখাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার উপমার সৌন্দর্য ও গৌরব সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। চরণকে পদ্ম বলিয়া বর্ণনা, কবি অকবি সকলেই করিয়াছেন। গুরুজনদিগকে সামান্য একখানি পত্র লিখিতেও "শ্রীচরণকমলেষু" পাঠ লেখা হয়। কিন্তু এই উপমার এক অংশে অসঙ্গতি আছে—পদ্মের স্থিতি-স্থান জল, কিন্তু চরণের স্থিতি-স্থান স্থল। কালিদাস

এই অসামঞ্জস্যটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপমান ও উপমেয়ের এই অংশে সাদৃশ্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার "কুমারসম্ভব" কাব্যে, উমার চরণকে স্থলপদ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং,

স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্।"

অর্থাৎ উমা যখন গমন করিতেন, তখন বোধ হইত যেন ভূমিতলে স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন। বিদ্যাপতিও শ্রীমতী রাধিকার চরণকে স্থলপদ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রচনাভঙ্গী অধিকতর সুললিত। "দূতি সংবাদে" দেখি, দূতি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধিকার অবস্থা বর্ণনাকালে বলিতেছেন—

নয়নক নীর চরণতলে গেল

খলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল॥

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা মুখ নত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন; পূর্বে তাঁহার চরণ ভূমিতলে স্থলপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহার নিম্নদেশে নয়নবিগলিত বারিরাশি সঞ্চিত হওয়ায়, উহাকে জলপদ্ম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই ভাবের উপমাই বিদ্যাপতির বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা। এই ভাবের উপমা এ পর্যন্ত একটি মাত্র, একজন পাশ্চাত্য লেখকের পুস্তকে, দেখিয়াছি। এক নবীনা রমণীর রক্তিমাভ কপোলদেশ ভয়ে শ্বেত বর্ণ ধারণ করিল,—এই অবস্থা বুঝাইতে লিখিয়াছেন—

"Her roses turned into lillies."

৮। রূপ-বর্ণনায় বিদ্যাপতির অন্যান্য সুন্দর সুন্দর উপমাও দেখিতে পাই—

(ক) কুচযুগ উপর আনন হেরু

চান্দ রাহু ডরে চড়ল সুমেরু।

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর হইয়া আছেন, তাঁহার মুখ নত হইয়া স্তনের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, চন্দ্র যেন রাহুর ভয়ে সুমেরু পর্বতের উপর আশ্রয় লইয়াছেন।

(খ) নমিত অলকে বেড়লা

মুখকমল শোভে।

রাহু কি বাহু পসারলা

শশিমণ্ডল লোভে॥

অর্থাৎ মুখকমল নমিত অলকদ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে; মনে হয়, যেন রাহু শশিমণ্ডলের লোভে বাহু প্রসারিত করিতেছে।

(গ) কলস-কুচ লোটাইলি

ঘনশামরি বেণী।

কনয় পর শুতলি

জনি কারি নাগিনী॥

অর্থাৎ ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেণী গৌরবর্ণ কুচ-কলসের উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে ; বোধ হইতেছে, যেন সুবর্ণ-পর্বতের উপর কৃষ্ণা নাগিনী শুইয়া রহিয়াছে।

(ঘ)　কুচযুগ পর চিকুর খুলি পসরল
তা অরুঝায়ল হারা।
যনি সুমেরু উপর মিলি উগলল
চাঁদ বিহুন সবে তারা ॥

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার কুচ-যুগলের উপর কেশজাল এলাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে গলার মুক্তাহার জড়াইয়া গিয়াছে ; মনে হইতেছে, যেন সুমেরু পর্বতের উপর চন্দ্রবিহীন নক্ষত্ররাজি উদিত হইয়াছে।

(ঙ　কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা ॥
*　*　*
চিকুর গলয়ে জলধারা
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা ॥

অর্থাৎ, স্নানান্তে শ্রীমতী কেশ নিংড়াইতেছেন, কেশের ভিতর হইতে জলধারা পড়িতেছে ; মনে হইতেছে, বুঝি চামর হইতে মুক্তাহার খসিয়া পড়িতেছে, অথবা বুঝি ঘনমেঘ মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে।

(চ) উরুদেশকে কদলীতরুর সহিত উপমা অনেক কবিই দিয়াছেন। কিন্তু এই উপমায় একটু অসঙ্গতি আছে। কারণ, কদলী-কাণ্ড নিম্নদিকে স্থূল ও উর্ধ্ব দিকে ক্রমে সূক্ষ্ম, কিন্তু উরুদেশ উর্ধ্ব দিকেই স্থূল ও ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া নিম্নদিকে নামিয়াছে। বিদ্যাপতি এই অসঙ্গতি নিরাকরণ করিবার জন্যই শ্রীমতী রাধিকার উরুদেশকে "বিপরীত কদলীতনু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"বিপরীত কনক-কদলীতরু-শোভিত"

(ছ)　"গিম সক্রো নাবল মুকুতা হারে
কুচযুগ চকেব চরই গঙ্গাধারে ॥"

অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার গ্রীবাদেশ হইতে মুক্তাহার কুচযুগ স্পর্শ করিয়া নিম্নে গমন করিয়াছে ; মনে হইতেছে, যেন গঙ্গার কিনারায় দুইটি চক্রবাক চরিতেছে। কনক-শম্ভু ও চক্রবাক উপমান বোধ হয় বিদ্যাপতির নিজস্ব, কারণ অন্যত্র ইহাদিগের প্রয়োগ এ পর্যন্ত দেখি নাই।

৯। উপমা ছাড়াও বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদেই তাঁহার সাধারণ ও স্বাভাবিক লিপি-চাতুর্যের প্রমানও যথেষ্ট পাওয়া যায়। শ্রীমতী কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন ; তাঁহার চরণগতি এক্ষণে পূর্বের চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে স্থির ভাব

ধারণ করিয়াছে; অপর পক্ষে, লোচনদ্বয় ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। কবি এই অবস্থাটি বর্ণনা করিতে, বলিতেছেন—

"চরণ চপল গতি লোচন নেল।"

অর্থাৎ চরণের চপলতা এক্ষণে লোচন অধিকার করিল।

"শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল।"

* * *

"কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব
একক ক্ষীণ আওকে অবলম্ব।"

অর্থাৎ, যৌবনারম্ভে কর্ণের দিকের পথ লোচন অধিকার করিয়া লইল অর্থাৎ কটাক্ষ আরম্ভ হইল এবং শ্রীমতীর কটিদেশের গুরুতা এখন নিতম্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল, ও নিতম্বের ক্ষীণতা কটিতে সংযুক্ত হইল।

এক সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"তোমার দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্রীমতীর কোমল তনু সঙ্কুচিত ও ক্লিষ্ট হইবে ভাবিয়া যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। কারণ কেহ কি কখনও দেখিয়াছে যে, ভ্রমরের ভরে পুষ্প-মঞ্জরী ভাঙ্গিয়া পড়ে?"

"কোমল তনু পরাভব পাওব
তেজি ন যাইবি তেহুঁ।
ভমর ভরে কি মাঞ্জরী ভাঁগয়ে
দেখল কতহু কেহ॥"

শ্রীমতীর পয়োধরে নখচিহ্ন বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

"কুচযুগে দেখল নখ পরহারে
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥"

শ্রীমতী লজ্জায় নীলবসনাঞ্চল দিয়া নিজের মুখ আবরণ করিলেন; মনে হইল চন্দ্র যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশিত হইল না—

"আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই
বাদর ডরে শশী বেকত ন হোই॥"

মান অবস্থায় শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার সখীকে নিজের দুঃখ জানাইয়া বলিতেছেন—"হে সখি তুমি নিজেই মনে বিচার করিয়া দেখ, আমার সামান্য অপরাধের নিমিত্ত আমার প্রতি তাঁহার এই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা কি ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে? সামান্য নখ কৃন্তন করিতে কে কবে কুঠার লইয়াছে?—"

"সজনি অপনে মন অবধার
নখ ছেদনে কে লয় কুঠার"?

শ্রীমতী মনের দুঃখে সখীকে বলিতেছেন—"আমি চন্দন বৃক্ষ ভাবিয়া শিমুলবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম; ফলে তাহার কণ্টকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে—"

"চন্দন ভরমে শিমর আলিঙ্গন
সালি রহল হিয় কাঁটে ॥"

শ্রীমতী আরও বলিতেছেন—"আমি পূর্বে ত জানিতাম না যে, তাহার বাক্য মধুময় কিন্তু হৃদয় বজ্রসম। এখন বুঝিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ পয়োমুখ বিষকুম্ভ—"

"মধু সম বচন কুলিশ সম মানস
প্রথমহি জানি না ভেলা।"

* * *

"হিয় সম কুলিশ বচন মধুধার
বিষঘট উপর দুধ উপহার ॥"

সখী মানাচ্ছন্ন শ্রীমতীকে বলিতেছেন—"সৃষ্টিকর্তা প্রথমে সুবর্ণ দিয়া তোমার বদন সৃজন করিতে গেলেন, কিন্তু উহা কসিয়া যে বর্ণ দেখিতে পাইলেন তাহা তাঁহার মনোনীত হইল না, তাই তিনি উহাকে দূরে রাখিয়া, পূর্ণচন্দ্র দিয়া তোমার আনন সৃজন করিলেন ও সৃষ্টির পর যে টুকু অবশিষ্ট রহিল তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তাহা হইতেই নক্ষত্রের সৃষ্টি হইল—

"আনি পুনিমা শশী কনক খোত্র কসি
সিরজিল তুয় মুখ সারা।
যে সব উবরল কাটি নড়াওল
সে সবে উপজল তারা ॥"

সখী শ্রীমতীকে মান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—"দেখ সূর্যদেব কমলিনীর বন্ধু ইহা সকলেই জানে; আর জলই সেই কমলিনীর প্রাণ। অথচ, সূর্য-কিরণেই জল ও পঙ্ক শুকাইয়া যায় এবং তখন কমলিনীও শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় পরে আবার সেই সূর্যই আকর্ষিত জলকে মেঘে পরিণত করিয়া পুনরায় কমলিনীর উপর সিঞ্চন করে—

"দিনকর বন্ধু কমল সব জানয়,
জল তহি জীবন হোই।
পঙ্কবিহীন তনু ভানু শুখায়ত,
জলহি পটাওত সোই ॥"

সখী আরও বলিতেছেন—পুরুষের স্বভাব চঞ্চল; তুমি এখন তাঁহার প্রত্যাগমন-প্রত্যাশা ত্যাগ কর। দেখ, কূপ কখনও পথিকের নিকট আগমন করে না; পিপাসাতুর পথিকই জলপানের নিমিত্ত কূপের নিকট গমন করে। অতএব তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর—

"একহি বেরি তঞে দূর কর আশ
কূপ ন আবয়ে পথিকহি পাশ ॥"

সখী আশ্বাস দিয়া শ্রীমতীকে বলিতেছেন—যদিও শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের নিকট গমন করিয়াছেন, তথাপি তুমি জানিও, তুমি যেমন তাঁহার প্রতি অনুরক্ত, তাঁহার মনও সেইরূপ তোমাতেই আসক্ত রহিয়াছে। দেখ, চন্দ্র স্বকীয় স্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা সরোবরের যাবতীয় পুষ্পকে সমভাবে স্পর্শ করিয়া আপ্যায়িত করেন বটে, কিন্তু এ কথা কে না জানে যে, চন্দ্রই কুমুদিনীর ও কুমুদিনীই চন্দ্রের জীবন—

"যইঅও সরোবর হিমকর নিজ করে,
পরশয়ে সবহু সমানে।
কুমুদিনীকাঁ শশী শশীকাঁ কুমুদিনী,
জীবন কে নাহি জানে॥"

মানান্তে মিলনের পর শ্রীমতী নিজ সখীকে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আমার অজ্ঞাতসারে আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। আমি তখন একাকিনী ও আমার অঙ্গের বস্ত্রাদিও সুসংযত ছিল না। তাই লজ্জায় হস্তদ্বারা কুচযুগল আবরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আবরণ করা গেল না। মলয়পর্বত-শিখর কি কখনও তুষার দ্বারা সমগ্রভাবে আচ্ছাদিত হইতে পারে?

"করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥"

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বিরহিনী রাধা মনের দুঃখে বলিতেছেন—

"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিপাসা॥"

ভাবটি অতি সুন্দর।

একটি নূতন ধরণের পদ দেখিলাম। সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীমতী রাধিকার আগমনের কষ্ট-কাহিনী নানা ভাবে বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইতেছেন না। কবি তাই বলিতেছেন—

"কমল ন বিকস ভমর অনুরোধ।"

অর্থাৎ ভ্রমরের অনুরোধে কখনও পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না, যথাকালেই বিকশিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয়

(প্রত্যুত্তর)

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ.

মৎ-প্রণীত "ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ, শ্রীভারতীর গত বৈশাখ হইতে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। গণনাবহুল প্রবন্ধে দুই এক স্থানে কিছু ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যে সময়ে আমার প্রবন্ধ শেষ হইয়াছিল, সে সময়ে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে সময়মত শুদ্ধিপত্র দিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্রটী স্বীকার করিতেছি। ছাপার ভুল যাহা আছে, তাহা সহজেই শোধনীয়; কিন্তু গণনার ভুল যাহা আমার অশক্তিজনিত হইয়াছে, তাহার এখানে উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীভারতী সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
(১) আষাঢ়	৬৪৪	২৯	৯ই জানুয়ারি	১০ই জানুয়ারি
(১) ঐ	৬৫০	১৪	৭ই জানুয়ারি	৯ই জানুয়ারি
(৩) ঐ	ঐ	২৫	৮ই জানুয়ারি	১০ই জানুয়ারি

বলা বাহুল্য এই সকল ভ্রান্তি শুধু দিন বা তারিখ বিষয়কই বটে; ইহাতে কিছুই গুরুতর ভ্রান্তি নাই। গত ১৯৩৯ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে J.R.A.S.B.L.এ আমার Bharata Battle Traditions, Solstice Days in Vedic Literature, Madhu-Vidya or the Science of Spring এবং When Indra became Maghavan নামক প্রবন্ধ চতুষ্টয় প্রকাশিত হইয়াছে*। এই প্রবন্ধসকলের প্রথমটিতে এই সকল ভ্রম নিরসন করিয়াছি। J.R.A.S.B.L-এর ঐ সংখ্যার ৪০০ পৃষ্ঠার পাদটীকা এবং ৩৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমার গণনায় এতদতিরিক্ত অন্য কিছু ভ্রম হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমার বঙ্গভাষায় লিখিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধের শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কৃত আলোচনা বা প্রতিপ্রবন্ধ শ্রীভারতী পত্রিকার গত কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত লেখক "আলোচনা" শব্দদ্বারা "প্রতিকঞ্চুক" বা "দূষণ"ই মাত্র বুঝাইতেছেন। প্রবন্ধের যদি কিছু গুণ থাকে তাহার অপলাপ বা খণ্ডন করার চেষ্টাই করিয়াছেন।

আমি ভারতযুদ্ধকাল নিরূপণ করিতে গিয়া এ বিষয়ে তিনটী প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তীর উল্লেখ এবং সেগুলি বিভিন্নকাল-জ্ঞাপকভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। তারপর যুক্তিযুক্ত আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে ভারতযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, বরাহ লিখিত বৃদ্ধ গর্গোক্তমতানুযায়ী শকপূর্ব ২৫২৬ অব্দে বা ২৪৪৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দেরই ৪ঠা নবেম্বর হইতে ২১শে নবেম্বরের মধ্যে;

* উক্ত প্রবন্ধ চতুষ্টয়ের সারাংশ, "Nature" নামক (Science Journal) বৈজ্ঞানিক পত্রিকার ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪০, সংখ্যায় Research Section এর "Some Indian Origins in the Light of Astronomical Evidence" নামক প্রবন্ধকারে বাহির হইয়াছে —সম্পাদক।

অন্য দুইটী কিম্বদন্তী যাহার—প্রথমটীর প্রচার আর্যভট (৪৯৯ খ্রীঃ অব্দ) হইতে হইয়াছে যে ভারত যুদ্ধ শকপূর্ব ৩১৭৯ বা ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ঘটিয়াছিল, এবং দ্বিতীয়টী—যাহা পৌরাণিক এবং যাহাতে উল্লিখিত হয় যে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেচন পর্যন্ত ১০১৫, ১০৫০, ১১১৫, বা ১৫০০ বৎসর, তাহার একটিকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। আমার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমি এই সকল বিষয়ই অতি সূক্ষ্মভাবে এবং অপক্ষপাতে বিচার করিয়াছি। আমার সমালোচক বা প্রতিপ্রবন্ধলেখকের পদ্ধতি অন্য প্রকার।

শ্রীযুত ধীরেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য ভারত যুদ্ধকালকে আর্যভটীয় বা জ্যোতিষিক কল্যাদিতে স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে ভারত যুদ্ধকাল উক্ত প্রসিদ্ধ তিনটী কিম্বদন্তী দ্বারাই যে একই কাল, ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ অব্দ, ইহাই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া সত্যান্বেষণ সম্ভবপর হয় না।

প্রথমতঃ বরাহ লিখিয়া গিয়াছেন—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥

শ্রীযুত ধীরেন বাবু এই শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির "ষড্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন ২৫৫৬ (যাহার স্বাভাবিক অর্থ হয় ২৫২৬) এবং "শককাল" অর্থে "শাক্যকাল"। কিন্তু "শককাল" শব্দদ্বারা বরাহ অন্যত্র কোথায়ও যে "শাক্যকাল" বুঝাইয়াছেন তাহা দেখান উচিত মনে করেন নাই। এই ব্যাখ্যাকে ধীরেন বাবুর স্বকৃত অপব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। আমরা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায় কোথায়ও "শককাল" অর্থ "শাক্যকাল" পাই নাই। যাঁহারা জ্যোতিষিককল্যাদি ভিন্ন অন্য কোনও কল্যাদির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই এই প্রকার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সম্ভব বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। শ্রীযুত ধীরেন্ বাবু যিনি শ্রীভারতী পত্রিকার সর্বপ্রথম সংখ্যায় (১৩৪৫ সনের ভাদ্র সংখ্যায়) অনেক প্রকারের কল্যাদির আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার কিরূপে এই অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হইয়া অপব্যাখ্যার প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত।*

উৎপল বরাহকৃত বৃহৎ সংহিতার টীকাকার। তিনি শককাল ও যুধিষ্ঠিরকালের অন্তর ২৫২৬ বৎসর লিখিয়াছেন বলিয়া শ্রীযুত ধীরেন বাবু সেই পরলোকগত প্রবীণ জ্যোতিষীর প্রতি "মস্তিষ্ক দুর্বলতার" অপবাদ আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু উৎপলকে হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রানুশীলনপর ব্যক্তিরা সকলেই অতি সম্মানের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন; তাঁহার উপর এই অযথা কটূক্তি নিতান্তই অশোভন। তারপর আল্‌বেরুনীর উপরও কটাক্ষ এবং রাজতরঙ্গিনীকার কহ্লন পণ্ডিতের উপর অপাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন। এই সকল বিদ্রূপ বা কটূক্তি দ্বারা সত্যনিরূপণ হয় না। এস্থলে ভিন্ন মতাবলম্বীদের উক্তির সমর্থক যুক্তিকেই বিবেচনা

---

* শ্রীভারতী, কার্তিক, ১৩৪৬, ১৭১ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি।

বা আক্রমণ করিতে হইবে। গালাগালি দিলে যুক্তিখণ্ডন হয় না। কলিদ্বাপরসন্ধি ধীরেন্ বাবুর মতে যে ৩১০২ খ্রী° পূ° অব্দেই তাহা পরিশুদ্ধ নাও হইতে পারে।

Wilford, রামপ্রসাদ সেন, গোপাল আয়ার, শ্রীরামদেব, নারায়ণশাস্ত্রী এবং চিমন্‌লাল ভি. বৈদ্য এই কয়জনের মতে বরাহলিখিত "শককাল" শব্দে "শাক্যকাল" এই কথা শ্রীযুত ধীরেন বাবু নিজপক্ষ সমর্থনার্থ উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ যুক্তিকে Argumentum ad verecundium বলে। এস্থলে ইহাই বিবেচ্য ইঁহারা কেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন? ইঁহারা ৩১০২ খ্রী° পূ° অব্দ ভিন্ন অন্য কোনও কল্যাদি জানিতেন কি না? এই সকল উদাহরণ দ্বারা ধীরেন বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া সুদূর পরাহত।

ইহার পর ধীরেন্ বাবু মেগাস্থিনিস প্রভৃতি গ্রীকদূতগণের উক্তি যে ভারতীয়েরা Dionysius হইতে Sandracottus পর্যন্ত ১৫৩ জন রাজা গণনা করে, তাহা হইতে ভারতযুদ্ধ যে ৩১০২ খ্রী° পূ° অব্দে হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও কোন মূল্য নাই। ধীরেন্ বাবু কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্বক স্থির করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত ১৩৮ জন রাজা ছিলেন, এবং তাহাদিগের গড়ে ২০ বৎসর রাজ্যকাল ধরিয়া ২৭৬০ বৎসর এবং তাহার সঙ্গে ৩২৬ খ্রী° পূ° অব্দ যোগ করিয়া ৩০৮৬ খ্রী° পূ° অব্দে শ্রীকৃষ্ণের কাল আনিয়াছেন; তারপর আরও কিছু নাড়াচাড়ি করিয়া ৩১০২ খ্রী° পূ° অব্দের নিকট উহাকে ফেলিয়াছেন। এরূপ করিয়া ভারতযুদ্ধ কালকে ৩১০২ খ্রী° পূ° অব্দে স্থাপন সম্ভবপর নহে। এস্থলে ধীরেন্ বাবু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন (১) এই ১৩৮ জন রাজা কি পর পর একই মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, (২) শ্রীকৃষ্ণ কি কখনও রাজা ছিলেন, (৩) শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব দ্বারকার রাজা ছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তমৌর্য মগধে রাজা ছিলেন, অতএব এই ১৩৮ জন রাজা, তাহাদের সংখ্যা ঠিক্ হইলেও একই দেশে রাজা ছিলেন কি না? (৪) যদি বিভিন্ন দেশে রাজ্য করিয়া থাকেন তবে ১৩৮ জনের কতজন সমসাময়িক ছিলেন? (৫) আমাদের পুরাণাদিতে এইরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থক কিছু পাওয়া যায় কি না? সুতরাং এই উক্তির দ্বারা ভারতযুদ্ধ কালকে জ্যোতিষিক কল্যাদিতে স্থাপন করার প্রচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

মহাভারতীয় কল্যাদি ও কলিযুগ আলোচনা করিতে গিয়া আমি বেদাঙ্গীয় যুগপ্রবর্তক মাঘ মাসের আরম্ভকাল নির্ণয় করিয়াছি, এই মাস ১৯২৪ খ্রী° অব্দে হইয়াছিল; এবং ভারতযুদ্ধ বৎসর বা ২৪৪৯খ্রী° পূ° অব্দ, বর্তমান কালের ১৯২৯ খ্রী° অব্দের সদৃশ এইজন্য ২৪৫৪ খ্রী° পূ° অব্দের ৯ই-১০ই জানুয়ারি মাঘী পূর্ণিমা দিবস হইতে মহাভারতীয় কল্যাদি স্বীকার করিয়াছি। ঐ দিবসে যুগাদি মাঘী পূর্ণিমা ও উত্তরায়ণারম্ভ একই দিনে সংঘটিত হইয়াছিল। ২৪৫৪ খ্রী° পূ° অব্দের পাঁচ বৎসর পর বেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পঞ্চবৎসরাত্মক যুগ শেষ হয়। এইজন্য ২৪৪৯ খ্রী° পূ° অব্দ বা ভারতযুদ্ধবর্ষকেও কল্যাদিরূপে গ্রহণ করা চলে। এই ২৪৫৪ খ্রী° পূ° অব্দ হইতে ভাগবতামৃতমতে ২০০০ বৎসর পরে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিকাল ৪৫৪ খ্রী° পূ° অব্দ

আইসে। ইহাকেই আমি মহাভারতীয় কল্যব্দ গণনার নিদর্শন স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু ধীরেন বাবু জ্যোতিষিক কল্যাদি ৩১০২ খ্রী° পূ° হইতে ২০০০ বৎসর গণিয়া ১১০২ খ্রী° পূ° অব্দে পৌছিলেন, কিন্তু কোনও বুদ্ধের নাগাল ধরিতে না পারিয়া ৮৫০ খ্রী° পূ° অব্দে কণক মুনি বুদ্ধের সন্ধান পাইলেন। ধীরেন বাবু ভুলিয়া গেলেন যে একমাত্র যে বুদ্ধদেব কীকট দেশে প্রকাশ পাইয়াছিলেন তাহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতে এবং ভাগবতামৃতে বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কনক মুনি বুদ্ধকে কোনও হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করে না। তারপর আমি যে মহাভারতীয় কল্যাদি গণনার দ্বিতীয় উদাহরণ পঞ্জিকা হইতে দিয়াছি, তাহাতে যে কলিতে যুধিষ্ঠির হইতে সেন বংশ পর্যন্ত ৩৬৯৫ বৎসর কালান্তর লেখা আছে এই রাজগণের শেষ রাজা বল্লাল সেন বলিয়া পূর্বে লিখিত হইত। ইহা আমার বয়স যখন ১২ কিম্বা ১৩ ছিল তখন দেখিয়াছি। আমাদের নিকট ১৮০৯ শাকের নন্দলালদে'র পঞ্জিকা আছে তাহাতে ইহা এখনও দেখাইতে পারি ; তবে বাক্যটী অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ বাক্যটী এখন আর পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহস্থল।* ২৪৫৪ খ্রী° পূ° হইতে ৩৬৯৫ বৎসর গণিয়া আসিলে ১২৪৬ খ্রী° অব্দ আইসে। ইহা সেনবংশের অবসানকাল। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা এস্থলে ধীরেন্ বাবু অন্যরূপ বুঝিয়াছেন, পরে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য পঞ্জিকার গোঁজামিলকে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ করিয়া সত্যকে অপলাপ করা নিতান্তই দূষণীয়।

এই অগ্রহায়ণ সংখ্যারই শেষভাগে ধীরেন বাবু আমার গণনার কিছু কিছু ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার যাহা ভ্রান্তি হইয়াছিল তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়াছি তদতিরিক্ত অন্য কোনও ভুল আমার হয় নাই। আমি পত্রিকান্তরে New style অর্থে Gregorian style বুঝাই নাই ; তদপেক্ষা শুদ্ধতর style বুঝাইয়াছি, তাহা আমার লেখা হইতে সহজেই বুঝা যায়, দুঃখের বিষয় ধীরেন্ বাবু তাহা সম্যক বুঝিতে পারেন নাই। এই সংখ্যার সর্বশেষে ধীরেন্ বাবু ৩১০৩ খ্রী° পূ° অব্দের ১৫ই জানুয়ারি কুরুক্ষেত্রকাল ভোর ছয়টায় সায়ন সূর্যস্পষ্ট ২৭১°.৩ এবং সায়নচন্দ্রস্পষ্ট ৮৯°.৪ পাইয়াছেন এমত লিখিয়াছেন। তিনি বলিতে চান্ যে এই দিন পূর্ণিমা ও উত্তরায়ণারম্ভ উভয়ের সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ধীরেন্ বাবুর গণনা হইতে পাওয়া যায় যে উত্তরায়ণারম্ভ পূর্ব দিনই হইয়াছিল। তারপর ইহা মাঘীপূর্ণিমা মোটেই ছিল না। এই ৩১০৩ খ্রী° পূ° অব্দ তিথিনক্ষত্রানুসারে ১৯৩৪ খ্রী° অব্দেরই সদৃশ ছিল। এই পূর্ণিমা ১৯৩৪ খ্রী° অব্দের ১লা মার্চ তারিখের পূর্ণিমার সম্পূর্ণ সদৃশ। পূর্ণিমান্ত উভয়স্থলেই পূর্বফল্গুনী তারার (δ Leonis এর) অতি সন্নিহিত স্থানই হইয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রী° অব্দের ১লা মার্চের পূর্ণিমা এবং ৩১০৩ খ্রী° পূ° অব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখের পূর্ণিমা উভয়েই ফাল্গুনী ছিল উহা মাঘী পূর্ণিমা ছিল না। ইহাকে মাঘী পূর্ণিমা

* এই বিষয়ে ভারতবর্ষ পত্রিকার, ১৩৩৬ ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কৃত "পাঁজিতে ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের ৩৪২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং ৩৪৩ পৃ। দ্রষ্টব্য।

বলিয়া বুঝাইবার প্রচেষ্টা সর্বাংশেই অমূলক। এই পূর্ণিমা জ্যোতিষবেদাঙ্গমতে বা বৈদিকমতেও ফাল্গুনীপূর্ণিমা ব্যতীত মাঘীপূর্ণিমা হয় না।

তারপর ধীরেন্ বাবুর শ্রীভারতীর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের আলোচনা করা যাইতেছে। Pargiter তাঁহার Dynasties of the Kali Age গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটী একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে এইভাবে পাইয়াছেন—

যাবৎপরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
তাবদ্ বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্রয়ম্॥

এস্থলে ধীরেন্ বাবু "পঞ্চশতোত্রয়ম্" এই অশুদ্ধ পাঠকে শুদ্ধরূপে পড়িতে হইলে "পঞ্চশতোত্তরম্"ই পড়িতে হয় তাহা ত্যাগ কথিয়া এক অপপাঠ "পঞ্চশতত্রয়ম্" পড়িয়াছেন। শ্লোকের তৃতীয় চরণে "সহস্র" এককের ব্যবহার হইয়াছে তাহার পর তদপেক্ষা ছোট এককের সাহায্যে বৃহত্তর সংখ্যা জ্ঞাপন যে রীতি বিরুদ্ধ তাহা ধীরেন্ বাবু মানিবেন না।

পুরাণমতে দশজন শিশুনাগবংশীয় রাজা যে ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করেন লেখা আছে, তাহার অপলাপ করিয়া তাহাদের রাজ্যকালকে অন্যায় মতে ১৬৩ বৎসরে পরিণত করিয়াছেন; পরিক্ষিন্নন্দান্তরকে ২৫০০ বৎসরে এরূপ সিদ্ধান্ত পৌরাণিক বংশাবলী হইতে কোনও প্রকারেই আইসে না ও আনা সম্ভবপর নয়। ধীরেন্ বাবু পৌরাণিক উক্তির আংশিক অপব্যাখ্যা ও আংশিক লোপ দ্বারাই তাহার সিদ্ধান্ত সমর্থনের প্রয়াসী হইয়াছেন।

শ্রীভারতীর পৌষ সংখ্যার ২৮৮ পৃষ্ঠায় ধীরেন বাবু এক অভিনব মতাশ্রয় করিয়াছেন, যথা, "পূর্বফল্গুনী তারার আরম্ভ-স্থানই মঘানক্ষত্রবিভাগের অন্তস্থান"। ইহা নিতান্তই অশুদ্ধ কথা; বর্তমানে মেষাদি হইতে কৃত্তিকাতারার স্থান ৩৬° অংশে, মঘাতারার স্থান ১২৬° অংশে এবং চিত্রাতারার স্থান ১৮০° অংশে আসিয়াছে। তাহাতে মঘাদি মঘাতারার ৬ অংশ পশ্চাতে এবং মঘান্ত, মঘাতারার ৭°২০´ কলা অগ্রে। সুতরাং বর্তমানে মঘানক্ষত্র বিভাগান্ত পূর্বফল্গুনী তারা পর্যন্ত নহে, কারণ মঘাতারা এবং পূর্বফল্গুনী তারাদ্বয়ের অন্তর ১১°২৬´কলা। কোনও কালে মঘানক্ষত্র বিভাগান্ত যে পূর্বফল্গুনী তারার স্থানে ছিল না তাহা নিম্নপ্রদর্শিত সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রাচীনদিগ-কর্তৃক সমাদৃত সৌরচান্দ্রিক-পদ্ধতিক্রমে দেখাইতেছি। আমি তারার অবস্থান দ্বারা মঘাদি নিরূপণ করিব না, কারণ তাহা করিলে Fallacy of Idem per Idem বা যাহাকে চলিত কথায় Viscious circle বলে তাহাতে পতিত হইতে হইবে। আমাদের পদ্ধতিতে বিতণ্ডার স্থান নাই।

জ্যোতিষ বেদাঙ্গকালে যুগাদি মাসারম্ভের অমান্তকালে সূর্য ও চন্দ্র ধনিষ্ঠাদিতে একত্র হইত। তাহা হইলে এই যুগাদি মাঘারম্ভের প্রতিপদের চন্দ্র নক্ষত্র ধনিষ্ঠা ছিল। এইরূপ মাঘ বরাহোক্তি অনুসারে ২ শকেন্দ্রকালে* আসিয়াছিল, কারণ ২ শকেন্দ্রকালই

* আর্যভটের পূর্বে চৈত্র শুক্লাদি গণনা ছিল না। খরোষ্ঠী শিলালিপিতে পৌষী হইতে বৎসর আরম্ভ দেখা যায়। ২ শকেন্দ্রকাল মাঘসিতান্ত বলিয়া উহার প্রকৃত অর্থ চৈত্র শুক্লাদি শকাতীত বর্ষ ১ এবং চান্দ্রমাস ১০।

পৈতামহ সিদ্ধান্তের করণাব্দ। ২ শকেন্দ্রকাল খ্রী° অব্দ ৮০ বা আমাদের কালের ১৯৩৫ খ্রী° অব্দের সদৃশ। কারণ ১৯৩৫−৮০=১৮৫৫ এবং ১৮৫৫=১৬০×১১+১৯×৫।

এই ১৯৩৫ খ্রী° অব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি অমান্ত হয়, রাত্রি ঘ ১০।২১ কলিকাতা-সময়ে। অমান্তে সূর্যসায়নরাশ্যাদি ১০।১৩।৫৫ ছিল। মঘাদি হইতে ধনিষ্ঠাদি ১০৪০০ কলা বা রাশ্যাদি ৫।২৩।২০।

এই সায়ন সূর্যকেই ধনিষ্ঠাদি গ্রহণ করিতে হয়।

সুতরাং ১৯৩৫ খ্রী° অব্দের ধনিষ্ঠাদির সায়ন স্থান=রা ১০।১৩।৫৫

১৩ নক্ষত্র=রা ৫।২৩।২০

সুতরাং অন্তর দ্বারা মঘাদি সায়ন=রা ৪।২০।৩৫

১৯৩৫ খ্রী° অব্দে মঘা তারার সায়ন স্থান=রা ৪।২৮।৫৬

সুতরাং মঘা তারার স্বক্ষেত্রে স্থান = ৮°।২১´

এবং মঘা নক্ষত্র বিভাগের শেষ মঘাতারার =৪°।৫৯´ কলা অগ্রে।*

সুতরাং ধীরেন্ বাবুর মতানুযায়ী মঘানক্ষত্রের শেষ কখনও পূর্বফল্গুনীতারায় পৌঁছিতে পারে না। আমরা জ্যোতিষ বেদাঙ্গেই সর্বপ্রথম সমনক্ষত্র বিভাগের ব্যবহার পাইয়া থাকি। সুতরাং জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হইতে যে মঘাদি পাওয়া যায় তাহা হইতে অন্য মত নিতান্ত অগ্রাহ্য।

এক্ষণে যদি ১৯২৪ খ্রী° অব্দের মাঘ এবং ১৯৩২ খ্রী° অব্দের মাঘকেও যুগাদি মাঘ বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলে মঘা তারার স্থান যথাক্রমে স্বক্ষেত্রের ৭°।৬´ কলায় এবং ৫°।৩৬´ কলায় দাঁড়ায়।

এইরূপে ধীরেন্ বাবুর কল্পনা মঘা বিভাগান্ত যে পূর্বফল্গুনী তারা স্থানে তাহার সমর্থক কোনও যুক্তিই পাওয়া যায় না। তবে ধীরেন্ বাবুর দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদাই অন্যরূপ।

জ্যোতিষী মাত্রই অবগত আছেন যে মঘা তারাগামী অয়ন রেখা হইয়াছিল শুদ্ধরূপে ২৩৫০ খ্রী° পূ° অব্দে। পাণ্ডবকালে মঘানক্ষত্র শব্দ দ্বারা শুধু নক্ষত্রই বুঝাইত সুতরাং বৃদ্ধ গর্গবাক্য যে,—

"কলিদ্বাপর সন্ধৌতু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্"

এই বাক্য হইতে সূক্ষ্ম গণনায় ২৩৫০ খ্রী° পূ° অব্দেই আইসে। আমাকর্তৃক নিরূপিত ২৪৫৪ খ্রী° পূ° অব্দের ৯—১০ই জানুয়ারি তারিখ ঐ কাল হইতে ১০৪ বৎসর মাত্র পূর্ববর্তী। সুতরাং আমাদের নিরূপণই ঠিক, ধীরেন বাবুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা যে ৩১০৩ খ্রী° পূ° অব্দের কাল আসিয়াছে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক।

তারপর ধীরেন বাবুর আলোচনার যে অংশ শ্রীভারতী পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত

* এই ধনিষ্ঠাদি হইতে ধনিষ্ঠা তারার (β Delphinis) স্থান স্বক্ষেত্রের ১°।৩১´ কলায় এবং জ্যেষ্ঠাতারার স্থান স্বক্ষেত্রের ১°।৩৬´ কলায় পড়ে।

হইয়াছে, তাহাতেও তিনি স্বীয়বুদ্ধি প্রভাবে যেরূপ মহাভারতবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে ভারতযুদ্ধকাল নির্ণয়ের শ্রাদ্ধ যতদূর গড়াইতেছে তাহাই অগ্রে বিবেচনা করিতেছি। তিনি মহাভারত বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ভারতযুদ্ধ ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যা দিনে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ৯৬ দিন পরে ভীষ্মপ্রয়াণ এবং সম্ভবতঃ পূর্বদিনে উত্তরায়ণারম্ভ হইয়াছিল। আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে ১৯২৯-৩০ খ্রী° অব্দ তিথিনক্ষত্রানুসারে ভারতযুদ্ধ বৎসরের সদৃশ—এই বৎসরকে মান বৎসর ধরিয়া উত্তরায়ণ দিবস ইন্দ্র দৈবত অমাবস্যায় ৮০ দিন পরে উত্তরায়ণ স্বীকার করিয়া আমরা ২৪৪৯ খ্রী° পূ° অব্দ ভারতযুদ্ধ বর্ষ নিরূপণ করিয়াছিলাম। ধীরেন বাবুর সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা যুদ্ধবর্ষীয় অয়ন দিনকে আরও ১৫দিন পশ্চাদ্বর্তী করিতে হইতেছে। স্থূল গণনায় যদি ৭৪ বৎসরে ১দিন অয়নের অগ্রগমন ধরা যায় তবে এই ১৫ দিন অয়নাপসার জন্য নিরূপিত ভারতযুদ্ধবর্ষ আরও ১১১০ বৎসর পূর্ববর্তী হইয়া ৩৫৫৯ খ্রী° পূ° চলিল। অর্থাৎ ভারতযুদ্ধবর্ষ নিরূপণের শ্রাদ্ধ ৩১০০ খ্রী° পূ° অব্দ হইতেও ৫৫৯ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত গড়াইল। ধীরেন বাবুর এই সমস্ত উৎসাহের মধ্যে এ কথাও বুঝা উচিত ছিল যে ৯৬ দিনে ৩ চান্দ্রমাস এবং ৭৷৷০ দিন হয়। ভীষ্ম প্রয়াণের দিন মাঘ ছাড়িয়া ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমীতে পৌঁছিল।

এস্থলে নীলকণ্ঠ ও ধীরেন বাবু এই উভয়ের অপব্যাখ্যা সম্বন্ধেও দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মণ সাহিত্য, মহাভারতে এবং পুরাণে "পঞ্চাশত" শব্দ দ্বারা পঞ্চাশই বুঝায়, যথা—তৈঃ ব্রাঃ ২, ৭, ৫২ তে আছে "যে মে পঞ্চাশতং দদুঃ।" ঐঃ ব্রাঃ ১৮ অধ্যায় ৫ম খণ্ড, ১৯ ব্রাহ্মণে এক পঞ্চাশতং, দ্বিপঞ্চাশতং বা শম্বা মাধ্যে ইত্যাদি স্থলে ও একান্ন এবং বায়ান্ন বুঝান হইয়াছে। আমি যে শ্রীভারতী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় বৃহদ্রথ-বংশ বর্ণনা পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেও পঞ্চাশতং অর্থে ৫০ এবং অষ্টপঞ্চাশতং অর্থে ৫৮ বুঝায়। এস্থলে নীলকণ্ঠের অপব্যাখ্যা এবং ধীরেন বাবুর অপব্যাখ্যা উভয়েই বর্জনীয়। ভাষাকে জানিয়া পরে ব্যাখ্যা করিতে হয়। আগে ভাষার উৎপত্তি পরে ব্যাকরণের উৎপত্তি ইহা অস্বীকার করা যায় না।

তারপর ধীরেন বাবুর যুক্তি যে শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ণকে বলিয়াছিলেন "ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যায় যুদ্ধারম্ভ কর" অতএব ঐ ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যাতেই যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভিত্তিহীন। শ্রীকৃষ্ণবাক্য কখনও কর্ণ অনুসরণ করেন নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে করিবারও কোন বিশেষ কারণ নাই। কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষের বলসন্নিবেশ, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্যাদির সংগ্রহ করিতেও দেরী নিশ্চয়ই হইয়াছিল। এই সকল কার্যে আমাদের গণনায় ২১ দিন লাগিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে ভীষ্মদেবকে বলিয়াছিলেন "হে ভীষ্ম, আপনার জীবিত কালের আর ৫৬ দিন বাকী আছে" এই বাক্যকে আমি প্রাকৃত মনুষ্যের মতন উক্তি স্বীকার করিয়াছি তাহাতে কোনও অন্যায় করি নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়াই গীতা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অন্য সময়ে তিনি প্রাকৃত ব্যক্তির মতই জ্ঞানসম্পন্ন থাকিতেন এ কথা মহাভারতের

অশ্বমেধিকপর্বের ১৬শ অধ্যায়ে, অনুগীতা পর্বাধ্যায়ের প্রথমেই পাওয়া যায় যথা :—"পূর্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা কহিয়াছিলাম, তৎসমুদায় এক্ষণে আর আমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। এবং আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই সেই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্তন করিয়াছিলাম।" ইত্যাদি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারতানুবাদ।

এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বাক্যকে এইস্থলে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করাকে Argumentum ad Invidiam নামক অযৌক্তিক পদ্ধতি বলিয়া তর্কশাস্ত্রে বলে। শ্রীভগবান্ যখন সীমাবদ্ধ মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে প্রকৃত মানুষেরই মত জ্ঞান এবং কার্য স্বাভাবিক অবস্থায় হইবেই। তিনি যখন যোগযুক্ত হইয়া থাকেন সেই সময়েই তাঁহার জ্ঞান ও বাক্য নিতান্ত পরিশুদ্ধ হইতে পারে; অন্য সময় নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথিত ভীষ্মের দেহত্যাগ-সময়বিষয়ক উক্তিকে প্রাকৃত মনুষ্যের উক্তির মত গ্রহণ করা দূষণীয় নহে আমাদের মতে এই শ্রীকৃষ্ণবাক্য স্থানভ্রষ্ট অবস্থায় বর্তমান মহাভারতে আছে। এস্থলে আরও এক অপব্যাখ্যার উল্লেখ করিতে হয়। শল্যপর্বের ৩৫ অধ্যায়ের দুইটী শ্লোক এই :—

ততো মন্যুপরীতাত্মা জগাম যদুনন্দনঃ।
তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাযশাঃ॥ ১৩॥
মৈত্রনক্ষত্রযোগেন সহিতঃ সর্বযাদবৈঃ।
আশ্রয়ামাস ভোজস্তু দুর্যোধনমরিন্দমঃ॥ ১৪॥

এই শ্লোকদ্বয়ের স্বাভাবিক অনুবাদ এইরূপ হইবে :—

"তারপর মহাযশাঃ যদুকুলের আনন্দবর্ধন হলধর দুঃখ পীড়িতান্তঃকরণ হইয়া সরস্বতী-নদী তীরস্থ তীর্থযাত্রায় প্রয়াণ করিলেন। অপর পক্ষে ভোজবংশজ অরিন্দম কৃতবর্মা অনুরাধা-নক্ষত্রদিনে সমস্ত যাদবগণসহ দুর্যোধনকে আশ্রয় করিলেন।"

কিন্তু নীলকণ্ঠ উল্লিখিত ত্রয়োদশ শ্লোকের সঙ্গে ১৪শ শ্লোকের প্রথমার্ধ একত্র করিয়া এক খিচুড়ী পাকাইয়াছেন এবং ধীরেন বাবুও চিন্তা না করিয়াই অপব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। এস্থলে ভুলিয়া যাওয়া উচিত ছিল না যে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত নারায়ণী সেনাই দুর্যোধন পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। এ বিষয়ে উদ্‌যোগপর্ব, ৬ অধ্যায় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহকৃতানুবাদ দ্রষ্টব্য। কৃতবর্মা ও তাহার অনুচরবর্গও যাদব বা যদুবংশীয়ই ছিল। যে বিসংবাদে যদুবংশ ধ্বংশ হয় তাহার আরম্ভ সাত্যকি কর্তৃক কৃতবর্মার মস্তকচ্ছেদন হইতেই হইয়াছিল।

আমরা এক্ষণে ধীরেন বাবুর প্রতিপ্রবন্ধের শ্রীভারতীর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের আলোচনা করিতেছি। ধীরেন বাবু লিখিয়াছেন '১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জ্যেষ্ঠা অমাবস্যার তারিখ ২৫শে নভেম্বর ও ৩১০২ খ্রী° পূ° ভারতযুদ্ধ বৎসর ধরিলে উত্তরায়ণ দিবস ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারীর সদৃশ। সকলেই দেখিবেন এই দুই তারিখের অন্তর ঠিক ৯৬ দিন পাওয়া যায়।' আমরা এই অংশের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

১৯৩৫ অব্দের ২৫শে নভেম্বর (৯ই অগ্রহায়ণ) ধীরেন বাবুর মতে জ্যেষ্ঠাঅমাবস্যা।

কিন্তু এই অমাবস্যার অন্তে সূর্য চন্দ্র জ্যেষ্ঠাতারাও পায় না। এই অমান্ত ১লা ডিসেম্বর তারিখে পড়িলে সূর্যচন্দ্রযোগ জ্যেষ্ঠা তারায় হইত। আমাদের পূর্বে প্রদর্শিত পদ্ধতি ক্রমে জ্যেষ্ঠা তারার স্ফেক্রেস্থান ১°।৩৬´ কলায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত ২৫শে নভেম্বরের অমাবস্যা জ্যেষ্ঠা তারাও পাইল না। এমন কি জ্যেষ্ঠা বিভাগও পাইল না। অতএব এই অমাবস্যাকে জ্যেষ্ঠাঅমাবস্যা বা ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যা কোন ক্রমেই বলা যায় না। সুতরাং ১৯৩৫-৩৬ সালকে যুদ্ধ-বৎসরের সদৃশ বৎসর বলা যাইতে পারে না। ইহাই মান-বৎরের ভ্রান্তি।

দ্বিতীয়তঃ, ধীরেন বাবু ভীষ্মপ্রয়াণ এবং যুদ্ধ-বৎসরের উত্তরায়ণ দিবসের সদৃশ দিবস ১৯৩৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী দেখাইয়াছেন। ঐ দিবসে বাংলা মতে ১৬ই ফাল্গুন এবং চান্দ্র ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী। ধীরেন বাবু ইহাকে মাঘী-শুক্লাষ্টমী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন। ইহা কোনক্রমেই হইতে পারে না। ১৯৩৫ অব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে চান্দ্রমাঘ আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রতিপদে ধনিষ্ঠাদি মিলিয়া যাইতেছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও পৈতামহ সিদ্ধান্তমতে এই প্রকার মাঘ হইতেই পঞ্চবৎসরাত্মক যুগ বৈদিক ও বেদাঙ্গীয় কালে আরম্ভ হইত। পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের ৩০ মাস অতীত না হইলে একটি অধিমাস আসিতে পারে না। সুতরাং মাঘসিতাদ্য উক্ত ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ঠিক ১২ চান্দ্রমাস পরে অর্থাৎ ২৪শে জানুয়ারী ১৯৩৬ অব্দে হইবে। কাজেই মাঘের শুক্লাষ্টমী ২১শে জানুয়ারী (১৯৩৬) পড়িতেছে। সুতরাং ধীরেন বাবু যে উক্ত দিবসের একমাস পরে অর্থাৎ ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ফাল্গুন শুক্লাষ্টমীকে মাঘ শুক্লাষ্টমী বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা নিতান্তই অবলম্বন-বিহীন। ভারতযুদ্ধকাল নির্ণয় করিতে হইলে অন্ততঃ ১৯২৯-৩০ অব্দকে মানবৎসর বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। এই মান-বৎসর এবং ধীরেন বাবুর ৯৬ দিন অবলম্বন করিলে যুদ্ধবর্ষ ৩৫৫৯ খ্রী° পূর্বের আসন্ন হয়। সুতরাং ধীরেন বাবু ৩১০২ খ্রী' পূ° প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার কিছুই সারবত্তা নাই।

ভারতযুদ্ধকালের চতুর্দশরাত্রি যুদ্ধের যে বর্ণনা ধ্রুবসত্য বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, তাহা ধীরেন বাবু কবিকল্পনা বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর্দশ দিবসের অর্ধরাত্রির পর সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্লান্ত ও নিদ্রাভিভূত হইয়া যুদ্ধে সম্পূর্ণ অপারগ হইলে অর্জুনের কথামত চন্দ্রোদয়কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রহিল*। এই ঘটনার অপলাপ করিলে মহাভারতীয় অন্য কোন প্রমাণই গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না। এস্থলে 'চন্দ্রোদয়োদ্ধূতঃ' স্থলে তিনি যে 'নিদ্রোত্থিতোদ্ধূতঃ' অপপাঠ সৃষ্টি করিতেছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক বলিয়া মনে হইতেছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে ধীরেন বাবু কতকগুলি ভ্রান্তবস্তু অবলম্বন করিয়া ভারতযুদ্ধকালকে তৎকথিত 'সর্বভারতীয়' মতানুযায়ী যে ৩১০২ অব্দে স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা নিতান্তই ভিত্তিহীন বলিয়া বিফল হইয়াছে। গ্রহণাদি ও গ্রহাবস্থান প্রভৃতি যাহা উৎপাতলক্ষণমাত্র তাহাই আশ্রয় করিয়া ধীরেন বাবু অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্বত্র অপব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেক বিষয়কে প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া নিজের বিপরীত বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং ধ্রুব সত্য ঘটনাকেও স্বমতপোষণের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতেছেন। এই সব কার্যদ্বারা সত্যকে লাভকরা সুদূর পরাহত। আমরা এপর্যন্ত ধীরেন বাবুর দোষই দেখিয়াছি, কিন্তু একথা স্বীকার্য যে তিনি গণিতকুশল, শ্রমশীল ও ব্যবহারাজীবসদৃশ নিতান্ত দুর্বল পক্ষেরও সমর্থন কুশল। এবিষয়ে আমি আর আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

---

* দ্রোণপর্ব, ১৮৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম্. এ.

[৫]

১৮২৫—১৮২৬ খ্রীঃ

১২৩২ বঙ্গাব্দ

বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রাচীনতম বাঙলা সংবাদ পত্র "বাঙ্গাল গেজেটি"র প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত সচিত্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির কথা আমরা সকলেই অবগত আছি। গঙ্গাকিশোর ১২৩২ বঙ্গাব্দে একখানি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই অভিধানের সংবাদ লং এর তালিকা অথবা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ২২, ৩২ ও ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে নাই। এই অভিধানের একখণ্ড শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের "সদানন্দ-জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের" "সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে" রক্ষিত আছে। আলোচ্য অভিধানখানির নাম "শব্দার্ণব"। ইহা "ভগবান অমর সিংহ কৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দার্ণব নাম রাখিয়া"—মুদ্রিত হইয়াছে। "অমরকোষ"—অবলম্বনে যে কয়েকখানি বাঙলা অভিধান ১৮০০ খ্রীঃ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, আলোচ্য অভিধান সম্ভবতঃ তন্মধ্যে দ্বিতীয়। উত্তরপাড়ার পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত শব্দসিন্ধুই অমরকোষ অবলম্বনে মুদ্রিত প্রথম বাঙলা অভিধান। আলোচ্য অভিধানের শব্দ সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। শব্দ সমূহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া মুদ্রিত। এই অভিধানে 'হ' বর্গের পর 'ক্ষ' বর্গের শব্দ স্থান পাইয়াছে। নিম্নে আলোচ্য অভিধানের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে প্রথম ১০টী শব্দ ও তাহাদের অর্থ যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

১। অঃ। অ। পুম্‌লিঙ্গ। বিষ্ণু। আদ্য অক্ষর স্বরের। শব্দের প্রথমে হইলে নিষেধার্থে বোধ হয়। ইহার উচ্চারণ কণ্ঠ হইতে হয়।

২. অকরণ° অ ক্লী° অভিশাপঃ

৩. অকুপারঃ অ পুং সমুদ্রঃ

৪. অংকোঠঃ অ পুং কাল আঁকড়া বৃক্ষ

৫. অখণ্ডঃ অ ত্রি সকল

৬. অখাতঃ অ ক্লী° দেবখাতঃ

৭. অখিল° অ ত্রি সকল

৮. অগঃ অ পুং পর্বতঃ বৃক্ষঃ

৯. অগদঃ অ পুং ঔষধ

১০. অগ্ন্যুৎপাতঃ অ পুং উল্কাপাতাদি

নিম্নে আলোচ্য অভিধানের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীশ্রীদুর্গা/শরণং/ভগবান্ অমরসিংহ/কৃত/অভিধান অকারাদিক্রমে/ভাষায়/বিররণ করিয়া শব্দার্ণব/নাম রাখিয়'/শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য/দ্বারা/বহরায় ছাপা হইল/সন ১২৩২ শাল/" পৃ° ৩৬০ +? আকার ৭$\frac{1}{8}$" × ৫$\frac{1}{2}$" ইঞ্চি।

১৮৩৯—১৮৪০ খ্রীঃ

১২৪৬ বঙ্গাব্দ

"বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের জন্মপল্লী "বহরা" গ্রামে মুদ্রিত শব্দার্ণবের উল্লেখ আমরা ইতঃপূর্বে করিয়াছি। উক্ত গ্রামের "বাঙ্গাল গেজেটি" যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত অপর একখানি বাঙলা অভিধানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের নাম "বঙ্গভাষাভিধান"। ইহা ১২৪৬ বঙ্গাব্দে "শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বহরা গ্রামে মুদ্রাঙ্কিত" হয়। এই গ্রন্থের উল্লেখ লংএর তালিকা অথবা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নথিপত্রের ২২, ৩২ ও ৪১ সংখ্যক সংগ্রহে নাই। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া শব্দ ও তাহাদের অর্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রতি কলমের জন্য পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দ্দেশ করা আছে। সমগ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ৪২২ অর্থাৎ ইহা ২১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার শব্দসমূহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। শব্দসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাত্র। আলোচ্য অভিধানে বহু দেশজ শব্দ স্থান পাইয়াছে, তবে সংস্কৃতমূলক তদ্ভব এবং তৎসম শব্দের সংখ্যাই অধিক। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলোচ্য অভিধানের কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

১. অই, পূর্বস্মৃত, সন্মুখস্থিত বস্তু, পৃ ১
২. কদলী, মোচাফল, পৃ ৭৩
৩. খদির, বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস, পৃ ৯৯
৪. গর্ভিনী, গুর্বিনী, পৃ ১০৫
৫. চিকুর, কেশ, পৃ ১২২
৬. নাগরী, বক্তৃত্বাদি গুণ বিশিষ্ট রসিকা স্ত্রী, পৃ ১৭৮
৭. পাতলা, ক্ষীণ, তরল, অল্পভার, পৃ ২০৬
৮. বৌদ্ধ, নাস্তিক বিশেষ পৃ ২৪৬
৯. ভাশুর, পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৃ ২৫৪
১০. হালি, নৌকা চালনের নিয়ামক দণ্ড, পৃ ৪১৪

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র যথা :—

"শ্রীশ্রীদুর্গা ॥ / শরণং ॥ / বঙ্গভাষাভিধান ॥ / অর্থাৎ / বালকদিগের শিক্ষার্থে / অকারাদি ক্ষকারান্ত শব্দ অনুলোমে / তদর্থ তদ্ভাষায় বিন্যাস পূর্বক / ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয়স্য / বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে / শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক / বহরা গ্রামে মুদ্রাঙ্কিত হইল / বঙ্গাব্দ ১২৪৬ সংখ্যক / দানিশাব্দ ৮৯ সংখ্যক /" পৃ ৪২২, আকার ৫"×৭½" * ইঞ্চি।

১৮৪৩ খ্রীঃ

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত মার্শম্যানের ইংরেজী বাঙলা অভিধানের সন্ধান আমরা জানি। এই অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১০।১১ বৎসরের মধ্যে একই অভিধানের পর পর তিনটী সংস্করণ হওয়ায় ইহার জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঐ সময় কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান স্কুলবুক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ অল্পমূল্যের অথচ সকল প্রয়োজনীয় শব্দে পূর্ণ স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী একখানি ক্ষুদ্র অভিধানের জন্য মার্শম্যানকে অনুরোধ করেন।

* এই গ্রন্থের একখণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে আছে।

মার্শম্যান তাঁহার ইংরেজী বাঙলা বৃহৎ অভিধানখানিকে অবলম্বন করিয়া আলোচ্য অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার মূল্য ১৷০ নির্দিষ্ট হয়। এই অভিধানে শিক্ষার্থীদের সচরাচর প্রয়োজনীয় প্রায় সকল শব্দই স্থান পাইয়াছিল। মার্শম্যান আলোচ্য সংক্ষিপ্ত অভিধানের ভূমিকায় ইহা সঙ্কলনের কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এই ভূমিকা উদ্ধৃত হইল।

"This little Work has been compiled for the use of Schools at the suggestion of the Calcutta Christian School Book Society, who were anxious for the publication of a Dictionary of smaller dimensions than those now in use, and at a price which might come within the means of the poorer class of students. It became necessary therefore to reverse, in some measure, the ordinary rule of publication, and to regulate the size of the book by its price. Hence I have been obliged to curtail the number of vocables, to the greatest extent compatible with the utility of the Dictionary, and to limit the selection of them to those which were likely to be most required by the scholar in the first years of his studies. I trust, however, it will be found to contain as great a number of words, as could well be afforded for the price fixed on the work, A Rupee, and a quarter.

Jonh C, Marshman.

Serampore, 11th Sept. 1843."

এই অভিধানে শব্দ ও তাহাদের অর্থ সমন্বিত প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে "School Dictionary English and Bengalee"—এরূপ লিখা আছে। এই অভিধানে প্রদত্ত বিভিন্ন ইংরেজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ লক্ষ্য করিলে সহজেই ইহার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। ইহাতে বহুশব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু ইংরেজী শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ নির্দেশ করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য অভিধানের নিদর্শন স্বরূপ প্রথম পৃষ্ঠার দশটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল—

1. Aback, ad. পশ্চাৎ
2. Abaft, or Aft, ad. পশ্চাৎদিক
3. Abaisance, S. নমস্কার, প্রণাম
4. Abandon, v, a. ত্যাগ-কৃ, ছাড়
5. Abandoned, a. ত্যক্ত, পরিত্যক্ত ; wicked, ভ্রষ্ট, দুষ্ট, কদাচারী
6. Abandonment, S. ত্যাগ
7. Abase, v. a. নীচ-কৃ, নম্র-কৃ
8. Abasement, S. নীচীকরণ, নম্রতা
9. Abash, v. a. লজ্জিত-কৃ, অপ্রস্তুত-কৃ
10. Abate v. a. ন্যূন-কৃ, লাঘব-কৃ, কমা, ছাড়।

এই অভিধানের আখ্যাপত্র যথা :—

"A/Dictionary,/English and Bengalee,/For the use of Schools./From the Serampore Press,/1843."/pp. 272+? Size. 7½″×4½″ inches,

১৮৪৭ খ্রীঃ

প্রবর্তকের ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার ৩২২-৩২৩ পৃষ্ঠায় মার্শম্যান সঙ্কলিত একখানি ইংরেজী-বাঙলা অভিধানের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে এই অভিধানের প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হয় এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত চতুর্থ সংস্করণের শুধু উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে চতুর্থ সংস্করণের একখণ্ড অভিধান দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। নিম্নে এই খণ্ডের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। যথা :—

"A/Dictionary/Of/The Bengalee Language./Vol. II./English and Bengalee./Fourth Edition./Serampore:/Sold at the Press, and also by Mr. P. S. D'rozario,/And by all the principal Book sellers in/Calcutta,/1847./" pp. 432. size. 8½"×5½" inches.*

১৮৫১ খ্রীঃ

মার্শম্যান সঙ্কলিত ইংরেজী বাঙলা অভিধানের চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র ইতঃপূর্বে মুদ্রিত করিয়াছি। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ ১৮২৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৩৯, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আলোচ্য অভিধানের একটী সংস্করণ দেখিয়াছি। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রে ইহা First Edition বলিয়া নির্দেশ করা আছে। সম্ভবতঃ পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রণ করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে Fifth Edition এর স্থলে First Edition মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংস্করণের শব্দ সমূহ ও চতুর্থ সংস্করণের শব্দসমূহ প্রায় অভিন্ন শুধু স্থল ভেদে কয়েকটী নূতন শব্দ স্থান পাইয়াছে, কয়েকটী শব্দের অর্থে ও সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে এই সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"A/Dictionary/Of/The Bengalee Language/Vol. II./English and Bengalee./First Edition./Serampore:/Printed at the Serampore/Chundrodoy Press./1851./"pp. 338. আকার ৮½"×৫½" ইঞ্চি।†

১৮৬৪ খ্রীঃ

সোমপ্রকাশের ১২৭১ বঙ্গাব্দের ২৮ অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'শ্রীইন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ" স্বাক্ষরিত এক পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে। এই বিজ্ঞাপনে শব্দসিন্ধু অভিধানের উল্লেখ পাইতেছি। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০০, মূল্য ২৲। ইহা সভাবাজারের ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের দোকানে প্রাপ্তব্য। এই অভিধানের কোন সংখ্যা এ যাবৎ দেখি নাই। গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা কে ছিলেন তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যাইতেছে না। এই বিজ্ঞাপন

* এই গ্রন্থের একখণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

† এই খণ্ড নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউট গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর তারিখের সোমপ্রকাশে পাইতেছি। সেইজন্য আলোচ্য গ্রন্থকে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত গ্রন্থ পর্যায়ে উল্লেখ করা হইল। নিম্নে বিজ্ঞাপনটী উদ্ধৃত হইল। যথা :-

"বিজ্ঞাপন"

শব্দসিন্ধু অভিধান

৬০০ শত পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ শব্দসিন্ধু নামে একখানি সুবিস্তীর্ণ নবাভিধান মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে তাঁহারা কলিকাতা শোভাবাজারের বটতলার উত্তর শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ২৪৫ নং দোকানে তত্ত্ব করিলে নগদ মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বটতলা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

১৮৬৭ খ্রীঃ

শ্রীভারতীর বর্তমান বর্ষের [দ্বিতীয় বর্ষের] তৃতীয় সংখ্যার ১৬৯ পৃষ্ঠায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত কেশবচন্দ্র রায় সঙ্কলিত "শব্দাবলী" নামক অভিধানের উল্লেখ করিয়াছি। এই অভিধানের এক খণ্ড ইণ্ডিয়া অপিস গ্রন্থাগারে আছে। আখ্যাপত্র হীন একখণ্ড শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের "সদানন্দ-জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের" "সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে" পাইয়াছি। এই অভিধানের শব্দসংখ্যা আনুমানিক পঁচিশ হাজার। ইহার শব্দ সমূহ প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম করিয়া বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। 'ক্ষ' বর্গের শব্দ সমূহ 'হ' বর্গের শব্দের পর মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতি শব্দের পাশে সেই শব্দের লিঙ্গ এবং শব্দটী বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি কোন শ্রেণীর তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা আছে। ইহাতে বহু দেশজ শব্দ ও স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২; আকার ৫″×৮½″ ইঞ্চি।

ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের গ্রন্থ তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় এই অভিধানের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে—

"Śabdāvuli, By Kasavachandra Rāya. pp. 432, Calcutta, 1867" নিম্নে আলোচ্য অভিধানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল। যথা :—

১। অবকুঞ্চন, ক্লীং বক্রকরণ। পৃ° ২২। ২। আধলি, স্ত্রীং অর্দ্ধমুদ্রা। পৃ° ৪০।

৩। একলাদুকলা, বিং একাকী দ্বিতীয় রহিত, ত্রিং বিং এক বা দুই। পৃ° ৬৩।

৪। কাফরি, পুং স্ত্রীং আফরিকাদেশস্থ লোক। পৃ° ৮০।

৫। খাবলা, ক্লীং কবল, গ্রাস; মুটা। পৃ° ১০১।

৬। গোঁড়ি, স্ত্রীং গুগ্লি। পৃ° ১১৪। ৭। চেলুনী, স্ত্রীং তণ্ডুল প্রক্ষালনোদক। ১৩১।

৮। ছেপ, ক্লীং নিষ্ঠীবন, থুথু, থুক। পৃ° ১৩৫। ৯। জেঠাই, স্ত্রীং জ্যেষ্ঠপিতৃব্য পত্নী। পৃ° ১৪৪।

১০। ঢিপী, পুং উচ্চস্থান, স্তূপ; রাশি। পৃ° ১৫১।

পশ্চিম রাঢ় আবিষ্কৃত লেখ-মালা

শ্রীহরিদাস পালিত, বিদ্যাবিনোদ ও **শ্রীনারায়ণ রায়** বি. এ, বিদ্যাবিনোদ

আমরা প্রৌঢ়-রাঢ়* দেশের ঐতিহাসিক (প্রত্নতাত্ত্বিক) বিবরণ সংগ্রহের জন্য "রাঢ় ঐতিহাসিক সঙ্ঘ" নামে একটী অনুসন্ধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পশ্চিম বংগের অধিবাসী—মাতৃভূমির সেবকগণ—এই সঙ্ঘের কর্মী। তাঁহারা স্ব স্ব গ্রাম ও পারিপার্শ্বিক পল্লী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। বৎসরে একাধিক বার সমবেত হইয়া সংগৃহীত বিষয়ের আলোচনা করা হয় এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন এক বিষয়ের অনুসন্ধানে কেহ লিপ্ত নহেন। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম-এ, বিদ্যাবৈভব মহাশয়ের আদেশ ও নির্দেশ মত সকল কার্য হইয়া থাকে।

কিছুদিন হইল প্রাচীন লিপির সন্ধান পাওয়া যায়—বাঁকুড়ার বেহারিনাথ পাহাড়ে! সেই লিপি অনুরূপ লিপি সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসের আবিষ্কৃত মুদ্রালিপির সমতুল্য দেখিয়া মনে হয়, রাঢ়দেশ যখন প্রাচীন সভ্যজনপদ, তখন এদেশে সৈন্ধবী-লিপি তুল্য লিপি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। এই আশা লইয়া অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া, প্রথমে বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিমস্থ দামোদর নদ তীরবর্তী কুজকুড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত সুচাঁদ পসারী (বর্তমানে মৃত) মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত গদাধর পসারী (গন্ধী) মহাশয়ের বাটির মহিলাদের পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মকর-ব্রত কালে যে আলিপনা চিত্র করা হয়, তাহা প্রাপ্ত হই। প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মহিলারা (১ম চিত্র) যে অঙ্কন করেন, তাহারই চিত্র গদাধর বাবুর ভ্রাতৃ-বধু স্বহস্তে অঙ্কন করিয়া দেন। সেই চিত্র-লিপিই প্রথমে প্রদত্ত হইল। তিনি ইহার অর্থ কিছুই অবগত নহেন, পূর্ব পূর্ব গৃহিণীগণ এই চিত্র অঙ্কন করিরা মকর সংক্রান্তিব্রত করিয়া-ছিলেন, বর্তমানে সেই চিত্র অঙ্কন করিয়া ব্রত-পূজা করা হয়। এদেশে এখন এ প্রকার লিপি প্রচলিত নহে। কোন্ কাল হইতে এই লিপি এই বংশে প্রবর্তিত হইয়া, এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাই এই ব্রত-লিপির বিশেষত্ব এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ। এই লিপির প্রচলন-কাল অবগত হইলে, এই বংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইবে। পূর্বের লোকেরা এই ব্রত-লিপির অর্থ

* রাঢ়—শব্দের ব্যবহার না করিয়া রাড় শব্দের ব্যবহার করা হইল। রাঢ় শব্দ সংস্কৃত বৈয়াকরণ-সৃষ্ট পদ বিশেষ। এই শব্দটি নিন্দনীয়, যেহেতু ইহা 'রহ' ধাতুজ, নিষেধঅর্থক। রাঢ়, (পু, স্ত্রী- ঢা "রহ-কর্ম-ঘঞ")। গঙ্গার পশ্চিম অংশের বঙ্গদেশ। রহ ধাতুর অর্থ ত্যাগ, বৈদিক গ্রন্থে রাঢ় দেশে তীর্থ-যাত্রা ব্যতীত বৈদিকগণের প্রবেশ নিষেধ ছিল। তাঁহারা এদেশকে ঘৃণা ও নিন্দা করিতেন। এইজন্য এদেশের নিষেধ অর্থক অবজ্ঞাসূচক নাম 'রাঢ়' রাখিয়াছেন। দেশের লোকে মাতৃভূমিকে সংস্কৃতের রাঢ় না বলিয়া 'রাড়' বলে। রাড়বাসীদের রাঢ় বলা কর্তব্য নয়। অধিকন্তু গোরক্ষবিজয়ে ড়াড়, এবং ময়নামতীর গানে রাড় শব্দের ব্যবহার আছে। এদেশবাসীরা রাড় বলে।

জানিতেন, দীর্ঘকালে লিপি ও ভাষার পরিবর্তন হওয়ায়, এই লিপি অচল হইয়া গিয়াছে এবং লিপিকৃত ভাষাও অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে।

বর্তমানে পূণ্য কর্ম বোধে, লিপিমালা চিত্রিত করিয়া ব্রতপূজা করা হইয়া থাকে। এই লিপির প্রচলন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। মকর-ব্রত চিত্রলিপির একাধিক চিত্রলিপি সৈন্ধবী-মুদ্রায় দৃষ্ট হয়। এই হেতু ধারণা হয়—সৈন্ধবী লিপিতুল্য লিপি রাঢ় দেশে একদা সুপ্রচলিত ছিল। এই লেখমালায় সামগ্রিক বংভী-লিপি এবং এদেশে ব্যবহৃত প্রাচীন নাগ-লিপির (খরোষ্ঠীপূর্ব আদ্যলিপি) বিদ্যমান থাকায় বিবেচিত হইতেছে যে—রাঢ় দেশে তথাকালে একপ্রকার মিশ্র-লিপির বিশেষ ব্যবহার হইত।

ব্রতলেখমালা অবলম্বনে মনে ধারণা হইল, পশ্চিম-রাঢ়ে, সুপ্রাচীন রাঢ়ী লিপির সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আশা সুফল প্রদান করিয়াছে। আমরা যতই দৃঢ়ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম, ততই এক একটি করিয়া প্রাচীন লেখমালার সন্ধান পাইতে লাগিলাম এবং উৎসাহ প্রবর্ধিত হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে—যেস্থানে একাধিকবার গিয়াছি, তথায় প্রাচীন লেখ-মালা প্রত্যক্ষ গোচর হইল। একাগ্রতাই সুফল দান করে। দেখার মত দেখিতে শিখিলে অনেক কিছু দেখা দেয়। যতই অনুসন্ধান করা হইল, ততই একগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে একাধিক লেখমালার চিত্রাবলী নয়নগোচর হইল। এই প্রকারে একাধিক আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে ও সন্ধান মিলিতেছে।

নাগপুর যাদুঘরে একটি গজ-লক্ষ্মী চিত্রে 'লছমীয়' শব্দ প্রাচীন অক্ষরে ক্ষোদিত আছে, উক্ত লিপি-চিত্র সৈন্ধবী-মুদ্রাবিশেষে উৎকীর্ণ দেখা যায়। পশ্চিম রাঢ়ে আবিষ্কৃত পট্ট-লিপি ও অপরাপর চিত্র-লিপির লিপি মধ্যে অধিকাংশ অক্ষর, সৈন্ধবী মুদ্রায় দেখা যায়। অতএব একদা মহেন্জোদাড়, হড়প্পায় যে লিপির প্রচলন ছিল, ঠিক সেই লিপিমালার প্রচলন, এই পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত ছিল। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রাঢ়ে আবিষ্কৃত লেখ-মালা, একদা রাঢ়ী বাংলা লিপি ছিল। দীর্ঘকালে লিপি-চিত্র ভেদ হইতে হইতে যে পরিবর্তিত রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাই বর্তমান বাংলা-লিপি। বাংলা বর্ণমালার আদ্যরূপের আবিষ্কার হইয়াছে। বাংলাভাষার প্রাথমিক রূপ,—ক্রম অভিব্যক্ত লিপিমালার সাহায্যেই অবগত হইবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীনকালের বাংলা ভাষা ও বাংলা অক্ষর, বর্তমান কালের মত ছিল না। প্রাচীন লেখমালার আবিষ্কারে প্রাচীন বাংলা ভাষারও খবর পাওয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন বাংলা ভাষার আদর্শ প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। এই প্রাচীন রাঢ়ী লেখ-মালার আবিষ্কারে, প্রাচীন রাঢ়ী বাংলা ভাষারও আবিষ্কার হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত লেখ-মালাগুলির চিত্র-রূপসহ পাঠ ও অর্থ প্রদত্ত হইবে।

নব-আবিষ্কৃত-লেখমালা পাঠের পরিচয়

মাগধী-বংভী-লিপি, পূর্বলিপি, সৈন্ধবী ও রাঢ়ী-লিপি—বংভীলিপির সুপ্রাচীন রূপ বড়লী শৈলের জৈনলিপি, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন উহা প্রায় ৪৪৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দের

খোদিত। পিপরাবাব ভস্মাধার ভাণ্ড লিপি ভগবান্ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। এই দুই লিপি বংভী লিপির প্রাচীন রূপ বিজ্ঞাপিত করে। বংভীলিপি যে প্রাচীন লিপি হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই লিপি সৈন্ধবী ও আন্ধরাড়ী লিপি। সৈন্ধবীলিপির প্রবর্তনকাল ও রাড়ী আন্ধলিপির কাল সমসাময়িক। নাগলিপি ১ রাঢ়ে প্রচলিত ছিল। বংভী ও নাগলিপির সাহায্যে, আলোচ্য নব আবিষ্কৃত রাড়ী লেখমালার পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু ভাবার্থ অবগত হওয়া গিয়াছে কেবল ধাতু শব্দ অবলম্বনে, নচেৎ দু-চার হাজার বৎসর পূর্বের ভাষা ও ভাষাগত অর্থ পাইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। তথাকালের ভাষা,—লেখমালায় ধৃত রহিয়াছে। লেখমালার এক-একটি শব্দ পদ, ধাতু সৃষ্ট শব্দ বিশেষ, সুতরাং ধাতু অর্থ অবলম্বনে ভাবার্থ প্রকাশ পায়, অন্য উপায়ে নয়। রাড় আন্ধ ভাষার শব্দ পদাদি, সংস্কৃত বৈয়াকরণ কৃত নয়, ইহা ধাতুসহ ধাতু শব্দের যৌগিক শব্দ বিশেষ। স্বভাবে ধাতুযোগের শব্দ, সংস্কৃতের পদপ্রকরণ অনুবর্তী নয়। ২

১ম•চিত্র ধৃত লেখমালার এক একটি চিত্র অবলম্বনে, এবং সেই চিত্র কোন্ অক্ষর তাহা যে রূপে নির্ণয় করিয়াছি, তাহা একাধিক চিত্র বিবৃতি দ্বারা উল্লেখ করা হইল। প্রত্যেক চিত্রের ব্যাখ্যান দিতে হইলে, প্রবন্ধের আকার বৃহৎ হইবে বলিয়া দেওয়া হইল না। সমগ্র পাঠটি দিয়া, ভাবার্থ প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করা হইবে এবং সমগ্র পাঠের ভাবার্থ লিখিত হইল।

লিপিচিত্র-পরিচয় বা বিবৃতি

(১ম চিত্র)

আলোচ্য লেখমালার প্রথম ছত্রটিতে ১২টি চিত্রলিপি আছে। দ্বিতীয় ছত্রে প্রায় সেইরূপ। তৃতীয় ছত্রে ২টি। প্রথম ছত্রের ১ম, ৪র্থ ও ১১শ চিত্র তিনটি যৌগিক। ১ম চিত্রটির মধ্যরেখা বাদে বংভীর ম বর্ণের প্রায় সদৃশ, তবে বংভীর ম বর্ণটির নিম্নাংশ প্রায় গোলাকার, নাগলিপির (খরোষ্ঠী পূর্ব) ম টি, অর্ধচন্দ্রাকার ছিল। উপরের চিত্রটি বংভীর গ চিত্রের বিপরীত সংস্থিত রূপ (এই প্রকার বিপর্যয় বর্ণ চিত্র রূপ প্রায় সকল প্রকার বর্ণমালায় দেখা যায়)।

১—নাগলিপি—(বিক্রমখোল লেখমালা) খরোষ্ঠি লিপির পূর্ববর্তী আদি লিপি। এই লিপি হইতে খরোষ্ঠি-লিপি অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাঢ়ের বণিকেরা নাগলিপির ব্যবহার করিতেন।

২—উদাহরণ যথা—'ভবতি' বা তী পদটি, রাড়ী প্রাকৃতে 'ভব+অত+ই', তিনটি ধাতু শব্দ যোগে প্রকট লাভ করিয়াছে।

সং—ভবৎ (তী), ত্রি, স্ত্রী,—'ভা—কর্তৃ—ডবতু"—উৎপাদ্যমান, বর্তমান। ভা এর আ-টি ড প্রত্যয়দ্বারা লোপ করিয়া ভবতু করা হইয়াছে। (ভর্ব বা ভরব"। প্রাঃ ভব' ধাতু ছিল। 'ভব' শব্দে উৎপত্তি, স্থিতি। জলমূর্তি শিব। সংসার, মঙ্গল ইত্যাদি) সং ইহা—(ভব)—"ভূ-ভাবে অল্"। বাং প্রাঃ—'ভব' ধাতু বিশেষ। ভূ (ভহিন্থ্র, ভব্য) ধাতুজনক। আন্ধ প্রাকৃতে ও সংস্কৃত গোড়ায় এই প্রভেদ। ৯৯ সূত্রে ভবতী, বাংপ্রা তাহা নয়।

ইহা প্রাচীন রাঢ়ী লেখমালার 'গ' এবং সৈন্ধবী মুদ্রা লিপিতে এই প্রকার একাধিক চিত্র আছে। মধ্যের দণ্ড রেখাটি-র। নাগ লিপির গ-টির দক্ষিণ অংশের পুচ্ছতুল্য অংশ পরিহারে আলোচ্য গ হয়। গ বর্ণের নিম্নস্থিত অর্দ্ধবৃত্তাকার চিত্রটি নাগীয় 'ষ' লিপির অনুরূপ। এই প্রকার মিশ্র লিপি দ্বারা প্রথম যৌগিক বর্ণটি লিখিত হইয়াছে, অতএব ইহার পাঠ মর, মগর, বা যগর হইতে পারে, তত্রাচ ভাষাগত 'লক্ষণা' অবলম্বনে বলা যাইতে পারে, মগর পাঠই প্রশস্ত। সংযুক্ত বর্ণের পাঠ উদ্ধার ব্যাপারে নিম্ন হইতে পড়িতে হয়। ২য় লিপিটি বংভী ও নাগ লিপির হ তুল্য; রাঢ়ী লিপির হ এই প্রকার ছিল[১]। ৩য়টি—রাঢ়ীয় প্রাচীন-ক। বৈগ্রাম লেখমালায় এই প্রকার ক খোদিত আছে, ইহার 'ভট্টারক' পাঠের ক এবং অলোচ্য ক—সমসাদৃশ্য। প্রাচীন রাঢ়ে এই প্রকার 'ক' লেখার প্রচলন ছিল। বৈগ্রাম লেখমালায় ক বর্ণটি, গুপ্ত (কুটিল ?) যুগের মাত্রাযুক্ত ক বর্ণের সমান, রাঢ় বংগের প্রাচীন ক ঠিক উক্ত প্রকার ছিল।

৪র্থ চিত্রটি যৌগিক, ইহা নাগ লিপির অ স্বর-বর্ণ তুল্য, কিন্তু উপরের বামাবর্ত বক্র অংশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি বা অর্ধ গোলাকৃতি চিত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, এই পুটুলিটি ম (সম্ভব), ইহার পাঠ অম বা ময় হইবে।

১১শ চিত্র—যৌগিক, নাগীয় ষ (মুর্দ্ধণ্য ষ ?) তুল্য, (নিম্নের ২টি বক্র রেখা বাদে), বংভীয় য বর্ণ-টি ইহার বিপরীত সংস্থিত চিত্র—(য ?)। এই যৌগিক চিত্রটির নিম্ন অংশ, প্রাচীন ক চিহ্নযুক্ত। তত্রাচ বংভী ক বিশেষে, উপরের বক্র রেখাটি স্বর বর্ণের চিহ্ন বিশেষের যোগ বিজ্ঞাপিত করে। কে, এবং বৈগ্রামী ক ধরিলে কো পাঠ হইবে কষ ক কয (ক্য ?) সমগ্র ছত্রের পাঠ—"মগর (মর, যগর ?) হ-ক-অ (অস, ময় ?)—হ-ক-ক (ঠ ?) রং-রং-র কে (কো ? কষ,-কয়=ক্য ?)-র" (মগর-হক অঅহ কক রং-রং-র-কে-র)

দ্বিতীয় ছত্রের দ্বিতীয় চিত্র যৌগিক—নিম্নের অঙ্কুশ সদৃশ চিত্রটি (বিপরীতসংস্থিত বংভীয়-ট) বংভীয় সময় বিশেষের—খ—বর্ণতুল্য এবং নাগলিপির প্রায়-প বর্ণ সম। এক সময় নাগীয় এ-স্বরবর্ণটি প্রায় উক্তরূপ ছিল, তত্রাচ প্রভেদের মধ্যে, ইহার শিরোদেশে একটি ক্ষুদ্র-দণ্ডরেখা যুক্ত থাকিত। ণ-বর্ণচিত্র, প্রায় অলোচ্য চিত্রের মত দেখায়। সম্ভব ইহা নাগ-লিপির —ণ (?), ইহার বামে দুটি বিন্দু বিদ্যমান (সমতলে সংস্থিত), বংভীয় ই-স্বরবর্ণটি তিন-বিন্দু (এই ছত্রের দশম চিত্রতুল্য) ছিল, খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত, গুপ্তকালে ইহা দুইটি শূন্য বা বিন্দু আকার প্রাপ্ত হয়, প্রভেদের মধ্যে উহার উপরে একটি ক্ষুদ্র সমতল রেখা লিখিত হইত। নাগীয়-ইস্বর কখন বিন্দু-চিহ্নিত ছিল না। এই আলোচ্য বিন্দু-দুটি সম্ভব-ই। উপরের চিহ্নটি-হ সামান্য রূপান্তর মাত্র। ইহা নাগীয়—হ। অতএব ইহার পাঠ—ণইহ (ইণহ ?)

তৃতীয় চিত্র—যৌগিক—গুর (যুর ?)। ৫ম চিত্রটি—যৌগিক এবং জটিল,—নিম্নের

১—নাগীয় হ হইতে রাঢ়ী বাংলার হ হইয়াছে, বংভী হইতে হয় নাই।

ত্রিভূজাকৃতি চিত্রটি গুপ্ত ব (প্রভেদের মধ্যে গুপ্ত-ব বর্ণে মাত্রাযুক্ত হইত), অথচ কখন মাত্রাহীন-ব লিখিত হইত,—নিম্নের চিত্রটী-'ব' পাঠ ধরা হইল। উপরের চিত্রটিই-ম (নাগ ?) অথবা রাঢ়ী-গ। মধ্যের রেখাটি-র। অতএব—বগর পাঠ হয় (এগর, ঐগর ?), ৭ম চিত্রটি নাগীয়-ষ (বংভীর-য, বিপরীত সংস্থিত ?) (ইষ)।

৯ম চিত্রটি যৌগিক ও কুটিল— (বংভীর বিপরীত সংস্থিত—ন, নাগীয়-ষ)-নিম্নের চিত্রটি নাগীয়-ট। পূর্ণপাঠ-ঢণ। শেষ চিত্রটি বংভীর—ঠ। সমগ্র পাঠ-ঢণ (ণ্ট ?)-ঠ। ২য় ছত্রের সমগ্র পাঠ—"ক গহ (গিহ ?)-গুর-ক (কা ?)-বগর-ষ-ইষ-ই-ঢণ-ঠ"।

১ম চিত্র

সমগ্রপাঠ

"মগর-হক-আ-হকক-(ঠ)-রংরংর- কে (কো ?)-র।
ক (কা ?)-গহ-গুর-ক (কা ?) -বগর-ষ-ইষ-ই-ঢণ-ঠ ॥"*

এই ভাষার রূপ—মগরকহ অহ কঠ (কট ?) রঙরঙ (রম-রম)-র-কষ (ক্ষ ?) রা (র)।"
সংক্ষিপ্তরূপ--মগরক (র্ক ?) অহ (হা ?) কঠ (কট) রকে (রক্ষ ?) (রা=দানে) ॥

ভাবার্থ

হে মাগর্ক (মগরক) কহ কট (কৃচ্ছ্র জীবন) র রঙ-(রম, রমরকে (রক্ষা কর)-দানে।

বিশেষ—হে মকর সংক্রান্তির দেবতা—ব্রতের দেবতা—কৃচ্ছ্র জীবনকে রমণীয় হইবার দান দাও। সাধারণ ব্যাপক অর্থ—হে দুর্গতি-নাশিনী দুর্গে! আমাদের কষ্টকর জীবন-যাত্রাকে রমণীয় কর,—সেইরূপ দান দাও।"

[শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের—৪র্থ অঃ—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" ॥ ১৩ ॥ কেহ বলেন 'আমরা কোন্ দেবতাকে হবিদ্বারা উপাসনা করিব। কেহ বলেন—ক সংজ্ঞক দেবতাকে হবিদ্বারা উপাসনা করিব। যাহাই হউক, এই লেখমালার শেষে দুইটি—পৃথক্ আকৃতির 'ক' আছে—এই দুটি রাঢ়ী সংস্কারে—প্রকৃতি ও পুরুষ (উপনিষদ বিশেষের সম্ভূতি ও অসম্ভূতি)—সেই মতে প্রকৃতি পুরুষের একত্রে উপাসনা করিতে হয়—একটির উপাসনা নয়। রাঢ়দেশের এই ব্রত চিত্র-লিপিতে—প্রকৃতি পুরুষের পূজা করা হইয়া থাকে। শেষের চিত্র দুটি—প্রকৃতি ও পুরুষ বিজ্ঞাপক—ক]

* মগর=মগ+অর। এই প্রকারে শব্দ বিভাগ করিয়া ভাবার্থ নির্ণীত হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

(৮৪) মহামহোপাধ্যায় পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী —ইনি তাঞ্জোরনিবাসী। কয়েক বৎসর পূর্বে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ইনি 'শতকোটী' নামক একগ্রন্থে ১শত পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

(৮৫) কাকারাম শাস্ত্রী—ইনি ১৯শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন এবং একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি শঙ্করানন্দের আত্মপুরাণের উপর এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

(৮৬) কেশবানন্দ ভারতী—ইনি হরিদ্বারের নিকটস্থ কনখলের মুনিমণ্ডল মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি'র উপর ইঁহার এক সরল টীকা আছে।

ইহাই সংক্ষেপে অদ্বৈতবেদান্ত-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলীর পরিচয়। বর্তমানযুগে অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তাস্রোত এত প্রবলাকার ধারণ করিবার প্রধান কারণ স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বিনী বক্তৃতা, যাহা ভারত ও ভারতেতর স্থানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ আচার্যগণের পরিচয় ইহাতে দিই নাই। কেবলমাত্র যাঁহারা সংস্কৃতে বেদান্ত পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদেরই নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্তমান সময়ে ম°ম° অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী, ম°ম° যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণও সংস্কৃতভাষায় অদ্বৈতবেদান্তের টীকাদি রচনা করিতেছেন।

বেদান্তের এই অদ্বৈতমতের সার আমরা শঙ্করাচার্যের মতবাদের মধ্যে উল্লিখিত করিয়াছি। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্যের মতবাদ ঐরূপই; সামান্যমাত্র কোন কোন স্থানে প্রভেদ থাকিতে পারে।

ইহার পরেই আমরা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সম্প্রদায়—বিশিষ্টাদ্বৈতসম্প্রদায়ের আচার্যগণের পরিচয়, মতবাদ ও গ্রন্থের বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(খ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্বে ইহার আচার্যদিগের জীবনী ও গ্রন্থের সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

সাধারণতঃ শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যকেই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলা হয়। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব হইতেই এই মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি বেদান্ত-

সূত্র-প্রণেতা বাদরায়ণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আশ্মরথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও এই মতবাদ উল্লিখিত আছে। ইহার নাম পাঞ্চরাত্র মতবাদ। শ্রীরামানুজও তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্যগণকে—আচার্য দ্রমিঢ়, টঙ্ক, গুহদেব, শ্রীবৎসাঙ্ক, নাথমুনি, যামুনাচার্য প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়াই তাঁহার বেদান্তদর্শন-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সর্বপ্রথম বোধায়নই এই মতবাদানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি রচনা করেন। রামানুজ কাশ্মীরে সারদাপীঠে এই বৃত্তির পুঁথি পান। কিন্তু ইহা লুপ্ত। তারপর দ্রমিঢ়, টঙ্কাদিরও ব্যাখ্যা ছিল, কিন্তু ঐগুলিও লুপ্ত। যামুনাচার্য কর্তৃক এই মতবাদের ও সম্প্রদায়ের অঙ্কুর রোপিত হয় এবং উহাই শ্রীরামানুজে মহীরুহাকারে পরিণত হয়। আর ধর্মসম্প্রদায়রূপে রামানুজ-প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের মূল দেখিতে পাই দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব আলোয়ারগণের মধ্যে। এই সকল আলোয়ার-গণের মধ্যে দশজন বিখ্যাত ছিলেন ও উঁহাদের অনেকেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের। শ্রীভারতী প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় ইঁহাদিগের বিষয়ে সামান্য আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী যুগে নাথমুনিকেই, এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহার রচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ইঁহার শিষ্য শ্রীযামুনাচার্য—এই মতবাদের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

(১) শ্রীযামুনাচার্য

যদিও নাথমুনি হইতেই ঐতিহাসিক যুগে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়, কিন্তু তাঁহার রচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি ২ খানি বৈষ্ণবধর্মমূলক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন জানা যায়; সম্ভবতঃ উহা অপ্রকাশিত। সেজন্য আমরা যামুনাচার্যকেই এই মতবাদের পথপ্রদর্শক বলিতে পারি। যেমন আচার্য গৌড়পাদ কেবলাদ্বৈতবাদের অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন এবং উহা তদীয় প্রশিষ্য শঙ্করাচার্যের গ্রন্থে মহীরুহরূপে প্রকটিত হইয়াছিল তদ্রূপ যামুনাচার্যও যে বীজরোপন করিলেন উহা তদীয় শিষ্য রামানুজাচার্যে মহীরুহাকার ধারণ করিল।

যামুনাচার্য (বা যামুনমুনি) আষাঢ় মাসের উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে আনুমানিক ৯৫৩ খ্রী° অব্দে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বীরনারায়ণপুরে (বর্তমান মদুরা) জন্মগ্রহণ করেন। নাথমুনি ইঁহার পিতামহ, এবং পিতা ঈশ্বরমুনি ইঁহার দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন। অতি অল্পবয়সেই ইনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। ইঁহার শিক্ষাগুরুর নাম শ্রীমহাভাষ্যাচার্য। মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি তদানীন্তন পাণ্ড্যরাজের সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করেন; এবং রাজা ও রাণীর মধ্যে এই বিচার ফলের পণস্বরূপ তিনি অর্ধরাজ্য প্রাপ্ত হ'ন। বহুকাল তিনি রাজ্যশাসন করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতামহ নাথমুনি যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি মানাক্কাল নম্বি (বা রামমিশ্র) নামক তাঁহার প্রধান শিষ্যকে আদেশ করেন যেন যথাসময়ে যামুনমুনিকে তিনি বৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করেন। এই মহাত্মা নম্বিই পরে যামুনাচার্যকে রাজ্য পরিত্যাগকরতঃ শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিয়া দীক্ষা

দেন। তদবধি ইনি শ্রীরঙ্গমেই রঙ্গনাথজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে সংস্কৃত ভাষায় (ক) স্তোত্ররত্নম্ (খ) সিদ্ধিত্রয়ম্ (গ) আগমপ্রামাণ্যম্ ও (ঘ) গীতার্থ সংগ্রহ এই ৪খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। পূর্বকথিত পাণ্ড্যরাজপণ্ডিতকে জয় করিবার পর হইতে ইঁহার নাম হইয়াছিল আল্‌ওয়ান্দার (অর্থাৎ যিনি জয় করিয়াছেন)। পরে আল্‌ওয়ান্দারের মতবাদের পূর্ণ প্রকট হইল আচার্য শ্রীরামানুজে। ইঁহার আবির্ভাবকাল আনুমানিক ৯৫৩—১০৪২ খ্রীঃ অব্দ।

(২) শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য

ইঁহার জীবনী শ্রীভারতী ১ম বর্ষ, চৈত্র সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। যেমন শঙ্করাচার্যকে কৈবলাদ্বৈতবাদের ও দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে, সেইরূপ রামানুজাচার্যকে বৈশিষ্টাদ্বৈতবাদের ও শ্রীসম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। ইঁহার আবির্ভাব কাল ১০১৭-১১৩৭ খ্রীঃ অব্দ। সুতরাং ইনি প্রায় ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ—ব্রহ্মসূত্রের উপর (ক) শ্রীভাষ্য নামকভাষ্য (খ) বেদান্ত-দীপ নামক টীকা ও (গ) বেদান্তসার নামক বৃত্তি; (ঘ) গীতার উপর ভাষ্য; (ঙ) উপ-নিষদের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার জন্য বেদার্থ সংগ্রহ নামক প্রকরণগ্রন্থ (চ) ভগবদারাধন নামক ভক্তিগ্রন্থ (ছ) গদ্যত্রয় (প্রকরণগ্রন্থ)। রামানুজকৃত এই ৭খানি গ্রন্থই প্রামাণিক। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কৃত রামানুজচরিতে আরও অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেগুলি শ্রীসম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যদিগের প্রণীত; কারণ দিব্যসূরি চরিত ও 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থ হইতে (এই পদ্যাত্মক গ্রন্থখানিতে রামানুজ ও এই সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্যের জীবনী আছে) আমরা এই ৭ খানি গ্রন্থই রামানুজকৃত বলিতে পারি। ইহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে—

(ক) শ্রীভাষ্যের উপর সুদর্শনাচার্য-কৃত শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা আছে। ইহা কাশী হইতে প্রকাশিত। নির্ণয় সাগর প্রেস হইতেও পণ্ডিত শ্রীনিবাস শর্মা শ্রীভাষ্য ও শ্রুত-প্রকাশিকা টীকাসমেত ৪টী সূত্র মাত্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের একটি সংস্করণে মূল, ভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার ও অধিকরণ মালা আছে। ইহা শ্রেষ্ঠ সংস্করণ। ইংরেজীতে Dr. Thibaut শ্রীভাষ্যের অনুবাদ করেন। ইহা Sacred Books of the East গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত Prof. Rangacharya কৃত ইংরেজী অনুবাদ আছে (ইহা অসম্পূর্ণ)। বাংলা ভাষায় ম.ম. পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-কৃত অনুবাদ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'শ্রুতপ্রকাশিকার' উপর 'ভাব-প্রকাশিকা' টীকা আছে এবং শ্রীভাষ্যের উপর বেদান্তাচার্যের 'তত্ত্বটীকা' আছে।

(খ) বেদান্তদীপ—ইহা বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত। তেলেগু অক্ষরেও ইহার কয়েকটি সংস্করণ আছে। ইহাতে রামানুজ স্বীয় অদ্বৈতবাদের শিক্ষাগুরু যাদব প্রকাশকৃত 'যতিধর্ম সমুচ্চয়' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় খণ্ডন করিয়াছেন।

(গ) বেদান্তসার—বৃন্দাবন হইতে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত এই গ্রন্থের একটী সংস্করণ আছে। কাশীর 'পণ্ডিত' পত্রিকায় প্রকাশিত ও পুনর্মুদ্রিত 'বেদান্ততত্ত্ব সার' নামক একখানি গ্রন্থ রেভারেণ্ড জনসন্ সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা রামানুজ-কৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা অন্য কাহারও কৃত।

(ঘ) গীতাভাষ্য—ইহার উপর বেদান্তদেশিকের "তাৎপর্যচন্দ্রিকা" টীকা আছে। ইহা শ্রীরঙ্গম বাণী বিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত। মাদ্রাজের নেটিসন্ কোং ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছে।

(ঙ) গদ্যত্রয়—ইহা শরণাগতি গদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য ও বৈকুণ্ঠগদ্য এই তিনভাগে বিভক্ত এবং ভক্তিরসাত্মক। ইহার উপর বেঙ্কটনাথের ভাষ্য আছে। সভাষ্য গদ্যত্রয় বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত।

(চ) ভগবদারাধনক্রম—ইহা তেলেগু অক্ষরে মুদ্রিত। সম্ভবতঃ ইহা দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই।

(ছ) বেদার্থ সংগ্রহ—ইহা শ্রীভাষ্যের পূর্বে রচিত। ইহার উপর স্নেহপূর্তি নামক এক টীকা আছে এবং কাশী হইতে ইহা প্রকাশিত।

শ্রীরামনুজের কুরেশ নামক (রঙ্গনাথজীর উত্তম পূর্ণ নামক একজন অর্চক-লিখিত লক্ষ্মীকাব্য নামক গ্রন্থে ইঁহার জীবনী পাওয়া যায়) একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। ইঁহার স্ত্রী ছিলেন মূর্তিমতী ভক্তি—নাম অণ্ডাল। ইঁহারা ধনী হইয়াও রামানুজের আশ্রয়ে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন ও ভগবদারাধনা করিতেন। এই কুরেশের ৯৪৩ শকাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে দুই যমজ পুত্র হয়। রামানুজের আদেশে এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হইল পরাশর ও কনিষ্ঠের নাম হইল ব্যাস। রামানুজের পরে এই পরাশর ভট্ট হইলেন শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য। কিন্তু পরাশর-লিখিত কোন দার্শনিক গ্রন্থাদির বিষয় জানা যায় না।

(৩) পরাশর ভট্টের পর আবির্ভূত হইলেন দেবরাজাচার্য। ইঁহার লিখিত গ্রন্থের নাম 'বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা।' ইহাতে অদ্বৈতমতের প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। ইনি খ্রী° ১২শ শতাব্দীর লোক এবং 'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকাকার সুদর্শনাচার্যের গুরু।

(৪) বরদাচার্য বা বরদার্য—ইনি দেবরাজাচার্যের পুত্র এবং রামানুজাচার্যের ভাগিনেয় ও শিষ্য। ইঁহার গ্রন্থ—তত্ত্বনির্ণয়।

(ক্রমশঃ)

দৈব ও পুরুষকার

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্কর তীর্থ যতি *

আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্মসমূহের ফল, দ্বিবিধ মূর্তিতে আসিয়া আমাদিগের নিকট প্রাদুর্ভূত হয়। এক দৈব, আর পুরুষকার। দৈববাদীগণ বলেন, "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" দৈবের সমান বল নাই। দৈবই আমাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় শুভাশুভ কর্মসমূহের ফল সংঘটন করিয়া দেন। আমরা কর্ম করি বটে,—কিন্তু সেই সকল কর্মের ফল যোজনা করিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ দৈবের হাত। এই হিসাবে যাহা প্রাক্তন, যাহা অদৃষ্ট, যাহা বিধিলিপি এবং যাহা সংস্কার, তাহারই নাম দৈব।

দৈববাদীগণ আরও বলেন যে,—দৈবের ইচ্ছা ভিন্ন আমাদের কোন কর্মই নির্বাহ করার সাধ্য নাই। তাঁহাদের এ যুক্তির দৃঢ়তা প্রতিপাদন জন্য তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চাহেন যে,—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" হে হৃষীকেশ, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে যখন যে কাজে নিয়োগ কর, আমরা তাহাই করি।

দৈববাদীরা দেখাইতেছেন যে, মানুষের শক্তি অপেক্ষা দেবতাদিগের শক্তি অনেক অধিক। দেবতারা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগের দ্বারা কর্ম করাইয়া লয়েন। দেবতারা যে আমাদের কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল প্রদান করেন, তাহাও তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ আমার কৃত শুভাশুভ কর্মের মধ্যে শুভ বা অশুভ ফলের ভোগটি অগ্রপশ্চাৎরূপে প্রয়োগ করাও দেবতাদিগের আয়ত্ত। এইরূপ এবং এবংবিধ বহুতর যুক্তি, দৈববাদীগণেরা স্বমত পোষকতার পক্ষে অনুকূল বলিয়া মনে করেন।

পুরুষকারবাদীগণের কথা অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন যে,—দৈব হইতে বল নাই, একথা স্বীকার করি, কিন্তু সে কথাটা এস্থলে নহে। আমাদিগের কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল সংঘটন করিয়া দেওয়ার স্থলে দেবতার হাত আছে, ইহা ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত কল্পনামাত্র। কেননা, কর্ম করি আমরা,—সেই কর্মের একটা ভাল মন্দ ফল উৎপন্ন হইবেই ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, এরূপ স্থলে দেবতাকে নিয়া টানাটানি করা কেন? প্রাক্তন, অদৃষ্ট, বিধিলিপি এবং সংস্কার, এইগুলি দৈবেরই বিভিন্ন অবস্থার নাম, ইহা অস্বীকার করি না।

দৈববাদীগণের স্বমত পোষকতার জন্য যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা সর্বতোভাবে নিরর্থক হইয়াছে,—কেননা, হৃষীকেশ যদি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদের দ্বারা শুভাশুভ কর্ম করাইয়া লয়েন, তবে সেই সকল শুভাশুভ কর্মের ফল, হৃষীকেশের ঘাড়ে

---

* শ্রীগোবর্ধন পীঠাধীন শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী ১০৮ স্বামী শ্রীশঙ্কর তীর্থ যতি মহারাজ।

না চাপিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপে কেন? যখন শুভাশুভ কর্মের ফল ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদিগকে ভুগিতে হয়,—তখন বুঝিতে হয় যে শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠাতাকেই সেই সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়; আর কাহাকেও নহে। এ সকল অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াই শাস্ত্রকর্তাগণ বলিয়াছেন যে "ফলং চ কর্তৃগামী" কর্মের ফল কর্মকর্তাকে আশ্রয় করে। ব্রহ্মপুরাণে আছে—

জানামিধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

এ সকল কথার তাৎপর্য অন্যরূপ। কর্মের গতি অতি দুজ্ঞেয়। তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা ইহা বিদিত হইয়া অন্তর্যামী পুরুষকে লক্ষ্য করতঃ একথা বলিয়াছেন। যে মানুষ সর্বাবস্থায় আপনাকে অকর্তা ও ঈশ্বরকেই কর্তা বলিয়া জানে—যাহার বাস্তবিকই কর্তৃত্বাভিমান নাই, তিনি মুক্ত পুরুষ। মুক্ত পুরুষের যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি হইয়া থাকে, যদি কোন ব্যক্তির সেরূপ অনুভূতি না হয়, অথচ সেরূপ অবস্থায় সে যদি বলে,—ঈশ্বর করাইতেছেন, আমি নির্দোষ, তবে সে ভণ্ড না হয় ভ্রান্ত। আমিত্ব বোধ থাকিতে কর্মের কর্তৃত্ব ঈশ্বরে আরোপ করা বিধেয় নহে।

কোন কোন স্থলে ও অবস্থা বিশেষে আমাদিগের শুভাশুভ কর্মফলের অগ্রপশ্চাৎরূপে বিলিব্যবস্থার ভার দেবতাদের হস্তে আছে, এই কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের পালিত গবাদি পশুর ন্যায় আমরা দেবতাদিগের দ্বারা পরিচালিত নহি। কর্মানুষ্ঠাতা কর্তাকে যখন তত্তদ্ কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, তখন, দেবতারা যে আমাদের দ্বারা কর্ম করাইয়া লয়েন, সেই দেবতারা ঐ সকল শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ করেন না কেন? ব্যবহারতঃ দেখা যায়, কৃষিজীবি লোকেরা পশুর দ্বারা হালচালনা করতঃ ভূমিকর্ষণ করিয়া বীজবপনান্ত ফসলাদি আপনারা ভোগ করে। গবাদি পশুর তাহাতে উপকার কি?

এবংবিধ বহুযুক্তির অবতারণা করিয়া পুরুষকারবাদীগণ দৈববাদীদিগের মত খণ্ডন জন্য সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপ বাদীদ্বয়ের দ্বন্দ্ব নিরসন জন্য দার্শনিকদিগের যুক্তি ও মীমাংসা কিরূপ, তাহা অতঃপর আলোচনা করা যাইতেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে,—জীবের দেহত্যাগের সময়ে, তাহার মর্মগ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হইতে থাকে। তখন তাহার স্মরণ-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। চিত্ত, নিজের বশে না থাকায়, দুঃখ যাতনায় কাতর হইয়াও তখন তাহার নিজের হিত সাধনে সামর্থ্য থাকে না। এই দেহপিণ্ড জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কালপক্ক ফলের ন্যায় নিজেই জীর্ণ হইয়া, যেরূপে আম্রফল, ডুমুর ফল, অশ্বত্থ ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, তেমনিভাবে এই পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরোপহিত আত্মা—দেহ সংলগ্ন এই সমস্ত অঙ্গ হইতে সম্প্রমুক্ত হইয়া, সম্পূর্ণ নিঃশেষভাবে,—কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রবেশের সময় যেরূপ প্রাণ থাকিয়া যায়, সেরূপ নহে,—পরন্তু প্রাণবায়ুর সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে

লইয়া পুনর্বার পূর্বগতির অনুরূপভাবে, প্রতি যোনিতে অর্থাৎ স্বীয় কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে যেরূপ যোনিতে জন্ম সম্ভব সেইরূপ যোনিতে গমন করে, প্রাণসমূহের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি লাভের জন্য। অর্থাৎ দেহত্যাগের কালে প্রাণসমূহ সহকারেই গমন করে। তখন প্রাণসমূহ নিস্পন্দ থাকে। আধার ভিন্ন প্রাণের কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। এজন্য পুরুষের এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে গমন হয়। এবং এই দেহ দ্বারাই পুরুষের কর্মফলভোগরূপ স্বার্থ সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু কেবল প্রাণমাত্র বিদ্যমান থাকিলেই হয় না।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, পুরুষ যে সময় বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে সময়ে তাহার নিজের চেষ্টায় আর অপর দেহ ধারণ করার সামর্থ্য থাকে না। কারণ তখন তাহার স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।—সুতরাং এ অবস্থায় পুরুষের দেহান্তর গমন সম্ভব হয় কিরূপে? এই সমস্ত জগৎই পুরুষের স্বীয় কর্মফল ভোগের সাধনরূপে প্রাপ্ত। "ভোগ্যরূপমিদং সর্বং জগৎ স্যাৎ ভূত ভৌতিকম্"। সেই পুরুষ, স্বীয় কর্মফল উপভোগের নিমিত্তই, একদেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে যাইতে বাধ্য হয়। সুতরাং সমস্ত জগৎই তাহার কর্মদ্বারা পরিচালিত হইয়া তদীয় কর্মফল ভোগের উপযুক্ত সাধন অর্থাৎ শরীরাদি নির্মাণ করিয়া নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। শ্রুতিতে ও তেমন কথা আছে—"কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তে"। অর্থাৎ পুরুষ স্বকৃত লোকেই জন্মলাভ করে। ইহার উদাহরণ এই যে,—যেমন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় প্রবেশের ইচ্ছুক পুরুষের জন্য ভোগ্য নির্মিত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি। অর্থাৎ জীবগণ যখন জাগ্রদবস্থা হইতে অপসৃত হইয়া স্বপ্নাবস্থার মধ্যে গিয়া সুষুপ্তি অবস্থায় প্রবেশ করে, তখন তাহাদের বাহ্য জগতের সহিত কোনরূপ সম্পর্কই থাকে না,—আবার যখন সুষুপ্তি ভঙ্গে স্বপ্নাবস্থায় মধ্য দিয়া জাগ্রদবস্থায় আসিয়া বিষয় ভোগ করার আবশ্যক হয়, তখন তাহাদের ভোগ্যবস্তু যোগায় কে? না, জগৎ। এস্থলে বুঝিতে হয় যে, জীবের স্বকীয় কর্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বয়ং জগৎই তাহার উপযুক্ত ভোগ্য সামগ্রী আনিয়া সম্মুখে উপস্থাপিত করে। এইরূপ মৃত্যুর পরেও জগৎই জীবের স্বস্ব কর্মানুযায়ী লব্ধ ভোগ্য বিষয় আনিয়া জীবকে উপহার দেয়। মৃত্যুর পরে কর্মফলাভিজ্ঞ সাংসারীকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ভূতগণ—অর্থাৎ শরীর নির্মাতৃগণ ও ইন্দ্রিয়াধিপতি সূর্যাদি দেবতাগণ, উক্ত সংসারীর কর্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া, তাহার পূর্বদেহের অনুষ্ঠিত কর্মফলের অনুরূপ উপভোগ্য সামগ্রী সমূহ লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, 'আমাদের ভোক্তা কর্তা এই আসিতেছে'—এইরূপ করিয়াই অপেক্ষা করিয়া থাকে।

মানুষ স্বকৃত কর্মফল স্বয়ংই ভোগ করে। এ বিষয়ে অন্যকৃত কর্মফল তাহার সাহায্যকারী হয় না। মানুষের কর্মফললব্ধ লোকাদি লাভের জন্য দেবতারা স্বয়ং সাহায্যই করিয়া থাকেন, সুতরাং দৈববাদীদিগের এতদ্বিষয়ক যে উক্তি তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

দার্শনিকদিগের মত এই যে,—দৈব এবং পুরুষকার বস্তুগত্যা পৃথক্ নহে। উভয়ই

জীবের স্বীয় কর্মলব্ধ ফল মাত্র। বর্তমান দেহের পূর্ববর্তী দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মের যে ফল, তাহা আসিয়া কচিৎ বর্তমান দেহের উপর আধিপত্য করে, তাহারই নাম দৈব; আর বর্তমান দেহের দ্বারা যে যে কর্মানুষ্ঠান করা হইতেছে, তাহার যে সকল ফল বর্তমান দেহে ভোগ হয়, তাহারই নাম পুরুষকার। কোন কোন লোকের বর্তমান দেহের অভ্যাস ব্যতীতও চিত্রকর্মাদি অথবা গান বাজনাদি কার্যে আবাল্য পটুতা দেখা যায়,—এই যে চিত্রকর্ম ও গান বাজনাদির স্বাভাবিক স্ফুরণ, ইহা বর্তমান দেহের কোনরূপ অনুশীলন ব্যতীত স্বতএব বিকাশ পাইয়াছে; ইহা পূর্ব পূর্ব দেহের সংস্কার মাত্র;—এই যে সংস্কার, ইহারই নাম, বিধিলিপি, প্রাক্তন বা দৈব। আর আমি যদি বর্তমান দেহ খাটাইয়া নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে জাহাজ প্রস্তুত করিতে শিখি, তবে তাহাই হইবে পুরুষকার। আমি পূর্ব পূর্ব দেহে যে সকল বিষয় নিরন্তর অনুধ্যান করিয়া আসিয়াছি অথবা যে সকল কার্য করিয়া আসিয়াছি,—তত্তৎকর্মের কোন কোন ফল যদি আমার বর্তমান দেহে আসিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে,—তবে তাহাকে আমারই কৃতকর্মের ফল বলিব; সুতরাং যাহাকে দৈব বলা হয়—তাহাও এই দেহের পূর্ব পূর্ববর্তী দেহের অর্জিত কর্মের ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। এস্থলে দৈব আর পুরুষকার উভয় এক হইয়া যাইতেছে।

গীতাস্মৃতিতে আছে—"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্মফল কামনা পরিত্যাগ পূর্বক কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় পাপদ্বারা লিপ্ত হন না। "অনন্যা-শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে"—যাঁহারা একাগ্রচিত্তে আমাকে চিন্তা করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; "অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে"—যে সকল ব্যক্তি অনন্য সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন; "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"—মনকে সমস্ত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতেই স্থির করিয়া রাখ; "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—তুমি নানাপ্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সর্বাত্মরূপ আমাকে আশ্রয় কর, অর্থাৎ আমারই শরণাগত হও। এই প্রকারে গীতাতে সর্বত্রই সাধনের (পুরুষকারের) দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে বলা হইয়াছে। কুত্রাপি বিনা সাধনে সিদ্ধিলাভের কথা বলা হয় নাই। অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ" (সাংখ্যসূত্র)। শান্তিশতকে দেখা যায়—"ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃকিঞ্চ বিধিনা। নমস্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" পারিপার্শ্বিক ভাল মন্দ ঘটনার জ্ঞান হইলে, বিচারাদি করিয়া ভালর দিকে প্রবৃত্তি ও মন্দ হইতে নিবৃত্তির যে ইচ্ছা ("জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা") হয়, তাদৃশী ইচ্ছার নাম পুরুষাকার। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধি করিবার যে তীব্র ইচ্ছা, তাহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। এই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার দ্বারাই পরমধর্ম অধিকৃত হয়। "অয়ন্তু পরমো ধর্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্।" অর্থাৎ যোগের দ্বারা যে আত্মদর্শন হয়, তাহাই

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আত্মদর্শন অবস্থায় দুঃখনিবৃত্তিরূপ শান্তি লাভ হয় বলিয়া আত্মদর্শন পরমধর্ম। যতটুকু অভ্যাস (পুরুষকার, প্রযত্ন) করা হইবে, ততটুকু ফললাভ হইবে। যথাসাধ্য যত্ন করাই কর্তব্য।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণের চতুর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কতিপয় সর্গে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—পুরুষকারের ফল কর্ম,—পুরুষকার কর্মদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। তাহা প্রত্যক্ষীভূত, যেমন, গমন ভোজন ইত্যাদি। দৈব ত মন্দমতি মূঢ়গণের কল্পিত, প্রকৃত পক্ষে তাহা অলীক, কেননা দৈবও পূর্বজন্মের পুরুষকার ভিন্ন আর কিছু নহে। সজ্জনাচরিত ও উপদিষ্ট পন্থা অনুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে চালনা তাহারই নাম পুরুষকার। যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহার জন্য যদি শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই বস্তু প্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীর ব্যত্যয় হইলে অর্ধপথ হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয়। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হইতে যে ইন্দ্রত্বের এ গৌরব,—কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলেই সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলেই কমলাসন ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেই গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর পদে সমাসীন হইয়াছেন। এই সংসারে কোনও এক প্রাণী পুরুষকার নামক প্রযত্ন বলেই অর্ধনারীশ্বর শিবরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই পুরুষকার দ্বিবিধ, প্রাক্তন ও অদ্যতন (বর্তমান)। প্রাক্তন অর্থাৎ দৈব পুরুষকার, অদ্যতন বা বর্তমান পুরুষকার দ্বারা জয় করা হয়। উৎসাহসমন্বিত, দৃঢ়তর, অধ্যবসায়ী, যত্নশীল পুরুষগণ শত শত সুমেরুকে জীর্ণ করিতে পারেন। প্রাক্তন পুরুষকার ত তুচ্ছ কথা।

যে, যে প্রকার যত্ন করে, তাহার সেইরূপ কর্ম ঘটিয়া থাকে। দৈবও কর্ম ব্যতীত আর কিছু নহে। কর্ম দ্বিবিধ। শাস্ত্র বহির্ভূত আর শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত। তন্মধ্যে শাস্ত্রবহির্ভূত কর্মানুষ্ঠানের ফল অনিষ্ট, আর শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত কর্মানুষ্ঠানের ফল ইষ্টসাধক। অতএব লোকে, শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত পুরুষকার সহকারে সেইরূপ যত্ন করিবে, যাহাতে ইহ জীবনের অনুষ্ঠিত কর্ম, অন্য ঐহিক সৎকর্মের সাহায্যে প্রাক্তন বা দৈবকে পরাজয় করিতে পারে। সমবল এবং ন্যূনাধিক বলসম্পন্ন, স্বীয় এবং পরকীয় কর্ম, মেষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর একে অন্যকে পরাভব করার জন্য প্রবৃত্ত হয়, (যেমন মনুষ্যদিগের তপস্যায় দেবতাদিগের বিঘ্নাচরণ), তন্মধ্যে যাহার শক্তি অধিক সেই জয়ী হয়। যথায় শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত কর্ম করিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিতে হইবে যে, অনিষ্টজনক স্বীয় দুষ্কর্ম প্রবল আছে। অতি দৃঢ়ভাবে কল্যাণজনক ঐহিক কর্ম আশ্রয় করিয়া ফলোন্মুখ প্রাক্তন দুষ্কর্মকেও জয় করিতে পারিবে। প্রাক্তন কর্ম আমাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে, ইত্যাকার বুদ্ধিকে জোর করিয়া নিপাতিত করিবে, প্রত্যেক কর্মের নিকট সে বুদ্ধির আধিক্য নাই। যতক্ষণ ঐহিক সৎকর্মদ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত না হয়, ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্মে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্মদ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে। ভাবী দোষ যে ঐহিক কর্মদ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাই এ বিষয়ের

উদ্‌যোগশীল বুদ্ধিবলে, প্রাক্তনরূপ অশুভ দূর করিয়া আপনাকে সংসার হইতে উত্তীর্ণ করার জন্য শম, দম প্রভৃতি লাভের নিমিত্ত যত্ন করিবে। শাস্ত্রানুমোদিত উদ্‌যোগ ইহলোক ও পরলোকের উপকারী। বিষ্ণু যেমন অসুর-পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সংসার কুহর হইতে স্বীয় বলপূর্বক নির্গত হওয়া আবশ্যক। স্বীয় দেহ যে নশ্বর, ইহা প্রতিদিন বিবেচনা করিবে। পশুগণের সদৃশ মূঢ়তা পরিত্যাগ করিবে। সৎপুরুষের কর্তব্য অবলম্বন করিবে। শুভ কর্মদ্বারা শুভফল লাভ হয়, অশুভ কর্মদ্বারা অশুভ ফল লাভ হয়,—দৈব নামে স্বতন্ত্র বস্তু আর কিছুই নাই। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক প্রভৃতি সাধন চতুষ্টয় আশ্রয় করিবে। যে সকল মূঢ় মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া যথাশাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তাহাদিগের ইষ্টভোগ-লিপ্সায় ধিক্। শাস্ত্রীয় পুরুষকারের যে অবধি নাই, তাহাও নহে, কিন্তু তাহা প্রযত্ন সাপেক্ষ। অথচ প্রস্তর হইতে রত্ন লাভের জন্য বহু যত্ন করিলেও তাহা বিফল হয়। কিন্তু শাস্ত্রীয়, কর্মে প্রবর্তমান প্রযত্ন কখনই নিষ্ফল হয় না। তবে ফল তারতম্য আছে। যেমন ঘটের পরিমাণ আছে, পটের পরিমাণ আছে, তেমন পুরুষার্থেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। অর্থাৎ ঘট হইলেই যে সকল ঘটে সমান পরিমাণ জল ধরে তা নয়। বস্ত্র হইলেই যে তাহা সকলেই পরিধানযোগ্য ও সমান দীর্ঘ হয়, তা নয়। পরিমাণ অনুসারে তাহারও তারতম্য হয়। তদ্রূপ পুরুষার্থ হইলেই যে তাহা সমান ফলের হেতু তাহা নহে। পরিমাণনির্দেশ ইহাতেও আছে। সৎশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া এবং সদাচারপূর্বক পুরুষার্থ (কর্ম) করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ফলদান করিয়া থাকে। ইহাই কর্মের স্বভাব। এই হইল পুরুষার্থের স্বরূপ। এই সব বুঝিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে কোন মানবই কখন বিফল প্রযত্ন হয় না। হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পুরুষ প্রবরগণ দারিদ্র্য দুঃখ শোক ভোগ করিয়াও পুরুষাকার প্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছেন। আশৈশবে বিশেষরূপে বারম্বার অনুষ্ঠিত শাস্ত্রচর্চা ও সৎসঙ্গ প্রভৃতিগুণদ্বারা স্বার্থলাভ, পুরুষের ফল; অতএব যাহারা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, অনুভূত, শ্রুত এবং অনুষ্ঠিত কার্যাবলীকে দৈবায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই সকল কুমতি মানবগণের অস্তিত্বই নাই। আলস্য দোষে এই সসাগর ধরামণ্ডল মূর্খ ও দরিদ্র মানবে পরিপূর্ণ; নিরন্তর কল্পিত ক্রীড়া-চঞ্চল-শৈশব অতিক্রান্ত হইলে মানব, পদ-পদার্থ পরীক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া যৌবন কাল হইতেই প্রযত্ন সহকারে সৎসঙ্গ আশ্রয় করিয়া স্বীয় দোষ গুণ বিচার করিবে। অর্থাৎ মুক্তির জন্য নিত্য-অনিত্য বস্তু-বিবেক প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয় আয়ত্ত করিতে যত্ন করিবে।

যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে, সেই আত্মবিদ্বেষ্টা জনগণ ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিতয়ের নাশ করিয়া থাকে। সংবিদ স্পন্দ (তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ) তৎপরে মনঃস্পন্দ (পুরুষার্থ সাধনেচ্ছা) পরে ইন্দ্রিয়স্পন্দ (অঙ্গচালনার্থ কর্মেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি) এই তিনটি অবস্থা হইতেছে পুরুষার্থের স্বরূপ। চিত্তমধ্যে যাদৃশ বিষয় স্ফূর্তি হয়, চিত্তও

তাদৃশ স্পন্দ প্রাপ্ত হয়। শরীর চেষ্টাও তথাবিধ হইয়া থাকে। সুতরাং ফলভোগও তদনুরূপ হয়। বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্যও পুরুষকার বলে দৈত্যগুরু হইয়াছেন। এইরূপ প্রয়ত্নশীল কতশত মানব দৈন্য দারিদ্র্য-দুঃখে পীড়িত হইয়াও পুরুষকারের বলে ইন্দ্রতুল্য হইয়াছেন, আবার ভূতপূর্ব সম্পত্তিশালী নহুষ প্রভৃতি রাজগণ বহু বিভব-রস আস্বাদন করিয়াও পৌরুষদোষে নরকের অতিথি হইয়াছেন। শাস্ত্রালোচনা, গুরূপদেশ ও স্বীয় প্রযত্ন এই ত্রিতয়ের সাহায্যেই সর্বত্র পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহাতে কদাচ দৈবের অপেক্ষা করে না। অশুভপথে প্রধাবিত চিত্তকে, যত্নবলে শুভপথে লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই সমুদয় তত্ত্বশাস্ত্রের অর্থ। যাহারা অল্পবুদ্ধি,—দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বস্ত বা সান্ত্বনা দিবার নিমিত্তই লোকে দৈব শব্দের ব্যবহার করে।

তবে, দৈব যে কি, তাহা বলা যায় না। উহা একটি যোগরূঢ়* শব্দ। দৈবের আকার নাই, কোন কর্ম নাই, স্পন্দ নাই ও কোন পরাক্রম নাই। ফলতঃ মানুষ স্বীয়কৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত হইলেই 'এই কর্মে এই ফল হয়'—এই প্রকার বাক্য মাত্রই দৈব নামে প্রসিদ্ধ। এ জগতে দৈবেরই যদি কর্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? কোন দুই ব্যক্তির কর্ম নির্বাহোপযোগিনী বুদ্ধি সমান, দুই জনেই কার্যের জন্য সমান পরিশ্রম করিয়াছে,—কিন্তু একজনের আশা পূর্ণ হয় নাই, আর একজন পূর্ণ মনোরথ হইয়াছে,—ইহার কারণ কি? তুমি বলিবে দৈব। আমি বলিব পুরুষকার। কারণ নিরবয়ব আকাশের সহিত শরীরীর যেমন সঙ্গ হইতে পারে না, সেইরূপ মূর্তিহীন দৈবের সহিত কারণান্তরের সংযোগ সম্ভবে না। মূর্তিমান পদার্থ-দ্বয়ই পরস্পর সংযুক্ত হয়। সুতরাং দৈব বলিয়া কিছু নাই। বিশ্বামিত্র ঋষি দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া এক পুরুষকার বলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, দৈত্যেরা কেবল পৌরুষবলেই দেবসমূহকে উৎপাদিত করিয়া ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে। কুমার নন্দীশ্বর মনুষ্য দেহধারী হইয়াও সেই জীবনেই উৎকট তপস্যা (পৌরুষ) প্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ"—এই সূত্রে উৎকট পুরুষকারের প্রভাব কীর্তিত হইয়াছে।

যাহা দৈব, তাহা কর্ম। সেই কর্ম—মন; সেই মন—পুরুষ; অতএব পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন সকলই অসত্য। সুতরাং দৈব বলিয়া এতদতিরিক্ত আর কিছু নাই।

উপরের কথাগুলি আলোচনা করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, প্রাক্তন কর্ম বা দৈব, আমার পূর্বদেহের কৃতকর্মের ফল, আর পুরুষকার আমার বর্তমান দেহের কৃতকর্মের ফল। সুতরাং প্রাক্তন কর্মফল আর পুরুষকার দ্বারা বর্তমান দেহ লব্ধ কর্মফল, উভয়ই আমার কৃতকর্ম লব্ধ তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দৈবের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে তৎপ্রতি যাহারা আস্থাবান, তাহাদিগের ভ্রম নিরশন জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল। ভরসা এই যে, এতদ্দ্বারা যদি একজনেরও মোহ কাটিয়া যায়।

"যস্য স্মরণ মাত্রেণ ন মোহো ন চ দুর্গতিঃ।
ন রোগো ন চ দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহম্॥"

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

---

* যে সকল শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ ও অবয়ব শক্তিজাত অর্থ, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থের প্রকাশক হয়, তাহা রূঢ়। যেমন মণ্ড শব্দের উত্তর পা ধাতু ড প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন পদটি হইতেছে মণ্ডপ। ইহার প্রকৃতি প্রত্যয় লব্ধ অর্থ হইল—মণ্ড পান করে যে, কিন্তু রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধিবশতঃ এই মণ্ডপ শব্দটি দেবোদ্দেশে প্রস্তুত গৃহকে বুঝায়।

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

বিশেষ্যভাগ বাদ দিয়া কেবল বিশেষণভাগকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলিলে আকাশ, দিক্, কাল প্রভৃতি অলক্ষ্যেও লক্ষণ সঙ্গত হয়। কারণ ঐ সকল দ্রব্যে শব্দভিন্ন অপর কোন বিশেষগুণ থাকে না। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ বিশেষণভাগের উদ্দেশ্য।

সম্পূর্ণ বিশেষণভাগের পরিবর্তে যদি 'গুণশূন্য' এইটুকু মাত্র বিশেষণভাগ বলা হয় তবে উল্লিখিত লক্ষ্যবস্তুগুলির মধ্যে কোনটিই একেবারে গুণশূন্য না হওয়ায় কোন লক্ষ্যেই লক্ষণ সমন্বিত হয় না, এ জন্য অসম্ভব দোষ উপস্থিত হয়।

কথিত অসম্ভব-দোষ নিবারণের জন্য 'বিশেষগুণশূন্য' এইরূপে বিশেষণভাগ বলিলে মন সকলবিধ বিশেষগুণ শূন্য হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সঙ্গত হয় কিন্তু নাসিকা প্রভৃতি অপর পাঁচটি লক্ষ্য বিশেষগুণশূন্য না হওয়ায় উহাতে লক্ষণসঙ্গতি হয় না বলিয়া অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

উল্লিখিত অব্যাপ্তিদোষ পরিহারের জন্য বিশেষণ অংশকে উদ্‌ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণশূন্য (অর্থাৎ বিশেষগুণসমূহের মধ্যে যাহারা প্রত্যক্ষযোগ্য কেবল সেই প্রকার বিশেষ-গুণ যাহাতে না থাকে এবংবিধ) এই প্রকারে পরিবর্ত্তন করিলে নাসিকা প্রভৃতি চারিটি লক্ষ্যের বিশেষগুণ সকল প্রত্যক্ষযোগ্য না হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সঙ্গত হয় বটে, কিন্তু পঞ্চম লক্ষ্যবস্তুর (কর্ণের) বিশেষগুণ (শব্দ) প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় উহাতে 'বিশেষণ' ভাগ সঙ্গত হইল না।

এইরূপে কর্ণে যে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, উহা নিবারণের জন্য লক্ষণস্থ 'বিশেষগুণ' কথাটির 'শব্দভিন্ন বিশেষগুণ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে কর্ণ-ইন্দ্রিয়ে শব্দ ভিন্ন অন্য কোনও প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ না থাকায় উহাতে বিশেষণভাগ ঠিকমত থাকিল। বিশেষ্যভাগের সঙ্গতি পূর্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব উহাতেও লক্ষণ সমন্বিত হইল।

ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়।

বাহ্যেন্দ্রিয়—সাধারণতঃ [১] বাহিরের বস্তু বিষয়ে প্রত্যক্ষ জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে বাহ্যেন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয় বলে। বাহ্যেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার [২] —নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ।

---

(১) শরীরের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের কথা 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে ২।৭ শ্লোকে পাওয়া যায়।

(২) প্রাচীন সাংখ্যসম্প্রদায়বিশেষ একেন্দ্রিয়বাদী ছিলেন; এই মতে কেবল 'ত্বক্'ই ইন্দ্রিয়। কোন কোন সাংখ্য সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয় সাতটি। (২।২।১০ ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য)

অন্তরিন্দ্রিয়—ইহার দ্বারা সুখ দুঃখ ইত্যাদি শরীরের অভ্যন্তরস্থিত বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ইহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ বলা হয়১।
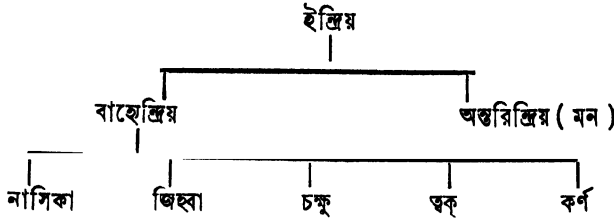
শরীর।

শৄ-ধাতু হইতে উৎপন্ন শরীরশব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ বিচার করিলে বুঝা যায়, উহার অর্থ বিশরণবিশিষ্ট অর্থাৎ শীঘ্রক্ষয়শীল কোন বস্তু। প্রধানতঃ স্থূল দেহ বুঝাইতে শরীর-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভোক্তৃবর্গের মধ্যে স্থূল দেহই সর্বাপেক্ষা আশু ক্ষয়শীল বা অল্প-কাল স্থায়ী। স্থূলদেহে শরীর শব্দের প্রয়োগের মূলে এইরূপ যোগার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকা অসম্ভব নহে। ভোক্তৃবর্গ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সর্বসাধারণে একই বস্তুকে ভোক্তা বলেন না। বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ বস্তুকে ভোক্তা বলেন। ভোগশব্দের অর্থ সুখ ও দুঃখের সাক্ষাৎকার। যিনি সুখ দুঃখ অনুভব করেন তিনিই ভোক্তা। সাধারণতঃ 'ভোক্তা' বলিলে আত্মাকেই বুঝায়২। স্থূলশরীর, লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মদেহ, কারণ-শরীর৩, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং এই সকল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বস্তুবিশেষ বিভিন্ন মতে ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাণীমাত্রই ভোগের জন্য শরীরের অপেক্ষা রাখে। শরীরকে আশ্রয় না করিলে কোন জীবেরই ভোগ নির্বাহ হইতে পারে না। এজন্য শরীরকে ভোগায়তন বলা হয়।

শরীর পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূতের মিলনে শরীর সৃষ্টি হয়। উক্ত মহাভূতসমুদায়ের প্রত্যেকেই শরীরের প্রতি একই প্রকারে কারণ—এইরূপ একটি মত জনসাধারণমধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। ন্যায়শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই৪। এইমতে এক একটি মহাভূতই এক একবিধ শরীরের উপাদান, অপর মহাভূতসকল উহাতে সহকারী মাত্র। কিন্তু আকাশ কোনও শরীর সৃষ্টিতে উপাদান

(১) সাঙ্খ্যমতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্ব। অহঙ্কার ও বুদ্ধি অন্তঃকরণ, কিন্তু উহারা ইন্দ্রিয় নহে। বেদান্তমতে অন্তঃকরণ চতুর্বিধ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। একই অন্তঃকরণ-বস্তু বিভিন্ন কার্য্যে করণ বলিয়া পৃথক্ নামে উল্লিখিত হইলেও স্থানবিশেষে বুদ্ধিকে কর্তা ও ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। পঞ্চদশী ৬।৮ শ্লোক।

(২) অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মই আত্মা, কিন্তু তিনি ভোক্তা নহেন।

(৩) লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর ন্যায়ে স্বীকৃত হয় নাই, উহা সাঙ্খ্য ও বেদান্তসম্মত।

(৪) 'প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে'। বৈশেষিকসূত্র ৪।২।২-৪ দ্রষ্টব্য।

নহে, তবে সর্বব্যাপী বলিয়া উহা শরীরের মধ্যেও আছে। কিরূপ শরীর কোন মহাভূতের সৃষ্ট তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে।

লক্ষণ। শরীরের লক্ষণ চেষ্টাশ্রয়ত্ব অর্থাৎ যাহাতে চেষ্টানামক ক্রিয়া থাকে তাহা শরীর। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব অথবা ভোগায়তনত্ব ও শরীরের লক্ষণ হইতে পারে।

লক্ষ্য। জীবদেহে কত অগণিত বৈচিত্র্য সম্ভব হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাণিতত্ত্ব-বিদেরা ঐ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছেন বিষয়ের তুলনায় তাহা সামান্য মাত্র। তথাপি বিভাগ দর্শনে শরীর বিষয়ে কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সমন্বয়। বায়ুর সংযোগে লম্বমান বস্ত্রাদিতে যে স্পন্দন দেখা যায় জীবিত ব্যক্তির হস্তপদাদি সঞ্চালন উহা হইতে ভিন্নজাতীয়। কারণ, হস্তপদের এই ক্রিয়া প্রাণীর যত্ন বশতঃ হইয়া থাকে। এই ক্রিয়ার নাম চেষ্টা। এই চেষ্টানামক ক্রিয়া শরীর ভিন্ন অন্যত্র থাকে না। সুতরাং জীবিতশরীরে সহজে এই লক্ষণের সঙ্গতি করা যায়। বৃক্ষ-লতাদিও সুখ দুঃখ অনুভব করে ইহা প্রাচীনসম্মত[১]। আধুনিক বিজ্ঞানেও উহা সমর্থিত হইয়াছে। অতএব ঐ সকলও শরীর-লক্ষণের লক্ষ্য এবং উহাতে লক্ষণসমন্বয়ও হইয়াছে।

মতবিশেষে পদতল হইতে মস্তকের চর্ম পর্যন্ত যাবতীয় অবয়বে গঠিত একটি অবয়বীই একটি শরীর এবং উহাই শরীর লক্ষণের লক্ষ্য। এতদনুসারে শরীরের অবয়ব হস্ত-পদাদি ইহার অলক্ষ্য এবং চেষ্টা হস্ত-পদাদি অবয়বেও থাকে বলিয়া ঐ সকলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত দোষ বারণের জন্য "চেষ্টাযুক্ত অন্ত্যাবয়বী" এই পর্যন্ত লক্ষণ বলা আবশ্যক। অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ চরম অবয়বী, যাহা কখনই অবয়ব হয় না তাহাই শরীর।

শরীর দ্বিবিধ—অদিব্য ও দিব্য। অদিব্য দেহ দ্বিবিধ৷ যোনিজ এবং অযোনিজ। যোনিজ দেহ দুই প্রকার—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। অযোনিজ দেহও দ্বিবিধ—স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। দিব্য দেহ ত্রিবিধ—জলীয়, তৈজস এবং বায়ব্য।

শরীর
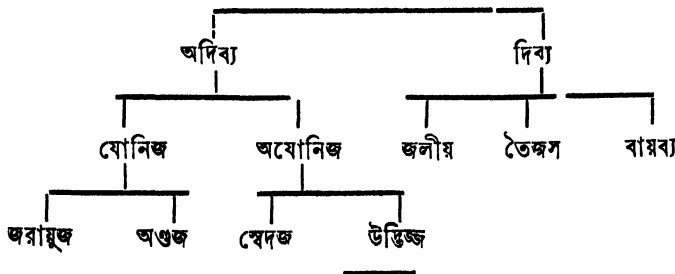
- অদিব্য
  - যোনিজ
    - জরায়ুজ
    - অণ্ডজ
  - অযোনিজ
    - স্বেদজ
    - উদ্ভিজ্জ
- দিব্য
  - জলীয়
  - তৈজস
  - বায়ব্য

---

(১) "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" মনু ১।৪৯ শ্লোক।
শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" মনু ১২। ৯।
যো বৈ চূতত্বয়া দৃষ্টস্ত্বভোগ্যফলপুষ্পকঃ। গোদাবরীতীরবাসী স বিদ্যাপতি নামকঃ॥ অনন্ত-ব্রতকথা।
প্রশস্তপাদাচার্য্য শ্রীধরভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র জয়ন্তভট্ট ও বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির মতে বৃক্ষাদি শরীর নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবী

বিভাগানুসারে পৃথিবী প্রথম দ্রব্য। দার্শনিকেরা স্থূলবস্তু অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যে বস্তুর বিশেষগুণ একাধিক বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহা স্থূল। এই ইন্দ্রিয় যত অধিক প্রকারের হইবে উহার আশ্রয় দ্রব্যও তত বেশী স্থূল হইবে। দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী স্থূলতম। কারণ, ইহার গুণ—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু এবং ত্বক্ এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়[১]। অপর কোনও দ্রব্যের গুণ চারিটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না।

বৈচিত্র্যের দিক্ হইতেও পৃথিবী সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ রস, ও রূপ পৃথিবীতেই সম্ভব হয়। ইহার আকৃতিগত বৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ। পর্বত, বনানী, কৃষিক্ষেত্র, মরুভূমি, উদ্ভিদ্, জীবশরীর, ঘৃত, তৈল ইত্যাদি সমস্তই পৃথিবী। 'পার্থিব'-শব্দে পৃথিবীজাতীয় দ্রব্য বুঝায়। পৃথিবী বুঝাইতে শাস্ত্রে 'ক্ষিতি' শব্দেরও সমধিক ব্যবহার দেখা যায়।

লক্ষণ। পৃথিবীর লক্ষণ গন্ধ (গন্ধবত্বং পৃথিবীত্বং) অর্থাৎ যে-জাতীয় দ্রব্যে গন্ধ থাকে তাহাই পৃথিবী।

লক্ষ্য। বিভাগ কিংবা স্বতন্ত্ররূপে নাম নির্দেশ করিয়া এই লক্ষণের সমুদায় লক্ষ্যের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পার্থিব বস্তুসকল এতই বিভিন্নজাতীয় যে, উহার অবান্তর জাতি-সমূহও অসংখ্যেয়। তবে জল, অগ্নি ও বায়ু—সাধারণতঃ ইহারা লোকপ্রসিদ্ধ, এই তিনটী ব্যতীত আর যাহা কিছু চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয় তাহাই পৃথিবী; এইরূপে লক্ষ্য পার্থিব বস্তুসমুদায়ের স্থূল ভাবে পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে[২]।

সমন্বয়। ফুল, ঘৃত ইত্যাদির গন্ধ অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উহাতে লক্ষণ সমন্বিত হইল। কাচ, প্রস্তর ইত্যাদি দ্রব্যে শাস্ত্রকারেরা গন্ধের অস্তিত্ব অনুমান করেন। গন্ধ উৎকট না হওয়ায় কিংবা অনুদ্ভূত হওয়ায় এই সমস্ত দ্রব্যে গন্ধ অনুভূত হয় না।

বায়ুতে যে ফুলের গন্ধ অনুভূত হয় উহা আমরা ফুলের গন্ধ বলিয়াই ব্যবহার করি এবং নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াই কোন্ গন্ধ কাহার তাহাও চিনিতে পারি। সুতরাং ঐ গন্ধ যে বায়ুর নিজস্ব নহে, পরন্তু বায়ুমধ্যস্থ কুসুমের অংশের তাহা মানিতে হইবে। অতএব বায়ুতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটে নাই। এইরূপ জলে পচাপাতা ও মৎস্যাদির গন্ধ এবং অগ্নিতে

---

(১) বেদান্তমতে শব্দ ও পৃথিবী জল ইত্যাদি পঞ্চভূতের গুণ (পঞ্চদশী ২।৫ শ্লোক) অতএব এই মতে পৃথিবীর গুণ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য।

(২) বৌদ্ধদর্শনে ও চরকসংহিতায় পৃথিবীকে 'খর' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। এই খরত্ব কাঠিন্যেরই নামান্তর অথবা অন্য কিছু তাহা বিচার্য।

দাহ্য শবের গন্ধও উহাদের নিজস্ব নহে ১। বায়ুতে ফুলের সূক্ষ্ম অংশের প্রবেশের ন্যায় জল এবং অগ্নিতেও ঐ সমস্ত পার্থিব বস্তুর সূক্ষ্ম অংশ প্রবিষ্ট হয়। সূক্ষ্মতাবশতঃ ঐ সব পার্থিব অংশ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়াই জল, বায়ু, অগ্নি, ইহারা গন্ধবান্ বলিয়া প্রতীত হয়।

পার্থিব দ্রব্যে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার—এই চতুর্দশবিধ গুণ, ক্রিয়া; সত্তা, দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব এবং পৃথিবীত্বের অবান্তর মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি অসংখ্যেয় জাতি ও বিশেষ এই সকল ভাবপদার্থের২ সমাবেশ হয়।

পৃথিবী দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। নিত্য পৃথিবী—পরমাণু। অনিত্য পৃথিবী ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। পার্থিবশরীর দ্বিবিধ—যোনিজ ও অযোনিজ। যোনিজ দ্বিবিধ—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। অযোনিজ দ্বিবিধ—স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।
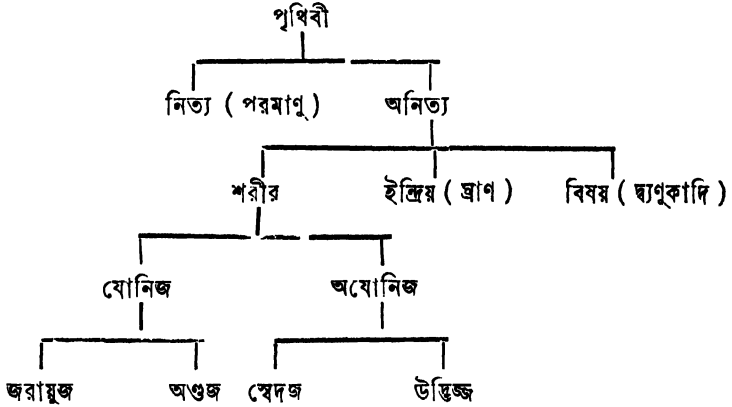
শরীর—মর্ত্যলোকের শরীরসমুদায় পার্থিব। মনুষ্য পশু ইত্যাদির দেহ যোনিজ-জরায়ুজ। সর্প, পক্ষী প্রভৃতির দেহ যোনিজ-অণ্ডজ। কৃমি, দংশ ৩ প্রভৃতির শরীর অযোনিজ-স্বেদজ। বৃক্ষ-লতাদির দেহ অযোনিজ-উদ্ভিজ্জ।

ইন্দ্রিয়—শরীরের যে অংশ নাসিকা নামে প্রসিদ্ধ উহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম পার্থিব অংশ-বিশেষকে **ঘ্রাণেন্দ্রিয়** কহে। উহাই প্রকৃত নাসিকা-ইন্দ্রিয়।

গন্ধ এবং গন্ধগত জাতি সকল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া উহাদিগকে ঘ্রাণের

(১) উপলভ্যাপ্সু চেদ্ গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদাপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্॥

ব্রহ্মসূত্র, ২ অ, ৩ পাদ ২৯ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(২) সমবায়ের বৃত্তিতা বিবাদগ্রস্ত। সমবায় নিরূপণ

(৩) আধুনিক জীববিদ্যা মতে ইহারাও অণ্ডজ।

বিষয় বলা হয়। গন্ধের সহিত ঘ্রাণের সম্বন্ধ—সংযুক্ত সমবায়। গন্ধত্বজাতির সহিত ঘ্রাণের সম্বন্ধ—সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়[১]।

বিষয়—শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত যাবতীয় অনিত্য পার্থিবদ্রব্যই বিষয়-পৃথিবী।

উৎপন্ন সকল পার্থিব দ্রব্যই স্ব স্ব অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিলাভ অর্থাৎ অবস্থান করে এজন্য অবয়বী পদার্থকে সমবেত (অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত) দ্রব্য বলা হয়, উহার আশ্রয় হয় সমবায়ী। যেমন—বস্ত্র সূত্রে সমবেত, সূত্র বস্ত্রের সমবায়ী। অন্যত্র (অবয়ব-অবয়বিভাব না হইলে) ইহার সজাতীয় ও বিজাতীয় দ্রব্যে সম্বন্ধ সংযোগ, যেমন—ভূতলের সহিত ঘটাদির এবং ঘটের সহিত জলের[২]।

জল

জল দ্বিতীয় দ্রব্য। ইহার বিশেষগুণ—রস, রূপ ও স্পর্শ যথাক্রমে জিহ্বা, চক্ষু ও ত্বক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এজন্য ইহাও স্থূল দ্রব্য। ইহার দ্বিবিধ বৈচিত্র্য দেখা যায়, বৃষ্টিকালে ও নদী প্রভৃতিতে তরলাবস্থা এবং শিলাবৃষ্টি কালে করকা (শিল) ও অতিশীতে হিমানী (বরফ) স্বরূপে সংহতাবস্থা। জলের অন্য একটি নাম 'অপ্'। জলীয় দ্রব্য বুঝাইতে শাস্ত্রে 'আপ্য' শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়।

লক্ষণ। যাহার স্পর্শ শীতল, তাহাকে **জল** কহে। (শীতস্পর্শবত্বং জলত্বং)

লক্ষ্য। জল সাধারণের পরিচিত বস্তু। বিভাগে অপ্রসিদ্ধ জলীয় বস্তুরও সন্ধান পাওয়া যাইবে। স্বভাবতঃ তরল হইলেও দুগ্ধ জলের অন্তর্গত নহে, উহা পার্থিব।

সমন্বয়। সুগম। পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত, তৈজস দ্রব্যের স্পর্শ উষ্ণ[৩]। আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যে কোন প্রকার স্পর্শই থাকে না। সুতরাং লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শীতল স্পর্শ জলের স্বাভাবিক, কোনকালেই উহার পরিবর্তন হয় না, তবে অধিক তেজঃ-সংযোগ হইলে অদৃশ্য তৈজসকণাসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শীতল স্পর্শকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সেজন্য উহাদেরই উষ্ণস্পর্শ জলে আরোপিত হয়। কালক্রমে তৈজসকণা অপসৃত হইলে পুনরায় উহা শীতল বলিয়াই প্রতীত হয়। অতএব লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা হয় না।

জলীয় দ্রব্যে রস, রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার এই চতুর্দশবিধ গুণ, ক্রিয়া; সত্তা, দ্রব্যত্ব ও জলত্ব জাতি এবং বিশেষ এই সমস্ত ভাব পদার্থের সমাবেশ হয়।

---

(১) পুষ্পাদির সূক্ষ্ম অবয়বে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় এবং ঐ অবয়বের সমবায় সম্বন্ধ গন্ধে থাকে। অতএব ঘ্রাণের সংযুক্ত পুষ্পাদি রেণু উহার সমবায় সম্বন্ধ গন্ধে সম্ভব হয়। গন্ধে গন্ধগত জাতিসমূহের সম্বন্ধ সমবায়। অতএব ঘ্রাণের সংযুক্ত-সমবেত-(পুষ্পাদি গন্ধ) সমবায় সম্বন্ধ ও গন্ধত্ব, সুরভিত্ব ইত্যাদি জাতিসমূহে রহিয়াছে।

(২) পার্থিব দ্রব্যের ন্যায় জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় দ্রব্যেরও অবয়ব-অবয়বিভাব স্থলে সমবায়—সম্বন্ধ ও অন্যত্র দ্রব্যান্তরের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। তাহা পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইল না।

(৩) স্পর্শনিরূপণ দ্রষ্টব্য।

জল দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। নিত্যজল—পরমাণু। অনিত্য জল ত্রিবিধ—শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়।
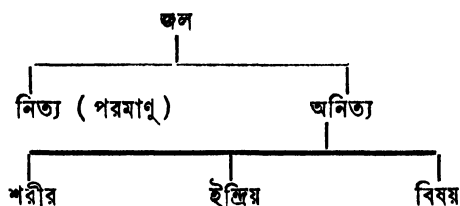
শরীর—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বরুণলোকস্থ জীবের দেহ জলময় অর্থাৎ উহাতে পার্থিব, তৈজস ও বায়বীয় অংশ থাকিলেও জলই উহার উপাদান।

ইন্দ্রিয়—যাহা জিহ্বা নামে ব্যবহৃত হয়, উহা স্থূল পার্থিব দ্রব্য। উহার মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম জলীয় দ্রব্যই যথার্থ **রসনা** বা **জিহ্বা** ইন্দ্রিয়।

সকল প্রকার রস এবং রসগত জাতিসমূহ রসনা-ইন্দ্রিয়ের বিষয়। রসের সহিত রসনা-ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায় এবং রসগত জাতির (রসত্ব, কটুত্ব, তিক্তত্ব প্রভৃতির) সহিত সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় [১]।

বিষয়—শরীর এবং ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর সমস্ত অনিত্য জলই 'বিষয়' জলের অন্তর্গত। বিশেষ বিশেষ পার্থিব দ্রব্যেই কোন কোন পার্থিবদ্রব্য অবয়ব হইয়া থাকে, সকল পার্থিব দ্রব্য অবয়ব হয় না। যেমন বস্ত্রে সূত্র অবয়ব হয়, কিন্তু কারণ হইয়াও তুরী বা মাকু উহার অবয়ব নহে। এইরূপ বিশেষত্ব জলে প্রায়শঃ দেখা যায় না, একপাত্রের জল অন্য পাত্রস্থ জলের সহিত মিশিলেই উহা পৃথক্-ভাবে না থাকিয়া একটি মহাজল সৃষ্টি করে। জলের এই বৈচিত্র্য তেজঃ এবং বায়ুতেও দেখা যায়।

তেজঃ

তেজঃ তৃতীয় দ্রব্য। ইহার রূপ ও স্পর্শ চক্ষু এবং ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ইহাও স্থূল দ্রব্য। পৃথিবী ব্যতীত অপর সকল দ্রব্য হইতে ইহার আকারগত বৈচিত্র্য অধিক। অগ্নি, আলোক, স্বর্ণ, সৌরকিরণ ইত্যাদি তেজঃ-পদার্থের অন্তর্গত। 'তৈজস' শব্দ তেজঃ-দ্রব্যকেই বুঝায়।

লক্ষণ। যাহার স্পর্শ উষ্ণ তাহাকে **তেজঃ** বলে। (উষ্ণস্পর্শবত্বং তেজস্ত্বং)

লক্ষ্য। কি কি দ্রব্য তেজঃ, তাহার কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিভাগ দেখিলে উহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

সমন্বয়। অগ্নি ও সূর্যকিরণে উষ্ণতা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ, এজন্য উহাতে লক্ষণসমন্বয়

---

(১) খাদ্য বস্তু রসনার সহিত সংযুক্ত, উহার সমবায় রহিয়াছে রসে, অতএব রসে রসনার সম্বন্ধ সংযুক্ত সমবায়। রসত্ব, কটুত্ব ইত্যাদি জাতিসমূহে রসের সমবায় থাকায় ঐ সমুদায়ে রসের সম্বন্ধ হয় সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়।

হইল। স্বর্ণ এবং আলোকে উষ্ণতা প্রত্যক্ষ না হইলেও উহাতে উষ্ণস্পর্শের অস্তিত্ব অনুমান দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং উক্ত দুই পদার্থেও লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয় নাই।

কদাচিৎ প্রস্তরাদি পার্থিব দ্রব্যে, জলে এবং বায়ুতেও উষ্ণতা অনুভূত হয়। বহুতর সূক্ষ্ম তৈজসকণা ঐ সমস্ত দ্রব্যে প্রবেশ করিলেই ঐ প্রকার অনুভব হইয়া থাকে। প্রবিষ্ট তৈজসকণাগুলির রূপ উদ্ভূত নহে, এজন্য উহারা স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া প্রস্তরাদি দ্রব্যের স্বাভাবিক স্পর্শ অভিভূত করিয়া রাখে। ইহাতে ঐ সমুদায় দ্রব্যের স্বীয় স্পর্শ অনুভূত হয় না। ফলে উহাতে উষ্ণ স্পর্শ আরোপিত হয়। অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্যে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় নাই।

তৈজস দ্রব্যে রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার এই একাদশবিধ গুণ ; ক্রিয়া ; সত্তা দ্রব্যত্ব এবং তেজস্ত্ব ইত্যাদি জাতি ও বিশেষ পদার্থের সমাবেশ হয়।

তেজঃ দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। নিত্য তেজঃ—পরমাণু। অনিত্য তেজঃ ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বিষয় তেজঃ চতুর্বিধ—ভৌম, দিব্য, উদর্য ও আকরজ।
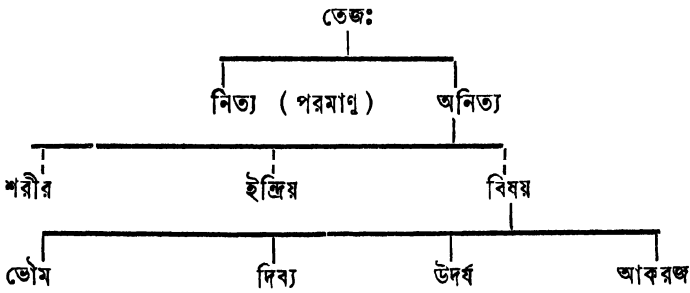
শরীর—আদিত্য লোকে তৈজস শরীরের অস্তিত্ব শাস্ত্রসম্মত।

ইন্দ্রিয়—শরীরের যে-স্থান চক্ষু নামে প্রসিদ্ধ, উহা নানাভাগে বিভক্ত। উহাতে বিস্তৃত শ্বেত বর্ণ ভাগের মধ্যে গোলাকার কৃষ্ণসার বা অন্যবর্ণমিশ্রিত অংশ তারা বা তারকা নামে প্রসিদ্ধ। গোলক উহার অন্য নাম। গোলকের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম তেজোবিশেষকে চক্ষুরিন্দ্রিয় বলে। মনুষ্যাদি জীবের দেহে নাসাদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটী গোলক দৃষ্ট হয় বলিয়া উহাতে দুইটী চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বীকৃত হয়[১]। উহারা একজাতীয় এজন্য বিভাগে সংখ্যা অধিক হয় না। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলেন সকল জীবের দেহে চক্ষুর স্থিতিস্থান এবং গঠনপ্রণালী সমান নহে।

চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজোবিশেষ, সুতরাং উহাতে রূপ ও স্পর্শ আছে। মনুষ্যাদিদেহে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু রাত্রিচর মার্জ্জারাদির নেত্রস্থ রূপ উদ্ভূত হওয়ায় উহাদিগের নেত্ররশ্মি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে[২]।

(১) মনুষ্যদিগের ও চক্ষুরিন্দ্রিয় একটিমাত্র, ইহাও একটি প্রসিদ্ধ মত। ন্যায়সূত্র, ৩য় অধ্যায় ১ আহ্নিক ৭-১১ সূত্রের ভাষ্য, বৃত্তি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(২) ন্যায়সূত্র ৪৪, ১ আ ৩ অঃ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

রামায়ণের শিল্পকলা

শ্রীকালিকাপ্রসাদ দত্ত এম্. এ.

অতীতের কোন্ এক শুভক্ষণে ঋষি বাল্মিকীর মুখ-নিঃসৃত যে বাণী একদা তমসা নদীর তীরে উচ্চারিত হইয়াছিল, শ্লোকের রূপ ধরিয়া তাহা আজ অমরকাব্য রামায়ণরূপে (রামায়ণং কাব্যমীদৃশং ১।২।৪৫) পরিচিতা। বর্তমানে যে আকারে আমরা রামায়ণ গ্রন্থটী দেখিতে পাই, তাহা অবশ্য মূলকাব্য নহে। যুগ যুগ ধরিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে উহা এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য মূলকাব্যটী উদ্ধার করা একরূপ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ মূল এবং প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে যে একমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্যতীত কেহ দুইটী পাঠের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেন না।

ভিণ্টারনিজ্ (Winternitz) বলেন যে বাল্মিকী নামে প্রকৃতই কোন এক ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য তাঁহার উক্তি যুক্তিসাপেক্ষ। যদিও রামায়ণের রচনাকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব দুইশত হইতে তিনশত শতাব্দীর মধ্যে মূল কাব্যটী রচিত হয়। পরবর্তীকালে বহু লিপিকার তাঁহাদের রচনা, শ্লোক বা গাথার আকারে মূলগ্রন্থে যোগ করিয়া বাল্মিকীর রচনা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কাব্যের অন্তরালে এবং কাহিনীর আবরণে রাজনীতি, সমাজনীতি বা শিল্পকলার বহু বিবরণ রামায়ণে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বাহুল্য দোষদুষ্ট হইলেও বর্ণিত বিষয়গুলির সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্পই আছে। কোন একটী বিশেষ বিষয় আলোচনার পক্ষে ইহা হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রামায়ণের শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

"শিল্পী" কথাটীর উল্লেখ রামায়ণের বহুশ্লোকে আছে (১।৫-১০; ১৭-৭; ১৪-২৬; ১৪-২৮; ২।৭৯-১৩, ১৭; ৮০-২২; ১০০-৫০; ৪।২৫-১৪)। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, শিল্পী কাহাদের বলা হইত? রামায়ণের একটী শ্লোক হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। যথা—

> কর্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্দ্ধকীন খনকানপি।
> গণকান্ শিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্॥ (১।১৩।৭)

অর্থাৎ, কর্মান্তিক (কামার?), বর্জকী (কাষ্ঠব্যবসায়ী), খনক, গণক এবং নট নর্তক প্রভৃতিগণকে "শিল্পী" আখ্যা দেওয়া হইত। দশরথ রাজার যজ্ঞগৃহ নির্মাণ কার্যে উক্ত

শিল্পীগণ আহুত হইয়াছিল। উপদেশ দিবার ছলে বশিষ্ঠমুনি বলিয়াছেন, কেহ যেন কাহারও কার্যে অবজ্ঞা প্রকাশ না করে (না চাবজ্ঞা প্রয়োক্তব্যা কাম-ক্রোধবশাদপি—১।১৩-১৫)। ইহা হইতে মনে হয় যে কোন কোন শিল্পকার্য হেয় এবং কোনটী সম্মানার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত জীবিকাগুলি কোন জাতিবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণেরাও কখন কখন শিল্পকার্যে ব্রতী হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কুশলী শিল্পীর অভাব ছিল না (ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি – ১।১৪-২৮)। রামায়ণে অন্যান্য শিল্পকার্য এবং শিল্পীর উল্লেখও আছে। যে অধ্যায়ে (২।৮৩) রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের বনযাত্রার বর্ণনা আছে, তথায় শিল্পীগণ সম্বন্ধে একটী বিবৃতি আছে। যথা—

মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
সূত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যেচ শস্ত্রোপজীবিনঃ॥ ২।৮৩।১২

এবং—

দন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ॥ ২।৮৩।১৩
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতা স্তথা কম্বলকারকা।
স্নাপকচ্ছোদকা বৈদ্যাঃ ধূপিকা শৌণ্ডিকস্তথা॥ (২।৮৩।১৪)

অর্থাৎ, মণিকার, কুম্ভকার, সূত্রকর্ম বিশারদ (ছুতার ?), শস্ত্রোপজীবি (শস্ত্রব্যবসায়ী) গন্ধব্যবসায়ী, সুবর্ণকার, কম্বল-প্রস্তুতকারক, বৈদ্য (চিকিৎসা ব্যবসায়ী ?) প্রভৃতি শিল্পীগণ ভরতের অনুগমন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত শিল্পীগণের নামোল্লেখ হইতে প্রতীয়মান হয় যে তদানীন্তন যুগে বহুবিধ শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। উপরন্তু ঐ সকল শিল্পকার্যের যে চর্চা ও অনুশীলন হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তবে ইহাও সত্য যে রামায়ণের কোনখানেই শিল্পীগণের কার্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নাই। তাহা বলিয়া ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবারও প্রকৃষ্ট কারণ নাই।

গৃহনির্ম্মাণ-শিল্প, চিত্র-শিল্প এবং অলঙ্কার-শিল্পের উৎকর্ষ অতি প্রাচীন কালেও সম্ভবপর হইয়াছিল। উক্ত কার্যে শিল্পীগণ যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। রামায়ণে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে শ্লোকগুলিতে (১।১৩।৮-১৭) রাজা দশরথের যজ্ঞগৃহ নির্ম্মাণের বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে তদানীন্তন যুগের গৃহ-নির্মাণ শিল্পের একটী ধারণা জন্মে। ইহা ব্যতীত সুন্দরকাণ্ডে লঙ্কাপুরীর সৌন্দর্য বর্ণনায় (৫।২।১৩, ১৭ ; ২।৪৮ ; ৩।৬, ৮, ৩৩ ; ১৪।২২, ২৩ ; ১৫।১৬) গৃহ-নির্মাণ-শিল্পের স্পষ্ট একটী প্রতিচ্ছবি মনে ফুটিয়া উঠে। বিচিত্র কারুকার্যময় তোরণ (বিচিত্রানি তোরণানি চ – ৪।২।৫১), ধ্বজা-সম্পন্ন সুউচ্চ অট্টালিকা (উচ্চাট্টালধ্বজাবতীং—১।৫।১০) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। নানাবিধ আকারের গৃহ সমূহ (বিবিধানি রূপানি ভবনানি – ৫।৪।৯) নির্মিত হইত।

চিত্রশিল্প ও অলঙ্কার শিল্পেরও সে যুগে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সুনিপুণ শিল্পী কর্তৃক চিত্রিত মনোহারী চিত্রাবলীর (সুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতম্—৪।২৫।২৫) দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পক্ষী অথবা বৃক্ষ লতাদির নানারূপ চিত্রে চিত্রিত দ্রব্য সমূহের উল্লেখও (পক্ষিকর্মভিরাত্রিং ক্রমকর্ম বিভূষিতাম্—৪।২৫।২২) রামায়ণে আছে। 'চিত্রশালা'র নামও আমরা পাই (চিত্রশালাশ্চ বিচিত্রাঃ—৫।১২।১৩)। চিত্রপট শোভিত গৃহাবলীর (চিত্রাণি চিত্রশালা গৃহাণি চ—৫।৬।৩৬) অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতু নাই।

অলঙ্কার শিল্পের পরিচয়ও রামায়ণে পাওয়া যায়। স্বর্ণ-খচিত জালির কার্য বহু গৃহের গবাক্ষের শোভা বর্ধন করিত (৫।২।৪৯ ; ৫।৩।৬)। স্বর্ণ-চিত্রিত মৎস্য বা পক্ষী রথীদের রথে শোভা পাইত। ইহা ভিন্ন অলঙ্কারাদির নির্মাণ বর্ণনা হইতে বুঝা যায়—উক্ত শিল্পের কতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, চিত্রশিল্প, বা গৃহনির্মাণশিল্প অথবা অলঙ্কার শিল্প—প্রগতিশীল শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে চতুঃষষ্ঠী কলার যে উল্লেখ আমরা পাই, তাহার সূচনা যে রামায়ণের যুগ হইতে হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

সংক্ষেপেই বলুন অথবা বিশদভাবেই বলুন—ইহাই হইতেছে রামায়ণের শিল্পকলার পরিচয়। কারণ, ইহার বেশী বিবৃতি দেওয়ার উপায় নাই। লিখিবার জন্য তথ্যাদি অতি সামান্যই। ইতস্ততঃ সংগ্রহ করিয়া যেটুকু আহরণ করিতে পারা যায়, তাহারই উপর অনুমান করিয়া লিখিতে হইবে। আমাদের ইহা ভুলিলেও চলিবেনা যে মূলতঃ রামায়ণ একখানি নীতি ও ধর্মমূলক কাব্য। সেস্থলে, রাজনীতি, সমাজ-নীতি অথবা শিল্পকলা সম্বন্ধে যেটুকু ইঙ্গিত আমরা পাই, তাহা অতি অল্পই বলিতে হইবে।

উপরন্তু, রামায়ণ বা রামচরিত বিষয়ক কাব্যটীকে দ্বিতীয় বেদ বলিয়া রামায়ণেই উক্ত হইয়াছে। যথা :—

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্রাম চরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
(১।১।৯৯)

—

গীতায় ছন্দঃ বা ভাষার দোষ (?)

শ্রীপূর্ণব্রহ্ম গীতাপাঠী

শ্রীযুক্ত ব্যোমব্রহ্ম গীতাধ্যায়ীর দ্বারা সম্পাদিত একখানি গীতা আমাদের হাতে আসিয়াছে। গীতার অনেক রকম ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে; যথা—দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, আধ্যাত্মিক, অনাধ্যাত্মিক, যৌগিক, ভৌগিক ইত্যাদি। এ পর্যন্ত কেহ গীতার ছন্দঃ বা ভাষার দোষ ধরেন নাই; উক্ত ব্যোমব্রহ্মজী তাহা করিয়াছেন। দোষ ধরিয়া তিনি যদি পৃথক্ কোন মন্তব্য করিতেন, তাহা হইলে তাহা তত আপত্তিকর হইত না। কিন্তু তিনি শ্লোকগুলি নিজের মতলবমত পরিবর্তন করিয়া যে মূল গ্রন্থরূপে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং যাহা মূলগ্রন্থের সহিত না মিলাইলে ধরিবার কোন উপায় নাই, তাহা হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ আপত্তিকর। কয়েকটী নিদর্শন পরিশেষে প্রদত্ত হইল। দুঃখের বিষয়, তিনি উহা ছন্দঃ-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ করিয়াছেন। যদি কোনও ছন্দঃ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন গীতাতে কিছুই ছন্দোদোষ নাই। অতএব ইহা ব্যোমব্রহ্মজীর পক্ষে অসাধারণ ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহস বলিতে হইবে। অজ্ঞতা তত দোষাবহ নহে, কিন্তু ধৃষ্টতা অমার্জনীয়। বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, গীতার ছন্দে Thrilling Melody আছে এবং ভাষায় Wonderful Sublimity আছে। বস্তুতঃ সহস্র সহস্র বর্ষ হইতে গীতার ছন্দঃ, গীতার ভাষা পাঠকের হৃদয়ে সাধু উৎসাহের সঙ্গীতময়ী অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া আসিতেছে। ব্যোমব্রহ্মজী বোধ হয় "পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বি-চতুর্থয়োঃ। গুরু ষষ্ঠঞ্চ পাদানং শেষে-ষ্বনিয়মো মতঃ॥"—এই সাধারণ প্রচলিত শ্লোকের নিয়মমাত্রই জানেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসকল অনুষ্টুভ্ ও ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে রচিত; তাহাতে ঐরূপ শ্লোকের নিয়ম খাটে না। তাহাতে প্রত্যেক পাদের ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বর্ণে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—১ম ও ৩য় পাদের (অযুক্ পাদের) ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ণে স-নগণ হয় না এবং ২য় ও ৪র্থ পাদের (যুক্ পাদের) ঐ ঐ বর্ণে স-ন-রগণ হয় না। আর অযুক্ ও যুক্ পাদের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম বর্ণে য-জ-ন ভ ইত্যাদিগণ হইতে পারে। তাহাতে অনুষ্টুভের পাঁচ প্রকার ভেদ হয়। যথা—(১) বক্ত্র, (২) পথ্যাবক্ত্র, (৩) চপলা, (৪) বিপুলা এবং (৫) সৈতবমতে বিপুলা। আর ত্রিষ্টুভ্ ছন্দও অনেক রকম আছে। যথা—ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, শালিনী বাতোর্ম্মী, বিধ্বঙ্কমালা, বিলাসিনী, শ্যেনী, দ্রুতা ইত্যাদি। আর এরূপ নিয়ম আছে যে, সজাতীয় ছন্দে উপজাতি বৃত্তও হইতে পারে। যেমন—এক পাদ ইন্দ্রবজ্রা অন্য তিন পাদ উপেন্দ্রবজ্রা ইত্যাদি। গীতাতে এবং মহাভারতের অন্যান্য বহুস্থলে ঠিক সেইরূপ আছে। ব্যোমব্রহ্মজী যে শ্লোকগুলি নিজের মতলবে বদলাইয়াছেন,

তাহার কোনটাই ছন্দঃ-শাস্ত্রবহির্ভূত নহে। যেমন—"গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" ইহা বিপুলা অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ এবং ইহার ১ম পাদে ম-ভগণ আছে। "নহি জ্ঞানেন সদৃশংপবিত্রমিহ বিদ্যতে" ইহাও বিপুলা এবং ইহার ১ম পাদে ম-জগণ আছে। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" ইহাও বিপুলা এবং ইহার ১ম পাদে র-ভগণ আছে। "কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম-ফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি" ইহাও বিপুলা। "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" ইহা পথ্যাবক্ত্র ছন্দঃ। "ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্" ইহা শালিনী ও ইন্দ্রবজ্রায় উপজাতিরূপে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দঃ। "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" ইহার ১ম পাদ ইন্দ্রবজ্রা ও অন্য তিন পাদ শালিনী অতএব উপজাতি হইয়াছে।

ইহা ছাড়া তিনি গীতার পদসকলের কোন কোন স্থানে দোষ ধরিয়াছেন। তাহাও অজ্ঞতামূলক। যদিও প্রাচীন গ্রন্থে আর্ষপ্রয়োগ থাকে, তথাপি কেহ তাহার সংশোধন করিতে সাহসী হন না। প্রসিদ্ধ গায়ত্রীর মধ্যে 'ধীমহি' কথাটার প্রয়োগ কেহত বদলাইতে যান না! গীতার অনেক শ্লোককে শঙ্করাচার্য মন্ত্ররূপেই ব্যবহার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য হইতে আধুনিক বড় বড় পণ্ডিতগণ কেহই গীতার ঐরূপ দোষ ধরিতে সাহসী হন নাই। বাইবেলের কোথাও কোথাও ভাব অস্পষ্ট ও ভাষা জটিল; কিন্তু কোন খৃষ্টান ধর্মযাজক কি সেজন্য বাইবেলের সংস্কার সাধন করিয়াছেন? ধর্ম পুস্তকের কথা দূরে থাকুক—হোমার, সেক্সপিয়ার, মিল্টন বা কালিদাসের ভাষা পরিবর্তন করা কি নিন্দার্হ দুঃসাহসিকতা বলিয়া বিবেচিত হয় না? গীতার চিরন্তন পাঠ যাহা আছে তাহা না দেখাইয়া নিজের রচনাকেই পাঠকের নিকট গীতা বলিয়া উপস্থাপিত করিয়া গীতাধ্যায়ী-জী অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছেন। ব্যোমব্রহ্মজী নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজেকে সমর্থন করিয়াছেন; যথা—"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।" কিন্তু তাঁহার "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ" ইহাও স্মরণ করিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত ছিল।

গীতার কতিপয় মূল শ্লোক এবং সেই মূল শ্লোকের স্থানে ব্যোমব্রহ্মজীর কল্পনা প্রসূত পরিবর্তিত শ্লোক—এই উভয়বিধ শ্লোকের নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্"—মূল ৪।২৪; "ব্রহ্মার্পণং হবির্ব্রহ্ম ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" পরিবর্তিত। "গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" মূল ১০।২৬; "সিদ্ধানাং কপিলো গন্ধর্বাণাং চিত্ররথস্তথা"—পরিবর্তিত। "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্" মূল ২।৭; "যন্নিশ্চিতং ব্রূহি হিতং ভবেন্মে শিষ্যঃ প্রপন্নং তব শাধ্যহং মাম্"—পরিবর্তিত। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"—মূল ৪।৩৮; "জ্ঞানেন সদৃশং নো হি পবিত্রমিহ বিদ্যতে"—পরিবর্তিত। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোহ্যহমেবংবিধোঽর্জুন"—মূল ১১।৫৪, "শক্য

এবং বিধো ভক্ত্যা ত্বংমনস্যায়র্জ্জুন”—পরিবর্ত্তিত। “কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ” মূল ৩।৩৯; “কামেনানলরূপেণ দুষ্পূরেণ চ ভারত”—পরিবর্ত্তিত। উক্ত সম্পাদকের পুস্তকে ঐরূপ বহু শ্লোক রহিয়াছে; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন বিধায় সেগুলি পাঠক সমীপে উপস্থাপন করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

---

(৩)

জেন্দ্-অবেস্তা

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

ইহা পারসীক জাতির ধর্মগ্রন্থ। পারসীকদিগের ধর্মের নাম মজ্দা বা মজ্দী ধর্ম, (ইহার পরম দেবতার নামানুযায়ী) জরথুশ্ত্র-ধর্ম (ইহার স্থাপয়িতা জরথুশ্ত্রের নামানুযায়ী), বা অগ্নি উপাসনা ধর্ম (ইহার দৃশ্য দেবতা অগ্নির নামানুযায়ী)। এই ধর্মগ্রন্থ যে ভাষায় লিপিবদ্ধ উহার নাম 'অবেস্তা'। সাধারণতঃ ইহাকে জেন্দ্ ভাষা বলা হয়, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ জেন্দ্ বলিয়া কোন ভাষা ছিল না। “জেন্দ্' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। যখন ইহা তদানীন্তন ইরাণ্ দেশের কথ্য ভাষা পহ্লবীতে অনূদিত হয় তখন এই ধর্মশাস্ত্রকে জেন্দ্ অবেস্তা বলিয়া উল্লিখিত হইল। 'অবেস্তা' শব্দের অর্থ 'নিয়ম'। এই ধর্ম নিয়ম গ্রন্থ ও তাহার ব্যাখ্যা (জেন্দ্) সমেত ইহার পহ্লবী ভাষায় নাম করণ হয় জেন্দ্-অবেস্তা।

এই অবেস্তা ভাষা কি তাহা লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে জন্ লিডেন্ (John Leyden) সাহেব জেন্দ্ বা অবেস্তা ভাষাকে মুল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত পালি বা প্রাকৃত ভাষার মত একটি কথ্য ভাষা স্থির করেন। আরস্কিন (Erskine) সাহেবেরও ঐ মত এবং ইনি বলেন ভারতবর্ষ হইতেই এই মজ্দা ধর্মের উদ্যোক্তাগণ এই ভাষা পারস্য দেশে লইয়া যান, কারণ প্রাচীন পারস্যে যে ৭টী কথ্য ভাষা ছিল তাহার মধ্যে জেন্দ্ ভাষার উল্লেখ নাই। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে ফাদার বার্থেলেমি (Father Paulo de St. Barthelemy) ঐ প্রকার মত প্রকাশ করেন। স্যর উইলিয়ম্ জোন্সও দেখাইয়াছেন যে অবেস্তার প্রত্যেক ১৩টী শব্দের মধ্যে ৬।৭টী সংস্কৃত। যাহা হউক বর্তমানে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অবেস্তা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাই কোন একটী প্রাচীনতম ভাষা হইতে উদ্ভূত। আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই প্রাচীনতম ভাষা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা।

বর্তমানে যে অবেস্তা গ্রন্থ পাওয়া যায় উহা সম্পূর্ণ নহে। ইহার অধিকাংশভাগই লুপ্ত হইয়াছে। তবে কি কি অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে পহ্লবী

ভাষায় রচিত এক সংক্ষিপ্ত সার হইতে জানা যায়। ঐ সংক্ষিপ্ত সার ওয়েষ্ট (West) সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। যাহা হউক বর্তমানে যে অংশ পাওয়া যায় তাহা ২ ভাগে বিভক্ত—

১ম ভাগ (ইহাকেই প্রকৃত অবেস্তা বলা হয়)—বেন্দীদাদ্, বিস্পেরাদ এবং যস্ন এই ৩ ভাগে বিভক্ত। বেন্দীদাদে ধর্মসম্বন্ধীয় আইন ও পৌরাণিক উপাখ্যান আছে, বিস্পেরাদে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে এবং যস্নে যজ্ঞ-ক্রিয়া ও ৫টী গাথা বা ঋক্ আছে। এই ৫টী গাথার ভাষা অন্যান্য অংশের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন। প্রথম ভাগের এই তিনটী বিভাগ পুঁথিতে ২ প্রকারে সজ্জিত দেখা যায়—(ক) একটি বিভাগের পর আর একটি (খ) সব কয়টি বিভাগই যজ্ঞ ক্রিয়ানুযায়ী একত্র সংমিশ্রিত। যেমন বেদবিভাগের পূর্বে ঋক্, যজুঃ, সামন্ বেদের এই কয়টি অংশই একত্র সংমিশ্রিত ছিল দ্বিতীয়টি (খ) এই প্রকার। প্রথম প্রকার (ক) সংস্করণের সঙ্গে পহ্লবী অনুবাদ আছে কিন্তু (খ) সংস্করণে অনুবাদ নাই এবং ইহাকেই "বেন্দীদাদ্ সাদ" অর্থাৎ শুদ্ধ বেন্দীদাদ্ বলা হয়।

২য় ভাগএর নাম 'খোর্‌দ অবেস্তা' (ক্ষুদ্র অবেস্তা)। ইহা কতকগুলি স্তবের সমষ্টি। এই সব স্তব পুরোহিত ও সাধারণ পারসীক সকলেই দিবস ও মাসের বিভিন্ন সময়ে পাঠ করেন। এই সকল স্তবের মধ্যে আছে—৫টি গাহ, ৩০টি শীরোজাহ্ এর প্রক্রিয়া, ৩টি আফ্রিগান্ এবং ৬টি ন্যায়ী। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি যাস্ত ও কয়েকটি নাস্কএর অংশও যাহা বর্তমানে পাওয়া যায় সেগুলিকে এই খোর্‌দ অবেস্তার অন্তর্গত বলা হইয়া থাকে। যাস্তগুলি মাসের ৩০ দিনের ৩০টি ইজাদএর (অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেব) স্তব। তন্মধ্যে ১৮টি বর্তমানে পাওয়া যায়।

পারস্যের সাসনীয় রাজত্বকালে যখন জরথুশ্ত্র-ধর্ম রাজ্যের ধর্ম ছিল তখন সমগ্র ধর্মপুস্তক ২১টি নাস্ক অর্থাৎ পুস্তকে বিভক্ত ছিল। ইহারা ৩ ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগটিতে ৭টি নাস্ক ছিল। ১ম ভাগের ৭টি নাস্ক এর নাম 'গাসান্' (গাথা), ২য় ৭টির নাম 'দাৎ' (ধর্ম নিয়ম) এবং ৩য় ৭টির নাম 'হধমাথ্র' (অর্থাৎ সংমিশ্রিত ভাগ)।

ক। প্রথমভাগের এই ৭টি নাস্ক বা গাথার নাম—(১) স্তোৎ-যাস্ত (২) সূৎকর্ (৩) বরস্ত্‌মানসর্ (৪) বক্ (৫) ভস্তগ্‌ (৬) হাধোখ্‌ত (৭) স্পস্ত। ইহার মধ্যে ১মটী সমগ্র অবেস্তার মধ্যে পবিত্রতম এবং ইহা ৩৩টী অধ্যায়ে বিভক্ত। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ এর প্রত্যেকটী ২১ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ২য়টীর মাত্র কিয়দংশ, ৩য়টীর এক অধ্যায় এবং ৪র্থটীর ৩টী অধ্যায় মাত্র পাওয়া যায়। ৫মটী একেবারে লুপ্ত। ৬ষ্টটীর ৩টী অধ্যায় আছে এবং ৭মটী (স্পস্ত) যদিও প্রাচীন আকারে নাই তবে বর্তমান আকারে 'জর্‌দুস্ত নাম' প্রভৃতির মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

খ। দ্বিতীয় ভাগের ৭টী পুস্তকের নাম—(১) নিকাতুম্ (২) গন্‌বা-সর-নিগৎ (৩) হুস্পারম্ (৪) সকাতুম্ (৫) বেন্দীদাদ (৬) কিত্রদাৎ (৭) বকান্ যাস্ত। ইহাদের মধ্যে (৫) বেন্দীদাদ্‌টী সমগ্র পাওয়া যায়। ১ম, ২য় ও ৪র্থ এর মাত্র সামান্য অংশই

পাওয়া যায়। ৩য়-এর কতকাংশ পহ্লবী গ্রন্থ "এর পতিস্তান" ও 'নীরঙ্গিস্তান" এর মধ্যে আছে। ৬ষ্ঠ এর কিয়দংশ 'শাহনাম' প্রভৃতি গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহা প্রাচীন ভাষায় নহে। ৭মএর কতকগুলি যস্ন পাওয়া যায়।

৩। তৃতীয় ভাগের ৭টী পুস্তকের নাম—(১) দাম্‌দৎ (২) নাতর (৩) পাজাগ্ (৪) রৎ-দাৎ-ঈতগ্ (৫) বরিস্ (৬) কস্‌কীস্রব (৭) বীস্‌তাস্‌প্-ষাস্ত। ইহার মধ্যে ১মটীর মাত্র ১টী অংশ পাওয়া যায়। ২য়টীর সব লুপ্ত। ৩য়টীর মধ্যে কিছু গাহ্ ও সিরোজার মধ্যে পাওয়া যায়। ৪র্থটীর ২টি অংশ পাওয়া যায়। ৫ম ও ৬ষ্ঠের কোন অংশ পাওয়া যায় না। ৭মটির মধ্যে মাত্র ২টি অংশ—বিস্‌তাস্‌প ষাস্ত এবং আফ্রিন্ পৈঘম্বর জরথুস্ত পাওয়া যায়।

ইহাই সংক্ষেপে সমগ্র জেন্দ্-অবেস্তার পরিচয়। ইহা হইতে দেখা যায় সমগ্র জেন্দ্-অবেস্তার কতকাংশ পাওয়া যায় এবং ইহা বর্তমানে ২ ভাগে বিভক্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই গ্রন্থ প্রথমে পহ্লবী ভাষায় ব্যাখ্যা সমেত অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এই পহ্লবী অনুবাদে মূলের প্রকৃত অর্থ অনেকস্থানে বিনষ্ট হইয়াছে। খ্রীস্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে পার্শী নেরিওসেঙ্গ নামক একব্যক্তি যস্নের সংস্কৃত অনুবাদ করেন। তারপর খ্রীঃ ১৭৭১ অব্দে আঁকোয়েতিল দুপেরোঁ (Anquetil Duperron) নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত প্রথম ফরাসী (বা ইউরোপীয়) ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইনি ভারতে আসিয়া পারসীক পুরোহিতদের নিকট অবেস্তা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তারপর ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে রিগা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লুকার (Klueker) ইহা জার্মানভাষায়অনুবাদ করেন। কিন্তু এই সব অনুবাদ পহ্লবী অনুবাদের উপর ভিত্তি করায় প্রকৃত অবেস্তার অর্থ ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে নাই। তারপর আঁকোয়েতিলের প্রায় ৭০ বৎসর পরে বুর্নোফ সাহেব (Eugene Burnouf) অবেস্তার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি দেখিলেন অবেস্তার প্রকৃত অর্থ পহ্লবী ভাষার গবেষণা হইতে পাওয়া যাইবে না। পরন্তু সংস্কৃত ভাষার এবং ভাষাতত্ত্বের (Philology) অনুশীলনে জানা যাইবে। তিনি দেখিলেন পূর্বোল্লিখিত সংস্কৃত অনুবাদেই অবেস্তার প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বেদ ও অবেস্তার পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেও একত্ব দেখিলেন এবং যস্নের উপর তাঁহার ব্যাখ্যা (commentaire sur le yasna) প্রকাশিত করিলেন। এইরূপে প্রমাণিত হইল যে পারসীক জাতির অবেস্তা বর্ণিত দেব-দেবীর ইতিবৃত্ত বেদের মধ্যেই নিহিত আছে।

অবেস্তার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ পরবর্তীকালে গেল্ডনার সাহেব প্রকাশিত করিতেছেন। ইহার অনেকাংশের ইংরেজী অনুবাদও Sacred books of the East গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গুজরাটী সংস্করণ ও অনুবাদ আছে। বাঙ্‌লা ভাষায় যদি ইহার একটি মূল ও অনুবাদ সমেত সংস্করণ প্রকাশিত হয় তবে বাঙ্‌লা ভাষাও সমৃদ্ধ হয় এবং অনেক বাঙালীই এই প্রাচীন আর্য জাতির ধর্ম-গ্রন্থ পড়িতে পারেন।

আমাদের কথা

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে 'শ্রীভারতী' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 'শ্রীভারতী'র সম্পাদকীয় সংঘের লেখকগণের ও পাঠকবর্গের পক্ষ হইতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্তমান সংখ্যা হইতে শ্রীভারতীর সাধারণ সম্পাদক রূপে আমরা প্রবীন সাহিত্যিক ও দার্শনিক রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্. এ. মহাশয়কে পাইয়াছি। যাহাতে 'শ্রীভারতী' উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে ও সুধীবর্গের নিকট সমাদৃত হয়, রায় বাহাদুর যেন তাহার ব্যবস্থা করেন।

*　　　*　　　*　　　*

বর্তমান সংখ্যায় 'বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র' শেষ হইয়াছে। 'বিদ্যাপতির উপমা' আগামীবারে সমাপ্ত হইবে। ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয় নামক যে দীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের পূর্ব লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনারূপে লিখিয়াছেন বর্তমান সংখ্যায় প্রবোধবাবু পুনরায় ধীরেনবাবুর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরদান করিয়াছেন। ধীরেনবাবুর নির্দিষ্টীকৃত ভারতযুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ প্রচলিত মতের সহিত মিলিয়া যায়। প্রবোধ বাবুর গণনা ও গবেষণানুযায়ী আরও কয়েকশতবর্ষ পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা হউক উভয়েরই গবেষণা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করা হইল। প্রাগৈতিহাসিক ভারতের ইতিহাস রচনায় ভারতযুদ্ধকাল-নির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এবিষয়ে কয়েকমাস যাবৎ প্রবন্ধাদি শ্রীভারতীতে প্রকাশিত হওয়ায় বর্তমানে আমরা আর আলোচনা বা পুনরালোচনার পক্ষপাতী নহি। তবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তররূপে এ বিষয় আলোচিত হইতে পারে।

*　　　*　　　*　　　*

প্রতি মাসের কোন্ কোন্ দিনগুলি কি কারণে শুভ ও বিখ্যাত তাহা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য গত বর্ষের শ্রীভারতীর বৈশাখ সংখ্যায় বৈশাখ মাসের বিখ্যাত দিনগুলির পরিচয় দান করা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে পরবর্তী মাসগুলির বিষয় এইভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমরা আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে এই প্রকার বিবৃতি প্রকাশিত করিব এবং বৈশাখ মাস সম্বন্ধে জানিবার জন্য পাঠকবর্গকে গত বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা পড়িতে অনুরোধ করি।

*　　　*　　　*　　　*

কোন এক ভদ্রলোক গীতার প্রচলিত পাঠ কয়েকস্থানে বিকৃত করিয়া ও তৎস্থানে

স্ব-রচিত পাঠ দিয়া গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। 'বিবিধ-প্রসঙ্গে'র মধ্যে এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। এ প্রকার কার্য যে নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * *

পারসীকদিগের ধর্ম-গ্রন্থ অবেস্তা ও হিন্দুদের আদি ধর্ম-গ্রন্থ ঋগ্বেদ প্রায় অধিকাংশ স্থলেই কিঞ্চিৎ পাঠতারতম্য ভেদে এক। এই অবেস্তার মধ্যে কি কি আছে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য 'জেন্দ্-অবেস্তা' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। ভারতীয় ভাষার মধ্যে এই অবেস্তা গ্রন্থের কেবলমাত্র গুজরাটী ভাষায় সংস্করণ ও অনুবাদ আছে, কারণ ভারতীয় পারসীকদিগের এই ভাষাই মাতৃভাষা। যাহাতে এই প্রাচীন ধর্মপুস্তকের একটি বাঙ্লা ভাষায় মূল ও অনুবাদসমেত সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহার জন্য আমরা ধনী ও পণ্ডিতবর্গের সহানুভূতি কামনা করি।

বিশ্বরাষ্ট্র সংঘকে (League of Nations) ভারতবর্ষ বহুলক্ষ টাকা সভ্যরূপে বাৎসরিক চাঁদা দেয়। ভারতের কৃষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির জন্য এই সংঘের নিকট হইতে ভারতবর্ষ তদনুরূপ সাহায্য পায় নাই। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ ভবনে স্যার, এস্, রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা হয়। ডক্টর কালিদাস নাগ, মিঃ জে, সি, মুখোপাধ্যায়, ডক্টর ডি, আর ভাণ্ডারকার প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বিষয়ে বক্তৃতাদি দেন। পরে সভাপতির নির্দেশক্রমে একটি কমিটি গঠিত হয় ও আন্তর্জাতিক কৃষ্টি সংঘ (International Federation of Culture) নামে একটি সংঘের সূচনা হয়। আগামী ১০ই মে তারিখে সংঘের উদ্বোধন হইবে। আগামী সংখ্যায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

পুস্তক সমালোচনা

Hindus and Musalmans of India—শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। স্যর সাফাৎ আহমদ খাঁ, লিট্-ডি লিখিত 'মুখপত্র' ও Mr. W. C. Wordsworth লিখিত 'উপক্রমণিকা' সম্বলিত। Messrs Thacker, Spink and Co (1933) Ltd. Calcutta কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—XXIV & 183; সাইজ ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, মূল্য—২॥০ টাকা।

'Cultural Fellowship in India' নামক পুস্তক লিখিয়া শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তীর নাম অনেক পাঠকের নিকট পরিচিত। এই পুস্তকখানি হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোক কর্তৃক সমান আদৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকখানি লেখকের দ্বিতীয় পুস্তক। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান জীবনধারার বিভিন্ন উপাদানগুলি এরূপ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে ইহাকে ভারতের 'মনঃলিপি' (Psychograph) বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির কাঠাম সম্বন্ধে লেখকের অভিমত ডক্টর স্যর সাফাৎ আহমদ্ খাঁ তাঁহার মুখপত্রে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন যে ভারতে ধর্ম্মের ভাব ও সংস্কৃতি বিকাশের দ্বারাই ইহার জীবনধারা গঠিত হইয়াছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনও এই সমস্ত ভাবধারায় গঠিত। পাশ্চাত্য ভাবধারা যদিও ব্যক্তিগত জীবনে অনেকটা ছাপ দিয়াছে কিন্তু দেখা যায় সেই ভাবধারার প্রভাব সমগ্র ভারতীয় জীবনের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে প্রামাণ্য উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া উপরোক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন।

এই পুস্তকখানির একটি শিক্ষাগত মূল্য আছে। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতাময় আবহাওয়ায় এইরূপ পুস্তকই ছাত্রগণের হস্তে প্রদান করিবার যোগ্য।

পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই খুব সুন্দর হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের একাদশ বার্ষিক স্বাস্থ্য সংখ্যা (১৯৪০) —শ্রীঅমলহোম সম্পাদিত। মূল্য—॥০ আনা।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের স্বাস্থ্য সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাওয়া গেল। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অনেক নূতন তথ্য অবগত হইলাম। ইহা শুধু কলিকাতাবাসিগণের নিকট কেন, যে কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির নিকট আদরনীয় হইবে।

ইহার ছাপা ভাল ও প্রচ্ছদপট সুরুচিজ্ঞাপক। ইহাতে অনেকগুলি প্লেট সংযুক্ত থাকায় এই সংখ্যাখানি বেশ মনোরম হইয়াছে।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ. বি-এল্, বেদান্তরত্ন প্রণীত। শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক কলিকাতা, ১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৩৪। মূল্য ১৷৷০ (দেড় টাকা)।

সাহিত্য ও দর্শন জগতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সুপরিচিত। ধর্মগজতেও তিনি Theosophy নামক ধর্মকেন্দ্রের একজন কর্ণধার। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে সব দার্শনিক চিন্তার বীজ ও তাঁহার মতবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থখানিতে ঐ সকল দার্শনিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ একত্রীকৃত করা হইয়াছে। শুধু ঐ সকল মতবাদকে একত্র করা হয় নাই উহাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ (যাহা বঙ্কিমগ্রন্থাবলীতে নাই) এবং বর্তমান গ্রন্থকারেরও সুচিন্তিত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্য-সম্রাট্ নহেন, তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক, ধর্মবিদ্, দার্শনিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন তাহা এই গ্রন্থপাঠে সকলে সম্যক্ অবগত হইবেন। বিষয় নির্বাচন ও বিভাগ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। আমরা সাহিত্যানুরাগী প্রত্যেককেই এই গ্রন্থপাঠে অনুরোধ করি ও ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

বেদ

১। অথর্বপ্রাতিশাখ্যম্—Edited by Dr. Surya Kanta—Lahore

প্রত্নতত্ত্ব

২। Revealing India's Past—By Sir John Cumming with a Foreword by Alfred Foucher.—London

সাহিত্য ও ব্যাকরণ

৩। ব্যাসরামদেবের সুভদ্রাপরিণয়নম্—পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত—এলাহাবাদ।

৪। নিঘণ্টু-নিরুক্ত—প্রথমখণ্ড—Ed. by V. K. Rajwade.

ধর্ম ও দর্শন

৫। Bhota-prakas'a—Sanskrit—Tibetan. A Tibetan Christomathy by M. M. Pt. Vidhusekhar Sastri—কলিকাতা।

৬। Hatuttamwopades'a of Jitari—A reconstructed Sanskrit Text with Tibetan Version by Durgācaraṇa Chattopādhyāya.—কলিকাতা

জৈনধর্ম

৭। শ্রীশান্তিনাথচরিতম্—শ্রীভবচন্দ্র সুরি—আমেদাবাদ।

ভারতীয় সংস্কৃতি

৮। Elements of Hindu Culture and Sanskrit Civilisation—by Dr. P. K. Acharya - Lahore.

ইতিহাস ও সমাজনীতি

৯। Histoire De Gingi—par—Rao Sahib C. S. Srinivasachari M. A.—Pondichery.

১০। Hindu Social Institutions by Pandharinath H. Valavalker. Ph.D., LL. B.—লণ্ডন।

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি. এল্ কর্তৃক সংকলিত

The Indian Antiquary Vol III, 1874

The life of Baba Nanak, the Founder of the Sikh Sect,—R. N. Curt, B. C. S.—শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানকের একটী প্রমাণ্য জীবন বৃত্তান্ত।

An Inscription from Badāmi—Prof, J. Eggeling, London. ইহা মঙ্গলীশ রাজার লিপি বলিয়া পরিচিত। এখানে এই লিপির একটী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এই লিপি অনুসারে মঙ্গলীশ্বর রাজা কীর্তিবর্মণের কনিষ্ঠ সহোদর; তিনি শক ৪৮৮ (৫৬৬ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

On some Pahlavi Inscriptions in south India—H. C. Burnell, Ph. D. M.C.S, Tanjore—ইহাতে পহ্লবী লিপির বিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে। প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া ইহা একটী গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ।

The Temple of Amarnath—অমরনাথের আর একটি নাম অম্বরনাথ। এখানে অমরনাথের মন্দির সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে। ইহাতেও প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক সংবাদ আছে।

সাময়িক সাহিত্য—চৈত্র, ১৩৪৬

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—উপনিষদের অর্থ—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস।

প্রবর্ত্তক—গুণবন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তির পথ—শ্রীমতিলাল রায়।

উদ্বোধন—বাঙ্গালায়-অদ্বৈত-ভাবধারা—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ব্রহ্মবিদ্যা—অভিব্যক্তিবাদ—শ্রীতুলসীদাস কর।

„ —বর্ত্তমান বিশ্বে বেদান্তের বাণী—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শিবম্—হিরণ্যগর্ভ—মণ্ডলেশ্বর-স্বামী-মহাদেবানন্দ গিরি।

„ —পঞ্চপ্রদীপ—স্বামী-বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি।

„ —ধর্ম্ম ও সমাজ—শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

„ —অদ্বৈতবাদীর আত্মরক্ষা—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ

সাহিত্য

প্রবাসী—নবযুগের কাব্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ —দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভারতবর্ষ—মেঘদূতে পরাধীনতার পরিণাম—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-বি-এল প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ।

„ —আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীমোহিণীমোহন দত্ত বি-এ।

প্রবর্ত্তক—আর্য্য-সঙ্গীতের ধারা নির্ণয়—প্রজ্ঞানন্দ।

„ —প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে-মুসলমানের দান—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

„ —রবীন্দ্র-কাব্যে রহস্যানুভূতি—"হরিহর"

„ —পল্লী-সাহিত্যের-যৎকিঞ্চিৎ—অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম-এ।

উদ্বোধন—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ, পি-আর-এস।

ব্রহ্মবিদ্যা—আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র—শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ

প্রবাসী—মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

„ —বর্ত্তমান বর্ষে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

„ —শিবের নৃত্যমূর্তি—শ্রীরমেশ বসু।

ভারতবর্ষ—কাগজের কথা—অধ্যাপক শ্রীবরদাদত্ত রায় এম-এ।

„ —রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—বাঙ্গালায় পালরাজত্ব ও কম্বোজ-বংশ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

প্রবাসী—তুরস্কের অভ্যুদয়—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

৪৬শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞানবাদ—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী সমাজের সমস্যা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার—শ্রীসুশীল কুমার দে, এম-এ ডি-লিট।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ।

দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ডি-এস্-সি।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৭)—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাময়িক সংবাদ

কলিকাতার নূতন মেয়র—গত ১১ই বৈশাখ বুধবার মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকী এবং শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম যথাক্রমে কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উভয়কে আমাদেব অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি—মাদ্রাজে ডাঃ এ্যারাণ্ডেল শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন রাজনৈতিক মুক্তিই আমাদের একমাত্র কাম্যবস্তু নয়। সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক থেকেও আমাদের চিত্তকে বৈদেশিক আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার বাহন—হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী লাহোরের অধ্যাপকসম্মেলনের সভায় বলেছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে বিদেশী ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন। এর ফলে শিক্ষার দ্রুত প্রসার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কথাই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে জোরের সঙ্গে বলিয়াছিলেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহিলা—প্রত্নতত্ত্ববিশারদা ডাঃ সি, মিনাক্ষী গত ৫ই মার্চ পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁহার একটী রচনা "The Historical Sculptures of the Vaikunthaperumal Temple, Kanchi" ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৬৩নং গবেষণামূলক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা)

গত ২৩শে এপ্রিল অপরাহ্নে "শ্রীভারতীর" প্রধান সম্পাদক বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার ঘাটশীলাস্থ ভবনে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েকমাস যাবৎ তিনি যকৃত ও হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম উদয়চাঁদ ঘোষ মজুমদার। কাশীধামে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া তিনি উপাধিপ্রাপ্ত হ'ন। ইহার পর তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় বহুভাষা আয়ত্ত করেন। পালি ও প্রাকৃতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন ভাষার পত্রাদি অনুবাদের জন্য "ট্রান্‌শ্লেটিং বুরো" নাম দিয়া একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এড্‌ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউসন্ নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউসনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) অধ্যাপক নিযুক্ত হন; এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর অতি পুরাতন সদস্য। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের স্থাপনাবধি তিনি কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। বহুবার তিনি বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ১৩১১ হইতে ১৩১৭ সাল পর্যন্ত 'বাণী' নামক মাসিক পত্র পরিচালনা করেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ১৩১৯ সালে তিনি ভারতবর্ষের অন্যতর সম্পাদক হন। অতঃপর Indian Academy of Arts নামক ইংরেজি পত্রের সম্পাদনা করেন। ১৩৩৬ হইতে চারি বৎসর কাল তিনি "পঞ্চপুষ্প" নামক মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ পরিচালিত বাংলা পত্রিকা "শ্রীভারতী"র প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দেবতত্ত্ব গ্রন্থমালার 'সরস্বতী' প্রকাশিত হইয়াছে। 'গণেশ' ছাপা হইতেছে। এই দুইখানি পুস্তকই ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের প্রকাশিত গ্রন্থমালার অন্তর্গত। 'জৈনজাতক' 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' ও 'শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি কিছুদিন কাশিমবাজারের মহারাজার অনুরোধে 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' নামক একখানি বৈষ্ণব পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর হইল তিনি "বঙ্গীয় মহাকোষ" নামক একখানি সুবৃহৎ অভিধান সম্পাদনে রত ছিলেন। এই অভিধানের কেবলমাত্র একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই অভিধানটী ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। যাহাতে এই অসম্পূর্ণ মহাকোষখানি সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহার জন্য ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পরিপূরিত হইবার নয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ | দশম সংখ্যা

ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য এম. এ.

[৬]

১৮৬৫ খ্রীঃ [?]

১৮০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অমরকোষের যে সকল বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েক খানির পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে "প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিচয়" শীর্ষক ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের "প্রবর্ত্তকে" মুদ্রিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে, প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভারতীর গত সংখ্যায় "শব্দার্ণব" নামক ১২৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত অমরকোষের একখানি বঙ্গানুবাদের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নে উক্ত সময়ের মধ্যে মুদ্রিত অপর একখানি অমরকোষের বঙ্গানুবাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল। আলোচ্য অভিধান খানি এই জাতীয় অপরাপর অভিধান হইতে পৃথক ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। এই অভিধানের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কবিতায় রচিত। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে যে সকল অভিধান মুদ্রিত হইয়াছিল তন্মধ্যে আলোচ্য অভিধান ব্যতীত অন্য কোন অভিধান কবিতায় রচিত হয় নাই। ১২২৪ [?] বঙ্গাব্দে মুদ্রিত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধুর শুধু ভূমিকা অংশ কবিতায় দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য অভিধানের সঙ্কলয়িতা সপ্তক্ষীরা নিবাসী স্বর্গত কাশীনাথ রায় চৌধুরী। এই অভিধানের যে খণ্ড আমি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত ও আখ্যাপত্র হীন। এই খণ্ডের আখ্যাপত্র না থাকায় ইহা কবে, কোন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু গ্রন্থে ব্যবহৃত টাইপ ও কাগজ দৃষ্টে ইহা যে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় যদিও গ্রন্থ প্রকাশ কালের উল্লেখ নাই তবুও ইহা যে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। নিম্নে সেই প্রমাণেরই উল্লেখ করিব।

এই অভিধান খানির প্রারম্ভে বন্দনাদি, তৎপরে 'পরিভাষা' ও পর্য্যায় বিবরণ এবং

তদনন্তর 'আত্ম-পরিচয়' মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার বন্দনাদি, পরিভাষা, আত্ম-পরিচয় প্রভৃতি অংশ এবং অভিধান অংশ সর্বত্রই পয়ারে রচিত। ইহাতে অমরকোষ ব্যতীত রঘুনাথ চক্রবর্তী এবং বেদান্ত বাগীশের টীকাধৃত সকল শব্দ স্থান পাইয়াছে।

এই অভিধানের বন্দনাদি অংশে সংক্ষেপে দেব দেবী বন্দনার পর অমর সিংহ কৃত অমরকোষের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে যে উদ্দেশ্যে কাশীনাথ আলোচ্য অভিধান সঙ্কলনে ব্রতী হন তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।

"সে রত্নে যত্ন মদ্ ভ্রাতা দেবনাথে হয়।
ভাষাভিলাষে এসে আমার অগ্রে কয়॥
* * *
ভ্রাতৃ অনুরোধ বোধ সুগমের তরে।
স্বীকার করিয়া ভীত হইলাম পরে॥" ইত্যাদি

এই কয় পংক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে গ্রন্থকারের ভ্রাতা "দেবনাথ" তাঁহার নিকট অমরকোষ শিক্ষা করিতে চাহিলে তিনি অমরকোষের এই বঙ্গানুবাদ করেন। 'দেবনাথ' তাঁহার ছাত্রাবস্থায় অমরকোষ শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। নিম্নে বন্দনাদি শীর্ষক ৪৮ পংক্তির পয়ারটী উদ্ধৃত হইল—

শব্দসিন্ধু।

বন্দনাদি।

নারায়ণ নর নরোত্তম সরস্বতী।
ব্যাসাদির পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি॥
করুণা করিয়া কমলজ কৃপাময়।
লোকদুঃখ দূর জন্য চিন্তিয়া হৃদয়॥
কবিতুল্য কবিবর পুত্র সারদার।
অমরে বামরসিংহে কল্লে অবতার॥
বিবিধ বিধানে বিধি সুবিধি বিধায়।
স্বীয়দত্ত নাম সত্য করিলেন তায়॥
অমর যশে সিংহ কবি সমাজ মাঝে।
নক্ষত্র ক্ষেত্রে যেন দ্বিজরাজ বিরাজে॥
সমর এ অমর অমর কিসে হয়।
কীর্তির্যস্য স জীবতি সর্বশাস্ত্রে কয়॥
সারদা সারদা বরদা যেই অমরে।
যক্ষবর হৈতে বর সে বরার বরে॥

কুবের কোষস্থ রত্ন স্বমূল্য সে হয়।
উচ্চ নীচ সর্বস্থানে সাধারণ রয়॥
অমরকোষস্থ সর্ব পদরত্ন সার।
ত্রিলোকেতে তুল্য মূল্য লক্ষ নাহি তার॥
শত শত সত্‌সমাজে সুশোভ্য হয়।
পণ্ডিতাদি সাধুমুখে স্বাদু সম রয়॥
ধনেশের ধন বিতরণ জন্য ক্ষয়।
অমরকোষস্থ বস্তু ব্যয়ে বৃদ্ধি হয়॥
শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি যে জন্য করিলে।
তাঁর মত মত মতিমান তা পালিলে॥
স্বনামে অমরকোষ প্রকাশ করিলে।
ছন্দঃসূত্রে পদরত্ন হার গেঁথে দিলে॥
সে রত্নে যত্ন মদ্‌ভ্রাতা দেবনাথে হয়।
ভাষাভিলাষে এসে আমার অগ্রে কয়॥
সে সতে রত অনুগত দেব দ্বিজের।
প্রাণাধিক মম প্রিয়তম পণ্ডিতের॥
ভ্রাতৃ অনুরোধ বোধ সুগমের তরে।
স্বীকার করিয়া ভীত হইলাম পরে॥
অমরকৃত কোষ অকূল জলনিধি।
কেমনে পাইব কূল কি ঘটালে বিধি॥
সুরশাখী শিরশাখা শোভিত সুফল।
বামন কেমনে পাবে মন কি পাগল॥
এক কারণে মনেরে ক্ষান্ত দেই রোষ।
পণ্ডিতের গ্রাহ্য হয় পণ্ডিতের দোষ॥
আমি মূর্খ কুকবি তা জ্ঞাত সর্বজন।
মূর্খের দোষ পণ্ডিত করেন মার্জন॥
বেদান্ত বাগীশ বাগীশ সদৃশ জ্ঞানী।
রঘুনাথ চক্রবর্তী অতুল্য বাখানি॥
টীকার টীকা দ্বিটীকা কোষের করিলে।
জ্ঞান ভানূদয়ে অজ্ঞানতমো হরিলে॥
ব্যাখ্যোপলক্ষ্যে অমর হৈতে যে অধিক।
স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রথিত করিলে দ্বিরসিক॥

মূল সহ আমি তাহা করিব লিখন।
কারণ অধিক জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন ॥

এই অভিধানের পরিভাষা বিভাগে অভিধানের মধ্যে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অভিধানে যে রীতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা আছে। নিম্নে পরিভাষা শীর্ষক ৪২ পংক্তির পয়ার উদ্ধৃত হইল—

পরিভাষা।

টীকাকার ধৃত অধিক যাহা লিখিব।
সে শব্দ বাম পার্শ্বে বিশেষ চিহ্ন দিব ॥
কোষ মধ্যবর্তী কি টীকাদ্বয়ান্তর্গত।
যৌগিক শব্দার্থ লভ্য নাম হবে যত ॥
তদ্ভিন্ন অন্য যে শব্দে সেই অর্থ হয়।
তাতে তৎপর্যায়ির নাম হবে নিশ্চয় ॥
পর্যায় পরিচায়ক যে যে শব্দ রবে।
তন্মধ্যে সাধুশব্দ পর্যায়ির্ নাম হবে ॥
ব্যাকরণ কার্য শব্দান্তে স্বার্থে ক হয়।
বহুব্রীহি সমাসেও শব্দান্তে ক রয় ॥
সে দ্বিবিধ ককার যে শব্দান্তে লিখিব।
সেই ককারোপরি বিশেষ চিহ্ন দিব ॥
সে ককার যুক্ত শব্দে যেই অর্থ হয়।
সে ককার হীন সে শব্দে সে অর্থ কয় ॥
প্রাদিপদিক শব্দ লিখিব সমুদয়।
ব্যাকরণ কার্যে শব্দ নানা রূপ হয় ॥
শব্দের লিঙ্গভেদ লিখিতে সুবিস্তার।
অঙ্ক সঙ্কেতে সংক্ষেপে করি সুপ্রচার ॥
১ একাঙ্কে স্ত্রী ২ দ্ব্যঙ্কে পুং ৩ ত্র্যঙ্কে ক্লীব হইবে।
৪ চতুরঙ্কে পুং ক্লীব ৫ পঞ্চে স্ত্রী পুং বুঝিবে ॥
৬ ষড়ঙ্কে স্ত্রী ক্লীব ৭ সপ্তাঙ্কে ত্রিলিঙ্গ হবে।
৮ অষ্টাঙ্কে অব্যক্ত লিঙ্গ বোদ্ধা বুঝে লবে ॥
শব্দা সহ সঙ্কেতাঙ্ক অঙ্কিত করিব।
যচ্ছব্দের যদঙ্ক তৎপার্শ্বে তাহা দিব ॥

বালক সবে সুখে শিখিবে অনায়াসে।
সে জন্য পয়ারচ্ছন্দে লিখি স্পষ্ট ভাবে ॥
পদ্যান্ত দ্ব্যক্ষরে ভাষায় মিত্রাক্ষর রীত।
তা করিলে গ্রন্থ বৃদ্ধি হয় বিপরীত ॥
তজ্জন্য পদ্যান্ত এক অক্ষর মিলন।
এ পুস্তকে এ রীতি করিলাম গ্রহণ ॥
সাধারণ জন জ্ঞান হবে অনায়াসে।
তজ্জন্য পরিচয়াদি লিখি গ্রাম্য ভাষে ॥
যে বিধানে অভিধান লিখিলে অমর।
তদ্রূপ লিখিব ভাষা শুন বিজ্ঞবর ॥
কিন্তু তিনি লিখেছেন নাম যথাক্রম।
ছন্দোনুরোধাদি জন্য লিখি ব্যতিক্রম ॥
ইত্যাদি যতেক দোষ ভাষাতে আমার।
দয়াগুণে গুণী শুদ্ধি করিবেন তার ॥
শ্রীগুরু চারুচরণ চিত্তে চিন্তা করি।
মানসে স্মরিয়ে সারা সরস্বতীশ্বরী ॥
অবিধানে অভিধানার্ণবে ঝাঁপ দেই।
গুরুদেব পার কর নিবেদন এই ॥

এই অভিধানের আত্মপরিচয় বিভাগে আভিধানিকের বংশ পরিচয় দেওয়া আছে। এবং প্রসঙ্গতঃ—

"অন্য বিশেষ মহেশ মঙ্গলে বিস্তার।
পদ্যে সত্য নারায়ণ পুস্তকে প্রচার ॥
শব্দসিন্ধু নাম এই গ্রন্থের রাখিয়া।
যে তাৎপর্যে রাখি নাম লিখি বিবরিয়া ॥"

—উক্তি হইতে জানিতে পারি যে শব্দসিন্ধু ব্যতীত কাশীনাথ 'মহেশমঙ্গল' ও 'সত্যনারায়ণ পুস্তক' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। সত্যনারায়ণ পুস্তকের ১২৫৬ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ আমি দেখিয়াছি।* নিম্নে শব্দসিন্ধুর আত্মপরিচয় শীর্ষক ৪৮ পংক্তির পয়ারটী উদ্ধৃত হইল। ইহাতে কবির বংশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

---

* নিম্নে এই সংস্করণের আখ্যাপত্র ও কবির পরিচয় জ্ঞাপক অংশ উদ্ধৃত হইল।—

"শ্রীশ্রীহরিঃ। / শরণং। / মহামুনি বেদব্যাস প্রকাশিত। / স্কন্দ পুরানীয় রেবাখণ্ডান্তর্গত / সত্য নারায়ণোপাখ্যান / নামক গ্রন্থ। / কাশীপুরবাসি / শ্রীযুতকাশীনাথ চতুর্দ্ধুরীণ কর্তৃক /

পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশিত / হইয়া। / ইদানিন্তু / কলিকাতা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। / ১২৫৬ সাল।/" পৃ° ২১, আকার ৭ $\frac{১''}{৩}$ × ৪ $\frac{১''}{২}$ ইঞ্চি।

"আমার আচার্য্য গুরু সর্বগুণধাম।
তর্কভূষণ উপাধি পীতাম্বর নাম॥
তিনি কুল পুরোহিত বিশেষ আমার।
পাইলাম বেদ মাতা কৃপাতে তাঁহার॥
তেঁহ বলিলেন বৎস কররে শ্রবণ।
সত্যব্রত কথা কর ভাষাতে রচন॥
শিরে আজ্ঞা ধরি পরে ভাবিতে লাগিলাম্।
গুরু আজ্ঞা জন্য মনে সাহস করিলাম্॥
স্কন্ধ পুরাণেতে মহাঋষি বেদব্যাস।
কৃপাকরে রেবাখণ্ডে করিলে প্রকাশ॥
সত্য নারায়ণ ব্রতকথা চমৎকার।
মহাযত্নে আমি ভাষা করিলাম তার॥
গুণবান্ গণ স্থানে করি নিবেদন।
কৃপা করি এ পুস্তক করিবে শ্রবণ॥
দোষ পেয়ে রোষ নাহি কদাচ করিবে।
অশুদ্ধ পাইলে তাহা শুদ্ধ করে দিবে॥
আত্ম পরিচয় দেই বিনয় করিয়া।
শুন সর্বজন স্বীয় দয়া প্রকাশিয়া॥
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে সপ্তসতি সার।
কাটানি কুলেতে যদুনাথ অবতার॥
তাঁর বংশধর শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুরাম নাম।
ইষ্ট পরায়ণ অসংখ্য সে গুণ গ্রাম॥
তাঁহার তনয় দ্বয় সর্ব গুণ ধাম।
শ্রীরাধা মোহন আর প্রাণনাথ নাম॥
জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠ তনয় আমি পাপাধার।
কাশীনাথ নাম মম জ্ঞান শূন্যাকার॥
নিবসতি করি আমি গ্রাম সপ্তক্ষীরে।
দ্বিতীয়ালয় কাশীপুর গঙ্গার তীরে॥
মমানুজ ভ্রাতা দেবনাথ দিলে সুর।
গাই সত্যদেব গীত আনন্দে প্রচুর॥"

আত্মপরিচয়।

আত্মপরিচয় পরে করি নিবেদন।
দয়াগুণে গুণিগণ করিবে শ্রবণ ॥
রাঢ়ীয় শ্রেণী সপ্তশতি কাটানি বংশ।
যদুনাথ যদুনাথ অংশ অবতংশ ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীধর শ্রীদ হইলে তাঁহার।
তদ্বংশে শ্রীরঘুনন্দন কৃপা অপার ॥
শ্রীগঙ্গাধরাদি কৃপা তৎপরে তদ্রূপ।
কুলীন কুলজ্ঞ কৃপাতে খ্যাতি স্বরূপ ॥
সপ্তাশ্ববাহন বৎ তাঁর সপ্ত সন্ততি।
কনিষ্ঠ হরিবল্লভ হরিদেব খ্যাতি ॥
তাঁহার তনয় রামদেব গুণধাম।
তৎ সুতদ্বয় চন্দ্রশেখর দুর্গারাম ॥
দুর্গারামের তৃতীয়পুত্র অনুপাম।
স্বয়ং বিষ্ণু বিষ্ণুরাম প্রভুরাম নাম ॥
সে সুকৃতির সৎকীর্তি কীর্তনে অপার।
মহেশ মঙ্গল গ্রন্থে কিঞ্চিৎ প্রচার ॥
অসীমা মহিমা তাঁর বর্ণিতে কে পারে।
জগৎ বিখ্যাত শ্রীগোবিন্দাদি প্রচারে ॥
সর্বগুণযুত শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সুত তাঁর।
রাধানাথ নামে রাধানাথ অবতার ॥
শ্রীরাধামোহন নামে বিখ্যাত ভুবনে।
বারেক যে দেখেছে সে না পাসরে মনে ॥
দ্বাপরে গোলক ত্যজি ভূলোকে আসিয়া।
পুনঃ নিত্য লোকে গেলা লীলা প্রকাশিয়া ॥
সে ক্ষত্রিয় বংশ চিন্তামণি চিন্তা করি।
দ্বিজকুলে যদুকুলে হয়ে অবতরি ॥
যত মনোসাদ অবিবাদে পূরাইলে।
পঞ্চপুত্র রাখি পঞ্চ পঞ্চে মিশাইলে ॥
সহোদরগণ মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ বটে।
পাপে কত কুঘটনা ঘটে এই ঘটে ॥
সপ্তক্ষীরা নাম গ্রাম ধাম মম হয়।

যথান্নপূর্ণাসহ বিশ্বেশ বিশ্বময় ॥
ছ্যালয় গঙ্গা প্রাক্-তীরে কাশীপুর গ্রাম।
কাশীসম দ্বিগ্রাম অসংখ্য গুণগ্রাম ॥
অন্নদা শিব নিবাস গঙ্গাতীর গুণ।
আমি থাকি কেবা কবে কহিতে নিপুণ ॥
অন্য বিশেষ মহেশ মঙ্গলে বিস্তার।
পরে সত্যনারায়ণ পুস্তকে প্রচার ॥
শব্দসিন্ধু নাম এই গ্রন্থের রাখিয়া।
যে তাৎপর্যে রাখি নাম লিখি বিবরিয়া ॥
পয়োধি প্রবেশিয়া প্রয়াসে রত্ন পায়।
পায় পায় অপায় তায় ব্যয়ে ক্ষয় যায় ॥
শব্দসিন্ধুতে অমূল্য পদ রত্নচয়।
চৌরাদি ভয় নাহি ব্যয়ে বৃদ্ধি নিশ্চয় ॥
সিন্ধু হৈতে রত্নোত্তোলনে প্রাণ আশঙ্কা।
পদরত্ন প্রসাদে পলায় কাল শঙ্কা ॥
পদে পদে পদবৃদ্ধি পদরত্ন পেলে।
সাদরে সম্মান লাভ সৎ সংসদে গেলে ॥

কাশীনাথের সত্যনারায়ণ পুস্তকের সুর দিয়াছিলেন দেবনাথ—
"মমানুজ ভ্রাতা দেবনাথ দিলে সুর।
গাই সত্যদেব গীত আনন্দে প্রচুর ॥

যে সত্যনারায়ণ পুস্তকের গানের সুর দিয়াছিলেন দেবনাথ—সেই দেবনাথই কাশীনাথের নিকট অমরকোষ শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সত্যনারায়ণোপাখ্যানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৫৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়। এই হিসাবে শব্দার্ণব রচনাকালও প্রায় সামসময়িক যুগে বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না। আমরা ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৫ই চৈত্র তারিখের সোমপ্রকাশে আলোচ্য অভিধানের সমালোচনা পাইতেছি ১। এই সমালোচনা ব্যতীত

১। সোমপ্রকাশ, ১৫ই চৈত্র ১২৭১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংখ্যার ২৯৬ পৃষ্ঠায় "নূতন পুস্তক ও পত্রিকা" শীর্ষক বিভাগে 'শব্দসিন্ধুর' নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে:—

"শব্দসিন্ধু। সপ্তক্ষীরার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরী অমরকোষ ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ও বেদান্তবাগীশ কৃত টীকা ধৃত শব্দ সকল সংগ্রহ করিয়া পয়ারে প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকের যেরূপ রুচি পরিবর্ত ও অকারাদি বর্ণ বিন্যাস ক্রমে অভিধান লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থ যে অধিকতর আদৃত হইবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।"

"পদ্যের দুর্ব্যবহার" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে ও আলোচ্য অভিধানের উল্লেখ আছে২।

---

২ "পদ্যের দুর্ব্যবহার

লোভাদি যে কয়টী অসৎ প্রবৃত্তি আছে, তাহা মানুষকে অসৎ পথে পদার্পণের ন্যায় অনেক বিষয়ের দুর্ব্যবহারে প্রবর্তিত করে। সর্বকালেই তাহার তুল্য প্রভুত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই প্রাচীন কালের রঘু আলেগজণ্ডর ও জুলিয়স সীজর লোভপরতন্ত্র হইয়া রাজ শক্তির পররাজ্য জয়রূপ যে দুর্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, এখনও সেই শক্তির দুর্ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। কেহ ভারতবর্ষ প্রবেশের চেষ্টায় আছেন, কেহ মেক্‌সিকো প্রভৃতি স্থানে স্বাধিকার বিস্তার করিতেছেন, কেহ ডেন্মার্ক জয়ের সুযোগ দেখিতেছেন, কেহ বা চীন প্রভৃতি গ্রাসের উদ্যোগে আছেন। সেকালের রাজাদিগের এই সংস্কার ছিল, বাহুবল প্রকাশ করিয়া পররাজ্য গ্রহণ করিতে পারিলে লোকে বীর-কীর্তি হইবে, এখনকার রাজগণের আয় বৃদ্ধি পররাজ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য হইয়াছে। পরিণাম বিবেচনা করিলে উভয়ই লোভে পর্যবসিত হইতেছে। প্রজা রক্ষার্থই প্রভুশক্তির সৃষ্টি। প্রাণি-সংহরণ পরসম্পত্তি লুণ্ঠন ও পররাজ্য হরণ করিয়া লোভ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি হয় নাই। প্রভুশক্তিকে পররাজ্য হরণাদিতে বিনিযোজিত করিলে ইহার দুর্ব্যবহার হয় সন্দেহ নাই।

রাজ শক্তির দুর্ব্যবহারের ন্যায় আজি কালি পদ্যের ও দুর্ব্যবহার দৃষ্টি গোচর হইতেছে। প্রাচীনকালে কোন কোন দেশের লোকে ভ্রমহেতু পদ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল অভিধান ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় পদ্যে রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখনও স্থান বিশেষে সেই ভ্রমের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এগুলি পদ্যের বিষয় নয়। ইহাতে পদ্য রচনা শক্তির বিনিযোগ করিলে পদ্যের দুর্ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা পদ্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদনুসারে যাহাতে রস না থাকে তাহাতে পদ্য শব্দ প্রয়োগ সঙ্গত হয় না। ইংরেজী গ্রন্থকারেরাও মানসিক আনন্দকে পদ্য লক্ষণ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই কাব্য পাঠকালে অনুভব করিয়া দেখিবেন, গ্রন্থের অন্তর্গত যে পদ্যগুলি নীরস হয় তাহা পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ হয়। হোমর হউক আর রামায়ণ হউক, সেক্সপিয়র হউক আর শকুন্তলা হউক, মিলটন হউক আর মাঘ হউক, ইহার যে যে অংশ নীরস তাহা ভাল লাগে না। যাহাতে কল্পনা শক্তি ও রচনা শক্তির সবিশেষ পরিচয়, রস, ভাব অথবা কোন উপদেশ না থাকে সে কাব্য দীর্ঘজীবি হয় না।

পয়ারে অনুবাদ করা একখানি অভিধান আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাই এই প্রস্তাব উত্থাপনের কারণ। প্রাচীন কালের লোকের এই সংস্কার ছিল, পদ্যে কোন বিষয় রচিত হইলে তাহা মুখস্থ করিবার সুবিধা হয়। কিন্তু অভিধান আনুপূর্বিক মুখস্থ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। অকারাদি বর্ণযোজনা ক্রমে অভিধান করিবার যে রীতি হইয়াছে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। সে রীতি পরিত্যাগ করিয়া আজি কালি পয়ারে অভিধান রচনার কদর্য রীতি

আলোচ্য অভিধানের পর্যায় বিবরণে অষ্টাদশ বর্গে বিভক্ত সমগ্র অভিধান যে সকল পর্যায় বিভক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ পাইতেছি। নিম্নে পর্যায় বিবরণ মুদ্রিত হইল। যথা—

স্বর্গ, পাতাল, ভূমি, পুর, শৈল, পঞ্চম।
বনৌষধি, সিংহাদি, মনুষ্য, বর্গাষ্টম ॥
ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রবর্গ, দ্বাদশ।
প্রাণি, বিশেষ্যনিঘ্ন, সংকীর্ণ, পঞ্চদশ ॥
নানার্থ, অব্যয়, এবং লিঙ্গাদি সংগ্রহ।
অষ্টাদশ বর্গ অমরাভিধানে কহ ॥
স্বর্গবর্গ চারি শত বার পর্যায় তায়।
পাতালে এক শত আট্‌চল্লিশ পর্যায় ॥
ভূমি বর্গে তিপ্পান্ন পর্যায় কবি কয়।
পুর বর্গে সাতষট্টি পর্যায় সুনিশ্চয় ॥
পর্যায় ত্রয়োবিংশতি কবি কহে শৈলে।
বনৌষধে তিন শত অষ্টনব্বই কৈলে ॥
সিংহাদিতে পর্যায় একশত ছত্রিশ।
মনুষ্যে চারি শত চৌষট্টি সুপ্রকাশ ॥
ব্রহ্মবর্গে পর্যায় এক শত বিরাশি।
ক্ষত্রিয়ে তিন শত উনপঞ্চাশ ভাষি ॥
বৈশ্যে এক শত ছত্রিশ পর্যায় কহে।
শূদ্রে এক শত আটষট্টি পর্যায় রহে ॥
এক শত বাষট্টি পর্যায় প্রাণিবর্গে।
পরে আর নিবেদন শুন বিজ্ঞবর্গে ॥
বিশেষ বিশেষ্যনিঘ্ন বর্গ লিখে সার।
এক শত চরোনব্বই পর্যায় তার।

যে কেন অনুসৃত হইতেছে, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। বিশেষতঃ যে কালে ভাবুকতা ও কল্পনা শক্তি প্রবল থাকে, সেই সময়েই লোকের পদ্যে সবিশেষ অনুরাগ হয়। যখন বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষ হইয়া ভাবুকতা ও কল্পনা শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে, সে অবস্থায় লোকের পদ্যে অনুরাগ কমিয়া যায়। আজি কালি কল্পনা শক্তির কাল অতীত হইয়াছে। এ সময়েও যে অভিধানরূপ নীরস পদ্য রচনায় প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, ইহা আশ্চর্যের বিষয়।" সোম প্রকাশ, ১৫ই চৈত্র ১২৭১ বাং, পৃ° ২৯৩-২৯৪।

সংকীর্ণ বর্গে এক শত আশি পর্যায়।
নানার্থ বর্গ বত্রিশ পর্যায় তাহায়॥
আঙ্ আদি অব্যয় নানার্থে পর্যায় এক।
অব্যয়ে সাতান্ন পর্যায় কবি লিখেক॥
লিঙ্গাদি বর্গে লিখেন সাতান্ন লক্ষণ॥
কাশীনাথ কহিল পর্যায় বিবরণ॥ পৃঃ ১-৫;

আলোচ্য অভিধানের নিদর্শন স্বরূপ অংশবিশেষ যথাযথ উদ্ধৃত হইল। এই নিদর্শন হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইবে। শব্দ ও তাহার অর্থ সহজে বাহির করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থের প্রারম্ভে পর্যায়ক্রমে সকল শব্দের এক দীর্ঘ সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। এই সূচীতে বিভিন্ন শব্দের অর্থ কোন অধ্যায়ের কত পৃষ্ঠার কোন পংক্তিতে আছে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। নিম্নে এই সূচীরও অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল। আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৮৵০+২১১+? আকার ৯১/৪ × ৬" ইঞ্চি।১

যেই স্থানে অনেকে মিলিয়ে মদ্য খায়।
আপান৩ পানগোষ্ঠিকা১ দ্বি সে স্থানে কয়॥
মদ্যপান পাত্রে কয়্ পানপাত্র৩ চষক৪।
আর × অনুতর্ষ ২ অনুতর্ষণ ৪ সরক ২॥
দ্যূতকৃৎ ২ অক্ষদেবিন্ ২ অক্ষধূর্ত ২ কিতব২।
ধূর্ত ২ পাঁচ খেলাকরা জোয়ারিকে কব॥
লগ্নক ২ প্রতিভূ ২ দুই জামিনদারে বলে॥
সভিক২ দ্যূতকারক ২ পাশাদি যে খেলে॥
মতভেদে উপরি উক্ত পর্যায় দ্বয়।
জামিনের অভিধান কবিবর কয়॥
দ্যূত ৪ অক্ষবতী ১ কৈতব ৩ পণ ২ এ চারি।
অপ্রাণিতে খেলা পাশা আদি কৈতে পারি॥
গ্লহ ২ যাহা বাজি রাখে যে কোন খেলায়।
অক্ষ২ দেবন২ পাশক২ পাঞ্চির নাম ত্রয়॥

১ শব্দার্ণবের আলোচ্য খণ্ড আড়িয়াদহ এসোসিয়েশন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। উক্ত লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়ের সৌজন্যে ইহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

পরিণায় ২ খেলার ঘুঁটি চালাকে কয়।
অষ্টাপদ ৪ শারিফল ৪ খেলার কোট্ হয়॥
প্রাণিদ্যূতও সমাহ্বয় ২ অভিধান দ্বয়।
বাজি রেখে ভ্যাড়াকুক্ড়াদি লড়ায়ে কয়॥
কাশী কহে শূদ্রবর্গ হৈল সমাপন।
গুরু স্মরি করি প্রাণিবর্গ আরম্ভন॥

[পৃঃ ১৩৯]

নির্ঘণ্ট

পৃ° ৪/০

বিদ্যাপতির উপমা

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ভূমানন্দ [কালীপুর আশ্রম, আসাম]

১১। বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে কোনও কোনও পদে কালিদাসের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোনও পদ ঠিক কালিদাসেরই অনুরূপ। বিদ্যাপতির একটি পদে দেখি—

"জল মধে কমল গগন মধে সুর।
আঁতর চাঁদ কুমুদ কত দূর॥
গগন গরজ মেঘা শিখর ময়ুর।
কত জন জানসি নেহ কত দূর।"

অর্থাৎ, দূরত্ব হেতু পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার ন্যূনতা হয় না। দেখ না, জলমধ্যে কমল থাকে ও সূর্য থাকেন আকাশে, চন্দ্র ও কুমুদিনি উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বহু, গগনে মেঘ গর্জন করে, পর্বত শিখরে ময়ূর বাস করে, অথচ ইহাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রীতির অণুমাত্রও তারতম্য হয় না। কালিদাসের "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা"য়ও ঠিক এই ভাবেরই শ্লোক দেখিতে পাই—

"গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো,
লক্ষান্তরেঽর্কঃ সলিলে চ পদ্মম্।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথো,
যো যস্য হৃদ্যং ন হি তস্য দূরঃ॥"

বিদ্যাপতি লিখিতেছেন—

"রোপিয় ন কাটিয় বিষহুক গাছ"

কালিদাসের "কুমারসম্ভবে" দেখি—

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"

কালিদাসের "মেঘদূতে" বিরহী যক্ষকে "কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ" বলিয়া বর্ণনা আছে; অর্থাৎ বিরহ-সন্তাপে যক্ষের দেহ এরূপ কৃশ হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রকোষ্ঠের বলয় খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতির বিরহিনী রাধিকারও সেই অবস্থা—

"কৃশ ভুজ ভূখন ক্ষিতিতলে মেল"।

অধিকন্তু, শ্রীমতীর দেহ তন্তুর ন্যায় ক্ষীণ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার অঙ্গুরী, বলয়ে পরিণত হইয়াছিল—

(ক) "অঙ্গুলক আঙ্গুটী সো ভেল বাহুটী
হার ভেল অতি ভার।"

(খ) অঙ্গুরী বলয় ভেল কামে পিন্ধায়ল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই ন পারই
তত্তক দোসরা দেহা।"

কালিদাসের উমা প্রতি পাদক্ষেপে পদ্ম ফুটাইতে ফুটাইতে চলিতেন, বিদ্যাপতির শ্রীমতী রাধিকাও—

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥"

১২। বিদ্যাপতির পদাবলীতে মধ্যে মধ্যে প্রচ্ছন্ন বর্ণনাও পাওয়া যায়, তবে তাহার সংখ্যা খুবই কম—

(ক) "পাঁচ পঞ্চ গুণ দশ গুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখি মাঝে।"

অর্থাৎ ৫ × ৫ × ১০ × ৪ × ৮ × ২ = ১৬০০০ ষোড়শ সহস্র সখীগণ মধ্যে।

(খ) অভিসার-প্রত্যাগত শ্রীমতী রাধাকে ননন্দা বলিতেছেন—

"যাহা লাগি গেলি তাহা কহা লইলি লো
তা পতি-বৈরি-পিতা কাঁহা।"
"যহ্নিকা জনম হইতে তোঁহে গেলি হে
আইলি তহ্নিকা অন্তে।"

অর্থাৎ তুই যার (যে জলের) জন্য গেলি, তা কোথায় রাখলি? আর তাহার (জলের) পতির (সমুদ্রের) বৈরির (অগস্ত্যের) পিতাই (কুম্ভই) বা কোথায়? যাহার জন্ম হইলে (সূর্যোদয় হইলে) তুই জল আনিতে গিয়াছিলি, তাহার অস্ত হইলে (সূর্যাস্ত হইলে) ফিরিয়া আসিলি?

শ্রীমতী উত্তরে বলিতেছেন—

"শঙ্করবাহন খেলি খেলাইতে
মেদিনী-বাহন আগে।"

অর্থাৎ, পথে একটি শঙ্কর-বাহন (বৃষ) খেলা করিতেছিল এবং একটি মেদিনী-বাহন (সর্প) সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেইজন্য আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

১৩। পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাপতির উপর যেমন কালিদাসের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, কবিবর ভারতচন্দ্রের উপরও সেইরূপ বিদ্যাপতির প্রভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের তুলনামূলক কয়েকটি মাত্র পদ নিম্নে দিলাম—

(ক) শ্রীমতী রাধিকা মান করিয়া বসিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মান ভঙ্গ করিবার জন্য নানাবিধ ভঙ্গীতে অনুনয় বিনয় করিয়া কথা বলিতেছেন—

"বদন চাঁদ তোর   নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিয় রস পীবে।"

ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে"ও দেখি, সুন্দর বিদ্যার প্রতি ঠিক এই ভাবেরই উক্তি করিতেছেন—

(১) "এ নয়ন চকোর   ও মুখ সুধাকর
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর॥"

(২) "নয়ন খঞ্জন মোর   নয়ন চকোর তোর
দুহে মিলি হাসিবে এখনি॥"

(খ) শ্রীকৃষ্ণ, মানিনী শ্রীমতীকে বলিতেছেন, আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তুমি বিচার করিয়া আমার উপযুক্ত শাস্তির বিধান কর—

"হামারি বচনে যদি নহে পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘনপাশে তাড়ি।
পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উর কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত এ শাতি॥"

ভারতচন্দ্রের সুন্দরও ঠিক এই ভাবেই বিদ্যাকে বলিয়াছেন—

"অপরাধ করিয়াছি   হুজুরে হাজির আছি
ভুজ-পাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচ-গিরি   নখাঘাতে চিরি চিরি
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর   নিতম্ব প্রহার কর
আর আর যেবা মনে লয়।"

(গ) বিদ্যাপতি অনেক স্থলেই পয়োধরকে শিবলিঙ্গের সহিত উপমা দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও সেই উপমাটি গ্রহণ করিয়া, বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

(১) "নাভিকূপে যেতে কাম কুচ-শম্ভু বলে
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥"

(২) "হাসিতে তড়িৎ জিনে পয়োধরে হর।"

(৩) "কুচ-শম্ভু শিরে নখচন্দ্রকলা।"

(ঘ) বিদ্যাপতি শ্রীমতীর কটিদেশকে ডমরুমধ্য ও সিংহের কটিদেশ অপেক্ষাও কৃশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"ডমরু সিংহ জিনি মাঝ।"

ভারতচন্দ্রও বিদ্যার কটিদেশকে ঠিক সেই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন—

"কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান
হরগৌরী কর পদে আছে বিদ্যমান।"

(ঙ) বিদ্যাপতি নীল-বসন-বেষ্টিত শ্রীমতীর দেহকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভিতরের বিদ্যুতের সহিত উপমা দিয়াছেন—

"নিল নিচোলে ঝাঁপবি নিজ দেহ
জনি ভিতরে দামিনী রেহ।"

ভারতচন্দ্রও বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।"

দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল কেহ কেহ বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ উপমাগুলিকে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মনে করেন। অবশ্য এবংবিধ ধারণা, কেবলমাত্র যাঁহারা কাব্যরস আস্বাদন করিতে অক্ষম, তাঁহারাই পোষণ করেন। যাঁহারা কাব্য আলোচনা করেন ও কাব্যরস আস্বাদন করিতে জানেন, তাঁহারা এই সমস্ত উপমায় আদৌ অশ্লীলতা লক্ষ্য করেন না; তাঁহারা দেখেন ভাব, রস, বচন-বিন্যাস, পদলালিত্য এবং উপমার সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। বিদ্যাপতির রচনায় এই গুণগুলি সমস্তই পূর্ণভাবে বিদ্যমান। অপরপক্ষে দেখি, কালিদাসের রচনাকেও কেহ কেহ ইদানীং অশ্লীলতাদোষদুষ্ট মনে করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে, এক মাসিক পত্রিকায় এই বিষয়ে আলোচনা ও প্রত্যুত্তর দেখিয়াছিলাম এবং মেঘদূতের "মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ" পদটির উপর বিশেষভাবে আক্রমণ দেখিয়া একটু আশ্চর্যান্বিতও হইয়াছিলাম। কালিদাসের কাব্য অশ্লীলতাপূর্ণ হইলে, "কুমারসম্ভব", "মেঘদূত", "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" প্রভৃতি পুস্তক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত বিদ্বান কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক টোল, স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী-দিগের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইত না। কবিদিগের রস ও লালিত্যপূর্ণ কবিতা, রসিকেরাই উপভোগ করেন, "অন্য লোকের লাঠি বাজে"। অন্ধের নিকট মনোহর দৃশ্য-বর্ণনার ন্যায়, ভক্তের নিকট কাব্য-বর্ণনা নিতান্তই নিরর্থক। তাই, কবি মনের দুঃখে বিনীতভাবে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাব ও সাধনা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅজিত ঘোষ

কামসূত্রের টীকাকার যশোধর চিত্রকলা-পদ্ধতির ছয়টী মূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; সেগুলি—(১) রূপভেদ, (২) প্রমাণ, (৩) ভাব, (৪) লাবণ্যযোজনা, (৫) সাদৃশ্য ও (৬) বার্ণিকভঙ্গ। রূপভেদ অর্থে আকৃতির প্রকারভেদ, প্রমাণ—আকৃতির পরিমাণ, ভাব—ভাবের অভিব্যক্তি, লাবণ্যযোজনা—লাবণ্য বা সৌন্দর্যের সমাবেশ, সাদৃশ্য—জীবনের অকপট পবিত্রতা এবং বার্ণিকভঙ্গ—বর্ণ-বৈচিত্র্যের লীলা।

চিত্র অঙ্কন করিবার সময় বিভিন্ন নরনারীর শিল্পবিজ্ঞানসম্মত আকৃতির প্রতি শিল্পীর লক্ষ্য রাখিবার নিয়ম ছিল। গ্রাম্য ব্যক্তি, নারী, বিধবা, সভাসদ্, অভিজাত, শিল্পী, মল্লবীর, সৈনিক প্রভৃতি সকলের চিত্রেই আকৃতির স্বতন্ত্র প্রমাণ অনুকৃত হইত। বিষ্ণুধর্মোত্তরেও পাঁচ প্রকার মানবের নির্দেশ দেখা যায়; সেগুলি (১) হংস, (২) ভদ্র, (৩) মালব্য, (৪) রুচক ও (৫) শশক। * রূপভেদ-অনুসারে ইহাদের বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত লাবণ্যযোজনা, সাদৃশ্য ও বার্ণিকভঙ্গের স্বাতন্ত্র্য শিল্পশাস্ত্রসমূহে দেওয়া হইয়াছে। মূর্তিগুলি প্রধানতঃ নয়টী ভঙ্গীতে হইতে পারিবে; ভঙ্গীগুলি যথাক্রমে—'ঋজ্বাগত' অর্থাৎ সম্মুখদৃশ্য, 'অনৃজু' অর্থাৎ পশ্চাদ্দৃশ্য, 'সাচীকৃতশরীর' অর্থাৎ বক্রভঙ্গীতে পার্শ্বদৃশ্য, 'অর্ধবিলোচন' অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুখের ও শরীরের তিন চতুর্থাংশের পার্শ্বদৃশ্য, 'পার্শ্বাগত' অর্থাৎ সম্পূর্ণ মূর্তির পার্শ্বদৃশ্য, 'পরাবৃত্ত' অর্থাৎ মুখ ও স্কন্ধদেশ পিছন দিকে ঘুরান মূর্তির দৃশ্য, 'পৃষ্ঠাগত' অর্থাৎ কতকাংশ পার্শ্বদৃশ্যে দৃষ্ট শরীরের উপরাংশের সহিত পশ্চাদ্দৃশ্য, 'পরাবৃত্ত' অর্থাৎ নীবি হইতে উপরাংশ বাঁকাইয়া পিছন দিকে ঘুরান মূর্তির দৃশ্য, এবং 'সমানত' † অর্থাৎ আসনপীড়ি অবস্থায় উপবিষ্ট মূর্তির পশ্চাদ্দৃশ্য। 'ক্ষয়' ও 'বৃদ্ধি'র দ্বারা এই সমুদয় দৃশ্য অঙ্কন করা সম্ভবপর হইত। ক্ষয় ও বৃদ্ধির রীতি অনেকটা ইউরোপীয় foreshortening রীতির মত। ইহার সহিত শিল্পী আলো ও ছায়ার অর্থাৎ light and shadeএর সাহায্য-ব্যতীত চলিতে পারিতেন না। আলো ও ছায়াকে বিষ্ণুধর্মোত্তরে 'বর্তনা' বলা হইয়াছে। এই বর্তনা আবার তিন প্রকারের—(১) পত্রজ—অর্থাৎ অনুপ্রস্থ রেখাসমূহে চিত্রিত বর্তনা, (২) ঐরিক—অর্থাৎ কমবেশী রঙ বুলাইয়া চিত্রিত বর্তনা এবং (৩) বিন্দুজ—অর্থাৎ বিন্দুসমূহে চিত্রিত বর্তনা। ‡

---

* JRAS, VII, 1875 এবং বৃহৎ-সংহিতায় [দ্রষ্টব্য H. Kern-কৃত অনুবাদ, ৯৩-৭] ইহাদের প্রমাণনিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

† 'সমানত' ভঙ্গিসম্বন্ধে শিল্পরত্ন ৬৪, ৬০-১১০ দ্রষ্টব্য।

‡ বিষ্ণুধর্মোত্তর ৪১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চক্ষুই যে ভাবব্যঞ্জনার প্রধান সহায় সে সত্যও সেযুগের শিল্পশাস্ত্রবিদ্‌গণের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। 'চিত্রলক্ষণ'কার* পাঁচ প্রকার চক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন—(১) ধনুরাকৃতি, (২) উৎপলাকৃতি, (৩) মৎস্যোদরাকৃতি, (৪) পদ্মপত্রাকৃতি, ও (৫) কড়িসদৃশাকৃতি। ধনুরাকৃতি চক্ষু প্রায় নিমীলিত। ধনু হইতে উৎপলাদিক্রমে চক্ষুর বিস্তার ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে এবং কড়িতে গিয়া সম্পূর্ণ বিস্ফারিত হইয়াছে। ধ্যানস্থ যোগীর চক্ষু ধনুরাকৃতি, সাধারণ লোকের চক্ষু উৎপলাকৃতি, রাজা-রাণী প্রণয়ি-প্রণয়িণীর চক্ষু মৎস্যোদরাকৃতি, ভয় বা ক্রন্দনের চোখ পদ্মপত্রাকৃতি এবং যন্ত্রণা ও ক্রোধজনিত চক্ষু কড়িসদৃশ। এতদ্ব্যতীত আরও একটী চক্ষুর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেটী দেবতার চোখ। দেবচক্ষু দুগ্ধের মত শুভ্র ও স্নিগ্ধ, তার নয়নপল্লবে কোনরূপ কর্কশতা থাকিবে না, নীল মণির মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্যের চঞ্চলতা থাকিবে এবং তারকা হইবে বৃহদাকার ও কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুর সহিত ভ্রূর যে প্রকারভেদ 'চিত্রলক্ষণে' দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, প্রশান্ত ব্যক্তির ভ্রূ হইবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও নর্তনশীল, ক্রন্দনপরায়ণ ব্যক্তির ভ্রূ ধনুরাকৃতি এবং বিলাপকারী ও ভয়চকিতের ভ্রূ নাসাসন্ধি হইতে অর্ধকপাল জুড়িয়া থাকিবে।

মধ্যযুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পগুলির মধ্যে ভিত্তিচিত্রই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এখনও তাহার নিদর্শন বর্তমান। ভিত্তিচিত্রের কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে যথেষ্ট বলা হইয়াছে। মহাউম্মগ জাতকে কয়েকটী চিত্রাগারের ('চিত্তাগারে'র) উল্লেখ আছে। বোধিসত্ত্ব একটী বিরাট্ গৃহে নির্মাণ করিয়াছিলেন; উহাতে সুন্দর সুন্দর ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত ছিল। আর একটী ভূগর্ভ প্রাসাদের ভিত্তিগুলিতে চূণের আস্তরণ দিয়া সেগুলির উপর শাক্যের মহিমা, সুমেরুপর্বত, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র, চারিটী মহাদেশ, হিমবান্ (হিমালয়), অনোত্তত (রাবণ) হ্রদ, সিন্দুর পর্বত, সূর্য ও চন্দ্র, ছয়টী স্বর্গ ও উহাদের যাবতীয় বিভাগের সহিত শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের স্বর্গ অঙ্কিত ছিল। এতদ্ব্যতীত কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের প্রমোদকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত একটী চিত্রাগারের কথাও বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রাগারে নানা দর্শকের সমাবেশ হইত, এমন কি অনেক ভিক্ষু নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সেখানে গিয়া চিত্রগুলি দেখিতেন। কালিদাসের 'মেঘদূতে' অমরাবতীর অভ্রংলিহ প্রাসাদে এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' রাজা অগ্নিমিত্রের চিত্রশালার কথা পাওয়া যায়। এই চিত্রশালাগুলিতেও ভিত্তিচিত্র সংরক্ষিত হইত।

এই ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের নিদর্শন এখন গুহা মন্দিরগুলিতেই পাওয়া যায়। সর্বসমেত প্রায় বার শত গুহামন্দির ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে চিত্রকলার নিদর্শন যেখানে যেখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। অজন্টা, বাঘ, শিগিরি এই নিদর্শনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। অজন্টার চিত্রকলাই ভারতীয় চিত্রশিল্পের চরম নিদর্শন।

* এপর্যন্ত 'চিত্রলক্ষণে'র মাত্র জর্মান অনুবাদ বাহির হইয়াছে। উহা Dauffer-কৃত Dokumente der indischen Kunst.

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত অজণ্টার চিত্রসম্ভার চিত্রিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ গুপ্তযুগেই অজণ্টার সৃষ্টি—তখন অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি রাজচক্রবর্তিগণের রাজ্যকাল।

গুপ্তযুগেই কিন্তু অজণ্টার সৃষ্টি হইলেও উহা সম্পূর্ণভাবে দ্রবিড়-সভ্যতার নিদর্শন। ভারতের বহু শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম কলাশিল্প দ্রবিড়-সংস্কৃতি হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্ব হইতেই এই সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সংস্কৃতির প্রভাবে যে চিত্রশিল্প গড়িয়া ওঠে তাহার নিদর্শনই আমরা অজণ্টা, বাঘ, শিগিরি ও সিত্তনবশলে পাইয়াছি। আবার অজণ্টায় যে চিত্রশিল্পের পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। অজণ্টা ও তাহার প্রভাবাধীন চিত্রশিল্প যে দ্রবিড়দেরই অবদান তাহার একটা আভাষ প্রথমে আমাকে আমার পূজনীয় স্বর্গগত জ্যেষ্ঠতাত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেন এবং তিনিই আমাকে উহার অনুসন্ধানে উৎসাহিত করেন এবং যথেষ্ট সন্ধানও দেন। এই অনুসন্ধানের ফল ১৩৪৩ 'বঙ্গাব্দে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে' কলাবিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে আমার চিত্রশিল্প বিষয়ক বক্তৃতায় আমি প্রথম উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। অতঃপর বহু নিবন্ধে ও 'বঙ্গীয় মহাকোষে'র 'অজণ্টা' শব্দে যথাসাধ্য উহাই প্রমাণ করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছি।

অজণ্টা দ্রবিড়-সভ্যতার নিদর্শন হইলেও উহা যে সম্পূর্ণ ভারতীয় তাহাতে অবশ্য দ্বিমত করিবার উপায় নাই। দ্রবিড়-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা ভারতীয় শিল্পকলার অবদান। আর্য-সংস্কৃতি অর্থাৎ যাহাকে আমরা Indo-Aryan Culture বলি এবং দ্রবিড়-সংস্কৃতি উভয়ে অনেকটা সমসাময়িক—উভয়ে পাশাপাশি একত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও এবং উভয়ের মধ্যে শিল্পের নীতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও একটা দিকে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল—তাহা ধর্ম ও চিন্তাধারা; একই ধর্মভাব ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়া উভয়েই গড়িয়া উঠিয়াছে। অজণ্টার চিত্রসম্ভার ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রনিচয়ের অনুকূল কলাবিজ্ঞানসম্মত। শিল্পের প্রধান বাণী সাম্য ও মৈত্রী এবং তাহার ফলে শান্তির সুদৃঢ় বন্ধন। শিল্পের মর্ম বিশ্বমানবের সর্বজনীন ভাষা। অরূপকে রূপায়তনে পর্যবসিত করিবার জন্য শিল্পীরা যুগে যুগে সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। যুগে যুগে শিল্পীরা এই রূপমাধুর্যে বিভোর হইয়া সাম্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সাম্যের অনুভূতি সে-যুগে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলে আর্য ও দ্রবিড় উভয় সংস্কৃতির মধ্যে এক মহামিলনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

প্রধানতঃ 'সত্য' ও 'বৈণিক' চিত্রশিল্প অজণ্টায় স্থান পাইয়াছে। সত্য বা আদর্শের অনুপ্রেরণার চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে প্রথমে দেবযোনি ও স্বর্গীয় চিত্রের পরিকল্পনা করিতে হয়। ইহার আদর্শ অজণ্টার দেবধর্মী চিত্রগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। বৈণিক কলাপদ্ধতির দিক্ দিয়া জাতকের গল্পগুলির প্রভাব দেখা যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। জাতকের চিত্রগুলি

বাস্তবজগতের নিত্য আবর্তনের সভাবমাত্র। সমগ্র চিত্রসম্ভারের রূপসংবেদ প্রমাণ ও রূপভেদ এবং শারীরসংস্থান ও আত্মার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কল্পনাদ্যোতক প্রতিভামাত্রই ইহাতে স্থান পায় নাই, বিচক্ষণতা ও ব্যুৎপত্তিও স্থান পাইয়াছে—কলাবিজ্ঞান-সম্মত আভ্যাসিকই ইহার প্রধান অবদান।

ভারতীয় মধ্যযুগকে বৌদ্ধভারত বলিলেও কোন অত্যুক্তি হয় না। গুহামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধরাই। শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধগণের উদ্দেশ্য ছিল, লোকলোচনের অন্তরালে এমন কোন নির্জন স্থানে তাঁহাদের ধর্মসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে লোকবৃত্তের কোলাহল ও অশান্তিময় জীবনযাত্রা তাঁহাদের ধর্মাচরণে কোনরূপ বাধা দিতে পারিবে না। প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের বেষ্টনী ও পবিত্রতা তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিবে। এইরূপ ধর্মসঙ্ঘে শিল্পকলা সংরক্ষণ করিবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। একথা সত্য যে, সকল দেশেই সকল সময়ে রূপশিল্প মানবের পরমার্থ-সাধনায় সহায়তা করিয়াছে। সাধকের ধার্মিক মনোবৃত্তির সহযোগিতায় সুকুমারশিল্প শ্রেষ্ঠ প্রভাব প্রয়োগ করিতে পারে। একারণেই গুহা-মন্দিরগুলিতে শিল্পসম্ভার তথা চিত্রকলার এইরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

সে-যুগের শিল্পীরা যে খুবই দক্ষ ছিলেন তাহা গুহামন্দিরগুলির চিত্রসমূহ দেখিলে স্পষ্টই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্স্ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। গ্রিফিথ্স্ সাহেব তাঁহার ছাত্রদের লইয়া অজণ্টার চিত্রগুলির নকল লইতে গিয়াছিলেন। নকল লইবার সময় তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বলেন—এই সমুদয় চিত্র যাঁহারা আঁকিয়াছিলেন, চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে তাঁহাদের দানবীয় ক্ষমতা ছিল। এমন কি, ঋজু ভিত্তিগাত্রের রেখাগুলি—যেগুলি মাত্র তুলির এক একটী তুলির দীর্ঘ টানে অঙ্কিত হইয়াছিল—সেই তুলির টানের অপরূপ সার্থকতা দেখিলে পরম বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়। যেখানে ছাদের গায়ে সুদীর্ঘ সরল রেখা সহজ ও সাবলীলভাবে টানা হইয়াছে এবং যেখানে এরূপ বাধাহীন তুলির আঁচড় টানা একান্ত দুরূহ, সেখানকার শিল্পীর সৃষ্টিনৈপুণ্য অলৌকিক বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছে। *

একথা বিদেশীয় শিল্পরসিকের লেখনী হইতেই বাহির হইয়াছে। সুতরাং এই উক্তির যথেষ্ট মূল্য দেওয়া যায়। অজণ্টার চিত্রগুলিতে এমন একটী বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় যাহা অন্য কোন যুগে বা ভারতের অন্যত্র দেখা যায় না। আবার অজণ্টা হইতেই আমরা একটা renaissance যুগের সন্ধান পাই। এই রেনাসাঁর সাধকেরা বিরাট্ শক্তি ও প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া চিন্তা করা অসঙ্গত নয়।

ভারতীয়েরা সেযুগে শিল্পকে শিল্পের অনুপ্রেরণা লইয়া ভালবাসেন নাই—পবিত্র প্রেমের ঐকান্তিক অনুরাগ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। পবিত্রতা ও অপবিত্রতায় কোন পার্থক্য দেখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শিল্পীর চোখে বিরাট্ হইতে অণু, মহৎ

* Indian Antiquary, Vol. III (1874), 26.

হইতে পিশাচ, সুন্দর হইতে অসুন্দর, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী সমস্তই সুন্দর। শিল্প-প্রকৃতির ছন্দে ও সামঞ্জস্যে পরমসুন্দরের আবির্ভাব হয়। সাধারণে যাহাকে কুৎসিত, অসুন্দর, অপবিত্র ও ভয়ঙ্কর দেখিবে, শিল্পীর শিল্পকুশল মনের নিভৃত প্রেরণা সেখানে সুন্দরের সাধনা করিবে; সুন্দরের সাধনাই তাঁহার আন্তরিকতা-'ভূমৈব সুখম্'। ইহাই ছিল সেযুগের শিল্পীর আদর্শ। সেই আদর্শের 'ভাবনা'য় রূপরসিকের মনে যে বেদনা জাগিয়া উঠিত, মনোজগতের অন্তরতম প্রদেশে তাহারই ভাষা মুখরিত হইয়া উঠিত—

'অহো ভাবোপপন্নতা।
অহো যুক্তলেখতা ॥'

তথাকথিত শিল্পীদের কোন সামাজিক সংহতি যেমন সর্বসাধারণের সর্বপ্রধান সুখের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, তেমনই ব্যক্তিগত সুখের লালসায় বা জ্ঞানতঃ তাঁহারা সুন্দরের সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন বলিলে ভুল হইবে। শিল্পের চরম পরিণতি ছিল জীবন-মৃত্যুর কয়েকটী সত্যের প্রচ্ছন্ন অনুভূতি—সুন্দর চিত্র আঁকিবার আকাঙ্খাই প্রবল ছিল না। শিল্পে সৌন্দর্যের ত্রুটি বা জীবনে সুখের অভাব কোন সভ্যতার পক্ষে প্রশ্ন উঠিবার উপযোগী নয়; এমন কি, ক্রমোৎকর্ষের প্রথম স্তরেও সৌন্দর্য বা সুখ সহজলভ্য হইতে পারে না। এই সত্যের অনুপ্রেরণা ছিল সেযুগের শিল্পকুশল মনের মজ্জাগত। এজন্যই সেই শিল্পীরা যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সৃষ্টি জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় অনবদ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পতত্ত্ববিৎ হ্যাভেল সাহেব তাই বলিয়াছেন—

Indian art must be placed among the greatest of the great schools, either in Europe or in Asia, and what India borrowed from outside her own world has repaid a hundred-fold by the produdts of her own creative genius, ...out of what she took came higher ideals than Greece ever dreamt of, and things of beauty that Italy never realized.*

* Indian Sculpture and Painting p. 69.

দ্বৈত ও অদ্বৈত বর্ণবাদ

শ্রীসমাধি প্রকাশ আরণ্য

'বর্ণ' সম্বন্ধে প্রাচীনতম সাক্ষী ঋগ্বেদে আমরা প্রধানতঃ দুইটী বর্ণ বা জাতির উল্লেখ পাই। ঋগ্বেদের ১০।৯০।১২ ঋকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটী বর্ণের উল্লেখ থাকিলেও, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে তাহা পরকালে প্রক্ষিপ্ত বা রচিত বলেন; আর তাহা না হইলেও ঐ চারি বর্ণ-বিভাগ ঋগ্বেদের অন্যত্র কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই। ঋগ্বেদে, অন্যান্য বেদে এবং উপনিষদে অনেক স্থলেই যে দুইটীমাত্র বর্ণের উল্লেখ আছে তাহা খুব দৃঢ় এবং সঙ্গত ভাবেই প্রমাণিত করে যে প্রাচীন বৈদিক যুগে কেবল দুইটী মাত্র বর্ণ প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদ,[১] বৃহদারণ্যকোপনিষদ,[২] মুণ্ডকোপনিষদ,[৩] রামায়ণ,[৪] মহাভারত[৫] পদ্মপুরাণ,[৬] শ্রীমদ্ভাগবৎ,[৭] আদি শাস্ত্র হইতে আমরা আরও পাই যে জগৎ জন্মের প্রথম প্রভাতে সত্যযুগে একটী মাত্র বর্ণ ছিল এবং তাহা ব্রাহ্মণ বা দেববর্ণ।

যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় বা আত্মজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁহারাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম ও আত্মবাদ, দেহবাদ বা ভোগবাদ অপেক্ষা উচ্চতর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেহবাদীরা "অনার্য", "অসুর", "দাস", "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত হইতেন এবং ইঁহারাই গীতোক্ত "তামসাঃ জনাঃ", যাঁহাদের জীবন ধারণের একমাত্র প্রয়োজনই ছিল মরণশীল দেহখানার চিন্তা ও তাহার ভোগ-সাধনা।

ঋগ্বেদ বর্ণিত যে দুইটী প্রধান বর্ণ বা জাতি আছে তাহাদের নাম :—(১) আর্য, দেব, বিপ্র বা ব্রাহ্মণ এবং (২) অনার্য, দস্যু, অসুর, দাস বা শূদ্র। এই প্রধান দুইটী "বর্ণ" কেবল যে পরস্পর বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে কখনও আর্যেরা প্রধান ও প্রবল হইতেন, আবার কখনও দস্যু বা অসুরেরা প্রধান ও প্রবল হইতেন—আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও ভৌমিক সংগ্রামে এবং বিজয়ে। বর্ণ বা জাতির দেহ-মনরাজ্যে ইহা আত্মবাদ ও দেহবাদের বা সৎবাদ ও অসৎবাদের চিরন্তন যুদ্ধ; কেন্দ্রাপসারিনী ও কেন্দ্রাভিসারিনী দুইটী শক্তির শাশ্বত সংঘর্ষ; মনোবিজ্ঞানের দুইটী চরম ভাব পরমাণুর নিত্য ঘূর্ণিপাক্। সমাজনৈতিক, বৃত্তিনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক আদর্শে সংবদ্ধ দুইটী বিবাদমান পক্ষের এই দেহবাদের সহিত আত্মবাদ-সংগ্রামের সামাজিক জাতি-দ্বন্দ্বই মূল নমুনারূপে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে আর্য-অনার্য ও দেবাসুর সংগ্রামে। এই সংগ্রাম অনেক সময়ই

(১) ১০।১২১।১; ১০।৯০।৫ (২) ১।৪।১০, ১১ (৩) ১।১ (৪) অরণ্যকাণ্ড, ১৪ অধ্যায় (৫) শান্তি, ১৮৮।১০; বনপর্ব, ১৪৮।১৮-২১ (৬) স্বর্গখণ্ড, ২৫ অধ্যায়,

উগ্র এবং দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া আর্য বা দেবগণের পক্ষে মরণ আঘাতে পর্যবসিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানের আধ্যাত্মিক বেগ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানবগণের বহুলাংশকে আর্যত্বে, ব্রাহ্মণত্বে এবং আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া পরিণামে জয়টীকা ললাটে ধারণ করিয়াছে। বৈদিক এবং ঔপনিষদিক বর্ণবাদের জাতি সংগ্রামের ইহাই হইল নিগূঢ় মর্মকথা।

দুইটী মাত্র বর্ণের একত্র সমাবেশ আমাদিগকে এই দ্বৈত বর্ণবাদেরই আভাষ প্রদান করে। ঋগ্‌বেদে আর্য ও দস্যু শব্দ একত্রে ব্যবহার বহুস্থলে আছে[৭]। ঐরূপ দাস ও আর্যশব্দও বহুস্থলে একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে[৮], "হত্বীদস্যূন প্রার্থ, বর্ণমাবৎ"[৯] অর্থাৎ:—দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন। এখানে আমরা "আর্যবর্ণ" পাইতেছি। "যো দাসং বর্ণমধরং[১০] ॥ এখানে আমরা "দাসবর্ণ" পাইতেছি। সায়ণাচার্য ঐ দাস শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন:— "দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্বা দাসমুপক্ষয়িতারং অধরং নিকৃষ্টমসুরম্।" অর্থাৎ:—দাসবর্ণ শূদ্রাদি অথবা দাস নামক নিকৃষ্ট অসুর। অথর্ববেদে শূদ্র ও আর্য শব্দ একত্র ব্যবহৃত আছে— "উত শূদ্র উত আর্যে"[১২]। শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতাতেও আমরা পাইতেছি "শূদ্রার্যৌ"[১৩] অর্থাৎ শূদ্র এবং আর্য। ঋগ্বেদে আমরা শূদ্রবর্ণকে দাস, দস্যু বা অসুররূপেই পাইতেছি। "শূদ্র বলিলে প্রধানতঃ দস্যু বা দাস জাতিকে বুঝাইত[১৪]।" ঋগ্বেদ হইতে আমরা আরও পাইতেছি যে এই দাস, দস্যু বা অসুর জাতিরা যজ্ঞহীন, শ্রদ্ধাহীন, হিংস্র ও অমানুষ ছিলেন। "বিশ্বস্মাৎ সীমধমানিন্দ্র দস্যূন বিশোদাসীরকৃনোর প্রশস্তাঃ[১৫]।" অর্থাৎ—হে ইন্দ্র! এই দস্যুদিগকে সমস্ত (সদ্‌গুণ) হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছ। "অকর্মাদস্যুরভি নো অমন্তুরন্য ব্রতো অমানুষা। ত্বং তস্যা মিত্রহন্ বধ দাসস্য দম্ভয়"[১৬] ॥ অর্থাৎ:—আমাদিগের চতুর্দিকে দস্যু আছে, তাহারা যাগ যজ্ঞাদি করে না, তাহারা অমন্ত্র বা মন্ত্রহীন, তাহারা অন্যব্রত, তাহারা অমানুষ। হে অমিত্র হন্তা, দাসদিগকে বধ কর। সেই দাসকে হিংসাকর, "নি অক্রতূন্ গ্রথিন মৃধ্র বাচঃ পনীং রশ্রদ্ধাং অবৃধাং অযজ্ঞান। প্রপতান দস্যূ রগ্নির্বিবায় পূর্বশ্চকারা পরাং অযজ্যূন[১৭] অর্থাৎ:—যজ্ঞহীন, জল্পক, হিংসিত বাক্, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধিশূন্য পনি নামক যজ্ঞরহিত দস্যুগণকে দূর করুন। অগ্নিপ্রধান হইয়া যাহারা যজ্ঞ করে না, তাহাদিগকে হেয় করুন। ছান্দোগ্যোপনিষদেও আমরা পাই যে "বিরোচন অসুর," সুন্দর অলঙ্কার ও বসনে পরিবৃত হওয়াকেই অমৃত, অভয়, ব্রহ্মভাব বা আত্মা এইরূপ দেহাত্মভাব প্রচার করেন। দেহাত্মবাদী, দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, যজ্ঞহীন, আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিই যে বৈদিক ঐ ঔপনিষদিক

(৭) ১১।১৭।১০-১১ ১।৫১।৮; ১।১০৩।৩; ১।১১৭।২১; ১।২৩০।৮; ৩।৩৪।৯ ইত্যাদি। (৯) ৬।২২।১০; ৫।২৮।৪; ১০।২২।৭-৮ ইত্যাদি। (১০) ৩।৩৪।৯, (১১) ১, (১২) ঐ, ২।১ ভাষ্য। ,(১৩) ১৯।৭।৮।১; ১৯।৬২।৩, (১৪) ১৪।১০; (১৫) বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ। (১৬) ৫।২৮।৪ (১৭) ১০।২২।৭।৮, (১৮) ৭।৬।৩।

যুগে দস্যু, অসুর, দাস বা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাহা আমরা এই সমস্ত হইতে জানিতে পাই। এই বৈদিক ও ঔপনিষদিক মানদণ্ডে বর্তমানের তথাকথিত ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণেরা যাঁহারা দেহাত্মবাদী, দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, যজ্ঞহীন, আত্মজ্ঞানহীন হইয়া বিরোচন অসুরের ন্যায় সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া এই দেহকেই অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম বা আত্মা বলিয়া কার্য্যতঃ প্রচার করেন, তাঁহারাও কি দাস দস্যু, অসুর বা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন নাই? এই সমস্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে আর্য ও অসুর, দাস বা শূদ্র বলিয়া দুইটী প্রাচীন বর্ণ বা জাতি পরস্পর পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরের বিভিন্ন মতবাদের প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেন। এই আত্মবাদীরাই ছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদির মূল ব্রাহ্মণ বা আর্য বর্ণ; আর অনাত্মবাদীরাই বা দেহাত্মবাদীরাই ছিলেন অনার্যাদির মূল শূদ্রবর্ণ বা অসুরবর্ণ। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আমরা দুই প্রকার "প্রজাপত্য" বা প্রজা সৃষ্টি পাই। "দ্বয়া বৈ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চ সুরাশ্চ। অর্থাৎ—দ্বিবিধই প্রাজাপত্য, দেব ও অসুর। আমাদের গীতাও ঐ কথা বলিয়াছেন, "দ্বৌ ভূত সর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ"[২০]। অর্থাৎ এই সংসারে দুই প্রকার ভূতসর্গ বা মনুষ্যগণের সৃষ্টি দুই প্রকার—দেব ও অসুর। শঙ্করাচার্যদেবও তাঁহার ভাষ্যে উপরোক্ত শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহাই সমর্থন করিয়াছেন। জগতের আদিম যুগে ভারতে এইরূপ দেব বা আর্য এবং অসুর, দস্যু বা শূদ্ররূপ দুই প্রকার মনুষ্য ভেদই আমরা ঋগ্বেদ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে পাই। এই দুই প্রকার মনুষ্যজাতি বা বর্ণ লইয়াই পরে চারি বর্ণ বা পাঁচবর্ণ বা বহুবর্ণ হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধদেবের সময়েও আমরা স্বয়ং বুদ্ধদেবের সাক্ষ্য পাইতেছি, ব্রাহ্মণ অশ্বলায়ন কর্তৃক সমর্থিত হইয়া, যে 'যবন কম্বোজ' (নেপাল) ও অন্যান্য পশ্চিম জনপদ অঞ্চলে তখনও আর্য ও দাস নামক দুইটী বর্ণ মাত্র প্রচলিত ছিল।[২১]

এই সমস্ত প্রাচীনতম সাক্ষ্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে ঐ দ্বৈতবর্ণবাদ বা বর্ণযুগল প্রধানতঃ গুণ, কর্ম, চরিত্র, ধর্ম প্রভৃতির তারতম্য অনুসারেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, পরে তাহাতে বংশানুক্রমিক, গোষ্ঠীগত বা পৈতৃক তারতম্য স্থান পাইলেও তাহা প্রবল বলিয়া গণ্য হয় নাই। তাহা আধ্যাত্মিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভাবধারা লইয়া যতখানি গঠিত ও নির্দিষ্ট হইয়াছিল, প্রাণীবিদ্যার দৈহিক ভাবধারা লইয়া ততখানি গঠিত বা নির্দিষ্ট হয় নাই। জাতি শাখার মূলে প্রাণীবিদ্যার দৈহিক ভাবাধারা অনেকখানি প্রবল থাকিলেও আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, 'মন' বা 'চিত্ত' নামক আধ্যাত্মিক 'আমি'ই জীবদেহ ধারণের মূল প্রেরণা, উৎসমুখ। মুণ্ডকোপনিষদের[২২] "মনোময় প্রাণ শরীরনেতা"ই এই স্থূল দেহ

(১৯) ৮।৮।৩-৪ (২০) ৩।৩।১ (২১) মজ্ঝিম নিকায় ২।১৪৯ পৃঃ। (২২) ১৬।৬

ধারণ করিয়া থাকেন, যেমন বৃহদারণ্যকোপনিষদ[২৩] চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিমিত্ত কারণ স্বর্ণকার উপাদান কারণ স্বর্ণ হইতে স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। প্রাণীবিদ্যার জন্মগত দৈহিক ধারাকে নিয়মিত, সংক্রামিত ও পরিবর্তিত করিয়া আসিতেছে যে শক্তি, তাহা সম্পূর্ণ মানসিক বা আধ্যাত্মিক। মন ও দেহের এই অধ্যাত্ম দ্বন্দ্বই কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে দ্বৈতবর্ণ সংগ্রামের ঐ সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জাতিগত ব্যবহারে।

পূর্বে বলিয়াছি যে জগৎজন্মের প্রথম প্রভাতে সত্যযুগে একটীমাত্র বর্ণ ছিল; তাহা ব্রাহ্মণ বা দেববর্ণ। বর্তমান প্রাণীবিত্বাবাদীদের (Biologists) মতে জলজ উদ্ভিদ, জলজপ্রাণী, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, বানর, বানর-মনুষ্য (Ape man), বর্বর আদিম মনুষ্য (Primitive man) এবং সর্বশেষে আধুনিক সভ্য মনুষ্য ক্রম বিবর্তনবাদে জন্মলাভ করিয়াছে[২৪]। আমাদের আর্যশাস্ত্র, আর্যজন্মান্তরবাদ ও আর্য দর্শন-বিজ্ঞান উহা আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। এ স্থান ও প্রসঙ্গ তাহার আলোচনার জন্য নহে। আমাদের প্রাচীনতম বেদ উপনিষদাদি এক বাক্যে অনেক স্থলেই প্রথম এক অদ্বৈত বর্ণ হইতেই যে বর্ণভেদের উৎপত্তি তাহা বলিয়াছেন। দেহের বিচার ও পার্থক্য লইয়া যে জাতি বা জন্মের কথা প্রগলভ হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে দেহসর্বস্ব দেহাত্মবাদ। জন্ম, মৃত্যু, শোক, তাপময় এই পরিণামশীল ভঙ্গুর দেহকে (যাহা দাহ করিলেই নষ্ট হয়) আর্য সাধকেরা কোন স্থানেই অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলেন নাই। অনাদি কাল হইতে যে জ্ঞাতা চিত্তের সাহায্যে এই স্থূল দেহধারণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহার তত্ত্ববিচার করিয়া বর্ণবাদের বা জাতিবাদের বিচার বিশ্লেষণ না করিলে তাহা একান্তই ভ্রান্ত হইবে। "মানসী সৃষ্টি" বা ঔপপাদিক জন্ম (abiogenesis) সম্ভব কিনা ইহা বর্তমান প্রাণীবিত্বাবিদের কাছে এখনও অজ্ঞাত রহস্য রহিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরবাদী দর্শন যদি জগদীশ্বরের এই জগৎ রচনাকে "মৈথুন সম্ভব" না বলিয়া "মানসী সৃষ্টি" বা রচনা জাত বলেন, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সঙ্কল্পসিদ্ধ পুরুষ ভূত-প্রকৃতি-বশীত্ববশতঃ যে জগৎ রচনা করিলেন তাহাতে প্রথম আবির্ভূত হইলেন সূক্ষ্মদেহী মহাত্মারা—যাঁহাদের মনঃপ্রধান জীবন যাত্রা নীহারিকা পুঞ্জবৎ অত্যুষ্ণ পৃথিবীতেও সম্ভব হইয়াছিল। এই প্রথম জাত ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিগণেরা যে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট থাকিলেও, প্রাণীবিদ্যার একটী বড় প্রমাণ এই যে মহাপুরুষের বা অতি মানবের নমুনা (Superman type) ঐ প্রাচীনতম যুগেও ঋষিগণ, বুদ্ধগণ প্রভৃতি বহু মহামানবে প্রস্ফুটিত যাহা হইয়াছিল, তাহা আদৌ বানর মনুষ্য "(Apeman)" বা আদিম বর্বর মনুষ্য জাতীয় (Barbarian Primitive man)

(২৩) ২।২।৭ (২৪) 'The outline of History by H. G. Wells, 5th Revision pp, 20—70 দ্রষ্টব্য এবং Universe Around us by Sir James Jeans, 3rd ed, 1933, Introduction p. 13 দ্রষ্টব্য।

মনুষ্য নহে। বেদ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদের বহু দ্রষ্টা ঋষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি সেই প্রাচীনতম যুগেও আবির্ভূত হইয়া পূর্বজন্ম রহস্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য যোগাদির সেই প্রাচীনতম বিদ্যার উপর বা বৈদিক ঔপনিষদিক ব্রহ্ম বিদ্যার উপর ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আর কেহই বিশেষ কোনও নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এই ব্রহ্মবিদ্যা ছিল যাঁহাদের সাধনার ধন, প্রাণের প্রাণ, দর্শনের নয়ন, জরা মরণের সকল শূদ্র শোককে জয় করিয়া তাঁহারা ছিলেন আর্য পূজ্য, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তপস্যার অভাবে, পরাবিদ্যার ভাস্বর আভায় যখন গ্লানির মলিনতা আসিয়াছে দেহাত্মবাদে, ভোগ সাধনায় তখনই শোক প্রাপ্ত "তামসা জনাঃ" শূদ্রগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন ব্রাহ্মণ বা আর্য নামক প্রথম বর্ণ হইতে।

সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদে[২৫] পাওয়া যায়, "সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ ব্রহ্ম। সনৈব ব্যভবৎ সবিশম সৃজত…। সনৈব ব্যভবৎ সশৌদ্রং বর্ণমসৃজত…। অর্থাৎ ব্রাহ্মণই এই ক্ষত্রিয়ের যোনি। তিনিও নিজ কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন না; তজ্জন্য তিনি বৈশ্য জাতি সৃষ্টি করিলেন। তিনিও কার্যকরণে সমর্থ হইলেন না; তখন তিনি শূদ্র জাতি সৃষ্টি করিলেন। মহাভারতে "যজ্ঞগীতা" নামক এক প্রাচীন গাথায় আছে, "অধরো বিতানঃ সংসৃষ্টো বৈশ্যো ব্রাহ্মণ স্ত্রিষু বর্ণেষু যজ্ঞসৃষ্টঃ॥ তস্মাদ্বর্ণা ঋজবো জ্ঞাতি বর্ণাঃ সংসৃজ্যন্তে তস্য বিকার এব। একং সাম যজুরেক মৃগেকা বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ[২৬]॥ অর্থাৎ :—বৈবাহিকাদি সম্বন্ধ দ্বারা নীচে অগ্নিবিস্তার দ্বারা বৈশ্য সংসৃষ্ট, ব্রাহ্মণ তিনবর্ণে যজ্ঞ সৃষ্টি করেন। এইজন্য সর্ববর্ণ সাধু; ব্রাহ্মণের বিকার হইতেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জ্ঞাতিবর্ণ সকল সৃষ্ট হয়। যেমন এক সাম, এক যজু, এবং এক ঋগ্বেদ তদ্রূপ এক বিপ্র; তত্ত্বনিশ্চয়ে এই এক ব্রাহ্মণ হইতেই সৃষ্টি; টীকাকার নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন "তেন ধর্মতো জন্মতশ্চ সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণ সংসৃষ্ঠা ইতি স্থিতম্[২৭]। অর্থাৎ :—এই হেতু ধর্মতঃ এবং জন্মতঃ সর্ববর্ণই ব্রাহ্মণসৃষ্ট ইহা স্থির। মহাভারত ও পদ্মপুরাণ আরও বলিতেছেন, "নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বির্ণতাং গতম্॥ কামভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্মাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ। ত্যক্ত স্বধর্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥ গোভ্যবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। স্বধর্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥ হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ। ইত্যেতেঃ কর্মভির্ব্যস্তা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্মো যজ্ঞ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥ অর্থাৎ বর্ণ সমূহের বিশেষ বা পার্থক্য নাই। এই জগৎ সমস্তই ব্রাহ্মণময়। ব্রাহ্মণেরা প্রথম সৃষ্ট হইয়া **কর্ম সমূহের** দ্বারা বর্ণতা বা ক্ষত্রিয়াদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী, সাহসপ্রিয়, স্বধর্মত্যাগী, ও রক্তাঙ্গ তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব

(২৫) ১।৪।১১-১৩। (২৬) শান্তিপর্ব, ৬০।৪৬-৪৭।

প্রাপ্ত হন। গবাদি পশুপালনে বৃত্তি স্থাপন করিয়া কৃষিজীবি হইয়া পীত যে দ্বিজগণ স্বধর্মে অনুষ্ঠিত রহিলেন না তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হিংসা মিথ্যা-প্রিয়, লুব্ধ, সর্বকামোপজীবী, শৌচপরিভ্রষ্ঠ কৃষ্ণ দ্বিজেরা শূদ্রতা প্রাপ্ত হন। এইরূপে কর্ম সমূহের দ্বারা পৃথক কৃত ব্রাহ্মণগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হন। তাহাদের নিত্য ধর্ম ও যজ্ঞক্রিয়া প্রতিসিদ্ধ বা নিষিদ্ধ নহে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'এ আমরা পাই যে, অনেক শূদ্র জন্মতঃ আর্যভাব নষ্ট করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইত এবং দাসপণ প্রত্যর্পণ করিলে শূদ্রও "আর্যত্ব" লাভ করিতে পারিতেন।

এই সমস্ত হইতে সুস্পষ্ট হইতেছে যে, এক আদিম অদ্বৈতবর্ণ বা জাতি হইতে ক্রমশঃ কাল ও গুণ কর্মবশে আর্য ও অনার্য নামক দ্বৈতবর্ণ বা জাতি রচিত হয়। প্রথমোক্ত ঐ আর্যবর্ণ ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া শূদ্র বা অনার্যদিগের সহিত নানাভাবে সংমিশ্রণে জন্মমিলনে বহু শাখায় এবং বহু বর্ণ সঙ্করবিভাগে পরিণত হয় এবং শূদ্র বা অনার্যগণও তাঁহাদের মূল ব্রাহ্মণ গোত্র হইতে বহুমুখী হইয়া বহুশাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন, নানারূপ অনুলোম-প্রতিলোম সংমিশ্রণে ও বৈবাহিক আদান প্রদানে।

ব্রাহ্মণ বা আর্যদিগের ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মভিত্তি হইতে অনার্য বা শূদ্রদিগের দেহাত্মবাদ বা দেহশীর্ষের যে পুষ্পিতাবস্থা তাহাই হইল এই বর্ণ বা জাতির নিম্ন গমনী বা পত্রশীর্ষমুখী শক্তি। ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানের যাঁহারা ছিলেন ধর্ম পিতা, সেই ব্রাহ্মণেরা তাহাকেই করিয়াছেন বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত ; অথচ বর্ণ আভিজাত্যের কায়েমী বর্ণদম্ভের রূপ লইয়া তাঁহারাই সমাজে বুক ফুলাইয়া গর্বভঙ্গীতে চলিবেন ব্রহ্মবাদের পাণ্ডার মতো। নিধিবাদ, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, যৌন প্রবৃত্তি, কামবাদ এবং বিরোচন অসুরের দেহবাদ সমগ্র আর্য এবং ব্রাহ্মণদিগকেও অন্য ধর্মাবলম্বী করিয়াছে। তাঁহারা অসুরের এবং শূদ্রের প্রধান চেলা সাজিয়াছেন এবং দেহাতীত আত্মার এই মাংসল দেহধারণটাকে হারাইবার গুপ্ত ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা শোকপ্রাপ্ত হইতেছেন। কেবল হিন্দু সমাজের নহে, সমগ্র জগতের সমস্ত সমাজ সমূহের বিকৃত মন, ক্ষিপ্তবুদ্ধি উন্মাদগণ আমাদিগকে অসুর মন্ত্রে এবং অসুর তন্ত্রে বিশ্বাসী হইতে বলিতেছেন। আর্যভূমি আর্যবর্ত হইতে ব্রহ্মমন্ত্র ও ব্রহ্মতন্ত্র সিংহাসন চ্যুত হইয়া নির্বাসিত হইয়াছে। ভারত এখন অনার্যবর্ত, অনার্য অসুরের ভূমি। অসুরগ্রস্তেরা এখন আর্যজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে না পারে, কিন্তু বর্ণ বা জাতির ব্রহ্মাভিমুখী পুষ্পযাত্রা বা পুনর্যাত্রা অপরিহার্য। "বীজ বৃক্ষ ন্যায়ের" অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মেই সামাজিক পুষ্পের দেহশীর্ষ হইতে ব্রহ্মমূলের বীজনিকেতনে পুনর্গমন অবশ্যম্ভাবী। বীজটী অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্পবিকাশের মাধুরী লইয়া বিকশিত হইয়া উঠে ; আবার সেই বিকাশের মধ্য দিয়াই সে তাহার সমগোত্রীয় ফলশালী বীজ জীবনে পরিণত হয়।

নিম্ন বিবর্তনের পরেই উর্ধ বিবর্তন বা বৈপ্লবিক আবর্তন আসে তাহার চক্র পরিবর্তন করিয়া। অবমানবত্বের ক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া আসে মহামানবত্ব। মারগণের অমানুষ

অসুরবাদকে জয় করিয়া পুনরায় জাগিয়া উঠিবে ঋষিগণের ও বুদ্ধগণের অলৌকিক জ্ঞানের আলো। জাতি বা মতবাদ বর্ণ বা অবর্ণনির্বিশেষে নিখিল মানবগণকে পূর্ণ সাম্যের মর্যাদাদানের নব সমাজতন্ত্রবাদে সমস্ত অনার্য শূদ্রগণকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা রচনা করিবে। তাহার বিজয় অভিযান, পূর্ণ অভিষেকে। বহু প্রকার বর্ণ বিভাগ, জাতি সংমিশ্রণ এবং দ্বৈতবর্ণ-বাদকে অদ্বৈতবর্ণবাদের একত্রে সমগ্রথিত করিবে যে ত্রিমার্গগা গঙ্গা, সাগর সঙ্গমের বিশাল আলিঙ্গনে, তাহা দিগ্‌দিগন্তে সাগর গর্জনেই গাহিবে "সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ" সর্ব বর্ণই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজাত, ব্রহ্মজন। ব্রহ্মবাদ প্রবন্ধের বিরোধী যে অসুরবাদ বা শূদ্রবাদ সে পিতৃ পরিচয়ে পুনরায় মিলিত হইবে নিখিল মানবের সমবায় সাধনার ব্রহ্মগোত্রে, ব্রহ্মদায়াদে।

ঋষিগণ ও বুদ্ধগণ প্রদর্শিত ব্রহ্মবিদ্যার নব ব্রহ্মতন্ত্রে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, আর্য অনার্য, হিন্দু অহিন্দু সকলের জন্যই সামাজিক, রাষ্ট্রিক ধর্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণ সাম্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, আমরা সেই মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিব। "প্রিয়ং সর্বস্যপশ্যতঃ উত শূদ্র উতার্যে। হে ঈশ, শূদ্রই হউক বা আর্যই ইউক, সকলেরই প্রিয় তুমি দর্শন কর। বৈদিক ঋষি নারী ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও গাহিব "যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃনোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্"। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকেই উগ্র করি, ঋষি করি, সুমেধা করি। ব্রহ্ম মহামিলনের ও ব্রহ্মসমবায়ে এই অধ্যাত্ম সমাজতন্ত্র বা ব্রাহ্মণোচিত ধর্মপদে নিয়োগ আজিও শ্রীদুর্গা পূজা উপলক্ষে 'দেবী সুক্তের' ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আমাদের কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। আজ উহা জীবন্ত, প্রাণবাণ হউক। ওই যে বৈদিক ঋষি নিখিল বিশ্বকে আর্য করিবার জন্য বলিতেছেন নিখিল মানবকে ডাকিয়া, "ইন্দ্রং বর্দ্ধন্তো অপতুরঃ কৃন্বন্তো বিশ্বমার্যম্" ৩১ ইন্দ্র বা শ্রীভগবানের মহিমা বাড়াও এবং বিশ্বের সবাইকে আর্য কর।

গণেশ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গণেশ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে সুয়ন্-চাওএর প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল, কারণ ৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে লোকায়ত নামক ব্রাহ্মণকে লো-য়াঙ-এ আনিবার জন্য কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। লোকায়ত এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে চীনদেশে আনাইয়া বৌদ্ধ সংস্কৃত যোগশাস্ত্র চীনা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া চিঙ-আই-সু-র সন্ন্যাসিগণের বোধের অনুকূল করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু চীনা ভাষা না জানায় বা উহা আয়ত্তে আনা সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি তাহাতে অসমর্থ হন। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে আনীত সংস্কৃত গ্রন্থাদি চিঙ-আই-সু-র মন্দিরে রাখিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যখন চীনে আসেন তখন তাঁহার সহিত সুয়ন্-চাওকে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায় নাই, কারণ কাশ্মীরের পথেই ভারতে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

সপ্তম শতকে চীনে গণেশ-যোগ ও গণেশের তান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও একথা স্থির করা যাইতে পারে যে, সপ্তম শতকের শেষেই চীনে গণেশ-সংস্কৃতির প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল। চীনা গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চীনদেশে গণেশ যুগ্মমূর্তিতে পূজিত হইতেন। যদি ধরা যায়, সুয়ন্-চাও-কর্তৃক চীনে কুয়ন্-সি-তি'এনের পূজা প্রবর্তিত হয় নাই, তাহা হইলে শুভাকরসিংহ নামক ভারতীয় পণ্ডিতকে ইহার প্রবর্তক অথবা চীনা ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থাদির প্রথম অনুবাদকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুভাকর (৬৩৭—৭৩৫ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন উড়িষ্যার জনৈক নৃপতি। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরে তিনি স্বীয় ভ্রাতার হস্তে রাজ্যভার দিয়া প্রব্রজিত জীবন গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মগুপ্তের নিকট যোগ ও তন্ত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ধর্মগুপ্তেরই নির্দেশানুসারে চীনে গিয়া যোগাচার মতের প্রচার করেন। পরিব্রাজক জীবনের কোন বিবরণ শুভাকর লিখিয়া যান নাই। তবে অষ্টম শতকের প্রথম দিকে যে তিনি চীনে ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত পুথিপত্রাদি হইতে জানা যায় যে, ৭১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ হইতে চীনের পথে যাত্রা করেন। সঙ্গে তিনি 'মহাবৈরোচনসূত্র' ও বহু তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ স্থলপথে না গিয়া তিনি জলপথে ভারতের পূর্ব উপকূলস্থ পালুর হইতে যাত্রা শুরু করেন। ৭১৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি চীনে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি তা'ঙ সম্রাট্‌দিগের রাজধানী চ'ঙ-আন্-এ আসেন।

এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ তা'ঙ সম্রাট্ সুয়ন্-সুঙ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। এই সময় শুভাকর আশী বৎসরের বৃদ্ধ। কিন্তু এই বৃদ্ধাবস্থাতেই তাঁহার যেরূপ কর্মশক্তি ছিল তাহা অতুলনীয়। এই সময়েই তিনি চীনা ভাষায় 'মহাবৈরোচনসূত্রে'র অনুবাদ করিয়াছিলেন। শেষ যে অনুবাদগ্রন্থ তিনি রচনা করেন তাহা তাঁহার জীবনের শেষ সময়ে লিখিত হইয়াছিল। ৯৮ বৎসরে ৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। শেষ জীবনে যে অনুবাদগ্রন্থটী রচিত হয় তাহা কুয়ন্-সি-তি'এন্-পূজার নিদর্শন-গ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই তন্ত্রগ্রন্থটী শুভাকর ভারত হইতে আনিয়াছিলেন, বা চ'ঙ-আন্-এর বিহারগুলির একটীতে উহা রক্ষিত ছিল, বা লো-য়াঙ-এর চিঙ-আই-সু-র মন্দিরে সুয়ন্-চাও-কর্তৃক পরিত্যক্ত গ্রন্থনিচয়ের উহা অন্যতম—কোনটীরই পক্ষে বিশেষভাবে কোন প্রামাণ্য উপস্থিত করা যায় না। তবে এত গ্রন্থ থাকিতে শুভাকর তাঁহার চীনে অবস্থানকালীন অল্প জীবনে অন্য কোন গ্রন্থের অনুবাদ না করিয়া এই গ্রন্থটীরই অনুবাদ করিলেন কেন? এক্ষেত্রে উহা রাজ-অনুজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করা স্বাভাবিক। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শুভাকরের পূর্বেই চীনদেশে গণেশ-সংস্কৃতির প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল।

অষ্টম শতকের শেষভাগে যে কুয়ন্-সি-তি'এন্-পূজার প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণও আমরা পাইয়াছি। চীনা সন্ন্যাসী চুঙ-সে-লিখিত একটী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রায় ৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে হন্-কুয়াঙ নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু যুগ্ম-গণেশের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার পূজাপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদির ফল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত চীনা যোগী হুই-কুওর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বিষয় জানা যায়। তিনি সিংহল-দেশীয় পণ্ডিত অমোঘবজ্রের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে যোগের দুই বিভাগের মণ্ডলে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই মণ্ডলের মধ্যে গণেশের স্থান আছে। চীনদেশে যে সমুদয় বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তিনি সেগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং চীনদেশে প্রচলিত কুয়ন্-সি-তি'এন্-এর পূজাপদ্ধতিও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারই শিষ্য কোবো দইসি জাপানে কুয়ন্-সি-তি'এন্-পূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইনি চীনদেশ হইতে জাপানে গিয়া তৎপ্রবর্তিত সিঙ্গন-সম্প্রদায়ের গূহ্য ধর্ম-মতে এই কুয়ন্-সি-তি'এন্-পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন।

চীনদেশে যুগ্ম-গণেশের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে কি না জানা যায় না। তবে একাদশ শতকেও যে যুগ্ম-গণেশপূজার প্রচলন ছিল চীনা ও জাপানী গ্রন্থসমূহ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট্ চেন্ সুন্ 'ত্রিপিটকে' কুয়ন্-সি-তি'এন্-পূজা-সম্বন্ধীয় চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সূত্রের' পুস্তকের সংযোজন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করিয়াছিলেন; অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কুয়ন্-সি-তি'এন্-এর মূর্তি প্রস্তুতও নিষিদ্ধ হয়। চীনে যুগ্ম-গণেশের কোনও মূর্তি না পাওয়াই ইহার মুখ্য কারণ।

কুঙ-সিএন্-মন্দিরে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের বিনায়কমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পরে অষ্টম শতকের শেষভাগের অথবা নবম শতকের প্রারম্ভকালের যুগ্মমণ্ডলের কতকগুলি নক্সাচিত্র পাওয়া যায়।

অষ্টম শতকে অমোঘবজ্র চীনদেশে বৈরোচনের গুহ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বজ্রধাতু ও গর্ভধাতু নামক যুগ্ম-মণ্ডলের ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই যুগ্ম-মণ্ডলের দুইটী পরম বাস্তব দিক্ আছে—একটী বাহ্য দিক্ ও অপরটী গুহ্য দিক্। নক্সাচিত্রগুলির বাহ্য ব্যাখ্যা-অনুযায়ী গর্ভধাতু এই বাস্তব ও পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতীক এবং বজ্রধাতু আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক জগতের প্রতীক; যদিও তাঁহারা বাহ্যতঃ বিভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এক এবং অভিন্ন। তাঁহারাই ধর্মধাতু অথবা অখিল বিশ্বের প্রতীক।

গুহ্যতত্ত্বের দিক্ দিয়া ব্যাখা করিলে বজ্রধাতু-নক্সার বৈরোচনই অখিল বিশ্বের আত্মা এবং গর্ভধাতুর কেন্দ্রে অঙ্কিত বজ্রসত্ত্ব পরিদৃশ্যমান জগতে তাঁহারই প্রকাশ। এই প্রকাশেই অখিল বিশ্বের পরম সত্তা। নিগূঢ় নক্সাচিত্র দুইটী ব্রহ্মাণ্ডের এই দুইটী দিকের প্রতীক। ইহাদের মধ্যে গুহ্যতত্ত্বটী শিক্ষার 'অভিষেক' হইবার পর জানিবার অধিকার শিষ্যের হইত।

চীনদেশে গর্ভধাতুর মণ্ডল সম্ভবতঃ শুভাকরসিংহ প্রবর্তিত করেন, অন্ততঃ মণ্ডলের প্রাচীনতম নক্সাটীর জন্য কৃতিত্ব তাঁহারই গর্ভধাতুর মণ্ডলের প্রাচীনতম নক্সায় দেবতাদের চিত্র অঙ্কিত নাই—তাঁহাদের নামগুলি মাত্র লেখা আছে। শুভাকর কোন্ বৌদ্ধগ্রন্থের সাহায্যে এই নক্সা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে আট-পাপড়িযুক্ত পদ্মফুলের কেন্দ্রে বৈরোচনের (গুহ্যতত্ত্ববাদীদিগের মতে বজ্রসত্ত্ব) নাম লেখা আছে। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, গুহ্য-পূজারহস্য-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতেই ভাব সংগ্রহ করিয়া ঐ নক্সার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

শুভাকরসিংহের জীবিতাবস্থায়ই নক্সাটীর বহু পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্রমে প্রাথমিক আকারের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং দেবতাদিগের নামের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যদিও 'মণ্ডলে'র প্রত্যেক পরিবর্তিত নক্সাতেই 'ঈশান' (শিব) নামটী দেখা যায়, কিন্তু কোনটীতেই 'বিনায়ক' নামটীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। জাপানের গর্ভধাতুর প্রাচীনতম নক্সাগুলির বহিরাবরণের 'ঈশান' হইতে তৃতীয় স্থানে 'বিনায়কে'র মূর্তি রহিয়াছে। প্রবাদ, এইগুলির মধ্যে একটী মূল নক্সা এবং আর একটী নক্সা কোবো দইসি-কর্তৃক চীনদেশ হইতে আনীত মূল নক্সার অনুলিপি।

তোগনুর 'মন্দর নো কেন্‌ক্যু' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোরিয়াদেশীয় যাজক চিসো দইজি অষ্টম শতকের শেষভাগে শুভাকরের নক্সার অনুলিপি প্রস্তুত করেন। পরে চিসো দইজি হুই-কুওর গুরু হইয়া শুভাকর যে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন। চিসো যদি এই অনুলিপিটী হুই-কুওকে দেখাইয়া থাকেন তাহা হইলে হুই-কুও নিশ্চয়ই তাহাতে বিনায়কের মূর্তি দেখেন নাই। এক্ষেত্রে গর্ভধাতু-মণ্ডলে কিভাবে বিনায়কের মূর্তি সন্নিবেশিত হইল সে রহস্য উদ্ঘাটন করা এক্ষেত্রে অসম্ভব।

বজ্রধাতু-মণ্ডলটী বজ্রশেখর-যোগ হইতে উদ্ভাবন করিয়া ভারতীয় সাধক নাগবোধি অঙ্কন করিয়াছিলেন। ৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার শিষ্য অমোঘবজ্রের চীনদেশে প্রত্যাগমনকালে তিনি তাঁহাকে ইহার অনুলিপি প্রদান করেন। নক্সাটীতে প্রত্যেক সারিতে তিনটী করিয়া তিন সারিতে নয়টী দেবতার চিত্র আছে। কেন্দ্র-পরিষদে পাঁচটী বৃত্ত, প্রত্যেক বৃত্তে পাঁচটী করিয়া দেবতার চিত্র অঙ্কিত। সমস্ত পরিষৎটীর প্রচ্ছদপটে আরও অন্যান্য দেবতার চিত্র দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে গণেশের পাঁচটী বিভিন্ন আকারের চিত্র আছে।

তোগন্থর মতে বজ্রধাতুর নক্সাটী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় নাই। ইহার উদ্ভাবক অমোঘবজ্র। তিনি নাগবোধির নিকট মণ্ডল-অঙ্কন শিক্ষা করিয়া চীনদেশে উহা প্রস্তুত করেন। যাহাই হউক, একথা ঠিক যে, গর্ভধাতু ও বজ্রধাতুর মণ্ডল সঠিক রূপ গ্রহণ করে চীনদেশে এবং অমোঘবজ্রই গর্ভধাতুর মধ্যে বিনায়কের মূর্তি সন্নিবেশিত করেন। ইহার বহিরাবরণে ভারতীয় প্রভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিনায়ক ব্যতীত ইশান, ইন্দ্র, যম, বরুণ, বৈশ্রবণ, গ্রহপুঞ্জ এবং রাক্ষসাদিও ইহাতে দেখা যায়।

বজ্রধাতুতে গণেশের যে পাঁচটী মূর্তি আছে, তাহাদের মধ্যে চারিটী আছে চারি পার্শ্বে এবং কেন্দ্রে বিনায়কের মূর্তি। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অমোঘবজ্র বলিয়াছেন—চারি পার্শ্বের চারিটী গণেশ দিগ্‌চতুষ্টয়ের রক্ষক এবং কেন্দ্রস্থ বিনায়ক বিপদ্‌বারণ। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অমোঘবজ্র এই ভাবটী ভারতবর্ষ হইতে আনিয়াছিলেন। বিনায়কের মূর্তিটী ভারতীয় মূর্তির অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ভারতীয় গণেশ ভগ্ন গজদন্ত ধারণ করিয়া থাকেন এবং বিনায়ক মূর্তিতে তৎপরিবর্তে একটী মূলা ধারণ করেন। উত্তর দিকের রক্ষক-হিসাবে যে গণেশ থাকেন, বিনায়কের স্থান ঠিক তাঁহারই নীচে। গর্ভধাতুর বিনায়কও বহিরাবরণের উত্তর দিকে অবস্থিত এবং তাঁহার স্থান ইশানের অনুচরবৃন্দের মধ্যে। গর্ভধাতুতে বিনায়ক ব্যতীত আর কোনও গণেশমূর্তি নাই।

এক্ষেত্রে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শুভাকর-পরিকল্পিত গর্ভধাতুর নক্সার সাহায্যেই অমোঘবজ্র এবং তাঁহার শিষ্য হুই-কুও বজ্রধাতুর মণ্ডলটী অঙ্কিত করেন। পরে তাঁহারা মণ্ডল দুইটীর সংযোজনকালে বজ্রধাতুর অনুকরণে গর্ভধাতুতে দেবতাদিগের মূর্তিগুলি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। শুভাকরের নক্সায় কোথাও গণেশের নামোল্লেখ ছিল না। অমোঘবজ্র এবং হুই-কুওই বিনায়কের চিত্রটী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। দৈবশক্তি ও মন্ত্রের প্রভাবের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এবং সেই জন্য বিপদ্‌বারণ গণেশের চিত্রটী উভয় নক্সাচিত্রেই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ন্যায়প্রবেশ

পূর্বানুবৃত্ত

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

উদ্‌ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য, ঐ প্রকার দ্রব্যের উদ্ভূত রূপ, পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ—এই দশবিধ গুণ এবং ক্রিয়া, উক্ত দ্রব্যগত ও ঐ সকল গুণ এবং ক্রিয়াগত জাতিসমূহ এবং সমবায়[১] এই সকল ভাবপদার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। অতএব ইহারা চক্ষুর বিষয়।

উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ সংযোগ, দ্রব্যগত জাতি, পূর্বোক্ত গুণসমূহ এবং ক্রিয়ার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায়, ঐ সমস্ত গুণ ও ক্রিয়াগত জাতি-সমূহের সহিত উহার সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়[২]। সমবায়ের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ বিশেষণতা[৩]।

বিষয়—শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন অনিত্য সকল তৈজস দ্রব্যই বিষয়তেজঃ।

ভৌমতেজঃ[৪] —যে তেজঃ ভূমি অর্থাৎ কাষ্ঠপ্রভৃতি পার্থিবদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তাহা ভৌমতেজঃ। যথা—অগ্নি।

দিব্যতেজঃ—যে তেজঃ জলবিশেষকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি লাভ করে তাহা দিব্যতেজঃ। যথা—বিদ্যুৎ[৫], বাড়বানল ইত্যাদি।

১ বৈশেষিক মতে সমবায়ের কোনরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না।

২ টর্চ-আলোকের ন্যায় তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া দৃশ্য ঘটাদি বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, তজ্জন্য ঘটাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব দ্রষ্টব্য বস্তু দ্রব্য হইলে উহাতে চক্ষুর সম্বন্ধ সংযোগ। সংযুক্ত-সমবায় ও সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ের সঙ্গতি পূর্ববৎ বুঝিতে হইবে। জৈন দার্শনিকেরা নেত্রগোলককেই চক্ষুরিন্দ্রিয় বলেন। রশ্মি না থাকায় উক্ত প্রকার চক্ষুর সহিত দূরস্থ বিষয়ের সংযোগ হইতে পারে না। এজন্য উঁহারা 'চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রাপ্যকারী' এই মতবাদ পোষণ করিতে পারেন না।

৩ বিশেষণতা-সম্বন্ধ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব এবং স্বরূপ এই দুই নামেও পরিচিত। সমবায়ে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ কেবলমাত্র 'বিশেষণতা' নামে উল্লিখিত হইলেও উহা দৃশ্যদ্রব্য ঘটাদিতে থাকায় প্রকৃত পক্ষে ঐ সম্বন্ধও সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেত-বিশেষণতা ইত্যাদি নামেই স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উহা না করিয়া ষড়্‌বিধ মাত্র সন্নিকর্ষ কেন বলিয়াছেন তাহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রকরণপঞ্জিকা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৪ সপ্তপদার্থী ১১১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫ এইস্থানে 'বিদ্যুৎ' শব্দের অর্থ মেঘস্থিত তেজোবিশেষ। অধুনা গৃহে আলোক এবং পাখা চালাইবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় উহার আশ্রয় ধাতুনির্মিত তার। অতএব উহাকে 'ভৌম' বলাই সঙ্গত। 'দিব্য' শব্দের 'অন্তরীক্ষস্থ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সূর্যমণ্ডলকে এই বিভাগের অন্তর্গত করা যায়। সপ্তপদার্থীমতে উহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা চিন্তনীয়।

উদর্যতেজঃ—যে তেজঃ উদরমধ্যে অবস্থান করিয়া অন্নাদি ভুক্তদ্রব্যের পাক অর্থাৎ রূপপরিবর্তন করিয়া রস, রক্ত ইত্যাদি ক্রমে পরিণতি করে তাহা উদর্যতেজঃ। মতবিশেষে ইহারই নাম পাচক পিত্ত। ইহার ইন্ধন অর্থাৎ দাহ্য পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য।

আকরজতেজঃ—যে তৈজস দ্রব্যের কোনও ইন্ধন নাই, তাহা আকরজতেজঃ। যথা—স্বর্ণাদি[১]। আকর অর্থাৎ খনিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা আকরজ।

বায়ু

বায়ু চতুর্থ দ্রব্য। ইহার একটিমাত্র বিশেষগুণ—স্পর্শ। কেবল ত্বক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বায়ু সূক্ষ্ম, স্থূল নহে।

পূর্বোক্ত তিনটি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সর্বসম্মত কিন্তু বায়ুর প্রত্যক্ষ বিবাদগ্রস্ত। বায়ু প্রত্যক্ষ নহে, উহার স্পর্শ প্রত্যক্ষ। ঐ স্পর্শ গুণ-পদার্থ। এজন্য উহার আশ্রয়রূপে কোনও দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক। এই স্পর্শেরও এমন বৈলক্ষণ্য অনুভবসিদ্ধ যে, পূর্ববর্ণিত দ্রব্যত্রয়ের কোনটিই এই স্পর্শের আশ্রয় হইতে পারে না। সুতরাং নূতন দ্রব্য মানা প্রয়োজন। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়বিশেষ উক্ত প্রকারে বায়ুর অনুমান করিয়া থাকেন। অন্য মতে ত্বক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য দ্রব্যকেই সূক্ষ্ম বলিয়া বর্ণনা করিলে, প্রথম মতানুসারে বায়ুকে সূক্ষ্ম বলা চলে কিন্তু ঐরূপ উক্তি নির্বিবাদ নহে।

১ স্বর্ণাদি অর্থাৎ স্বর্ণ এবং প্লাটিনম্, আইরিডিয়ম্ ও অস্মিয়ম্ প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত বরধাতু আকরজ-তেজঃ। সম্ভবতঃ অতিপ্রাচীনেরা শেষোক্ত তিনটি ধাতু বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং স্বর্ণের সহিত বহু সাদৃশ্য দেখিয়া ঐগুলিকেও আকরজ শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য 'স্বর্ণাদি' এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।

আয়ুর্বেদে স্বর্ণকে পার্থিব দ্রব্যে অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। ঐমতে ঐ প্রকার অন্তর্ভাবের প্রয়োজনও আছে। বস্তুতঃ পীতবর্ণ এবং গুরুত্ব থাকায় স্বর্ণকে পার্থিব বলাই সঙ্গত। কিন্তু বহু পার্থিব দ্রব্য হইতে স্বর্ণের বৈলক্ষণ্যও দেখা যায়। কারণ, অত্যধিক তাপেও উহার তরলাবস্থা নষ্ট হয় না, উহা দ্রবই থাকে। স্বর্ণের অপার্থিবত্বে এই যুক্তি নানা গ্রন্থে দেখা যায়। বিশেষতঃ 'বহ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং' এই শ্রুতিবাক্যও স্বর্ণের তৈজসত্বে প্রবল প্রমাণ। তাই অতিপ্রাচীনেরা বলিয়াছেন—আকরজং স্বর্ণাদি। কিরণাবলী, ন্যায়কন্দলী, ব্যোমবতীবৃত্তি সেতুটীকা উপস্কার এবং সূক্তি প্রভৃতি গ্রন্থের মতে এই স্থানের 'আদি'কথাটি রজত, তাম্র, কাংস্য, ত্রপু (রাঙ্) সীস, লোহা প্রভৃতি ধাতুকেও আকরজ-তৈজস শ্রেণীভুক্ত বলিয়া সূচনা করিতেছে।

কৃষ্ণ বর্ণ ও গুরুত্ব থাকায় এই সকল ধাতুকে পার্থিব বলাই সঙ্গত। তৈজসত্ব সাধনে সমর্থ অধিকতাপ-সহত্ব-স্বরূপ স্বর্ণস্থলীয় যুক্তিও ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না, ইহাদের তৈজসত্বে কোনরূপ শ্রুতিপ্রমাণও পাওয়া যায় না। তথাপি প্রবীণ গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে কেন তৈজস বলিলেন তাহা চিন্তনীয়।

বেগের মৃদুতা ও তীব্রতা অনুসারে বাহ্যবায়ুর বিবিধ বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। শরীরে রোগ উৎপাদনে আভ্যন্তর বায়ুর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে[১]। পিত্ত ও শ্লেষ্মার তুলনায় বায়ুবিকারের সংখ্যাও অধিক[২]।

লক্ষণ। যে-বস্তু রূপশূন্য অথচ স্পর্শবিশিষ্ট তাহা বায়ু। (রূপরহিতস্পর্শবত্ত্বং বায়ুত্বম্)

লক্ষ্য। বিভাগে বায়ুর পরিচয় জানা যাইবে।

সমন্বয়। সুগম। যাহা রূপশূন্য তাহাই বায়ু এইরূপ বলিলে আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যে ও গুণাদি ছয় পদার্থে অতিব্যাপ্তি হয়। স্পর্শবিশিষ্ট বস্তুমাত্রকেই বায়ু বলিলে পৃথিবী, জল এবং তেজঃ এই তিনটি দ্রব্যও বায়ু-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এজন্য লক্ষণে উভয় ভাগেরই প্রয়োজন আছে।

বায়ুতে স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার —এই নয় প্রকার গুণ, ক্রিয়া ; সত্তা, দ্রব্যত্ব, বায়ুত্ব প্রভৃতি জাতি এবং বিশেষ, এই সমস্ত ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়।

বায়ু দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। অনিত্য বায়ু ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। বিষয় বায়ু দ্বিবিধ—আভ্যন্তর ও বাহ্য। আভ্যন্তর বায়ু পঞ্চবিধ—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান।
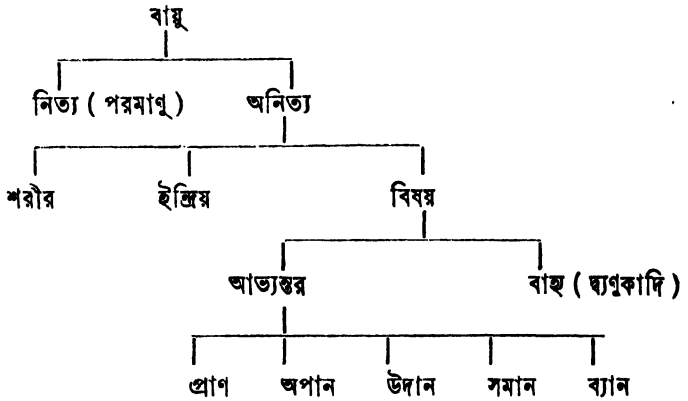
শরীর—শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির দেহ বায়বীয় অর্থাৎ ঐ সকল শরীরের উপাদান বায়ু ; পৃথিবী, জল ইত্যাদি নিমিত্ত বা সহকারী।

ইন্দ্রিয়—চর্ম শরীরের আবরণ, ত্বক্ উহার নামান্তর। ত্বকের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বায়বীয় অংশ অবস্থান করে উহা 'ত্বক্'-ইন্দ্রিয়।

উদ্ভূত স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য ; ঐ প্রকার দ্রব্যের উদ্ভূত স্পর্শ, পৃথক্ত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ,

১ পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ।

২ অশীতির্বাতবিকারাঃ, চত্বারিংশৎ পিত্তবিকারাঃ, বিংশতিঃ কফবিকারাঃ। সুশ্রুতসংহিতা

বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ ও দ্রবত্ব—এই দশবিধ গুণ; ক্রিয়া; উক্ত দ্রব্যগত জাতিসকল এবং উল্লিখিত গুণসমূহে এবং ক্রিয়ায় অবস্থিত জাতি সমুদায় ও সমবায়—এই সকল ভাববস্তু ত্বক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, এজন্য ইহারা ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়।

উল্লিখিত বিষয়সমূহে ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ চক্ষুর সম্বন্ধের অনুরূপ অর্থাৎ বিষয়বস্তু দ্রব্য হইলে উহাতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযোগ, দ্রব্যসমবেত (জাতি, গুণ বা ক্রিয়া) হইলে সংযুক্ত-সমবায় এবং দ্রব্যসমবেত-সমবেত হইলে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় ইত্যাদি।

বিষয়—শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত যাবতীয় অনিত্য বায়ুকে বিষয়-বায়ু বলা হয়। বিষয়-বায়ুকে আভ্যন্তর ও বাহ্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়।

শরীরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর একপ্রকার বায়ু আছে, যাহার অস্তিত্বে জীবন এবং অভাবে মৃত্যুর পরিজ্ঞান হয়[১]; উহা আভ্যন্তর বিষয়-বায়ু। শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান এবং পৃথক্ প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করায় ইহাকে প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান—এইরূপ পঞ্চ প্রকারে বিভাগ করা হয়।

আভ্যন্তর বিষয়-বায়ু ভিন্ন দ্ব্যণুক হইতে মহাঝটিকা পর্যন্ত সকল বিষয়-বায়ু বাহ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত।[২]

আকাশ

আকাশ পঞ্চম দ্রব্য। শব্দ আকাশের একমাত্র বিশেষগুণ এবং উহা কেবল শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য। এজন্য আকাশ স্থূল নহে। মহত্ত্ব-পরিমাণ কম হইলে বস্তু 'সূক্ষ্ম' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার সূক্ষ্মকে প্রচলিত কথায় বলে 'সরু'। যথা—সূক্ষ্ম সুতা সরু সুতা ইত্যাদি। দর্শন শাস্ত্রে সূক্ষ্ম-শব্দের অর্থ অন্যরূপ। যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অগম্য, অনুমান কিংবা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যাহার বিষয়ে ধারণা করা যায় না, দার্শনিকের নিকটে তাহাই সূক্ষ্ম। আকারের হ্রস্বতা এবং বৃহত্ত্ব এক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। তাই আকাশ পরম-মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট[৩] অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা বড় পরিমাণের কল্পনা করা যায় না সেইরূপ বৃহৎপরিমাণ হইয়াও সূক্ষ্ম। যে রীতি অনুসারে স্পর্শের দ্বারা বায়ুর অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, শব্দের দ্বারা আকাশের অনুমানে শাস্ত্রে সেই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে।

১ উপনিষদে শরীরের মধ্যে আকাশ, বায়ু ইত্যাদির অপূর্ব অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। এই আকাশ দহর-আকাশ নামে এবং বায়ু বৈরম্ভ বা বৈরম্ভক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দিব্যাবদানে বলা হইয়াছে—শরীরের মধ্যে 'বৈরম্ভ' নামে এক মহাসমুদ্র বিদ্যমান। উহাতে উৎপন্ন প্রবল ঝটিকাবায়ুও বৈরম্ভ।

২ জ্যোতিঃশাস্ত্রে ও পুরাণে বাহ্য বিষয়-বায়ু 'প্রবহ' ইত্যাদি সাত প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে।

৩ পরমমহত্ত্ব-পরিমাণ চতুর্থ অধ্যায়ে পরিমাণনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

এই সূক্ষ্ম দ্রব্যের পরিচয় দিতে হইলে তটস্থভাব অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শাস্ত্রে নানাস্থানে অবকাশ-শব্দের দ্বারা আকাশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ঐজন্য উপাধির সাহায্যও গৃহীত হইয়া থাকে। জলপূর্ণ কলসী হইতে সমুদায় জল ফেলিয়া দিলে উহার অভ্যন্তর এক বিলক্ষণ আকারে অনুভূত হইয়া থাকে। তখন কলসী হয় শূন্য। কলসীর এই মধ্যবর্তী অবকাশই আকাশ। তবে এই শূন্যতা বা অবকাশ কলসী অর্থাৎ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা পরিচিত বলিয়া উহা ঘটাকাশ নামে ব্যবহৃত হয়, আর পরিচ্ছেদক অর্থাৎ পরিচায়ক বলিয়া ঘট হয় উহার উপাধি। ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তখন আর উহাকে ঘটাকাশ বলিবার হেতু থাকে না। তখন ইহা নিরুপাধি, কেবল— আকাশ বা মহাকাশ।

লক্ষণ। যাহা শব্দের সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ যাহাতে শব্দ সমবায়-সম্বন্ধে থাকে তাহা **আকাশ**।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। সুগম।

আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ—এই ছয় প্রকার গুণ, সত্তা ও দ্রব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাবের সমাবেশ হয়[১]।

আকাশ নিত্য এবং একমাত্র দ্রব্য[২]। ইহা কোনও শরীরের উপাদান নহে। এজন্য সজাতীয় ভেদ না থাকায় ইহার স্বাভাবিক কোন বিভাগ করা যায় না। ইহা সর্বব্যাপী অর্থাৎ দিক্, কাল ও আত্মা ব্যতীত[৩] অন্য পঞ্চবিধ দ্রব্যের প্রত্যেকটির সহিত সংযুক্ত বলিয়া উহারা প্রত্যেকেই আকাশের উপাধি হইতে পারে। তাহাতে ইহার ঔপাধিক বিভাগ হয় অগণনীয়। যেমন—ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি। এই সকল ঔপাধিক ভেদের মধ্যে একটি মাত্র ভেদ গ্রহণ করিয়া 'ইন্দ্রিয়' নামে আকাশের একটি বিভাগ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই উপাধি কর্ণশষ্কুলী।

কর্ণশষ্কুলী দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশ কর্ণ ইন্দ্রিয়[৪]। কর্ণেন্দ্রিয় 'শ্রবণ' ও 'শ্রোত্র' এই দুই নামেও প্রসিদ্ধ।

১ আকাশে কোন ক্রিয়া হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ঈথার (Ether) নামে একটি বস্তু কল্পিত হইয়াছে। উহার তরঙ্গ আছে। তরঙ্গ ক্রিয়াসাপেক্ষ। অতএব ঈথার আকাশ হইতে ভিন্ন বস্তু। আকাশ একমাত্র দ্রব্য, এজন্য আকাশত্ব জাতি নহে। বেদান্তপরিভাষায় উক্ত হইয়াছে—"কর্ণেন্দ্রিয় বহির্গত হইয়া শব্দের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে"। অতএব এই মতে স্থলবিশেষে আকাশের ক্রিয়া স্বীকার্য।

২ 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে আকাশের উৎপত্তি বেদান্তসম্মত।

৩ বিভু অর্থাৎ পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত অন্য বিভু-দ্রব্যের সংযোগ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়-বিশেষের সম্মত নহে, এজন্য "দিক্, কাল এবং আত্মা ব্যতীত" বলা হইল।

৪ ঈশ্বরই শব্দের সমবায়িকারণ এবং কর্ণশষ্কুলীকে উপাধি স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 'ঈশ্বর'কেই কর্ণেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে আকাশ নামে একটি পৃথক্ দ্রব্যের কল্পনা করিতে হয় না। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি এই মতের সমর্থক। ঐরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মাই কর্ণেন্দ্রিয় এইরূপ আলোচনাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শব্দ এবং শব্দগত জাতিসমূহ কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ঐ দুই পদার্থে যথাক্রমে কর্ণের সম্বন্ধ সমবায় ও সমবেত-সমবায়[১]।

কাল

কাল ষষ্ঠ দ্রব্য। ইহা আকাশের ন্যায় নিত্য, সর্বব্যাপী ও সূক্ষ্ম। শীঘ্র, বিলম্ব, যুগপৎ অর্থাৎ এককালীন (সমসাময়িক, contemporary) দিন, রাত্রি প্রভৃতি ব্যবহার সম্পাদনের জন্য 'কাল' নামক দ্রব্য অনুমিত হয়[২]। ইহা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ (বয়সে বড় ও ছোট) ব্যবহারের অসাধারণ উপায়। ইহাকে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থেরই কারণ বলা হইয়াছে। ইহা সকল পদার্থেরই আশ্রয় বা আধার।

লক্ষণ। যাহা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ এই প্রকার ব্যবহারের কারণ, তাহা কাল।

লক্ষ্য। কাল একমাত্র বস্তু এবং অতীন্দ্রিয়। অতএব অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি জীবজাতির এক একটি মাত্র প্রাণীকে কোনও রূপে পরিচিত করিতে পারিলে যেমন ঐ জাতীয় সমস্তগুলির পরিচয় সহজে দেওয়া যায়, সেই প্রকারে কালের পরিচয় দিতে পারা যায় না। আকাশে শব্দের ন্যায় কালে কোন প্রত্যক্ষযোগ্য গুণও বিদ্যমান নহে, যাহার দ্বারা আকাশের দৃষ্টান্তে কালের পরিচয় দেওয়া সম্ভব। সত্য বটে, কালের অনেক উপাধি আছে, যাহার দ্বারা দিন, রাত্রি, ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রকারে কালের ব্যবহার জনসাধারণে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কাল অনিত্য এবং নানাবিধ এইরূপ ধারণাই সহজে উপস্থিত হয়। ফলে, কাল একমাত্র ও অতীন্দ্রিয় এই সিদ্ধান্তে ব্যঘাত হয়। অতএব উপাধির সাহায্যেও কালের স্বরূপ যথাযথ বুঝিতে পারা যায় না।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য লইলে বিষয়টি কিঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে। মনুষ্য অগণনীয় কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই 'মনুষ্য', এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ব্যবহার উপপাদনের জন্য যেমন 'মনুষ্যত্ব' নামে একটি অখণ্ড ধর্ম বা জাতি স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটিতেই 'কাল' এইরূপে ব্যবহার হওয়ায় 'কালত্ব' নামে অখণ্ড ধর্ম স্বীকার্য। উহা তিনে থাকিয়াও স্বয়ং এক এবং উহার আশ্রয় বা ধর্মী-বস্তুটি যদি এক হইলেও উহার

১ কর্ণেন্দ্রিয় আকাশবিশেষ, শব্দ উহাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত। সুতরাং শব্দে কর্ণের সম্বন্ধ সমবায়। শব্দগত জাতি—শব্দত্ব, ধ্বনিত্ব, বর্ণত্ব, কত্ব, খত্ব ইত্যাদি, সমবায়-সম্বন্ধে শব্দে অবস্থিত। অতএব ঐ সকলে কর্ণের সম্বন্ধ সমবেত-সমবায়। কুমারিল ভট্টের মতে শব্দ বিভু-দ্রব্যবিশেষ, সুতরাং কর্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ সংযোগ। এই মতে সমবায় স্বীকৃত হয় নাই কিন্তু ঐ স্থানে তাদাত্ম্য নামে এক সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব এই মতে সর্বত্র সমবায় স্থলে তাদাত্ম্য বলিতে হইবে।

২ বৈশেষিক সূত্র ২।২।৬।

দ্বারা নির্বাহযোগ্য সকল ব্যবহার সম্পন্ন করা যায়, তাহা হইলে উহাকে নানা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, প্রত্যুত গৌরব-দোষগ্রস্ত। কালের একমাত্র-দ্রব্যত্ব উক্ত প্রকারে সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু উহার সকল ব্যবহারেই উহার উপাধি অবলম্বন। ঐ উপাধির স্বরূপ ক্রিয়াবিশেষ। মতবিশেষে উৎপন্ন দ্রব্য এবং গুণ-পদার্থও কালের উপাধি হইয়া থাকে। এজন্য স্থূলভাবে বলা যায় যে, ক্রিয়াবিশেষ, মতান্তরে উৎপন্ন দ্রব্য এবং গুণও কাল-লক্ষণের লক্ষ্য। বস্তুতঃ উহার যাহা উপাধি তাহাই যথার্থ লক্ষ্য।

সমন্বয়। অতীতত্ব ও ভবিষ্যত্ব কোন বস্তুর স্থির ধর্ম নহে। বর্তমান কোনও বস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই অতীত ও ভবিষ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। আজ বুধবার, ১৩৪৭ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ,—বর্তমান। গত রাত্রিতে অর্থাৎ ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার ইহাই ছিল ভবিষ্যৎ, আজিকার রাত্রি প্রভাত হইবার পরে অর্থাৎ ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ইহাই হইবে অতীত। অতএব দেখা যাইতেছে—এই বুধবারের সৌরক্রিয়াই মুখ্যভাবে উল্লিখিত ব্যবহার সম্পন্ন করাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে সূর্যক্রিয়ার ঐরূপ ব্যবহার সম্পাদনে সামর্থ্য আসিল কিরূপে ? নৈয়ায়িক উত্তরে বলিবেন—কালের সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ সূর্যের ক্রিয়া কালের উপাধি[১], এই কারণেই উহার দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যবহার সম্ভবপর হয়। সৈন্যেরা সম্মুখযুদ্ধে জয় করে সত্য কিন্তু তদ্দ্বারা পশ্চাদ্বর্তী রাজশক্তিকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রকৃতস্থলে সূর্যের ক্রিয়া দিন-রাত্রি ঘটাইতেছে বটে কিন্তু উহার সামর্থ্য যোগাইতেছে কাল।

কালে সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চবিধ গুণ, ক্রিয়া ; সত্তা ও দ্রব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ—এই কয়টি ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়।

একমাত্র দ্রব্য হওয়ায় শুদ্ধ অর্থাৎ নিরুপাধি কালের কোন বিভাগ সম্ভবপর হয় না। ইহার ঔপাধিক ভেদ অনেক, দেশভেদে তাহাও বিভিন্ন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ক্ষণ, লব, নিমেষ, কলা, বিপল, পল ইত্যাদি, পাশ্চাত্যদেশে সেকেণ্ড, মিনিট ইত্যাদি ঔপাধিক সূক্ষ্ম কাল।

দিক্

দিক্ সপ্তম দ্রব্য। কালের ন্যায় ইহাও একটিমাত্র, নিত্য, সর্বব্যাপী এবং সূক্ষ্ম দ্রব্য। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, দূর ও নিকট ইত্যাদি ব্যবহার এই সপ্তম দ্রব্যের অস্তিত্ব বশেই সম্পন্ন হয়।

লক্ষণ। যাহা পূর্ব, পশ্চিম, দূর, নিকট ইত্যাদি ব্যবহারে হেতু, তাহা দিক্।

লক্ষ্য। অতীন্দ্রিয় এবং একমাত্র দ্রব্য এজন্য কালের ন্যায় দিক্ সম্বন্ধেও কোনও স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। ব্যবহারে যে সকল ক্ষেত্রে—পূর্বদিক্ পশ্চিম দিক্—ইত্যাদি প্রকারে,

১ সূর্যের ক্রিয়া সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাধি হইলেও ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব শিরোমণিমতে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ 'কাল' নামে কোন দ্রব্যে প্রমাণ নাই।

দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, দিকের উপাধিবিশেষই ঐরূপ ব্যবহারে প্রধানতঃ আলম্বন। উহার দ্বারা বিশুদ্ধ দিক্ পদার্থের স্বরূপ বুঝা যায় না। রাত্রি দিন ইত্যাদি ঔপাধিক কাল যেমন সৌরক্রিয়া-সাপেক্ষ তদ্রূপ পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি ঔপাধিক দিক্‌ও সূর্যের উদয়, অস্ত ইত্যাদির সাহায্যেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার বিচারে প্রচুর সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইলেও বিশুদ্ধ দিক্ ও কালের পরস্পর পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ, কাল-কৃত পরত্ব ও অপরত্ব হইতে দিক্-কৃত পরত্ব এবং অপরত্বের বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে[১]।

বিশেষতঃ ঔপাধিক কাল—যাহা অতীত, কোনও সময়ে তাহা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বলিয়া গণ্য হইত, এবং যাহা আজ বর্তমান, আগামী কাল তাহা হইবে অতীত এবং গতকল্য ছিল ভবিষ্যৎ, এইরূপে ভবিষ্যৎ-কাল ও সময়ানুসারে বর্তমান কিম্বা অতীত বলিয়া গণনা-যোগ্য; এজন্য উহারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ পরস্পর মিশ্রভাবাপন্ন কিন্তু ঔপাধিক দিক্ তদ্রূপ নহে। যে দেশে যখনই অবস্থিতি হউক না কেন, প্রাতঃকালে যেদিকে সূর্য দেখা যাইবে তাহা পূর্বদিকই হইবে, পশ্চিম বা উত্তর দিক্ হইবে না। কার্যের এই বৈলক্ষণ্য উহাদিগের কারণেরও পরস্পর বিভিন্নতাই সূচনা করে। অতএব, পূর্বে উল্লিখিত ছয় দ্রব্য এবং যে দুই দ্রব্য বিষয়ে পরে বলা হইবে এই সমস্ত হইতে অন্যপ্রকার দ্রব্য—এইভাবে লক্ষ্য দিক্-পদার্থ বুঝিতে হইবে।

সমন্বয়। উদয়কালীন সূর্য-সংযুক্ত দিক্‌কেই পূর্বদিক্ বলে। 'দিক্'নামে কোনও বস্তু অস্বীকার করিলে কোন্ পদার্থের সহিত সৌর-সংযোগ উক্ত ব্যবহার সম্পাদন করিবে? অতএব সৌর-সংযোগবিশিষ্ট দিক্ই পূর্বোক্ত ব্যবহারে কারণ হওয়ায় লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বিত হইল।[২]

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চবিধ গুণ, সত্তা ও দ্রব্যত্ব এই দুইটি জাতি এবং একটি মাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাবপদার্থ দিক্-পদার্থে অবস্থান করে।

দিকের স্বাভাবিক কোনও বিভাগ সম্ভব হয় না। ইহার ঔপাধিক বিভাগ মুখ্যতঃ চতুর্বিধ—পূর্ব, পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর।

দিকের এই কল্পিত ভেদ হইতে দিক্-কোণেরও কল্পনা হইয়াছে। উহাদের নাম বিদিক্, উহা ও চারিপ্রকার। উর্ধ এবং অধঃ নামে দিকের আরও দুইটি বিভাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইভাবে ঔপাধিক দিক্ দশ প্রকার হইয়াছে[৩]। পূর্ব দিক্ এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণ ইত্যাদি ক্রমে ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নামানুসারে ইহাদের নাম হইয়াছে—ঐন্দ্রী, আগ্নেয়ী, যাম্যা, নৈঋর্তী, বারুণী, বায়ব্যা, কৌবেরী, ঐশানী, ব্রাহ্মী এবং নাগী।

১ চতুর্থ অধ্যায়ে পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ দ্রষ্টব্য।

২ একই দিক্-বস্তুদ্বারা পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি বিরুদ্ধ নানা ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হয় তাহা বৈশেষিক দর্শনে এবং ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩ সপ্তপদার্থীতে 'রৌদ্রী' নামে একাদশী দিক্ উল্লিখিত হইয়াছে। উহার লক্ষ্য কি তাহা চিন্তনীয়।

শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলস্থ মালবার ও কানাড়া প্রদেশকে মধু ও দুগ্ধের দেশ বলা হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে বহু প্রাচীনকালে এই অঞ্চল আরব সাগরের অন্তর্গত ছিল। এই পশ্চিমঘাটের সংস্কৃত নাম সহ্যপাহাড় আর এই স্থানকে পরশুরামক্ষেত্র বলে। কানাড়া, মালবার, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন এই পরশুরামক্ষেত্রের অন্তর্গত। প্রবাদ আছে যে পরশুরাম আর্যাবর্তে তাঁহার কার্য সমাধা করিয়া সমুদ্রের নিকট একটী নিভৃত স্থান প্রার্থনা করেন এবং সমুদ্র তাঁহাকে এইস্থান দান করে। এই প্রদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সর্বরকম সুষমায় পরিশোভিত। অত্যুঙ্গ পর্বতশ্রেণী, দিগন্ত প্রসারিত বনানী, নদনদীপ্লাবিত উর্বর ভূখণ্ড এই অঞ্চকে অতি মনোরম করিয়াছে। এই পরশুরামক্ষেত্রেই ভারতের দার্শনিক গগনের তিনটী অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জন্মগ্রহণ করেন--আচার্য শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব।

শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যের জীবনী ও মতবাদ অনেকে অবগত আছেন; কিন্তু মধ্বাচার্যের জীবনী ও দর্শন সাধারণের মধ্যে তত প্রচলিত হয় নাই। ভারতবর্ষে শ্রী, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব—এই ৫টী বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে মধ্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন মধ্বাচার্য। মধ্বাচার্যের জীবনীর মধ্যে দুই খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—(ক) মণিমঞ্জরী (খ) মধ্বাচার্যবিজয়। এই দুইখানিই পণ্ডিত নারায়ণাচার্য রচিত। ইনি মধ্ব-শিষ্য ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্যের পুত্র এবং মধ্বের সমসাময়িক। ত্রিবিক্রমেরও বায়ুস্তুতি (মধ্বকে বায়ুর অবতার বলা হয়) নামক সংস্কৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থকে মধ্ব-জীবনী বলা চলে। কিন্তু এইগুলি কথঞ্চিৎ সাম্প্রদায়িক দোষদুষ্ট। তবে এইগুলি মধ্বের সমসাময়িক গ্রন্থ এবং নারায়ণ পণ্ডিতের খুল্লতাত শঙ্করাচার মধ্বেরই গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এই গ্রন্থাগারটী পরে অপহৃত হইয়া যায়। ইংরেজী ভাষাতে মধ্বের জীবনী ও মতবাদের মাত্র দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে—(১) কৃষ্ণস্বামী আয়ার কৃত (C. N. Krishna Swamy Iyer M. A.) Historical Sketch of Madhva and Madhvaism এবং (২) পদ্মনাভাচার কৃত (C. M. Padmanabhachar B.L.) The life and Teachings of Sri Madhvachar-yar. বাংলা ভাষায় মধ্বের কোন প্রামাণিক জীবনী নাই। সেজন্য পাঠক বর্গের সাধারণভাবে তাঁহার পূত জীবনী অবগতির জন্য বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। পরবর্তী প্রবন্ধে তাঁহার ধর্মমত ও সাম্প্রদায়িক নিয়মানুষ্ঠানের বিষয় লিখিত হইবে। আর তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বর্তমান লেখক কৃত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে যথাস্থানে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দক্ষিণ কানাড়া জেলার অন্তর্গত উদিপি নামক একটী তালুক আছে। উদিপি শব্দ চন্দ্র

মৌলীশ্বর শব্দের অপভ্রংশ। উড়ুপ=চন্দ্র। ইহার অন্য নাম শিবল্লী (শিব বেল্লী) বা রজত পীঠপুরম্। এই স্থানটী চন্দ্রমৌলীশ্বর ও অনন্তেশ্বর এই দুইটী মন্দিরের জন্য প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। মধ্বাচার্য এখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করেন এবং ইহা তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র হয়। উদিপি তালুকটী প্রচীন তুলুব জনপদের অন্তর্গত। উদিপি হইতে কয়েক মাইল দূরে বিমানগিরি নামক পাহাড়ের পাদদেশে পজকক্ষেত্র নামক একটী গ্রাম মধ্বের জন্মস্থান। এই বিমানগিরির উপরে পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দির আছে এবং ইহার চারি পার্শ্বে পরশুতীর্থ, ধনুঃতীর্থ, গদাতীর্থ ও বাণতীর্থ নামে পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত ৪টী পবিত্র পুষ্করিণী আছে।

মধ্বের জন্ম হয় বিলম্বীবর্ষের বিজয়া দশমীদিনে। তাঁহার জন্মবর্ষ লইয়া কয়েকটী মতভেদ আছে। দক্ষিণ কানাড়া জেলার পুস্তকে (District Manual of South Canara) তাঁহার জন্ম সময় ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দ ধরা হইয়াছে। ইহা বুকাননের ভ্রমণ কাহিনী হইতে ও মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয় (৩২ অ. ১০০ ও ১৩১ শ্লোক) হইতে নির্দ্ধারিত। ঐ শ্লোকের তাৎপর্যে জানা যায় মধ্ব নিজেই কলিযুগের ৪৩০০ অব্দে তাঁহার জন্ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা ১১৯৯ খ্রীঃ অঃ হয়। কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহাশয় এই অব্দটাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তরাদি মঠ ও অন্যান্য মঠের যে গুরুপরম্পরা তালিকা আছে তাহাতে দেখা যায় মধ্ব ১১১৮ খ্রীঃ অব্দে (বিলম্বী ১০৪০ শক) জন্মগ্রহণ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১১৯৮ খ্রীঃ অব্দে (পিঙ্গল ১১২০ শক) দেহত্যাগ করেন। মধ্ব ৭৯ বর্ষ জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১১১৮ খ্রীঃ অব্দ তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের সময় নয়, জন্মসময় বলা যাইতে পারে। আউফ্রেক্ট (Aufrecht), ডক্টর স্যর আর, জি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি এই অব্দটাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানের কয়েকটী প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা হইতে অন্য তারিখ পাওয়া যায়—১২৩৮ খ্রীঃ অব্দ। এই বিষয়ে যে সব গবেষণা হইয়াছে তাহা পরে লিপিবদ্ধ হইবে। বর্তমানে আমরা ১২৩৮ খ্রীস্টাব্দই তাঁহার জন্মসময়রূপে গ্রহণ করিতেছি।

ইঁহার পিতার নাম মধ্বেজী ভট্ট বা মধ্যগেহ। তুলুভাষায় ইঁহার নাম 'নদুবন্তিলয়'। ইনি একজন সামান্য ভূস্বামী ছিলেন এবং আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। বেদ এবং পুরাণে ইঁহার পাণ্ডিত্য ছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'ভট্ট' উপাধি দিয়াছিলেন। মধ্বাচার্যের মাতার নাম বেদবতী। ইনি ভক্তিমতী ও পতিপরায়ণা ছিলেন। প্রথমে ইঁহাদের একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র হয়। পুত্র দুইটীর শৈশবেই মৃত্যু হয়। তারপর ইঁহাদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় ইঁহারা অনেক ব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধন করেন এবং উদিপির মন্দিরে শ্রীঅনন্তেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। ১২ বৎসর পরে ইঁহাদের পুত্র লাভ হইল। পুত্রের নামকরণ হইল 'বসুদেব'। ইনিই ভবিষ্যতে মধ্বাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইঁহার অন্যনাম পূর্ণপ্রজ্ঞ, পূর্ণবোধ ও আনন্দতীর্থ। যৌবনে ইঁহার আকৃতি ভীমসদৃশ ছিল বলিয়া ইনি ভীম বলিয়াও কথিত হইতেন। যেমন অন্যান্য মহাপুরুষদের জন্মসম্বন্ধে অলৌকিক ঘটনার কাহিনী শুনা যায় মধ্বাচার্যের জন্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ দুই একটী ঘটনা জানা যায়। জন্মসময়ে অনন্তেশ্বরের মঠের দেবতা

বিষ্ণু এক ব্রাহ্মণ দূত দ্বারা প্রচার করিলেন যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোন মতে তিনি বিষ্ণুর অবতার এবং কোন মতে বায়ুর অবতার ছিলেন। বায়ুর অবতার বলিবার কারণ এই যে এই সম্প্রদায়ের মতে বায়ুর উপাসনা দ্বারাই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। বাল্যকালে ইনি একবার হারাইয়া যান। পিতামাতা উদিপির মন্দিরে ও অন্যান্য স্থানে বহু সন্ধান করিয়াও পাইলেন না; শেষে উদিপির মন্দির হইতেই তিন দিন পরে পাওয়া গেল। মধ্বাচার্যবিজয়ে আছে যে বায়ু নারায়ণের আদেশে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য মধ্বরূপে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৫ম বর্ষে মধ্বাচার্যের উপনয়ন হয়। তারপর তিনি পুগবনবংশীয় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট অলঙ্কার, ন্যায়, বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উপনয়নের পর হইতেই তাঁহার বৈরাগ্য উদয় হয়। তিনি উদিপি হইতে কয়েক মাইল দূরস্থ বন্দরকারে মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী অচ্যুতপ্রেক্ষা বা পুরুষোত্তম তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণে মনস্থ করেন ও গৃহত্যাগ করেন। এই সন্ন্যাসীপ্রবর ভাগবত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি তখন উদিপি মন্দিরেই অবস্থান করিতেছিলেন। মধ্বের গৃহত্যাগ পিতার অত্যন্ত কষ্টের কারণ হইল। তপস্যালব্ধ তাঁহার একমাত্র পুত্র,—গুণবান, বিদ্বান পুত্র এই চারুবয়সে সংসার ত্যাগ করিলেন। পিতাও তাঁহার অনুসন্ধানে ঐ মঠে গমন করিলেন। পিতাকে সান্ত্বনা দিতে না পারিয়া মধ্ব গুরুর সহিত দক্ষিণদেশ পর্যটনে বাহির হইলেন। পিতাও মধ্বের পশ্চাতে প্রায় উদিপি হইতে ৩৮ মাইল দূরবর্তী নেত্রবতী নদীতীরস্থ মাঙ্গালোর সহরের নিকট অনুগমন করেন। পিতার অনুনয়ে মধ্ব বলিলেন যে যতদিন না তাঁহার (মধ্বের) অন্য একটী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে ততদিন তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন না। পিতা বলিলেন মধ্বের সন্ন্যাসগ্রহণ যেন মাতার অনুমতি সাপেক্ষ হয়। মধ্ব ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন পিতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মধ্যগেহের একপুত্র সন্তান হইল। ইনিই ভবিষ্যতে সোদাই মঠের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হ'ন। তখন মধ্ব স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুমতি ভিক্ষা করেন। প্রথমে মাতা কিছুতেই স্বীকৃতা হ'ন না; তখন মধ্ব বলিলেন যে অনুমতি না দিলে তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। মাতা বাধ্য হইয়া অনুমতি দিলেন। মধ্ব তখন সন্ন্যাস গ্রহণে চলিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১১।১২ বর্ষ।

আবার অন্যমতে তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ৯ বা ১৬। সম্ভবতঃ তিনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। কারণ উদিপিমঠে রক্ষিত একটী সংস্কৃত শ্লোক হইতে জানা যায় যে মধ্বের ৫ম বর্ষ বয়সে উপনয়ন হয় ও ইহার ৭ বৎসর পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

যাহা হউক সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে মধ্ব তাঁহার গুরুর মঠে একটি বিরাট ধর্ম-সভার আহ্বান করেন ও সেখানে তিন দিন যাবৎ তাঁহার মতবাদ প্রচার ও বিপক্ষ মতবাদ খণ্ডন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে গুরু ও সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তারপর এক শুভ

মুহূর্তে মধ্ব বা বসুদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল আনন্দতীর্থ। তখন হইতে তিনি অন্য একটী মঠের অধ্যক্ষ হইলেন। সেই সময় এই তুলুব প্রদেশ জৈনধর্মের একটী কেন্দ্রস্থান ছিল। এখানে জৈনদের বহু স্তম্ভ, বস্তী প্রভৃতি ছিল। মধ্ব জৈনসম্প্রদায়ের অনেক পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করেন। একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত—ইঁহার নাম বুদ্ধসাগর, ইঁহাকেও পরাস্ত করেন।

ইহার অল্প দিন পরে মধ্ব দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি গুরুর সহিত উদিপি হইতে বহির্গত হইয়া মাঙ্গালোর অতিক্রম করতঃ ইহার ২৭ মাইল দুরবর্তী বিষ্ণুমঙ্গলম্ নামক একটি স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানটী মধ্বের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কারণ তিনি পরবর্তী কালে প্রায়ই এখানে আসিয়া বিষ্ণু মন্দিরে কয়েক সপ্তাহ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। এখান হইতে তাঁহারা ত্রিবাঙ্কুরে উপনীত হইলেন। এই স্থানে শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্কর স্বামীর সহিত মধ্বের বিবাদ ও তর্ক হয়। বিদ্যাশঙ্কর মধ্বকে মৌখিক বিবাদ না করিয়া সাধ্য থাকিলে শঙ্করমত খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিতে বলেন। মধ্বও এই যুক্তি গ্রহণ করেন। তারপর মধ্ব কুমারিণ অন্তরীপ ও রামেশ্বর অভিমুখে গমন করেন। রামেশ্বরে ৪ মাস অবস্থানের পর সশিষ্য মধ্ব শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাশঙ্করও সশিষ্য রামেশ্বরে গিয়াছিলেন ও সেখানে মধ্বকে নানাভাবে বাদ বিতণ্ডায় উত্যক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থস্থান অতিক্রম করিয়া মধ্ব উদিপিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে সন্ন্যাসগ্রহণের পর ৭ বৎসর অতিবাহিত হইল। তিনি তখন শাস্ত্র রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমেই তিনি গীতাভাষ্য রচনা করেন।

গীতাভাষ্য রচনা করিয়া হিমালয়ের অন্তর্গত বদরিকাশ্রমে উপনীত হ'ন। প্রবাদ আছে (মধ্ববিজয় মতে) সেখানে ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ও তাঁহাকে গীতাভাষ্য উপহার দেন। ব্যাসদেব প্রীত হইয়া মধ্বকে তিনটী শালগ্রাম শিলা দান করেন। মধ্ব পরে ঐ শিলাত্রয় সুব্রহ্মণ্য, উদিপি এবং মধ্যতন এই তিন স্থানের মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদ্ব্যতীত তিনি উদিপির মঠে একটী কৃষ্ণমূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে—কোন বণিকের এক অর্ণবপোত দ্বারকা হইতে মালবার গমন কালে তুলুবের নিকট ডুবিয়া যায়। ঐ জাহাজে গোপীচন্দন মৃত্তিকায় ঢাকা একটি কৃষ্ণমূর্তি ছিল। মধ্বাচার্য দৈববলে উহা জানিয়া জল হইতে ঐ মূর্তি উত্তোলন করিয়া উদিপি মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি ইহা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থানরূপে পরিগণিত।

অবশ্য বেদব্যাস বহু পূর্বের লোক এবং তাঁহার সহিত কি প্রকারে মধ্বাচার্যের সাক্ষাৎ হইল তাহা বিবেচ্য। ঋষিরা জগতের কল্যাণের জন্য মুক্তাত্মা হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করেন ইহা অনেক সাধকের প্রত্যক্ষলব্ধ। সম্ভবতঃ বেদব্যাস সূক্ষ্ম শরীরে মধ্বকে সাক্ষাৎ দান করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি ব্যাসাশ্রমে (ইহা বদরিকাশ্রম হইতে কয়েক মাইল উত্তরে) ব্যাসদেবের দর্শনলাভের পর দাক্ষিণাত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে তিনি ব্রহ্ম-

সূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রিয়শিষ্য ও সহযাত্রী সত্যতীর্থ ইহার নকল করিতে লাগিলেন ও প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই উদিপিতে একখণ্ড প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে মধ্ব গোদাবরীতীর্থে গমন করেন। এইস্থানেই পণ্ডিত শোভনভট্ট এবং সমি শাস্ত্রী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহারাই বিখ্যাত পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরি তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। পথিমধ্যে মধ্ব খুব সম্ভব নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, কারণ ইহা তখন শাস্ত্রপ্রচারের একটী বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল ছিল। তথা হইতে তিনি পুরীধামে গমন করেন ও সেখান হইতে গঞ্জামের শ্রীকূর্মমন্দির ও ভিজাগপাটামের সিংহাচলম মন্দির দর্শন করেন। গোদাবরী তীরে তিনি ভট্ট, প্রভাকর, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীকে স্বমতে আনয়ন করেন। তারপর তিনি উদিপিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শিষ্যগণকে স্বরচিত ব্রহ্ম সূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। যে স্থানে তিনি দিনের পর দিন শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন সেই স্থান এখনও চিহ্নিত আছে; ইহা অনন্তেশ্বর মন্দিরের অন্তর্গত ৩ বর্গ হস্ত পরিমিত স্থান। এস্থানে পরবর্তী কালে বাদিরাজ যতীন্দ্র মধ্বের একটী প্রস্তরমূর্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্ব স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া এই চেষ্টা হইতে বিরত করেন। তিনি উদিপিতে অবস্থানকালে ক্রমে ৩৭ খানি প্রকরণ গ্রন্থ ও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে গীতাভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের নাম যথা—

(১) ঋগ্বেদ ভাষ্য (মাত্র ১ম মণ্ডলের ১ম অধ্যায়ের শ্লোকাত্মক ব্যাখ্যা) (২-১১) ঈশ, কেন, কঠ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন ও ঐতরেয় এই দশখানি উপনিষদের ভাষ্য ও তাহাদের টিপ্পনী (১২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্য (১৩) ভগবদ্গীতা তাৎপর্য-নির্ণয় (১৪) ভাগবতপুরাণ তাৎপর্য নির্ণয় (১৫) মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয় (১৬) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও তাহার টীকা (১৭) ব্রহ্মসূত্রানুভাষ্য (১৮) ব্রহ্মসূত্রানুব্যাখ্যান (ন্যায়বিবরণ) (১৯) কথালক্ষণ (২০) কৃষ্ণকর্ণামৃত মহার্ণব (২১) কর্মনির্ণয় (২২) জয়ন্তী কল্প (২৩) তত্ত্ববিবেক (২৪) তত্ত্বসংখ্যান (২৫) তত্ত্বোদ্যত (২৬) তন্ত্রসার (২৭) প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন (২৮) প্রমাণ লক্ষণ (২৯) মায়াবাদ-খণ্ডন (৩০) উপাধিখণ্ডন (৩১) যতিপ্রণবকল্প (৩২) যমকভারত (৩৩) বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয় (৩৪) সদাচার স্মৃতি (৩৫) সন্ন্যাসপদ্ধতি (৩৬) দ্বাদশস্তোত্র (৩৭) নরসিংহ নখস্তোত্র।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে (১-১৮) ভাষ্য ও ব্যাখ্যা—এবং অবশিষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ ও স্তোত্রাদি। ইহাদের অধিকাংশই কুম্ভকোণম্ অন্তর্গত মধ্ববিলাস বুকডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার পর মধ্বাচার্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ন। তিনি পুনরায় বদরিকাশ্রমাভিমুখে সশিষ্য যাত্রা করেন। তাঁহার এই অভিযানের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ স্থান অতিক্রম করিলেন তাহাও জানা কঠিন। দাক্ষিণাত্যের বহু জনপদ ও উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থস্থানাদি দর্শন করিয়া তিনি বদরিকায় উপনীত হইলেন। বদরিকাশ্রম দর্শন পর তিনি কুরুক্ষেত্র, হস্তিনাপুর প্রভৃতি হইয়া কাশীধামে উপনীত

হইলেন। তথা হইতে আরও বহুস্থান দর্শন করিয়া তিনি উদিপিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মধ্বাচার্যের পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি শিষ্যদের সুবিধার জন্য তুলুব প্রদেশে আরও ৮টী মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং ইহাদের মধ্যে---যথাক্রমে রামসীতা, লক্ষ্মণসীতা, দ্বিভুজ কালীয় দমন, সুবিট্‌ঠল, চতুর্ভুজ কালীয় দমন প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর গোদাবরী তীরস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ৮জন সন্ন্যাসীকে ঐ ৮টী মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। এই মন্দিরগুলি— কানুর, পেজাওর, আদমার, পলিমার, কৃষ্ণপুর, সিরুর, সোদে ও পুত্তগে এই ৮টী স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রিয় শিষ্য পদ্মনাভতীর্থকে রামচন্দ্রমূর্তি ও ব্যাসপ্রদত্ত শালগ্রামশিলা প্রদান করিয়া আদেশ করেন "আমার মত প্রচার কর ও উদিপির মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ ধনরত্ন সংগ্রহ কর"। তদনুযায়ী পদ্মনাভ অনেক অর্থ-সংগ্রহ করিয়া ৪টী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয়বার বদরিকা হইতে ফিরিবার পর তিনি পণ্ডিত ত্রিবিক্রমকে স্বমতে আনয়ন করেন। ইনি তৎকালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে মধ্বাচার্যের পিতা মধ্যগেহ (ইঁহার প্রকৃত নাম কি জানা যায় না—মধ্যগেহ একটী উপাধিমাত্র) প্রবীণ বয়সে দেহত্যাগ করেন। মাতা বেদবতীও কিছুদিনের মধ্যে মর্তধাম ত্যাগ করিলেন। তখন মধ্বাচার্যের অনুজ তাঁহার নিকট (তিনি তখন জয়সিংহের রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন) এই সংবাদ আনয়ন করেন। ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন ও চাতুর্মাস্যব্রত সমাপান্তে মধ্বাচার্য স্বগ্রাম পজকক্ষেত্রে আগমন করিলেন। ভ্রাতার বৈরাগ্যদর্শনে ইহার কিছুদিন পরে তিনি কণ্বতীর্থে (ইহা মাঙ্গালোর হইতে ১১ মাইল দূরে) তাঁহাকে সন্ন্যাস দান করিলেন ও নামকরণ করিলেন বিষ্ণুতীর্থ। এই শুভদিনে আরও ৭জন ব্রাহ্মণকে তিনি সন্ন্যাসদান করেন। আর এই ৮ জন সন্ন্যাসীকে উদিপির ৮টী মঠের অধ্যক্ষ করিলেন যথা—

(ক) বিষ্ণুতীর্থ সোদে মঠের (খ) জনার্দন তীর্থ কৃষ্ণপুর মঠের (গ) বামনতীর্থ কানুরমঠের (ঘ) নরসিংহতীর্থ—আদমার মঠের (ঙ) উপেন্দ্রতীর্থ পুত্তগে মঠের (চ) রামতীর্থ সিরুর মঠের (ছ) হৃষীকেশ তীর্থ পলিমার মঠের (জ) অক্ষোভ্যতীর্থ পেজাওর মঠের অধ্যক্ষ হইলেন।

এইরূপে প্রায় ৭৯ বৎসর ও কয়েকমাস ধরাধামে অবস্থান করিয়া এবং সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতে আপনমত প্রচার ও শিষ্যসংগ্রহ করিয়া ধর্মগুরু আচার্য মধ্ব ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে (১২৩৯ পিঙ্গল শকে) দেহত্যাগ করিলেন আর তাঁহার ধর্মপ্রচারের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন ৪ জন প্রধান শিষ্য—পদ্মনাভতীর্থ, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্থ ও অশোক তীর্থের উপর। তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্য হইলেন পদ্মনাভতীর্থ। তাঁহার শিষ্যদের অনেকের বিশ্বাস তিনি বদরিকায় এখনও সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিতেছেন।

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

(৫) বরদাচার্যের পর আবির্ভূত হইলেন ইঁহার পৌত্র ও শিষ্য—বরদাচার্য নড়াডুম্মল। ইঁহার গ্রন্থ—(ক) তত্ত্বসার (খ) সারার্থচতুষ্টয়।

(৬) বীররাঘবাচার্য—ইনিও সুদর্শনাচার্যের গুরু বরদাচার্যের অন্য এক শিষ্য। ইনি উপরিলিখিত তত্ত্বসারের উপর "রত্নপ্রসারিণী" নামক এক টীকা রচনা করেন।

(৭) বাদিহংসাম্বুবাচার্য বা ২য় রামানুজাচার্য। ইনি পদ্মনাভাচার্যের পুত্র ও বিখ্যাত বেঙ্কটনাথের মাতুল এবং গুরু। ইঁহার গ্রন্থ "ন্যায়কুলিশ"। ইঁহার আবির্ভাব সময় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

(৮) বেদান্ত মহাদেশিকাচার্য বা বেঙ্কটনাথাচার্য—ইনি প্রায় ১২৬৮-১৩৭৬ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত অর্থাৎ ১০৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। অদ্বৈত সম্প্রদায়ের যেমন আনন্দগিরি শঙ্করভাষ্যের বহু টীকা রচনা করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ রামানুজকৃত ভাষ্যাদির টীকা রচনা করেন। ইঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত রামানুজের পর এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেহ আবির্ভূত হ'ন নাই। ইনি রামানুজের চতুর্থ পুরুষ অর্থাৎ প্রশিষ্যের শিষ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ যথা—(ক) ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য (খ) গীতার্থ সংগ্রহ (গ) গীতাভাষ্য টীকা (ঘ) গদ্যত্রয় টীকা (ঙ) তত্ত্বমুক্তাকলাপ (চ) ন্যায়পরিশুদ্ধি (ছ) সর্বার্থসিদ্ধি ও ইহার টীকা (জ) সেশ্বর মীমাংসা (ঝ) মীমাংসা পাদুকা (ঞ) শতদূষণী (ট) অধিকরণসারাবলী (ঠ) ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন (ড) তত্ত্বটীকা (ঢ) বাদিত্রয় খণ্ডন (ণ) সংকল্প সূর্যোদয় (ত) যাদবাভ্যুদয় কাব্য (থ) তিরুবাইমুড়ি ইত্যাদি

(৯) বরদগুরু আচার্য—ইনি বেদান্ত মহাদেশিকের পুত্র। ইঁহার অন্যনাম প্রতিবাদি ভয়ঙ্কর অন্নন। ইনি তর্কশাস্ত্রে বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ যথা—(ক) সপ্ততিরত্ন-মালিকা (ইহাতে পিতার প্রশংসা আছে) (খ) বেদান্তদেশিকের অধিকরণসারাবলীর উপর টীকা।

(১০) লোকাচার্য পিল্লাই—ইনি রামানুজ হইতে ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। ইঁহার অবির্ভাব সময় ১৪শ শতাব্দী। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) তত্ত্ব নির্ণয় (খ) তত্ত্বশেখর।

(১১) সুদর্শনাচার্য—ইনি রামানুজের শ্রীভাষ্যের উপর 'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকা রচনা করেন। সম্ভবতঃ ইঁহার অন্যনাম সুদর্শনসূরি এবং ইনি রামানুজের বেদার্থ সংগ্রহের উপর 'তাৎপর্য দীপিকা' নামক টীকা রচনা করেন। ইনি খ্রীস্টীয় ১৩শ—১৪শ শতাব্দীর লোক।

(১২) বরদবিষ্ণু আচার্য—ইনি সুদর্শনাচার্যের 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র উপর 'ভাব প্রকাশিকা' টীকা রচনা করিয়াছেন।

(১৩) রঙ্গরামানুজাচার্য---ইনিও ১৪শ শতাব্দীর লোক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া তাহার প্রবর্তক দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লেখেন। কিন্তু রামানুজাচার্য তাহা করিতে পারেন নাই। ইনি সেই অভাব মোচন করিয়া দশখানি উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করেন।

(১৪) অনন্তাচার্য—যাদবগিরি প্রদেশের মেলকোট নামক স্থানে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি সুদর্শনাচার্যের পরবর্তী। ইনি অনেকগুলি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের পুষ্টিসাধন করেন। যথা—(ক) জ্ঞানযাথার্থবাদ (খ) প্রতিজ্ঞাবাদার্থ (গ) ব্রহ্মশক্তি পদবাদ (ঘ) ব্রহ্মলক্ষণ নিরূপণ (ঙ) বিষয়তাবাদ (চ) মোক্ষকারণতাবাদ (ছ) শরীরবাদ (জ) শাস্ত্রারম্ভ সমর্থন (ঝ) শাস্ত্রৈক্যবাদ (ঞ) সংবিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থ (ট) সমাসবাদ (ঠ) সামানাধিকরণ্যবাদ (ড) সিদ্ধান্ত সিদ্ধাঞ্জন।

(১৫) দোদ্দয় মহাচার্য রামানুজদাস—ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর লোক। ইঁহার পূর্বে রামানুজ সম্প্রদায়ের আরও কয়েকজন আচার্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের কৃত কোন সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইঁহার রচিতগ্রন্থ যথা—(ক) বেদান্তদেশিকের শতদূষণীর উপর 'চণ্ডমারুত' টীকা (খ) অদ্বৈতবিদ্যাবিজয় (এই গ্রন্থে অদ্বৈতমত ও মাধ্বমত খণ্ডন করেন) (গ) উপনিষদ্মঙ্গলদীপিকা (ইহাতে উপনিষদের ব্যাখ্যা আছে) (ঘ) পারাশর্য বিজয় (ইহাতে অপ্পয়দীক্ষিতের ন্যায়মণিরক্ষা গ্রন্থ খণ্ডিত হইয়াছে) (ঙ) ভাষ্যোপন্যাস (ইহা শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা) (চ) সদ্বিদ্যাবিজয় (ছ) বেদান্তবিজয় (জ) ব্রহ্মবিদ্যাবিজয় (ঝ) পরিকর বিজয়।

(১৬) সুদর্শন গুরু—ইনি উপরিলিখিত দোদ্দয় মহাচার্যের শিষ্য। ইনি গুরুকৃত 'বেদান্ত বিজয়' (ইহার অন্যনাম অদ্বৈত বিজয়) উপর 'মঙ্গল দীপিকা' নামক টীকা রচনা করেন।

(১৭) বরদনায়কস্থরি—ইঁহার রচিত গ্রন্থ চিদচিদীশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ।

(১৮) শ্রীনিবাসাচার্য—ইনি গোবিন্দাচার্যের পুত্র। শঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র যেমন বেদান্তপরিভাষা রচনা করিয়াছেন, ইনিও সেই ভাবে 'যতীন্দ্রমতদীপিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া রামানুজমতের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়াছেন ও বেদান্ত পরিভাষাকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহার উপর মঃমঃ পণ্ডিত অভ্যঙ্কর শাস্ত্রী এক টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার দ্বিতীয়গ্রন্থ বেঙ্কটনাথের শতদূষণীর উপর 'পাদুকা সহস্র' টীকা। যতীন্দ্রমতদীপিকার মধ্যে ইনি এই সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে অধিকাংশের গ্রন্থকর্তার পরিচয় দিতেছি। অবশিষ্ট কয়েকটীগ্রন্থ সম্ভবতঃ লুপ্ত।

(১৯) শ্রীনিবাস তাতাচার্য—ইঁহার লিখিত গ্রন্থ—আনন্দতারতম্যবাদ-খণ্ডন। ইহাতে মাধ্বমত খণ্ডনের চেষ্টা আছে। ইঁহার দুই পুত্র—শ্রীনিবাসাচার্য ও অন্নয়াচার্য। এই দুইজনই মহাপণ্ডিত ছিলেন।

(২০) শ্রীনিবাসাচার্য---ইনি তাতাচার্যের পুত্র। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ

আছে। যথা—(ক) তত্ত্বমার্তণ্ড (ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা আছে ও ব্যাসতীর্থের মাধ্ব চন্দ্রিকা খণ্ডনের প্রয়াস আছে) (খ) অরুণাধিকরণসরণি বিবরণী—ইহাতে শঙ্করের আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা খণ্ডনের চেষ্টা আছে (গ-ঘ) ওঙ্কারবাদার্থ ও প্রণব দর্পণ---ইহাতে মধ্ব সম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্থের মত খণ্ডন করা হইয়াছে (ঙ) জিজ্ঞাসাদর্পণ---ইহাতে রামানুজ মতপ্রপঞ্চিত হইয়াছে। (চ) প্রজ্ঞানরত্নপ্রকাশিকা—ইহাতে উপাসনা ও ধ্যান দ্বারা মুক্তি হয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে (ছ) বিরোধ নিরোধ ভাষ্যপাদুকা—ইহাতে অদ্বৈত মত খণ্ডনের চেষ্টা আছে (জ) নয়দ্যুমণি—ইহা যতীন্দ্র মত দীপিকার অনুকরণে লিখিত (ঝ) সিদ্ধান্ত চিন্তামণি—ইহাতে রামানুজ সিদ্ধান্ত একত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। (ঞ) ভেদদর্পণ—ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে (ট) সহস্রকিরণী—ইহা শতদূষণীর উপর এক টীকা।

(২১) বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য—ইনি শ্রীনিবাসাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ইঁহার রচিত গ্রন্থ বেদান্ত কারিকাবলী।

(২২) মহীশূর অনন্তাচার্য—ইঁহার আবির্ভাব সময় প্রায় ১৮৫০ খ্রীঃ অঃ। ইঁহার গ্রন্থ---ন্যায়ভাস্কর। ইহাতে মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকার খণ্ডনের চেষ্টা আছে। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল।

(২৩) মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী—ইনি সম্ভবতঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হ'ন এবং কাশীধামে বাস করিতেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(ক) রামানুজের বেদার্থ সংগ্রহের উপর 'স্নেহপূর্তি' নামক টীকা (ইহাতে অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ খণ্ডনের চেষ্টা আছে) (খ) শ্রীভাষ্যের ভূমিকা (গ) রামানুজ কৃত বেদান্ত সারের ভূমিকা।

(২৪) কাঞ্চীর প্রতিবাদি ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য—ইঁহার প্রকৃত নাম অনন্তাচার্য। ইনি কাশীতে এক সময়ে অদ্বৈত মতাবলম্বী রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রীর সহিত লিখিত বিচার করেন। ইঁহার 'একশাস্ত্রত্ব মীমাংসা' নামক গ্রন্থে বেদান্ত ও মীমাংসার এক শাস্ত্রত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহাই সংক্ষেপে বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের আচার্যগণের এবং তাঁহাদের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের যেরূপ বহু আচার্য ও গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই সম্প্রদায়ের সেরূপ গ্রন্থকার আবির্ভূত হ'ন নাই। ইহার আচার্যদের অনেকেই ধর্মগুরু ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক ছিলেন, দার্শনিক চিন্তাধারায় ও আলোচনায় তত অনুরাগী ছিলেন না। এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মচিন্তার মূলভিত্তি দ্রাবিড়বেদ। ইহা প্রায় ৪ হাজার শ্লোকাত্মক ও দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত। পূর্ববর্তী বৈষ্ণব আলোয়ারগণও এই সব ঈশ্বরপ্রেম মূলক ভক্তি রসাত্মক পদের কর্তা। যামুনাচার্য ও রামানুজাচার্যই এই ভক্তি ধর্মকে দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপিত করেন এবং পরে বেদান্ত মহাদেশিক উহাকে আরও দৃঢ়তর করেন। শঙ্কর সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণ যেমন শঙ্করের মতের সহিত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কোন কোন স্থলে বিভিন্ন মতাবলম্বী, এই সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের মধ্যে সেরূপ মতদ্বৈধ বিশেষ নাই।

সুতরাং মাত্র রামানুজমত আলোচিত হইলে এই সকল আচার্যদিগেরই মত আলোচিত হইবে। এইবার সংক্ষেপে রামানুজের দার্শনিক মতবাদ আলোচিত হইতেছে।

রামানুজ দর্শন (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে (ক) বিষ্ণু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (খ) শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। দার্শনিক মতবাদ উভয়েরই প্রায় এক। এক সম্প্রদায় বিষ্ণুকে পরম পুরুষ ও অন্য সম্প্রদায় শিবকে পরমপুরুষ বিবেচনা করেন।

রামানুজাচার্যের মতে মৌলিক পদার্থ ৩টী (ক) চিৎ (জীব) (খ) অচিৎ (জড় বস্তু) (গ) ঈশ্বর বা পুরুষোত্তম। চিৎ---অনন্তজীবাত্মা, অচিৎ---জগৎ, এবং ঈশ্বর---অশেষ কল্যাণ গুণাকর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টিস্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ। এই অনন্ত জীব ও জগৎ যেন ঈশ্বরের শরীর। সুতরাং ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জীব জগৎ বিশিষ্ট। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যেমন 'বেল' বলিতে ইহার শাঁস ও খোসা দুই বুঝায় ঈশ্বরও তদ্রূপ জীব ও জগৎ বিশিষ্ট। তিনি সাকার ও নিরাকার উভয়ই। জল যেমন হিমের আধিক্যে জমিয়া বরফ হয় নিরাকার ঈশ্বরও তদ্রূপ ভক্তের ভক্তি হিমে সাকাররূপ ধারণ করেন।

সমগ্র রামানুজদর্শনে এই কয়টী বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে—(১) স্থুল-সূক্ষ্ম, চেতনাচেতন ব্রহ্মের একত্ব (২) দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতির অবিরোধ (৩) ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নির্বিশেষত্ববাদখণ্ডন (৪) ব্রহ্মের সগুণত্ব, বিভুত্ব ও বিশেষত্ববাদ প্রতিপাদন (৫) জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও দাসত্ব (৬) জীবের বন্ধন ও তাহার কারণ—অবিদ্যা (৭) জীবের মুক্তির কারণ—বিদ্যা ও উপাসনা (ভক্তি)। (৮) শঙ্কর মতের মায়াবাদ খণ্ডন ও অনির্বচনীয়বাদ খণ্ডন (৯) জগতের মিথ্যাত্ব খণ্ডন ও সত্যত্ব স্থাপন (১০) মুক্ত অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির নিরসন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

মনুর সমাজে নারীর স্থান

শ্রীকালিকাপ্রসাদ দত্ত, এম.এ.

মনু বলিয়াছেন—

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ (৩।৫৬)

অর্থাৎ যে পরিবারে নারীগণ সম্যক্‌ভাবে আদৃত হ'ন, দেবতাগণ তথায় প্রীত হ'ন; এবং যে স্থানে তাঁহাদের অনাদর হয়, সেই গৃহে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়া সমস্ত বিফলে যায়।

নারীজাতির প্রতি এতাদৃশ সম্মান বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থে নাই।

যে গৃহে নারীগণ দুঃখে কালযাপন করেন, মনুর মতে সেই পরিবার শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরন্তু যেখানে তাঁহারা সদা প্রফুল্ল থাকেন, সেই পরিবারে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। ('ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা'—৩।৫৭) সুতরাং যাঁহারা গৃহের শ্রীবৃদ্ধি-কামনা করেন, তাঁহারা যেন সর্বদাই স্ত্রীজাতির সমাদর করেন (৩।৫৯)।

উক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে মনুবর্ণিত সমাজ চিত্রে তদানীন্তন কালে নারীর স্থান অতি উচ্চে ছিল, তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হইতে পারে। ইহাতে আমরা কেবল একটী দিকের চিত্র প্রতিফলিত হইতে দেখি। উচিত বিচার করিতে হইলে অপর দিকও দেখা দরকার। দুই দিক নিরপেক্ষভাবে দেখিবার পর আমরা মনুবর্ণিত সমাজে নারীর প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে পারি। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন—নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু নাই। ('অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যা পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্'—৯।২) বালিকা হউক বা যুবতী বা বৃদ্ধাই হউক, স্ত্রীলোকের স্বাধীন সত্তা বলিয়া কিছু নাই। কন্যাবস্থায় পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অধীনে ইহাদের থাকিতে হইবে (৫।১৪৭)। মনু আরও নির্দেশ দিয়াছেন—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ (৯।৩)

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে পিতা রক্ষক, যৌবনে রক্ষা করেন স্বামী এবং বার্ধক্যে রক্ষক হইবে তাহার পুত্রগণ। কারণ স্ত্রীলোকেরা স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়।

ইহার পর নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

সামাজিক অন্যান্য কার্যকলাপেও নারীজাতির অধিকার সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

পুরুষদিগের ন্যায় জাতকর্ম ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপগুলি যথাক্রমে পালিত হইত। বলা বাহুল্য উক্তকার্যগুলিতে কোনরূপ মন্ত্র পাঠ হইত না। 'অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং' (২।৬৬) অর্থাৎ মন্ত্রহীন ক্রিয়া কলাপ সাধিতে হইবে। ইহা ভিন্ন 'নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মোব্যবস্থিতিঃ' (৯।১৮) অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের সংস্কারাদি কোন কার্যে মন্ত্র উচ্চারিত হইবে না, ইহাই শাস্ত্রবিধি ইত্যাদি। উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। স্ত্রীলোকদের 'উপনয়ন' নাই। কিন্তু মনু বলেন---

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া॥ (২।৬৭)

অর্থাৎ নারীদের বিবাহ কার্যই উপনয়নের তুল্য। পতিসেবা গুরুগৃহে বাসের ন্যায় এবং গৃহকর্মগুলি সায়ংকাল ও প্রাতঃকালীন অগ্নিপরিচর্যার তুল্য পরিগণিত হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে স্বামী-সেবা ও গৃহকর্ম সম্পাদন—নারীগণের ইহাই ছিল জীবনের একমাত্র কাম্য ও সাধ্য। অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহ করা ও প্রাতঃসন্ধ্যায় অগ্নি-পরিচর্যার মতই উক্ত দুটী কার্য পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামীসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের অন্য যজ্ঞ নাই। ('নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো'—৫।১৫৫)।

ইহা ব্যতীত, স্থানে স্থানে মনু নারীজাতির উপর নির্মমভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সমাজের চক্ষে ইহাদের নীচ এবং হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস মনু পাইয়াছেন। মনু বলেন, স্ত্রী জাতিকে কেহ কখন বলপূর্বক সৎপথে রাখিতে সমর্থ হয় না। 'ন কশ্চিদ্ যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম'—৯।১০) নারীগণ বিচার বুদ্ধিহীন, ও বয়োবিশেষেও ইহাদের উপর আস্থা রাখা উচিত নয়! ('নৈতংরূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ'—৯।১৪) নারীজাতির স্বভাবতঃই ভোগাভিলাষশীলতা হেতু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে; তৎজন্য পুরুষ জাতির এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য (৯।১৫,১৬)। পুরুষগণের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব ('স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্—২।২১৩)। স্মৃতি এবং শ্রুতি ইত্যাদি গ্রন্থে ইহাদের কোন অধিকার নাই (৯।১৮)। সন্তান-ধারণ করিবার জন্যই নারীর সৃষ্টি ('প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ'—৯।৯৬) এবং সন্তান-পালনই ইহাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ('জাতস্য পরিপালনম্'—৯।২৭)। এইরূপে বহুস্থলে নারী জাতির কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে মনুর নির্দেশ রহিয়াছে।

এখন সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে আমরা একই গ্রন্থে দুইটী ভিন্নমুখী ভাব ধারার পরিচয় পাই। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় যে কোন এক ব্যক্তিবিশেষের লেখনী প্রসূত চিন্তাধারার সমষ্টি মনুসংহিতা নয়। সম্ভবতঃ যুগে যুগে সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া বহু লেখক তাহাদের স্বীয় রচনা ও চিন্তাধারা মনু-লিখিত মূল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য যদি আমরা মনে করি যে তদানীন্তন কালের সমাজে নারীর স্থান নিম্নস্তরে ছিল, তাহা হইলে ঠিক বিচার হইবে না। তাহা হইলে, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'

(২।২৩৮) অথবা 'ইমং হি সর্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম মুত্তমম্' (৯।৬) ইত্যাদি বাক্যগুলি একেবারেই নিরর্থক হইয়া যায়।

পরিশেষে স্ত্রীধন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। মনুর মতে—

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃ-পিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥ (৯।১৯৪)

অর্থাৎ অধ্যগ্নি (কাত্যায়নের মতে বিবাহকালে প্রদত্ত যৌতুক), অধ্যাবাহনিক (কাত্যায়নের মতে পিতৃগৃহ হইতে আনীত যৌতুক), প্রীতিদত্ত (স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ধন) এবং মাতৃ পিতৃ ও ভ্রাতৃদত্ত যৌতুক এই ছয় প্রকার দান স্ত্রীধন নামে অভিহিত। এই ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন উত্তরাধিকার বিষয়ে দুইটী বিধি আছে—ব্রহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব এবং প্রাজাপত্য বিবাহে লব্ধ স্ত্রীধনে, কোন সন্তানাদি না থাকিলে—স্বামীর প্রথম অধিকার হয়। কিন্তু আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে লব্ধ ধনে কোন সন্তানাদি না থাকিলে অগ্রে মাতা এবং তৎপরে পিতার ন্যায্যদাবী প্রতিষ্ঠিত আছে।

(২)

কবি ভবভূতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আবির্ভাব কাল

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি.এল্

সংস্কৃত পাঠকমাত্রেরই নিকট কবি ভবভূতির নাম সুপরিচিত। তাঁহার রচিত 'বীরচরিতম্' বা 'মহাবীর চরিতম্', 'উত্তররামচরিতম্' ও 'মালতীমাধবম্'—যে তিনটী সংস্কৃত নাটক গ্রন্থ আমরা পাই, তাহাতে তাঁহার নাম চিরকাল অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার এই তিনটী নাটক গ্রন্থের প্রস্তাবনা হইতে তাঁহার জীবনীর ও বংশের সামান্য মাত্র পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তিনি যে কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ সকল গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাইবার উপায় নাই। মহাকবি কালিদাসের যুগ সম্বন্ধেও যেমন অনেক মত প্রচলিত আছে, ভবভূতির সময় সম্বন্ধেও নানাবিধ মত আছে। তাঁহার জন্মসময় সম্বন্ধে যে মতটী সাধারণতঃ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

'বীরচরিতম্' নাটকে তিনি যে নিজের আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত পদ্মপুর নগরে সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান্ কাশ্যপ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় সবিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবিও ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল নীলকণ্ঠ এবং পিতামহের নাম ভট্টগোপাল। তাঁহার মাতার নাম জাতুকর্ণী। তিনি জ্ঞাননিধির ছাত্র

ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল শ্রীকণ্ঠ। অনেকের মতে ভবভূতির প্রকৃত নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ। কিন্তু 'উত্তররামচরিত' নাটকেও দেখিতে পাওয়া যায়, 'শ্রীকণ্ঠ' তাঁহার উপাধিমাত্র। "অস্তি খলু তত্র ভবান্ কাশ্যপঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণ তত্বজ্ঞো ভবভূতির্ণাম জাতুকর্ণী পুত্রঃ।" স্বরচিত গ্রন্থ হইতে আমরা ভবভূতি সম্বন্ধে এইটুকু বিবরণ পাইয়া থাকি।

কবি ভবভূতির জন্মস্থানে যে ভগ্নস্তূপ আছে, তাহা এখন "প্রাচীন মনুমেন্ট্ সংরক্ষণ" আইনানুসারে ভারত-সরকার-কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। এই পদম্পুর বা পদ্মপুর গ্রাম এখন মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভাণ্ডারা জেলায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের আমগাঁ স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

কবির জন্মকাল সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কোন্ মতটী যে সঠিক তাহা স্থিরীকৃত করা বিশেষ দুরূহ। 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে কল্হন যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ভবভূতির কাল-সম্বন্ধে যে সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সঠিক বলিয়া মনে হয়। কল্হন হইতে আমরা জানিতে পারি যে কবি ভবভূতি পদ্মপুরের অধিবাসী হইলেও, তিনি কণৌজের রাজা যশোবর্মদেবের সভাসদ্ ও সভাকবি ছিলেন। যশোবর্মদেব কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের হস্তে পরাজিত হইলে, কবি ভবভূতি বিজেতা নৃপতির সহিত কাশ্মীরে গমন করেন এবং সেইখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। রাজা ললিতাদিত্য খ্রী° ৬৯৩ হইতে ৭২৯ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।[১] ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে কবি ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

অনেকে বলেন কবি ভবভূতি কুমারিল ভট্টের নিকটও কিছুদিন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।[২] কুমারিল ভট্টের সময় সপ্তম শতাব্দীতে[৩] নির্ধারিত হইলে, ভবভূতির জন্মকাল সহজেই সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

কেহ কেহ আবার মনে করেন যে ভবভূতি পঞ্চম শতাব্দীর কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনার ভঙ্গী ইত্যাদি হইতে তাঁহাকে পঞ্চম শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে করা যায় না। তাঁহার রচনাধারা পঞ্চম শতাব্দীর কবিগণের রচনার মত প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক নহে। ইহা সপ্তমশতাব্দীর লেখকগণের রচনারমত জটিল ও অস্বাভাবিক। ইহার দ্বারাও বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে কবি ভবভূতিরচিত গ্রন্থ সকল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রচিত হইয়া ছিল।

(১) ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। অনেকের মতে যশোবর্মদেব ৭৩৬ খৃঃ অঃ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হন।

(২) History of Sanskrit Literature—Sm. A. K Devi, p. 161.

(৩) The Indian Antiquary, Vol III.—Kalidas, Sri Harsha and Chand—By Kasinath Trimbak Telang. Bombay.

বিবিধ সংবাদ

(১)

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী—এই লাইব্রেরী লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের অন্তর্গত এবং ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে দুই লক্ষের অধিক মুদ্রিত পুস্তক (প্রাচ্যদেশ সংক্রান্ত) ও ১৫ হাজারের অধিক প্রাচ্য বিদ্যাবিষয়ক পুঁথি ও Xylographs আছে। সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি ভাষার পুঁথির যে মুদ্রিত তালিকা আছে তাহা প্রদত্ত হইতেছে—

(ক) সংস্কৃত (১) Mackenzie Collection—H. H. Wilson কৃত ২ খণ্ড।
(২) General Collection—J. Eggeling কৃত ও A. B. Keith কৃত।
(৩) Burnell Collection (বৈদিক গ্রন্থ)—A.C. Burnell কৃত।
(৪) Hodgson Collection—Sir W. W. Hunter কৃত।
(৫) Tagore Collection—S. M. Tagore কৃত—T. Aufrecht কৃত।
(৬) Buhler Collection—G. Buhler কৃত।
(৭) Royal Society Collection—C. H. Tawney and F. W. Thomas কৃত।
(৮) Aufrecht Collection—F. W. Thomas কৃত।
(খ) বঙ্গভাষা ও আসামী ভাষা—J. F. Blumhardt কৃত।
(গ) হিন্দুস্থানী ভাষা— ঐ কৃত।
(ঘ) পালিভাষা (ক) H. Oldenberg কৃত
ঐ (মান্দালয় হইতে) V. Fausboll কৃত।
(ঙ) জেন্দ ও পহ্লবীয়—M. N. Dhalla কৃত।

(২)

ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে নূতন তথ্য

হিন্দুদেবমন্দিরের পূজারীকে ঔরঙ্গজেব-কর্তৃক ভূমিদান—মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব এ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস লেখকগণ-কর্তৃক হিন্দু বিদ্বেষী ও হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দিরের ধ্বংসকারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু আসামের গৌহাটীর স্থানীয় বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ শর্মা কর্তৃক সম্প্রতি পারস্য ভাষায় লিখিত যে একটী দলিল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ঔরঙ্গজেবের বিষয়ে একটী নূতন আলোকপাত হইয়াছে। এই দলিলটী

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহণের নবমবর্ষের সফর মাসের দ্বিতীয় দিনের তারিখযুক্ত। এই তারিখ খ্রীস্টীয় ১৬৬৭ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের কোন তারিখে হইবে। এই দলিলে ঔরঙ্গজেব-কর্তৃক উমানন্দ নামক শিব মন্দিরের পূজারীকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই মন্দিরটী গৌহাটীর নিকটে ব্রহ্মপুত্রনদীর নিকটবর্তী একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

এই মন্দিরের পূজারী ছিলেন---সুদামা ও কামদেব, তাঁহাদিগকেই মোগল সম্রাট্ ভূমিদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও উক্ত মন্দিরের পূজারী আছেন। এই দলিলের ফটোগ্রাফ সহিত একটী বিবরণী আসাম উপত্যকার স্কুলসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গোস্বামী-কর্তৃক প্রকাশিত হইবে। এই দলিলের বিবরণ প্রকাশিত হইলে ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব সম্বন্ধে আবার নূতন গবেষণার বিষয় হইবে এবং তাহাতে ভারতের অজ্ঞাত ইতিহাসের আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(৩)

তমলুক আবিষ্কার—কৌশাম্বী যুগের প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তি

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত। এখানে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক শীঘ্রই খননকার্য আরম্ভ হইবে। কলিকাতাস্থ ভারতীয় যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারতপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ টি. এন্. রামচন্দ্রন্ গত ৬ই মে তারিখে তমলুক পরিদর্শন করিয়া কোন্ স্থানে খননকার্য করা হইবে তাহা ঠিক করিয়া আসিয়াছেন। আগামী শীত কালে কার্য আরম্ভ করা হইবে।

ইহার পূর্বে কোন স্থানীয় ভদ্রলোক এখানে কূপ খনন করিবার সময় তাহার ভিতরে দুইটী মৃন্ময় পাত্র ও কতকগুলি পুতুল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই জিনিষগুলি কৌশাম্বীযুগের জিনিষ বলিয়া অনুমান করা হয়।

স্থানীয় একটী বিদ্যালয়ে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা রক্ষিত ছিল। স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ, মিঃ রাম চন্দ্রন্‌কে এই মুদ্রাগুলি পরীক্ষার জন্য প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের কথা

ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের (League of Nations) সদস্য। ইহার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর ১৪ লক্ষ টাকা সংঘে চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু ইহার জন্য ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের নিকট হইতে বিশেষ উপকৃত হয় নাই। এই সব বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হলে একটি সাধারণ সভা হয়। কিভাবে কৃষ্টির দ্বারা একটী আন্তর্জাতিক সম্মিলন ও ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপিত হইতে পারে এবং জগতে শান্তি ও মৈত্রেয়ীর বাণী পুনঃ প্রচারিত হইতে পারে সে বিষয়ের বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। তারপর গত ১০ই মে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে লর্ড সিংহের সভাপতিত্বে International Federation of Culture (আন্তর্জাতিক কৃষ্টিসংঘ) স্থাপিত হয়। আগামী ১৫ই মে তারিখে এই সংঘের নূতন মাসিক পত্রিকা India and the World প্রকাশিত হইবে। বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ লইয়া এই সংঘের কার্যকারী সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সেবাব্রত, মহিলা-আন্দোলন, ছাত্র-সংঘঠন প্রভৃতি বহু কার্যসূচী পরিকল্পিত হইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের ভারতীয় শাখারূপে ইহা পরিগণিত হয় তাহারও চেষ্টা হইবে।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি ও দেশবাসীদের এইকার্যে যোগদান আশা করি।

* * * *

ইউরোপের সমরানল ক্রমশঃই বিপুলবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বহুদেশকে গ্রাস করিতেছে। কত রাষ্ট্র ধ্বংস হইল, কত নরনারী ও শিশু অকাল মৃত্যু—নৃশংসমৃত্যু বরণ করিল। এই ধ্বংসলীলার অবসান কোথায়? মানব কি সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে? ভারতের সাম্য, করুণা, মৈত্রেয়ী ও শান্তির অমৃত বাণী কি ইউরোপে প্রবেশ করিবে?

* * * *

গত বৈশাখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। বিভিন্ন স্থানে তাঁহার জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। যেন তিনি দেশের বর্তমান দুর্দিনে তাঁহার বাণী দেশকে শুনাইয়া আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক কলহ নিরাশনের ব্যবস্থা করেন।

* * * *

বর্তমান সময়ে যখন যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য বিদেশীয় পণ্যদ্রব্য আমদানির অভাব অনুভূত হইতেছে, তখন দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট National Planning Committee গঠন করিয়া দেশীয় বিভিন্ন শিল্প ও কারখানা স্থাপনের অনেক প্রস্তাব করিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন একটী কারখানাও এখন পর্যন্ত স্থাপিত হইল না।

পুস্তক সমালোচনা

What is Hinduism (হিন্দু ধর্ম কি ?) Pachaiyappa's College এর অধ্যক্ষ ডি, এস, শর্ম্মা লিখিত। পাতা সংখ্যা ১—১৩৬। মান্দ্রাজে সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকার অল্প কথায় হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে উপক্রম ও উপসংহার বাদে ৫টি অধ্যায়ে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, হিন্দুর নিত্য কর্তব্য, হিন্দু দর্শন ও হিন্দুর নীতি শাস্ত্রের ও হিন্দু সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এত অল্পের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মত একটি বিরাট ধর্মের বিষয় সমালোচনা দুরূহ হইলেও গ্রন্থকার সাধারণ যুবকগণের জন্য ইহা লিখিয়া বিশেষ ধন্যভাজন হইয়াছেন। তাহার নিজের কথাতেই আছে যে বর্তমান গ্রন্থখানি College Text Book হিসাবে লিখিত। সুতরাং ইহাতে বিস্তৃত আলোচনা আশা করা যায় না। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। তবে গ্রন্থকারের সহিত আমরা দুই একস্থলে একমত হইতে পারি নাই। তিনি বর্তমান জাতি বিভাগকে বর্ণাশ্রমধর্মের জাতিবিভাগ বলিয়া স্বীকার করেন না। কেন করেন না তাহার যুক্তি দেন নাই কেবল উল্লেখই করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহার হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মতেরই অনুকরণ, সুতরাং ঐ স্থানগুলি অস্পষ্ট। মোটের উপর গ্রন্থখানি ভালই হইয়াছে। আমরা হিন্দুধর্মে অনুরাগী ব্যক্তিগণকে পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীনলিন বিহারী বেদান্ততীর্থ

"শরৎ সাহিত্যে পতিতা"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী, এম-এ, পি-আর-এস্ প্রণীত ; প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা ; পৃঃ ১১৮, মূল্য ১।০।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের ইতিহাস-চর্চার খ্যাতিই এ যাবৎ শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি যে বাঙ্গালা কথা সাহিত্যের প্রতিও আসক্ত, একথা আগে জানা ছিল না। মানব চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

তাঁহার 'শরৎ সাহিত্যে পতিতা'র সাবলীল ভাষা ও সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে তাঁহার এই আসক্তি ক্ষণিকেরও নহে, আকস্মিকও নহে, বহুদিনের পুরাণো। কিন্তু তাহা হইলে এতকাল তিনি বাঙ্গালা কথা সাহিত্যের দিকে সুনজর দেন নাই কেন ?

'শরৎ সাহিত্যে পতিতা'কে এই দিনে সাধারণের সমক্ষে বাহির করিবার অধ্যাপক মহাশয়ের একটা কৈফিয়ৎ আছে। গ্রন্থের 'প্রযোজনা'য় সেই কথাই পাই, "শরৎচন্দ্রকে নতুনরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস চলিতেছে। যদি এই ভাবে আরও কিছুকাল চলে, তবে

হয়ত সত্যিকার মানুষ শরৎচন্দ্র অস্তমিত হইয়া যাইবে। আমরা কল্পিত শরৎচন্দ্রকে দেখিব।" ইহা একান্তভাবে ঐতিহাসিক মনের প্রবল সত্যনিষ্ঠার নিঃস্বার্থ অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ ইহ অসার খলু সংসারে ঐতিহাসিকের প্রয়োজন পদে পদে, ইতিহাসানুরক্তকে বাদ দিলে সংসার ও সমাজ দুই-ই বিকৃতির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 'মানুষ'-শরৎচন্দ্রকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য ঐতিহাসিক মাখনবাবু কম আয়াস স্বীকার করেন নাই। মনে হয়, 'শরৎ সাহিত্যে পতিতা'কে প্রকাশ করার মুখ্য উদ্দেশ্যই ইহা। 'প্রয়োজনায়' ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের কতগুলি অজ্ঞাত তথ্য আছে, সেগুলি 'মানুষ' শরৎচন্দ্রকে মরিতে না দিতে অবশ্যই সাহায্য করিবে। কিন্তু 'মানুষ'টিকে সুস্থ ও সবল দেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আরও তথ্যের প্রয়োজন। ভরসা করি, মাখনবাবু সার্ধ চারিকোটি নরনারীর স্ফুট ও অস্ফুট অনুরোধে ও কৌতূহলের খাতিরে সে সকল তথ্য আহরণে ব্যাপৃত থাকিতে লজ্জাবোধ করিবেন না।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, পুস্তকখানির নামকরণ 'শরৎ সাহিত্যে পতিতা' না হইয়া 'শরৎ সাহিত্যে নারী' হইলে অধিকতর শোভন হইত কিনা। কিন্তু 'পতিতা' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে গ্রন্থকার সুস্পষ্ট হেতুনির্দেশ করিয়াছেন, 'পতিতা' শব্দটী সামাজিক অর্থে গৃহীত হইয়াছে। 'পতিতা' হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিতে 'সতী' শব্দের বিপরীত অর্থবোধক পরিভাষা।......দেহ কিংবা মন কোনটীই হিন্দুনারীর পক্ষে পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। মনে মনেও যদি বিবাহিতা হিন্দুনারী পরপুরুষকে কল্পনা করে, তবু সে পতিতা। এই অর্থে 'পতিতা' শব্দ ব্যবহৃত হইল।

এই গ্রন্থের যিনি ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার এই সকল তত্ত্ব-কথা পছন্দ হয় নাই। তাঁহার মতে, "কোন নারী সামাজিক অর্থে পতিতা কি অ-পতিতা তাহা সাহিত্যিকের নিকটে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার।" অকিঞ্চিৎকর এখনও ঠিক হয় নাই, তবে যে রেটে এই সমস্ত 'সাহিত্যেক'দের চোখে, মুখে ও কলমে প্রায় সকল নারীই একাকার হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ভরসা হয়, ব্যাপারটা অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিতে আর বেশী দেরীও নাই। কিন্তু এই সকল ঘরোয়া গোপন কথা অধ্যাপক মাখনবাবুর ন্যায় বেরসিক অ-সাহিত্যিকের গ্রন্থে কেন ?

গ্রন্থকার 'শরৎ সাহিত্যে'র পতিতাদিগকে মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীবিভাগ যেমন সমীচীন, তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণও তেমনই নিপুণ হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থে অনেকগুলি ছাপার ভুল আছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে "শরৎ সাহিত্যে পতিতা' পরিশোধিত তথা পরিবর্ধিত কলেবর দেখিতে পাইব।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

নূতনগ্রন্থ সংবাদ

প্রত্নতত্ত্ব

১। Japanese Sculpture—S. Noma. Trans. by M. G. Mori.

২। East Indian Sculpture—Dating from the first Century of Christian Era to the eighteenth Century.

ইতিহাস

৩। A'in-i Akbari—By Abu'l-Fazl' Allami, Translated from the Original Persian by H. Blochmann, M. A., Second edition, revised by D. C. Phillot, M. A. Vol I.

৪। The Akbarnāma—A History of the reign of Akbar, including an account of his predecessors of Abul-l-Fazl. Translated from the Persian by H. Beveridge. Vol III.

৫। Madras Tercentenary Commemoration Volume.

ধর্ম ও দর্শন

৬। মনুস্মৃতি—মেধাতিথি মনুভাষ্যসমেত। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক সম্পাদিত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

৭। Aims and Ideals of Ancient Indian Culture—by Prof. B. Ray.

৮। The Education of India. History and Problems—by T. N. Siqueira.

সাহিত্য

৯। Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Collection of the Royal Asiatic Society of Bengal. Edited by Chintaharan Chakravarti M. A. Vol VIII. Part I. Tantra Manuscript.

১০। রত্ন সমুচ্চয়—A classified Catalogue of Sanskrit Works published in India and abroad—By M. C. L. Das. Third Edition.

পুরাতন পত্রিকা*

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি. এল্ কর্তৃক সঙ্কলিত

The Journal of Indian History, Vol. VIII, 1929

Antiquity of the Puranic Story Traditions.

—By Sashi Bhusan Chaudhuri, Dacca University.

পৌরাণিক কাহিনী সকলের প্রাচীনত্ব বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনা। প্রাচীনযুগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের পুরাণের মধ্যে দেখিতে হইবে। পুরাণ শব্দ প্রথমে অথর্ববেদের দুইটী ঋকে দৃষ্ট হয়। বৈদিক কাহিনীসকল পুরাণগুলিতে কিরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে প্রবন্ধকার বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

Some Side-light on the Character and Court-life of Shah Jahan

—By K. R. Qanungo.

মোগল সম্রাট সাজাহানের চরিত্র ও রাজ্যশাসন প্রণালীর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

Relations between the Hindus and the Mahammadans of Bengal in the middle of the Eighteenth Century (1740-1765) By Kali Kinkar Datta, M.A., Patna College, Patna.

উক্ত প্রবন্ধে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিরূপ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* গত সংখ্যায় The Indian Antiquary Vol III পর্যন্ত বিষয় সূচী প্রকাশ শেষ হইয়াছে। শ্রীভারতীর ১৩৩৬ সালের মাঘসংখ্যা অবধি The Journal of Indian History, Vol VII পর্যন্ত বিষয়সূচী প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাময়িক সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩৪৭

ধর্ম্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—নারদের ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রেমঘনানন্দ।

" —শ্রীকৃষ্ণের পূজা পার্বণের কাল—অধ্যাপক শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ,

" ঋভু—শ্রীকালীচরণ শাস্ত্রী এম-এ।

উদ্বোধন—ত্যাগ দ্বারা ভোগ কর—স্বামী রমানন্দ।

" —চরমতত্বে শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী, পি-এইচ্-ডি পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ।

" —পঞ্চদশী—পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রবর্ত্তক—গীতায় কর্ম্মবাদ—শ্রীমতিলাল রায়।

উদয়াচল—গীতায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন।

" —প্রেমতত্ব—অধ্যাপক শ্রীজানকী বল্লভ ভট্টাচার্য এম-এ।

শিবম্—পদ্মপাদ ও বেদান্ত—অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, এম-এ,-পি-আর-এস, পি এইচ্ ডি।

" —বিচার ও নির্গুণ উপাসনা—শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়।

" —শিবলিঙ্গ—মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি।

সাহিত্য

ভারতবর্ষ—চারি শতাধিক বৎসর পূর্বের নাট্যাভিনয়—অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু এম-এ।

" —উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব—রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

উদ্বোধন—বঙ্কিমচন্দ্রের উপকথায় ইন্দ্রিরা, রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ, পি-আর-এস্

প্রবর্ত্তক—বাংলার অভিনব আদি লিপিতত্ব—শ্রীহরিদাস পালিত, বিদ্যাবিনোদ।

বঙ্গশ্রী—বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা—শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ

ভারতবর্ষ—ভারতের জাতীয় উন্নতি—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবর্ত্তক—ঋণ-তত্ব—শ্রীমতিলাল দাশ।

বঙ্গশ্রী—বিচিত্র আকারের মন্দির—শ্রীরমেশ বসু।

উদয়াচল—বিজ্ঞানের স্বরূপ—শ্রীপূর্ণেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এম-এস-সি

শিবম্—ক্রমবিকাশ—ডাক্তার শিবদাস সুর, এম্-বি।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা—অধ্যাপকশ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্. এ

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

৪৬শ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা

সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ্-ডি।

'দুর্গেশ নন্দিনী'তে ইতিহাস—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমীর খুস্রু-কৃত 'দবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পি-এইচ-ডি।

দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক যুগের ভাষা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি।

তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৮)—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাময়িক সংবাদ

বিজ্ঞান মিউজিয়াম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা কর্পোরেশনের সহযোগিতায় একটি বিজ্ঞান মিউজিয়াম সংগঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে বিজ্ঞান কলেজে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র স্বরূপে এই ধরণের মিউজিয়াম আছে। বিজ্ঞান চর্চায় কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই চেষ্টা সার্থক হইলে জন সাধারণের বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ট হইবে ও বৈজ্ঞানিক চর্চারও সুবিধা হইবে।

মিউজিয়াম পরিচালনা শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী জুলাই মাসে মিউজিয়ামপরিচালনা শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত আশুতোষ মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধানে একটী ক্লাস খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ক্লাসে ৬ মাস যাবৎ শিক্ষা দেওয়া হইবে। মিঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং এই বিষয়ে আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করা হইবে। ইহাতে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে (১) মূর্তি বিশ্লেষণ, (২) মূর্তির শ্রেণী বিভাগ, (৩) মূর্তি প্রদর্শনের কৌশল (৪) মূর্তির ক্যাটালগ করা (৫) মূর্তি

রাখিবার উপায় ও পরিষ্কার করা ইত্যাদি। বর্তমান বর্ষে ১২ জন ছাত্র লইয়া ক্লাস খোলা হইবে।

ভারত সম্বন্ধে নূতন ভারত সচিবের অভিমত—২৩ শে মে কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে নূতন ভারত সচিব মিঃ এল, এস আমেরী জানান যে, ভারতে বর্তমান অচল অবস্থা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নীতি এখন বলবৎ রহিয়াছে। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষ কর্তৃক ব্রিটেন কমন ওয়েলথ এ স্বাধীন ও সমঅংশদারীলাভই ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য।

ভারতীয় সৈন্যদল গঠন—৩১ শে মে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যর রবার্ট ক্যাসেলস্ এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে ভারতের স্থায়ী সেনাদলের জন্য আরও একলক্ষ বা ততোধিক লোক সংগ্রহ করা হইবে; এবং ভারতীয় বিমান বহরের আয়তন বর্তমানের চতুর্গুণ করা হইবে।

কলিকাতায় ডাঃ হোরেশ আই পোলম্যান—ডাঃ পোলম্যান ওয়াশিংটনের কংগ্রেস পাঠাগারের ভারতীয় শাস্ত্রশাখার ডিরেক্টর (Director of Indian studies in the Library of Congress, Washington). তিনি কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া, বিভিন্ন পাঠাগার বা পরিষদে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিপি গ্রন্থ আছে microfilms সাহায্যে সেই সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি গ্রহণ করিতেছিলেন। উক্ত কার্যব্যাপারে তিনি দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

শোক সংবাদ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন। গত ৩রা মে শুক্রবার রাত্রি ১০টা ২০ মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভারতের সর্বপ্রথম আই-সি-এস্ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ছিলেন। বীমাজগতে তাঁহার একনিষ্ঠতা ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়েও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি কবীন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ | একাদশ সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদোপনয়ন

কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ

উপ-ব্রহ্মণঃ সমীপে নয়নং প্রাপণম্—অর্থাৎ যাহাদ্বারা ব্রহ্মসকাশে লইয়া যাওয়া যায়, তাহার নাম উপনয়ন। ব্রহ্মসকাশে উপনীত হইতে হইলে বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন করিলে জ্ঞান হয়, জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞানের সীমা নাই এবং অন্ত নাই। ব্রহ্মেরও সীমা নাই এবং অন্ত নাই। অতএব জ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপ।

ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে হইলে বেদ, উপবেদ প্রভৃতি সবই অধ্যয়ন করিতে হয়। বেদ চতুর্বিধ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। আয়ুর্বেদ-অথর্ববেদের উপাঙ্গ[১]। অতএব আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে উপনীত হইতে হয়, কারণ অনুপনীতের বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই।

অনুপনীতের যেমন বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই, তেমনই উপনয়নের অধিকারও সকলের নাই। সেজন্য বলা হইয়াছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে যে কোন বর্ণীয় শিষ্যকে আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত উপনীত করিবে।[২] সুশ্রুত কিন্তু বলিয়াছেন আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত কেহ কেহ কুলগুণ সম্পন্ন শূদ্রকেও গ্রহণ করিতেন এবং তাহাকে উপনীত করাও হইত, কিন্তু সে উপনয়নে কোন মন্ত্রাদির প্রয়োগ ছিলনা, কাজেই তাহাতে হোমাদি যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত না[৩]।

উপনয়ন দিবার অধিকার,—ব্রাহ্মণ তিনবর্ণেরই শিষ্যের উপনয়ন দিতে পারিতেন।

১। "ইহ খলু আয়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ববেদস্য"—সুশ্রুত-সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।
চতুর্ণামৃক্সামযজুরথর্ববেদানামথর্ববেদেহস্যোক্তিঃ ॥
অগ্নিবেশসংহিতা—সূত্রস্থান ৩০ অ°

২। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামন্যতমং * * * শিষ্যমুপনয়েৎ।

৩। "শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জমুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে।" সুশ্রুত-সূত্র—২অ°।

ক্ষত্রিয় স্বীয়বর্ণের ও বৈশ্য শিষ্যের এবং বৈশ্য বৈশ্য-শিষ্যেরই উপনয়ন দিতে পারিতেন ১। অতএব প্রাচীনকালে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের যেমন আয়ুর্বেদে উপনয়নের অধিকার ছিল, তেমনই ইহাদের আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেও অধিকার ছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার থাকিলেও অধ্যাপক হইতে হইলে কতকগুলি গুণের আবশ্যক ছিল,—নতুবা বর্ণ দ্বারা অধ্যাপনার অধিকার তিনবর্ণেরই থাকিলেও সকলেরই আচার্য বা অধ্যাপক হইবার অধিকার ছিল না। সেজন্য মহর্ষি অগ্নিবেশ আচার্যকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন—

আচার্য এতাদৃশ গুণবান হওয়া আবশ্যক, যথা—অধীতশাস্ত্রে যাঁহার সুনির্মলজ্ঞান বেদোক্ত কর্ম সকল স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সেই সকল কর্ম সম্পাদনে নিপুণ, দাক্ষিণ্য-বিশিষ্ট, শুচি, ক্ষিপ্রহস্ত, অধ্যাপনার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সে সকল উপকরণ যাঁহার আছে, সকল ইন্দ্রিয়গুলি যাঁহার অক্ষুণ্ণ, বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রকৃতির তত্ত্ববিৎ, শাস্ত্র ও কর্মের সিদ্ধান্ত যাঁহার অবগত, বহুপ্রকার বিদ্যায় অভিজ্ঞ, অসূয়া ও ক্রোধশূন্য, ক্লেশ সহিষ্ণু, শিষ্যবৎসল, অধ্যাপনাকার্যে সুনিপুণ এবং অধ্যাপ্যবিষয় যিনি শিষ্যকে উত্তমরূপে বোধগম্য করাইয়া দিতে সমর্থ—তিনিই আচার্য বা অধ্যাপক হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন ২। আর,—

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বা বর্ণ চতুষ্টয়ের আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের অধিকার থাকিলেও অধ্যয়ন করিবার যোগ্যতা সকলের ছিল না। যোগ্যতার জন্য শিষ্যকে পরীক্ষা করা হইত এবং সেই পরীক্ষায় যদি শিষ্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তবেই তাহাকে উপনীত করিয়া আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করান হইত।

যেরূপ বা যে সকল গুণ থাকিলে, আয়ুর্বেদে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা হইত, তাহা যথা,—প্রশান্ত, আর্যপ্রকৃতি, অক্ষুদ্রকর্মা অর্থাৎ নীচকর্ম যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না, চিত্তবৃত্তি যাহার উদার, মুখ, চক্ষুঃ ও নাসিকা যাহার সরল, জিহ্বা তনু অর্থাৎ পাতলা ও নির্মল, দন্ত ও ওষ্ঠ বিকৃতিশূন্য, ধৃতিমান্, নিরহঙ্কার, মেধাবী, তর্কশক্তি ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, উদারপ্রকৃতি, আয়ুর্বেদবিৎ-কুলে জাত অথবা আয়ুর্বেদবৃত্তি দ্বারা যাহারা জীবন যাপন করে, চিন্তাশীল, সর্বাঙ্গসম্পন্ন, অবিকৃতাস্ত্রিয়, বিনীত, অনুদ্ধত, অব্যসন অর্থাৎ কোন

১। ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি, রাজন্যো দ্বয়স্য, বৈশ্যো বৈশ্যস্যোবেতি।"

সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান ২য় অধ্যায়।

২। "আচার্যং পরীক্ষেত। তদ্‌যথা,—পর্যবদাতশ্রুতং পরিদৃষ্টকর্মাণং দক্ষং দক্ষিণং শুচিং জিতহস্তং উপকরণবন্তং সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্নং প্রকৃতিজ্ঞং প্রতিপত্তিজ্ঞমনুপস্কৃতবিদ্যমনহঙ্কৃতমনসূয়কমকোপনং ক্লেশক্ষমং শিষ্যবৎসলমধ্যাপকং জ্ঞাপনসমর্থঞ্চেতি।"

চরকসংহিতা-বিমানস্থান ৮ম অধ্যায়।

প্রকার কদভ্যাস যাহার নাই, সুশীল, শুচি, অধ্যয়নে যাহার অনুরাগ আছে, দক্ষ, দয়াদাক্ষিণ্যযুক্ত, অধীত বিষয়ের অর্থ পরিজ্ঞানে ও কর্ম দর্শনে অভিনিবিষ্ট, অলুব্ধ, অনলস, সর্বজীবের হিতৈষী, আচার্যের আজ্ঞাবহ ও আচার্যের প্রতি অনুরক্ত, এতাদৃশ গুণসম্পন্ন শিষ্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়নে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত ১। এবং ইহার বিপরীতগুণসম্পন্নকে গ্রহণ করা হইত না ২।

শিষ্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহার উপনয়ন দেওয়া হইত। উপনয়ন কার্য,—উত্তরায়ণে, শুক্লপক্ষে, শুভদিনে অর্থাৎ যেদিনে ভগবান্ চন্দ্রমা,—পুষ্যা, হস্তা, শ্রবণা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে সমাগত হইতেন, সেই দিনে সম্পাদিত হইত। উপনয়ন দিবার পূর্বে আচার্য শিষ্যকে আদেশ করিতেন—তুমি উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য মস্তক মুণ্ডন করিবে ও উপবাসী থাকিবে, তারপর ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ, অগ্নি, ঘৃত, উপলেপন, সুগন্ধমাল্য, জলকলস, দীপ, হিরণ্য, রজত মণি, মুক্তা, প্রবাল, পট্টবস্ত্র, কুশ, লাজ (খৈ) সর্ষপ, আতপতণ্ডুল, গ্রথিত ও অগ্রথিত শুক্লপুষ্প, পবিত্রভোজ্য ও ঘৃষ্ট চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া আমার নিকটে আসিবে ৩।

শিষ্য গুরুর আদেশমত দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলে,—আচার্য সমতল পবিত্র যজ্ঞস্থানে শিষ্যকে পূর্ব্ব অথবা উত্তরমুখে উপবেশন করিতে বলিতেন। শিষ্যের সম্মুখে চতুর্হস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণ যজ্ঞবেদী গোময়ের দ্বারা লিপ্ত থাকিত এবং তাহার উপরে কুশ বিছাইয়া দেওয়া হইত ও সেই যজ্ঞবেদীতে শিষ্যকর্তৃক আনীত দ্রব্যসকল যথাযথ স্থানে স্থাপন করা হইত। তারপর পলাশ, ইঙ্গুদী, উড়ুম্বর ও যষ্টিমধু প্রভৃতি কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আচার্য পূর্বমুখে শুদ্ধভাবে অধ্যয়নবিধি বিধানপূর্ব্বক তিন তিনবার ঘৃত ও মধু যোগে অগ্নিতে আহুতি দিতেন। ৪। আহুতি দানের পর আশীর্বচনসংপ্রযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ,

১। "আচার্যঃ শিষ্যমেবাদিতঃ পরীক্ষেত। তদ্‌যথা,—প্রশান্তমার্যপ্রকৃতিকমক্ষুদ্রকর্মাণমৃজুচক্ষুর্মুখনাসাবংশং তনুরক্তবিশদজিহ্বমবিকৃতদন্তৌষ্ঠং ধৃতিমন্তমনহঙ্কৃতং মেধাবিনং বিতর্কস্মৃতিসম্পন্নমুদারসত্ত্বং তদ্বিদ্যকুলমথবা তদ্বিদ্যবৃত্তং তত্ত্বাভিনিবেশিনমব্যঙ্গমব্যাপন্নেন্দ্রিয়ং নিভৃতমনুদ্ধতমর্থতত্ত্ব ভাবকমকোপন মব্যসনিনং শীলশৌচাচারানুরাগদাক্ষ্যপ্রদক্ষিণ্যো-পন্নমধ্যয়নাভিকামমর্থবিজ্ঞানে কর্মদর্শনেচানন্যকার্য্যমলুব্ধমনলসং সর্ব্বভূতহিতৈষিণমাচার্যঃ সর্বানুশিষ্টপ্রতিপত্তিকরমনুরক্ত-মেবংগুণসমুদিতমধ্যাপ্যমমাহুঃ।" চ, বি, ৮ অ.

২। "অতো বিপরীতগুণং নোপনয়েৎ"। সু. সূ. ২ অ.

৩। "উদগয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেঽহনি তিষ্যহস্তশ্রবণাশ্বযুজান্যতমেন নক্ষত্রে যোগমুপগতে ভগবতি শশিনি কল্যাণে কল্যাণেচ করণে, মৈত্রে মুহূর্ত্তে কৃতস্নানঃ মুণ্ডঃ কৃতোপবাসঃ কষায়বস্ত্রসংবীতঃ সমিধোঽগ্নিমাজ্যমুপলেপনমুদকুম্ভাংশ্চ সুগন্ধিহস্তো মাল্যদানদীপহিরণ্যরজতমনিমুক্তাবিদ্রুমক্ষৌমপরিধীংশ্চ কুশলাজ-সর্ষপাক্ষতাংশ্চ শুক্লাশ্চ সুমনসো গ্রথিতাগ্রথিতা মেধ্যাংশ্চ ভক্ষ্যান্ গন্ধাংশ্চ ঘৃষ্টানাদায়োপতিষ্ঠস্বেতি।" চ, বি. ৮ অঃ ৭।

৪। 'তমুপস্থিতমাজ্ঞায় সমে শুচৌ দেশে প্রাক্‌প্রবণে উদক্‌প্রবণে বা চতুষ্কিষ্কুমাত্রং চতুরস্রং স্থণ্ডিলং গোময়োদকেনোপলিপ্তং কুশাস্তীর্ণং যথোক্তচন্দনোদকুম্ভক্ষৌমহেমরজতমণিমুক্তাবিদ্রুমালংকৃতং মেধ্যভক্ষ্যগন্ধশুক্লপুষ্পলাজ-সর্ষপাক্ষতোপশোভিতং কৃত্বা তত্র পলাশীভিরৈঙ্গুদীভিরৌড়ুম্বরীভির্মাধুকীভির্বা সমিদ্ভিরগ্নিমুপসমাধায় প্রাঙ্‌মুখঃ শুচিরধ্যয়নবিধিমনুবিধায় মধুসর্পির্ভ্যাং ত্রিস্ত্রির্জুহুয়াদগ্নিম্। চ. বি. ৮ অ.।

অগ্নি, ধন্বন্তরি, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও সূত্রকার মহর্ষিগণকে অভিমন্ত্রিত করিয়া স্বাহা শব্দের দ্বারা হোম করিতেন আর শিষ্যকেও সেই সঙ্গে স্বাহা শব্দের দ্বারা গুরুর অনুসরণ করিতে বলিতেন অর্থাৎ শিষ্যকেও সেইসঙ্গে অভিমন্ত্রিতগণের হোম করিতে হইত। হোমের পর অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিতে হইত এবং বৈদ্যগণেরও পূজা করিতে হইত[১]।

অনন্তর আচার্য শিষ্যকে অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের সমীপে অনুশাসন করিতেন। আচার্যের অনুশাসন-বাক্য সকল যথা,—

তুমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবে। শ্মশ্রু ধারণ করিবে। সত্যকথা বলিবে, নিরামিষ ও পবিত্র দ্রব্যসকল ভোজন করিবে, কাহারও ঐশ্বর্য দেখিয়া ঈর্ষা করিবে না, শস্ত্র ধারণ করিবে না। আমার আদেশে তোমার অকার্য বলিয়া কিছু থাকিবে না, অর্থাৎ আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহাই তুমি করিবে। তবে আমি যদি এমন কোন আদেশ করি,—যাহাতে রাজবিদ্বেষ, প্রাণহরণ, বিপুল অধর্ম বা মহদনিষ্ট হইতে পারে,—তাহাহইলে তুমি সে সকল কার্য করিবে না। তদ্ভিন্ন তোমার যাহা কিছু, সে সকল আমাকে অর্পণ করিবে, আমাকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে, আমার অধীন হইবে এবং সর্বদা আমার হিতকর কর্ম সম্পাদন করিতে থাকিবে। পুত্রের মত, দাসের মত, প্রার্থীর মত আমার অনুসরণ করিবে। আমি যাহা আদেশ করিব, তাহা তুমি শান্তচিত্তে অবহিত হইয়া পালন করিবে। আমার আদেশ পালনের সময় অন্যমনস্ক হইবে না, বিনীত ভাবে নিপুণতার সহিত সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া অসূয়াশূন্য হইয়া আমার অনুমত কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিবে। আমার আদেশ লইয়া তুমি সর্বত্র গমন তো করিবেই, যদি কোন দিন আমার আদেশ ব্যতিরেকেই তোমাকে কোথাও কিছু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাইতে হয় তো, সেখানে সর্ব প্রথমে আমার প্রয়োজনসিদ্ধি করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিবে[২]।

যদি তুমি কর্মসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি, যশোলাভ ও মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ কামনা কর, তাহা হইলে, গো এবং ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিবে এবং সকল জীবের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিবে।

১। "আশীর্বচনসম্প্রযুক্তৈর্মন্ত্রৈব্রাহ্মণমগ্নিং ধন্বন্তরিং প্রজাপতিমশ্বিনাবিন্দ্রমৃষীংশ্চ সূত্রকারানভিমন্ত্রায়মানঃ পূর্বং স্বাহেতি শিষ্যশ্চৈনমন্বারভেত। হুত্বা চ প্রদক্ষিণমগ্নিমুপক্রামেত। ততোঽনুপরিক্রম্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ; ভিষজশ্চাভিপূজয়েৎ॥ চ. বি. ৮ অ.

২। "অথৈনমগ্নিসকাশে, ব্রাহ্মণসকাশে, ভিষক্‌সকাশে চানুশিষ্যাৎ,—ব্রহ্মচারিণা শ্মশ্রুধারিণা সত্যবাদিনা-ঽমাংসাদেন মেধ্যসেবিনা নির্মৎসরেণাশস্ত্রধারিণা ভবিতব্যম্। ন চ তে মদ্বচনাৎ কিঞ্চিদকার্যং স্যাদন্যত্র রাজদ্বিষ্টাৎ প্রাণহরাদ বিপুলাদধর্মাদনর্থপ্রযুক্তাদ্বাপ্যর্থাৎ। মদর্পণেন মৎপ্রধানেন মদধীনেন মৎপ্রিয়হিতানুবর্তিনা চ ত্বয়া শশ্বদ্ভবিতব্যম্। পুত্রবদ্দাসবদর্থিবচ্চোপচরতানুসর্তব্যোঽহম্। অনুৎসুকেনাবহিতেনানন্যমনসা বিনীতেনাবেক্ষ্যাবেক্ষ্যকারিণানসূয়কেন চাভ্যনু জ্ঞাতেনপ্রবিচরিতব্যম্। অনুজ্ঞাতেন চাননুজ্ঞাতেন চ প্রবিচরতা পূর্বং গুর্বর্থোপাহরণে যথাশক্তি প্রবিচরিতব্যমিতি। চ, বি, ৮ অ

সর্বদা উঠিতে বসিতে কায়মনোবাক্যে আতুরগণের আরোগ্যের জন্য যত্ন করিবে। জীবিকার জন্যও রোগীদিগের সহিত দ্রোহ করিবে না। মনেও কখন পরস্ত্রীর সঙ্গ কামনা করিবে না এবং পরদ্রব্যের প্রতি লোভ করিবে না। তোমার বেশ ও পরিচ্ছদাদি শুভ্রশান্ত হইবে। মদ্যপান করিবে না। কোন পাপ আচরণ করিবে না বা পাপীর সঙ্গ করিবে না। তোমার বাক্য মৃদু মধুর, সরল, সুন্দর, ধর্মসঙ্গত, কল্যাণজনক, সত্য, হিত ও পরিমিত হইবে। দেশকাল বিচার করিয়া ও স্মৃতিমান্ হইয়া জ্ঞান, অভ্যুদয় ও উপকরণ সংগ্রহে নিত্য যত্নশীল হইবে[১]।

যাহারা রাজার সহিত শত্রুতা করে বা রাজার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যাহারা মহাপুরুষগণের সহিত শত্রুতা করে বা মহাপুরুষগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহাদিগের কখনও চিকিৎসা করিবে না। এইরূপ যাহারা অত্যন্ত বিকৃত, দুষ্ট, দুরাচার, পরাপকারক ও অপবাদকে ভয় করে না, তাহাদেরও চিকিৎসা করিবে না। তদ্ভিন্ন যাহাদের স্বামী, পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক উপস্থিত নাই, এরূপ স্ত্রীলোকের জীবনসংশয় কালেও তাহার নিকট তুমি চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইবে না এবং কখনও তুমি,—স্বামী বা অন্য কোন অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীজনপ্রদত্ত তাম্বুল প্রভৃতি গ্রহণ করিবে না[২]।

যখন তুমি চিকিৎসার্থ কোন রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন তুমি গৃহস্বামীকে জানাইয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া একজন পুরুষের সঙ্গে সভ্যভাবে অবনত মস্তকে, রোগীর কথা স্মরণ ও রোগের বিষয় ধীরভাবে চিন্তা এবং সম্যক্ প্রকারে বিচার করিতে করিতে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ করিয়া রোগীর আরোগ্য বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে বাক্য, মনঃ, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয় প্রণিধান করিবে না। তদ্ভিন্ন রোগীর গৃহের কোন কথা বাহিরে প্রকাশ করিবে না এবং রোগীর জীবনের কাল অধিক নহে,—মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে, ইত্যাদি মর্মন্তুদ সংবাদ তুমি জানিলেও অথবা জিজ্ঞাসিত হইলেও বলিবে না, যাহাতে রোগীর বা আত্মীয় স্বজনের চিত্তে আঘাত লাগিতে পারে। তুমি যতই জ্ঞানবান্ হওনা কেন, কখনও

১। "কর্মসিদ্ধিমর্থসিদ্ধিং যশোলাভঞ্চ প্রেত্যচ স্বর্গমিচ্ছতা ভিষজাত্বয়া গোব্রাহ্মণমাদৌকৃত্বা সর্বাপ্রাণভৃতাং শর্মাশাসিতব্যম্। অহরহরুত্তিষ্ঠতা চোপবিশতা চ সর্বাত্মনা চাতুরাণামারোগ্যেপ্রযতিতব্যম্। জীবিত হেতোরপি চাতুরেভ্যো নাভিদ্রোগ্ধব্যম্। মনসাপি পরস্ত্রিয়ো নাভিগমনীয়াঃ, তথা সর্বমেব পরস্বম্। নিভৃতবেশপরিচ্ছদেন ভবিতব্যম্। অশৌণ্ডেনাপাপেনাপাপ সহায়েন চ শ্লক্ষ্ণশুক্লধর্ম্যশভ্যধন্যসত্যহিতমিতবচসা দেশকালবিচারিণা স্মৃতিমতা জ্ঞানোত্থানোপকরণ-সম্পৎসু নিত্যং যত্নবতা। চ. বি, ৮ অ,

২। "ন চ কদাচিদ্ রাজদ্বিষ্টানাং রাজদ্বেষিণাং বা মহাজনদ্বিষ্টানাং মহাজনদ্বেষিণাং বা ঔষধমনুবিধাতব্যম্। এবং সর্বেষামত্যর্থবিকৃতদুষ্টদুঃখশীলাচারোপচারোণামপবাদপ্রতিকারাদীনাং মুমূর্ষতাঞ্চ তথৈবাসন্নিহিতেশ্বরাণাং স্ত্রীণামনধ্যক্ষাণাং বা। ন চ কদাচিৎ স্ত্রীদত্তমামিষমাদাতব্যমননুজ্ঞাতং ভত্রা থবাধ্যক্ষেণ। চ. বি. ৮অ.

নিজের জ্ঞানের বিষয়ে শ্লাঘা করিবে না। কেন না, আত্মশ্লাঘা আপনার লোকের নিকট হইতে শুনিলেও অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠে ১। আর—

তুমি ইহাও জানিও যে,—আয়ুর্বেদের পার নাই অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্র আমি যাহা জানি, তাহার অধিক জ্ঞাতব্য কিছু নাই—এ কথা মনে করিও না। অতএব অবহিত হইয়া সর্ব্বদা চিকিৎসা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভার্থ অভিনিবেশ দিবে। এরূপ ক্ষেত্রে এতাদৃশ কর্ম করা উচিত, আবার যখন করিতে হইবে তখন এইরূপ করিব ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করিবে ও অসূয়াশূন্য হইয়া অপরের চিকিৎসাসৌষ্ঠব অর্থাৎ চিকিৎসার কৌশল অধিগত করিতে চেষ্টা করিবে। কেন না, যাহারা বুদ্ধিমান্ হয় তাহাদের নিকট সকল লোকই আচার্য আর যাহারা নির্বোধ তাহাদের নিকট সকল লোকেই শত্রু বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত, অমিত্রেরও যদি কিছু প্রশংসনীয়, যশস্য, আয়ুষ্য ও লোকহিতকর থাকে, তাহা হইলে সে সকল গ্রহণ করা ও তদনুসারে কার্য করা ২।

এতদ্ভিন্ন,—দেবতা, অগ্নি, দ্বিজ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্যগণের অনুবর্তন করিবে। তুমি ইঁহাদের অনুবর্তী হইলে এই অগ্নি, সর্ব্ববিধ গন্ধ, রস, রত্ন ও বীজসকল এবং যথোক্ত দেবতা-সকল তোমার মঙ্গল করিবেন। নতুবা ইঁহারাই তোমার অকল্যাণ করিবেন। ৩।

শিষ্য গুরুর এইসকল অনুশাসন তথাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ৪।

এযাবৎ যে সকল অনুশাসনের কথা বলা হইল। সুশ্রুতসংহিতাতেও এইরূপ অনুশাসনের কথা কিছু সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। তবে সুশ্রুতের অনুশাসনে কিঞ্চিৎ বিশেষ দেখা যায় যথা—

“আমার অনুমত স্থানে গমন, শয়ন, আসন, পরিগ্রহ, ভোজন ও অধ্যয়ন করিবে এবং আমার প্রিয় ও হিতকর্মসকল সম্পাদন করিবে। যদি তুমি এই সকল অনুশাসনের বিপরীত আচরণ কর, তাহা হইলে তোমার অধর্ম হইবে, বিদ্যা বিফল হইবে এবং

১। আতুর কুলঞ্চানুপ্রবিশতা বিদিতেনানুমতপ্রবেশিনা সার্দ্ধং পুরুষেণ সুসংবীতেনা বাক্‌শিরসা স্মৃতিমতা স্তিমিতে নাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য মনসা সর্বমাচরতা সম্যগানুপ্রবেষ্টব্যম্। অনুপ্রবিশ্য চ বাঙ্‌মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ন ক্বচিৎ প্রণিধাতব্যানি অন্যত্রা-তুরাদাতুরোপচারাদর্থাৎ বাতুরগতেষ্বন্যেষু চ ভাবেষু। ন চাতুরকুলপ্রবৃত্তয়োবহির্নিশ্চারয়িতব্যাঃ। হ্রাসিতঞ্চায়ুষং প্রমাণ-মাতুরস্য জানতাপি ন ত্বয়া খলু বর্ণয়িতব্যং যত্রোচ্যমানমাতুরস্যান্যস্যবাপ্যুপঘাতায় সম্পদ্যতে। জ্ঞানবতাপি চ নাত্যর্থমাত্মানো জ্ঞানেন বিকত্থিতব্যম্। আপ্তাদপি হি বিকত্থমানাদত্যর্থমুদ্বিজন্ত্যনেকে। চ, বি, ৮ অ

২। “ন চৈব হি অস্ত্যায়ুর্বেদস্য পারম্। তস্মাদপ্রমত্তঃ শশ্বদভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ। এতচ্চৈবং কার্যমেবং ভূয়ঃপ্রবৃত্তস্য সৌষ্ঠবমনসূয়তাপরেভ্যো বাপ্যাগময়িতব্যম্। কৃৎস্নো হি লোকোবুদ্ধিমতামাচার্যঃ শত্রুশ্চাবুদ্ধিমতামতশ্চাভি সমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পৌষ্টিকং লৌকিকমভ্যুপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যমনুবিধাতব্যঞ্চেতি।

৩। “দেবতাগ্নিদ্বিজগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্যেষু তে নিত্যং সম্যগ্‌বর্তিতব্যম্। তেষু চ তে সম্যগ্বর্তমানস্যামগ্নিঃ সর্বাগন্ধ-রসরত্নবীজানি যথেরিতাশ্চ দেবতাঃ শিবায়স্যুরতোঽন্যথা বর্তমানস্যাশিবায়েতি।

৪। “ইত্যেবং ব্রুবতি আচার্যে শিষ্যস্তথেতি ব্রুয়াৎ।” চ, বি-৮ অ

তোমার বিদ্যা প্রকাশলাভ করিবে না। আর আমি যদি অকারণে তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করি, তাহা হইলে আমি পাপভাক্ হইব এবং আমারও বিদ্যা বিফল হইবে। অপিচ দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী, আশ্রিত, সাধু ও অনাথ প্রভৃতি যাহারা তোমার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইবে, তাহাদিগকে তুমি নিজের আত্মীয় স্বজনের মত স্বীয় ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করিবে,—তাহাতে তোমার ভালই হইবে। আর পশু পক্ষীকে যাহারা বধ করে তাদৃশ ব্যাধ বা শাকনিক ও পতিত এবং যাহারা পাপ আচরণ করে, তাহাদের তুমি চিকিৎসা করিবে না। যদি এই সকল উপদেশ মানিয়া চল, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা প্রকাশলাভ করিবে, লোক সকল তোমার বন্ধু হইবে এবং তোমার যশঃ, ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ হইবে।১। সুশ্রুতের অন্যান্য অনুশাসন পূর্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তদনুরূপ।

আয়ুর্বেদে উপনীত শিষ্যের অধ্যয়ন সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন—"ব্রাহ্ম মুহূর্তে বা প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানের পর দেবর্ষি, গো. ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্যগণকে নমস্কার করিবে। তারপর সমতল ও পবিত্রস্থানে স্বচ্ছন্দভাবে উপবেশন করিয়া অভিনিবেশ সহকারে প্রস্ফুটস্বরে ক্রমানুযায়ী সূত্রসকল আবৃত্তি করিতে থাকিবে। অনন্তর অধীত বিষয়ের তত্ত্বার্থ সম্যক্‌রূপে অধিগত করিয়া স্বদোষপরিহার ও পরদোষ প্রমাণের জন্য মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও রাত্রিতে সেই সকলের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে থাকিবে।

উপনীত শিষ্যের অনধ্যায় সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত আদেশ করিয়াছেন,—"কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী ও অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যায়, বিদ্যুৎপাত বা অকালে মেঘগর্জন হইলে অধ্যয়ন বন্ধ করিবে। এতদ্ভিন্ন আত্মীয় স্বজনের, রাষ্ট্রের ও রাজার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; এবং শ্মশান, যান, বধ্যভূমি ও যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ও মহোৎসবে কিংবা অনিষ্ট লক্ষণ সকল দর্শন করিলে বা ব্রাহ্মণেরা যে সকল দিনে অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনে এবং অশুচি অবস্থায় অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ২।

১। "মদনুমতস্থানগমনশয়নাসনভোজনাধ্যয়নপরেণ মৎপ্রিয়হিতেষু বর্তিতব্যমতোঽন্যথা তে বর্তমানস্যাধর্মো ভবত্যফলাচ বিদ্যা নচ প্রাকাশ্যং প্রাপ্নোতি অহং বা ত্বয়ি সম্যগ্বর্তমানে যদ্যথাদর্শী স্যামেনোভাগ্ ভবেয় মফলবিদ্যশ্চ। দ্বিজ গুরুদরিদ্রমিত্র প্রব্রজিতোপনতসাধ্বনাথানামুপগতানাং চাত্মবান্ধবানামিব স্বভেষজৈঃ প্রতিকর্তব্যমেবাসাধুভবতি। ব্যাধ শাকুনিকপতিত পাপকারিণাং নচ প্রতিকর্তব্যমেবং বিদ্যা প্রকাশতে মিত্রযশোধর্মার্থকামাংশ্চ প্রাপ্নোতি। সুশ্রুত-সূত্রস্থান ২য় অধ্যায়।

২। "কল্য কৃতক্ষণঃ প্রাতরুত্থায়োপচ্যুষং বা কৃত্বাবশ্যকমুপস্পৃশ্যোদকং দেবর্ষিগোব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধাচার্য্যেভ্যো নমস্কৃত্য সমে শুচৌ দেশে সুখোপবিষ্টো মনঃপুরঃসরাভির্বাগ্ভিঃ সূত্রমনুক্রমেন্ পুনঃপুনরাবর্তয়েদ্বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবিশ্যার্থতত্ত্বং স্বদোষপরিহারায় পরদোষ প্রমানার্থমেবং মধ্যন্দিনেঽপরাহ্নে রাত্রৌচশশ্বদপরিহাপয়ন্নধ্যয়নমভ্যস্যেদিতি। চ. বি. ৮ অ.।

১। "কৃষ্ণেঽষ্টমী তন্নিধনেঽহনী দ্বে,
কৃষ্ণেতথ্যেপ্যেবমহর্দ্বি সন্ধ্যম্।

আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পূর্বে ছিল, এখনও আছে। কিন্তু পূর্বে কি ছিল, তাহা বর্তমান আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনা দ্বারা কিছুমাত্র অবগত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তখনকার কালে যে সকল বিদ্যার্থী আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিত আর যে সকল অধ্যাপক আয়ুর্বেদের অধ্যাপনা করিতেন, এতদুভয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয়, এই প্রবন্ধে পাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয়ভাবে ভাবিত না হইলে ভারতের কল্যাণ সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন, একবার প্রাচীন মহর্ষিগণের অনুশাসন বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

অকাল বিদ্যুৎস্তনয়িত্নু ঘোষে,
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষিতি পব্যথাসু—।
শ্মশানযানা স্তুতনাহবেষু
মহোৎসবৌৎপাতিক দর্শনেষু
নাধ্যেয় মন্ত্রেষু চ যেষু বিপ্রা—
নাধীয়তে নাশুচিনাচ নিত্যম্॥ সু-সূ ২ অ.

বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাদ (১)*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাদের মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী দুইটি দার্শনিক মতবাদ আর কোথাও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানবাদী বলেন, বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান আছে কিন্তু বাস্তব পদার্থ কিছু নাই। কিন্তু বৈশেষিকের প্রথম কথা হইল, বস্তু আছে বলিয়াই জ্ঞান সম্ভব,—বস্তু ব্যতিরেকে বিজ্ঞান কখনই সম্ভব হইত না। এই মতে বিজ্ঞান বস্তুসাপেক্ষ, কিন্তু বস্তু বিজ্ঞাননিরপেক্ষ। বস্তুকে বিজ্ঞাননিরপেক্ষ করিয়াই বৈশেষিক সন্তুষ্ট হন নাই; তিনি আরও বলেন, বস্ত্বাবলীর পরস্পরের মধ্যেও আন্তরিক কোন যোগ নাই—প্রত্যেক দ্রব্যই একটি বিশেষ; এই জন্যই এই মতবাদ বৈশেষিক নামে পরিচিত। কিন্তু টেবিল চেয়ার প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুই, যে একটি বিশিষ্ট "দ্রব্য"—তাহা অবশ্য নহে। বৈশেষিকের "দ্রব্য" হইল সম্পূর্ণ রূপে স্বপ্রতিষ্ঠ,—দিক্ (space) ও কালের আশ্রয়ও যাহার প্রয়োজন হয় না। দিক্ ও কাল সেইজন্য বৈশেষিক মতে দুইটি দ্রব্য মাত্র, দ্রব্যাধার নহে। কিন্তু যাহা দিক্ ও কালের অতীত তাহা হয় অণোরণীয়ান্ না হয় মহতো মহীয়ান্ † হইতে বাধ্য! বৈশেষিকী দ্রব্যগুলি বাস্তবিকই সেইরূপ,—ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। বিশ্বপ্রপঞ্চ বৈশেষিক মতে এই দ্রব্যাবলীর বিবিধ সমন্বয়ে গঠিত। বৈশেষিক মত সম্বন্ধে আর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা শান্তরক্ষিত স্বয়ং পূর্বপক্ষীর হইয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

ক্ষিত্যাদিভেদতো ভিন্নং নবধা দ্রব্যমিষ্যতে।
চতুঃসংখ্যং পৃথিব্যাদি নিত্যানিত্যতয়া দ্বিধা ॥ ৫৪৯ ॥

অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি দ্রব্য নয় প্রকার; তন্মধ্যে প্রথম চারিটি (ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি, বায়ু) আবার নিত্যতা ও অনিত্যতা ভেদে দুই প্রকারের। এই দ্বৈবিধ্য কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে :—

পৃথিব্যাদ্যাত্মকাস্তাবন্ত ইষ্টাঃ পরমাণবঃ।
অনিত্যা যে তদাদ্যৈস্তু প্রারব্ধাস্তে বিনাশিনঃ ॥ ৫৫০ ॥

অর্থাৎ পৃথিব্যাদি যে সকল পরমাণু মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে (তাহা নিত্য); এবং সেই নিত্য পরমাণু যে সকল পদার্থের আদি তাহা হইল অনিত্য, আরব্ধ ও বিনাশশীল। যাহা আরব্ধ (originating in activity) তাহা অনিত্য হইতে যাইবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর,—যাহাই হেতুমান তাহাই অনিত্য (হেতুমদনিত্যমিতি ন্যায়াৎ)।

---

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, Second Series, No. 1.

† Infinite or infinitesimal—Hiriyana, Outlines of Indian Philosophy, p. 229.

বৌদ্ধ এইবার ক্ষিত্যাদি প্রথম দ্রব্য চতুষ্টয় অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন :—

তত্র নিত্যাণুরূপাণামসত্ত্বমুপপাদিতম্।
নিঃশেষবস্তুবিষয়ক্ষণভঙ্গপ্রসাধনাৎ ॥ ৫৫১ ॥

অর্থাৎ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্যবস্তুর অসত্ত্ব পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ দেখান হইয়াছে যে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা ক্ষণভঙ্গী নহে। পৃথিব্যাদি যে সকল নিত্য পরমাণুর কথা বলা হইয়া থাকে সেগুলিও অশেষ বস্তু বলিতে যাহা বুঝায় তাহারই অন্তর্গত (অশেষবস্তুব্যাপিনঃ)। সুতরাং বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে পৃথিব্যাদি পরমাণুও ক্ষণিক। যাহা কিছু সৎ, তাহা ক্ষণিক না হইয়া পারে না, কারণ যাহা অক্ষণিক তাহা ক্রমিক বা যুগপৎ কোন কার্যই সম্পন্ন করিতে না পারায় তাহার অসত্ত্বই প্রমাণিত হয়। * পরমাণুর নিত্যত্বের অপর বাধক প্রমাণ এই :—

নিত্যত্বে সকলাঃ স্থূলা জায়েরন্ সকৃদেব হি।
সংযোগাদি ন চাপেক্ষ্যং তেষামন্ত্যবিশেষতঃ ॥ ৫৫২ ॥

অর্থাৎ, পর্বতাদি স্থূল বস্তুর কারণস্বরূপ এই পরমাণু যদি নিত্য হয় তবে পর্বতাদি সকল বস্তু এক সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া যাওয়া উচিত, কারণ নিত্য পরমাণুর সংযোগাদি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন থাকিতে পারে না।—পূর্বপক্ষী বলেন পর্বতাদির কারণ হইল পরমাণু;. এখন এই পরমাণু যদি নিত্য হয় তবে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে পরমাণু হইল পর্বতাদির সম্যক্ কারণ, যে-হেতু যাহা নিত্য তাহা কোন বিষয়েই অপর কিছুর মুখাপেক্ষী হইতে পারে না। কিন্তু পরমাণু যদি পর্বতাদির সম্যক্ কারণই হয়, তবে পর্বতাদি সকল বস্তু এক সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া যাওয়া উচিত! আর সমগ্র কারণ সত্ত্বেও যদি উৎপত্তি না ঘটে তবে স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তুর উৎপত্তি কোন মতেই সম্ভব নহে।

পূর্বপক্ষী কিন্তু বলিতে পারেন যে কারণ তিন প্রকার,—সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ, এবং নিমিত্তকারণ। যাহা যে কার্যের সহিত সমবেত হয় তাহাই সেই কার্যের সমবায়িকারণ; কার্যের সহিত সমবেত না হইয়াই যাহা কারণভাব প্রাপ্ত হয় তাহা হইল অসমবায়িকারণ,—যেমন অবয়বিদ্রব্যের উৎপাদে অবয়বসংযোগ; অপর সকল প্রকারের কারণ হইল নিমিত্তকারণ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে পরমাণু হইতে দ্রব্যোৎপাদ হয় বলিয়া যে সংযোগাদির কোন প্রয়োজন নাই তাহা নহে; অতএব বৌদ্ধের যুক্তি অসিদ্ধ।

এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়াই শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন "সংযোগাদি নচাপেক্ষ্যং" ইত্যাদি। যদি সংযোগাদিদ্বারা পরমাণুতে কোন বিশেষত্বের উদ্ভব হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে পরমাণু সংযোগাদির মুখাপেক্ষী! কিন্তু পরমাণুর নিত্যতাবশতঃ কোন বাহ্যবস্তু যখন তাহাতে

---

* কমলশীলের ভাষা এখানে অদ্ভুত :—"অক্ষণিকস্তু যৌগপদ্যাভ্যামর্থক্রিয়াবিরোধাৎ"। ধরিয়া লইতেছি যে "যৌগপদ্যাভ্যাম্" একটি elliptic dual.

কোন বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করিতে পারে না তখন পরমাণু সংযোগাদির মুখাপেক্ষী হইবে কিরূপে? তাহার উপর ইহাও দেখা যায় যে শরীর গৃহ প্রভৃতি স্থূল পদার্থ ক্রমান্বয়েই উৎপন্ন হয়, যুগপৎ হয় না।

অবিদ্ধকর্ণ পরমাণুর নিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলিয়াছেন:—পরমাণুর যাহা উৎপাদক তাহাতে সদ্বস্তুর ধর্ম থাকিতে পারে না, কারণ তাহা শশশৃঙ্গাদির মত সত্ত্বপ্রতিপাদক প্রমাণের বিষয়ই নহে। সুতরাং পরমাণুর উৎপাদক কোন কারণ থাকিতে পারে না। পরবর্তী কারিকায় এই আশঙ্কার কথাই বলা হইয়াছে:—

সদ্ধর্মোপগতং নোচেদণূৎপাদকমিষ্যতে।
বিদ্যমানোপলম্ভার্থপ্রমাণাবিষয়ত্বতঃ ॥ ৫৫৩ ॥

অর্থাৎ, যদি বলা যায় যে পরমাণুর যাহা উৎপাদক তাহাতে সদ্বস্তুর ধর্মই নাই, যে-হেতু তাহা বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধ্যর্থে প্রযুক্ত প্রমাণের বিষয়ই নহে, তবে উত্তর:—

নাসিদ্ধের্দৃশ্যতে যেন কুবিন্দাদ্যণুকারণম্।
পরমাণ্বাত্মকা এব যেন সর্বে পটাদয়ঃ ॥ ৫৫৪ ॥

অর্থাৎ, দেখাই তো যায় যে তন্তুবায়াদি পরমাণুর উৎপত্তির কারণ, কারণ পটাদি বস্তু যে অণ্বাত্মক সে-বিষয়ে পূর্বপক্ষীর তো কোন সন্দেহ নাই!—তন্তুবায়াদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল মাত্র পটাদির উৎপাদক হইলেও যে প্রকৃত পক্ষে পরমাণুরও উৎপত্তির কারণ তাহা পরে দেখান হইবে।

উপরন্তু, পরমাণুর যাহা উৎপাদক তাহাই যে কেবল প্রমাণের বিষয় নহে—এ-কথাও ঠিক বলা যায় না, কারণ যাহা অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট দেশ ও কালের অন্তর্গত তাহার প্রতি প্রমাণ প্রয়োগ করা সম্ভব না হইলেও তাহার অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে (সত্ত্বাবাবিরোধাৎ)। সুতরাং পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে পরমাণুর যাহা উৎপাদক তাহাই কেবল প্রমাণের অতিরিক্ত তবে তাঁহার যুক্তি অন্ততপক্ষে অনৈকান্তিক।—ইহাই দেখাইবার জন্য পরবর্তী কারিকায় বলা হইতেছে:—

সদ্গ্রাহকপ্রমাভাবান্ন বা সত্তা প্রসিধ্যতি।
প্রমাণবিনিবৃত্তৌ হি নার্থাভাবেঽস্তি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৫৫ ॥

অর্থাৎ, কোন বস্তুর সত্তানির্ধারক প্রমাণ ব্যতিরেকে সেই বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ না হইতে পারে; কিন্তু সেই জন্যই যে প্রমাণাভাব বশতঃ অস্তিত্বাভাবও নিশ্চিত—এ-কথা বলা যায় না।

এইরূপে কারণদ্রব্যের (পরমাণুর) খণ্ডন করিয়া শান্তরক্ষিত পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাবলীর খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন:—

তদারব্ধস্ত্ববয়বী গুণাবয়বভেদবান্।
নৈবোপলভ্যতে তেন ন সিধ্যত্যপ্রমাণকঃ ॥ ৫৫৬ ॥

অর্থাৎ, বস্তুরূপে যাহা উপলব্ধ হয় তাহা প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি গুণ ও অবয়বের সমষ্টি মাত্র; সেই গুণাবলী ও অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ কোন আরব্ধ (composite) অবয়বীর যখন

কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না তখন স্বীকার করিতে হইবে যে এইরূপ অবয়বী অপ্রমাণিত এবং অসিদ্ধ।—পটাদি অবয়বী দ্রব্য কখনও শুক্লাদি গুণ এবং তন্ত্বাদি অবয়ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে দেখা যায় না; সুতরাং গুণাবলী হইতে পৃথক্ কোন দ্রব্যের যখন উপলব্ধি ঘটিতেছে না তখন গুণ হইতে পৃথক্ কোন গুণীর বিচারও ব্যর্থ—অবয়ব ও অবয়বীর বিচারও তদ্রূপ।—পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে উদ্দ্যোতকর ভাবিবিক্তাদির বিরুদ্ধ যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে; তাঁহাদের মত এই যে, বৌদ্ধের প্রদর্শিত উপরোক্ত যুক্তি হইতে প্রমাণিত হয় না যে গুণ ও অবয়ব হইতে পৃথক্ কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই:—

ননু প্রধানসম্পর্কে দৃশ্যতে স্ফটিকোপলঃ।
তদ্রূপাগ্রহণেপ্যেবং বলাকাদিশ্চ দৃশ্যতে ॥ ৫৫৭ ॥
কঞ্চুকান্তরিতে পুংসি তদ্রূপাগ্রগতাবপি।
পুরুষপ্রত্যয়ো দৃষ্টো রক্তে বাসসি বস্ত্রধীঃ ॥ ৫৫৮ ॥

অর্থাৎ, উদ্দ্যোতকরাদির মতে গুণ হইতে পৃথক্ গুণীর উপলব্ধি ঘটিয়া থাকে। শুক্লতা হইল স্ফটিকের গুণ, কিন্তু অপর কোন বস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ শুক্লতা যখন আর উপলব্ধ হয় না তখনও কিন্তু স্ফটিকটির উপলব্ধি ঘটিতে থাকে। অল্পান্ধকার রাত্রিতে বলাকা-শ্রেণী যখন উড়িয়া যায় তখন পক্ষীগুলির শ্বেতবর্ণ আর দৃষ্টি গোচর হয় না, কিন্তু পক্ষীগুলিকে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আগুলফলম্বিত পরিচ্ছদে শরীর আবৃত থাকিলেও মানুষকে মানুষ বলিয়া চেনা যায়, যদিও তাহার গায়ের রং কি তাহা বলা যায় না। বস্ত্রের আদিম রংটি কষায়কুঙ্কুমাদি অন্য কোন রং দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বস্ত্রজ্ঞানের কোন ব্যাঘাত ঘটে কি?—গুণ ও গুণীর পার্থক্য যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। অনুমানের দিক্ হইতেও তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বপক্ষী এইবার বলিতেছেন:—

রূপাদীন্দীবরাদিভ্য একান্তেন বিভিদ্যতে।
তেন তস্য ব্যবচ্ছেদাচ্চৈত্রাদেশ্চ তুরঙ্গমঃ ॥ ৫৫৯ ॥
ক্ষিত্যাদিরূপগন্ধাদেরত্যন্তং বা বিভিদ্যতে।
একানেকবচোভেদাচ্চন্দ্রনক্ষত্রভেদবৎ ॥ ৫৬০ ॥

অর্থাৎ, পদ্মপুষ্পাদি হইতে ঐ পুষ্পাদির রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন—রূপাদি দ্বারা পুষ্পাদি ব্যবচ্ছিন্ন (differentiated) হইয়া থাকে মাত্র। আরোহীর দ্বারা অশ্বও এইরূপে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সে-জন্য কেহই মনে করে না যে অশ্ব ও আরোহী অভিন্ন। এই রূপেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু হইল রূপ, রস গন্ধ ও স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার উপর আরও বিবেচ্য এই যে ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি হইল একবচনান্ত শব্দ, কিন্তু রূপরসগন্ধ স্পর্শ হইল বহু-বচনান্ত; সুতরাং এই দিক হইতেও গুণ ও গুণীর পার্থক্যের অবকাশ রহিয়াছে। এই পার্থক্য যে কিরূপ তাহা একবচনান্ত "চন্দ্র" এবং বহুবচনান্ত "নক্ষত্রাবলীর" তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। চন্দ্রও একটি নক্ষত্র, কিন্তু সেইজন্য "নক্ষত্রাবলী" বহুবচনান্ত বলিয়া "চন্দ্র"

বহুবচনান্ত নহে। সুতরাং নক্ষত্রত্ব সত্বেও চন্দ্রের একটি একান্ত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে।—এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকার্য। পূর্বপক্ষী এইবার দেখাইবেন যে অবয়ব ও অবয়বীর ভেদও অস্বীকার করিবার উপায় নাই :—

বিভিন্নকর্তৃশক্ত্যাদের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ তথা।
বিরুদ্ধধর্মযোগেন স্তম্ভকুম্ভাদিভেদবৎ ॥ ৫৬১ ॥

অর্থাৎ, সূত্র ও বস্ত্রের কর্তা ও শক্তি যখন বিভিন্ন তখন স্বীকার করিতে হইবে যে সূত্র ও বস্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যদিও বলা হইয়া থাকে যে সূত্র হইতেই যখন বস্ত্র প্রস্তুত হয় তখন এতদ্দ্বয়ের কোন পার্থক্য নাই। সূত্র ও বস্ত্রের ধর্মাবলী যখন বিপরীত তখন স্তম্ভ ও কুম্ভের মধ্যে যে-রূপ ভেদ, সূত্র ও বস্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। সূত্র হইল যোষিৎকৃত, কিন্তু বস্ত্রকার হইল তন্তুবায়; বস্ত্র শীত নিবারণ করিতে পারে কিন্তু সূত্র তাহা পারে না; বস্ত্রোৎপত্তির পূর্বেই সূত্রের উপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, এবং সূত্রের উপর তন্তুবায় পরিশ্রম না করিলে বস্ত্রোৎপত্তি কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। সূত্র ও বস্ত্রের অনন্যত্ব কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে?—এইরূপে অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে অবয়বী হইতে অবয়ব পৃথক্। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে :—.

স্থূলার্থাসংভবে তু স্যান্নৈব বৃক্ষাদিদর্শনম্।
অতীন্দ্রিয়তয়াণূনাং নচাণুবচনং ভবেৎ॥ ৫৬২ ॥
স্থূলবস্তুব্যপেক্ষো হি সূক্ষ্মোঽর্থস্তথোচ্যতে।
স্থূলৈকবস্তুভাবে তু কিমপেক্ষাস্য সূক্ষ্মতা॥ ৫৬৩ ॥

অর্থাৎ, সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে পৃথক কোন স্থূল পদার্থ যদি না থাকে তবে বৃক্ষাদি যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেরূপ ক্ষেত্রে 'অণু' বলিয়া কোন শব্দও সম্ভব হইত না, বিশেষ যখন পরমাণু ইন্দ্রিয়ের অতীত। বাস্তব স্থূল পদার্থের সহিত তুলনা সম্ভব বলিয়াই পরমাণুর ন্যায় অতিসূক্ষ্ম পদার্থ স্বীকার করা যাইতে পারে। কোন স্থূল পদার্থই যদি না থাকে তবে কিসের সহিত তুলনায় পরমাণুকে সূক্ষ্ম বলা হইবে? —সুতরাং অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।—বৌদ্ধ এইবার প্রতিবাদ করিতেছেন :—

নন্ রক্তাদিরূপেণ গৃহ্যন্তে স্ফটিকাদয়ঃ।
ন চ তদ্রূপতা তেষাং স্বপক্ষক্ষয়সঙ্গতেঃ॥ ৫৬৪ ॥

অর্থাৎ, স্ফটিকাদির সম্বন্ধে পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন তাহাদের গুণ উপলব্ধ না হইলেও তাহাদের উপলব্ধি হয়—একথা অসিদ্ধ, কারণ স্ফটিকাদির ঐরূপ জ্ঞান হইল প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্তজ্ঞান। বলাকাশ্রেণীকেও যে অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ মনে হয় তাহার কারণ বলাকাশ্রেণীর প্রকৃত রূপ তখন আমাদের চোখে পড়ে না। এইরূপ ভ্রান্তজ্ঞান আশ্রয় করিয়া কিরূপে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধে বিচার করা যাইতে পারে? বলাকাশ্রেণীর প্রতীয়মান কৃষ্ণবর্ণ যদি পূর্বপক্ষী

তাত্ত্বিকজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করেন তবে তদ্দ্বারা তিনি স্বপক্ষই ক্ষুণ্ণ করিবেন। কারণ তাহা হইলে আর ঐ দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া এরূপ কথা বলা চলিবে না যে বস্তুর রূপের গ্রহণ না হইলেও বস্তুর গ্রহণ হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতে পারেন, রক্তজবাদির সান্নিধ্যেই যে স্ফটিক দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নহে, অপর পদার্থের অনবস্থিতিস্থলেও স্ফটিকের উপলব্ধি ঘটে। একথার উত্তর :—

তদ্রূপব্যতিরিক্তশ্চ নাপরাত্মোপলভ্যতে।
ন চান্যাকারধীবেদ্যা যুক্তাস্তেঽতিপ্রসঙ্গতঃ॥ ৫৬৫॥

অর্থাৎ, রক্তজবার রংটি ভিন্ন স্ফটিকে আর কিছু উপলব্ধ হইতেছে না। তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হইবে যে স্ফটিকের উপলব্ধি নির্ভর করে তাহা হইতে পৃথক আর একটী দ্রব্যের—রক্তজবার—অনুভূতির উপর? কিন্তু পূর্বপক্ষীও বলিতে পারেন না যে একবস্তুর উপলব্ধি অপর এক বস্তুর অনুভূতির উপর নির্ভর করে, কারণ তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ অবশ্যম্ভাবী।

একথাও যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বস্তু যে-প্রকারের তদ্বিষয়ক জ্ঞান সে-প্রকারের না হইতেও পারে—তাহা হইলেও যে পূর্বপক্ষীর কথা সিদ্ধ হইতে পারে না তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে :—

শুক্লাদয়স্তথা বেদ্যা ইত্যেবং চাপি সংভবেৎ।
তস্মাদ্‌ভ্রান্তমিদং জ্ঞানং কম্বুপীতাদিবুদ্ধিবৎ॥ ৫৬৬॥

অর্থাৎ, সে-ক্ষেত্রে ইহাও সম্ভব যে শুক্ল বস্তুটি উপলব্ধ হয় না, উপলব্ধি হয় কেবল শুক্লাদি বর্ণের! গুণিপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (স্ফটিকের) এই শুক্ল বর্ণই হয়তো রক্তপুষ্পের সান্নিধ্যে রক্তরূপে প্রতিভাত হয়! সুতরাং গুণ হইতে পৃথক্ গুণিপদার্থের সিদ্ধি হইল কিরূপে? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শঙ্খের পীতত্ববুদ্ধির মত গুণপদার্থ হইতে পৃথক্ গুণিপদার্থের বুদ্ধিও ভ্রান্তজ্ঞান।—পূর্বপক্ষী (৫৫৮ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে মানুষের সর্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিলেও আচ্ছাদিত জীবটিকে মানুষ বলিয়া চেনা যায়। কিন্তু তাহাও হইল জল্পনা (guess) মাত্র, প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে; উপরন্তু ঐ প্রকারের জ্ঞান অস্পষ্ট :—

কঞ্চুকান্তর্গতে পুংসি ন জ্ঞানং ত্বানুমানিকম্।
তদ্ধেতুসন্নিবেশস্য কঞ্চুকস্যোপলম্ভনাৎ॥ ৫৬৭॥

অর্থাৎ, বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ সম্বন্ধে যে বুদ্ধি জন্মায় তাহা অনুমান মাত্র, জ্ঞান নহে; কারণ সে-ক্ষেত্রে যাহা উপলব্ধ হয় তাহা হইল ঐ আবরণ, যাহা সেই আনুমানিক মনুষ্যটির দ্বারা বিশেষ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকারের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলাই যাইতে পারে না।—পূর্বপক্ষী আরও বলিয়াছেন যে বস্ত্র রঞ্জিত হইলেও বস্ত্রজ্ঞান কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না; একথার উত্তর :—

কষায়কুঙ্কুমাদিভ্যো বস্ত্রে রূপান্তরোদয়ঃ।
পূর্বরূপবিনাশে হি বাসসঃ ক্ষণিকত্বতঃ ॥ ৫৬৮ ॥

অর্থাৎ, কষায়কুঙ্কুমাদির দ্বারা যে বস্ত্রে নব রূপের উদ্ভব হয় তাহা যথার্থ; কিন্তু ক্ষণিকত্ববশতঃ বস্ত্রমাত্রেই তো প্রতিক্ষণে নবরূপ গ্রহণ করিবেই! তদ্দ্বারা কি বস্ত্রে কোন স্থিরসত্তা প্রমাণিত হয়? ক্ষণিকত্ববশতঃ বস্ত্রের পূর্বেকার শুক্লাদিরূপের বিনাশ ঘটিলে অপর শক্তির বলে নূতন রূপাদির উদ্ভব হয়, এবং প্রত্যক্ষদ্বারা তাহা গৃহীত হইলে তৎপরে এই প্রকারের ভ্রান্ত (সাংবৃত) জ্ঞান জন্মায় যে পূর্বের বস্ত্রই যথোচিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইয়া এখনও বর্তমান রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু রূপপরিবর্তনের পূর্বে বা পরে কোন অবস্থাতেই যে কোন বস্ত্রের প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত সহযোগে পূর্বপক্ষী বস্ত্রাদির মধ্যে স্থিরসত্ত্ব কোন গুণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারিবেন না। অতএব পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে না। অনুমানপ্রমাণ রূপেও তাহা অগ্রাহ্য, কারণ প্রামাণ্য বিষয়টি এখানে পূর্বেই প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে; উপরন্তু তাহা অলৈঙ্গিক (not apprehensible by means of inference)। —পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন যে বস্ত্রের শুক্লাদিরূপ যদি না থাকে তবে রঞ্জিত বস্ত্র ধৌত করিলে তাহার শ্বেত বর্ণ ফিরিয়া আসে কেন? ইহার উত্তর :—

পুনর্জলাদিসাপেক্ষাত্তস্মাদেবোপজায়তে।
রূপাদ্রূপান্তরং শুক্লং লোহাদেঃ শ্যামতাদিবৎ ॥ ৫৬৯ ॥

অর্থাৎ, যে শুক্লবর্ণ ফিরিয়া আসে তাহা পূর্বের শ্বেতবর্ণ নহে; এখানে জলাদির সংস্পর্শে তৎসাপেক্ষ আর একটি শুক্লবর্ণ জন্মলাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এখানে যাহা ঘটে তাহা হইল এক রূপ হইতে রূপান্তরের উৎপত্তি, অগ্নিসংস্পর্শে শ্যাম লৌহ ভাস্বর হইয়া উঠিয়া পুনরায় যেমন শ্যামতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু কি করিয়া জানিব যে রূপান্তরেরই উৎপত্তি হইতেছে, পূর্বরূপ ফিরিয়া আসিতেছে না? ইহাও তো হইতে পারে যে বস্ত্রাদির পূর্বরূপ কিয়ৎকালের জন্য অভিভূত থাকে মাত্র, এবং পরে সেই অভিভবের অভাব ঘটিলে পূর্বরূপ পুনরায় উপলব্ধ হইতে থাকে! একথার উত্তর ঃ—

তাদবস্থ্যে তু রূপস্য নান্যেনাভিভবো ভবেৎ।
প্রাক্তনানভিভূতস্য স্বরূপস্যানুবর্তনাৎ ॥ ৫৭০ ॥

অর্থাৎ, 'বস্ত্রাদির রূপ যদি তদবস্থই থাকিবে তবে তাহার অভিভব ঘটে কি করিয়া? অভিভব বলিতেই কি পূর্বাবস্থার পরিবর্তন বুঝায় না? প্রাক্তন রূপের অনভিভব বলিতে বুঝায় স্বরূপেরই অনুবর্তন।—পূর্বে (৫৫৯ সংখ্যক কারিকায়) বলা হইয়াছিল যে

"ইন্দীবরস্য রূপম্" এই প্রকারের বাক্যপ্রয়োগ হইতেই বুঝা যায় সে বস্তু ও বস্তুর রূপ বিভিন্ন। এক্ষণে তাহার উত্তরে বলা হইতেছে :—

ষষ্ঠীবচনভেদাদি বিবক্ষামাত্রসংভবি।
ততো ন যুক্তা বস্তুনাং তৎস্বরূপব্যবস্থিতিঃ ॥ ৫৭১ ॥

অর্থাৎ ষষ্ঠী বিভক্তির বিবিধ প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা সঙ্গত নহে।—যদি বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী ষষ্ঠ্যাদি বিভক্তির প্রয়োগ ঘটিত তাহা হইলে "ইন্দীবরস্য রূপম্"—এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ হইতে বস্তুসিদ্ধি সম্ভব হইত। কিন্তু বিভক্তির প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন, তাহা আদৌ বাহ্য বস্তুর ভেদাদি মানিয়া চলে না। সুতরাং তাহা হইতে বস্তুত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে?—পরবর্তী কারিকাতেও পূর্বপক্ষীর যুক্তির অনৈকান্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে :—

তথাহি ভিন্নং নৈবান্যৈঃ ষণ্ণামস্তিত্বমিষ্যতে।
তেষাং বর্গশ্চ নৈবৈকঃ কশ্চিদর্থোঽভ্যুপেয়তে ॥ ৫৭২ ॥

বৌদ্ধ এখানে বৈশেষিকের নিজের কথা হইতেই দেখাইতেছেন যে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেই যে গুণ ও গুণীর পার্থক্য স্বীকৃত হইয়া থাকে তাহা নহে। বৈশেষিক নিজে স্বীকার করেন না যে ষট্‌পদার্থের * "অস্তিত্ব" আবার একটি পৃথক্ পদার্থ, যদিও ষট্‌পদার্থের অস্তিত্বের কথা তিনি অনবরতই বলিয়া থাকেন। সেইরূপ পদার্থবর্গের কথাও বৈশেষিকদের মুখে শুনা যায়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে "বর্গ" কি ষট্‌পদার্থ হইতে পৃথক্ কোন বস্তু? কাজেই বাস্তব ভেদ না থাকিলেও যখন বৈশেষিক বলিতে পারেন "ষট্‌পদার্থের বর্গ" ইত্যাদি, তখন "ইন্দীবরের রূপ" এই প্রকারের বাক্যপ্রয়োগ হইতে কিরূপে তিনি "ইন্দীবর" ও "ইন্দীবরের রূপ" এই উভয় বস্তুর ভেদ অনুমান করেন? বাক্যপ্রয়োগ যে কতখানি অবাস্তব হইতে পারে তাহা "দারাঃ" "সিকতাঃ" প্রভৃতি শব্দ হইতেও বুঝা যায়; এগুলি বহুবচনান্ত হইলেও তজ্জ্ঞাপিত পদার্থে বহুত্বের লক্ষণ নাই।

বৈশেষিক এইবার যাহা বলিতেছেন তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। তিনি বলিতেছেন যে অস্তিত্ব নামক একটি সপ্তম পদার্থ তাঁহাদের দর্শনে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করাই আছে, সুতরাং ষট্‌পদার্থের "অস্তিত্ব" স্বীকার করিলে তাঁহাদের মতের কোন হানি হইবে না :—

ষড়েতে ধর্মিণঃ প্রোক্তা ধর্মাস্তেভ্যোঽতিরেকিণঃ।
ইষ্টা এবেতি চেৎ কোঽয়ং সম্বন্ধস্তস্য তৈর্মতঃ ॥ ৫৭৪ ॥

---

* বৈশেষিকী ষট্‌পদার্থ হইল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়। বৈশেষিক মতে জগতের যাহা কিছু সমস্ত এই ষট্‌পদার্থের অন্তর্ভুক্ত।

দ্রব্যেষু নিয়মাদ্যুক্তো ন সংযোগো ন চাপরঃ।
সমবায়োঽস্তি নান্যশ্চ সংবন্ধোঽঙ্গীকৃতঃ পরৈঃ॥ ৫৭৫॥

অর্থাৎ, এই যে ষট্‌পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে সেগুলি হইল ধর্মী; সুতরাং তাহাদের অতিরিক্ত ষট্‌ধর্মও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বৌদ্ধ কিন্তু উত্তরে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহাই যদি হয়, তবে পদার্থ ও ধর্মাবলীর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ দুই প্রকারের হইতে পারে,—সংযোগ অথবা সমবায়। সংযোগের এখানে অবকাশ নাই। কারণ গুণবিশেষ হওয়ায় পদার্থাবলীর মধ্যে কেবল দ্রব্যের সহিতই সংযোগ সম্ভব, অপর পাঁচটি পদার্থের সহিত কিন্তু তাহা সম্ভবই নহে। পদার্থ ও ধর্মাবলীর সম্বন্ধ সমবায়াত্মকও হইতে পারে না, যে-হেতু অস্তিত্বের (ভাব) ন্যায় সমবায়ও পূর্বপক্ষী এক প্রকারের বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু সমবায়ের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ যদি সমবায়াত্মক হয় তাহা হইলে পদার্থের ষট্‌সংখ্যকতা বশতঃ সমবায়ও আর একরূপ হইতে পারিবে না!—কমলশীল এই দুরূহ কারিকাদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে "পদার্থপ্রবেশক" নামক এক বৈশেষিকগ্রন্থ হইতে একটি বচন, উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"এবং ধর্মৈর্বিনা ধর্মিণামেষ নির্দেশঃ কৃতঃ" (অর্থাৎ ষট্‌পদার্থে কেবল ধর্মীগুলিকেই ধরা হইয়াছে, ধর্ম ধরা হয় নাই)। শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা এখানে যে বৈশেষিকদের কথা বলিতেছেন তাঁহাদের মতে পদার্থের সংখ্যা ছিল দ্বাদশ—ছয়টি ধর্মী এবং ছয়টি ধর্ম (ধর্মিরূপা এব যে ভাবাস্তে ষট্‌পদার্থা ইতি প্রোক্তাঃ, ধর্মরূপাস্তু ষট্‌পদার্থা ব্যতিরিক্তা ইষ্টা এব—কমলশীল)।

পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে ধর্মধর্মিভাব ব্যতিরেকেও পদার্থের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তবে বক্তব্য:—

সংবন্ধানুপপত্তৌ চ তেষাং ধর্মো ভবেৎ কথম্।
তদুৎপাদনমাত্রাচ্চেদন্যেঽপি স্যুস্তথাবিধাঃ॥ ৫৭৬॥

অর্থাৎ, কোন সম্বন্ধই যদি না থাকে তবে কোন ধর্মীর যে কোন ধর্ম* আছে তাহাই বলা যাইবে না। আর যদি ধরা যায় যে ষট্‌পদার্থ হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ধর্মী ও ধর্মের মধ্যে এই তদুৎপত্তি সম্বন্ধ বর্তমান, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধ অন্যত্রও স্বীকার করিতে হইবে; অর্থাৎ কুণ্ড ও জল সম্বন্ধে বলিতে হইবে যে কুণ্ড হইতেই জলের উৎপত্তি—যাহা অবশ্যই অসম্ভব।

তস্যাপ্যস্তিত্বমিত্যেবং বর্ততে ব্যতিরেকিণী।
বিভক্তিস্তস্য চান্যস্য ভাবেঽনিষ্ঠা প্রসজ্যতে॥ ৫৭৭॥

অর্থাৎ, ষট্‌পদার্থের অতিরিক্ত অস্তিত্বরূপ আর একটি ধর্ম স্বীকার করিলেই যে পূর্বপক্ষী রক্ষা পাইবেন তাহা নহে; অস্তিত্বও যখন একটি বস্তু তখন সেই অস্তিত্বেরও

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখানে অস্তিত্বরূপ একটি বিশেষ ধর্মের কথা হইতেছে।

আবার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন যে ধর্ম হইতে পৃথক্ ধর্মী সম্বন্ধেই কেবল ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুতরাং "অস্তিত্বের অস্তিত্ব" বলিলেই স্বীকার করা হইল যে এই দুই অস্তিত্বের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু এ-কথার কি কোন অর্থ হয়? তাহার উপর আবার অস্তিত্বের অস্তিত্ব বলিয়াই শান্তি নাই—তাহারও আবার অস্তিত্বের কথা উঠিতে বাধ্য; কিন্তু তাহা হইল অনবস্থা দোষ। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে প্রয়োজন হইলে অনবস্থাও স্বীকার করিতে হইবে, তবে উত্তর :—

অন্যধর্মসমাবেশে প্রাপ্তা তত্র চ ধর্মিতা।
দ্রব্যাদেরপি ধর্মিত্বমস্মাদেব চ সংমতম্॥ ৫৭৮॥

অর্থাৎ, অস্তিত্বের অস্তিত্ব, তাহার আবার অস্তিত্ব—এইরূপ করিয়া উত্তরোত্তর অস্তিত্বা-বলীর যে অনন্ত শৃঙ্খল পাওয়া যাইবে তাহার প্রত্যেকটিই হইবে ধর্মী; কিন্তু তাহা হইলে ধর্মীর সংখ্যা হইয়া পড়িবে অনন্ত, অথচ পূর্বপক্ষী বলেন যে ধর্মী ষট্‌সংখ্যক (ষট্‌পদার্থ)। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, ষট্‌পদার্থের অস্তিত্ব বলিতে বুঝায় যে এই ছয়টি পদার্থই কেবল সেই প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে যদ্দারা সদ্বস্তুর উপলব্ধি হয়; এবং ষট্‌পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞানই হইল পদার্থের উপলব্ধিযোগ্যতার প্রমাণ, কারণ এই বিজ্ঞান থাকিলে তবে পদার্থকে সৎ বলা যাইতে পারে। অতএব বলা যাইতে পারে যে জ্ঞেয়ত্ব হইল জ্ঞানজনিত এবং অভিধেয়ত্ব হইল নামজনিত। সুতরাং ষষ্ঠীবিভক্তির ব্যবহারে যে গুণী ও গুণের পার্থক্য বুঝায় তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই—অনবস্থা বা সপ্তম পদার্থের কথা এখানে উত্থাপন করাই অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু পূর্বপক্ষীর এই সকল যুক্তি কল্পনা মাত্র। পূর্বপক্ষী যে অতিরিক্ত পদার্থের (অস্তিত্ব) কথা বলিতেছেন তাহা যদি অর্থক্রিয়াসমর্থ (capable of producing effective action) হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই পদার্থ; পূর্বপক্ষী যদি কেবলমাত্র নূতন এক পদার্থ অস্বীকার করিবার জন্যই ষষ্ঠীবিভক্তি প্রয়োগ করিয়া বলেন ইহা "তাহাদের" অস্তিত্ব—তাহা হইলে তো প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধই নাই! কারণ বস্তুতঃ যাহা পৃথক্ নহে, ইচ্ছা করিয়া যদি লোকে তাহাকে পৃথক্ বলে, তাহাতে প্রকৃত কোন বিরোধের উৎপত্তি হইতে পারে না। এতদ্দারা প্রমাণিত হইল যে ষষ্ঠীবিভক্তির ব্যবহার হইতে গুণ ও গুণীর পার্থক্য কল্পনা করা অযৌক্তিক।

পূর্বপক্ষী (৫৬১ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে সূত্র ও বস্ত্রের কর্তা ও শক্তি বিভিন্ন। বৌদ্ধ এক্ষণে তদুত্তরে বলিতেছেন :—

প্রথমেভ্যশ্চ তন্তুভ্যঃ পটস্য যদি সাধ্যতে।
ভেদঃ সাধনবৈফল্যং দুর্নিবারং তদা ভবেৎ॥ ৫৭৯॥
প্রাপ্তাবস্থাবিশেষা হি যে জাতাস্তন্তবোঽপরে।
বিশিষ্টার্থক্রিয়াসক্তাঃ প্রথমেভ্যোঽবিলক্ষণাঃ॥ ৫৮০॥

অর্থাৎ, বস্ত্রের সহিত প্রথম সূত্রগুলির পার্থক্য প্রমাণ করাই যদি পূর্বপক্ষীর উদ্দেশ্য হয় তবে

তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক (কারণ কেহই সে কথা অস্বীকার করে না)। এবং পরেও অপর যে-সমস্ত বিশেষ অর্থক্রিয়াসম্পন্ন সূত্র একটি বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেগুলিও প্রথম সূত্রাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ নহে।—বিশেষ অর্থক্রিয়াবিশিষ্ট পরবর্তী সূত্রাবলী বলিতে বুঝাইতেছে বস্ত্র। সূত্রাবস্থার সূত্র এবং বস্ত্রাবস্থার সূত্র ক্ষণিকত্ববশতঃ এক হইতে পারে না বলিয়াই শান্তরক্ষিত এই দুই অবস্থার সূত্রের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু যদি পূর্বপক্ষী বলেন, যে-সকল সূত্র বস্ত্রের সমকালীন সেগুলি হইতেও বস্ত্র পৃথক্—তাহা হইলে কিন্তু হেতু অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে :—

এককার্যোপযোগিত্বজ্ঞাপনায় পৃথক্শ্রুতৌ।
গৌরবাশক্তিবৈফল্যদোষত্যাগাভিবাঞ্ছয়া ॥ ৫৮১ ॥
সাকল্যেনাভিধানেন ব্যবহারস্তু লাঘবম্।
মন্যমানৈঃ কৃতা যেষু বাগেকা ব্যবহর্তৃভিঃ ॥ ৫৮২ ॥
তেভ্যঃ সমানকালস্তু পটো নৈব প্রসিধ্যতি।
বিভিন্নকর্তৃসামর্থ্যপরিমাণাদিধর্মবান্ ॥ ৫৮৩ ॥

অর্থাৎ, একই কার্যে উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক সূত্রের পৃথক্ শ্রুতি (separate mention) বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহাতে শব্দগৌরব, অশক্তি, বৈফল্য প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। সমস্ত সূত্রের যদি একটি কথার দ্বারা (যেমন "বস্ত্র") উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে বাগ্‌ব্যবহারের অনেক লাঘব হইবে—ইহা মনে করিয়া লোকে বহু সূত্রের প্রতি একটি মাত্র শব্দ ("বস্ত্র") ব্যবহার করিলেও সেই সূত্রের দ্বারা কিন্তু সূত্রের সহিত সমকালভাবী বস্ত্রও প্রমাণিত হইবে না, কারণ বস্ত্রের কর্তা, শক্তি, পরিমাণ সবই সূত্র হইতে পৃথক্।—শান্তরক্ষিত যদিও এই কারিকাত্রয়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। সূত্র ও বস্ত্রের সমকালীনতার কথা বার-বার বলা হইয়াছে তাহার কারণ ক্ষণিকত্বপক্ষে বস্ত্রটি প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে। কাজেই বস্ত্র বয়ন শেষ হইলেও প্রতিক্ষণে যে নূতন বস্ত্রের অভ্যুদয় হইতেছে তাহাতে কিন্তু আগে সূত্র পরে বস্ত্র এরূপ কথা চলিবে না। এক্ষেত্রে সূত্র ও বস্ত্র পৃথক্ হউক বা না হউক তাহারা যে সমকালীন তাহা নিঃসন্দেহ। ফলকথা এই যে বৌদ্ধ সমকালীন বস্ত্র ও সূত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে, শব্দগৌরব পরিহারের উদ্দেশ্যেই কেবল লোকে সূত্রগুলির প্রত্যেকটি পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ না করিয়া সবগুলিকে একসঙ্গে "বস্ত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহার উপর আবার প্রত্যেক সূত্রের বিশিষ্ট রূপ নির্দেশ করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু কার্যতঃ তাহাও অসম্ভব। সমস্ত বস্তু বুঝাইবার জন্য যেমন "জগৎ" "ত্রিভুবন", "বিশ্ব" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ বহু সংখ্যক সূত্র একসঙ্গে বুঝাইবার জন্যই লোকে "বস্ত্র" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। কাজেই সূত্রাবলী হইতে পৃথক্ কোন বস্ত্রের সত্তা স্বীকার করা যায় না। (ক্রমশঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বঙ্গাভিধানের পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ.

[৭]

১৮৩০ খ্রীঃ

বোর্ড অফ এডুকেশনের গ্রন্থ তালিকায় ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ফর্ষ্টারের অভিধানের বাঙলা ইংরেজী খণ্ডের নিম্নোক্ত উল্লেখ আছে—"Vocabulary H. P. Foster- 1825. A Vocabulary Bengali and English arranged in alphabetical order".—[B. E. Cat. p. 12.] ১৭৯৯ ও ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ফর্ষ্টারের অভিধানের পরবর্তী কোন সংস্করণের উল্লেখ লংএর তালিকা অথবা বাঙলা গভর্নমেণ্টের নথিপত্র সংগ্রহে কোথাও নাই। বোর্ড অফ এডুকেশনের গ্রন্থ তালিকায়, ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত যে বাঙলা ইংরেজী অভিধানের উল্লেখ আছে, তাহার কোন খণ্ড এযাবৎ দেখি নাই; কিন্তু ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ইংরেজী বাঙলা অভিধানের পুনর্মুদ্রণ দেখিয়াছি। নিম্নে এই খণ্ডের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল। ইহা প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ বলিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী শব্দ ও তাহাদের অর্থ উদ্ধৃত হইল না।

"A / Vocabulary. / In two parts, / English and Bengalee, / And / Vice Versa. / By H. P. Forster, / Senior Merchant on the Bengal Estublishment. / Vox Et Praeterea Nihil / Calcutta. / Reprinted at No 70 Cossitollah Street. / 1830. /" pp. × × + 420 + ?, Size 10" × 7½" inches.*

১৮৪০ খ্রীঃ

কয়েক খানি আধুনিক বাঙলা অভিধানে প্রত্যেক শব্দের অর্থ নির্দেশ করিয়া শব্দের ধাতু, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন এবং স্থল ভেদে উচ্চারণ নির্দেশ করা থাকে। প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশের প্রচলন প্রায় ছিল না। একমাত্র অমর কোষের অন্যতম টীকাকার ত্রিকাণ্ডশেষ প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম দেবের "বর্ণদেশনা" গ্রন্থে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশের আংশিক প্রয়াস দৃষ্ট হয়। আধুনিক বাঙলা অভিধানে উচ্চারণ নির্দেশের যে পরিচয় পাই, তাহা সম্ভবতঃ ইউরোপীয় অভিধান হইতে গৃহীত।

বাঙলা সাহিত্যে ইউরোপীয় নানা ভাষার শব্দ প্রয়োগ করিতে যাইয়া বিভিন্ন লেখকেরা ইউরোপীয় শব্দের যে বাঙলা লিপ্যন্তর নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই এক না হইয়া একাধিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বহুশ্রুত Shakespeare

* এই গ্রন্থের এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

ও Maxmuller এই দুইটী নাম উল্লেখ করিতে পারি। কেহ কেহ প্রথম নামটী সেক্সপীয়র সেক্সপীয়ার, সেক্ষপীর প্রভৃতি রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ Maxmuller বাঙলায় মেক্সমূলর, মেক্সমূলার আবার স্থলভেদে মোক্ষমূলর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জন সাধারণের মধ্যে একই নাম বা শব্দের একাধিক উচ্চারণের প্রচলন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া, কয়েকখানি অভিধানে বহু ইউরোপীয় শব্দের বাঙলা লিপ্যন্তর নির্দেশ করা আছে।

মূল বাইবেল গ্রীক ভাষায় রচিত। গ্রীক ভাষা হইতে ইহা ইংরেজীতে অনূদিত হয়। বহু ইউরোপীয় মিশনারী বাইবেল ইংরেজী হইতে বাঙলায়, আবার কেহ কেহ মূল গ্রীক হইতে বাঙলায় অনুবাদ করেন। একাধিক ব্যক্তি দ্বারা একই গ্রন্থ অনূদিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, বাইবেলোক্ত বহু নামের বাঙলা লিপ্যন্তর বিভিন্ন অনুবাদকের লেখায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সময় কয়েকজন মিশনারী একই নামের একাধিক লিপ্যন্তর লক্ষ্য করিয়া—কি ভাবে একই নামের একই লিপ্যন্তর ভারতীয় সকল প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহার করা চলে, তাহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে ঠিক এক শতাব্দী পূর্বে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বেপ্টিষ্ট মিশনারীদের দ্বারা একখানি খ্রীস্টধর্মগ্রন্থোক্ত নাম সূচী সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের নামসমূহ রোমান বর্ণানুক্রমে রোমান অক্ষরে সজ্জিত। প্রত্যেক নামের পাশে বঙ্গাক্ষরে সেই নামের বাঙলা লিপ্যন্তর নির্দেশ করা আছে। বাঙলা অভিধানের পরিচয় মূলক এই প্রবন্ধে খ্রীস্টধর্মগ্রন্থোক্ত এই নাম সূচীর উল্লেখ করা হইল। অভিধানের প্রধান অঙ্গ শব্দের অর্থ নির্দেশ, আলোচ্য গ্রন্থে শব্দের অর্থ নির্দেশ না করিয়া অভিধানের গৌণ অঙ্গ উচ্চারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রায় সাড়ে তিন হাজার নাম প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১৭।১৮টী করিয়া মুদ্রিত আছে। এই নাম সূচীর নিদর্শন স্বরূপ ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১১টী নাম এবং তাহাদের বাঙলা লিপ্যন্তর নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

Aaron	হারোণ্
Abacuc	হবক্কূক্
Abaddon	অবাদ্দোন্
Abagtha	অবগথ
Abana	অবানা
Abarim	অবারীম্
Abada	অবদ্
Abdi	অব্দি
Abdiel	অব্দীয়েল্
Abdon	অব্দোন্
Abednego	অবেদ্নিগো

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই :—

"List / Of / Proper Names / Occurring in the / Sacred Scriptures. / Designed to form the basis of a uniform method / Of spelling the Proper Names of Scripture / In the languages of India. / By / The Calcutta Baptist Missionaries. / English and Bengali / Calcutta. / Printed at the Baptist Mission Press, / Circular Road. / 1840. /" pp. XIII + 1 + 200 ; আকার ৬½"×৪" ইঞ্চি।*

১৮৫৬ খ্রীঃ

কেরীর নির্দেশে জন ক্লার্ক মার্শম্যান কেরীর অভিধান অবলম্বনে এক সংক্ষিপ্ত বাঙলা ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮২৭ ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। প্রবর্তকের "প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে [১৩৪৪, পৌষ ; পৃ° ৩১৯-৩২০ দ্রষ্টব্য] উক্ত সংক্ষিপ্ত সংস্করণের পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে ; এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র ও উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্তমানে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত উক্ত অভিধানের এক সংস্করণ দেখিতে পাইয়াছি। এই সংস্করণের আখ্যাপত্রে ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া নির্দেশ করা আছে। এই উক্তি ভ্রমাত্মক। আমরা ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি এবং তাহার সম্বন্ধে আলোচনা ও করিয়াছি। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের পরবর্তী কোনও সংস্করণ হইবে। এই সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ ও নহে ; কারণ এই সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণে নাই, তেমন কয়েকটী শব্দ পাইতেছি। অর্থের দিক্ দিয়াও দ্বিতীয় সংস্করণ ও আলোচ্য সংস্করণে স্থানে স্থানে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিম্নে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

"A/ Dictionary / Of / The Bengalee Language. / vol. I. / Bengalee and English. / Abridged from / Dr. Carey's Quarto Dictionary./ Second Edition. / Serampore. / Printed at the "Tomohur" Press. /Sold at the Press, and also at the Calcutta School Book / Society's Depository and by all the Principal / Book-sellers in Calcutta./ 1856." /pp. 531, size. 9¼"×5½" inches.†

১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ

"শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত" শব্দাম্বুধির প্রথম সংস্করণ ১৭৭৫ শকে [১৮৫৩-৫৪ খ্রীঃ], দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৭৮ শকে [১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ], তৃতীয় সংস্করণ ১৭৮০ শকে [১৮৫৮-৫৯ খ্রীঃ], এবং চতুর্থ সংস্করণ ১৭৮৮ শকে [১৮৬৬-৬৭ খ্রীঃ] মুদ্রিত হয়। আমরা প্রবর্তকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের

* এই গ্রন্থের এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

† এই গ্রন্থের এক খণ্ড শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

চৈত্র সংখ্যায় "প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে "শব্দাম্বুধির" প্রথম ও চতুর্থ সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। নিম্নে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা :—

"শব্দাম্বুধি। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত। / বহুতর সংস্কৃত শব্দ / সহকৃত / গৌড়ীয় সাধুভাষান্তর্গত বহুল শব্দের / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / এবং / অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়া বুভৌ। / নৈব শব্দাম্বুধেয়ঃ পারং কিমন্যে জড় বুদ্ধয়ঃ॥ / কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে সংশোধনানন্তর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৭৮।" / পৃ°৵+৬১৫ ; আকার ৭½"×৫" ইঞ্চি।

তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র যথা :—

"শব্দাম্বুধি। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত / বহুতর সংস্কৃত শব্দ / সহকৃত / গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের / অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। / শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ / এবং / অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক / কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ' কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ। / নৈব শব্দাম্বুধেয়ঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ / কলিকাতা। / সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে সংশোধনানন্তর তৃতীয়বার মুদ্রিত। / শকাব্দা ১৭৮০।" / পৃ°৵+৬১৫ ; আকার ৭"×৪½" ইঞ্চি।*

১৮৬১ খ্রীঃ

শ্রীভারতীর দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় [১৩৪৬, কার্তিক] গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত "শব্দসার" অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। সোমপ্রকাশের ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের সংখ্যায় এই অভিধানের এক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নিম্নে এই সমালোচনা উদ্ধৃত হইল।

সোমপ্রকাশ বাং ১২৬৮।৪ আষাঢ়, ইং ১৮৬১।১৭ জুন

শব্দসার

"কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শব্দসার নামে এক বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করেন এই গ্রন্থ তাঁহাদিগেরই যে কেবল উপকারকারী হইবে এরূপ নহে সংস্কৃত ব্যবসায়ীরাও এতদ্দ্বারা বহুধা উপকৃত হইবেন। দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার সমধিক অনুশীলন হইতেছে, এতাদৃশ সময়ে এবম্বিধ অভিধান প্রণয়ণের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করা বাহুল্য। এই অভিধানের মূল্য ১।৷০ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। শব্দসার সঙ্কলয়িতা যে রীতিতে উল্লিখিত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার কৃত বিজ্ঞাপনের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

* শব্দাম্বুধির তৃতীয় সংস্করণ কোন্নগর লাইব্রেরীতে আছে।

"ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্য স্বর্গীয় ডাক্তার উইলসন সাহেব, বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে যে সংস্কৃত ভাষায় অভিধান গ্রন্থ সংগৃহীত ও ইংরাজী ভাষায় অর্থ সমেত দুইবার মুদ্রিত করেন, তাহার প্রথম বারের পুস্তকে অর্থ সমুদায় সপ্রমাণ সঙ্কলিত হইয়াছে সেই পুস্তক দৃষ্টে আমি এই শব্দসার অভিধানের আদর্শটি প্রথম প্রস্তুত করি। পরে, অবকাশ মতে যত পারিয়াছি কতকগুলি সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তাহার ব্যাখ্যান কারক মহাশয়দিগের ব্যাখ্যাত অর্থগুলির আবশ্যক রূপ সঙ্কলন করিয়া ইহাতে বিন্যস্ত করিয়াছি। কিন্তু, যাবতীয় অথবা বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠ করণান্তর তদর্থবিশেষের সঙ্কলন পূর্বক ইহা প্রচার করাই উচিত ছিল, তাহা মানসও করিয়াছিলাম, কিন্তু সে মানস একেবারে সফল হইয়া উঠিল না; সুতরাং ইহাতে কদাচিৎ কোন আবশ্যক শব্দের ও অর্থের অভাব থাকিবার সম্ভাবনা রহিল; আমার মনোমধ্যে এই একটি বিলক্ষণ ক্ষোভ রহিয়াছে।"

"সংস্কৃত—সমুদ্রের মধ্যে যে সকল শব্দ শব্দশাস্ত্রে নিতান্ত প্রচলিত বোধ হইয়াছে, তাহাই এই কোষে সন্নিবেশিত করিয়াছি; এবং কোন্ শব্দ কোন্ অর্থে কোন্ লিঙ্গে প্রয়োগ হয়, তৎ-সূচনার্থে প্রতি শব্দের অন্তে (পু), (স্ত্রী), (ক্লী), (ত্রি), (ব্য) এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিন্যাস করিয়াছি; আর সদা দ্বিবচনান্ত কিম্বা বহুবচনান্ত শব্দগুলি (দ্বি), (বহু) ইত্যাকার শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। কেবল সংক্ষেপ মানসে এইমাত্র ত্রুটি স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যে সকল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরতা উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহার বিশেষ বিশেষ রূপ বিন্যাস করা প্রায় হয় নাই, কিন্তু কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ জ্ঞান থাকিলে তাহা প্রায় সকলেরই সুজ্ঞেয় হইতে পারিবে এই অনুমানে তাহা অবজ্ঞাত হইয়াছে। এবং লিঙ্গ জ্ঞান ও অর্থ প্রতীতি হইলে অনায়াসে শক্তি গ্রহ হইবার সম্ভাবনা, এই বিবেচনায়, বিশেষ্য বিশেষণের বিভেদ সূচক কোন চিহ্ন বিন্যস্ত হয় নাই আর কোন কোন স্থলে এককালে উভয় লিঙ্গের চিহ্ন বিন্যাস পূর্বক উভয় অর্থ লিখিত তাদৃশ স্থলে দর্শকগণ ক্রম প্রণালী অবলম্বন পূর্বক লিঙ্গ ও অর্থের সমন্বয় করিয়া লইবেন।"

পৃ° ৩৬৬

১৮৬৩-৬৪ খ্রীঃ

শ্রীভারতীর বর্তমান বর্ষের গত শ্রাবণ সংখ্যায় [পৃ° ৭২৯-৭৩১] কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার সংগৃহীত "শব্দার্থ প্রকাশিকা" অভিধানের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত সংখ্যায় শব্দার্থ প্রকাশিকার প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র মুদ্রিত হয়। নিম্নে ১৭৮৫ শকাব্দে [১২৭০ বঙ্গাব্দ] মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল।

"শব্দার্থ প্রকাশিকা। / অর্থাৎ / বিবিধ কোষ হইতে সঙ্কলিত বহুতর শব্দের / ধাতু সম্বলিত / অর্থ প্রকাশকগ্রন্থ। / শ্রীকেদার নাথ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে / শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার কর্তৃক সংগৃহীত / হইয়া / শ্রীযুত বিশ্বম্ভর লাহার অনুমত্যনুসারে / কলিকাতা / বৃন্দাবন বসাকের ইষ্ট্রীট ৩৭।১ নম্বর ভবনে / কবিতারত্নাকর যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দাঃ ১৭৮৫ সন ১২৭০ / এই গ্রন্থ যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি চিৎপুর / রোড

৯৭।২ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। / মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র।" / পৃ°২ + ৬৩৩ ; আকার ৯½"×৫¾" ইঞ্চি। *

১৮৬৪ খ্রীঃ

শ্রীভারতীর প্রথম বর্ষের ৭৩১ পৃষ্ঠায় [১৩৪৬, শ্রাবণ] ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত "শব্দ দীধিতি" অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের সোমপ্রকাশে এই অভিধানের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা মুদ্রিত হয়। নিম্নে বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা যথা যথ উদ্ধৃত হইল। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ দেখি নাই। নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা হইতে আমাদের অজ্ঞাত কয়েকটী তথ্য জানিতে পারিয়াছি।

সোমপ্রকাশ ১৫ আষাঢ় ১২৭১ বাং, ইং ১৮৬৪, ২৭ জুন।

"বিজ্ঞাপন

ধাতু ও লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত শব্দদীধিতি অভিধান প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও নূতন সঙ্কলিত শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন দেশ নগরাদির বর্তমান নাম যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তক খানি আট পেজী ফর্মার ৭০৮ (?) পৃষ্ঠা হইয়াছে। মুল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি (ডাকমাসুল সমেত) ৩॥০ (?) টাকা এবং বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি ৪ টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয়, ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয়ে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে অবিলম্বে পুস্তক পাইবেন। স্বাক্ষরকারিরা দুই মাসের মধ্যে পুস্তক গ্রহণ না করিলে বিনাস্বাক্ষর কারির মধ্যে গণনীয় হইবেন ইতি।

ঢাকা
নর্মাল বিদ্যালয়
৪ঠা আষাঢ় ১২৭১ — শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।"

৫২৩ পৃ°

সোমপ্রকাশ ২২ আষাঢ় ১২৭১ বাং, ইং ১৮৬৪৪, জুলাই।

শব্দদীধিতি। এখানি অভিধান। ঢাকা নর্মালস্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এতৎসংগ্রহ করিয়াছেন, যে প্রণালীতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে আমরা সংগ্রহ কর্তার লিখিত ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। উদ্ধৃত অংশ এই :—

"দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাবপ্রকাশক শব্দের অত্যন্ত অভাব আছে, সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণেতা মাত্রেই নূতন নূতন শব্দ প্রণয়ন ও অনেক অব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সমুদায় শব্দের অর্থ প্রায় কোন অভিধানেই পাওয়া যায় না, তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা পাঠক

* শব্দার্থ প্রকাশিকার দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে।

গণের নিকট এই ভাষা সময়ে সময়ে এক অভিনব ভাষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; আমি সেই অভাব পরিহারে কৃতসংকল্প হইয়া প্রথমতঃ নানাবিধ বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিয়া বহুসংখ্যক নূতন শব্দ সংগ্রহ করি। পরে নানাবিধ কোষ হইতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় শব্দ সংগ্রহ করিয়া ধাতু ও লিঙ্গ সহিত শব্দদীধিতি নামে এই অভিধানখানি প্রচারিত করিলাম। ইহাতে ইতরভাষাশব্দ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীন দেশ নগরাদির বর্তমান নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুগমার্থ ইংরাজী হইতে অনুবাদিত নূতন সঙ্কলিত শব্দের অর্থ মধ্যে মধ্যে ইংরাজীতেও লিখিত হইয়াছে।" ৫৩৫-৫৩৬ পৃ°।

১৮৬৫ খ্রীঃ

শ্রীভারতীর প্রথম বর্ষের ১৭৩ পৃষ্ঠায় [১৩৪৬, শ্রাবণ] ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত "শব্দার্থ রত্নমালার" সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছি। এই অভিধানের খণ্ডিত ও আখ্যাপত্র হীন এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্যের 'জ্যোতিষসার সংগ্রহ' গ্রন্থে 'শব্দার্থ রত্নমালা'র এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞাপন হইতে আলোচ্য অভিধানের মূল্য ৩৲ টাকা ও শব্দ সংখ্যা ন্যূনাধিক অশীতি সহস্র ছিল বলিয়া জানা যায়। নিম্নে এই বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইল।

"বিজ্ঞাপন।

শব্দার্থ রত্নমালা।

নানাবিধ কোষ শাস্ত্র হইতে শব্দোদ্ধৃত করিয়া ন্যূনাধিক অশীতি ৮০০০০ সহস্র সংখ্যক শব্দ অকারাদি ক্ষকারান্ত শব্দ সমূহের লিঙ্গ ভেদ থাকিবেক এবং তত্তৎ শব্দের যথার্থ বিস্তৃতার্থ হইবেক এবং প্রতি পৃষ্ঠার শিরোদেশে পরম্পরা প্রচলিত দৃষ্টান্ত বাক্য সম্বলিত।

স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ৩৲ অস্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ৪৲ টাকা।"

শ্রীমদ ভগবদ্‌গীতায় কথিত জ্ঞানের স্বরূপ

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি*

অনির্বাচ্যাবিদ্যা দ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো
বিবর্তা যস্যৈতে বিয়দনিলতেজোঽববনয়ঃ।
যতশ্চাভূদ্ বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদম্
নমামস্তদ্ ব্রহ্মাঽপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্ ॥

['ভামতী'-কারঃ]

অনির্বচনীয় দ্বিবিধ অবিদ্যাসহকৃত যে পরমাত্মদেবের বিবর্ত (তত্ত্বতঃ অন্যথাভাব সত্ত্বেও কল্পিত অন্যথাভাব) এই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এবং এই উচ্চ-নীচ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাঁহা হইতে উদ্‌ভূত, সেই অপরিমিত সুখ ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি।

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মন স্তব,
হ্যনাত্মবন্ধ স্তত এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্বিবেকোদিত বোধবহ্নি-
রজ্ঞানকার্যং প্রদহেৎ সমূলম্ ॥

[বিবেকচূড়ামণিঃ ৪৯]

তুমি পরমাত্মস্বরূপ, কিন্তু অজ্ঞানবশে অনাত্মবস্তুতে (দেহেন্দ্রিয়াদিতে) আত্মবুদ্ধি করিয়া তোমার আত্মবন্ধন ঘটিয়াছে, আর সেই হেতুই তোমার সংসার বন্ধন। আত্মা ও অনাত্মা এই উভয়ের বিচার দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানাগ্নি উক্ত অজ্ঞানকার্য (বন্ধন) অজ্ঞান সহিত ভস্মীভূত করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ম হইতে একাদশ শ্লোক কয়েকটি এই—

অমানিত্ব মদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তি রার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচম্ স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ দোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

---

* শ্রীগোবর্দ্ধন পীঠাধীন শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য স্বামী শ্রী১০৮ শ্রীশঙ্করতীর্থ যতি মহারাজ।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্ম জ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

একে একে এই কথাগুলির বিচার করা যাউক।

১। অমানিত্বম্—মানঃ মৎসমঃ কোঽপিনাস্তি ইতি স্বস্মিনি উৎকর্ষারোপঃ যস্য অস্তি ইতি মানী, মানিনঃ ভাবঃ মানিত্বম্ বিদ্যমানাবিদ্যমানগুণৈঃ আত্মশ্লাঘাস্বস্মিন্ উৎকৃষ্টত্ববুদ্ধিঃ, ন মানিত্বম্ আত্মনঃ শ্লাঘনম্ অমানিত্বম্ স্বগুণ শ্লাঘনাভাবত্বম্। আত্মজ্ঞানের শ্লাঘারাহিত্য। অপিচ লোকের নিকট কোনরূপ সম্মান প্রার্থনা না করা। বর্তমান অথবা অবর্তমান আপনার গুণকীর্তন-বর্জন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ক্ষুদ্রমনা, ঐহিক ভোগসুখে নিরত, সুতরাং অজ্ঞান, তাহারা স্বকীয় সুখ্যাতি পরের নিকট কীর্তন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। যাহারা পরের মুখে আপনার সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার জন্য লালায়িত, আত্মশ্লাঘা তাহাদের নিত্যসহচর।

২। অদম্ভিত্বম্—দম্ভঃ সম্মানলাভার্থং স্বধার্মিকতাপ্রকাশঃ যস্য অস্তি স দম্ভী, দম্ভিনঃ ভাবঃ দম্ভিত্বং স্বধর্মানুষ্ঠানপ্রকটীকরণং স্বমহত্ত্বস্য প্রকটনং, ন দম্ভিত্বম্ অদম্ভিত্বং দম্ভাভাবত্বম্। —স্বধর্ম প্রকটনের নাম দম্ভিত্ব। আমি ধার্মিক, আমি বিদ্বান ইত্যাদি অভিমান। তাহার অভাবের নাম অদম্ভিত্ব। ভাষা কথায় দম্ভরাহিত্য। গর্বিত লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা আপনাকে কদাচ ছোট মনে করে না। সর্বসাধারণের উপরে আপনাদের আসন মনোনীত করে। সকলের সহিত সমভাবে মিশিতে, সকলের সহিত সমভাবে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে দাম্ভিকেরা কদাচ পারে না। দাম্ভিক চিনিয়া লইবার এই একটি সঙ্কেত।

৩। অহিংসা—বাঙ্মনোদেহকর্মভিঃ পরপীড়ারাহিত্যং ভূতদয়া। বাক্য, মন, কায় দ্বারা প্রাণীগণের অপীড়া বা পরপীড়া বর্জন অর্থাৎ প্রাণীগণের প্রতি দয়া। ইচ্ছাপূর্বক আপনদেহের ব্যতিরিক্ত যে সকল দেহ আছে, তত্তাবত দেহে কোনরূপ যন্ত্রণা-দায়ক ব্যবহার না করা। আমরা স্বকীয় প্রাণরক্ষার জন্য কতকগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণীকে জলের সহিত উদরস্থ করি, চক্ষুর দুই পাতার সংঘর্ষে কতকগুলিকে মারিয়া ফেলি। চলিবার সময় পায়ের তলায় কতগুলিকে পিষিয়া মারি। আবার জ্বালানি কাষ্ঠ সহযোগে কতকগুলিকে চুল্লীতে আহুতি দেই। জাঁতা পিসিয়া, বাটনা বাটিয়া, সম্মার্জনীর আঘাত দ্বারা অনেকগুলিকে পরলোকে পাঠাই। এবম্বিধ ক্রিয়াদ্বারা অনুষ্ঠিত ব্যাপারগুলি শাস্ত্রকারগণ সর্বতোভাবেই পরপীড়াসংজ্ঞার অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কেননা, এগুলি না করিলে দেহযাত্রা নির্বাহ হয় না। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ পরপীড়া জন্মায় না। তবে যদি আমি, কতকগুলি মাছিকে একত্র বসিতে দেখিয়া সহসা আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলি, বা ইচ্ছাপূর্বক কতকগুলি পিপীলিকাশ্রেণী পদদলিত করিয়া যাই, অথবা মধু-আহরণ

জন্য মৌমাছিদিগকে আগুনে পুড়াইয়া মধু সঞ্চয় করি,—তাহা যথার্থ পরপীড়ণ (প্রাণীহিংসা) শব্দে অভিহিত হইবে। স্বাধীনভাবে মৃগযুথ অরণ্যে বেড়াইয়া থাকে; আহার লোভে একটাকে হনন করিলে, উহা পরপীড়া। ছাগলগুলিকে কাটিয়া উদরস্থ করাও পরপীড়া। গগনবিহারী পাখীগুলিকে গুলি করিয়া হত্যা করা পরপীড়া। এবম্বিধ পরপীড়াবর্জনের নাম অহিংসা। আরও একটি কথা,—সংসারে তিনটি মাত্র তাপ আছে,—একটি বন্ধু বিয়োগ, একটি অর্থহানি আর একটি বাক্যবাণ (পরকে ভয় প্রদর্শন এবং কঠোর বাক্যে মর্মচ্ছেদন)। এই তৃতীয় স্থানীয় বাক্যবাণ দ্বারাও পরপীড়া জন্মে। প্রাণীগণের প্রতি মৈত্রাদিভাব পোষণ না করিলে অহিংসা-পালন পূর্ণ হইতে পারে না। এবং সর্বথা বাহ্যবিষয়ক স্বার্থপরতা ত্যাগ না করিলেও অহিংসাপালন সম্ভবপর হয় না; যেহেতু বাহ্য সুখ খুঁজিতে গেলেই পরকে পীড়া দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পরবোধ থাকিতে কেহ হিংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। আত্মা সর্বগত এই বোধ যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে হিংসা থাকিতে পারে না। যথার্থতঃ অহিংসাধর্মের পালন আত্মজ্ঞান না হইলে হয় না।

৪। ক্ষান্তিঃ—পরেণ অপকৃতেঽপি চিত্তস্য অবিকৃততা তদপরাধসহনং চ।—পরের অপরাধ গ্রহণ না করা; অপিচ অকাতরে পরপীড়া সহ্য করা। ভাষা কথায় সহিষ্ণুতা। দেহের প্রতি যাহাদের অত্যন্ত মমতা, তাহারা সহিষ্ণু হইতে পারে না। দেহ চালনার পথের প্রতিবন্ধকরূপে যে সকল ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে পরের দ্বারা অনিষ্ট-সংঘটন একটি। স্বভাবতঃ যাহারা পরানিষ্টকারী, তাহাদের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াও, তাহাদের কৃত অপরাধ গ্রহণ বা স্মরণ না করা ক্ষান্তির লক্ষণ। অপিচ শরীরের মধ্য হইতে জাত, কিংবা শরীরের বাহির হইতে আগত কতকগুলি সুখদুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অবিচলিত থাকার নাম সহিষ্ণুতা। শীত বাতাদি জনিত ক্লেশ, পুত্র ও অর্থহানি নিবন্ধন তাপ, যাঁহাকে স্পর্শ করে না, তিনই সহিষ্ণু। "চিন্তা-বিলাপ-রাহিত্যেন আধ্যাত্মিকাদ্যুপদ্রবসহনংক্ষান্তিঃ" (শ্রীশংকরানন্দ যতিবরঃ)।

৫। আর্জবম্—সারল্যম্ অকুটিলস্বাভাবত্বম্। "যথাহৃদয়ং ব্যবহরণম্ পরপ্রতারণা-রাহিত্যমিতি যাবৎ" (শ্রীমধুসূদন যতিবরঃ)। সরলতা, অবক্রতা, কুটিলতা পরিত্যাগ। মানসিক ও শারীরিক ব্যবহার যাঁহাদের একভাবাপন্ন অর্থাৎ যাঁহারা মনে মুখে একরূপ আচরণ করেন, তাঁহারা সরল। সরল ব্যক্তি কখনও পরপ্রতারণা করিতে পারে না। সারল্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। অসত্যবাদীরা কদাচ সরল ব্যবহার করিতে পারে না। আমাদের যেমন অবস্থাভেদে ও কার্যভেদে আটপৌরে ও পোষাকী পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়,—এই ব্যবহারটী সারল্যের পরিপন্থী। কারণ সরল ব্যবহারের সহিত সত্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায়, অবস্থাভেদ ও কার্যভেদের সম্ভাবনা থাকে না বা থাকিতে পারে না। সরল সর্বদাই সত্যরূপে প্রতিভাত। তাহাতে অসত্য ও কাপট্যের ছায়া নাই। সরল লোকদের বাহিরে ভিতরে একভাব। আত্মা, পুত্র, মিত্র, কলত্র এবং শত্রু এই সকলের প্রতি একরূপ দৃষ্টি না থাকিলে আর্জবধর্মের রক্ষা হইতে পারে না।

৬। আচার্যোপাসনা—আচার্যঃ মোক্ষসাধনস্য উপদেষ্টা, তস্য উপাসনং শ্রদ্ধাভক্তিভ্যাম্ নমস্কার শুশ্রূষাদিনা সেবা।—যে আত্মজ্ঞ পুরুষ মোক্ষসাধনের উপায় প্রদর্শন করাইয়াছেন, তাঁহার পরিচর্যা। এখনকার দিনের গুরুসেবার অর্থ অন্যরূপ হইয়াছে। নিরন্তর আচার্যের সাহচর্যে থাকিয়া আচার্যের অন্তর্নিহিত গুণরাশি অনুকরণে স্বতঃই শিষ্যের প্রবৃত্তি জন্মে। দুরবগাহ মোক্ষদায়িকা বৃত্তির স্ফুরণ, আচার্যের সাহায্য ভিন্ন লাভ করা যায় না। এজন্য প্রথম সাধনের অবস্থায় আচার্যের সহচররূপে দীর্ঘকাল বাস করার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে গুরুগৃহে বাস করার নাম ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্ম বা বেদলাভের নিমিত্ত যে ব্রত আচরণীয়, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য।

৭। শৌচম্—শারীরমনসোঃ দ্বিবিধং শোধনম্। শারীরং (বাহ্যং) কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং ক্ষালনম্ অস্পৃশ্যাভক্ষ্যভোজনত্যাগশ্চ, মানসং চ (অন্তশ্চ আভ্যন্তরং চ) মনসো রাগাদিমলানং বিষয়দোষদর্শনরূপ মোক্ষপ্রতিপক্ষভাবনয়া অপনয়ঃ।—শৌচ দ্বিবিধ; শারীরিক (বাহ্য) শৌচ ও মানসিক (অন্তঃ) শৌচ। মৃজ্জলাদি দ্বারা নিজ দেহমলক্ষালন এবং মেধ্যাহার ভোজনকে বাহ্যশৌচ বলে। পচা, দুর্গন্ধ, মাদক, অস্বাভাবিকরূপে কোন শরীরযন্ত্রের উত্তেজক, এরূপ দ্রব্য অমেধ্য। অমেধ্য আহার ভোজনে এবং অমেধ্য দ্রব্যের সংসর্গে চিত্তমলিন হয় এবং শরীর সাধনোপযোগী কর্মণ্যতাশূন্য হইয়া পড়ে। অতএব অমেধ্য দ্রব্যের সংসর্গ ও অমেধ্য আহার সর্বদা ত্যাজ্য। অমেধ্যের বিপরীত যাহা, তাহা মেধ্য। মদ, মান, অসূয়া, অনুরাগ ও আসক্তিরূপ মনোমল অপনয়নের নাম অন্তঃশৌচ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা অন্তঃশুচি হওয়া যায়। শৌচাচরণের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের বিশেষ সহায়তা হয়।

'পাতঞ্জল দর্শনে শৌচকে নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পতঞ্জলি দেব বলিয়াছেন, "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ"—শৌচধর্ম পালন করিতে করিতে যতির স্বদেহের প্রতি জুগুপ্সা—ঘৃণার উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং অন্য সংসর্গে প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব হয়। যতই শৌচধর্মের অনুষ্ঠান করিবে, ততই নিজ শরীরের প্রতি ঘৃণা—'শরীরে কত ময়লা লইয়াই রহিয়াছি!' এইরূপ জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বহুবার শৌচ করিয়াও যখন দেখিবে যে শরীরকে কিছুতেই পূর্ণরূপে অমল করিতে পারা যায় না, তখন নিজ শরীরকেই পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে; অতএব তখন পরকীয় শরীরকে স্পর্শ করিতে কি আর ইচ্ছা হইতে পারে? মননকেই মানস শৌচ বলে। [কিরূপ মনন?] আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? এই জগৎটার কোথা হইতে কিরূপে উৎপত্তি হইল? আমি কি চিরদিনই এইরূপ থাকিব? চিরদিনই কি ভোজনাদিতে রত থাকিব? আমি কি করিয়া এমন মলিন ও দুঃখী হইলাম? না, আমি বস্তুতঃ মলিন নহি, আমি শুদ্ধ-আত্মা, অত্যন্ত নির্মল, আমার আবার ময়লা কোথায়? আত্মা ত অত্যন্ত নির্মল, অতএব তাহার শৌচের আবশ্যকতা নাই, এবং এই দেহ অত্যন্ত মলিন, সহস্র শৌচ দ্বারাও ইহার পূর্ণ শৌচবিধান করা যাইতে পারে না; অতএব কাহার শৌচ বিধান করা যাইবে? ইত্যাকার মননই প্রকৃত শৌচ। বাহ্যশৌচের অবশ্য অবশ্যকতা আছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টাই প্রকৃত

শৌচ। 'এই আন্তর জ্ঞান-শৌচ ত্যাগ করিয়া যে মূঢ় কেবল বাহ্য শৌচেরই অনুষ্ঠানে রত হয়, সে নিশ্চয়ই কাঞ্চনকে ত্যাগপূর্বক লোষ্ট্রকে গ্রহণ করিয়া থাকে' (যোগতত্ত্বসার)।

৮। স্থৈর্যম্—"স্থিরভাবঃ মোক্ষমার্গে এব কৃতাধ্যবসায়ত্বম্" (ভাষ্যকারঃ শ্রীশংকরঃ) "মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তস্য অনেকবিধবিঘ্নপ্রাপ্তৌ অপি তদপরিত্যাগেন পুনঃপুনঃ যত্নাধিক্যম্" (শ্রীমধুসূদনযতিবরঃ)। "সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা" (স্বামী শ্রীধরঃ)। "মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তস্য বিঘ্নসম্ভাবেঽপি তদগননম্" (নীলকণ্ঠঃ)। নিগৃহীতস্য মনসো নৈশ্চল্যেন মোক্ষেচ্ছয়া শ্রবণাদৌ এব স্থাপনং স্থৈর্যম্" (শ্রীশংকরানন্দ যতিবরঃ)।—স্থিরভাব, অচাঞ্চল্য। সৎপথে চলিবার প্রবৃত্তি সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা। মোক্ষসাধনের প্রবৃত্তির বিঘ্নসমূহের অপসারণ জন্য পুনঃপুনঃ যত্নের আধিক্য। বিষয়দোষদর্শনরূপ প্রতিপক্ষ ভাবনাদ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করার পর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনসময়ে বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও শ্রবণাদি ত্যাগ না করিয়া তদ্বিষয়ে একনিষ্ঠতার নাম স্থৈর্য।

৯। আত্মবিনিগ্রহঃ—আত্মনঃ অন্তঃকরণস্য দেহেন্দ্রিয়বর্গস্য চ বিনিগ্রহঃ আত্মাতিরিক্তেষু বিষয়েষু প্রবৃত্তি-নিরোধঃ, শরীরসংযমঃ মনোনিরোধশ্চ।—মোক্ষমার্গ প্রাপ্তির জন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সংযতাভ্যাস এবং কার্যকারণের সংঘাত নিবন্ধন চিত্তের যে বিকার জন্মে তাহার নিরোধ আত্মনিগ্রহের তাৎপর্য। মন বাক্য শরীরকে সৎপথে (মোক্ষসাধনে) চালিত করার অভ্যাসই আত্মনিগ্রহ।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্—ইন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণাম্ অর্থাঃ দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়াঃ ইন্দ্রিয়ার্থাঃ তেষু ইন্দ্রিয়ার্থেষু ঐহিক-পারত্রিক-শব্দাদি ভোগ্যবিষয়েষু বৈরাগ্যম্ দোষদর্শনেন মিথ্যাদর্শনেন চ রাগাভাবঃ।—বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট, শ্রুত ইত্যাদি জনিত ভোগাদির প্রতি চিত্তবৃত্তির যে বিরাগ বা বিতৃষ্ণা, তাহার নাম ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য। বহিরিন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে,—তাহাই ইন্দ্রিয়ার্থ। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সাধারণ চেষ্টা এই যে, তাহারা জন্মান্তরীয় সংস্কার-প্রভাবে মনোবৃত্তির উপর আপনাপন বহির্মুখী কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। [এ সম্বন্ধে কঠ-শ্রুতি এই—"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"। ইহার ভাবার্থ এই—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সেইহেতু জীব বাহ্যবস্তুই দর্শন করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দর্শন করিতে পায় না]। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাতেই তাহার ভোগাভিলাষ জন্মে। সুতরাং শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও সহসা সেই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। এবম্বিধ অভ্যাস যাহাদের দৃঢ়তর, সহজে তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরও বিতৃষ্ণা যে হইতে পারে, এ ভাবও তাহাদের মনে স্থান পায় না। এতদ্ভিন্ন পূর্ব সংস্কার অনুরূপ মনোজাত ভোগাদির প্রতি বিতৃষ্ণাও ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যের অপর লক্ষণ। বিষয়ের দোষদর্শনে বিষয়ভোগে অরুচি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্।

১১। অনহঙ্কারঃ—কর্তা ভোক্তা অহমস্মি ইতি অভিমানঃ অহঙ্কারঃ তদভাবঃ

অনহঙ্কারঃ দর্পাভাবত্বম্। "জাত্যাদিষু অহংকারহেতুষু সৎস্থ অপি বন্ধকত্ববুদ্ধ্যা তদ্রহিত্বম্ অনহংকারঃ" (শ্রীশংকরানন্দযতিবরঃ)। "আত্মশ্লাঘনাভাবেঽপি মনসি প্রাদুর্ভূতঃ অহং-সর্বোৎকৃষ্ট ইতি গর্বঃ অহংকারঃ তদভাবঃ অনহংকারঃ" (শ্রীমধুসূদনযতিবরঃ)। অনাত্ম দেহাদির প্রতি আত্মখ্যাতি হইলে যে 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি' অভিমান হয়, তাহা বর্জনের নাম—অনহংকার। আত্মশ্লাঘা নিবন্ধন 'আমি সর্বোত্তম' মনে যে এইরূপ গর্বের ভাব আসে, তাহার বর্জনের নাম অনহংকার। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি এই সাড়ে তিন হাত দেহটি আমি, ইত্যাকার ভাবনা আমাদের সকলেরই বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এই ভাবনাটি কেবল এক জন্মের নহে, বহু জন্মের অভ্যাসের ফলরূপে আমাদের দেহে আত্ম-বুদ্ধির সঞ্চার হইয়াছে। ইহা বহুদিনের অভ্যাস ব্যতিরেকে বিমর্দিত হইবার নহে। এ সম্বন্ধে 'পঞ্চদশী'-কার বলেন,—

"বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিষ্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনঃ রুদেত্যেব জগৎ সত্যত্বধীরপি ॥"

দেহ, ইন্দ্রিয় আমি, এবং দৃশ্যমান জগৎ সত্য,—পূর্ব পূর্ব বহুজন্ম যাবৎ ইহা দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিয়া আসাতে সেই সংস্কার পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়ারই কথা।

১২। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্—জন্ম উৎপত্তিঃ চ মৃত্যুঃ প্রাণবিয়োগঃ চ জরা বৃদ্ধত্বং চ ব্যাধিঃ রোগঃ চ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধয়ঃ, দুঃখানি অসংখ্যক্লেশাঃ এব দোষাঃ অমঙ্গলাঃ দুঃখদোষাঃ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধীনাং দুঃখদোষাঃ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষাঃ তেষাম্ অনুদর্শনম্ শাস্ত্রং স্বানুভূতংচ অনুস্মৃত্য পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানম্।—জন্মজনিত, মৃত্যুজনিত, জরা ও ব্যাধি জনিত দেহে যে দুঃখোৎপত্তি হয়,—অনুক্ষণ তত্তদ বিষয়ের দোষ আলোচনা। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় উপভোগ নিবন্ধন দেহে যে দুঃখোৎপত্তি হয়,—নিয়ত তচ্চিন্তন দ্বারা স্বভাবত বৈরাগ্যোদয় হয়। এবং তাহার ফলে জীবের আত্মস্বরূপ নির্ণয়ের প্রবৃত্তির উদ্দীপন হয়।

১৩। অসক্তিঃ—সক্তিঃ বিষয়েষু ভোগেষু প্রীতিঃ সঙ্গঃ রাগঃ, তদভাবঃ অসক্তিঃ, সঙ্গনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীত্যভাবঃ।—মন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে তজ্জনিত বিষয়াদির সংস্পর্শ হেতু অন্তরে যে প্রীতি জন্মে, তাহার নাম আসক্তি। সর্বতোভাবে তাহা বর্জনের জন্য সাধন—অসক্তি।

১৪। পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ—পুত্রাশ্চ দারাশ্চ স্ত্রিয়শ্চ গৃহাশ্চ পুত্রদার-গৃহাঃ তে আদয়ঃ যেষাং ধনাদীনাং তে পুত্রদারগৃহাদয়ঃ তেষু পুত্রদারগৃহাদিষু। আদিশব্দেন ক্ষেত্র-বিত্তদাসপশ্বাদি স্নেহবিষয়ঃ গৃহ্যতে। অনভিষ্বঙ্গঃ অভিষ্বঙ্গঃ পুত্রাদিষু তাদাত্ম্যভাবনয়া পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী বা ইতি প্রীত্যতিশয়ঃ তস্য অভাবঃ অনভিষ্বঙ্গঃ। —শরীরের বাহির হইতে আগত দুঃখ দুর্দৈবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া—পুত্রদারাদির সুখ দুঃখে আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাকার যে ভাবনা তাহাকে অভিষ্বঙ্গ বলে, তাহা অজ্ঞানপ্রসূত। এতদ্বিষয়ক চিন্তা দ্বারা পুত্রদারাদিতে নিঃসঙ্গ হওয়া পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ। (ক্রমশঃ)

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

মন

মন অষ্টম দ্রব্য। ইহা প্রলয়কালীন পার্থিব পরমাণুর[১] ন্যায় নিত্য, নিরবয়ব, ক্ষুদ্রতম পরিমাণ বিশিষ্ট ও সর্ববিধ বিশেষগুণ শূন্য[২]। অতএব ইহাও সূক্ষ্ম।

একই ক্ষণে কাহারও বিজাতীয় একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া একাগ্রমনে কোন ঘটনা দেখিতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাক্ষুষজ্ঞান অর্থাৎ দর্শন-কার্য চলিতেছে ততক্ষণ সৌর কিরণের প্রচণ্ড উষ্ণতা অনুভূত হয় না, দর্শন সমাপ্তির পরেই অনুভব হইয়া থাকে—উঃ কি গরম, মাথা ফাটিয়া যাইতেছে। এই উষ্ণতার অনুভব—ত্বাচ-প্রত্যক্ষ। ইহার কারণ—সৌর কিরণ সংযোগ। উহা পূর্বোক্ত চাক্ষুষ-জ্ঞান কালেও ছিল, তথাপি তখন ত্বাচ-প্রত্যক্ষ হয় নাই। কারণ রহিয়াছে তথাপি কার্য কেন হয় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—যদি পূর্ব নির্দিষ্ট কারণ সকল মিলিত হইলেও কোন কার্য উৎপন্ন না হয় তবে ঐরূপ কার্যের প্রতি অপর কোন বস্তুকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। পূর্ব স্বীকৃত কোন পদার্থের দ্বারা যদি ঐ সমস্যার মীমাংসা না হয় তবে কেবল ঐজন্যই নূতন পদার্থও কল্পনা করিতে হয়। এরূপক্ষেত্রে ইহাই নিয়ম। প্রকৃত স্থলে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানের আরও এমন একটি কারণ আছে যাহা যখন যে-ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানোৎপত্তিরূপ স্বীয় কার্যে সমর্থ হয়, নতুবা হয় না, তখন অন্য ইন্দ্রিয়গুলি উহার অভাবে অসমর্থ থাকে। সুতরাং এই কারণ-বস্তুটি এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে একই ক্ষণে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে না পারে। এজন্য পরমাণু-পরিমাণবিশিষ্ট কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে এবং উহাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া মানিতে হইবে। ঐ দ্রব্যই মন। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, দর্শনকালে মন চক্ষুর সহিত মিলিত ছিল তাই তখন চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইয়াছিল এবং মস্তক পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে রৌদ্র লাগিলেও ঐস্থানে মন না থাকায় স্পর্শানুভব (ত্বাচ-প্রত্যক্ষ) হয় নাই[৩]।

১ জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর রস, রূপ ও স্পর্শ নিত্য। অন্য সময়ে পার্থিব পরমাণুতে গন্ধ প্রভৃতি বিশেষগুণ বিদ্যমান থাকে কিন্তু উৎপত্তিযোগ্য ভাব-পদার্থ হওয়ায় প্রলয় কালে উহারা বিনষ্ট হয়, সুতরাং তখনই মন উহার সহিত তুলনাযোগ্য।

২ 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ' এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে মন উৎপন্নবস্তু।

৩ 'অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্ অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি, মনসা হেব পশ্যতি—ইত্যাদি বৃহদারণ্যকো-পনিষৎ ১।৫।৩। কেহ কেহ জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য স্বীকার করিয়াছেন।

মন অত্যন্ত বেগশালী। বোধ-হয় বেগবিষয়ে কিছুই ইহার সমকক্ষ নহে। এজন্য ইহা এত শীঘ্র শরীরের সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে যে চক্ষু হইতে পদতল পর্যন্ত আসিবার বিলম্ব ও বুঝা যায় না। ফলে দর্শনকালের উক্ত একাগ্রতার মধ্যেই যদি পায়ে কাঁটা কিংবা সূচি বিদ্ধ হয় মন তৎক্ষণাৎ চক্ষু হইতে ঐস্থানে আসিয়া সূচির স্পর্শ এবং তজ্জনিত দুঃখ অনুভব করাইয়া দেয়।

এই প্রকারে অনুমান দ্বারা পরমাণুস্বরূপ[১] মন স্বীকারের ফলে জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য নিবারিত হইয়াছে এবং অত্যধিক বেগ বশতঃ উহা দ্রুতগতিশালী হওয়ায় একবিধ জ্ঞানের অব্যবহিত পরক্ষণে অন্যবিধ জ্ঞানের উৎপত্তির বিলম্ব লক্ষ্য করা যায় না।

লক্ষণ। যাহা স্পর্শবান্ নহে অথচ ক্রিয়াবান্ তাহাই **মন**। (অস্পর্শবত্বে সতি ক্রিয়াবত্বং মনস্ত্বং)

লক্ষ্য। সুগম। মন প্রত্যেক শরীরে একটি মাত্র[২]। জীবজাতির শরীর অসংখ্যেয় এজন্য মনের সংখ্যা ও গণনা বহির্ভূত। সকল মনই একপ্রকার অর্থাৎ কোন একটি মনেও অন্য মন অপেক্ষা বৈচিত্র্য নাই। এজন্য শাস্ত্রে ইহার বিভাগও দৃষ্ট হয় না।

সমন্বয়। মন সর্বদাই ক্রিয়াশীল, উহাতে কোনরূপ স্পর্শও থাকে না। অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বিত হইল। পার্থিব পরমাণু ক্রিয়াশীল। প্রলয়কালে উহাতে স্পর্শ না থাকিলেও সময় বিশেষে উহা স্পর্শবান্। যাহা স্পর্শবান্ তাহাকে স্পর্শবান্ হইতে ভিন্ন বলা যায় না।[৩] অতএব পার্থিব পরমাণুতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় নাই।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, (দিক্-কৃত) পরত্ব ও অপরত্ব এবং সংস্কার এই আট প্রকার গুণ, ক্রিয়া, সত্তা, দ্রব্যত্ব ও মনস্ত্ব—এই তিনটি জাতি, প্রত্যেকতঃ ১টী বিশেষ—মনে এই সমস্ত ভাবপদার্থের সমাবেশ হয়।

কায়ব্যূহ শাস্ত্রসম্মত। মনের নিত্যত্ব মানিলে এই কায়ব্যূহ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়। জীবের এমন কতকগুলি ধর্ম ও অধর্ম থাকে যাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রে উহার নাম প্রারব্ধ কর্ম, উহার বিনাশ কেবলমাত্র ভোগের দ্বারাই সম্ভব। যোগবলে ধর্ম ও অধর্মের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। যাঁহারা ধর্ম ও অধর্ম প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারা 'ঋষি' পদবাচ্য। প্রারব্ধ কর্ম প্রচুর হইলে ভোগের দ্বারা ঐগুলিকে বিনাশ করিতে বহুবার জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক হয়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যে সকল ঋষি মুক্তিলাভে ঐ প্রকার বহু জন্ম-

---

১ কুমারিল ভট্ট ও গুরু প্রভাকরের মতে মন বিভু-সর্বব্যাপী। মানমেয়োদয়, প্রমাণপরিচ্ছেদ ৪ পৃঃ। পাতঞ্জল সূত্রে কৈবল্যপাদের দশম সূত্রীয় ব্যাসভাষ্যে মনের বিভুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কোন মতে মন শরীরপরিমাণ।

২ প্রত্যেক শরীরে একাধিক মনের অস্তিত্বের কথা ন্যায়সূত্রের ৩য় অধ্যায়ে মনঃপরীক্ষা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

৩ অন্যোন্যাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি এই মতই সমধিক প্রচলিত। তদনুসারে যাহা একবার স্পর্শবান্ হইয়াছে তাহাকে কখনও 'স্পর্শবান্ নহে' এরূপ বলা যায় না।

গ্রহণজনিত বিলম্ব সহ্য করিতে না চাহেন তাঁহারা যোগবলে বহুবিধ শরীর সৃষ্টি দ্বারা এক সময়েই কর্মানুসারে সমুদায় ভোগ সম্পন্ন করিয়া প্রারব্ধের ক্ষয় করেন। এককালে এইরূপ বহু শরীর সৃষ্টিকেই কায়ব্যূহ বলে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যুগপৎ ভোগের জন্য বহু শরীর সৃষ্টি সম্ভব কিন্তু কেবল শরীরের দ্বারাই ভোগ নির্বাহ হয় না এইজন্য প্রত্যেক শরীরে মনও প্রয়োজনীয়। মন নিত্য, সুতরাং সৃষ্টির দ্বারা তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব নহে। সুতরাং কায়ব্যূহমতে প্রত্যেক শরীরের জন্য মন সুলভ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয়—অনাদি সংসারে অনেক জীব মুক্তি লাভ করিয়াছেন। শরীর না থাকায় তাহাদের মন ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। মুমুক্ষুগণ সৃষ্ট শরীরসমূহে যোগবলেই ঐ সকল মন আবিষ্ট করিয়া যথানিয়মেই ভোগ নির্বাহ করিতে পারেন[১]। অতএব কায়ব্যূহ সিদ্ধান্ত মনের নিত্যতার বিরোধী নহে।

আত্মা

আত্মা নবম দ্রব্য[২]। ইহা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম। আকাশ সূক্ষ্ম কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ (শব্দ) বহিরিন্দ্রিয়ের (কর্ণের) দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, আত্মার নানাবিধ বিশেষগুণ আছে কিন্তু উহাদিগের একটিও কোন বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই দৃষ্টিতে আত্মা আকাশ হইতে সূক্ষ্মতর।

অনেক শ্রুতিবাক্যে পাওয়া যায়—আত্ম-স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকেরা প্রায় সকলেই এই বিষয়ে স্ব স্ব সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য স্বীয় অনুভব ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। এমন কি, যাহারা বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না তাঁহারাও স্ব-সিদ্ধান্তে শ্রুতিবাক্যের সমর্থন দেখাইয়া বেদপ্রামাণ্যবাদীদিগকে নিজ পক্ষে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

কেহ কেহ আত্মার পরিচয় দিতে অনুভব, যুক্তি ও শ্রুতিবাক্য এই তিনটির সম্মিলিত-ভাবে সাহায্য লইয়াছেন। ফলে অন্যবস্তু হইতে সূক্ষ্মতা হিসাবে ইহার বৈলক্ষণ্যই পরিস্ফুট হইয়াছে।

এইস্থানে 'অনুভব' শব্দের অর্থ—'অহং' প্রত্যয়। যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া 'অহং' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ হয় অর্থাৎ লোক যাহাকে 'আমি' বলিয়া বুঝে তাহাই আত্মা। ইহাই হইতেছে অনুভব দ্বারা আত্ম-পরিচয়।

কেবলমাত্র অহংপ্রত্যয় হইতে নিঃসংশয়ে আত্মার স্বরূপ বুঝা যায় না। কারণ,

১ ন্যায়দর্শন, ৩।২।৩৩ সূত্রে ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য-টীকা।

২ আত্মনিরূপণের অন্য প্রধান উদ্দেশ্য নবম দ্রব্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপন। কেবল জীবাত্মার স্বরূপ নির্দ্ধারণেও ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব জীবাত্মা হইতে অধিকতর দুর্জ্ঞেয়। এজন্য উহা অবশ্য বক্তব্য হইলেও প্রথমতঃ কেবল জীবাত্মার পক্ষেই যুক্তি-তর্ক আলোচিত হইল।

'অহং' শব্দ নির্দিষ্টরূপে কোনও একটিমাত্র বস্তুকে বুঝায় না। আমি মানুষ, আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি ব্যবহারে 'অহং'শব্দের অর্থ স্থূলশরীর। আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি স্থলে উহার আলম্বন চক্ষু ও কর্ণ। আমি ভীত, আমি লজ্জিত এইস্থানে 'আমি'র অর্থ মন [১]। অতএব ঐ উদ্দেশ্যে যুক্তিরও সাহায্য লইতে হইবে।

এই যুক্তি দ্বিবিধ—নিরতিশয় প্রিয়ত্ব[২] ও জ্ঞান। নিরতিশয় প্রিয়ত্ব—যে বস্তু অন্য সকলের তুলনায় যাহার নিকটে অধিকপ্রিয় তাহার মতে উহাই আত্মা অর্থাৎ ধরিয়া লইতে হইবে যে, নিজের আত্মা বলিয়াই ঐ ব্যক্তি সেই বস্তুকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে।

বিমলা পুত্রকে ভালবাসিত। পুত্রটি মারা গেল। পুত্রশোকে বিমলা আহার ত্যাগ করিল। তারপরে একদিন ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জীবনের অবসান ঘটাইল।

সাধারণতঃ সকলেরই নিজের প্রাণ সমধিক প্রিয়। এজন্য ইহাদিগকে প্রাণাত্মবাদী বলা যায়। নিজের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা না করায় বুঝা যাইতেছে পুত্র বিমলার প্রাণ হইতেও বেশী প্রিয় ছিল। সে মনে করিত পুত্র মরিয়াছে অর্থাৎ তাহার আত্মাই মরিয়াছে, সে নিজেই নাই। এরূপ অবস্থায় তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে কে? আর সে নিজেই বা কেন রক্ষা করিবে? অতএব বুঝা গেল—বিমলা পুত্রাত্মবাদী।

এই যুক্তিও আত্মা কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। কারণ, কোন্ বস্তু কাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রথমতঃ তাহা স্থির করাই কঠিন। কথঞ্চিৎ স্থির হইলেও প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষে একই বস্তু নিরতিশয় প্রিয় হইবে ইহা কখনই সম্ভব নহে। কাল বিশেষে এই প্রীতির ব্যতিক্রমও ঘটে। আজ যাহা সর্বাপেক্ষা প্রিয় কালক্রমে অন্য কিছু তাহার স্থান অধিকার করে ইহা সচরাচর দেখা যায়। অথচ প্রত্যেক প্রাণীর আত্মা বিভিন্ন জাতীয় বস্তু ইহা বলাও দুঃসাহস। সকলের পক্ষে যথার্থ আত্মা একজাতীয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অন্য যুক্তির ও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

নিরতিশয়প্রিয়ত্ব-ধর্মের ন্যায় জ্ঞানও আত্মার পরিচয়ে সাহায্য করে। বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান, উপলব্ধি, চেতনা ও চৈতন্য ইহারা পর্যায় শব্দ অর্থাৎ একই বস্তুর বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি শব্দের অর্থ বিষয়ে কিছু স্থূল ধারণা সকলের পক্ষেই থাকা সম্ভব। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের সহজ পরিচয় দিবার মত আর কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই বোধ বা জ্ঞান যাহার ধর্ম তাহাই আত্মা।

জ্ঞান—এই তৃতীয় পরিচায়ক বস্তুর কিছু অসাধারণ্য আছে। কোনও বস্তু যদি উক্ত প্রকার অনুভব অথবা প্রিয়ত্ব-ধর্মের কিংবা সম্মিলিত অনুভব ও প্রিয়ত্বের বলে আত্মত্বের দাবী করিয়া বসে এবং ঐরূপ অবস্থায় যদি কেহ প্রমাণ দিতে পারে যে, উহা চেতন নহে

---

১ অধ্যাসভাষ্যের ভামতী দ্রষ্টব্য। 'কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকশ্রুতিবাক্যে লজ্জা ভয় ইত্যাদি মনের ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ন্যায়মতে যদি উহারা জ্ঞানবিশেষ হয় তবে সিদ্ধান্তানুযায়ী আত্মার ধর্ম।

২ তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি। অতস্তৎপরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥ পঞ্চদশী ১। ৮ শ্লোক।

তাহা হইলে সেই বস্তুর আত্মত্বের দাবী কোন দার্শনিক মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন না। ফলতঃ দাঁড়াইতেছে—জ্ঞান বা চেতনাই আত্মার যথার্থ পরিচায়ক। তবে, যে-স্থলে ঐ চেতনা-ধর্ম কাহার এই প্রকারে চেতনার ধর্মী বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত অনুভব ও যুক্তির দ্বারা ঐ সন্দেহ দূর করা সম্ভব বলিয়া উহাদিগকেও আত্মার পরিচয়ে সহায়ক না বলিয়া পারা যায় না।

উল্লিখিত অনুভব ও যুক্তির সাহায্যে[১] বিভিন্ন সম্প্রদায় পুত্র, স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের পক্ষে[২] আত্মত্বের দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেহই নিজের দাবী স্থির রাখিতে পারেন নাই। প্রতিবাদীরা কিরূপে পরাজিত হইলেন তাহা সংক্ষেপে বুঝান অসম্ভব। কারণ উহা সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের এবং ঐ সকল দর্শন বিভাগীয় প্রত্যেক গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অল্প কথায় বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইতে হইলে ইহাই বলা সঙ্গত যে যাবতীয় দর্শন গ্রন্থ—এই বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীদিগের বিবাদ, দৃষ্টান্ত, সাক্ষ্য, প্রমাণ ও কূটতর্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিবাদ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পরবর্তীকালেও সমান ভাবেই চলিবে। ইহার চিরনিবৃত্তি কখনই হইবে না। কোনও পক্ষ বিজয়ী হইয়া অন্যপক্ষের নাম সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

'আত্মন্'শব্দ গমনার্থক 'অত'ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—গমনকারী। প্রৌঢ়বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাকৃত জনসাধারণেরও ধারণা মৃত্যুকালে আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অসুররাজ হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে, পরে দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা পুরাণে পাওয়া যায়। দেবযান এবং পিতৃযানে জীবের গমনাগমন উপনিষৎ প্রভৃতি সকল অধ্যাত্মশাস্ত্র সম্মত। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে জীবের এই গমনাগমন সূক্ষ্ম শরীরের সহযোগেই হইয়া থাকে। বিভু জীবাত্মার পক্ষে গমনাগমনরূপ ক্রিয়া মুখ্য বা সাক্ষাৎভাবে সম্ভবপর হয় না। অতএব জীবের গমনাগমন গৌণ। যদি তাহাই হয় তবে জীবাত্মার উপাধি সূক্ষ্মশরীরেরই গমনাগমন মুখ্য ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের ন্যায় অল্পকাল স্থায়ী নহে, উহা যুগ যুগান্ত কাল অবিকৃত থাকে। ন্যায় বৈশেষিক মতে যে-সকল ধর্ম আত্মার গুণ বলিয়া নির্দিষ্ট শাস্ত্রান্তরসম্মত সূক্ষ্মশরীরে

১ উপনিষদে আত্মার পরিচয় প্রদ বহু শ্রুতি আছে। উহাতে পূর্বপক্ষরূপে নানাবিধ বস্তুকে আত্মা বলা হইয়াছে। ফলে সকলেই স্বপক্ষ সমর্থক শ্রুতির উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন। এজন্য বিস্তৃতি ভয়ে শ্রুতির সাহায্য আলোচিত হইল না। জিজ্ঞাসুগণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে অনুসন্ধান করিবেন।

২ বেদান্তসার, পঞ্চদশী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। উহাতে ন্যায়শাস্ত্রে অপ্রসিদ্ধ আরও অনেক বস্তুর পক্ষে আত্মত্বের দাবী করা হইয়াছে এবং সংক্ষেপে তাহার খণ্ডন ও করা হইয়াছে।

সে সমস্তই সম্ভব১। সূক্ষ্ম শরীরকেই যথার্থ আত্মা বলিলে জন্ম-মৃত্যুর রহস্যও জনসাধারণের কিঞ্চিৎ সুখবোধ্য হয়। এইরূপে সূক্ষ্মশরীরের পক্ষে আত্মত্বের দাবী সুসঙ্গত মনে হইলেও দার্শনিকেরা তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। কারণ, উহা অমৃত = আভূতসংপ্লবস্থায়ী অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থিতিশীল হইলেও নিত্য নহে, এক সময়ে উহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আত্মা বিনাশী ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

সকল গত্যর্থ ধাতুরই অন্য একটি অর্থ জ্ঞান। এই প্রসিদ্ধি অনুসারে আত্মন্ শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ—জ্ঞানবান্। নানারূপ সূক্ষ্ম যুক্তি ও তর্কের দ্বারা যেরূপ বুঝা গিয়াছে তাহাতে এই জ্ঞানবান্ বস্তুটির স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে—ইহা নিত্য, নিরবয়ব, পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা, ও আনন্দের আধার।

পূর্ব বর্ণিত অষ্টবিধ দ্রব্যের কোন একটিও এই লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। এজন্য ঐ সমুদায় হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন এইপ্রকার আত্ম-দ্রব্য শাস্ত্র ও অনুমান দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই নবম দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইলেও ইহা প্রত্যক্ষ সীমার বহির্ভূত নহে। যখনই কোন বিশেষগুণ—সুখ দুঃখ ইত্যাদি, উহাতে উৎপন্ন হয় তখনই 'আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপে উহার মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রত্যক্ষে প্রধানতঃ সুখ দুঃখের স্বরূপ প্রকাশিত হইলেও উহাদিগের ধর্মী—যথার্থ আত্ম-বস্তুরও প্রকাশ অনুভব সিদ্ধ২।

লক্ষণ। যাহা জ্ঞানের অধিকরণ তাহাই **আত্মা**। (জ্ঞানাধিকরণত্বং আত্মত্বং) অথবা 'আত্মত্ব' জাতি আত্মার লক্ষণ।

লক্ষ্য। জীবাত্মা এবং ঈশ্বর উভয়ই আত্মলক্ষণের লক্ষ্য।

সমন্বয়। সুগম। শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানের যথার্থ অধিকরণ হইতে পারে না ইহা দৃঢ় যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অতএব লক্ষণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক জীবেরই কোনও সময়ে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। গর্ভাশয়ে মৃত জীবেরও পূর্ব ও পর জন্মে জ্ঞান স্বীকার্য। অতএব লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষেরও আশঙ্কা নাই ৩।

---

১ পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবিধ কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থ লইয়া সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। সাঙখ্য মতে ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিরূপে প্রসিদ্ধ। ফলে প্রবৃত্তি, ইচ্ছা দ্বেষ এবং ভাবনা ইহারাও বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষ। সুখ সত্ত্বগুণ ও দুঃখ রজোগুণ।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—কাম অর্থাৎ অভিলাষ, সংকল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়-জ্ঞান বিশেষ) লজ্জা, ভয় ও ধী অর্থাৎ বুদ্ধি ইহারা মনের ধর্ম। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৫।৩)

২ বৈশেষিক সূত্রে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত হয় নাই। শ্রুতি বলেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' অর্থাৎ আত্মা বাক্য ও মনের অতীত। মন সমাধি-সংস্কৃত অর্থাৎ যোগবলে বলীয়ান্ হইলে আত্মদর্শনে সক্ষম হয় ইহাও শ্রৌতমত।

৩ জীবাত্মার জ্ঞান দুইক্ষণ মাত্র থাকিয়া বিনষ্ট হয়। ঐ সময়েও জ্ঞানের অধিকরণত্ব স্বীকৃত হইলে জ্ঞান-শূন্যতাকালেও উহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 'আত্মত্ব' জাতি সর্বদাই আত্মায় থাকে অতএব দ্বিতীয় লক্ষণে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

আত্মা দ্বিবিধ[১]—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

আত্মা

জীবাত্মা পরমাত্মা

জীবাত্মা
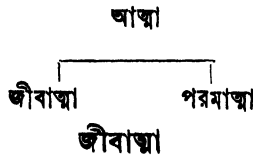
জীবাত্মা—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম—এই চতুর্দশবিধগুণ; সত্তা, দ্রব্যত্ব ও আত্মত্ব এই তিনটি জাতি; এবং প্রত্যেকে একটি করিয়া বিশেষ; এই কয়টি ভাব পদার্থের জীবাত্মায় সমাবেশ হয়।

জীবাত্মা প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন[২]। যাহারা প্রাণী বা জীব নামে পরিচিত তাহাদিগের বৈচিত্র্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি প্রকারে অসঙ্খ্যেয়। এই বৈচিত্র্য শরীরগত। ইহার দ্বারা যথার্থ-আত্মবস্তুর সামান্যমাত্রও পার্থক্য হয় না। অতএব জীবাত্মা অগণিত এবং উহাদের পরস্পর বৈলক্ষণ্য দুর্জ্ঞেয়।

পরমাণু, মধ্যম এবং পরমমহত্ত্ব এই ত্রিবিধ পরিমাণের মধ্যে একটি পরিমাণ প্রত্যেক দ্রব্যেই অবশ্য থাকে। সুতরাং জীবাত্মার পরিমাণ আছে এবং উহা পরমমহত্ত্ব, উহাতে অন্য পরিমাণ কল্পনা করা যায় না। কারণ, জীবাত্মা অতিক্ষুদ্র অর্থাৎ পরমাণুপরিমাণ হইলে উহার সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষযোগ্য হইত না। যেহেতু, আশ্রয় দ্রব্যে মহত্ত্ব-পরিমাণ না থাকিলে কোন গুণেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না! ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। পরমাণু ও পরম-মহত্ত্বপরিমাণ ব্যতীত অন্য সকল পরিমাণই মধ্যমপরিমাণ। মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট সমস্ত বস্তুই বিনাশী। অতএব জীবাত্মা মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্টও নহে। অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে—প্রত্যেক জীবাত্মাই বিভু অর্থাৎ পরমমহত্ত্ব-পরিমাণবিশিষ্ট।

প্রত্যেক জীবাত্মা বিভু হইলে যাবতীয় শরীরের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় জীবগণের ভোগ-সাঙ্কর্য দোষ উপস্থিত হইতে পারে। একের সুখ দুঃখ অন্যের ভোগযোগ্য হওয়ার নাম ভোগসাঙ্কর্য। নৈয়ায়িকগণ এই ভোগসাঙ্কর্য দোষের পরিহার করিতে বলেন যে, ভোগ অদৃষ্ট দ্বারা নিয়মিত। জীবগণের অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম বিভিন্ন। এই অদৃষ্টবশতঃ বিভিন্ন জীবাত্মার কোনও এক একটিমাত্র শরীরের সহিত এমন বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যাহার ফলে কেবলমাত্র ঐ একটি শরীরেই তাহার আমিত্ববোধ জন্মে, অন্য শরীরের

---

১ সাংখ্য ও মীমাংসাশাস্ত্রের মতে ঈশ্বর বা পরমাত্মা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

২ যাবতীয় শরীরে একই জীবাত্মা বিদ্যমান এই প্রকার জীবৈক্যবাদের কথা ও নানাগ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩ রামানুজ মতে জীবাত্মা পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র।

৪ জৈন মতে জীবাত্মা দেহের সম-পরিমাণ এবং সঙ্কোচবিকাশশীল স্বীকৃত হওয়ায় কোন মানুষ কর্মানুসারে হস্তীর শরীর ধারণ করিলে আত্মা বিকাশ দ্বারা হস্তীর দেহ ব্যাপ্ত করিতে এবং পিপীলিকা হইয়া জন্মিলে সঙ্কুচিত হইয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র শরীরেও অক্লেশে বাস করিতে পারে। আত্মাকে দেহ সম-পরিমাণ মানিলে ভোগসাঙ্কর্য দোষ ঘটে না।

সহিত উহার সংযোগ থাকিলেও উহাতে আমিত্ব-বোধ হয় না। ফলে সেই ব্যক্তি ঐ শরীরেরই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে, অন্য শরীরের সুখাদি অনুভব করিতে পারে না।

জীবাত্মা সকল বিভু হইলে অপরিমিতত্ব অর্থাৎ স্থানাভাবের প্রশ্নও স্বতই মনে উদিত হয়। দুইটি বস্তুর পরস্পর সংযোগ হইলে অবশ্যই সমুদায়ের আকার বৃদ্ধি হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এমত অবস্থায় জীবাত্মারা বিভু হইলে উহাদিগের পরস্পর সংযোগ এবং আকাশ, পরমাত্মা, কাল এবং দিকের সহিত সংযোগ হইবেই। ফলে সমুদায়ের পরিমাণ এমন বড় হইবে যে উহার স্থান কল্পনা করাও অসম্ভব। এই দোষ পরিহারের জন্য নৈয়ায়িকগণ বলেন যে,

বিভু দ্রব্য সকল ক্রিয়াশূন্য। ক্রিয়া ব্যতীত সংযোগ জন্মিতে পারে না। সুতরাং বিভু দ্রব্যগুলির পরস্পর সংযোগই হইতে পারে না ১। অতএব আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির পরস্পর সংযোগ হওয়ায় উহাদিগের আকার বৃদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন উহাদের স্থানাভাবের আশঙ্কা অমূলক।

পরমাত্মা

আত্মন্-শব্দের অর্থ জ্ঞানবিশিষ্ট ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞান যাঁহার পরম—অর্থাৎ নিরতিশয়, সর্ববিষয়ক, বিষয়নিরপেক্ষ, কিংবা নিত্য তিনি **পরমাত্মা**। ঈশ্বর, ব্রহ্ম,২ অন্তর্যামী প্রভৃতি পরমাত্মার নামান্তর। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, একমাত্র—অদ্বিতীয়।

জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বর বিষয়েও বহুবিধ মতবাদ বিদ্যমান। সকল মতেই 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ আছে, কেহই উহাকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় নিরর্থক শব্দ বলেন নাই। যে সম্প্রদায় যে-বস্তু বুঝাইবার উদ্দেশ্যে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করেন সেই মতে তাহাই ঈশ্বর। এই দৃষ্টিতে বলা যায় একান্ত নাস্তিকেরাও ঈশ্বর মানিয়া থাকেন। তাহাদের মতে রাজাই ঈশ্বর। শিল্পীরা বিশ্বকর্মা নাম দিয়া ঈশ্বরেরই পূজা করেন। পৌরাণিক মতে পিতামহ অর্থাৎ যিনি পিতারও পিতা—আদি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ঈশ্বর ৩।

এইরূপে বিভিন্ন মতবাদীগণ যে সকলের পক্ষে ঈশ্বরত্বের দাবী উত্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অধিক শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য, এমন কি বৃক্ষবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন দেবতার ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইয়াছে ৪।

---

১ বাচস্পতি মিশ্র "আকাশাদিভিঃ সম্বদ্ধ ঈশ্বরঃ মূর্তিমদ্দ্ব্যসম্বন্ধিত্বাদ ঘটবৎ" এই অনুমান দ্বারা বিভুদ্বয়ে সংযোগ প্রমাণিত করিয়াছেন। বিভুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকৃত হইলেও নিরবয়ব বস্তুর সংযোগে আকার বৃদ্ধি হয় না বলিয়া উক্ত প্রকারে আশঙ্কা জন্মে না।

২ বেদান্ত মতে নিগুণ ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলা হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন—ঐ রূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই।

৩ পঞ্চদশী

৪ কুসুমাঞ্জলি ১ম স্তবক।

মাধ্ব সম্প্রদায়

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

গত জ্যৈষ্ঠমাসের 'শ্রীভারতী'তে শ্রীশ্রীমধ্বাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সংখ্যায় তাঁহার সম্প্রদায়ের বিষয় সামান্যভাবে উল্লিখিত হইতেছে। এই সম্প্রদায়ের অনেক তথ্য পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্য নাম ব্রহ্মসম্প্রদায়। ইহা মধ্বাচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। যেমন রামানুজ প্রবর্তিত অন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায় রামানুজের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, মাধ্বসম্প্রদায়ের সেইরূপ পূর্ববর্তী কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। মধ্বের ৪ জন প্রধান শিষ্য ছিলেন যথা—পদ্মনাভ, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্থ ও অশোকতীর্থ। উদিপির মন্দিরই এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় মঠ। মধ্ব-প্রতিষ্ঠিত আরও ৮টী মন্দিরের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই ৮টী মঠের অধ্যক্ষেরা পর্যায়ক্রমে উদিপির মঠের অধ্যক্ষ হইবেন। সুতরাং প্রায় ১৪ বৎসর অন্তর এক এক জনের পালা হয়। এবং মকরমাস বা মাঘ মাসে ২ বৎসর অন্তর অধ্যক্ষের পরিবর্তন হয়। কিন্তু পদ্মনাভ তীর্থ ৭ বৎসর উদিপি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন অর্থাৎ এই সম্প্রদায়ের মোহান্ত ছিলেন। তাঁহার পর নরহরি তীর্থ মোহান্ত হ'ন। ১২০৪ খ্রীঃ অঃ এ পদ্মনাভের তিরোধান হইলে, ১২১৩ খ্রীঃ অঃ এ নরহরি মোহান্ত হইলেন। নরহরির পর মাধবতীর্থ ও তাঁহার পর অশোকতীর্থ মোহান্ত হ'ন। আমরা নিম্নে এই সম্প্রদায়ের আচার্য-পরম্পরার একটি তালিকা দিতেছি। যেমন শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেক আচার্যই গ্রন্থ রচনা দ্বারা স্ব-স্ব মতবাদের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, এই সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের মধ্যে সেইরূপ অল্প কয়েকজনই গ্রন্থকার ছিলেন, অবশিষ্ট অনেকেই কেবল মন্দির প্রতিষ্ঠাদি ও শিষ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। ক্রমশঃ মতদ্বৈধবশতঃ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু উপ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। অশোকতীর্থের সময়েই বিভিন্ন মোহান্তের শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে ১৪টী উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ক্রমে ইহা ১৮টী উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। যথা—(১) মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত আদি সম্প্রদায়, (২-১১) মধ্বাচার্যেরই অনুষ্ঠিত ১০টী মালাবারী সম্প্রদায়, (১২-১৫) মধ্বের ৪টী প্রধান শিষ্যের ৪টী সম্প্রদায়, (১৬) পরবর্তী কালের (প্রায় ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে) সত্যবোধতীর্থ প্রবর্তিত সত্যবোধী সম্প্রদায়, (১৭-১৮) রাজেন্দ্রতীর্থ সম্প্রদায় ও বিবুধেন্দ্র বা রাঘবেন্দ্র সম্প্রদায়। এই শেষোক্ত ২টী সম্প্রদায় খ্রীস্টায় ১৪শ শতাব্দীতে সৃষ্ট হয় এবং এই দুইটী অন্য ১৬টী সম্প্রদায় হইতে অনেক বিভিন্ন ও স্বাধীনভাবাপন্ন।

কেবল সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন। অতি নীচজাতি

ব্যতীত সকলকেই ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্মের উপদেশ দেন। এই সম্প্রদায়ে ব্যবসায়ের মত গুরুত্বপদ বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া যায়। ইহাতে গুরুর বেশ অর্থোপার্জন হয়। শিষ্যেরও গুরুত্যাগ বা গ্রহণে গুরুর অর্থোপার্জন হয়। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন এবং দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ, মস্তক মুণ্ডন এবং গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন।

মধ্বাচারীরা উত্তপ্ত লৌহের দ্বারা স্কন্ধ এবং বক্ষোদেশে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন অঙ্কিত করেন এবং নাসামূল হইতে কেশ পর্যন্ত ৩টী ঊর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করেন। এই ২টী রেখার নীচের ২টী দিক আর ১টী রেখা দ্বারা ভ্রূমধ্যদেশে যুক্ত করিয়া দেন, আর উহার মধ্যে গন্ধ দ্রব্যের ভস্ম দ্বারা একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করেন ও তাহার শেষে হরিদ্রাময় গোলাকার একটি তিলক অঙ্কন করেন।

ইঁহাদের মতে উপাসনার ৩টী অঙ্গ যথা—(১) অঙ্কন (শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন অঙ্কন) (২) অঙ্গ নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর নামে সন্তানগণের নামকরণ (৩) অঙ্গভজন (অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভজনের অনুষ্ঠান)। দান, পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ—কায়িকভজন ; সত্যকথন, হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন—বাচনিকভজন ; দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা মানসিকভজন। ইহাদের ধর্মনীতির সার এই দশপ্রকার ভজন। "ভজনং দশবিধং, বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি, অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনমিতি"। সুতরাং প্রত্যেক ভজনটাই নারায়ণে সমর্পণ করিতে হইবে।

ইঁহাদের মতে নারায়ণ স্বর্গীয় বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া লক্ষ্মী, ভূমি ও লীলাদেবী এই তিন পত্নীর সঙ্গে অনির্বচনীয় ঐশ্বর্য সুখভোগ করেন। তিনি স্বরূপ অবস্থায় গুণের অতীত, কিন্তু যখন মায়ার সঙ্গে যুক্ত হ'ন তখন সত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। ইঁহাদের মতে শিব ও ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাই অনিত্য ও ক্ষর, লক্ষ্মীই একমাত্র অক্ষর। আর বিষ্ণু ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র। ইঁহাদের মতে জীব ও পরমেশ্বর বা নারায়ণ পৃথক। সেজন্য ইঁহাদিগকে দ্বৈতবাদী বলা হয়। পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধজল ও লবণে, চোর ও হৃতদ্রব্যে এবং পুরুষ ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেমন প্রভেদ, জীব ও ঈশ্বরেও সেইরূপ প্রভেদ, এতদ্ব্যতীত আরও পাঁচ প্রকার ভেদ ইঁহারা স্বীকার করেন—জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ, এবং জীবগণ ও জড় পদার্থের ভেদ। এই পাঁচ প্রকার ভেদের নাম প্রপঞ্চ। সুতরাং ইহাদের মতে জীবের নির্বাণমুক্তি বা সাযোজ্যমুক্তি নাই। ইঁহাদের মতের সংক্ষিপ্তসার আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রমেয় রত্নাবলীতে দিয়াছেন যথা—"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমং সত্যং জগত্তত্ত্বতো ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নিজ সুখানুভূতি রমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনম্ অক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈক বেদ্যো হরিঃ।"

অর্থাৎ (১) হরি পরতম (২) জগৎ তত্ত্বতঃ সত্য (৩) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ সত্য (৪) জীবগণ হরির অনুচর অর্থাৎ দাস (৫) জীবগণের মধ্যে নীচ ও উচ্চভাব বিদ্যমান

(৬) আত্মার নিজ সুখানুভূতিই মুক্তি (৭) শুদ্ধা ভক্তিই মুক্তির সাধন (৮) অক্ষাদিত্রয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম প্রমাণ (৯) একমাত্র হরিই অখিল বেদবেদ্য। পদার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থটী মাধ্বমতের সংক্ষিপ্তসার। ইহার উপর পদ্মনাভাচার্যের 'মধ্বসিদ্ধান্তসার' নামক টীকাও আছে। যাঁহারা বিশদরূপে মাধ্বমত জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন।

এইবার এই সম্প্রদায়ের লোকদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইঁহারা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহের আদান প্রদান করেন। মধ্বব্রাহ্মণদের পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই সুন্দর, বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। যাঁহারা ধারোয়ারের পূর্বে বাস করেন তাঁহাদের গায়ের রং কিছু ময়লা, কিন্তু যাঁহারা পশ্চিমে বাস করেন তাঁহারা সুন্দর। মধ্ব ব্রাহ্মণ মাত্রেই গায়ে লক্ষ্মীমূর্তি অঙ্কিত করেন এবং বিধবারাও ঐরূপ চিহ্নিত করেন। ইঁহারা খুব ভোজন-বিলাসী। কিন্তু ইঁহারা কোন নেশার বশবর্তী নহেন; মৎস্য, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি আহার করেন না। ইঁহাদের মেয়েরা নানারকম চাট্‌নী, আচার, ক্ষীর, পিষ্টক, পানীয় প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে পারেন। মেয়েরা কেশরভাত, চিত্রান্নভাত, ভাঙ্গীভাত, হুগীভাত, প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রণালীতে অন্ন প্রস্তুত করিতে পারেন।

ইঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদেও বেশ সুরুচি আছে। বালক বালিকারা একরমক টুপি পরে, ইহার নাম 'কুসাই'। মেয়েরা আংরাখা ব্যবহার করেন, নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করেন; কপোলে, চিবুকে, বাহু প্রভৃতিতে হলুদের রেখা টানেন, উল্কী পরেন।

ইহাদের অবিবাহিত বালিকা ও বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ খোঁপা বাঁধিয়া উহাতে ফুল গুঁজিয়া দেন। স্ত্রীলোকেরা নানা রকমের অলঙ্কার পরেন যথা---কাদাকু (সোনার সঙ্গে হীরা বা প্রবাল বসান আংটি), বন্তী মুটুস্ (মুক্তার দুল), হাতিবন্তী (ইয়ারিং), ভিক্‌বালী (কাণের মাঝে পরিবার জন্য ইয়ারিং), তানমণি (মুক্তার মালা), কণ্ঠি, স্বর্ণহার, বাহুকিরীট, বাজুবন্ধ, উধারা (সোনা বা রূপার তারে প্রস্তুত শৃঙ্খল), সরপলী (রূপা দিয়া প্রস্তুত), স্বর্ণপত্র (কপালের উপরে পরে), ভুজঙ্গপুষ্প (সোনার কাঁটা দিয়া চুলে গুঁজিয়া দেওয়া হয়), স্বর্ণপাপ্‌ড়ি (মস্তকাভরণ), বেশর (নাকে পরাইয়া দেয়), অর্ধচন্দ্র (দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে পরে), সোনার পিন, স্বর্ণছাতী (কাণের মাঝে পরে) হারলিন বালা (কাণের পশ্চাতে পরে), বালি (কাণের নিম্নে পরে), বয়লা, খোধাচি, খিদ্‌কী, বারলিন, গিলি প্রভৃতি নানাপ্রকারের বালা, মঙ্গলসূত্র (কণ্ঠাভরণ—বিবাহের দিন হইতে স্বামী যতদিন জীবিত থাকিবে ইহা পরিতে হয়), ইত্যাদি।

ইহারা খুব নিষ্ঠাবান, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে নিবেদন না করিয়া অন্ন পানীয় নিজেরা বা নিমন্ত্রিতদিগকে দেন না। ইঁহারা সাধারণতঃ প্রাতঃস্নান করেন। ১লা চৈত্র হইতে ইহাদের নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। ঐ দিনে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া কার্যারম্ভ

করেন। দশহরা, আশ্বিনের শুক্লা দশমী, বালি প্রতিপৎ, কার্ত্তিকের শুক্লা প্রতিপৎ, অক্ষয় তৃতীয়া ও রামনবমী এবং চৈত্রের শুক্লা তৃতীয়া ইঁহাদের নিকট বিশিষ্ট শুভ তিথি। চৈত্রের শুক্লা তৃতীয়াতে ইঁহারা মহাসমারোহে গৌরীমূর্তি পূজা করেন।

বৎসরের মধ্যে মাধ্বসম্প্রদায়ের বহু উৎসব ও পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। বাহুল্যভয়ে এই সবের বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে না।

নিম্নে মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার তালিকা ও তিরোভাব বর্ষ ও সমাধিস্থান উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইতেছে।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	কত বৎসর মোহান্ত ছিলেন	তিরোভাব খ্রীস্টাব্দ	তিরোভাব শকাব্দ	সমাধিস্থান
১।	মধ্বাচার্য	৮০	১১৯৭	১১১৯	বদরিকাশ্রম
২।	পদ্মনাভতীর্থ	৭	১২০৪	১১২৬	অনিগুন্দি
৩।	নরহরিতীর্থ	৯	১২১৩	১১৩৫	,,
৪।	মাধবতীর্থ	১৭	১২৩০	১১৫২	,,
৫।	অক্ষোভ্যতীর্থ	১৭	১২৪৭	১১৬৯	মালখেড়
৬।	জয়রায়াচার্য	২১	১২৬৯	১১৯১	,,
৭।	বিদ্যাধিরাজ	৬৪	১৩৩২	১২৫৪	ভার্গল
৮।	কবীন্দ্র	৭	১৩৩৯	১২৬১	অনিগুন্দি
৯।	বাগীশতীর্থ	৪	১৩৪৩	১২৬৫	,,
১০।	রামচন্দ্রতীর্থ	৩৩	১৩৭৬	১২৯৮	ভার্গল
১১।	বিদ্যানিধি	৬৮	১২৪৪	১৩৬৬	,,
১২।	রঘুনাথ	৫৫	১৫০২	১৪২৪	মালখেড়
১৩।	রঘুরাজ	৫৫	১৫৫৭	১৪৭৯	অনিগুন্দি
১৪।	রঘূত্তমতীর্থ	৩৮	১৫৯৫	১৫১৭	কল্যাণ
১৫।	বেদব্যাসতীর্থ	২৪	১৬১৯	১৫৪১	পেনগুন্দী
১৬।	বিদ্যাধীশ	১২	[illegible]	১৫৫৩	একচক্রনগর
১৭।	বেদনিধি	৪	১৬৩৫	১৫৫৭	পান্ধারপুর
১৮।	সত্যব্রত	৩	১৬৩৮	১৫৬০	সোগালী
১৯।	সত্যনিধিতীর্থ	২২	১৬৬১	১৫৮৩	নিভৃতিসঙ্গম
২০।	সত্যনাথ	১২	১৬৭৪	১৫৯৬	পিনকি নদী (ভীরকোলার নিকট)
২১।	সত্য-অভিনবতীর্থ	৩৩	১৭০৬	১৬২৮	নন্চরগুন্দী
২২।	সত্যপূর্ণ	২০	১৭২৬	১৬৪৮	কোলারপুর

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	কত বৎসর মোহান্ত ছিলেন	তিরোভাব খ্রীস্টাব্দ	তিরোভাব শকাব্দ	সমাধিস্থান
২৩।	সত্যবিজয়	১৩	১৭৩৯	১৬৬১	অর্ণি
২৪।	সত্যপ্রিয়	৫	১৭৪৪	১৬৬৬	মনোমথন
২৫।	সত্যবোধতীর্থ	৩৮	১৭৮২	১৭০৪	সাভানুর
২৬।	সত্যসন্ধ	১২	১৭৯৪	১৭১৬	মহিষী
২৭।	সত্যবর	৩	১৭৯৭	১৭১৬	শান্তিবিদ্নার
২৮।	সত্যধর্ম	৩৪	১৮৩১	১৭৫৩	হোলহনর
২৯।	সত্যসঙ্কল্প	১০	১৮৪১	১৭৬৩	মহীশূর
৩০।	সত্যসন্তোষ	১	১৮৪২	১৭৬৪	,,
৩১।	সত্যপ্রয়াণ	২১	১৮৬৩	১৭৮৫	শান্তিবিদ্নার
৩২।	সত্যকাম	৯	১৮৭২	১৭৯৩	আত্কুর
৩৩।	সত্যেশ	৭ মাস	১৮৭২	১৭৯৪	,,
৩৪।	সত্যপরাক্রম	৭	১৮৭৯	১৮০১	চিতাপুর
৩৫।	সত্যবীর	—	—	—	—

বেদান্ত দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

রামানুজ মতে **প্রমাণ** ৩ প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। **প্রমেয় ২ প্রকার**—দ্রব্য ও অদ্রব্য। দ্রব্য ২ প্রকার—জড় ও অজড়। জড় ২ প্রকার—প্রকৃতি ও কাল। প্রকৃতি চতুর্বিংশতি প্রকার যথা—প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত। কাল ৩ প্রকার—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অজড় ২ প্রকার—পরাক্ (নিত্য বিভূতি ও ধর্মভূত জ্ঞান) এবং প্রত্যক্। প্রত্যক্ জীব ও ঈশ্বরভেদে ২ প্রকার। জীব ৩ প্রকার—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। ঈশ্বর পাঁচ প্রকারে অবস্থিত—পর, ব্যূহ, বিভু, অন্তর্যামী ও অর্চাবতার। নারায়ণই পর। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ৪ প্রকার ব্যূহ। মৎস্যাদি অনন্তবিভু, অন্তর্যামী প্রতিশরীরে অবস্থিত। আর অর্চাবতার শ্রীরঙ্গনাথ, বেঙ্কটনাথ প্রভৃতি দেবমূর্তি।

অদ্রব্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংযোগ ও শক্তি। ইহাই সংক্ষেপে রামানুজ মতের পদার্থ বিভাগ।

অধিকারী—পূর্বে উক্ত হইয়াছে শঙ্করমতে শমদমাদি সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, কর্মকাণ্ডে জ্ঞান থাক বা না থাক তাহাতে যায় আসে না। কিন্তু রামানুজমতে কর্মমীমাংসায় যাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। ইঁহার মতে জৈমিনীকৃত পূর্বমীমাংসা ও বাদরায়ণকৃত উত্তরমীমাংসা এই উভয়ই এক শাস্ত্র। অগ্রে সমগ্র বেদাধ্যয়ন করিয়া ইহার কর্মকাণ্ডে সম্যক্ জ্ঞান হইলে কর্মের অনিত্যতার জ্ঞান জন্মে, তারপরেই লোকের মুক্তির অভিলাষ হয় ইহাই রামানুজের মত। সুতরাং বেদান্তের অধিকারী হইতে হইলে কর্মমীমাংসায় সম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন।

বিষয়—রামানুজ মতে স্থূলসূক্ষ্ম-চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মই বিষয়। এই ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহে কারণ নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। শ্রুতিতে যে সব নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য আছে উহার প্রকৃত তাৎপর্য সবিশেষমূলক। নির্গুণ অর্থ হেয় গুণের অভাব। শব্দ বা বেদ নির্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদন করিতে পারে না। শঙ্করমতে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহে। তিনি জ্ঞানস্বরূপ প্রত্যগাত্মস্বরূপ। জ্ঞানের বিষয় জড় বস্তু। ব্রহ্মের নির্গুণভাবই পারমার্থিক, সগুণভাব আরোপিত মাত্র।

সম্বন্ধ—ব্রহ্মের ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ। আর শাস্ত্রদ্বারা সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতে পারে। শঙ্করের ন্যায় রামানুজও যদিও ৩টী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কেবল শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ।

প্রয়োজন—আচার্য রামানুজের মতে বেদান্তের প্রয়োজন অবিদ্যানিবৃত্তি। উপাসনা দ্বারা এই অবিদ্যানিবৃত্তি হইতে পারে। উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় এবং অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূরীভূত হয়। জীব তখন মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাসরূপে চিরকাল অবস্থান করেন ও তাঁহার নিত্যলীলার সহচর হইয়া অপার আনন্দ ভোগ করেন। শঙ্করের মতে উপাসনাদ্বারা চিত্ত-মালিন্য দূর হয়। আর জীব ও ব্রহ্মের একাত্মকজ্ঞানই বেদান্তের প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে অবিদ্যা-নাশ উভয়ের মতেই প্রয়োজন, কিন্তু শঙ্করমতে জ্ঞানে অবিদ্যার নাশ হয়, রামানুজমতে উপাসনায় অবিদ্যার নাশ হয়।

জীব—জীব তিনপ্রকার—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। যাহাদের সংসারে নিবৃত্তি হয় নাই তাহারা বদ্ধ। এই বদ্ধজীব আবার দুই প্রকার শাস্ত্রবশ্য ও শাস্ত্র-অবশ্য। যাহাদের জ্ঞান করণায়ত্ত তাহারা শাস্ত্রবশ্য। ইহারা দুই প্রকার বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। যাহারা ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গনিষ্ঠ তাহারা বুভুক্ষু। যাহারা মোক্ষনিষ্ঠ অর্থাৎ মোক্ষলাভের একান্ত ইচ্ছুক তাহারা মুমুক্ষু। বুভুক্ষু দুই প্রকার অর্থকামপর ও ধর্মকামপর, যাহারা দেহাত্মাভিমানপর তাহারা অর্থকামপর ও যাহারা বৈদিক ধর্মাদিতে অনুরক্ত তাহারা ধর্মকামপর। এই ধর্ম-কামপর আবার দুই প্রকার—ব্রহ্মাশিব প্রভৃতি অন্যদেবতাভক্ত ও ভগবৎনারায়ণভক্ত। এই ভগবৎনারায়ণপরায়ণ আবার তিন প্রকার—আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী। এই প্রকারে রামানুজ জীবের অনেকপ্রকার ভাগ করিয়াছেন। এই জীবের স্বরূপ কি? তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মের শরীর, স্বয়ং প্রকাশ, অর্থাৎ চেতন এবং আত্ম স্বরূপ, জীব অণু, নিত্য এবং প্রতিশরীরে বিভিন্ন। জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ হইতে বিলক্ষণ। স্বাভাবিকরূপে জীব সুখী কিন্তু উপাধিজনিত দুঃখী। জীব যেন ঈশ্বরের কার্যরূপ, সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ এই প্রকার—জীব অণু, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিভু; জীব কার্য, ব্রহ্ম কারণ; জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই চেতন ও আত্মস্বরূপ। ব্রহ্মপূর্ণ, জীব খণ্ডিত। সুতরাং ব্রহ্মে ও জীবে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে।

জগৎ—রামানুজমতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, ইহা মিথ্যা বা অসত্য নহে। ইহা ব্রহ্মের যেন শরীরস্থানীয়, ইহা ব্রহ্মশক্তিতে আশ্রিত এবং সৎ। এককথায় ঈশ্বর জীবজগৎ বিশিষ্ট।

সাধন—রামনুজমতে ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি মুক্তির সাধন। ভক্তিদ্বারাই মুক্তি-লাভ হয়, জ্ঞানদ্বারা নহে। ভক্তিদ্বারা, প্রার্থনাদ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করিলে তিনি মুক্তি দান করেন। ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি ভক্তির অন্তর্গত।

ব্রহ্ম—রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। মায়া ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্মের গুণের সীমা নাই। তিনি অশেষ কল্যাণ গুণের আকর। তিনি সর্বান্তর্যামী; পরমব্রহ্ম নারায়ণই পুরুষোত্তম, তিনিই

জগতের কারণ। তিনি বিভু। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও অনন্ত প্রভৃতি গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা।

মুক্তি—ভগবানের দাসত্ব লাভই মুক্তি। বৈকুণ্ঠে নারায়ণ শ্রী, ভূ ও লীলা এই তিন দেবী সমেত বিহার করিতেছেন এবং ইহাদের সেবা করাই পরমপুরুষার্থ। রামানুজমতে জীব কখনই ভগবানের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। কারণ জীব স্বরূপতঃ নিত্য এবং ভগবানের নিত্য দাস। মুক্তিলাভ হইলেও জীব ও ব্রহ্মে চিরদ্বৈতভাব থাকিবে। শঙ্করের মতে ঘটের বিনাশে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়, তাহার কোন পৃথক সত্তা থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধিরূপ উপাধিনাশে জীবও পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়—তাহার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু রামানুজমতে জীব এখনও যেমন আছে মুক্তিলাভের পরও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক থাকিবে কেবল সে মুক্তিলাভের পর ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। শঙ্কর প্রতিবিম্ববাদী অর্থাৎ তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব বা আভাস, জীব নিত্য মুক্ত; উপাধিবশতঃ নিজকে বদ্ধ মনে করিতেছে। কিন্তু রামানুজমতে জীব অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে, ইহা ব্রহ্মেরই অংশমাত্র। জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি কিন্তু ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে রামানুজের ব্রহ্ম জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) World-Soul বা Logos.

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

যুদ্ধ ও আমাদের জ্যোতিষ

শ্রীগণপতি সরকার

মনুষ্য চায় সুখ ও শান্তি। প্রাকৃতিক নিয়ম কি তাই? প্রকৃতির অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি তাহার কাম্য নয়। জাগতিক অবস্থা দেখিয়া আমরা ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর জ্যোতিষ শাস্ত্রও তাহাই যেন ঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর চারিদিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কোন না কোন দিকে কোন না কোন প্রকার দুর্বিপাক বা উৎপাত লাগিয়াই আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে প্রত্যহই ভূকম্পন হইয়া থাকে। কখন তাহা কোন না কোন দেশে সম্যক্ উপলব্ধ হয়, কখন তাহা অনুভূত হয় না। আবার কোনটি যন্ত্রযোগে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পৃথিবীর অঙ্গ ব্যাপৃত আছে। এই সকল ঘটনার মধ্যে যুদ্ধের উৎপাতই মনুষ্যকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও বিপন্ন করে। আমরা দেখিতেছি জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মিথুনেচধনুর্মীনরাশৌ মন্দঃ সমাশ্রিতঃ।
তদা ভূপাবিনশ্যন্তি পৃথ্বী শোণিতপূরিতা॥

মিথুনরাশি কিংবা ধনুরাশি অথবা মীনরাশিতে শনি গোচরে উপস্থিত হইলে রাজাদিগের বিনাশ হয় এবং পৃথিবী রক্তে পরিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ শনি এই তিনরাশির যে কোনও রাশিতে থাকিলেই যুদ্ধ অনিবার্য। আমরা পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রত্যক্ষতা উপলব্ধি করিয়াছি। শনি যখন এই রাশিগুলির কোন না কোনটিতে অবস্থিত হইয়াছেন তখনই যুদ্ধ, বিগ্রহ বা ভূপতির বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে। বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মহাযুদ্ধকালে ইহার বিস্তৃত তালিকা আমরা একবার প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মিথুনরাশি হইতে ধনুরাশিতে উপস্থিত হইতে শনির ১৫ বৎসর অতিবাহিত হয়, এবং ধনু হইতে মীনে আসিতে প্রায় ৮ বৎসর লাগে, আবার মীন হইতে মিথুনে আসিতে প্রায় ৮ বৎসর লাগে। সুতরাং ৭ হইতে ১০ বৎসর মধ্যে দুইবার, আর ১৫ বৎসর পরে একবার যে যুদ্ধ সংঘটিত হইবেই, ইহাই জ্যোতিষশাস্ত্রের সাধারণ মত। ইহা ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহের আরও বহুসূত্র জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে। যেমন :—

কর্কিমীনমৃগস্ত্রীষু শনিভৌমৌ যদাস্থিতৌ।
তদাযুদ্ধাকুলাপৃথ্বী ধনধান্য বিবর্জিতা॥

যে সময়ে কর্কট, মীন, মকর অথবা কন্যারাশিতে শনি ও মঙ্গল একত্র থাকিবে সেই সময় পৃথিবী যুদ্ধের জন্য ব্যাকুলা হয় এবং ধনধান্য বিহীনা হয়।

আবার মিথুনরাশিতে শনি অথবা রাহু উপস্থিত হইলে দুর্ভিক্ষ হয় এবং পশ্চিম দেশের রাজাদিগের ক্ষয় হয়। বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মহাযুদ্ধকালে শনি মিথুন রাশিতেই অবস্থিত ছিল। আবার মঙ্গল, শুক্র ও শনি একত্র এক রাশিতে আশ্রয় করিলে রাজাগণের বিনাশ হয় এবং প্রজাবর্গের ক্ষয় হয়। এইরূপ বহুপ্রমাণ জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিলে পাওয়া যায়। এইগুলি কেবলই সূত্র নহে, ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার সভ্যতা উপলব্ধি সহজেই হয়।

পূর্বোক্ত সূত্রগুলি ব্যতীত সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতিও যুদ্ধের বার্ত্তা আনয়ন করে।

এই যে ইউরোপ খণ্ডে বর্তমান ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিলে ইহাও যে গ্রহপতি প্রভৃতি দ্বারা পূর্বাহ্ণেই সূচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা আয়াসসাধ্য নহে। এই যুদ্ধ মীনস্থ শনিই যে সূচনা করিয়াছে তাহা আমি ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর British Journal of Astrology-র সম্পাদক Belly সাহেবকে এবং ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল Modern Astrologyর সম্পাদককে বহু প্রমাণাদিসহ প্রবন্ধ যোগে জানাইয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা জানিনা কি কারণে ঐ প্রবন্ধ তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন নাই। ১৯৩৭ খ্রীস্টব্দেই শনি মীনে আসিয়াছিলেন, তখন হইতেই এই যুদ্ধের যে সূচনা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই বলা চলে। সে সময়ে স্পেনদেশের যুদ্ধ, রাজা ৮ম এডওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ, চীনজাপান যুদ্ধ, এবং ভারতবর্ষে ও সীমান্তপ্রদেশের গোলযোগ, রাজ্যশাসন-প্রণালীর পরিবর্তনাদি, রাষ্ট্রবিপ্লবানুগ ঘটনাবলী দেখা দেয়। বর্তমান যুদ্ধে জার্মানের প্রচণ্ড উগ্র অগ্রগতির কারণ হইতেছে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে (১৯ বৈশাখ ১৩৪৬) তারিখের সর্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। শাস্ত্রে কথিত আছে তুলার চন্দ্রে গ্রহণ হইলে পশ্চিম-সীমান্তবাসীগণ পীড়িত হয়। আরও কারণ দেখিতে পাই ১৩৪৪ সালেই ২৫শে আশ্বিন সূর্যগ্রহণ ঘটিয়াছে এবং ১১ই কার্ত্তিক চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে, এই এক মাস মধ্যেই দুইটি গ্রহণ হওয়ায় তাহার ফল--তুমুল যুদ্ধ এবং রাজাদিগের নিজ নিজ সেনাগণের মধ্যে কলহ-নিবন্ধন সর্বনাশ। পুনরায় ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন এবং চৈত্রমাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ একমাস মধ্যেই সংঘটিত হইতেছে ইহাও রাজ্যের কল্যাণকর নহে, প্রত্যুত বিশেষ বিপজ্জনক।

আর এই ১৩৪৭ সালেই বৈশাখ মাসে—

মেষে সমাশ্রিতে ভানৌ বৃষে চ ধরণীসুতে।
ভয়ব্যাধি যুতালোকা নৃপাণাং বিগ্রহোমহান্‌॥

মেষ রাশিতে রবির অবস্থান এবং বৃষে মঙ্গলগ্রহ থাকায় ইউরোপখণ্ডে ভীষণ মহামারী-রূপ জার্মানজাতি আবির্ভূত হইয়া পোলাণ্ড-গ্রহণ এবং নরওয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী-রাজ্য পর্যন্ত ধ্বংস-সাধন করিল। জানিনা "অপরং কিংবা ভবিষ্যতি"।

পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্বে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধকালে তেরদিন পক্ষে এক অমাবস্যা সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার ফলে ঘোরতর ভয়সঙ্কুল লোকক্ষয়কর ভারতযুদ্ধে রক্তসমুদ্র প্রবাহিত হইয়া ভারতের বীর্যবহ্নি চিরতরে নির্বাপিত হইয়াছে। এবার এই ১৩৪৭ সালে ৫ই আষাঢ় (ইং ১৯৪০ খ্রী॰ ১৯শে জুন) যে চান্দ্র জ্যৈষ্ঠ শুক্ল পূর্ণিমা, তাহা তের দিনের পক্ষে হইতেছে। সেবারের তেরদিনের পক্ষের অমাবস্যায় ভারতবর্ষে যাহা ঘটিয়াছিল, এবার তেরদিনের পক্ষের পূর্ণিমা তাহাই ইউরোপখণ্ডে ঘটাইতেছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাভেদে বোধ হয় ভারত ও ইউরোপ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ ভারতের কল্যাণ করুন, জগতে শান্তিবিধান করুন।

(২)

ভারতে নৌ-বিদ্যা

"ষ্টীম" জনষ্টনের প্রথম পথ প্রদর্শন

শ্রীযুগলকিশোর পাল

ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিল কমিশনের (Indian Historical Records Commission) কার্যবিবরণীর যে ষোড়শ সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জেম্স্ হেনরী জনস্টন্ সাহেব ভারতে বাষ্পীয় নৌ-বিদ্যা প্রচলনের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার একটী সুন্দর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জনস্টন সাহেবকে সেকালে অনেকে "ষ্টীম" জনস্টন বলিত।

ভারতে বাষ্পীয়পোত প্রবর্তনের নিমিত্ত জনস্টন সাহেব যে বিশেষ অধ্যবসায় ও অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনস্টন সাহেব খ্রী॰ ১৭৮৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ১৮০৩ খ্রী॰ অব্দে রাজকীয় নৌ-বহরে প্রবেশ করেন এবং ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে যোগদান করেন। ১৮১৭ খ্রী॰ অব্দে তিনি "প্রিন্স ব্লুচার" নামক জাহাজের অধিনায়ক পদে মনোনীত হন।

সেই সময় একটী সাধারণ 'ষ্টীম ন্যাভিগেশন' কোম্পানী প্রবর্তনের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়, জনস্টন সাহেব সেই কমিটিতে নিযুক্ত হন। ভূমধ্যসাগর দিয়া গ্রেট ব্রিটেন ও তাহার ভারতীয় উপনিবেশগুলির মধ্যে গমনাগমনের সুবিধা হইতে পারে কিনা এই বিষয়ে তিনি কৃতনিশ্চয় হইয়া ১২০ দিনের মধ্যে ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতে আগমন এবং ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার একটি উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

যখন জনস্টন সাহেব প্রমাণ করিলেন যে আরও দীর্ঘ পথ দিয়া ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয় পোতের দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা যাইতে পারে, তখন হইতে ভারতে তাঁহার

প্রকৃত কর্ম আরম্ভ হইল। ব্যবসায়ের দিক দিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইল না বটে, কিন্তু ভারত সরকার এই বাষ্পীয়পোত সামুদ্রিক যুদ্ধব্যাপারে নিয়োগ করিবার ব্যবহারিকতা উপলব্ধি করিলেন। শীঘ্রই জনষ্টনের কার্যাবলী লর্ড আমহার্ষ্টের গবর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং মেরিন বোর্ডের অনুমত্যনুসারে কোম্পানীর সমস্ত স্বত্ব ক্রয় করা হইল ও এই কার্যে জনষ্টন সাহেবকে নিযুক্ত করা হইল। বাষ্পীয়পোত তখন আর নূতন জিনিষ ছিল না বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের দিক হইতে এইরূপ পোত পরিচালনা করা তখনও খুব ব্যয়সাধ্য ছিল।

দেশের মধ্যে বাষ্পীয় পোত প্রচলনের নূতন পরিকল্পনা নির্ধারণার্থ জনষ্টন সাহেব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা অনেক বিবেচনা করিবার পর ভারতীয় উপকূলে চলাচলের জন্য লৌহনির্মিত পোতের সুপারিশ করেন। ১৮৩৩ খ্রী° অব্দে জনষ্টন সাহেব উক্ত কোম্পানীর বাষ্পীয় পোতসমূহের একমাত্র কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হন। ১৮৩৮ খ্রী° অব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখে জনষ্টন সাহেব ভারতীয় বাষ্পীয়পোতের জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিনচালকদিগের শিক্ষাপ্রদানের জন্য তাঁহার পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ দিয়া একটি স্মারকলিপি প্রকাশ করেন। ইংল্যাণ্ড হইতে অধিক খরচে ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যা শিক্ষা করিবার পরিবর্তে এখন কাপ্তেন জনষ্টন সাহেবের নিকট দেশীয় লোক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইলেন।

জেমস্ জনষ্টন ১৮৫১ খ্রী° অব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত উক্তকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং তিনি গৃহ প্রত্যাবর্তনের পথে উত্তমাশা অন্তরীপের (Cape of Good Hope) নিকট দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পরিকল্পনা যথার্থই গ্রহণযোগ্য বলিয়া, আবার বাষ্পীয়জাহাজব্যবসায়ে বে-সরকারী উদ্যম চলিতে লাগিল। ১৮৪৪ খ্রী° অব্দে the Ganges Steam Navigation Company গড়িয়া উঠিল। জনষ্টন সাহেব তাঁহার কার্য এরূপ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছিলেন যে ভারতে বাষ্পীয়পোতের ভবিষ্যৎ তাঁহার কার্যের উপর ভিত্তি করিয়াই গঠিত হয়। তাঁহার পরে ভারত সরকারের বাষ্পীয়পোতসমূহের পরিরক্ষণের জন্য সরকার বাহাদুরের আর উচ্চ বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

(৩)

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

শ্রীযুগলকিশোর পাল

বৎসরের এক একটি দিন এক একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া একটি একটি বিশিষ্ট দিনে পরিণত হইয়াছে, যাহা আমাদিগের নিকট পুণ্যাহ। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই তিথি আমাদের নিকট পুণ্যাহ জন্মাষ্টমী বলিয়া পরিচিত। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমরা ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতারিখ স্মরণ করিয়া

পুণ্যাহ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। আষাঢ় মাসের প্রথম তারিখও কাব্যজগতে একটি স্মরণীয় দিন। মহাকবি কালিদাস কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তাঁহার অমরকাব্য মেঘদূত লিখিয়াছিলেন জানিনা, তবে বিরহী যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম * দিবসে নব মেঘোদয় দেখিয়া সেই মেঘকে দূত স্বরূপ তাহার স্বপ্নলোকের বিরহিণী প্রিয়ার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, ইহা আমরা কবির কাব্যের দ্বিতীয় শ্লোকে দেখিতে পাই। তাই জগতের কবি ও শিল্পীদের নিকট এই দিনটীও একটি স্মরণীয় দিন।

মেঘদূতের বিষয়বস্তু অতি সংক্ষিপ্ত ও সামান্য। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষ অলোকানগরীতে অবস্থিতা তাহার বিরহিণী প্রিয়ার নিকট মেঘের সাহায্যে তাহার বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছে। এই সামান্য বিষয়বস্তু মহাকবির লেখনীপ্রভাবে এরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে যে, আজও বিশ্বের প্রণয়ীহৃদয়ে সেই বার্ত্তা ধ্বনিত হইতেছে। তাই বাংলার বিশ্বকবি গাহিয়াছেন—

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃতবরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

মেঘদূতের পরিকল্পনা কালিদাসের নিজস্ব কিনা সেবিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অনেকে বলেন কবি, কুবের, যক্ষ, অলকা ও কৈলাশ এই কয়েকটী পরিচিত নাম অবলম্বন করিয়া নিজ কল্পনাবলে মেঘদূতের উপাখ্যান সৃষ্টি করেন। আবার কেহ কেহ বলেন রামায়ণে বর্ণিত 'রামবিলাপ' ও হনুমান কর্তৃক লঙ্কায় সীতার নিকট রামচন্দ্রের সন্দেশপ্রেরণ এই দুইটি আখ্যায়িকার উপর ভিত্তি করিয়া কবি মেঘদূত রচনা করেন। Professor Keith বলেন, রামায়ণে যে বর্ষাবর্ণনা আছে তাহার সহিত মেঘদূতের বর্ণনার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধজাতকসকলের মধ্যে যে কামবিলাপ জাতক আছে তাহার সঙ্গেও মেঘদূতের কিছু কিছু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

মেঘদূতে বর্ণিত যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে রামগিরি ও অলকাই প্রধান। রামগিরির বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে, কিন্তু অলকার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয় নাই। মেঘদূতের পরিশিষ্ট 'মেঘদৌত্যম্' কাব্যের প্রণেতা

* কোন কোন পুস্তকে "প্রথম" এই কথার স্থলে "প্রশম" পাঠ দৃষ্ট হয়। প্রশম কথার অর্থ শেষ। তাহা হইলে উক্ত পুঙ্‌ক্তির অর্থ হয় আষাঢ়ের শেষ দিবসে। কিন্তু আষাঢ়ের শেষ দিবসে প্রথম মেঘোদয় কিরূপে সম্ভব হয়? আধুনিক জ্যোতিষীগণের মতে তখনকার আষাঢ়মাস বর্তমান আষাঢ়ের অনেক পূর্বে আরম্ভ হইত এবং বর্তমানের আষাঢ়ের ৭ তারিখে সেই সময়কার আষাঢ়ের শেষ হইত। তাহা হইলে 'প্রশম' কথার প্রয়োগ অসামঞ্জস্য হয় না।

ত্রৈলোক্যমোহন গুহনিয়োগী উক্ত কাব্যের উপক্রমণিকায় অলকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, প্রায় ৫০০০০ বৎসর পূর্বে অলকানগরী উত্তরমেরুর অন্তর্গত সুমেরু পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত ছিল। 'অমরকোষে' সুমেরু পর্বতের একটী প্রতিশব্দ 'সুরালয়' বা দেবতার আবাসভূমি। পরে এক ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে অলকার অবস্থান সরিয়া আসিয়া মধ্য এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। এবিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে রামগিরি নামে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। রমেশ দত্তের 'Economic History of India' গ্রন্থে এই 'রামগিরি' স্টেশনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু মেঘদূতে বর্ণিত 'রামগিরি'র অবস্থানের সহিত এই রামগিরির কোনওরূপ মিল নাই। মেঘদূতের রামগিরি দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত ছিল—দণ্ডকবনে অবস্থানকালে জনকতনয়া সীতার অবগাহনে সেস্থানের জল পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। তাহা হইলে চিত্রকূট পর্বতকে কবি রামগিরি নাম দিয়াছেন। রামের গিরি রামগিরি অর্থাৎ বনবাসকালে রামচন্দ্র সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহা বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এবং কাম্‌টা নামে পরিচিত। ১৮০৬ খ্রী° অব্দে Asiatic Annual Register এ Capt. Blunt মিরজাপুর হইতে নাগপুর ভ্রমণের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, 'রামগিরি' নাগপুরের নিকট অবস্থিত। রামগিরির বর্তমান নাম রামটেক (Ramte'c) ; মানচিত্রে রামটাগ্ নাম আছে। ইহার প্রকৃত নাম 'রাম-টিঙ্কি'—মারাঠা ভাষায় ইহা রামগিরিরই নাম। অতএব রামগিরি নাগপুরের সামান্য উত্তরে অবস্থিত।

মহাকবির 'মেঘদূত' যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা ইহার বিভিন্ন পাঠভেদ হইতে বুঝা যায়। কাশ্মীর, গুর্জর, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠদৃষ্ট হয়। Aufrecht's "Catalogus Catalogorum"এ উননবতিপ্রকার পাঠভেদের কথা এবং মেঘদূতের উপর চতুস্ত্রিংশ টীকার বিষয় উল্লেখ আছে। বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সালের 'নবপ্রভা' নামক পত্রিকার অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় মিঃ এম্-এম্-চক্রবর্তী মহাশয় 'মেঘদূত' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় ৪০ প্রকার টীকা উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন যে;—তাঁহার ধারণা মেঘদূতের উপর প্রায় পঞ্চাশের উপর টীকা আছে। Nandargikar-কৃত মেঘদূতের যে সংস্করণ আছে তাহাতে ২০টী টীকার উল্লেখ আছে, এই টীকাগুলির মধ্যে মল্লিনাথ, ভারত, সনাতন, রামনাথ হরগোবিন্দ ও কল্যাণমল্ল-কৃত টীকাগুলি অন্তর্গত।

মিঃ চক্রবর্তীর মতে বল্লভদেবের কৃত টীকাই মেঘদূতের প্রাচীনতম টীকা। বল্লভদেব খ্রী° ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে। মিঃ চক্রবর্তী বলেন যে নবমশতকের প্রথমভাগে রচিত জৈনগ্রন্থমালার 'পার্শ্বাভ্যুদয়' নামক গ্রন্থে মেঘদূতের প্রাচীন মূল শ্লোক উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়।

খ্রী° ১৮১৩ অব্দে মিঃ H. H. Wilson-কর্তৃক 'মেঘদূতের' ইংরেজী অনুবাদ হয়। পরে

১৮৩৫ খ্রী° Prof. S. Johnsonকর্তৃক Wilsonকৃত অনুবাদের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। (Encyclo-Brit. 9th Edn. Art. Sanskrit Language & Literature দ্রষ্টব্য)

Mr Nandargikar মেঘদূতের দুইটি জার্মান সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন :—

প্রথমটী Prof. Max Muller কৃত; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন Prof. Z. Gildemeister ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মল্লিনাথের টীকাসমেত একটি মেঘদূতের সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার পরে পণ্ডিত প্রাণনাথ পণ্ডিত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি হৃষীকেশ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মেঘদূতের এক একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

বোধহয় মেঘদূতের প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইহার পরে এই কাব্যের আরও অনেক বাংলা অনুবাদ ও সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

(ক)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রফলক

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত মেহার গ্রামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ-কালের একটী তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে; ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া এই তাম্রফলকের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়।

এই ফলকটীর পরিমাণ প্রায় ১২″×১০″। ইহাতে বৈষ্ণব রাজা দামোদর-কর্তৃক স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদানের বিষয় লিখিত আছে। ফলকটীর সম্মুখভাগে ২৪ লাইন আছে এবং পশ্চাৎদিকে ১৯ লাইন আছে। এই ফলকের উপর প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা আছে।

পণ্ডিতবর্গের মতে এই ফলকটীর সময় নির্ধারিত হইয়াছে। খ্রী° ১২৩৪ অব্দে। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশের রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী প্রথম মুসলমান অধিকৃত হয়। এই ফলকটীতে সেই সঙ্কটময় সময়ের কিছু বিবরণ আছে বলিয়া ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

মেহার গ্রামের মহম্মদ রহিমুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করিবার সময় এই ফলকটী প্রাপ্ত হয়। তাহার নিকট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয় এই ফলকটি প্রাপ্ত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী চক্রবর্তী-কর্তৃক এই ফলকটীর পাঠোদ্ধারের পর এই ফলকটীকে আশুতোষ মিউজিয়মে প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

(খ)

হৈ হৈ নৃপতিগণের স্থবর্ণমুদ্রা

রায়পুর আবিষ্কার।

নিখিল ভারত নিউমিস্‌ম্যাটিক্ মহাকোশল ও প্রাচ্যদেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি ও স্থানীয় সম্পাদক পণ্ডিত লোচনপ্রসাদ পাণ্ডে রায়পুরে আবিষ্কৃত একপ্রকার স্থবর্ণমুদ্রা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য রায়পুরে গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র মুদ্রাতত্ত্ব ও উৎকীর্ণলিপি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিবার জন্য ড্রান প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন।

রায়পুর সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে দাল দাল নামে যে গ্রাম আছে সেখানে কতকগুলি স্থবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি সম্প্রতি রায়পুরের মহকুমা হাকিমের আদালতে গবর্নমেণ্টের 'প্রাপ্ত-সম্পত্তির অধিকার' (Treasure Trove) আইন অনুসারে অনুসন্ধান করিবার জন্য গচ্ছিত আছে। মিঃ পাণ্ডে এই সমস্ত মুদ্রা অনুসন্ধান করিয়াছেন। মুদ্রাগুলি দুই রকম আকারের ৯৫টী মুদ্রা বড় আকারের ও ৪১টী মুদ্রা ছোট। মুদ্রাগুলির দুই দিকেই খোদাই করিয়া লেখা আছে এবং সমস্ত মুদ্রাই বেশ ভাল অবস্থায় আছে। মিঃ পাণ্ডে মনে করেন যে এই মুদ্রাগুলি মহাকোশলের হৈ হৈ নৃপতি পৃথিবীদেব ও জজল্লদেবের সময়কার। এই নৃপতিগণের রাজধানী ছিল বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত, রায়পুর নগরে। এই মুদ্রার স্থবর্ণ বিশুদ্ধ স্থবর্ণ নহে; এই মুদ্রা দ্বিতীয় পৃথিবীদেব ও দ্বিতীয় জজল্লদেবের রাজত্বের সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়। এই মুদ্রাগুলি প্রায় ৮০০ বৎসরের পুরাতন।

আশা করা যায় রায়পুরের জেলা-সমিতি দেশীয় নৃপতিগণের মুদ্রার প্রকৃত নিদর্শন-স্বরূপ ইহার কতকগুলি মুদ্রা স্থানীয় মিউজিয়মে রক্ষা করিবেন।

আমাদের কথা

আগামী ১২ই জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়ান্‌ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্‌ ডক্টর দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরকে তাঁহার সম্মানার্থে রচিত একটি গ্রন্থ—"আচার্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থ" উপহার দিবেন। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিরূপে এই গ্রন্থ ও একটি অভিভাষণ অর্পণ করিবেন। এই 'আচার্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থে' পৃথিবীর বিশিষ্ট মনীষিবর্গ তাঁহাদের রচনা পাঠাইয়াছেন। ডক্টর ভাণ্ডারকর ইন্‌স্টিটিউটের পত্রিকা "Indian Culture" এর অন্যতম সম্পাদক, ইহার অন্যতম সদস্য (Hony. Fellow), ইহার প্রথম ভারতীয় কৃষ্টি সম্মেলনের মূল সভাপতি, ইত্যাদি বহুপ্রকারে ইন্‌স্টিটিউটের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি তাঁহার বহুমূল্য গ্রন্থাগার ইন্‌স্টিটিউট্‌কে দান করিতেছেন। তাঁহার প্রতি ইন্‌স্টিটিউটের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রীতি প্রদর্শনে আমারা আন্তরিকভাবে যোগদান করিতেছি।

*　　　*　　　*　　　*

বাংলা দেশে সম্প্রতি ৩টী নূতন কলেজ এই জুলাই মাস হইতে প্রতিষ্ঠিত হইল—(ক) বরিশাল জেলার অন্তর্গত চাখার গ্রামে "ফজলুল হক্‌ কলেজ" (খ) মালদহে "ফজলুল হক্‌ আদিনা কলেজ" ও (গ) পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জে "সিরাজগঞ্জ কলেজ"। এই তিনটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাতে একটী নূতন নারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের সাফল্য কামনা করি।

*　　　*　　　*　　　*

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি নূতন ট্রেনিং কলেজ খুলিতেছেন। বাংলাদেশে অনেক উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ও কলেজ আছে, কিন্তু শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মাত্র ২টী ট্রেনিং কলেজ আছে—একটি কলিকাতায় ও একটি ঢাকাতে। শিক্ষকদিগের শিক্ষাপ্রণালীর উপর স্কুল কলেজের সাফল্য ও ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনগঠন নির্ভর করিতেছে। বাংলায় কয়েকটী মহিলা শিক্ষালয়ও আছে; কিন্তু একটি শিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং কলেজ নাই। গ্রাম্য উন্নতিবিধানের জন্য (Rural uplift) স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শিক্ষা দিবার কোন ট্রেনিং কলেজ নাই। অনেক ধর্মপ্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ভারতেতর স্থানে ধর্মপ্রচারক পাঠাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মের অন্তর্গত কোন ট্রেনিং কলেজ নাই। সমাজ-সেবা শিক্ষা করিবার জন্য (Social Service Training) কোন স্কুল বা কলেজ নাই। (সম্প্রতি বোম্বাইএ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে)। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই প্রকার বহু ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বর্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন এখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অন্ততঃ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা এবং ধর্মপ্রচারকদিগকে কি প্রকার প্রণালীতে তাঁহাদের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে সেই সব বিষয়মুলক পুস্তকাদি রচনা করিয়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদিতে উহাদের প্রচারের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বিভিন্ন বিষয়ক শিক্ষাপ্রণালীপদ্ধতি নির্ণয়ের কতকটা আশু সমাধান হয়।

পুস্তক-সমালোচনা

Reflections on Indian Travels.—Chandra Chakraberty প্রণীত Vijaya Krishna Brothers. Book-sellers & Publishers, 31. Vivekananda Road, Calcutta. Rs 1/8- Pages 1-251.

আলোচ্য গ্রন্থখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে পৌরাণিক নামানুসারে ভাগ করিয়া (যথা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি) উহাদের প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, আবহাওয়া ও বর্তমানে কোন্ কোন্ ব্যাধি ঐ সকল দেশে অধিক তাহা আলোচিত হইয়াছে। যাহারা Imperial Gazetteer-এর খবর পান নাই তাহারা বর্তমান গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের অল্পের ভিতর অনেক কথা বলার বেশ ক্ষমতা আছে। তবে অত্যন্ত সংক্ষেপ করায় কোন কোন স্থান কিছু দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে, অনেক স্থলে সিদ্ধান্তগুলি যুক্তি ব্যতীত স্থাপিত করা হইয়াছে। তবে তিনি বর্তমান যুক্তি অপেক্ষা পৌরাণিক উক্তিগুলিকে অধিক প্রামাণ্য জ্ঞান করায় অনেক স্থলে বোধ হয় যুক্তি দেখান প্রয়োজন বোধ করেন না। পৌরাণিক জাতিসমূহের সহিত বর্তমান নৃতত্ত্ব বর্ণিত জাতিগণের সৌসাদৃশ্য-আবিষ্কার আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। দুই একটী উদাহরণ দিতেছি—Daityas (দৈত্য) = Mongoloids. Asura = Assyrians. Brahman = Paraman (a median Atharvan tribe of mixed Alpine-Aryan origin)। সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত না হইলেও বলা যায় যে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি একান্ত উপেক্ষার যোগ্য নয়।

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ

Ayurveda or The Hindu System of Medicine. By D.B.V. Raman. Malleswaram P.O. Bangalore. Price As. -/8/- Pages 1-31.

বর্তমান পুস্তিকাখানি ইংরেজী ভাষায় আয়ুর্বেদ-সম্বন্ধীয় একটী সুলিখিত প্রবন্ধ। ইহা লণ্ডনের Search Quarterlyতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সেই প্রবন্ধটী পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদিও স্বীকার করিয়াছেন যে এত অল্প পাতার মধ্যে আয়ুর্বেদের মর্ম-প্রকাশ করা কঠিন তথাপি তিনি যেভাবে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব-প্রকাশ পাইয়াছে। অল্প কথার মধ্যে আয়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য কোন কথাই বাদ যায় নাই। বায়ু, পিত্ত, কফের মোটামুটি আলোচনা, বিভিন্ন রোগের শারীরিক অবস্থান প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় কথায় গ্রন্থটী পূর্ণ। যাহারা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ুর্বেদের মোটামুটী তত্ত্ব জানিতে চান তাঁহারা বইখানি পড়িতে পারেন।

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ

চিত্রচম্পূ—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিরচিত। শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্তী-কর্তৃক সম্পাদিত; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মুখবন্ধ সম্বলিত। ১৫২, বাগ রাণী ভবানী, ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত। ৪+৪০+৪+৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য—২৲ টাকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ধমান ও নবদ্বীপ, এই রাজধানীদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর প্রতিভা বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সাধনায়, রসিকতায় এবং আরও অনেক কিছুতেই তখন বাঙালী বিশেষ কৃতিত্ব-প্রদর্শন করিয়া পশ্চিম বঙ্গকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই যুগে যাঁহারা উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও ভাবুকতাপূর্ণ রচনা দ্বারা এদেশ-বাসীকে আনন্দদান করিতে পারিয়াছিলেন, গুপ্তিপাড়া নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহাদের একজন। বর্ধমানাধিপ চিত্রসেনের নিকট হইতে প্রেরণালাভ করিয়া তিনি বাণভট্টের কাদম্বরীর রীতি অনুসরণ করিয়া 'চিত্রচম্পূ' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। এই চম্পূকাব্যখানি সে যুগের বিদ্বৎ সমাজকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালীর গৌরব এই সংস্কৃত কাব্যখানির পুঁথি দুর্লভ হইয়া পড়ায় আমরা বহুদিন ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলাম। এই গ্রন্থের পদলালিত্য ও উজ্জ্বলকল্পনার অতিরিক্ত ইহার আর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে আলিবর্দি খাঁর সময়কার বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে এই গ্রন্থখানির অভাব বহুদিন হইতেই আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলাম। সম্প্রতি প্রবীন শিক্ষাব্রতী, নীরব সাধক শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় এই গ্রন্থের বহু আয়াস-লব্ধ পুঁথিখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থের পাঠোদ্ধারে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং এই গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি কবির ও তাঁহার কাব্যের এবং গ্রন্থনিহিত তদানীন্তন দেশের চিত্র সম্পর্কে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বহু নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় নিজেও গুপ্তিপাড়া নিবাসী, সেজন্য গুপ্তিপাড়ার সুসন্তান বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য তিনি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। দেশবরেণ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মুখবন্ধ লিখিয়া এই সংস্করণটীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। এই মুখবন্ধে কবিরাজ মহাশয় কাব্যখানির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত সমাজে এই গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

What is wrong with the Indian Economic Life?—Dr. V. K. R. V. Rao, Ph.D. (Cantab) প্রণীত। বোম্বে Vora & Co. Publisher Ltd,. কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—১০৪। মূল্য—একটাকা।

বোম্বাই বেতার কেন্দ্র হইতে লেখক ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যে ছয়টী বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেইগুলি লইয়া এই পুস্তকটী মুদ্রিত হইয়াছে।

পুস্তকখানিতে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। প্রথম কয়েকটী বক্তৃতায় কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন-প্রণালীতে এবং বাণিজ্যে ও বাট্টাহারে কোথায় ক্রটি বর্তমান তাহা দেখাইয়াছেন। এই সব ক্রটির জন্য ভারতের জনসাধারণ বিশেষতঃ কৃষককুল যে অর্থনৈতিক দুর্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লেখক ভালভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ জন অধিবাসী কৃষি-কার্যের উপর তাহাদের জীবিকা অর্জনের জন্য নির্ভর করে। উন্নতপ্রণালীতে কৃষি-কার্যের অভাব, উপযুক্ত সারের অভাবে জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, কৃষককুলের নিরক্ষরতা, উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্যের অভাব, ফসল বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বাজারের অভাব, কৃষিজীবির অতিরিক্ত ঋণভার, জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস এবং অবসর সময়ে অন্য কোন বৃত্তির অভাব এই সমস্ত কারণে ভারতের কৃষিজীবিগণের জীবন-যাত্রার ধারা অসম্ভব প্রকারে নিম্ন হইয়াছে, জীবনধারণোপযোগী অতি আবশ্যক দ্রব্যগুলি হইতেও তাহারা আজ বঞ্চিত। গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার এই সমস্ত দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কতকগুলি উপায় প্রস্তাব করিয়াছেন। সেগুলি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রণিধানযোগ্য।

পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও অর্থনীতির ছাত্রগণের বিশেষ উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই। পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল।

K. C.

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

ধর্ম ও দর্শন

১। Yogic Home Exercises—Swami Sivananda. বোম্বাই।

২। The ancient wisdom—the hope of the world—M. Steynor.

৩। Sayings of Lord Mahavira—K. P. Jain. এটয়া।

৪। উপনিষদ্ রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা, ৮ম খণ্ড—শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা, হাওড়া।

ইতিহাস

৫। Warren Hastings and Oudh—C. Collin Davies. (Oxford University Press)

৬। Ancient India—History of Ancient India for 1,000 years in four volumes (from 900 B.C to 100 A.D)—বরোদা,

৭। India's Sacred Shrines and Cities—Madras.

সাহিত্য

৮। বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—১৮১৮-১৮৬৭—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।

জ্যোতিষ

৯। পঞ্চাঙ্গদর্পণ—শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, কলিকাতা।

বিবিধ

১০। The Rhythm of Living—Sir Albion Banerjee, লণ্ডন।

১১। Japan, Her Cultural Development—Ryuichi Kaji

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি.এল্

Journal of Indian History, Vol—IX. 1930.

The Main Currents of the 18th. Century Indian History—H. N. Sinha, M. A.

খ্রী° ১৭০৭ অব্দ হইতে ১৮০৩ অব্দ পর্যন্ত সময় ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় বর্তমান যুগের প্রভাতকাল বলা যাইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে এই সময়ে

ভারতের ইতিহাসে কি কি প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সকলের একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

Gleanings from Sanskrit Literature—Dasharatha Sharma, M. A. —বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাজশেখরের পুস্তকাবলীর পরিচয় আছে।

History of the Reign of Shah Jahan—Abdul Aziz, Barrister-at-Law. —ইহাতে মোগলরাজ্য শাসনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে আছে—মোগল বিচারালয়ের বিবরণ, মনসবদারী প্রথা, মোগল বাদশাহগণের আভিজাত্য ও মোগল সেনার বিষয়।

The Rise of the Mahratta Power in the South—Rao Bahadur Dr. S. Krishnaswami Aiyangar, M.A. Ph.D.—ইহাতে দাক্ষিণাত্যে মরাঠাজাতির অভ্যুত্থানের বিশদ বিবরণ আছে।

Buddhist Logic in the Manimakalai—S. S. Suryanarayana Sastri.—বর্ত্তমান প্রবন্ধে মণিমাকলাই গ্রন্থস্থিত বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

সাময়িক সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—উপনিষদের অর্থ ও উপনিষদ নির্বাচন—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্।

" —আর্য পূজাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান—শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ।

উদ্বোধন—"যত মত তত পথ"—অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ।

উৎসব —বাসনা যায় কিসে?—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

" জ্ঞানের সোপান—শ্রীমদ্ অকিঞ্চনানন্দ ব্রহ্মচারী।

প্রবর্ত্তক—গীতার উপসংহার—শ্রীমতিলাল রায়।

তত্ত্ব-কৌমুদী, ৬৩ ভাগ, ১ম সংখ্যা—ধর্মের প্রকৃতি ও বিকৃতি—শ্রীসরোজকুমার দাস, এম্-এ, পি-এইচ-ডি।

" ৬৩ ভাগ, ৫ম সংখ্যা—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধনের অভিব্যক্তি—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

সাহিত্য

প্রবাসী—জগতের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দিক্—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হালদার, এম্-এস্সি, এম্-এ।

" —আদি মানব ও সভ্যতার বিকাশ—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, এম্-এস্-সি।

ভারতবর্ষ—ভট্ট কুমারিলের পরিচয়—শ্রীপঞ্চানন তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

বঙ্গশ্রী—প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে লোকশিক্ষা ও সমাজগঠন—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী।

„ —উত্তর বঙ্গের কবি জীবন মৈত্রের পদ্মা পুরাণ—শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী।

প্রবর্ত্তক—ইংলণ্ডের শিল্প ও শিল্পী—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ।

„ গণ সাহিত্যে পল্লী-নৃত্যগীতের স্থান—শ্রীজ্যোতির্ময় মৌলিক।

তত্ত্ব-কৌমুদী—৬৩ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা—মৃত্যুর স্বরূপ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্নতত্ত্ব

ভারতবর্ষ—কৌশাম্বী—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, এফ-আর-এ-এস্-বি, এফ-আর-জি-এস্।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—মহীশূর—ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল।

বঙ্গশ্রী—সিপাহী-যুদ্ধের নূতন কথা—শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

প্রবর্ত্তক—অযোধ্যা—শ্রীমতিলাল রায়।

বিবিধ

প্রবাসী—হিন্দুদিগের ঋতু-বিভাগ ও বর্ষারম্ভ—শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাস, এম্-এ, পি-এইচ-ডি।

„ —আইরিশদের দেশে—শ্রীমণিলাল দাস।

ভারতবর্ষ—নীহারিকা ও বিশ্বের বিশালতা—অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে, এম্-এস্-সি।

„ —আর্থিক দুনিয়া—শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়।

বঙ্গশ্রী—বাংলার মৎস্য—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

„ —ভারতের রাষ্ট্রভাষা—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

„ ফরাসী শিল্পসংগ্রহশালার পুণ্যতীর্থে—শ্রীচিন্তামণি কর।

উদ্বোধন—অচেনা ধাতুর পরিচয়—অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্-সি।

উদয়াচল—বাঙ্গালীর খাদ্য—ডাঃ শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়।

———

সাময়িক সংবাদ

অইন-ই-অক্‌বরী গ্রন্থের মূল হস্তলিপি—পণ্ডিত জহওর লাল নেহরু কাশ্মীর হইতে মোগল সম্রাট্ আকবরের সুপ্রসিদ্ধ সচিব আবুল ফজল-কৃত অইন-ই-অক্‌বরী গ্রন্থের একখানি মূল হস্তলিপি আনয়ন করিয়াছেন। তিনি এই হস্তলিপি গ্রন্থখানি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গ্রন্থাগারে প্রদান করিয়াছেন।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতিরক্ষা-দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতিরক্ষার উদ্যোক্তৃগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে স্থায়ী শান্তিস্থাপনের দ্বারাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা যাইতে পারে। তাঁহারা মনে করেন ভারত যদি স্বাধীনতা অর্জন করে, তাহা হইলে ভারত ও গ্রেট বৃটেন—এই দুইটী স্বাধীন দেশের চেষ্টাতেই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাঁহারা অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার একটী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টিফেনোজ নির্মলেন্দু ঘোষ লেকচারার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ সালের জন্য ইংরেজ ঔপন্যাসিক আল্‌ডুস্ হাক্সলীকে ষ্টীফেনোজ নির্মলেন্দু ঘোষ লেকচারা-রের পদে নির্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ হাক্সলী যথাসময়ে এই পদ গ্রহণ করেন নাই এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদসত্ত্বেও নীরব আছেন। কাজেই নিরুপায় হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পদের জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে আহ্বান করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ

স্বামী পরমানন্দ—গত ২১শে জুন বোস্টনের বেদান্তসমিতির অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ ৬০ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

স্বামী পরমানন্দের পূর্বেকার নাম ছিল 'বসন্ত'। তিনি বরিশাল জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং খ্রী° ১৯০০ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রীভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ { দ্বাদশ সংখ্যা

গণেশ

স্বর্গগত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

জাপানে গণেশ

খ্রীস্টীয় নবম শতকের পূর্বে জাপানে গণেশ-সংস্কৃতির প্রবেশলাভ ঘটে নাই। এই সময়েই জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষু কোবো দইসি (বা কু-কই) 'মহাবৈরোচনসূত্রে'র শুভাকরসিংহ-কৃত চীনা অনুবাদের পুথি পান। মহাবৈরোচনসূত্রের তান্ত্রিক গুহ্যবাদই গণেশ-সংস্কৃতির অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কোবো দইসি এক জন বিশিষ্ট ভিক্ষু ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সূত্রের তত্ত্বার্থ বুঝিতে অসমর্থ হন। কোন জাপানী পণ্ডিতও ইহার মর্ম তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন নাই। তখন তিনি জাপান-সম্রাটের অনুমতি লইয়া ভিক্ষু দেন্‌গ্যো দইসির সমভিব্যাহারে ৮০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঙ-রাজসভায় উপনীত হন এবং তথা হইতে 'মহাবৈরোচনসূত্রে'র গূহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য এক জন বৌদ্ধ পণ্ডিতের অনুসন্ধানে চীনের মন্দিরসমূহে গমন করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি সিঙ-লোঙ-সুর মন্দিরে গিয়া হুই-কুওর সাক্ষাৎ পান। হুই-কুও এক জন অসাধারণ পণ্ডিত ও সেন-য়েন সম্প্রদায়ের নায়ক ছিলেন। তিনিই কোবো দইসিকে মহাবৈরোচনসূত্রের গূহ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেন। সিন্‌গোন-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ প্রবাদ আছে যে, কোবো দইসি তাঁহার নিকট 'অভিষিক্ত' বা দীক্ষিত হন। হুই-কুও চীনা শিল্পী লি-চেন্‌কে 'মণ্ডলে'র দুইটী অংশের চিত্র অঙ্কন করিবার আদেশ দেন এবং সেই দুইটী অংশের চিত্র তিনি কোবো দইসিকে প্রদান করেন। এই দুইটী চিত্র তকওসানের জিন্‌গো-জি মন্দিরে এখনও রক্ষিত আছে। চিত্র দুইটী 'তকও-মণ্ডল' নামে পরিচিত। কথিত আছে, তোজির কন্‌গে-ইন মন্দিরে রক্ষিত বহুবর্ণ চিত্র 'তোজি-মণ্ডল' কোবো দইসি-কর্তৃক ৮২১ খ্রীস্টাব্দে চিত্রিত হইয়াছিল।

উক্ত মণ্ডলের দুইটী চিত্রের অনেকগুলি অনুলিপি গৃহীত হইলেও উহার দেবগোষ্ঠী হইতে ভারতীয় রূপেরই আভাস পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় পরিষদের চতুর্ব্যূহের নায়করূপী গণেশের বজ্রধাতুমূর্তিতে ভারতীয় আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষেও এরূপ মূর্তি বিরল নহে। পশ্চিম দিকের নায়কের নাম 'বজ্রবাসী'—ইঁহার হস্তে তীর ও ধনু, পূর্বের নায়ক 'বজ্রচিন্ন'—ইঁহার হস্তে ক্ষুদ্র ছত্র, দক্ষিণের নায়কের নাম 'বজ্রভক্ষণ'—ইনি হস্তে পুষ্পমালা ধারণ করেন, উত্তরের নায়ক 'বজ্রমুখ'—ইঁহার হস্তে তরবারি। ইঁহাদের মধ্যে এক জন নায়ককে বন্যবরাহের মুণ্ডবিশিষ্ট হইতেও দেখা যায়; সম্ভবতঃ অসদ্‌যোনিকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। বজ্রধাতু-মণ্ডলে চারি জন নায়ক এইভাবে থাকেন—

পশ্চিম : বজ্রবাসী
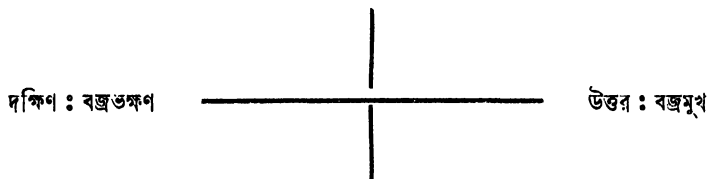
পূর্ব : বজ্রচিন্ন

গণেশের পঞ্চম মূর্তি 'বিনায়কে'র পরিকল্পনা ব্যতীত বজ্রধাতুতে গণেশের পরিকল্পনা-গুলির কোনটীই জাপানে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। এই বিনায়ক মণ্ডলের উত্তর দিকের নায়ক বজ্রমুখের ঠিক নিম্নেই থাকেন। আমরা জানি, 'গর্ভধাতু'তে বিনায়ক থাকেন ঠিক উত্তরে। গর্ভধাতুর পরিকল্পনা-অনুযায়ী বিনায়কের সংস্থান এইরূপ—

পূর্ব
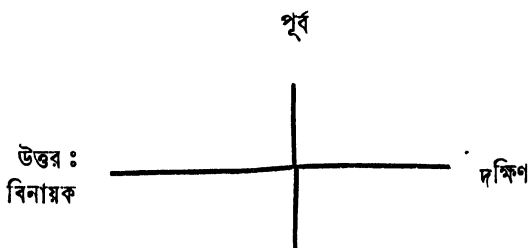
পশ্চিম

জাপানে বিনায়ক-মূর্তিতে গণেশকে মূলা ধারণ করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ ও সিংহলে এরূপ বড় একটা দেখা যায় না, অন্ততঃ এরূপ প্রচলন ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

অবশ্য নেপালে ও তিব্বতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভগ্ন গজদন্তের স্থানে মূলার ব্যবহার ছিল। ইহা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, মণ্ডলের মূল পরিকল্পনা উত্তর-পূর্ব ভারতে রচিত হইয়াছিল। জাপানী প্রবাদ-অনুসারে অমোঘবজ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাঁহাকে শ্রমণ নাগবোধি মণ্ডল-রচনার প্রণালী শিখাইয়া দেন; এই নাগবোধি আবার তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নাগার্জুনের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। নাগার্জুন সপ্তম শতকের মধ্যভাগের লোক এবং তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী হইলেও তিনি হিমালয়ে গিয়া মহাযান শিক্ষা, শিক্ষাদান ও প্রচার করেন।* তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের প্রাচীনতম রচয়িতাদের মধ্যে তিনি এক জন। 'একজটা'র উদ্দেশ্যে রচিত 'সাধন-মালা'র দুইটী সাধনের তিনি রচয়িতা এবং সম্ভবতঃ কোন কারণে তিনি 'ভোট'এ (তিব্বতে) অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভোট হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়।† অতএব নাগার্জুন যে তিব্বতে বা অন্ততঃ তিব্বত-সীমান্তে গিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করা যায়। তথায় তাঁহার পক্ষে মূলাহস্তে গণেশ-মূর্তির পরিচয় পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং মণ্ডলে গণেশের যে মূলাধারণেরও পরিকল্পনা করা হয়, তাহা নাগার্জুনের অভিজ্ঞতা হইতে শিষ্যপরম্পরায় অমোঘবজ্র শিক্ষা করেন। অমোঘবজ্র চীনে এই আদর্শের বাহক। তথা হইতে কোবো দইসি জাপানে তাহা লইয়া যান।

গণেশের মণ্ডলের পরিকল্পনা জাপানে প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথায় বিনায়ক-মূর্তিসমূহ নির্মিত হইতে থাকে। ইকোমার হোজ.ন.-জি মন্দির বিনায়কের মন্দিররূপে প্রসিদ্ধ। বিনায়কের রূপের পরিকল্পনাসমূহ পরে অন্যান্য রূপ লাভ করে। বিনায়ক-মূর্তিসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত গণেশের মূর্তি অন্যতম পরিকল্পনা। ঠিক ভারতীয় রীতির মত তাঁহার এক হাতে একটী ভগ্ন গজদন্ত দেখা যায়, অপর দন্তটী দেখা যায় না। জাপানের গণেশমূর্তিতে অনেক সময় হাস্যস্ফুরিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই তিনি দণ্ডায়মান এবং তাঁহার হাত দুই হইতে ছয়টী। বজ্রবিনায়ক-মূর্তিতে তিনি বজ্র ধারণ করেন। আবার ককু-জে.ন্-চো-মূর্তিতে তাঁহার তিনটী মুণ্ড এবং প্রত্যেক মুণ্ডে তিনটী করিয়া চক্ষু দেখা যায়; চারি হস্তের একটীতে তরবারি, একটীতে মূলা, একটীতে সম্ভবতঃ মোদক ও একটীতে দন্ত থাকে। জাপানীদের মতে, ইনি পর্বতে উপবিষ্ট থাকেন এবং ইনি 'হস্তিযূথের অধিপতি'।

কোবো দইসির পরে খুব বেশী দিন গণেশ-পূজার প্রভাব জাপানে থাকিতে পারে নাই। কারণ বিনায়ক বরাবরই গৌণ দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছেন এবং গণেশ-সংস্কৃতিও জাপানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া

---

* B. L. Suzuki : Eastern Buddhism, Vol. III, 1924,—The Shingon School of Mahayana Buddhism.

† B. Bhattacharya : Buddhist Esoterism, 68.

যায় না। কঙ্গি-তেন-সংস্কৃতিই জাপানে কিছু দিন স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই সংস্কৃতি কোবো দইসিই আনিয়াছিলেন। গুহ্য ও গুপ্ত কঙ্গি-তেন-সংস্কৃতি যোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কঙ্গি-তেন যুগ্মদেবতাকে সিন্‌গোন-সম্প্রদায় সচ্চিদ্‌ব্রহ্ম (বৈরোচন) ও আত্মা প্রকৃতির (স্ত্রী-রূপী অবলোকিতেশ্বরের) মিলনের প্রতীক বলিয়া অভিহিত করে। কঙ্গি-তেনকে জাপানীরা কঙ্গি-দেন, দইসো কঙ্গি-দেন, দইসো-দেন নামে এবং বেশীর ভাগ সো-দেন সম ও তেন-সন সম নামেও অভিহিত করিয়া থাকে।

শ্রী-রূপী অবলোকিতেশ্বরের একাদশমুণ্ডবিশিষ্ট একটী মূর্তি অমোঘবজ্র জাপানে আনেন। এই অবলোকিতেশ্বরের জাপানী নাম—জু-ইচি-মেন কন্নোন। তবে জাপানীরা স্ত্রী-রূপী অবলোকিতেশ্বরকে শুধু 'কন্নোন' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। কঙ্গি-তেন-মন্দিরে জু-ইচি-মেন কন্নোনের মূর্তি প্রায়শঃ দেখা যায়।

৭২০ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় শ্রমণ বজ্রবোধি ও তাঁহার সিংহলদেশীয় শিষ্য অমোঘবজ্র গুহ্য মতবাদের মূলতত্ত্ব চীনদেশে প্রচার করেন। তাঁহারা চীনদেশে শুধু মন্ত্র, ধারণী, মণ্ডল প্রভৃতি তন্ত্রসাধনের প্রবর্তন করেন নাই, আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ যোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আদিবুদ্ধ ও মহাবৈরোচন-সংস্কৃতিরও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বজ্রবোধির মৃত্যুর পর অমোঘবজ্র মহাবৈরোচনসূত্রের অনুলিপির সন্ধানে সিংহলে ফিরিয়া আসেন। তিনি ভারতেও আসিয়াছিলেন, বজ্রবোধির সহিত যখন তিনি চীনে যান তখন যে পাণ্ডুলিপিটী তাঁহাদের সঙ্গে ছিল তাহা সমুদ্রপথে প্রবল ঝড়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে ভিক্ষু নাগবোধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বজ্রধাতু-নক্সাচিত্রের গুহ্যতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরে ৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে চীনে প্রত্যাগমনকালে তিনি মণ্ডল, বহু তন্ত্রগ্রন্থ ও মহাবৈরোচনসূত্রের একটী অনুলিপি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জাপানে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি একাদশমুণ্ডবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের একটী মূর্তিও চীনদেশে আনেন।

য়ুয়ন্‌-চোয়ঙের পূর্বেই দোশো-কর্তৃক চীনদেশে যোগের প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল এবং উহা চীনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তথা হইতে উহা জাপানে নীত হয়। অমোঘবজ্রের পূর্বে চীনে যোগের এই প্রতিষ্ঠা হইলেও বস্তুতঃ তিনি ও তাঁহার চীনা শিষ্য হুই-কুও উহার অধিকতর প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। এই দু'জনেরই না কি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এই অলৌকিক ক্ষমতার একটী দৃষ্টান্ত এইরূপ— কোবো দইসির যখন অভিষেক হয়, তখন হুই-কুও তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সেন্‌-য়েন (বা সিন্‌গোন) -প্রবাদানুসারে এই সময়ে একটী অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করা হয়। উহাতে কোবো দইসি ক্ষণেকের জন্য আদিবুদ্ধ বৈরোচনের সহিত একীভূত হইয়াছিলেন।* জাপানের সিন্‌গোন-সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ আর একটী অপ্রাকৃত ঘটনার কথা প্রচলিত আছে। ৮০৬ খ্রীস্টাব্দে

* A Lloyd : Development of Japanese Buddhism (Jour. Asia. of Japan-এ প্রকাশিত)।

কোবো দইসি যখন জাপানে প্রত্যাগমন করেন, তখন জাপসম্রাট্-কর্তৃক তিনি তৎপ্রবর্তিত সিন্‌গোন-সম্প্রদায়ের গূহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য আদিষ্ট হন। সম্রাট্ সপারিষদ ও বৌদ্ধ প্রধানগণ-পরিবেষ্টিত ছিলেন। কোবো দইসি 'মিক্যো' মতবাদ বিশ্লেষণ করিবার সময় নাকি ক্ষণেকের জন্য বৈরোচন-মূর্তিতে আদিবুদ্ধের রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।* এই ঘটনার পর সার্বভৌম পরমপুরুষের সহিত ব্যক্তিবিশেষের সম্মিলনের মূলসূত্র সিন্‌গোন-সম্প্রদায়ের গূহ্য মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং কঙ্গি-তেন-সংস্কৃতির রহস্যবাদ তাহাদের মধ্যে গৃহীত হয়। জাপানে আসিবার সময় কোবো দইসি তন্ত্রগ্রন্থগুলির সহিত কঙ্গি-তেনের কোন মূর্তি আনিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি তিনি না আনেন, তাহা হইলে চীনা ভিক্ষু চুঙ-সে (জাপানী নাম—কইশিৎসু) এই কৃতিত্বলাভের অধিকারী। ইনিই সিন্‌গোন বৌদ্ধগণকে কঙ্গি-তেন-মূর্তির সম্পূর্ণ ও প্রামাণ্য পরিকল্পনা দেন। ইঁহার পরিকল্পনানুযায়ী কঙ্গি-তেনের মূর্তি ধাতুনির্মিত হইবে এবং উহা ২২ ইঞ্চির অধিক উচ্চ হইবে না। উভয় মূর্তির সম্মুখভাগ পরস্পরের দিকে থাকিবে। উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধাবস্থায় থাকিবে এবং দুই হাতে উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া থাকিবে। উভয়ের মস্তক পরস্পরের স্কন্ধের উপর ন্যস্ত হইবে। তাঁহাদের পরিধেয় হইবে চরণ পর্যন্ত প্রলম্ব।

জাপানে বৌদ্ধ মন্দিরের বহির্দ্বারের রক্ষী নি-ওর সহিত কঙ্গি-তেনের বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই সামঞ্জস্য দেখিয়া উভয়ের ঐক্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উভয়েই মন্দিরের রক্ষী। কঙ্গি-তেনের মত নি-ওও একত্রে পরিকল্পিত যুগ্মদেবতা। মণ্ডলের দুই অংশে ঐজে.নের অভিব্যঞ্জনায় নি-ওর স্থান আছে—এই পরিকল্পনা 'গর্ভ' বা বাস্তব জগতের প্রতীক, পক্ষান্তরে 'ফুদো' নামক দেবতা 'বজ্র' বা তত্ত্বভূত জগতের প্রতীক। বহির্দ্বারের রক্ষিরূপে নি-ওর প্রতিষ্ঠা যে জাপানেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাহা নহে, সুদূর পশ্চিমে চীনা তুর্কীস্তান পর্যন্ত ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। চীনা তুর্কীস্তানের বজ.কৃলিক নামক স্থানের একটী সুবৃহৎ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এইরূপ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতে ত্রিপুরারাজ্যে উনকোটি পাহাড়ের উপর গণেশের একটী সুবৃহৎ মূর্তির উভয় পার্শ্বেও এইরূপ মূর্তির সমাবেশ দেখা যায়।† সম্ভবতঃ এইরূপ মূর্তিতে রক্ষীর মূর্তির পরিকল্পনা করা হইত। কঙ্গি-তেন যেমন মন্দিরের রক্ষী, তেমনি বহির্দ্বারের রক্ষিরূপে নি-ওরও পরিকল্পনা হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়।

কঙ্গি-তেন যুগ্মমূর্তিতে স্ত্রী-বিনায়ক মস্তকে মুকুট ও পুরুষ-মূর্তি চিন্তামণি ধারণ করিতে পারেন। চীনা শ্রমণ হন্-কুয়াঙের বিধানানুসারে গণেশের যুগ্মমূর্তিতে নারী-দেবতার উভয় স্কন্ধ বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিবে এবং পুরুষের এক বা উভয় স্কন্ধই নগ্ন হইবে। এরূপ মূর্তি

---

* B. L. Suzuki : Singon School of Mahayana Buddhism.

† Archaeological Survey of India, 1921-2, Pl. XXXa.

জাপানে দেখা গেলেও আবার অনেক ক্ষেত্রে নারী মূর্তির স্কন্ধ নগ্নই দেখা যায়। আবার আর এক প্রকার কঙ্গি-তেন-মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা পরস্পর আলিঙ্গনাবস্থায় না থাকিয়া উভয়ে পিঠে পিঠ দিয়া একত্র সম্মিলিত; * কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁহাদের চরণযুগল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘোরান। কঙ্গি-তেন-মূর্তিপরিকল্পনার ইহাই মাত্র পরিণতি নয়, পরে তাঁহারা পাশাপাশি অবস্থায়ও পরিকল্পিত হইয়াছিলেন—এরূপ মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

জাপানে কঙ্গি তেনের মূর্তিপরিকল্পনার তিনটী বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে—একটী সাধারণ বা লৌকিক, একটী গুহ্য এবং একটী উভয়ের মধ্যস্থস্বরূপ। যাঁহারা দীক্ষার অভিষেক লাভ করিবেন তাঁহাদের নিকট আবার চতুর্থ একটী মূর্তির পরিকল্পনা দেওয়া হইত। এই চারিটীর প্রত্যেকটীতেই কঙ্গি-তেন গুপ্তভাবে পূজিত হইতেন এবং তাঁহাদের মূর্তি সাধারণ ভক্তদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইত না। মন্দিরের একটী গুপ্ত কক্ষে যখন কঙ্গি-তেনকে রাখা হইত, অর্থাৎ পূজার জন্য প্রকাশ্যে রাখা হইত না, তখন সেই মূর্তি একটী আবরণের মধ্যে রাখা হইত; আবার যখন তাঁহাদের মূর্তি 'জু.চি'র † মধ্যে রক্ষিত থাকিত তখন দ্বারসমূহ বন্ধ রাখা হইত।

কঙ্গি-তেনের প্রার্থনার নিয়মসমূহ কোবো দইসিই জাপানে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গণেশের পূজা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। একক বা যুগ্ম যে কোন মূর্তিতে কোবো দইসি গণেশ-পূজা করিয়াছিলেন এরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গণেশ-পূজার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত 'সকে' ও বেদানা ফল উৎসর্গ করিয়া—অতঃপর ধূপধুনার গন্ধসহ দেবতার উদ্দেশে তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করা হইত। মন্দিরে জলাধারে বা পবিত্র তৈলে মূর্তিটী ডুবান হইত। এখনও জাপানের ধনী গৃহস্থের ঘরে গণেশের গুপ্তপূজার প্রচলন আছে। একটী ব্রোঞ্জনির্মিত পাত্রে সংস্কৃত শণের বীজের তৈল ঢালিয়া মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক এক শত আটবার উহাকে পূত করা হয়। তারপর ঐ তৈল উত্তপ্ত করা হয় এবং তাহাতে কঙ্গি-তেন-মূর্তি ডুবাইয়া দেওয়া হয়—মূর্তিটী পাত্রের ঠিক মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া থাকে। তদনন্তর একটী তামার হাতলযুক্ত ব্রোঞ্জের হাতা দিয়া ঐ তৈল এক শত আটবার তুলিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কঙ্গি-তেন-মূর্তির মাথায় ঢালিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে এইরূপ পূজা ব্যতীত অন্য কোনভাবে পূজার প্রচলন জাপানে বড় একটা দেখা যায় না। জাপানের কোয়-সন্-মন্দিরের সিন্‌গোন পুরোহিত শ্রীযুক্ত এম. মোরিতা বর্তমান চীনা রীতি-সম্বন্ধে অ্যালিস্ গেটিকে লিখিয়া জানান যে, চীনারা এখনও পূজানুষ্ঠানের সময় স্বর্গীয় দেবতাদের

* Sir Charles Eliot : Japanese Buddhsim, 356.

† 'জু.চি' দেবমূর্তি রাখিবার এক প্রকার আধার। এই আধারের ঢাকনি এত স্বচ্ছ যে, বাহির হইতে ভিতরের মূর্তি দেখা যায়।

জন্য একটী বেদী নির্ম্মাণ করে; ইহার উদ্দেশ্য, অসদ্‌যোনিবর্গকে দূরীভূত করিয়া প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা।

চীনে যুগ্মমূর্তির যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যদি উহা তিব্বত হইতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে উহা বিনায়ক ও তাঁহার শক্তির মিলিত মূর্তি বলিতে হইবে। এখন, বিনায়কের শক্তির সহিত অবলোকিতেশ্বরের অভিন্নত্ব আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। অমোঘবজ্র সিংহল হইতেই অবলোকিতেশ্বরকে জাপানে আনিয়াছিলেন। সিংহলে অবলোকিতেশ্বর 'লোকনাথ' নামে পরিচিত। এই লোকনাথের রূপ বা অভিব্যঞ্জনা আটটী; তন্মধ্যে প্রথম চারিটী—'ব্রহ্মানাথ', 'বিষ্ণুনাথ', 'শিবনাথ' ও 'গৌরীনাথ' এবং অষ্টম রূপ গণনাথ। * সিংহলী বৌদ্ধশাস্ত্রে গণনাথের যে রূপবর্ণনা আছে, তাহা ভারতের গণেশমূর্তির সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং গণনাথমূর্তিতে বিনায়কের সহিত বোধিসত্ত্বের একত্ব পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আবার 'কারণ্ডব্যূহে' দেখিতে পাওয়া যায়, বোধিসত্ত্ব আপনাকে গণেশের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন—তিনি বলিতেছেন, সমুদয় জীবগণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং যতক্ষণ না মানবকুল মুক্তি পায় ততক্ষণ তিনি শূন্যতা গ্রহণ করিবেন না। † কারণ্ডব্যূহের সহিত অমোঘবজ্র পরিচিত ছিলেন। সুতরাং অবলোকিতেশ্বরের সহিত গণেশকে অভিন্ন দেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়।

(ক্রমশঃ)

* 'মহানির্বাণতন্ত্রে' আবার লোকনাথের রূপ বারটী, তন্মধ্যে একটী রূপ 'গণনাথ'।

† **Buddhist Esoterism, 28-9.**

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কথিত জ্ঞানের স্বরূপ

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৫। ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং চ সমচিত্তত্বং—ইষ্টানাম্ অনুকূলানাং সুখানাং তৎসাধনানাং চ, অনিষ্টানাং প্রতিকূলানাং দুঃখানাং তৎসাধনানাং চ উপপত্তয়ঃ সংপ্রাপ্তয়ঃ ইষ্টানিষ্টোপপত্তয়ঃ তাসু ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিষু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তত্বং সমং হর্ষবিষাদ-বিকাররহিতং তুল্যং চিত্তম্ অন্তঃকরণম্ যস্য বিদুষঃ স সমচিত্তঃ তস্য ভাবঃ সমচিত্তত্বম্ তুল্যচিত্তত্বম্ ইষ্টোপপত্তিষু হর্ষস্য বর্জনম্ অনিষ্টোপপত্তিষু বিষাদস্য বর্জনম্।—ইষ্টসমাগমে বা অনিষ্টসম্পাতে চিত্তের ধৈর্যচ্যুতি না হওয়া। অর্থাৎ ইষ্টানিষ্টবিষয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় সমজ্ঞান। অর্থাৎ ইষ্টবস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষের অভাব এবং অনিষ্টাগমনে বিষাদের অভাব। যাহারা গৃহী, আশৈশব তাহারা সকলেই, স্নেহের কোলে লালিত পালিত। শরীর-সম্পর্কীয় সুখটা কি জিনিস, তাহা গৃহীরা বিলক্ষণরূপে অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে চিনিয়া লন। বলা বাহুল্য সুখটা বা সুখের অবস্থাটা চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটারও স্বরূপ পরিজ্ঞান হইয়া যায়। সুতরাং দেহের পক্ষে যাহা অনুপযোগী তাহাই দুঃখ, এবং শারীরিক ব্যবহারের পথে যাহা অনুকূল তাহারই নাম দেওয়া হয় সুখ। কেবল নামকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন না। সুখটা অতীব প্রিয়তম এবং দুঃখটা একান্ত অপ্রিয় বলিয়া একটা ধারণাও বদ্ধমূল হইয়া যায়। সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও ইষ্ট এবং অনিষ্টাগমে বা সুখে এবং দুঃখে সর্বদা সর্বাবস্থায় সমজ্ঞান কি গৃহীর ন্যায় জীবের পক্ষে কঠোর সাধন নহে? সুতরাং সুখে দুঃখে সমজ্ঞান কথাগুলি স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া গৃহীদের প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ গৃহস্থ ছাড়া, মনুষ্যের মধ্যে এমন কতকগুলি জীব আছেন, যাঁহাদের চিত্ত ইষ্টানিষ্ট আগমে অবিচলিত থাকে। বস্তুতঃ, একথা ধারণা করিবার যোগ্যতাও গৃহস্থেরা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

১৬। ময়ি চানন্যযোগেন ব্যভিচারিণী ভক্তিঃ—ময়ি পরমেশ্বরে অনন্যযোগেন ভগবতঃ বাসুদেবাৎ পরঃ ন অন্যঃ কোঽপি মম শরণং গতিঃ অস্তি ইত্যেবং নিশ্চয়ঃ অনন্যঃ, অনন্যশ্চাসৌ যোগশ্চ অনন্যযোগঃ তেন অনন্যযোগেন, অব্যভিচারিণী ব্যভিচারিণী ব্যভিচরণশীলা অন্যথা-চরণশীলা ন ভবতি সা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ প্রীতিঃ। জ্ঞানস্য অন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ ভক্তিঃ জ্ঞানম্ উচ্যতে।—ভগবান্ বাসুদেব ভিন্ন আর পরতর কিছু নাই, এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ ভক্তিশব্দবাচ্য। কোন বিষয়ে দ্বিত্ব থাকিলে তাহাকে ব্যভিচার বলা হয়। যাহাতে দ্বিত্ব সম্ভাবনা থাকে না তাহা অব্যভিচারী।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ বা আত্মস্থ পুরুষ, অর্জুনকে এই জ্ঞানোপদেশ করিতেছেন।

সুতরাং এখানে 'ময়ি' শব্দে আমাতে অর্থাৎ পরমাত্মপুরুষেতে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ তাহাই ভক্তিশব্দের বাচক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তি এস্থলে বলার উদ্দেশ্য নহে। কেননা উহা ভগবানের মানুষী তনু। ব্যবহারতঃ দেখা যায় মানুষ সাধারণতঃ গুণপক্ষপাতী, কুরূপ-কদাকার হইলেও, মনুষ্যগণ তাদৃশ পুরুষের গুণের আদর করে। পক্ষান্তরে নির্গুণ যদি শ্রীমন্তও হয়, তাহাকে কেহ সমাদর করে না। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে গোয়ালার ছেলে হইলেও ভিতরে ভিতরে তিনি পরমাত্মপুরুষ। কারণ, অবতারেরা মনুষ্যাদি দেহধারণ করিলেও তাহাতে বিশেষত্ব বজায় থাকে। উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহখণ্ড কেবল লৌহমাত্র নহে, লৌহ ও অগ্নি এই উভয় ভাবাপন্ন, তেমন অবতারের মধ্যেও মনুষ্যাদিভাবের এবং ঈশ্বরভাবের সমাবেশ বুঝিতে হইবে। তাহাতেই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—"নৈষঃ কেবল মানুষঃ।" অর্থাৎ ইনি কেবলমাত্র মানুষ নহেন (পরমাত্মপুরুষও বটেন)। আমরা সেই গোয়ালার ছেলেকে অর্ঘ্য না দিয়া পরমাত্মপুরুষ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহকোটরে অবস্থিত, তাঁহাকেই অর্ঘ্য দিয়া পূজা করি। পুরাণ-ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে নানাদিগ্‌দেশীয় নৃপতিগণ সভাসীন। কথা উঠিল,—অর্ঘ্য দেওয়া হইবে কাহাকে? অর্ঘ্যপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট যোগ্যব্যক্তি এখানে সভাসদ্‌দিগের মধ্যে কে! সকলে একবাক্যে ভীষ্মদেবকে বেদবিৎ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, সে সভায় কি কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন না যে, বর্ণাশ্রমধর্মানুসারে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া একজন ক্ষত্রিয়কে অর্ঘ্য দেওয়ার প্রস্তাব করিতে হইল? হাঁ, ইহার উত্তর এই যে, সভায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এক জন কেন, বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই উপস্থিত ছিলেন—হইতে পারে, তাঁহাদের বেদজ্ঞতা ভীষ্ম অপেক্ষা ন্যূন ছিল। যাহা হউক, যখন সর্বসম্মতিক্রমে ভীষ্মকেই অর্ঘ্য দেওয়া স্থির হইল, তখন ভীষ্মদেব সর্বাগ্রে সভাসদ্‌দিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—আমি জানি, শ্রীকৃষ্ণ আমাপেক্ষাও অধিকতররূপে বেদজ্ঞানসম্পন্ন; অতএব যে অর্ঘ্য আপনারা আমাকে প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা আমার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়া হউক। এই মহতী সভায় শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিতে, কদাচ আমি অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে পারি না। এই সকল কথার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়,—ভীষ্ম, গোয়ালার ছেলে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের দেহাভ্যন্তরবর্তী পরমাত্মপুরুষের পূজা করিয়াছিলেন। সুতরাং বক্ষ্যমান স্থলেও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের কথিত "আমাতে" শব্দে মানুষীতনুমাশ্রিত গোয়ালার ছেলে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইবে না। "ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত মূর্তিনা",—এই অব্যক্ত 'মূর্তির' উদ্দেশ্যেই পূজাদি হইয়া থাকে।

আরও একটী কথা,—স্ত্রীলোকেরা একমাত্রপতিপরায়ণা হইলে, তাহাদিগের সেই বৃত্তিটীর নাম দেওয়া হয় অব্যভিচারিণী। এখানে দ্বিত্বের সম্ভাবনা নাই বলিয়া "দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে।" (বার্ত্তিককারঃ) 'দ্বিধা ইত অর্থাৎ দুই প্রকারে প্রাপ্ত বস্তুর নাম দ্বীত, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন; তাহার ভাবকে দ্বৈত বলিয়া কথিত হয়।' যে

স্ত্রীলোকেরা বহু পতি ভজনা করে, সেই বহুপতিপরায়ণাদিগের বৃত্তিটির নাম ব্যভিচারিণী। যেহেতু এস্থলে দ্বিত্বের সংঘটন হইয়াছে।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্বম্—"বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বা অশুচ্যাদিভিঃ সর্প-চৌরব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতঃ অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদিঃ" (ইতি শাঙ্করভাষ্যে), বিবিক্তশ্চাসৌ দেশশ্চ বিবিক্তদেশঃ, তংনিদিধ্যাসসিদ্ধ্যর্থং সেবিতুং শীলং যস্য স বিবিক্তদেশসেবী, তস্যভাবঃ বিবিক্ত-দেশসেবিত্বম্ অরণ্যনদীপুলিনাদিনির্জনস্থানসেবনশীলত্বম্। "দেবতাগৃহ তৃণকূট বল্মীকবৃক্ষমূল কুলালশালাঽগ্নিহোত্র নদীপুলিন গিরিকুহর কন্দরকোটর নির্ঝর স্থণ্ডিলেষ্বনিকেতবাসী" ইতি শ্রুতিঃ। স্বভাবতঃ যে সকল দেশ শুচি বলিয়া কথিত, অথবা সর্পব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল পরিশূন্য, চৌরকৃত উপদ্রব-রহিত, এরূপ অরণ্য নদীপুলিন, দেবগৃহাদি বিবিক্ত শব্দবাচ্য। সমাধিলাভার্থ সেবনশীল ব্যক্তির নাম বিবিক্তদেশসেবী। ঐ সকল স্থান সেবন নিবন্ধন আত্ম-প্রসাদ জন্মে, এবং আত্মবিষয়ক ভাবনা বিস্তার পায়। স্থূলকথা নির্জন বাস।

অনেকের জানা আছে, মিঠাইর দোকানের নিকটে বাসস্থান হইলে, মিঠাই খাইবার জন্য অল্পাধিক মাত্রায় প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু যদি মিঠাইর দোকান বাড়ীর কাছে না থাকে তবে মিঠাই খাইবার প্রবৃত্তি জন্মে না। মানুষমাত্রের স্বভাব এই যে,—উপভোগ্য জিনিষ-কাছে পাইলেই উপভোগ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে—এবং উপভোগ করে। নিয়ত নির্জনবাস নিবন্ধন ভোগতৃষ্ণা আপন হইতেই কমিয়া আইসে। বাহিরের ভোগতৃষ্ণা যাহার যে পরিমাণ কমিবে, আভ্যন্তরিক আত্মজ্ঞান ঠিক সেই পরিমাণে তাহার বাড়িবে। এ বিষয়ের ইহাই পরীক্ষা।

১৮। অরতির্জনসংসদি—জনানাং বহির্মুখানাং সংসৎ সভা সমবায়ঃ জনসংসৎ তস্যাং জনসংসদি "জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যানামবিনীতানাং কলহোন্মুখিতচিত্তানাং সংসৎ সমবায়ো জনসংসৎ" (ইতি শাঙ্করভাষ্যে) তস্যাম্ অরতিঃ প্রীত্যভাবঃ অরুচিঃ।—নিরন্তর নির্জন বাস অভ্যস্ত হইয়া গেলে বিষয়ীদিগের সংসর্গে বিরতি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। জনকোলাহল-পরিশূন্য স্থানে বাসনিবন্ধন কলহ, রাগদ্বেষাদির জন্য অন্তরে কোন বিকার উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নির্জনবাসের ফলে লৌকিক ব্যবহার-বন্ধন'ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অবস্থা দুইটী পরিপক্ক জ্ঞানস্ফুরণের মধ্যবর্তী স্তরের লক্ষণ।

শাস্ত্রে "সঙ্গত্যাগ" কথাটি বিষয়ভোগলম্পট আত্মজ্ঞান বিমুখ কুসঙ্গ ত্যাগকেই লক্ষ্য করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু জ্ঞানভক্তিবর্জিত ভগবদ্বিমুখ লোকের সঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল। পরন্তু তত্ত্ববিৎ সাধুসজ্জনের সঙ্গ সর্বদাই পরম কল্যাণকারক, যেহেতু তাহা জ্ঞান সাধনের পরম অনুকূল। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"সঙ্গঃ সর্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্তব্যঃ সতঃ সঙ্গো হি ভেষজম্॥"—কুলার্ণব, ১ম উল্লাস।

অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সর্বসঙ্গত্যাগই কর্তব্য অর্থাৎ কাহারও সঙ্গ করা উচিত নহে। যদি সর্বসঙ্গ ত্যাগ করিতে তিনি অসমর্থ হন, তাহা হইলে সৎসঙ্গ করিবেন, যেহেতু সৎপুরুষের সঙ্গ ভবব্যাধির মহৌষধ।

"ওঁ দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ" (নারদ ভক্তিসূত্র---৪৩)

অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিবর্জিত ভগবদ্ভজন-বিমুখ বিষয়ভোগপরায়ণ দূষিতচরিত্র জনের সহবাস সর্বদাই পরিত্যাজ্য। যেহেতু এরূপ অসৎসঙ্গ 'ওঁ কামক্রোধমোহ স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ সর্বনাশ-কারণত্বাৎ' (৪৪ সূত্র) কাম, ক্রোধ, মোহ উৎপত্তির এবং স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিবৈকল্য ও সর্বনাশের কারণ।

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মানম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তম্ অধ্যাত্মম্ আত্মাদিবোধকম্, জ্ঞায়তে আত্মতত্ত্বম্ অনেন ইতি জ্ঞানম্, অধ্যাত্মং যজ্‌জ্ঞানং তদধ্যাত্মজ্ঞানং বেদান্তশাস্ত্রম্, অধ্যাত্মজ্ঞানে আত্মস্বরূপজ্ঞানে নিত্যত্বং নিরতত্বং নিত্যভাবঃ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞানে সততং নিষ্ঠাবত্ত্বম্। জ্ঞানের হেতুভূত ভাবসমূহের পরিপাক নিমিত্ত আত্মবিষয়ক ধ্যানের নাম অধ্যাত্মজ্ঞান। নিয়ত তাহার পরিচিন্তন। যেমন কোষের মধ্যে কোষকার কীটের অবস্থান, যেমন খোসার ভিতরে বিশুষ্ক সুপারির সংস্থিতি, যেমন সুপক্ক তেঁতুলের খোসার ভিতর তেঁতুল, তেমন এই দেহরূপ খোসাটার ভিতর 'আমি'—তৈলধারা-প্রবাহবৎ অবিচ্ছিন্নরূপে ইত্যাকার মনন; ইহা আরও উচ্চ স্তরের কথা। মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদর্শন চেষ্টা।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্—তত্ত্বানাং জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষঃ ব্রহ্মাত্মনাবস্থানম্, তত্ত্ব-জ্ঞানস্য মোক্ষস্য অর্থঃ প্রয়োজনং কার্যসহিতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ পরমানন্দপ্রাপ্তিশ্চ তত্ত্বজ্ঞানার্থঃ, তস্য দর্শনম্ ঐক্যসাক্ষাৎকাররূপ সর্বোৎকৃষ্ট ফলালোচনম্। তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বেদান্তের অর্থ আলোচনা অর্থাৎ অমানিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমান ভাবসমূহের পরিপাক নিমিত্ত মোক্ষের উপায় চিন্তন। অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বিষয়ের বিচারোৎপন্ন বিবেক দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদদর্শন। ইহাই জ্ঞানের চরম বা সর্বোচ্চ স্তর। তত্ত্বজ্ঞানের ফল (কার্য-সহিত অজ্ঞাননিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি) * আলোচনা করিলে তৎসাধনানুষ্ঠানে জীবের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

এই বিংশতিটী জ্ঞানের লক্ষণ। অর্থাৎ এই লক্ষণান্বিত যিনি, তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া অতঃপর কহিতেছেন—

* এতৎ পূর্বোক্তম্ অমানিত্বাদিতত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনান্তং বিংশকং সাধনং জ্ঞানোৎপত্তিকারণত্বাৎ জ্ঞানম্ জ্ঞানসাধনম্ ইতি এবং মহর্ষিভিঃ প্রোক্তম্ কথিতম্। অতঃ যথোক্তাৎ জ্ঞানসাধনসমূহাৎ যৎ অন্যথা বিপরীতং মানিত্বং দম্ভিত্বং হিংসাদি তৎ অজ্ঞানম্ ইতি জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ সংসারকারণত্বাৎ চ প্রোক্তম্। "তস্মাৎ অজ্ঞানপরিত্যাগেন জ্ঞানম্ এব উপাদেয়ম্ ইতি ভাবঃ" (শ্রীমধুসূদন যতিবরঃ)॥

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" গীতা, ৪।৩৫

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও গুরুদেবকে পরিচর্যা করিয়া জানিয়া লও সেই জ্ঞান কি ; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তাহা তোমাকে উপদেশ দিবেন।

এখানে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী বলিয়া দুইটি কথা আছে। জ্ঞানীরা পরোক্ষ জ্ঞানী আর তত্ত্বদর্শীগণ অপরোক্ষজ্ঞানী অর্থাৎ আপ্ত। আপ্তোপদেশের নাম শব্দপ্রমাণ। শব্দপ্রতিপাদ্য অর্থ বিষয়ে যিনি অভ্রান্ত, যাঁহার প্রতারণাদিরূপ কোনও দূষিত অভিসন্ধি নাই, নিজে যাহা যথার্থ বলিয়া জানিয়াছেন, তাহা অন্যকে বুঝানই যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনিই তদ্বিষয়ে আপ্ত। তাঁহার উপদেশ শব্দপ্রমাণ। ঋষিগণ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা সুতরাং তাঁহারা আপ্ত। [ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা, মন্ত্রের স্রষ্টা নহেন ; তাঁহারা শাস্ত্রের স্মারক, শাস্ত্রের কারক অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রণেতা নহেন। "ব্রহ্মাদ্যা ঋষি পর্যন্তাঃ স্মারকাঃ নতু কারকাঃ"।] আপ্তপুরুষেরা তত্ত্বদর্শী। তাঁহাদের বাক্য অভ্রান্ত প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। এজন্য আপ্তপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনের প্রতি স্নেহাধিক্যনিবন্ধন তাঁহাকে তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট জ্ঞানের স্বরূপ শ্রবণ করিবার অবকাশ না দিয়া, স্বয়ং তাহা বলিয়া দিতেছেন,—

বলিতেছেন যে, এই বিংশতিটী জ্ঞানের লক্ষণ,—যাহা ইহার বিপরীত, তাহাকেই অজ্ঞান বলিয়া জানিও। জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ কীর্তন করিতে যাইয়া জ্ঞানলক্ষণ বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান স্বরূপতঃ কি জিনিস, তাহার পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন নাই। না পারিবার কারণ আছে। নৈয়ায়িকদিগের পদার্থ নির্ণয়-সম্বন্ধীয় বাচ্য-বাচক শব্দের পরিজ্ঞান জন্য একটা উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে যে,—"গো-সদৃশঃ গবয়ঃ"। 'গবয়' বলিয়া একপ্রকার জন্তু আছে, অথচ তাহা কেহ দেখে নাই, কিন্তু গবয় শব্দ দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে,—উহা গরুর মতন। গরু যখন সকলেই দেখিয়াছি, তখন গরুর মতন বলার তাৎপর্য এই যে, মহিষের মতন নয়, ঘোড়ার মতন নয়, হাতীর মতন নয়, ভেড়ার মতন নয়। অথচ ঠিক গরুর মত নহে, তবে,—গরুর চেহারার সাদৃশ্য আছে, এইমাত্র। ইহা হইল ব্যাপ্তি লক্ষণ। ব্যাপ্তি লক্ষণের বিশিষ্টগুণ এই যে, উহা সামানাধিকরণ্যগুণযুক্ত অর্থাৎ অদৃষ্ট বস্তুর পরিজ্ঞানের সাহায্যকারী। সুতরাং গরুর মতন যাহা দেখিব, অথচ তাহা গরুও হইবে না, অবশ্যই তাহা 'গবয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব। এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানকে 'উপমিতি' বলে। ঠিক এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ এখানে জ্ঞানটী আমাদের সকলেরই অপরিজ্ঞাত পদার্থ। তাহার পরিজ্ঞান করাইয়া দেওয়ার সহজ উপায় আর নাই। সুতরাং 'গোসদৃশ গবয়ের' প্রতীতির ন্যায়—জ্ঞানের প্রতীতি জন্মাইয়া দেওয়া ভিন্ন উপলব্ধি করাইয়া দেওয়ার আর কোন পন্থা নাই। সুতরাং সমানাধিকরণ ব্যবস্থার সহায়তা লইয়া বলিতেছেন যে, উপরের কথিত বিংশতিটী জ্ঞানের লক্ষণ। অর্থাৎ যে আধারে ঐ সমস্ত লক্ষণগুলি বিকাশ পাইবে, সেই আধারটীকে জ্ঞানী বলিয়া বুঝিও। জ্ঞান ভিতরের বস্তু, উহা মনোবৃত্তির অবস্থাবিশেষমাত্র,—তাহাকে ভিতর

হইতে নিষ্কাষণ করিয়া বাহিরে আনিয়া দেখাইবার উপায় নাই। এজন্য সাদৃশ্য বস্তুর পরিচয় করাইয়া দিয়া, জ্ঞান কি, তাহা জানিবার জন্য সুগম উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যে কেহ, এই পন্থানুসারে তত্ত্ববিচার দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ পরিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

আরো এক কথা,—কর্মানুষ্ঠাতা পুরুষের ইচ্ছা ও অনুরাগ অনেক প্রকার, এবং বিচিত্র। সুতরাং বাহ্যবিষয়ে যাহাদের হৃদয় একান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্র কিছুতেই তাহাদিগকে সেই বিষয় হইতে বিরত করিতে সমর্থ হয় না। এবং স্বভাবতঃ যাঁহাদের চিত্ত বাহ্য বিষয় হইতে বিরক্ত, তাঁহাদিগকেও বাহ্য বিষয়ে আসক্ত করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু শাস্ত্র হইতে এই মাত্র হয় যে, প্রদীপাদি আলোক যেমন অন্ধকার মধ্যস্থ বস্তু বিষয়ে জ্ঞানমাত্র জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ 'ইহা ইষ্টসাধন, উহা অনিষ্ট সাধন'—এইরূপে সাধ্যসাধন বিষয়ক সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া দেয় মাত্র। কিন্তু শাস্ত্র কখনই লোকদিগকে, ভৃত্য প্রভৃতির ন্যায় বলপূর্বক কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করেনা, কোন বিষয় হইতে নিবৃত্তও করেনা। কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়,—বহু লোক, অনুরাগের প্রাবল্যবশতঃ শাস্ত্রবিধিও অতিক্রম করিয়া চলে। সেইহেতু সাধারণ লোকের বুদ্ধি বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রসমূহ নানা প্রকার উপদেশ করিয়া থাকেন।

রোগের কোন চেহারা অদ্যাপি কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে, কি ধরিয়া বলি যে, এই রোগটী জ্বর, ইহার নাম আমাশয়, ইহার নাম পাণ্ডু, ইহার নাম অতিসার? না,—লক্ষণ ধরিয়া। কোন্ কোন্ লক্ষণগুলি দ্বারা কোন্ কোন্ রোগের অভিব্যক্তি হয়, শাস্ত্রে তাহার নির্দেশ আছে। এখানে যেমন শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া, তল্লক্ষণাদি দৃষ্টে আমরা অনায়াসে রোগ নির্ণয় করিতে পারি, তেমন জ্ঞানের লক্ষণগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকিলে সেই সেই লক্ষণ ধরিয়া জ্ঞানী পুরুষকে চিনিয়া লইবার সুবিধা হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবনার অবতারণা।

"তস্মাদাত্মবিদামত্র লক্ষণানীতি সিদ্ধয়ঃ।
ইমাং মতিং পরিত্যজ্য বিদ্ধ্যন্যানি মরুৎসুত॥
নির্মমত্বমহংকার-হীনত্বং সঙ্গহীনতা।
সদা শান্ত্যাদিযুক্তত্বং সংসারেঽস্মিন্ বিরক্ততা॥
জিতেন্দ্রিয়ত্বমাত্মেচ্ছা তৎপরত্ব-মহর্নিশম্।
নিষ্পরিগ্রহতা দ্বন্দ্বসহতা নিরপেক্ষতা॥
সর্বব্যাপার-বৈমুখ্যং নিজানন্দৈকসক্ততা।
এবমাদীনি সর্বাণি জ্ঞানিনাং লক্ষণানি তু॥"

[বশিষ্ঠকৃত তত্ত্বসারায়ণে রামগীতা]

—'অতএব সিদ্ধিসমূহই আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ, এই বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ—নির্মলতা, অনহঙ্কার, সঙ্গহীনতা (আসক্তিশূন্যতা), শান্তি আদি, সংসারে বিরক্ততা, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মদর্শন, সর্বদা আত্মদর্শনে রততা, নিষ্পরিগ্রহতা (বহু পরিজনে বেষ্টিত না থাকা), দ্বন্দ্বসমতা, নিরপেক্ষতা (কিছুর অপেক্ষা না করা—স্বাধীনতা), সর্বব্যাপারে বিমুখতা, নিজ আনন্দে আসক্ততা ; ইত্যাদি'।

"জ্ঞানিনঃ সাত্ত্বিকা যে স্যু বৈরাগ্যাদি বিভূষিতঃ।
ব্রহ্মৈক্য-মননে নিষ্ঠাঃ স্বাশ্রমাচার-ভাস্বরাঃ॥" (ঐ)

—'সাত্ত্বিক জ্ঞানী বৈরাগ্যাদিযুক্ত, জীব ব্রহ্মের ঐক্যে মনন পরায়ণ ও স্বাশ্রমের আচারে নিষ্ঠ'।

ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

বৈশেষিক ও বিজ্ঞানবাদ (২) *

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পূর্বপক্ষী (৫৬২ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছিলেন যে সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে পৃথক্ কোন অবয়বী পদার্থ না থাকিলে বৃক্ষাদি দেখাই যাইত না। বৌদ্ধ এখন বৈশেষিকেরই এই কথা হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে ইহা স্বীকার করিলে পরমাণুই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ পরমাণু যদি অতীন্দ্রিয় হয় তবে বিশিষ্ট অবস্থাতেই বা তাহা ইন্দ্রিয়-গোচর হইবে কেন? যিনি বলেন যে পরমাণু নিত্য, তাঁহার প্রতি জিজ্ঞাস্য, নিত্যত্ববশতঃ পরমাণুতে যখন কোন অবস্থাতেই কোন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইতে পারে না তখন সর্বাবস্থাতেই তো পরমাণু ইন্দ্রিয়াতীত থাকিবার কথা! কিন্তু দেখা যায় যে :—

অন্যোন্যাভিসরাশ্চৈবং যে জাতাঃ পরমাণবঃ।

নৈবাতীন্দ্রিয়তা তেষামন্যানাং গোচরত্বতঃ॥ ৫৮৪॥

অর্থাৎ, যে-সকল পরমাণু পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া (বৃক্ষাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে) তাহারা অতীন্দ্রিয় নহে, কারণ অপরে তাহা অনুভব করিতে পারে।—বৈশেষিক কিন্তু বলিতে পারেন যে তাঁহাদের পরমাণু একটির পর একটি পৃথক্ ভাবে অবস্থিত; সেই পৃথক্রূপে যখন পরমাণু পরিলক্ষিত হয় না তখন পরমাণুর প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। ইহার উত্তর :—

পৌর্বাপর্যবিবেকেন যদ্যপ্যেষামলক্ষণম্।

তথাপ্যধ্যক্ষতাহবাধা পানকাদাবিব স্থিতা॥ ৫৮৬॥

এই কারিকাটি অস্পষ্ট; কমলশীলের টিপ্পনী হইতে বুঝা যায় যে তিনিও এটির সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারেন নাই। কারিকাটির ভাবার্থ কিন্তু এই অস্পষ্টত্ব সত্ত্বেও বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ এখানে বলিতেছেন যে অণ্বাবলী ক্রমানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ পরিদৃষ্ট না হইলেও তাহাদের প্রত্যক্ষতা না হউক অধ্যক্ষতা (eligibility to perception) অসম্ভব হইবার কারণ নাই। পানক (?) প্রভৃতি মিশ্র দ্রব্যে পরমাণুগুলি পৃথক্ভাবেই দেখা যায়; এবং সেখানে অবয়ব হইতে পৃথক্ কোন অবয়বীর অস্তিত্ব নাই, কারণ বিবিধ বিজাতীয় পদার্থের সমবায়েই সেখানে দ্রব্যের উৎপত্তি (বিজাতীয়ানাং দ্রব্যারম্ভকত্বাৎ)। পরমাণু হইতে অবয়বী অভিন্ন হইলে সংযোগোৎপন্ন বস্তুর দৃশ্যত্ব কখনই সম্ভব হইত না, কারণ সেই সংযোগের যাহা আশ্রয় সেই পরমাণুই অদৃশ্য (অদৃষ্টাশ্রয়ত্বাৎ)। সংযোগী পদার্থ-গুলির একটিও যদি অদৃশ্য হয় তবে সংযোগ আর দেখা যায় না; অথচ বৈশেষিক বলিতে

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, Second Series, No. 2.

চাহেন যে সংযোগী অণ্বাবলীর প্রত্যেকটি অদৃশ্য হইলেও সংযোগরূপ দ্রব্য দেখা যাইবে। প্রকৃত কথা এই যে বস্তুর প্রত্যক্ষতাই অসিদ্ধ। যে-বস্তুর যে-অংশটুকু অন্যান্য বস্তু হইতে যে-পরিমাণে পৃথক্ (ব্যাবৃত্তি) করা যায় সেই বস্তু কেবল সেই পরিমাণেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে কোন বস্তুকেই অপর সকল বস্তু হইতে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে distinguish করা যায় না।—বৈশেষিক কিন্তু বলিতেছেন, বস্তু নিরংশ এবং পূর্ণভাবেই তাহা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যে নিশ্চয় জ্ঞান হইতে পারে না একথা বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। ইহার উত্তর :-

অকল্পনাক্ষগম্যেঽপি নিরংশেঽর্থস্ত লক্ষণে।
যদ্ভেদব্যবসায়েঽস্তি কারণং স প্রতীয়তে ॥ ৫৮৮ ॥

অর্থাৎ, বস্তু নিরংশ হওয়ায় যদিও তাহা অকল্পন (অর্থাৎ নির্বিকল্প ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গ্রাহ্য) তথাপি তাহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে নিশ্চয়জ্ঞান জন্মায় তাহাই হইল বস্তুর প্রত্যয়ের কারণ। কেবলমাত্র অনুভব হইতে কখনও নিশ্চয়জ্ঞান জন্মিতে পারে না,—সেজন্য অভ্যাস, প্রত্যাসত্তি প্রভৃতিরও প্রয়োজন। আমরা কেবলমাত্র তর্কের অনুরোধে পরমাণু ও বাহ্যার্থ স্বীকার করিয়া লইয়া এই কথা বলিতেছি। বিজ্ঞানবাদী প্রকৃতপক্ষে নীলাদি বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব স্বীকার করেন না, কারণ স্বপ্নে প্রকৃত বাহ্যার্থ ব্যতিরেকেও নীলাদির প্রতিভাস (illusion) সম্ভব হওয়ায় বাহ্যার্থের বস্তুত্ব সম্বন্ধে সর্বদাই সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে।

বৈশেষিক এইবার বলিতেছেন, অবয়বী যদি না থাকে তবে বহু পরমাণুর স্থলে লোকে 'একটি' পর্বত দেখিতে পায় কিরূপে? ইহার উত্তর :—

সমানজ্বালাসংভূতের্যথা দীপেন বিভ্রমঃ।
নৈরন্তর্যস্থিতানেকসূক্ষ্মবিত্তৌ তথৈবকথা ॥ ৫৮৯ ॥

অর্থাৎ, একই প্রকারের অসংখ্য অগ্নিশিখা ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হইবার ফলে যেরূপ একটি অচঞ্চল দীপশিখার বিভ্রম জন্মায়, ঠিক সেইরূপেই অসংখ্য সূক্ষ্ম পরমাণুর আনন্তর্যের ফলে পর্বতাদি স্থূল পদার্থের 'একত্ব' বিষয়ক বিভ্রম জন্মিয়া থাকে।—ইহাও অবশ্য বিজ্ঞানবাদীর নিজের কথা নহে, যদিও বিজ্ঞানবাদের অভ্যুদয়ের পূর্বেই (যথা লঙ্কাবতারসূত্রে) বৌদ্ধদর্শনে এই দীপশিখার দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। বিজ্ঞানবাদীর এখানে দেখানর উদ্দেশ্য যে অবয়বী থাকিলেই যে বৈশেষিকের মত অবয়বও স্বীকার করিতে হইবে তাহা নহে। বিজ্ঞানবাদীর নিজের মতে অবশ্য অবয়ব ও অবয়বী দুইই মায়িক।

বৌদ্ধ এইবার পূর্বপক্ষীকে দেখাইয়া দিতেছেন তাঁহার কিরূপ আপত্তি উত্থাপন করা উচিত (পরং চোদয়িতুং শিক্ষয়তি) :—

এতাবত্তু ভবেদত্র কথমেষাং ন নিশ্চয়ে।
নীলাদিপরমাণূনামাকার ইতি গম্যতে ॥ ৫৯১ ॥

তদপ্যকারণং যস্মান্নৈব জ্ঞানমগোচরম্।
নচৈকস্থূলবিষয়ং স্থৌল্যৈকত্ববিরোধতঃ ॥ ৫৯৩ ॥

কমলশীল এই অস্পষ্ট কারিকাদ্বয়ের যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও অস্পষ্ট :—পরমাণুগত নীলাদি যে পরমাণু হইতে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধ হয় না তাহার কারণ স্বরূপ ইহা বলা যায় না যে পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয় না (বিবেকেনালক্ষণম্), কারণ পরমাণু ও নীলাদির ভেদজ্ঞানের নিশ্চয়তা অন্য উপায়েও উৎপন্ন হইতে পারে। এবং এই জ্ঞান যে নির্বিষয় তাহা বহিরর্থবাদী (নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক) কখনই বলিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিজ্ঞানমাত্রতা স্বীকার করা হইবে। এখন বিজ্ঞানের বিষয় এই রূপাদি যাহা স্থূলাকারে প্রতিভাত হয় তাহা এক না অনেক? এবং এক হইলে তাহা অবয়বসংযোগে আরব্ধ কি না (composed of parts or not)? একসঙ্গে তাহা কখনই এক ও অনেক উভয়ই হইতে পারে না কারণ তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কেন? তাহার উত্তর :—

স্থূলস্যৈকস্বভাবত্বে মক্ষিকাপদমাত্রতঃ।
পিধানে পিহিতং সর্বমাসজ্যেতাবিভাগতঃ ॥ ৫৯৩ ॥
রক্তে বা ভাগ একস্মিন্ সর্বং রজ্যেত রক্তবৎ।
বিরুদ্ধধর্মভাবে বা নানাত্বমনুষজ্যতে ॥ ৫৯৪ ॥

অর্থাৎ, স্থূলপদার্থ যদি একস্বভাব (intrinsically singular) হয় তাহা হইলে একটি মক্ষিকার পদদ্বারা সেই স্থূলপদার্থের অতি সামান্য অংশ আবৃত হইলেই তাহার সমস্তটি আবৃত হইয়া যাইবে, কারণ যাহা সর্বতোভাবে একস্বভাব তাহার এক অংশ আবৃত এবং অপর এক অংশ অনাবৃত কখনও হইতে পারে না। এবং বিরুদ্ধ ধর্মের অভিসঞ্চার সর্বতোভাবে একস্বভাব কোন বস্তুতে সম্ভব না হওয়ায় এই প্রকার বস্তুর অতি ক্ষুদ্রাংশ রঞ্জিত হইলেই সমস্ত বস্তুটি রঞ্জিত হইতে বাধ্য! একস্বভাব বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস কখনই সম্ভব হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই একটিমাত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা কি? আর ইহা যে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ তাহাও সুস্পষ্ট, কারণ কোথাও দেখা যায় না যে বস্তুর একাংশের আবরণেই সমগ্র বস্তুটি আবৃত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং বস্তুর একত্ব কোন দিক্ হইতেই সমর্থন করা যায় না। অতএব সংযোগজ বস্তু অসিদ্ধ।

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, "একই বস্তুতে যখন কোন প্রকার ভেদ সম্ভব নহে তখন ('রক্তে বা ভাগ একস্মিন্ সর্বং রজ্যেত' এই প্রকার বাক্যে) সর্ব-শব্দের প্রয়োগ কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না", (কারণ যেখানে অংশ বা ভাগের সম্ভাবনা আছে সেখানেই কেবল সর্বশব্দ প্রয়োগের সার্থকতা আছে)। এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বলা হইয়াছে :—

নম্বু চৈকস্বভাবত্বাৎ সর্বশব্দোঽত্র কিংকৃতঃ।
স হ্যনেকার্থবিষয়ো নানাত্মাবয়বী ন চ ॥ ৫৯৫ ॥

বৈশেষিক এখানে বিজ্ঞানবাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন যে তাঁহার মতে বস্তু যখন একস্বভাব (প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বভাব) তখন তাঁহার পক্ষে সর্ব-শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে, কারণ এই শব্দ সর্বত্র বিবিধার্থের জ্ঞাপক।—ইহার উত্তরে বলা হইতেছে :—

নমু যে লোকতঃ সিদ্ধা বাসোদেহনগাদয়ঃ।
ত এবাবয়বিত্বেন ভবদ্ভিরুপবর্ণিতাঃ॥ ৫৯৬॥
রক্তং বাসোঽখিলং সর্বং নিঃশেষং নিখিলং তথা।
তত্রেচ্ছামাত্রসংভূতমিতি সর্বে প্রযুঞ্জতে॥ ৫৯৭॥
তথাবিধবিবক্ষায়ামস্মাভিরপি বর্ণ্যতে।
সর্বং স্যাদ্রক্তমিত্যাদি নির্নিবন্ধা হি বাচকাঃ॥ ৫৯৮॥

অর্থাৎ, লোকপ্রসিদ্ধ বস্ত্র, দেহ, পর্বত প্রভৃতিকেই আপনারা (=বৈশেষিকগণ) অবয়বী বলিয়া থাকেন; এবং সেই বস্ত্রাদিকেই আপনারা রক্ত, অখিল, সর্ব প্রভৃতি বিশেষণদ্বারা অভিহিত করেন। এই সকল শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। শব্দপ্রযোক্তা যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন—ইহা স্মরণ করিয়াই আমরা বিবক্ষাবশে বলিয়া থাকি "সর্বং স্যাদ্রক্তং" ইত্যাদি। এই প্রকারের শব্দপ্রয়োগ হইতে কিছুই অনুমান করা যায় না। উপরন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই প্রকারের আপত্তি আপনাদের বিরুদ্ধেই প্রযুজ্য, যাঁহারা স্থূলবস্তুর একত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; আমরা তাহা আদৌ স্বীকার করি না।

অনুবর্তী কারিকায় শান্তরক্ষিত শঙ্করস্বামী নামক এক বিরুদ্ধপক্ষীয় দার্শনিকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

নমু চাব্যাপ্যবৃত্তিত্বাৎ সংযোগস্য ন রক্ততা।
সর্বস্যাসজ্যতে নাপি সর্বমাবৃতমীক্ষ্যতে॥ ৬০০॥

অর্থাৎ, সংযোগ যেহেতু অব্যাপ্যবৃত্তি (non-coincident) সেইজন্য বস্ত্রের একাংশ রঞ্জিত হইলেই যে তাহার সমস্তটি রঞ্জিত হইয়া যাইবে তাহা বলা যায় না, এবং সেই জন্যই শরীরের একদেশ আবৃত হইলেই সমগ্র শরীর আবৃত হইবারও কারণ নাই।—কারিকাটির মধ্যে "অব্যাপ্যবৃত্তি" কথাটিই লক্ষণীয়। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে সংযোগস্থলে সংযোগী বস্তুদ্বয়ের প্রত্যেকটিই যে অপরটির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইতে বাধ্য তাহা নহে।—কিন্তু শঙ্করস্বামীর এই কথা ঠিক নহে, কারণ :—

নমু চানংশকে দ্রব্যে কিমব্যাপ্তং ব্যবস্থিতম্।
স্বরূপং তদবস্থানে ভেদঃ সিদ্ধোঽতএব বা॥ ৬০১॥
বহুদেশস্থিতিস্তেন নৈবৈকস্মিন্ কৃতাস্পদা।
ততঃ সিদ্ধা পটাদীনামণুভ্যোঽনেকরূপতা॥ ৬০২॥

অর্থাৎ, দ্রব্য যদি নিরংশ হয় তবে সংযোগস্থলে তাহার কিছুমাত্রও অব্যাপ্ত

থাকিতে পারে কি? যদি থাকে তবে তদ্দ্বারাই দ্রব্যের ভেদ সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তখন আর তাহাকে নিরংশ বলা যাইবে না। সেইরূপ যে-দ্রব্য এক তাহার কখনও একসঙ্গে একাধিক দেশে অবস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে পটাদি রূপতঃ অংশাবলী হইতে পৃথক্।—কমলশীল এই কারিকাদ্বয়ের ব্যাখ্যাসম্পর্কে অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন :—

যদি পটাদি একাত্মক দ্রব্য হয় তবে তাহাতে কষায়াদি বর্ণের দ্বারা অব্যাপ্ত এমন কি থাকিতে পারে যাহাতে বর্ণ ও বস্ত্রের সংযোগ অব্যাপ্তবৃত্তি (non-coincident) হইতে পারে? কোন অংশের অব্যাপ্তি স্বীকার করিলেই ভেদ স্বীকার করা হইবে—যাহা একাত্মক দ্রব্যে অসম্ভব। এবং দ্রব্য নিরংশ হওয়ায় ইহাও বলা চলিবে না যে তাহার প্রধানাংশ বর্ণাচ্ছাদিত হওয়াতেই সমগ্রটি রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যদি বলা যায় যে বহু বা অল্প অবয়বের সংগ্রহণের ফলেই স্থূল ও সূক্ষ্মের ভেদ উপস্থিত হয় তবে উত্তর, অবয়বই সে-ক্ষেত্রে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম হউক—অবয়বীর সহিত তাহার কি সম্পর্ক? আর অবয়বী যখন পূর্বপক্ষীর মতে নিরংশ তখন অবয়বের অল্পত্ব বা বহুত্ব নিবন্ধন কোন প্রকারের বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব তাহাতে হওয়া উচিত নয়; স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মত্ব এক্ষেত্রে সেই অবয়ব পরমাণুরই ধর্ম হওয়া উচিত।

পূর্বপক্ষী যে বলেন সংযোগ অব্যাপ্তবৃত্তি—এ-কথার অর্থ কি? এ-কথার অর্থ যদি ইহা হয় যে সংযোগে দ্রব্যের সর্বাংশ ব্যাপ্ত হয় না তবে সে অর্থ ঠিক নহে; কারণ এখানে "সর্ব" বলিতে যে "দ্রব্য" বুঝাইতে পারে না তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। এই কথার দ্বারা ইহাও বুঝাইতে পারে না যে আশ্রয়দ্রব্যের একাংশের মাত্র সংযোগ ঘটে, কারণ নিরংশ দ্রব্যের অংশ সম্ভবই নহে। যদি বলা যায় "সর্ব" বলিতে এখানে অবয়বী দ্রব্যের সর্ব অবয়ব বুঝাইতেছে তবে উত্তর, সে-ক্ষেত্রে সমস্ত অবয়বগুলি রঞ্জিত হইলেও দ্রব্যটি অরক্ত থাকিবে, এবং ফলে একই সঙ্গে রক্ত ও অরক্তের অনুভব ঘটিবে। এ-ক্ষেত্রে কেবল "অবয়ব" না বলিয়া "অবয়বীর আরম্ভক অবয়ব" বলিলেও কোন লাভ হইবে না। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে অবয়ব বলিতে এখানে পরমাণু বুঝাইতেছে—তবে তাহাও ঠিক্ হইবে না, কারণ পরমাণু অতীন্দ্রিয় হওয়ায় অংশাশ্রিত সংযোগও অতীন্দ্রিয় হইবে এবং তজ্জন্য রক্তাদি বর্ণের অনুভব ঘটিবে না। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, ব্যাপ্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইল অঙ্গুলির সহিত তাহার রূপের সম্বন্ধের অনুরূপ,—যেখানে আশ্রয়স্বরূপ সমস্ত অঙ্গুলিটির উপলব্ধি ব্যতিরেকে তাহার রূপের উপলব্ধি ঘটিতে পারে না; সুতরাং সংযোগ অব্যাপ্তবৃত্তি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইল এই যে কেবল আশ্রয়ের উপলব্ধির ফলেই যে সংযোগের উপলব্ধি ঘটিতে পারে তাহা নহে। কিন্তু পূর্বপক্ষীর এ-কথা ঠিক নহে। আশ্রয়ের উপলব্ধি ব্যতীত সংযোগ কোথাও উপলব্ধ হয় না। ঘট ও পিশাচের সংযোগ কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ এই সংযোগের আশ্রয়স্বরূপ পিশাচ ও ঘটের মধ্যে ঘটটি দেখা যাইলেও পিশাচ কখনও দেখা যায় না। আর পূর্বপক্ষীর কথা সত্য হইলে বস্তুর আশ্রয়ের উপলব্ধি ব্যতিরেকে

বর্ণও কখনও দেখা যাইত না; অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে বর্ণও হইয়া পড়িত ব্যাপ্যবৃত্তি। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, অরক্ত অবয়বসমূহে সমবেত দ্রব্যের অনুভূতি সম্ভব হইলেও সংযোগাত্মক বর্ণের উপলব্ধি তাহাতে ঘটে না; সুতরাং দ্রব্যের আশ্রয়ের উপলব্ধি হইলেও দ্রব্যটির উপলব্ধি না ঘটিতে পারে। কিন্তু এ-কথা ঠিক্ নহে। ইহা যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে যে-দ্রব্যে রক্ত এবং অরক্ত অবয়ব সমবেত হইয়াছে সেখানে অবয়বীর একত্ব বশতঃ রক্ত অবয়বেরও বর্ণোপলব্ধি না ঘটিতে পারিত, কারণ আশ্রয়ের উপলব্ধি সত্ত্বেও বর্ণটি দৃষ্ট হইবার কারণ থাকিত না।—সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞানের যাহা বিষয় তাহা কখনও একরূপ হইতে পারে না (নৈকরূপো বিষয়ো যুক্তঃ)। অপর দিকে, যাহার অস্তিত্ব আছে—এবং সেইজন্যই যাহা অনেকরূপ—তাহার ভেদ প্রকৃত পক্ষে পরমাণুসঞ্চয়ের ভেদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ঘটাদির অস্তিত্ব ও পরমাণুর অস্তিত্বে কোন পার্থক্য নাই (ঘটাদীনামণুরূপতা), এবং ইহা হইতে আরও সিদ্ধ হইল যে নীলাদি পরমাণুরই আকার; পরমাণু হইতে পৃথক্ কোন সংযোগবস্তু স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।—এখানে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৌদ্ধ সংযোগদ্রব্য অস্বীকার করিতেছেন বলিয়াই যে তিনি পরমাণুবাদে বিশ্বাসবান্ তাহা নহে। বিজ্ঞানবাদী কেবল দেখাইতেছেন যে বৈশেষিকের পরমাণুবাদ স্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন প্রকৃত সংযোগদ্রব্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পূর্বপক্ষী (৫৬২ সংখ্যক কারিকায়) আপত্তি করিয়াছিলেন যে স্থূলতর কোন সংযোগ পদার্থ না থাকিলে "অণু" শব্দের ব্যবহারই সম্ভব হইত না। এই আপত্তি বৌদ্ধ এই এক কথা বলিয়াই সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন যে নামের সহিত বস্তুর কোন সম্বন্ধই নাই—নির্গুণ ঈশ্বরের প্রতিও যে লোকে নামসঙ্কেত করিয়া থাকে তাহাই ইহার প্রমাণ (যদ্বন্নির্বিত্তেঽপী-শ্বরশ্রুতিঃ)।

এইরূপে সাধারণ ভাবে অবয়বের দ্বারা আরব্ধ বা অনারব্ধ কোন প্রকার স্থূল বস্তুরই যে অস্তিত্ব সম্ভব নয় তাহা প্রমাণ করিয়া শান্তরক্ষিত সেই উদ্দেশ্যেই নৈয়ায়িক সুলভ আরও কতকগুলি সূক্ষ্মতর যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু বাহুল্যভয়ে সেগুলির আলোচনা হইতে আমাদিগকে বিরত থাকিতে হইবে। মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরের বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহার কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে অবয়ব ও অবয়বী বলিতে আশ্রিত ও আশ্রয় ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না, এবং এই আশ্রিত ভাবের নামই হইল সমবায়। শান্তরক্ষিত এতদুত্তরে বলিতেছেন:—

সমবায়াত্মিকা বৃত্তিস্তস্য তেষ্বিতি চেন্ননু।
তস্যামপি বিচারোঽয়ং কোপেনৈব প্রধাবতি ॥ ৬১২ ॥

অর্থাৎ, যদি বলা যায় যে অবয়বে অবয়বীর বৃত্তি (subsistence) সমবায়াত্মক মাত্র তাহা হইলেও বৈশেষিকের বিরুদ্ধে পূর্বযুক্তি আরও খরতর ভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

কারণ তখনও জিজ্ঞাসা করা যাইবে, অবয়বী একটি অবয়বে যে-ভাবে সমবেত থাকে অপরাপর অবয়বেও সেইভাবেই সমবেত থাকে কি? এই প্রশ্ন বিপক্ষবাদীর যুক্তিকে কিরূপে ধ্বংস করিবে তাহা কমলশীলের অপরূপ ভাষা হইতেই বুঝা যায়:—কুমতিরচিত-দোষজালমসহমানকোপাদিবাভিধাবতি।

এইরূপে বিপক্ষীয় আরও কয়েকটি অনুরূপ যুক্তি অনুরূপ পন্থায় সমালোচনা করিয়া শান্তরক্ষিত পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন যে বৈশেষিকী নব দ্রব্যের প্রথম চারিটির (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কারণ অবয়বীপদার্থ স্বীকার করিলেও তাহা ক্ষিত্যাদি অবয়ব হইতে সিদ্ধ হয় না। আত্মাখ্য দ্রব্যের বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে. সুতরাং সে সম্বন্ধেও কিছু বলিবার নাই। বাকি রহিল আকাশ, কাল, দিক্ ও মন। এখন আকাশ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষীর মত জ্ঞাপন করিবার জন্য বলা হইতেছে :—

সমাশ্রিতাঃ কচিচ্ছব্দা বিনাশিত্বাদিহেতুতঃ।
ঘটদীপাদিবত্তচ্চ কিল ব্যোম ভবিষ্যতি ॥ ৬২২ ॥

অর্থাৎ, শব্দ যখন ঘট, দীপ প্রভৃতির ন্যায় বিনাশিত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট তখন তাহাও ঘটাদির ন্যায় অপর কিছুর আশ্রিত হইতে বাধ্য। পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি পঞ্জিকায় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে:—আকাশ নামে নিত্য এবং অদ্বয় এক দ্রব্য আছেই; এই দ্রব্যের লিঙ্গ (indicative) অথবা গুণ হইল শব্দ এবং শব্দের আশ্রয় হইল আকাশ। ক্ষিত্যাদি দ্রব্যচতুষ্টয় এই শব্দের আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ শব্দে ক্ষিত্যাদির গুণ অবর্তমান। কিরূপে বুঝা যায় যে শব্দে ক্ষিত্যাদির গুণ অবর্তমান? উত্তর:—শব্দ প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার কারণে কোন বৈশিষ্ট্যোৎপত্তি দেখা যায় না (অকারণগুণপূর্বকত্বাৎ), দ্রব্য যতকাল স্থায়ী হয় শব্দ ততকাল স্থায়ী হয় না (অযাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাৎ); এবং শব্দ তাহার আশ্রয় হইতে অন্যত্রও উপলব্ধ হইয়া থাকে (আশ্রয়াদন্যত্রোপলব্ধেশ্চ)। স্পর্শবৎ দ্রব্যগুলির গুণ কিন্তু অন্যরূপ। শব্দে আত্মার গুণও অবর্তমান, কারণ শব্দ বাহেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়; আত্মা কেবল স্ব-আত্মার দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে, শব্দ কিন্তু অপরাত্মার দ্বারাও উপলব্ধ হয় (আত্মান্তর-গ্রাহ্যত্বাৎ); আত্মা অহংবুদ্ধি হইতে অভিন্ন, কিন্তু শব্দ অহংকার হইতে পৃথক্। শব্দের এই সকল গুণ আত্মার সুখাদি গুণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শব্দ হইল শ্রোত্রগ্রাহ্য; সুতরাং তাহা দিক্, কাল ও মনের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং "পারিশেষ্যাৎ" (by the process of elimination) স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দ হইল আকাশেরই গুণ। আকাশের একমাত্র লিঙ্গ (indicative) হইল শব্দ, সুতরাং আকাশ অদ্বয় ও একরূপ; যেহেতু আকাশের গুণ সর্বত্রই উপলব্ধি করা যায়, সেইহেতু আকাশ হইল বিভু (all-pervading); এই বিভুত্ববশতঃ—এবং যেহেতু আকাশ অপর কিছুর আশ্রিত নহে সেই-হেতু—আকাশ হইল দ্রব্য*; এবং যেহেতু আকাশ কাহারও সৃষ্ট নহে সেইহেতু তাহা নিত্য।

* ধরিয়া লইতেছি যে মুদ্রিত পুস্তকে 'বিভুগুণবত্বাৎ'-এর পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদটি ছাপার ভুল।

আকাশ সম্বন্ধে বৈশেষিকের বক্তব্য এখানে অল্পকথায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কাল সম্বন্ধে বৈশেষিকী মতও শান্তরক্ষিত পক্ষপাতশূন্য হইয়া উপস্থিত করিয়াছেন :—

আদিত্যাদিক্রিয়াদ্রব্যব্যতিরেকনিবন্ধনম্।
পরাপরাদিবিজ্ঞানং ঘটাদিপ্রত্যয়ো যথা ॥ ৬২৩ ॥
বলীপলিতকার্কশ্যগত্যাদিপ্রত্যয়াদিদম্।
যতো বিলক্ষণং হেতুঃ স চ কালঃ কিলেষ্যতে ॥ ৬২৪ ॥ †

অর্থাৎ, পূর্বাপরাদির যে বিজ্ঞান জন্মায় তাহার ভিত্তি (নিবন্ধন), ঘটাদি প্রত্যয়ের ভিত্তির ন্যায়, সূর্যপ্রভৃতি ক্রিয়াদ্রব্য হইতে নিশ্চয়ই পথক্; কারণ পূর্বাপরাদির বিজ্ঞান বলীপলিতাদির প্রত্যয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই পূর্বাপরাদির বিজ্ঞানের যাহা হেতু তাহাই হইল কাল।—কমলশীল টিপ্পনীতে বলিয়াছেন যে বলীপলিতাদিই হইল ক্রিয়াদ্রব্য। কারিকায় যে হেতুর কথা বলা হইয়াছে তাহা কাল ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। পূর্বাপরাদির বিজ্ঞান দেশজন্য (due to the sense of space) হইতে পারে না, কারণ বৃদ্ধ পিতা পুত্রের পশ্চাতে অবস্থিত থাকিলে বলা হয় যে পিতা পুত্রের "পর" অবস্থিত রহিয়াছেন, (কিন্তু কালতঃ পিতা পুত্রের পশ্চাতে থাকায় বলা হয় "পূর্বে")। বলীপলিতাদি হইতে যে পূর্বাপরের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ বলীপলিতাদির প্রত্যয় ও পূর্বাপরের প্রত্যয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন ক্রিয়া হইতেও যে পূর্বাপরের জ্ঞান জন্মায় তাহাও নহে, কারণ এই জ্ঞান ক্রিয়ার জ্ঞান হইতে পৃথক্। এইজন্যই বৈশেষিকসূত্রে বলা হইয়াছে—"অপরং পরং যুগপদযুগপচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি"। আকাশের যে-ভাবে একত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয় কালেরও তাহাই হইবে।—ইহাই হইল কালপ্রমাপক বৈশেষিকী যুক্তি। দিক্ (space) ও মন প্রমাণের জন্য বৈশেষিক যাহা বলিয়া থাকেন তাহা এই :—

পূর্বাপরাদিবুদ্ধিভ্যো দিগেবমনুমীয়তে।
ক্রমেণ জ্ঞানজাত্যা চ মনসোঽনুমিতির্মতা ॥ ৬২৫ ॥
চক্ষুরাদিবিভিন্নং চ কারণং সমপেক্ষতে।
ক্রমেণ জাতা রূপাদিপ্রতিপত্তী রথাদিবৎ ॥ ৬২৬ ॥

অর্থাৎ, একটি মূর্ত দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাপর মূর্ত দ্রব্য সম্বন্ধে যে বুদ্ধি বশতঃ বলা যাইতে পারে যে সেগুলি উত্তরস্থ, দক্ষিণস্থ ইত্যাদি (দশ দিক্!)—সেই বুদ্ধি হইতেই দিক্ অনুমিত হয়; আর চিত্তে ক্রমানুযায়ী যে বিবিধ জ্ঞানের সঞ্চার হয় তাহা হইতেই মনের অনুমান, কারণ এই প্রকারের জ্ঞানসঞ্চার চক্ষুরাদি হইতে বিভিন্ন কোন কারণ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। বাস্তবিক রথাদির ন্যায় রূপাদির প্রতিপত্তি

† কারিকাদ্বয়ের অন্বয় হইবে এইরূপ :—যৎ পরাপরাদিবিজ্ঞানং তদাদিত্যাদিব্যতিরিক্তপদার্থনিবন্ধনম্, বলীপলিতাদিপ্রত্যয়বিলক্ষণত্বাৎ, ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ।

(apprehension) যে ক্রমিক তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবিধ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিবিধ বস্তুর সন্নিকর্ষ সত্বেও দেখা যায় যে বস্তাবলী একটির পর একটি করিয়াই উপলব্ধ হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ইন্দ্রিয়াবলীর পশ্চাতে অপর কোন এক শক্তি আছে যাহার সান্নিধ্যের উপরেই ইন্দ্রিয়ের ভাবগ্রহণের ক্ষমতা নির্ভর করে। এই শক্তিই হইল মন। বৈশেষিকসূত্রে বলা হইয়াছে "যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্"।—বৌদ্ধ এইবার উত্তর করিতেছেন :—

উপাত্তাদিমহাভূতহেতুত্বাঙ্গীকৃতেধ্বর্নেঃ।
সিদ্ধা এবাশ্রিতাঃ শব্দাস্তেষ্বিত্যাদ্যমসাধনম্ ॥ ৬২৭ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী যদি সাধারণভাবেই বলিতে চাহেন যে শব্দ অপর কিছুর আশ্রিত তাহা হইলে আমাদের সহিত কোন বিরোধ নাই, কারণ আমরাও বলি যে শব্দের হেতু হইল মহাভূত, যে মহাভূতাবলীর কতকগুলি বাস্তবিকই উভয়পক্ষের দ্বারাই স্বীকৃত হইয়া থাকে *। শব্দ হইল এই ভূতাবলীর কার্য, সুতরাং তাহাদেরই আশ্রিত।—বৌদ্ধ যে মহাভূত স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা অবশ্য চিত্তচৈত্ত (mental phenomenon) রূপে (চিত্তচৈত্তৈঃ স্বীকৃতানি)। কিন্তু বৈশেষিক যদি শব্দের কোন বিশিষ্ট প্রকারের আশ্রিতত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন এবং বলেন যে শব্দের আশ্রয় হইল অমূর্ত, নিত্য, অদ্বয় ও বিভু, তাহা হইলে কিন্তু যথাযুক্ত দৃষ্টান্তের অভাববশতঃ তাঁহার হেতু অনৈকান্তিক হইয়া পড়িবে। তাহার উপর আরও বিবেচ্য, শ্রোত্র যখন পূর্বপক্ষীর মতে আকাশাত্মক এবং আকাশও যখন এক, তখন সর্বপ্রকার শব্দই সর্বত্র শ্রুত হওয়া উচিত ; আকাশ যখন নির্বিভাগ তখন "এইটি আমার শ্রোত্র" "ঐটি অপরের"—এই প্রকারের ভেদবুদ্ধি থাকা সম্ভব নয়। পূর্বপক্ষী একথাও বলিতে পারিবেন না যে অদৃষ্টের বিধান অনুসারে আকাশের যে অংশটুকু শ্রোত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় ব্যক্তিবিশেষ কেবল সেই অংশটুকুর শব্দই শুনিতে পায় ; কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে আকাশ হইল নিরংশ। আর কাল্পনিক অংশবিভাগ করিলেই যে তদনুরূপ অর্থক্রিয়ারও উৎপত্তি হয় তাহা নহে,—জলকে অনল বলিলেই কি জল জ্বলিতে থাকে ?

কাল ও দিক্ স্বীকার করিতে না পারার আরও বহুবিধ কারণ আছে :—

বিশিষ্টসময়োদ্ভূতমনস্কারনিবন্ধনম্।
পরাপরাদিবিজ্ঞানং ন কালান্ন দিশশ্চ তৎ ॥ ৬২৯ ॥
নিরংশৈকস্বভাবত্বাৎ পৌর্বাপর্যাদ্যসম্ভবঃ।
তয়োঃ সংবন্ধিভেদাচ্চেদেবং তৌ নিষ্ফলৌ নমু ॥ ৬৩০ ॥

অর্থাৎ, পূর্বাপরের জ্ঞান কাল বা দিক্ কিছুর উপরেই নির্ভর করেনা ; বিশিষ্ট লোকব্যবহার হইতে যে বিশেষ মনোবৃত্তির উদয় হয় তাহা হইতেই এই প্রকার বুদ্ধির উৎপত্তি। কাল ও দিক্ যখন নিরংশ ও একাত্মক তখন তাহাতে পৌর্বাপর্যাদির বুদ্ধি

* বৌদ্ধগণ পৃথ্বী, অপ্, তেজস্ এবং ঈরণ—এই চারিটি মহাভূত স্বীকার করিতেন (Stcherbatsky, Central Conception of Buddhism, p. 99)।

জন্মিতে পারে না। আর যদি বলা যায় যে কাল ও দিকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তু হইতেই এই পৌর্বাপর্যের জ্ঞান জন্মায়—তাহা হইলে কাল ও দিক্ স্বয়ং নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। —এখানে কাল ও দিকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তু বলিতে বুঝাইতেছে প্রদীপ, শরীর প্রভৃতি বাহ্য ও আধ্যাত্মিক পদার্থ। পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে এই সকল পদার্থের সম্বন্ধে যখন পূর্বাপরাদি জ্ঞান সম্ভব তখন তাহা হইতে দিক্ ও কাল সম্বন্ধেও সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে। বৌদ্ধ ইহাতে বলিতেছেন যে তাহাই যদি হয় তবে দিক্ ও কাল স্বীকার করার কোন হেতুই থাকিবে না। কারণ যে-সকল অর্থক্রিয়ার জন্য দিক্ ও কাল স্বীকার করা যাইতে পারে তাহা যদি দিক্কালসম্বন্ধী অপর বস্তু হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া যায় তবে দিক্ ও কাল স্বীকার করা হইবে কেন ?

মন সম্বন্ধেও বৌদ্ধের বক্তব্য, সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানাবলীর কারণমাত্ররূপে তাঁহারাও মন স্বীকার করিতে প্রস্তুত :—

চক্ষুরাদ্যতিরিক্তং তু মনোঽস্মাভিরপীষ্যতে।
ষণ্ণামনন্তরোদ্ভূত প্রত্যয়ো যো হি তন্মনঃ॥ ৬৩১॥
নিত্যে তু মনসি প্রাপ্তাঃ প্রত্যয়াঃ যৌগপদ্যতঃ।
তেন হেতুরিহ প্রোক্তো ভবতীষ্ট বিঘাতকৃত্॥ ৬৩২॥

অর্থাৎ, চক্ষুরাদি হইতে পৃথক্ একটি মন আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি, কারণ ষড়িন্দ্রিয়ের অনন্তর যে প্রত্যয় উৎপন্ন হয় তাহাই হইল মন। কিন্তু এই মন যদি নিত্য হয়—যাহা পূর্বপক্ষী বলিয়া থাকেন—তাহা হইতে সমস্ত প্রত্যয় (cognitions) যুগপৎ ঘটিবে, কারণ যাহা নিত্য তাহা সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র হওয়ায় তাহার সমস্ত কার্য একসঙ্গেই ঘটিতে বাধ্য। অথচ যুগপৎ বিবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না দেখিয়াই বৈশেষিক মনের অনুমান করিয়া থাকেন। সুতরাং মনের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইলে বৈশেষিকের নিজেরই ইষ্টহানি ঘটিবে। পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত হেতুর এই বিরুদ্ধতা আরও তীক্ষ্ণভাবে দেখাইয়া দিবার জন্য শান্তরক্ষিত পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন :—

সৌগতাপরনির্দিষ্টমনঃসংসিদ্ধ্যসিদ্ধয়ে।
সাকারমন্যথাবৃত্তং মন্যে সূত্রমিদং কৃতম্॥ ৬৩৩॥

অর্থাৎ মনের প্রমাণরূপে ন্যায়সূত্রকার যাহা বলিয়াছেন তাহা এতই অসঙ্গত যে মনে হয় তদ্বিষয়ক সূত্রে একটি অ-কার যোগ করিয়া পাঠই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।—মন সম্বন্ধে গৌতমীয় সূত্র হইল "যুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্"। শান্তরক্ষিত বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন সূত্রটির প্রকৃত পাঠ হওয়া উচিত "যুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তের্মনসঃ অলিঙ্গম্", কারণ যুগপৎ সকল জ্ঞানের যে উৎপত্তি হয়না তাহা হইতে তথাকথিত মনের অনিত্যত্বই প্রমাণিত হয়, নিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না।

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—দেবতা, মনুষ্য ও বৃক্ষ ত ঈশ্বর বটেই, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বাসিয়া, কোদালি প্রভৃতিও ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিলে উহারা সকলেই ফলপ্রদ হইয়া থাকেন [১]।

এই উক্তির তাৎপর্য কি? বক্তা কি বলিতে চাহেন—ঈশ্বর অনেক, তিনি চেতন ও অচেতন উভয়স্বরূপ, তাঁহারও জন্মমৃত্যু আছে, তিনিও উচ্চনীচভাবাপন্ন, মৈত্রী বিরোধ প্রভৃতির দ্বারা তিনিও নিপীড়িত? যদি তাহাই হয় তবে তিনি পরস্পরবিরুদ্ধ নানা-ধর্মাক্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐরূপ কোন বস্তু কেহই স্বীকার করিতে পারে না। মনে হয়, বক্তা উহার দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন—এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান এবং তাঁহার অস্তিত্ববশতই ঐ সকলের অস্তিত্ব। এজন্য উপাসনার অবলম্বন যাহাই হউক না কেন সকল উপাসনাই তাঁহাকে স্পর্শ করে এবং উপাসকেরাও ফল লাভ করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর চেতন ইহা তাহার আত্মন্‌ সংজ্ঞার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। দেহ মন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুসমুদায়ের মধ্যে কে যথার্থ জীবাত্মা ইহা যেমন চেতনা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং যেমন পূর্বস্বীকৃত অন্য কোন পদার্থকে চেতন বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব হওয়ায় 'আত্মন্‌' নামে নবম পদার্থ মানিতে হইয়াছে সেইরূপ চেতনবিশেষের ঈশ্বরত্ব নিশ্চিত হয় তাহার সর্বশক্তিমত্ত্ব অর্থাৎ সকল বিষয়ে অব্যাহত—অকুণ্ঠ শক্তির দ্বারা এবং স্বীকৃত জীবাত্মাদিগের মধ্যে কাহারও পক্ষে সর্বশক্তিমত্ত্ব সম্ভবপর না হওয়ায় ঐজন্য একটী নূতন চেতনের কল্পনা করা আবশ্যক। সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি মতসমূহের মধ্যে যে মতে যাহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে উক্ত মতবাদিগণ তাঁহাকেই সর্বশক্তিমান্‌ বলিয়া—কেবল তাঁহারই শক্তি সর্বত্র অকুণ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি কোনও রূপে প্রমাণিত হয় যে কুত্রাপি তাঁহার শক্তি কুণ্ঠিত অর্থাৎ ব্যাহত হইয়াছে তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না, তাঁহার ভক্তদিগের নিকটেও নহে।

শক্তি বা সামর্থ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কার্য দেখিয়া উহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। সভায় যে ছাত্রের মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করিবার কথা ছিল অল্পকাল পূর্বে জানা গেল সে আসিতে পারিবে না। অন্য একটি ছাত্র তখনই পুথি লইয়া মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেল। যথাসময়ে এক ফর্মার একটি বৃহৎ কবিতা উত্তমরূপে সে আবৃত্তি করিয়া দিল। শ্রোতারা চমৎকৃত হইল, বলিল—হাঁ, মেধাবী (অভ্যাসশক্তি সম্পন্ন) ছেলে বটে!

বালকের এই মেধাশক্তির ন্যায় সকলেরই বিষয়বিশেষে অল্প বা বিস্তর শক্তি

---

১ জলপাষাণমৃত্তিকাকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ। ঈশ্বরাঃ সর্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ পঞ্চদশী, ৬।২০৮ শ্লোক।

আছে। কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের এত অধিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে মনে হয়, ঐ বিষয়ে ইহার শক্তি চরমে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু ইহাও সর্বশক্তিমত্ত্ব নহে। সকল বিষয়েই যদি কাহারও শক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করে তবে তাঁহাকে বলে সর্বশক্তিমান্। এরূপ শক্তি কোনও জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব সর্বশক্তিমান্ নূতন একটা চেতন বস্তু স্বীকার করা প্রয়োজন।

এক্ষণে প্রতিবাদীরা বলিতে পারেন যে, শক্তিমানেরা প্রায়শঃ নিজ কার্যে গতানুগতিকতা রক্ষা করিয়া চলেন না এবং যাহা পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে ইচ্ছানুসারে তাহারও কিছু নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। শিল্পীদিগের উত্তরোত্তর অভিনব আবিষ্কার এবং পুনঃ সংস্করণ কালে কবির নিজগ্রন্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রভৃতি সহস্র দৃষ্টান্ত দর্শনে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। অতএব যদি কাহারও শক্তি সর্ব বিষয়েই প্রসার লাভ করিত এবং কিছুতেই উহার প্রতিরোধ না হইত তবে ঐ শক্তিমান্ ব্যক্তিটি এত গতানুগতিক হইতে পারিতেন না এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া অনেক নূতন কার্য করিয়া ফেলিতেন। তাহা হইলে প্রতিদিন পূর্বদিকেই সূর্যোদয় দেখা যাইত না, মাসে অন্ততঃ দুই চারি দিনও পশ্চিমে সূর্যোদয় দৃষ্ট হইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক প্রস্তর দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ প্রতিনিয়ত বড় না হইয়া ক্বচিৎ ইট্ ও পাথর হইতে ছোট হইত; কোনও বৃহৎ বস্তু ভাঙ্গিলে উহা হইতে নির্গত খণ্ড সমুদায়ের অন্ততঃ দুই একটিও মূল বস্তু হইতে বৃহদাকার হইত; দুইয়ের সহিত দুইয়ের যোগফল (২+২ = ৪) নিয়মিতরূপে চার না হইয়া কখনও তিন (৩) এবং কখন বা পাঁচ (৫) হইত এবং হিমালয় স্থানান্তরিত হইয়া সাগরপরিখার কোলে অসহায় ভারতে দুর্গের প্রাকাররূপ ধারণ করিত। অথবা ইহা অপেক্ষাও এমন অনেক অদ্ভুত কাজ তিনি করিতেন যাহাতে তাঁহার অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহের অবসর হইত না, ভয়ে অথবা ভক্তিতে সকলেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু ঐ প্রকার সর্ববিষয়িনী অকুণ্ঠ শক্তির কোনও পরিচয় একান্তই দুর্লভ। অতএব নূতন আর একটি চেতন বস্তু মানিবার পক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। এইরূপ প্রমাণশূন্য বস্তু মানিয়া উহাকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করাও শূন্যে চিত্রনির্মাণের ন্যায় উপহাসযোগ্য নহে কি ?

প্রশ্ন যত সহজে হয় উহার উত্তর তত সহজ বা সরল হয় না ইহা একটি চিরন্তন সত্য। আবার ঐ প্রশ্ন যদি সাধারণের প্রত্যক্ষবহির্ভূত বস্তু সম্পর্কে উত্থিত হয় তবে তাহার উত্তর অতিশয় দুরূহ হইয়া পড়ে। সুতরাং এই নূতন চেতন বস্তু এবং তাঁহার সর্বশক্তিমত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নের অল্পকথায় কোন সরল উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। বিভিন্ন শাস্ত্রে নানা দিক হইতে এই প্রশ্নের বিশেষ বিচারপূর্বক যেসকল হৃদয়গ্রাহী উত্তর পাওয়া যায় তর্কশাস্ত্রে নৈপুণ্য ব্যতীত ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশলাভ করা কঠিন। ঐ সকল উত্তরের মধ্যে একটি সরল উত্তর এইরূপ—

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় অনেক কার্যেরই উৎপত্তির জন্য চেতন কিছুর অপেক্ষা

থাকে—ঘটনির্মাণে কুম্ভকার, বস্ত্রনির্মাণে তন্তুবায়, প্রাসাদনির্মাণে শিল্পী অপরিহার্য। এই সকল দৃষ্টান্তের ফলে প্রথমসৃষ্টিতে অর্থাৎ চতুর্বিধ পরমাণু দ্বারা ঐসমস্ত দ্ব্যণুক সৃষ্টিতেও চেতনের সাহায্য অস্বীকার করা যায় না। আমাদিগের ন্যায় কোন চেতন জীবের দ্বারাও ঐ কার্য সম্ভব হয় না। অগত্যা জীব হইতে পৃথক্ ঐপ্রকার কার্যের যোগ্য অন্য একটি চেতন বস্তু স্বীকার করা একান্তই প্রয়োজন। ঐ চেতন বস্তুই ঈশ্বর। শাস্ত্র এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন।

দ্ব্যণুকসৃষ্টির জন্য যদি উক্ত প্রকারে ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার্য হয় তবে হিমালয়পর্বত সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির সৃষ্টিও ঈশ্বরসাপেক্ষ ইহা অস্বীকারের উপায় নাই।

স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক জীবের এবং সম্মিলিতভাবে জীবসমুদায়ের যাহা অসাধ্য সেই সমস্ত ক্ষুদ্র দ্ব্যণুকাদির ও বৃহত্তম সূর্য, সাগর প্রভৃতির সৃষ্টির জন্য যেমন জীব ব্যতিরিক্ত চেতনের (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব মানিতে হয় সেইরূপ জীবগণের কার্যবিশেষের মূলেও ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহা না মানিয়া পারা যায় না।

প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করিলে অনুভব করিতে পারিবেন যে, যথাযোগ্য প্রণালী সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়াও তাঁহার সকল চেষ্টা সফল হয় নাই, অনেক ক্ষেত্রেই উহা নিষ্ফল অথবা বিপরীত ফলদায়ক হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করিয়াও ধনিগণ অকালে পুত্রশোক পাইতেছেন। সর্বথা অল্পযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রেরাও যে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় পাশ হইতেছে অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রেরাও সেই পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। অবশ্য, কতকগুলি চেষ্টার বিফলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আপাততঃ কোন স্পষ্ট কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রশ্নের চরম মীমাংসা হয় না। কারণ, নির্দিষ্ট উত্তরই পুনরায় নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। চিন্তাশীলগণ দেখিতে পাইয়াছেন—সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান ঈশ্বর[১]।

ঈশ্বরের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সুচিকিৎসকেরা যেরূপ ক্ষেত্রে বিফল হইতেছেন অনেক অচিকিৎসকও সেইরূপ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই নানা বিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদিগেরও মনোরথ সফল হইতেছে, যোগ্যব্যক্তিরাও ব্যর্থতায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার এই প্রকার ইচ্ছা হয় কেন এইরূপ প্রশ্ন কোন বিচারশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত হয় না। কারণ, স্বাধীন ব্যক্তির ইচ্ছা যে নিরঙ্কুশ তাহা প্রত্যেকেই নিজের মনোবৃত্তি অনুসন্ধান করিলে মানিতে বাধ্য হইবেন। জীবের ক্ষমতাধীন এবং ক্ষমতার বহির্ভূত এইপ্রকার অসংখ্য ব্যাপারে ঈশ্বরই যদি সমাধানের উপায় বলিয়া মানিতে হয় তবে অন্য সকল কার্যের মূলেও তিনি রহিয়াছেন, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

শক্তি প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু নহে, কার্য্য দ্বারা উহা অনুমিত হয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

[১] "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ" ৪।১।১৯ ন্যায়সূত্র।

অতএব যেখানে ও যেকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা যথার্থভাবে জানিয়া অনুমান করিতে হইবে যে ঐ বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা ঐপ্রকারই, নতুবা তাঁহার ইচ্ছা অন্যপ্রকার হইলে কার্যও অবশ্যই তদনুযায়ী হইত, কোনরূপেই বর্তমান আকারে উহা সঙ্ঘটিত হইতে পারিত না। ইহাই তাঁহার সর্বশক্তিমত্ব। আচার্য উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়ে উক্তরূপ ধারণাই দৃঢ় হয়[১]।

ঈশ্বরের এই সর্ববিষয়িনী শক্তি কার্যানুমেয় বলিয়াই ভবিষ্যতে কোথায় কি হইবে তাহা কেহই নির্দিষ্টরূপে বলিতে পারে না।

অবশ্য, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিচারদৃষ্টিতে বহুক্ষেত্রে কার্যকারণভাব দেখিয়া এবং ঈশ্বরশক্তির প্রতি উদাসীন থাকিয়া কোন কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ কি প্রকার ইহা কল্পনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের সেই সকল কল্পনা অনেকস্থলে সত্যও হইতেছে বটে কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তাঁহাদিগের নির্ধারণ যে নিতান্তই ভ্রম তাহাও দেখা যায়। টাইটানিক (the Titanic) জাহাজের প্রথম যাত্রায় সমুদ্রে নিমজ্জন, বিহার ও কোয়েটার ভূমিকম্প পূর্বে কে অনুমান করিতে পারিয়াছিল? এই সমস্ত বড় ব্যাপার ত দূরের কথা। সামান্য রন্ধন ভোজন প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্য আরম্ভ করিলেও যথানিয়মে উহার সমাপ্তি যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও পূর্বে স্থির করা যায় না। হাঁড়ি ফাটিয়া অগ্নি নির্বাপণে ও অকস্মাৎ মর্মন্তুদ শোকসংবাদশ্রবণে রন্ধন বন্ধ হয় এবং লড়াই করিতে করিতে কুকুর পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আহার বন্ধ করে ইহা ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই সমস্তই ত তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা এবং সর্বশক্তিমত্তার স্পষ্ট সাক্ষ্য। ভবিষ্যতে ইহা হইতে আরও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য যে কত মিলিবে তাহা কে বলিতে পারে! অতএব ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকিলে এবং তিনি সর্বশক্তিমান হইলে নিজের ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ খামখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া অবশ্যই নূতন অদ্ভুত কিছু করিতেন, তাহা না করায় ঐ প্রকার সর্বশক্তিমান্ কেহ নাই ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন—এই অষ্টবিধ গুণ, সত্তা, দ্রব্যত্ব, আত্মত্ব[২]—এই তিনটি জাতি এবং একটিমাত্র বিশেষ এই কয়টি ভাবপদার্থ পরমাত্মায় স্বীকৃত হয়।

এই সমুদায়ের মধ্যে একত্ব সংখ্যা, পরমমহত্ব পরিমাণ, একপৃথকত্ব, জ্ঞান, ইচ্ছা[৩] ও যত্ন এই কয়টি ঈশ্বরের নিত্যগুণ, সংযোগ ও বিভাগ অনিত্য।

১ 'কোঽনুগ্রহার্থঃ? যদ্ যথাভূতং যস্চ যদা বিপাককালঃ তৎ তথা তদা বিনিযুঙ্ক্তে ইতি'—ন্যায়দর্শন, ৪।১।২১ সূত্রের ন্যায়বার্তিক।

২ আত্মা সুখ দুঃখের সমবায়িকারণ। ঐ সমবায়িকারণতার কোন অবচ্ছেদক ধর্ম অবশ্য কল্পনীয়। ঐ ধর্ম আত্মত্ব। এইপ্রকারে আত্মত্ব-জাতি সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর সুখদুঃখশূন্য, সুতরাং সুখদুঃখের সমবায়িকারণতাও ঈশ্বরে সম্ভাবিত নহে। ফলে আত্মত্ব-জাতিও ঈশ্বরে কল্পনীয় নহে। এইরূপ বিচারে কেহ কেহ ঈশ্বরে আত্মত্ব-জাতি স্বীকার করেন না।

৩ পদার্থধর্মসংগ্রহে প্রশস্তপাদাচার্য বলিয়াছেন—'সিসৃক্ষা জায়তে' অর্থাৎ (ঈশ্বরের) সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে। ইহার দ্বারা আপাততঃ বুঝা যায় এই মতে ঈশ্বরে অনিত্য ইচ্ছা আছে।

ঈশ্বরের গুণ কয়প্রকার এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে আচার্যগণের মত বিভিন্ন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঈশ্বরে ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এইমতে ঈশ্বরের গুণ নয় প্রকার১।

জয়ন্তভট্টের মতে ঈশ্বরের গুণ দশবিধ, কারণ তাঁহাতে ধর্ম এবং নিত্য সুখ বিদ্যমান২।

দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির মতে ঈশ্বরের গুণ সাতপ্রকার—সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন এবং নিত্যসুখ। এই মতে পৃথক্ত্ব গুণমধ্যে পরিগণিত নহে এবং ঈশ্বরে পরিমাণ গুণের অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ৩।

বার্তিককার উদ্দ্যোতকরাচার্য ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা নিত্য বলিয়া 'যত্ন' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলায় মনে হয় তাঁহার মতে ঈশ্বরের গুণ সপ্তবিধ।

মত বিশেষে ঈশ্বরে ইচ্ছা ও যত্ন স্বীকৃত হয় না। এই মতে ঈশ্বরের গুণ ষড়্বিধ।

প্রাচীন আচার্যগণ জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে যে প্রকার অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্দ্বারা জ্ঞান, ইচ্ছা এবং যত্ন বিশিষ্টবস্তুই সিদ্ধ হইয়াছে৪। শ্রুতি বলিয়াছেন—তাঁহার (ঈশ্বরের) জ্ঞান, বল অর্থাৎ ইচ্ছা-শক্তি এবং ক্রিয়া (যত্ন) স্বাভাবিক৫ —নিত্য। অতএব অনুমান এবং আগম এই দ্বিবিধ প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বরে জ্ঞান ইচ্ছা, ও যত্ন সিদ্ধ হওয়ায় সংখ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ সামান্য গুণের সহযোগে ঈশ্বর অষ্টবিধগুণসম্পন্ন এইরূপ স্থির হইয়াছে। ইহাই বর্তমানে প্রচলিত ন্যায়সিদ্ধান্ত।

ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—তিনি (ঈশ্বর) ঔপনিষদ৬ অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ে কেবল বেদবাক্যই প্রমাণ, অনুমান কিংবা প্রত্যক্ষ ঐ বিষয়ে প্রমাণ নহে। কারণ, বেদনিরপেক্ষ কেবল অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। যদি তাহা সম্ভব হইত তবে সাংখ্য ও মীমাংসকসম্প্রদায়ের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ সুলভ হইত। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ-

১ ন্যায় দর্শন ৪।১।২১ সূত্রভাষ্য।

২ বিষ্ণুপ্রীতিকামনাপূর্বক কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই প্রীতি শাস্ত্রানুসারে সুখবিশেষ। অতএব উৎপত্তিযোগ্য অনিত্য সুখ ও ঈশ্বরে স্বীকার্য কি না ইহা লইয়া শাস্ত্রে বিচার দেখা যায়। কিন্তু প্রীতিশব্দের অর্থ যদি ভক্তি হয় তবে ঈশ্বরে অনিত্য সুখ কল্পনার প্রয়োজন থাকে না।

৩ পদার্থতত্ত্বনিরূপণ।

৪ ক্ষিত্যাদ্যণুকং সকর্তৃকং কার্যত্বাদ্ ঘটবদিতি নিকৃষ্টপ্রয়োগঃ। 'সকর্তৃকত্বং চ উপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতিমজ্জন্যত্বমিতি। ঈশ্বরানুমান চিন্তামণি।

৫ "পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

৬ "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। ১।১।৪ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

যোগ্যও নহেন। সুতরাং ঈশ্বরবিষয়ে শ্রুতি যে প্রকার নির্দেশ করিবেন ঈশ্বর ঠিক সেই প্রকারই হইবেন, উহা হইতে ঈষৎ ব্যতিক্রমও হইবার উপায় নাই। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ যাহা স্থির হয় তাহাতে শ্রুতিনির্দিষ্ট প্রকার হইতে অল্পমাত্র নূতনত্ব (ব্যতিক্রম) থাকিলে ঐ অনুমান আগমবিরুদ্ধ হওয়ায় কোন আস্তিক ব্যক্তিই উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারেন না। আর যদি উহার দ্বারা অবিকল শ্রুতির সিদ্ধান্তই অনুসৃত হয় তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ঐ স্থলে আগমই প্রমাণ হইল, স্বাতন্ত্র্য না থাকায় অনুমান অনুবাদতুল্য হইয়া বার্তাবহ দূতের কার্য করিল মাত্র। অতএব ঈশ্বরবিষয়ে একমাত্র আগমপ্রমাণের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

বেদের শরণাপন্ন হইলেও ঈশ্বরবিষয়ে অনায়াসে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কারণ, কোন কোন শ্রুতি বলিতেছেন—তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ঈশ্বরে কোন প্রকার গুণই নাই। অন্য অনেক শ্রুতি স্পষ্টভাবে তাঁহার নানাবিধ গুণ নির্দেশ করিতেছেন। সকল শ্রুতিবাক্যেরই প্রামাণ্য মানিতে হইবে। কোন একটিকেও অপ্রমাণ বলা যাইবে না।

বেদবাক্যসকল এই প্রকার বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করায় এক সম্প্রদায় বলেন—ঈশ্বর সগুণ ইহাই যথার্থ শ্রুতিসিদ্ধান্ত। কিন্তু মুমুক্ষুগণ তাঁহাকে 'নির্গুণভাবে ধ্যান করিলেই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন, নতুবা সগুণভাবে ধ্যান করিলে তাঁহার ঐশ্বর্য দর্শনে বিষয়াকাঙ্ক্ষা আসিতে পারে, তাহাতে তাঁহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত হইবে। ঈশ্বরের নির্গুণত্ববোধক শ্রুতিসমূহ এই অভিপ্রায়ে ধ্যানের জন্য ঈশ্বরের নির্গুণত্ব উপদেশ দিতেছেন মাত্র, ঈশ্বর যথার্থই সর্বগুণশূন্য ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য নহে[১]।

ঈশ্বর দিব্যকল্যাণগুণযুক্ত এবং প্রাকৃতহেয়গুণশূন্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া রামানুজাচার্য উক্ত শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন[২]।

কপিলসম্মত সাংখ্যদর্শনে নিরীশ্বরবাদ সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সাংখ্যের স্বীকৃত পদার্থ। তিনি বলেন—সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি সামান্যগুণ ঈশ্বরেও স্বীকার্য এবং এই অর্থে তিনি সগুণ। এতদ্ব্যতীত কোন বিশেষ গুণ না থাকায় তিনি নির্গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন[৩]।

এইরূপ মতবাদও শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি সর্বগুণাধার অথচ নির্গুণ অর্থাৎ তাঁহার সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়ই সত্য। যেহেতু, বেদবাক্যই তাঁহার অস্তিত্বে একমাত্র

১ কুসুমাঞ্জলি ৩।১৭ কারিকা ও উহার প্রকাশটীকা ও ন্যায়দর্শন, চতুর্থখণ্ড ৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)

২ "দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত হেয়গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদবর্ণনেনৈক শ্রৈবাবগমাৎ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্বচমিতি দিক্" রামানুজকৃত বেদান্ততত্ত্বসার।

৩ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ও ন্যায়দর্শন (বং সাং প. সং) চতুর্থখণ্ড ৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রমাণ, যদি তাহা হইতেই তাঁহার 'সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়রূপতা প্রতিপন্ন হয় তবে তাঁহার উভয় রূপই সত্য বলিতে হইবে। যেসকল বস্তু প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণান্তরের বিষয়, বিরোধ ও উহা পরিহারের চিন্তা সেই বস্তু সম্বন্ধেই কর্তব্য। বেদমাত্রবেদ্য ভগবানের সম্বন্ধে উহার চর্চা অনাবশ্যক।

তিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাযুক্ত বলিয়া সগুণ এবং জীবাত্মা-সমূহের অধর্ম, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি শূন্য বলিয়া নিগুর্ণ এই প্রকারেও উক্ত শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা হইতে পারে। 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়শূন্য" এইরূপ হইলেও ফলতঃ উল্লিখিত অর্থই প্রকারান্তরে আসিয়া পড়ে।

'গুণ' শব্দ সামান্যবাচক। সুতরাং যে কোন একটি গুণ থাকিলে উহার আশ্রয় (দ্রব্য) সগুণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব 'নির্গুণ' বলিলে সর্বপ্রকারে গুণশূন্য এইরূপ বুঝাই স্বাভাবিক। নির্গুণত্ব ও সগুণত্বের বিরোধ উক্তরূপে পরিহার করিলে "নির্গুণ কথাটীর অন্তর্গত, 'গুণ'শব্দ গুণবিশেষকেই বুঝাইতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সামান্যবাচক শব্দের কোন বিশেষ অর্থ গ্রহণ লক্ষণা ব্যতীত সম্ভবে না। লক্ষণা পরিহার করিয়া বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করাই প্রশস্ত।

ভগবান্ শঙ্করাচার্যের মতে 'ব্রহ্ম নির্গুণ' ইহাই সত্য এবং তাহার এই রূপই আগম-মাত্রবেদ্য। তবে সর্বশক্তিময় ব্রহ্ম অনির্বচনীয় মায়াশক্তির যোগে সগুণরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহার নাম ঈশ্বর। তখন তিনি অনুমানগম্যও হইতে পারেন। এই মতে উক্ত প্রকারে শ্রুতিবিরোধের পরিহার হইলেও ব্রহ্মের সগুণত্ব মায়াত্মক উপাধি দ্বারা সম্পাদিত, উহা তাঁহার স্বাভাবিক বা নিত্যস্বরূপ নহে ইহা স্বীকার করিতে হয়।

বস্তুতঃ গন্ধ, রস, রূপ, অধর্ম, দুঃখ, দ্বেষ ইত্যাদি গুণ ঈশ্বরে আছে কিনা তাহা কাহারও বিচার্য নহে। ঐসকল গুণের অভাব ঈশ্বরে সর্বসম্মত। অতএব জ্ঞান ইচ্ছা যত্ন, ইত্যাদি অন্য কোন গুণ তাঁহার আছে কিনা ইহাই যথার্থ বিবাদের বিষয়। উহাদিগের মধ্যে জ্ঞানই প্রধানতঃ আলোচ্য। কারণ, ঈশ্বরে ইচ্ছা ও যত্ন সর্বসম্মত নহে। পরন্তু জ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত স্থির হইলে অন্য দুইটির সম্বন্ধেও মীমাংসা কিছু সহজ হইতে পারে।

সৎকার্যবাদী সাংখ্য ও বেদান্ত সম্প্রদায়ের মতে গুণ এবং উহার আশ্রয় (দ্রব্য) ভিন্ন নহে। যেমন শুক্ল রূপ, পরিমাণ ও গুরুত্ব এই সমুদায় লইয়াই উহা বস্ত্র। ইহাদিগের মতে পুরুষ বা ব্রহ্ম চিন্ময়, চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং পুরুষ বা ব্রহ্ম জ্ঞানবান্ ও জ্ঞানস্বরূপ এই উভয়প্রকারেই নির্দেশযোগ্য। ফলতঃ এই প্রকারেও শ্রুতিসকলের বিরোধ পরিহার করা যাইতে পারে। ইহাতে অন্যদর্শনের সহিত মতবিরোধের গুরুত্বও অনেক কমিয়া যায়।

ঈশ্বর উৎপত্তিযোগ্য সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্তা। জীবাত্মা নিত্য কিন্তু তাহার

---

১ ভেদাভেদবাদের সহিত এইমত তুলনাযোগ্য।

শরীর এবং জীবাত্মার সহিত ঐ শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ তাঁহারই সৃষ্ট। এই ভাবে জীব ও জড়-সমষ্টিরূপ সমগ্র জগৎই ঈশ্বরসৃষ্ট। এই সিদ্ধান্তে তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রয়োজন এবং বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অবলম্বনে নানাবিধ দুরূহ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়—

কেন তিনি সৃষ্টি করিলেন? দুঃখভোগের জন্য কেহ ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করে না। অতএব দুঃখভোগ কখনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে। সুখের জন্য কার্য করা লোক-প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি নিত্য তৃপ্ত ও আপ্তকাম। সুতরাং তাঁহার পক্ষে বৈষয়িক সুখভোগের বাসনা সম্ভবে কি? তাহা হইলে সাধারণ জীব হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই সৃষ্টিকার্য দ্বারা তিনি সুখী হইলেন কি? যদি হইয়া থাকেন তবে ক্ষণিক সুখভোগে তিনিও জীব-তুল্য হইয়া পড়েন। আর যদি ইহার দ্বারা সুখী না হইয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে তাঁহার শক্তিও কুণ্ঠিত, তিনি সর্বশক্তিমান্ নহেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় বৈষম্য। যদি তিনি সৃষ্টি করিলেনই তবে এই বৈষম্য কেন? সকলকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? তিনি যদি পক্ষপাতশূন্য, তবে তাঁহার সৃষ্টিতে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী কেহ দুঃখী হয় কেন? তিনি শক্তিমান্ অতএব সকলকে সমানভাবে সুখী করাই তাঁহার উচিত ছিল।

তৃতীয় প্রশ্নের বিষয় নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নির্দয়তা। লোকমুখে শুনা যায় তিনি দয়াময়। কিন্তু প্রত্যহ মৃত্যু, ব্যাধি, অত্যাচার, পীড়নের যে নৃশংস ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা ত তিনিই করিতেছেন। তবে তিনি কেমন দয়াময়? সকলের মূলেই যদি তিনি, তবে এমন নির্ঘৃণ—নির্দয় নৃশংস আর একটি কল্পনাও করা যায় না।

শাস্ত্র এই সমুদায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা উপাদেয় কিন্তু দুরূহ। সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তবে অল্প কথায় এইমাত্র বলা যায়—

সৃষ্টির কোনও আদি নাই। বর্তমানের জীবগণ পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। প্রাণীগণ স্ব স্ব কৃত কর্মের ফলভোগ করে। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে ব্যক্তি যে প্রকার কর্ম করিয়াছে পরজন্মে কিংবা আরও পরবর্তী জন্মে তাহাকে তদনুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি তাহাদিগের সঞ্চিত সেই সমুদায় কর্ম কি এবং তাহার ফলই বা কেমন তাহা জানেন এবং উহার অপক্ষপাত বিচার করিয়া থাকেন মাত্র। বিচারক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদী স্ব স্ব কার্যের অনুরূপ ফলভোগ করিবে তাহাতে বিচারকের দোষগুণের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অতএব ঈশ্বর বৈষম্য অথবা নৈর্ঘৃণ্যদোষে লিপ্ত নহেন।

সৃষ্টিপ্রবাহ বা সংসার অনাদি। জীবগণের অনাদি অদৃষ্ট দ্বারাই উহা পরিচালিত হইতেছে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে সৃষ্টিকার্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন হয় না। ফলে সৃষ্টিকার্য দ্বারা তিনি সুখী হন কিনা অথবা সৃষ্টিনাশে দুঃখী হন কিনা কিংবা সুখ-ভোগ তাঁহার পক্ষে সম্ভব কিনা এই সকল আশঙ্কারও অবকাশ থাকে না। (ক্রমশঃ)

যোগবাশিষ্ঠ ও শঙ্করাচার্য

স্বামী ভুমানন্দ

কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা

যোগবাশিষ্ঠ বেদান্তদর্শনের একখানি প্রসিদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান দার্শনিক পণ্ডিতগণের নিকট ইহা এখন পর্যন্ত বিশেষভাবে আদৃত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-পরীক্ষার জন্য এই পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছে এবং অধ্যাপকগণ ও ছাত্রমণ্ডলী সেই অংশটুকুই কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্কল্পে তদনুসারেই অনুশীলন করেন। এই বিরাট মূল্যবান পুস্তকসম্বন্ধে আমি পূর্বে বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গের সহিত আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমি এমন একজনকে দেখি নাই যিনি সমগ্র পুস্তকখানি অন্ততঃ সাধারণভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, বিশেষভাবে বিচারপূর্বক অনুশীলন ত দূরের কথা। সুখের বিষয় সম্প্রতি দেখিতেছি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমুন্নত কোনও কোনও অধ্যাপকের দৃষ্টি যোগবাশিষ্ঠের দিকে আকর্ষিত হইয়াছে ও তাঁহারা এই পুস্তকসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।

দুই বৎসর পূর্বে আমি যখন চিত্রকূটে ছিলাম, সেই সময় দৈবযোগে আমি একখানি পুস্তক দেখিতে পাই, তাহার নাম "Yogavāsiṣṭha and its Philosophy" অর্থাৎ বাশিষ্ঠ দর্শন। পুস্তকের নামটি দেখিয়াই আমার কৌতুহল জন্মে ও উহা পাঠ করিবার জন্য গ্রহণ করি। পুস্তকের লেখক বি. এল. আত্রেয় এম. এ, ডি.লিট্, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। পুস্তকখানির কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, অন্ততঃ একজন শিক্ষিত লোক যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ (thesis) লিখিয়াছিলেন ও তাহার ফলে, তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি.লিট্ উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই পুস্তকের এক অংশে দেখিলাম, লেখক যোগবাশিষ্ঠের প্রণয়ন-কাল নির্ণয় করিবার জন্য অনেক যুক্তি ও প্রমান দিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহা ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্বেও আমি দেখিয়াছি, কেহ কেহ এই বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডক্টর স্যর রাধাকৃষ্ণণ, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও প্রফেসার শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডক্টর আত্রেয়ের পরে, মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রাঘবনও এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করেন ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে যোগবাশিষ্ঠ রচিত হয়। প্রত্যেক লেখকই

কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবলম্বনে স্ব স্ব বিচারধারা অনুসারে অনুমান করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কাজেই পরস্পর একমত হইতে পারেন নাই, হওয়া সম্ভবও নয়। এ বিষয়ে আমি নিজেও বহুপূর্বে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনও প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। যাহা হউক এই বিষয়ে আমি কিছুদিন পূর্বে পুনরায় অনুসন্ধান করি ও তাহার ফলে একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে যোগবাশিষ্ঠ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

পূর্বে যে এ সম্বন্ধে অন্য কেহ আলোচনা করেন নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের যুক্তিতে তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেন নাই। ডক্টর আত্রেয়ের পুস্তক পাঠ করার পর যোগবাশিষ্ঠ ও শঙ্করাচার্য্যের পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমি যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ (direct internal evidence) পাইয়াছি, তাহা সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। কিন্তু আমি প্রথমে আমার সিদ্ধান্তের অনুকূলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ধরিয়া স্থূলভাবে ও সংক্ষেপে বিচার করি এবং পরে শঙ্করাচার্যের নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে যোগবাশিষ্ঠ শঙ্করাচার্যের পূর্বে।

প্রাচীন গ্রন্থাদির কাল নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমেই তাহাদিগের ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য আসিয়া পড়ে এবং একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহাদিগের প্রণয়নকালের, অন্ততঃ তাহাদিগের পৌর্বাপর্য্যের, অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। যেমন রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থদ্বয় একটু লক্ষ্য করিয়া পাঠ করিলেই বলা যায় কোন্ খানি পূর্ববর্তী এবং ইহার জন্য রামায়ণের

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্" ॥

—শ্লোককে সংস্কৃত ভাষার আদি শ্লোক বলিয়া স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় না। যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যাদি ও পুস্তকাবলী সাধারণভাবে পাঠ করিলেই দেখা যায় যে তাহারা যোগবাশিষ্ঠের ভাষার ও রচনার অনুরূপ নয় এবং একটু লক্ষ্য করিলেই বলা যায় যোগবাশিষ্ঠ পূর্ববর্তী।

শঙ্করাচার্যের ভাষ্যাদিতে তাঁহার স্বকল্পিত অনেকগুলি বিশেষ সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় যথা "সাধন-চতুষ্টয়" "ষট্ সম্পৎ" ইত্যাদি। এই সংজ্ঞাগুলি শঙ্করাচার্য স্বয়ং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ এবং পরবর্তী লেখকগণও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে এই সমস্ত সংজ্ঞার নামগন্ধও নাই। কাজেই স্বীকার করিতে হয় উহা শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী।

দেখিতে পাওয়া যায়, শঙ্করাচার্যের পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা দার্শনিক-ভাবে তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই শঙ্করাচার্যের মতবাদ ও বিচার-

প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে কোনও উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না।

শঙ্করাচার্যের বিচারপ্রণালী অনুসরণ করিলেও দেখা যায় যে, যেখানেই তিনি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, সেখানেই তিনি শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, যেহেতু তাঁহার মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ সেইহেতুই তাহা অগ্রাহ্য ও বর্জনীয়। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ-প্রণেতা তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে শ্রুতিবাক্যের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের প্রাঞ্জল ভাষা, অবিসম্বাদী সুস্পষ্ট যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিচার ধারা, গ্রন্থকারের নিজেরই, ইহার জন্য তাঁহাকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই।

শঙ্করাচার্যের ভাষ্যাদিতে উপনিষদের শ্লোকের অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে এবংবিধ ব্যবহার এককালীনই নাই। যোগবাশিষ্ঠ-প্রণেতা তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে অন্য কোনও লেখকের রচনাকে প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই।

শঙ্করাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্তী লেখকগণ, তাৎকালিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বকীয় মত স্থাপন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন ও সময় সময় তাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়া যুক্তিবহির্ভূত বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই ; কিন্তু যোগবাশিষ্ঠে এবম্বিধ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যোগবাশিষ্ঠ-প্রণেতা অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিতে যে বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও শঙ্করাচার্যের বিচারধারা হইতে কোনও কোনও অংশে পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যের মতে আমাদিগের সম্মুখে দৃষ্ট জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই অর্থাৎ উহা কিছুই নয়। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ-প্রণেতার মতে এই জগৎ "কিছুই নয়" নয়, বরং ইহাই সেই একমাত্র অবিনাশী স্বরূপ বা অদ্বৈত সত্বা ; তবে যে ইহার মধ্যে নানাত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা "নামতঃ ন তু বস্তুতঃ", "বাচি ভিন্নং ন বস্তুনি" এবং এই কথাই তিনি বহু প্রকারে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

(ক) সঃ কণো যা চ কণিকা যা বীচির্যস্তরঙ্গকঃ
যঃ ফেণো যা চ লহরী তদ্ যথা বারি বারিণি॥
যো দেহো যা চ কলনা যদ্ দৃশ্যং যৌ ক্ষয়াক্ষয়ৌ
যা ভাবরচনা যোঽর্থস্তত্তথা ব্রহ্ম ব্রহ্মণি॥

(খ) সর্গ এব পরং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মৈব সর্গদৃক্॥

(গ) যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্দৃশ্যজাতং পুরোগতম্
পরং ব্রহ্মৈব তৎ সর্বমজরামরমব্যয়ম্॥

উভয়ের যুক্তিধারা বিচার করিলে পরিষ্কারই অনুমিত হয়, উভয়ে এই জগৎকে বিভিন্ন-

ভাবে দর্শন করিয়াছেন। তাহা হইলেও, উভয়েরই শেষ সিদ্ধান্ত সেই এক অবিনশ্বর ব্রহ্মেই পর্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

যোগবাশিষ্ঠের কোনও স্থানেই শঙ্করাচার্যের সামান্য ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু শঙ্করার্যের অনেক গ্রন্থে যোগবাশিষ্ঠের শ্লোক বা তদনুরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেও অনুমান করা যায় যে যোগবাশিষ্ঠ শঙ্করাচার্যের পূর্বে।

অপরপক্ষে, কেহ কেহ যোগবাশিষ্ঠকে শঙ্করাচার্যের পরবর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রধান যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে বা কোনও পুস্তকে যোগবাশিষ্ঠের উল্লেখ করেন নাই। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, মনে হয়, তাঁহারা শঙ্করাচার্যের সমগ্র পুস্তক ও ভাষ্যাদি অধ্যয়ন করেন নাই; নতুবা তাঁহারা নিজেই দেখিতে পাইতেন শঙ্করাচার্য একাধিকবার যোগবাশিষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আলোচনা পরে করিব।

কাহারও মতে. যেহেতু শঙ্করাচার্য যোগবাশিষ্ঠের কোনও ভাষ্য লেখেন নাই, সেই হেতুই স্বীকার করিতে হইবে যে শঙ্করাচার্যের কালে যোগবাশিষ্ঠের অস্তিত্বই ছিল না। অবশ্য এই মতটির পরিপোষক-সংখ্যা অধিক নয়। তবে একথার উত্তর নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে যোগবাশিষ্ঠ নিজেই ভাষ্য, কাজেই তাহার আর ভাষ্যের প্রয়োজন হয় নাই—"অগাধে পতিতং রত্নং রত্নেনৈবাবলোক্যতে"।

যাহা হউক, এই বিষয়ে কিছুদিন মাত্র অনুসন্ধান করিয়া আমি যে সমস্ত নির্দিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা এক্ষণে সাধারণের বিচারার্থ নিবেদন করিতেছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক—

"ঋষিভির্বহুধাগীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।"

ও তাহার ভাষ্য পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য "ঋষিভিঃ" শব্দ ব্যাখা করিতে, বলিয়াছেন—"ঋষিভির্বসিষ্ঠাদিভিঃ"। আমার মনে হয় এস্থলে শঙ্কর যোগবাশিষ্ঠকেই লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন। কারণ বশিষ্ঠ নামের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোনও দার্শনিক গ্রন্থ নাই। বশিষ্ঠ নামযুক্ত একমাত্র প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ বশিষ্ঠ সংহিতা, কিন্তু ইহার লিখনভঙ্গী ও লিখিত বিষয় দেখিয়া মনে হয় উহা যোগবাশিষ্ঠের পরবর্তী কালে অপর কোনও গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ গীতার ঐ শ্লোকের প্রতিপাদ্য যে বিষয়ের অর্থ করিতে শঙ্করাচার্য বশিষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, বশিষ্ঠ সংহিতায় সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনও বিচার বা কথাই নাই। যাহা হউক যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে যোগবাশিষ্ঠ ও বশিষ্ঠ সংহিতার প্রণয়নকর্তা পৃথক নয় একই, তাহা হইলে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করা আরও সহজ হইয়া উঠে। কারণ বেদান্তদর্শনের "অনাবিষ্কুর্বন্নন্বয়াৎ" ৩।৪।৫০ সূত্রের শারীরক ভাষ্যে দেখিতে পাই শঙ্করাচার্য বশিষ্ঠ সংহিতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(ক) যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ ॥
গূঢ়ধর্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ
অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ ॥

(খ) "অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তাচারঃ" ইত্যাদি

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রের ভাষ্যে দেখিতে পাই শঙ্করাচার্য "তথা চ বাশিষ্ঠে যোগশাস্ত্রে" বলিয়া কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই "যোগশাস্ত্রই" যে যোগবাশিষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। অবশ্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য শঙ্করাচার্যের ভাষ্য কি না এ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহারা এই সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা এ পর্যন্ত করিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ নহে। কাজেই এখন পর্যন্ত শ্বেতাশ্বতরভাষ্যকে শাঙ্করভাষ্য না বলিয়া পারা যায় না। কাজেই এদিক দিয়াও দেখা যায় যে, যোগবাশিষ্ঠ আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী।

ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত মহামূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতের উদ্যোগপর্বের কয়েকটিমাত্র অধ্যায়ে বিবৃত আছে। এই অংশকে সাধারণতঃ "সনৎসুজাতীয়" বলা হয়। এই সনৎসুজাতীয় পাঠ করিলে দেখা যায়, প্রথম অধ্যায়ের ১৫ ও ৩১ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য "তথা চাহ বশিষ্ঠঃ", "তথা চাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ" বলিয়া যোগবাশিষ্ঠের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সনৎসুজাতীয় ভাষ্য সম্বন্ধেও পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু আমার মতে এই ভাষ্যকে কোনও প্রকারেই অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যায় না, কারণ এই ভাষ্য যে শঙ্করাচার্যের নিজেরই, ইহা নানা প্রকারে প্রমাণ করা যায়। ইহাদিগের মধ্যে আমি তিনটি প্রমাণ নিম্নে দিলাম—

প্রথমতঃ—মাধবাচার্য তাঁহার শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে পরিষ্কার বলিয়া গিয়াছেন যে সনৎসুজাতীয়ভাষ্য শঙ্করের লেখনীপ্রসূত—

"ততো মহাভারতসারভূতাঃ স ব্যকরোদ্ ভাগবতীশ্চ গীতা
সনৎসুজাতীয়মসৎসু দূরং ততো নৃসিংহস্য চ তাপনীয়ম্"

দ্বিতীয়তঃ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

"সনৎসুজাতেঽপি একপাদং নোৎক্ষিপতি" ইত্যাদি

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে মহাভারতের গীতাংশের ন্যায় সনৎসুজাতীয়াংশও

শঙ্করাচার্যের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল; কাজেই তাঁহার পক্ষে ইহারও একটি ভাষ্য লেখা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

তৃতীয়তঃ—শঙ্করাচার্যের বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাই—

"প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥"

এস্থলে শঙ্কর নিশ্চয়ই সনৎকুমারকেই "ব্রহ্মণঃ সুতঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে সনৎসুজাতীয়ের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক অবলম্বনেই বিবেকচূড়ামণির উদ্ধৃত শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কারণ সেখানে দেখিতে পাই সনৎকুমার বলিতেছেন—

"প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি"

উল্লিখিত সমুদয় যুক্তি ও প্রমাণগুলি একত্রে আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, যোগবাশিষ্ঠ শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। আশা করিয়া পাঠকগণের মধ্যে কেহ এই সূত্র ধরিয়া ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান করিবেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনু-সন্ধানমূলে এতদপেক্ষাও নির্দিষ্ট ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত আছে। বিষ্ণুকে যাঁহারা পরম-দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করেন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা হয়। বৈদিকযুগেও যজ্ঞাদিতে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃত হইত এবং বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলা হইত। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ ও উপাসনাদির দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করা হইত। সেই সময় এই ধর্মের নাম ছিল 'সাত্বত' ধর্ম। পরবর্তীকালে ভক্তিমার্গের উপাসনা প্রচলিত হইল। এবং ইহার নাম হইল ভাগবৎ ধর্ম বা পাঞ্চরাত্রমত। এই পাঞ্চরাত্র ধর্ম হইতে মধ্যযুগে কয়েকটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আচার ব্যবহার, উপাসনা প্রণালী প্রভৃতিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভেদ কারণ। ৪টী সম্প্রদায়ে এই বৈষ্ণব ধর্ম বিভক্ত হইল যথা—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। শ্রী (লক্ষ্মী) রামানুজাচার্য কর্তৃক, ব্রহ্ম মধ্বাচার্য কর্তৃক, রুদ্র বল্লভাচার্যের দ্বারা এবং সনক নিম্বার্কাচার্যের দ্বারা প্রবর্তিত হইল। এইভাবে মধ্যযুগে এই ৪টী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইল। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। যদিও চৈতন্যদেব নিজে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদ অভিনব ও অধিকতর সমুজ্জ্বল। বর্তমান প্রবন্ধে রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীশ্রীবল্লভাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইতেছে।

তৈলঙ্গদেশে (মান্দ্রাজ প্রদেশে) ১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দে (১৫৩৫ বিক্রম সম্বৎ) বল্লভাচার্যের জন্ম হয়। কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মমাস ও জন্মস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণভট্ট ও মাতার নাম যল্লমমগরু। তাঁহার বাল্যকালের জীবনীর কোন ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতা বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ও কাশীতে বাস করিতেন। এইস্থানে ধর্মাচার লইয়া স্থানীয় লোকদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় তিনি কাশী হইতে অন্যত্র যাত্রা করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার পত্নী গর্ভবতী। পথগমনে কষ্ট হওয়ায় অষ্টম মাসেই তিনি এই সন্তান এক বনমধ্যে প্রসব করেন। সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জীবিত সন্তানকে লইয়া কাশীতে প্রত্যাগমন করেন ও সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনের নিকটস্থ গোকুলে আসিয়া বসবাস করেন। এখানে তিনি নারায়ণ ভট্ট নামক এক পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। অতি শীঘ্রই তিনি সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করিলেন। তারপর একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। নানাপ্রকার সাংসারিক অশান্তি তাঁহার মনকে ভগবদ্মুখী করিয়া তুলিল। তিনি কাশীতে আগমন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। "ভক্তমাল" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে—তিনি দক্ষিণ

ভারতের বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় গমন করিয়া স্মার্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন ও সেখানে বৈষ্ণবগণের আচার্যপদে অভিষিক্ত হ'ন। বিজয়নগরে তাঁহার মাতুলালয় ছিল। রাজা কৃষ্ণদেবের রাজত্ব সময় ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দ। আর সে সময় অদ্বৈত বৈদান্তিক অপ্পয় দীক্ষিতের পিতা ও পিতামহ কৃষ্ণদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন কিনা সে বিষয় জানা যায় না।

বল্লভাচার্য বিজয়নগর হইতে উজ্জয়িনীতে গমন করেন ও সেখানে শিপ্রানদীর তীরে এক অশ্বথবৃক্ষমূলে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এই স্থানটী এখনও তাঁহার বৈঠক বলিয়া খ্যাত। এইরূপে তিনি কিছুকাল হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ পর্যটনাদি করিয়া গোকুলে প্রত্যাগমন করেন। গোকুল যমুনার বাম তীরস্থ ও মথুরাসহর হইতে প্রায় তিনক্রোশ পূর্বে। এখানে বলা প্রয়োজন কাশীতে তিনি অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রথমে গোকুলেই বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি মথুরার ঘাটে ও চুনারে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কারণ চুনারের একক্রোশ পূর্বদিকে একটি মঠ ও মন্দির আছে এবং সেখানে 'আচার্য কূঁয়া' নামে একটি কূপ আছে, আর মথুরাঘাটে তাঁহার এক বৈঠক আছে। যাহা হউক তিনি গোকুলে অবস্থান করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও পূজাদিতে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অর্চনায় প্রীত হইয়া দর্শন দেন এবং বালগোপাল মূর্তির সেবা ও পূজা প্রচার করিতে আদেশ দেন। তদবধি এই সম্প্রদায় বালগোপালের উপাসক। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার একবার মিলন হয়। শ্রীচৈতন্যদেব তখন বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। শুনা যায় বল্লভাচার্য বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক পরাজিত হ'ন। তিনি চৈতন্যদেব অপেক্ষা ৭।৮ বৎসরের বড় ছিলেন। যাহা হউক, বল্লভাচার্য গোকুলে অবস্থান কালে তাঁহার মতের পরিপোষক প্রায় ১৬খানি প্রকরণ গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি রচনা করেন। নিম্নে ইহাদের পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। এইরূপে তিনি বহুকাল যাবৎ জীবিত থাকিয়া স্বীয় মত প্রচার ও শিষ্য সংগ্রহ করেন। তিনি গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশেও স্বীয় মত প্রচারে গিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুর্জর স্ত্রী ও পুরুষ আছেন। তিনি প্রায় ১০৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি কিছুকাল কাশীধামের অন্তর্গত জেঠন-বড় নামক স্থানে অবস্থান করেন। এইস্থানে তাঁহার একটি মঠও আছে। এই কাশীতেই প্রায় ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। কোন মতে তিনি বোম্বাই প্রদেশস্থ কোনস্থানে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। তিনি একদিন কাশীর হনুমানঘাটে গঙ্গাস্নানে অবতরণ করিলেন, আর উঠিলেন না; আর ঐ স্থান হইতে একটী অগ্নিশিখা আকাশে উত্থিত হইল। তীরস্থ অনেকে যেন দেখিলেন তিনি আকাশে লীন হইয়া গেলেন। ইহা হইতে মনে হয় তিনি গঙ্গসলিলে সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিট্‌ঠলনাথ এই সম্প্রদায়ের আচার্যপদে বৃত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ছিল গোপীনাথ। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না।

বল্লভাচার্যকৃত গ্রন্থাবলী

(১) অনুভাষ্য—ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। ইহার উপর পুরুষোত্তমজী মহারাজ কৃত "ভাষ্যপ্রকাশ" টীকা আছে। (২) সুবোধিনী—ইহা ভাগবতের ব্যাখ্যা। (৩) সিদ্ধান্তরহস্য (৪) বিষ্ণুপদ, ইহা হিন্দী ভাষায় লিখিত বিষ্ণু গুণকীর্তন। (৫) ভাগবতলীলারহস্য (৬) গীতাভাষ্য (৭) পূর্বমীমাংসাভাষ্য (৮) সটীক তত্ত্বদীপ বা তত্ত্বার্থদীপ।

এই ৮টী প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্য ব্যতীত তাঁহার কৃত বহু প্রকরণ গ্রন্থ ও স্তোত্রাদি আছে যথা—অন্তঃকরণ প্রবোধ ও ইহার টীকা আচার্যকারিকা, আনন্দাধিকরণ, আর্যা, একান্তরহস্য, বালভেদ, ত্রিবিধ লীলানামাবলী, নবরত্ন ও ইহার টীকা, নিরোধ লক্ষণ ও ইহার বিবৃতি, মথুরা-মাহাত্ম্য, মথুরাষ্টক, যমুনাষ্টক, বেদপ্রতিকারিকা, বিবেকধৈর্যাশ্রয়, শ্রুতিসার, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, সন্ন্যাস-নির্ণয় ও ইহার টীকা, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, সেবাফলস্তোত্র, ভাগবতসার সমুচ্চয়, মঙ্গলবাদ, পুরুষোত্তম সহস্র নাম, পুষ্টিপ্রবাহ, মর্যাদাভেদ, পত্রাবলম্বন, পদ্য, পরিত্যাগ, পরিবৃঢ়াষ্টক ও ইহার টীকা, প্রেমামৃত ও ইহার টীকা, প্রৌঢ় চরিতনামন্, বালচরিতনামন্, বালবোধ, কৃষ্ণাশ্রয়, স্বামিন্যষ্টক, ভক্তিবর্ধিনী ও ইহার টীকা, সর্বোত্তমস্তোত্র ও ইহার টীকা।

এই সব গ্রন্থ ব্যতীত বিষ্ণুপদ (ইহা বল্লভাচার্য কৃত) ও ব্রজবিলাস, অষ্টছাপ, বার্তা (ইহাতে বল্লভ ও তাঁহার ৮৪জন ভক্তের চরিত বর্ণিত আছে) প্রমুখ কয়েকটী ভাষাগ্রন্থও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রামাণিক।

এইবার আমরা বল্লভাচারী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বল্লভাচার্যের মতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় উপবাস ও কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজন নাই। উত্তম বস্ত্রপরিধান ও সুখাদ্য অন্ন পানীয়াদি এবং বিষয় ও সুখ সম্ভোগ পূর্বক ভগবানের সেবা করিতে হয়। সেজন্য এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা বিষয়ী ও ভোগবিলাসী এবং গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ। গোস্বামীর শিষ্যরা তাঁহাদিগকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও ভোজনদ্রব্য এবং ভোগবিলাসের উপকরণ প্রদান করে। এইরূপ নিয়ম আছে যে শিষ্যেরা গোস্বামীকে তাহাদের তনু, মন ও ধন এই তিনই সমর্পণ করিবে। শিষ্যেরা অনেকেই ধনী ও ব্যবসায়ী; গোস্বামীরাও ব্যবসায় করেন।

ইঁহারা প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা করেন — মঙ্গলারতি (সূর্যোদয়ের অর্ধঘণ্টার পর) শৃঙ্গার (৪দণ্ড বেলায়) গোয়ালাবেশ, (৬ দণ্ড বেলায়) রাজভোগ, (মধ্যাহ্নকালে) উত্থাপন, (অপরাহ্নকালে), ভোগ, সন্ধ্যা ও শয়ন (৬ দণ্ড রাত্রিকালে)।

এই প্রকার নিত্যসেবা ব্যতীত বৎসরে কয়েকটী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়—যথা জন্মাষ্টমী রাসযাত্রা প্রভৃতি। রাসযাত্রা উৎসব একটী মনোরম দৃশ্য—ইহাতে নানাপ্রকার নৃত্য, গীত বাদ্যাদির আয়োজন হয়, তৃণগৃহ ও নানা পণ্যশালা প্রস্তুত হয়। নদীকূলে পাষানবেদীর উপর

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। স্তোত্রপাঠ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ইহাদের পূজার ও উৎসবের বিশেষ অঙ্গ।

এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন; ললাটে দুইটী উর্ধ্বপুণ্ড্র করিয়া নাসামূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি অঙ্কন ক'রে উহা জুড়িয়া দেন ও ঐ পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ গোলাকার তিলক ধারণ করেন। কণ্ঠে তুলসীর মালাও ধারণ করেন।

গোস্বামীরা এই সম্প্রদায়ের বালকদিগকে প্রথমে গলায় তুলসীর মালা দিয়া "শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম" এই মন্ত্রপাঠ দ্বারা সম্প্রদায়ভুক্ত করেন তারপর ১২শ বা ততোধিক বর্ষে দীক্ষা দিয়া দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দেন।

মথুরা ও বৃন্দাবনে এই সম্প্রায়ের বহু মঠ ও মন্দির আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মন্দিরের মধ্যে এইকয়টী বিশেষ প্রসিদ্ধ যথা—আজমীরের অন্তর্গত শ্রীনাথদ্বারের মঠ—এই মঠটী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন; এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে বৎসরে অন্ততঃ একবার এই মন্দির দর্শন করিতে হইবে; কাশীর অন্তর্গত লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির; দ্বারকা ও পুরীর কয়েকটী মন্দির; জগন্নাথক্ষেত্র ও দ্বারকা ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। গুজরাট, মালব ও কাশ্মীরের বহু স্বর্ণবণিক ও ব্যবসায়ী লোকেরা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। প্রতি হুণ্ডীতে ১টী পয়সা ও প্রতিদিনের বস্ত্রবিক্রয়ে দুইটী ক'রে পয়সা ইঁহারা দেবালয়ে দানের জন্য রাখিয়া দেন। আর পরস্পরকে ইঁহারা "শ্রীকৃষ্ণ" ও "জয়গোপাল" বলিয়া অভিবাদন করেন।

বল্লভাচার্যের মতবাদের নাম 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। ইঁহারা এই মতের প্রথম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে না। পূর্বে এই মত মাধ্বমতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারপর বিষ্ণুস্বামী নামক কোন বৈষ্ণব আচার্য মাধ্বমতে কয়েকটীস্থানে নূতন মত প্রবর্তিত করেন। বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য জ্ঞানদেব ও তাঁহার দুই শিষ্য নাথদেব ও ত্রিলোচন এবং ইঁহাদের শিষ্য বল্লভাচার্য। তবে বল্লভাচার্য এই সম্প্রাদায় ও মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বর্তমান লেখককৃত বেদান্তদর্শনের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে। সেজন্য এস্থানে আলোচিত হইল না।

ইহাই সংক্ষেপে বল্লভাচার্যের জীবনী ও সম্প্রদায়ের পরিচয়। যেমন শঙ্করাচার্যপ্রমুখ অন্যান্য আচার্যদিগের সংস্কৃত ভাষায় জীবনী আছে এবং ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাতেও জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে বল্লভাচার্যের সেই প্রকার কোন জীবনী নাই। যাহাতে অন্ততঃ ইংরেজী এবং বাংলা, হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় এই মহাপুরুষের জীবনী ও মতবাদমূলক একটী প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহার জন্য এই সম্প্রদায়ের ধনী ও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি.এল্

যে সকল দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, সেই সকল দেশের পক্ষে প্রাচীন মুদ্রার মূল্য ইতিহাস রচনার উপাদান স্বরূপ অধিক না হইলেও, ভারতের পক্ষে যেখানে জনপ্রবাদ, বৈদেশিক পর্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন এবং সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে হয়, প্রাচীন মুদ্রা ইহার ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উপকরণ। সেইকারণ প্রাচীনমুদ্রা ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষকগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

মানব সমাজের আদিম যুগে, যখন হইতে শ্রম বিভাগ আরম্ভ হইল, তখন হইতে মানবসমাজে বিনিময় আরব্ধ হয়। এই বিনিময়ের সুবিধার জন্য ক্রমে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইল। বস্ত্রনির্মাণকারীর যখন খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক নাই তখন কৃষক যদি খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে বস্ত্র ক্রয় করিতে আসিত, তখন বড় অসুবিধা মনে হইত। এই অসুবিধা দুরীকরণের নিমিত্ত পৃথিবীর সর্বত্র বিনিময়ের স্থায়ী উপকরণের উদ্ভাবনের জন্য মানবসমাজ কৃতসঙ্কল্প হইল এবং বিনিময়ের এই উদ্ভাবিত উপকরণের নামই মুদ্রা। প্রথম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ধাতু পৃথিবীর সর্বত্র বিনিময়ের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসিগণ ধাতুনির্মিত মুদ্রা বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সমূহে ভারতবর্ষের প্রাচীন সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বর্ণ মুদ্রার নাম সুবর্ণ বা নিষ্ক, রজত মুদ্রার নাম পুরাণ বা ধরণ এবং তাম্র মুদ্রার নাম কার্ষাপণ ছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতে প্রথমে চূর্ণধাতু বিনিময়ের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত। তাহা হইলে, নিষ্ক, ধরণ ও কার্ষাপণ প্রভৃতি শব্দ প্রথমতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের একটী নির্ধারিত ওজন বুঝাইত[১]। পরে যখন ভারতবর্ষেও ক্রমে ওজন করা চূর্ণ ধাতুর পরিবর্তে ধাতুনির্মিত মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইল, তখন পুরাণ, কার্ষাপণ, সুবর্ণ বা নিষ্ক ক্রমে ওজনের নাম হইতে মুদ্রার নামে পরিণত হইয়াছিল।

ঋক্-সংহিতায় নিষ্ক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। ঋষি কক্ষীবন্ সিন্ধুনদী তীরবাসী রাজা ভাবযব্যের নিকট হইতে নিষ্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] বৌদ্ধ সাহিত্যে সুবর্ণ বা রজত নির্মিত

১ সুবর্ণ ওজনের রীতি—১ নিষ্ক বা পল=৪ সুবর্ণ=৬৪ মাষা=৩২০ রতি
রৌপ্য ওজনের রীতি—১ ধরণ বা পুরাণ=১৬ মাষক=৩২ রতি।
তাম্র ওজনের রীতি—১ কার্ষাপণ=৮০ রতি।

২ ঋক্-সংহিতা—১।১২৬।১

কার্ষাপণ বা কাহাপণের উল্লেখ আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতুর নির্মিত মুদ্রার প্রচলন ছিল।

প্রাচীন সুবর্ণ, নিষ্ক বা পল অদ্যাপি বোধ হয় আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক চতুষ্কোণ ও গোলাকার প্রাচীন রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন ধরণ বা পুরাণ। এই সমস্ত মুদ্রা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রৌপ্যের পাত কাটিয়া একই সময়ে বহু চতুষ্কোণ রজতখণ্ড নির্মিত হইয়াছিল, পরে প্রত্যেক খণ্ডের পার্শ্বে এক বা ততোধিক অঙ্ক চিহ্ন (punch-mark) অঙ্কিত হইয়াছে। এই চতুষ্কোণ মুদ্রাই প্রাচীন পুরাণ বা ধরণ।

ভারতের সর্বপ্রাচীন মুদ্রা আকারে চতুষ্কোণ ছিল। সমগ্র ভারতে যে সমস্ত অঙ্ক চিহ্ন-যুক্ত সুবর্ণ, রজত বা তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই চতুষ্কোণ। সুতরাং প্রাচীন পুরাণ বা ধরণ এবং এই সকল অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা যে এক, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে এই জাতীয় সহস্র সহস্র রজত ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইহা অঙ্কযুক্ত (punch-marked) মুদ্রা নামে পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে, প্রাচীন ভারতের মুদ্রা আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের পরে গ্রীক্‌দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরে ভারতে মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যর আলেক-জান্দার কানিংহাম এই মতের ভিত্তিহীনতার প্রমাণ করেন। ফরাসী পণ্ডিত বর্নুফ, এই জাতীয় মুদ্রা যে ভারতের মুদ্রা, অনুকরণ নহে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রোমক ঐতিহাসিক কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস (Quintus Curtius) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে দিক্‌বিজয়ী বীর আলোকজান্দার তক্ষশিলানগরে উপস্থিত হইলে উক্তনগরীর দেশীয় রাজা ৮০ টালেণ্ট (Talent) মুল্যের মুদ্রিত রৌপ্য উপহার দিয়াছিলেন।[১] সুতরাং গ্রীক্ জাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব হইতেই এই দেশে মুদ্রিত রৌপ্য বা রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল।

ফরাসী পণ্ডিত দেকুরদেমাঁসে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে পুরাণাদি মুদ্রা ভারতে মুদ্রাঙ্কিত পারসিক মুদ্রা। রৌপ্য পুরাণ এবং রৌপ্য দারিকে (দারা বা দরায়ুসের মুদ্রা) কোনই প্রভেদ নাই। এইমত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব অন্যতম অধ্যক্ষ ডাক্তার ডি. বি. স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

গৌতমবুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে মুদ্রার প্রচলন ছিল, ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যে তাহার বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জাতকসমূহ বর্তমান আকারে লিখিত হইয়াছিল, এইগুলিতে কার্ষাপণ বা কাহাপণ নামের ব্যবহার অনেক

১ Coins of Ancient India, p. v.

স্থানে দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক রিজ্ ডেভিড্ (Rhys David) তাঁহার "On Ancient Weights and Measures of Ceylon" নামক প্রবন্ধে পালি সাহিত্যে মুদ্রার উল্লেখের দৃষ্টান্তগুলি একত্র করিয়াছেন। পাণিনির সময়েও মুদ্রার প্রচলন ছিল, "সিদ্ধান্ত কৌমুদী"তেই তাহার প্রমাণ আছে। তাঁহার সূত্রে রূপ্য=রূপাদাহত শব্দের ব্যবহার আছে। রূপ (আকার) হইতে 'য' প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। রূপ্য শব্দে মুদ্রিত আকার বিশিষ্ট মুদ্রা বুঝায়। এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় খ্রী° পূ° ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পুরাণাদি মুদ্রার প্রচলন ছিল, সুতরাং খৃষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পূর্বে মুদ্রার উৎপত্তি হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ভারতীয় মুদ্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যায় যে নাতিস্থূল রূপার পাত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ রজত মুদ্রা নির্মিত হইত; পরে বিশুদ্ধি জ্ঞাপনের জন্য এই সকল মুদ্রার একপার্শ্বে বা উভয়পার্শ্বে অঙ্কচিহ্ন মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাঙ্কনবিধি প্রাচীন জগতের অন্যান্য সভ্যদেশের মুদ্রাঙ্কন রীতি হইতে বিভিন্ন বলিয়াই বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতিকে এতদ্দেশজাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রৌপ্যের পাত কাটিয়া তাহার পার্শ্বে একটী একটী করিয়া অনেকগুলি অঙ্কচিহ্ন মুদ্রিত হইত! কি কারণে তাহা বলিতে পারা যায় না, মুদ্রার একইদিকে অধিকাংশ অঙ্কচিহ্নগুলি মুদ্রিত হইত, অপরদিকে অনেক পুরাণে অঙ্ক চিহ্ন থাকিত না, থাকিলেও সেগুলির সংখ্যা অতি অল্প। উভয়দিকের অঙ্কচিহ্নের সংখ্যা সমান এরূপ মুদ্রা অতীব বিরল। এই সকল অঙ্ক চিহ্নের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কানিংহাম প্রভৃতি মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে বণিকগণ একবার পরীক্ষিত মুদ্রা পুনরায় চিনিয়া লইবার জন্য এইরূপ চিহ্নাঙ্কন করিত। পরবর্তীকালে বাংলায় স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের রজতমুদ্রাসমূহে এইরূপ অঙ্কচিহ্ন (Punch mark বা Shroff mark) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ স্পুনার বলেন যে পুরাণের অঙ্কচিহ্নগুলি ঐ সকল মুদ্রা যে যে নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল সেই সেই নগরের চিহ্ন বা লাঞ্ছন।

বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক চিহ্নযুক্ত মুদ্রাসম্বন্ধে একটী গবেষণামূলক ৬২শ-সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত পাত্রহা নামক স্থানে যে সকল অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এখানে মোট ২, ৮১৩ সংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় ১,৭০৩টী মুদ্রার সম্বন্ধে এই পুস্তকে আলোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রাতে বিভিন্ন বিভিন্ন চিহ্ন আছে, পণ্ডিতগণ মনে করেন যে যখন এই মুদ্রাগুলি নির্মিত হইরাছিল, তখন বিভিন্ন নির্মাণকারী ইহাতে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এক একটী ছাপ দিয়াছিল এবং এই মুদ্রা সকল যে ভারতের স্বদেশজাত মুদ্রা এবং অন্য কোনদেশের মুদ্রার অনুকরণ নহে ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য পুস্তক নাই। ভারতবর্ষীয় বা অন্যান্য দেশের পুরাতত্ববিদ্‌গণ, যাঁহারা মুদ্রাতত্ত্ববিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাধারণতঃ ইংরেজীভাষায় নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় লিখিত মুদ্রাতত্ব বিষয়ে বোধ হয় একমাত্র পুস্তক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থ "প্রাচীন মুদ্রা"। মুদ্রাতত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Prof. E. J. Rapson (১) Indian Coins (২) British Museum Catalogue of Indian Coins, Andhras, W. Ksatrapas etc.

Dr. Alexander' Cunnigham

(১) Coins of Ancient India.
(২) Coins of the Indo-Greek Princes.
(৩) Coins of the Sakas. (৪) Coins of Mediæval India.

Allan : British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties.

Percy Gardner : (১) Parthian Coinage (২) British Museum Catalogue of Indian Coins, Greek & Scythic Kings of Bactria & India.
(৩) Gold Coins of Asia before Alexander the Great.

Vincent A. Smith : Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol I

H. Nelson Wright

Catalogue of coins in the Indian Museum Vols. II & III

Shamsuddin Ahmad.

A supplement to the catalogue of coins in the Indian Museum Vol II &III

R. B. Whitehead :

Catalogue of coins in the Punjab Museum, Lahore Vol I.

T. W. Rhys David :

On the Ancient Coins & Measures of Ceylon.

G. F. Hill : Historical Greek Coins.

B. V. Head : Catalogue of Greek Coins in the Br. Museum, Attica.

Elliot : South Indian Coins.

C. J. Brown—The Coins of India

Surendra Kishor Chakravarty—A Study of Ancient Indian Numismatics

Rakhaldas Banerjee—Descriptive List of Sculptures & coins in the Museum of Bangiya Sahitya Parishad.

P. N. Bhattacharyya : A hoard of silver punch-marked coins from Purnea.

ইহা ছাড়া Numismatic Chronicle, Numimatic supplement of the Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal প্রভৃতি Journalএ মুদ্রাতত্ব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বেদান্তদর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্.

পূর্বে রামানুজের মতবাদ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এইবার রামানুজ শঙ্করের মতবাদ কি ভাবে খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে।

শঙ্করের দর্শন মায়াবাদের উপর স্থাপিত। রামানুজ বলেন এই মায়াবাদ ৭টী প্রকারে অনুপপন্ন। মায়া বা অবিদ্যা যাহা শঙ্করের মতে সৎও নহে অসৎও নহে সদসৎ অর্থাৎ অনির্বচনীয় তাহা ব্রহ্মাশ্রিত কি না অর্থাৎ ব্রহ্ম ও অবিদ্যা বা মায়া পৃথক বা অপৃথক। যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নহে ; যদি অপৃথক হয় তাহা হইলে জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে কি প্রকারে অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকিতে পারে ? আর অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত নহে জীবাত্মাশ্রিত এই কথাও বলা যায় না ; কারণ জীবাত্মা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্য বা ফল, জীবাত্মার পূর্বে তাহা হইলে অবিদ্যা কোথায় থাকে ? সুতরাং অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতও নহে জীবাত্মাশ্রিতও নহে। তারপর শঙ্করের মতে অবিদ্যার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি এই দুই প্রকার শক্তি আছে। আবরণশক্তি দ্বারা অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত করে। রামানুজ বলেন ইহা অসম্ভব, কারণ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, ইহাকে আবৃত করা কি প্রকারে সম্ভব ? তারপর শঙ্কর মায়াকে অনির্বচনীয় বলিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ বলেন সৎও নহে অসৎও নহে এরূপ কোন বস্তু থাকিতে পারে কি ? আর একই বস্তু একসঙ্গে সদসৎ হয় কি প্রকারে ? শঙ্কর বলেন যখন কোন ব্যক্তির শুক্তিতে রজত ভ্রম হয় তখন একটী 'প্রাতিভাসিক' রজতের সৃষ্টি হয়। রামানুজ বলেন এই 'প্রতিভাসিক' বা অনির্বচনীয় রজতের সৃষ্টি হইবে কেন ? ইহা ভ্রম মাত্র। কেহ কি কখন সাধারণ রজত হইতে ভিন্ন একটা 'প্রাতিভাসিক' রজত দেখিয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন ? এই প্রকারে রামানুজ শঙ্করের অনির্বচয়নীতাখ্যাতিবাদ নিরাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আর ৪ প্রকার খ্যাতিবাদ যথা—অসৎখ্যাতি (ইহা মাধ্যমিক বৌদ্ধদের মত), আত্মখ্যাতি (ইহা যোগাচার বৌদ্ধদের মত), অখ্যাতি (ইহা পূর্ব মীমাংসার অন্তর্গত প্রভাকর সম্প্রদায়ের মত), এবং অন্যথাখ্যাতি (ইহা নৈয়ায়িকদিগের মত)—এই সমস্তই খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব জটিল বিষয়ের আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। এইভাবে শঙ্করের মায়াবাদের উপর রামানুজ ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। রামানুজ তারপর শঙ্করের নির্বিশেষবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের বহির্ভূত। রামানুজ বলেন কাহারও কি কখন নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান বা প্রতীতি হইয়াছে ? জ্ঞানের স্বভাব কি ? জ্ঞানের বিষয়বস্তুটীকে প্রকাশ করা ;

সুতরাং নির্বিশেষ বস্তু কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে? শঙ্কর ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামানুজ বলেন এইগুলি ব্রহ্মের বিশেষণ। শাস্ত্রও নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে পারে না, কারণ প্রভৃতি ও প্রত্যয়যোগে যে পদসিদ্ধ হয় উহা কোন বিশিষ্ট অর্থই বোধগম্য করায়; নির্বিশেষ বস্তুর বোধ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহে নির্গুণ নহে—ইহা সগুণ ও সবিশেষ। ব্রহ্মের যে সব নির্গুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি আছে ঐগুলি ব্রহ্মে হেয় গুণের অভাব ইহাই প্রতিপন্ন করে। তারপর শঙ্করমতে আত্মা ও অনুভূতি অভিন্ন ইহাও রামানুজের মতে যুক্তিবিরুদ্ধ। অর্থাৎ শঙ্কর বলেন জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিরপেক্ষ কিন্তু রামানুজ বলেন জ্ঞান দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তু এই দুইটীর সাহায্যে উৎপাদ্য। এইরূপে বহুপ্রকারে রামানুজ শঙ্করমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্কর সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণ আবার এইসব দোষ খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজ মতাবলম্বীরা আবার উহাদের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। এইভাবে বিচার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াছে ও বেদান্ত চিন্তাধারার গম্ভীরত্ব বর্ধিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে রামানুজমতগুলির পুনরালোচনা করিয়া এই সম্প্রদায়ের মতবাদের উপসংহার করা হইতেছে ও সেই সঙ্গে কেবল দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পার্থক্যও বর্ণিত হইতেছে।

(১) শঙ্করমতে ব্রহ্ম নির্গুণ। রামানুজমতে ইহা সগুণ এবং অনন্ত কল্যাণের আধার

(২) শঙ্করমতে জীব ও ব্রহ্ম এক, জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব। রামানুজ মতে জীব ব্রহ্মের অংশ—ইহা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত, জীব অণু, অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি—আর ব্রহ্ম বিভু, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি।

(৩) শঙ্করমতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত অর্থাৎ এই জগৎ মিথ্যা, ইহার ব্যাবহারিক সত্ত্বা আছে বটে কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। রামানুজমতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মের শরীর স্থানীয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ইহা মিথ্যা নহে পরন্তু সৎ। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি এবং এই শক্তিবলেই জগতের সৃষ্টি। সুতরাং ব্রহ্ম জীব ও জগৎ বিশিষ্ট। অবশ্য ব্রহ্ম অদ্বিতীয়—তাঁহাতে কোন স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই কিন্তু স্বগতভেদ আছে; আর এই জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বগতভেদ। [ব্রহ্ম অদ্বিতীয় অথচ জীবজগৎ বিশিষ্ট। এই জন্যই এই মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ]।

(৪) রামানুজের মতে মুক্তিলাভের পরেও জীব এখন যেমন অংশরূপে অবস্থান করিতেছে সেইরূপ অংশই চিরকাল থাকিবে এক হইয়া যাইবে না। মুক্তিলাভের পর জীবের ব্রহ্ম সান্নিধ্য হইবে। কিন্তু শঙ্করের মতে ঘটাকাশ যেমন ঘটটী ভাঙ্গিয়া দিলে মহাকাশে পরিণত হয় উহার কোন পৃথক সত্ত্বা থাকে না সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীর ও মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকারযুক্ত সূক্ষ্মশরীর—এই ২টী যেন ঘট—ইহাদের ধ্বংসে অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইবে।

(৫) শঙ্করের মতে জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাধনা। "তত্ত্বমসি", "অহংব্রহ্মাস্মি"

এই সব মহাবাক্যের যথার্থ জ্ঞানে মুক্তি হয়। রামানুজ বলেন ভক্তিই মুক্তির প্রধান সাধনা, জ্ঞান উহার সহকারী সাধনা মাত্র।

শঙ্করমতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই ব্রহ্মজ্ঞানের ও বেদান্তপাঠের অধিকার আছে। যাহারই ৪টি গুণ (ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে) আছে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। রামানুজমতে দ্বিজাতীয় ব্যক্তি যিনি পূর্বমীমাংসাদর্শন সম্যক্‌রূপে পাঠ করিয়াছেন তিনিই বেদান্ত দর্শনের অধিকারী।

রামানুজসম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণের মতবাদের সহিত রামানুজমতবাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। অন্যান্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় যেমন শ্রীকণ্ঠাচার্য প্রবর্তিত শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মূলতঃ রামানুজমতবাদই। রামানুজের মতে বিষ্ণুই ব্রহ্ম বা পরম দেবতা, আর শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ বা শ্রীকর প্রভৃতির মতে শিবই পরম দেবতা। রামানুজ মতে মুক্তাবস্থায় জীব বিষ্ণুরই সেবকরূপে অবস্থান করে, কিন্তু শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতির মতে জীবের মুক্তিলাভের পর শিবের সমান ঐশ্বর্য হয়।

ইহাই সংক্ষেপে বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থবিবরণী ও মতবাদ। এইবার তৃতীয় সম্প্রদায় দ্বৈতসম্প্রদায়ের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

(গ) দ্বৈতবাদ

(১) মধ্বাচার্য—ইনি কোনমতে ১১৯৯ এবং কোন মতে ১২৩৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ, বাসুদেব, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি। ইঁহার গুরু ছিলেন—অদ্বৈতমতাবলম্বী, নাম অচ্যুত প্রকাশ। ইনিই দ্বৈতমতের প্রথম প্রবর্তক। অবশ্য এই মত ইঁহার পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহাকে ইনিই প্রথম দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। ইঁহার ভাষ্য ও প্রকরণগ্রন্থাদির সংখ্যা ৩৭খানি। ইঁহার জীবনী ও সম্প্রদায়ের বিষয় বর্তমান লেখকদ্বারা শ্রীভারতীর ২খণ্ড, ৯ম ও ১০ম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেজন্য উহা আর আলোচিত হইল না। ইনি শঙ্করমতকে রামানুজ অপেক্ষা ভীষণতরভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর পরে ইহার মতবাদের বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(২) ত্রিবিক্রমাচার্য—ইনি মধ্বাচার্যের শিষ্য। পূর্বে ইনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে মধ্বাচার্যকর্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার গ্রন্থ—(১) উষাহরণ কাব্য (সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে রচিত) (২) মধ্বাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের উপর 'পদার্থ প্রদীপিকা' নামক টীকা।

(৩) পদ্মনাভাচার্য—ইনিও পূর্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে মধ্বাচার্য কর্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য হন। ইঁহার গ্রন্থ—(ক) পদার্থ-সংগ্রহ (খ) উহার টীকা মধ্বসিদ্ধান্তসার।

(৪) অক্ষোভ্যমুনি—ইঁহার সময় আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ। ইনিও মধ্বাচার্যের শিষ্য এবং ন্যায়ের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। একসময় ইঁহার সহিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ অদ্বৈতবাদী বিদ্যারণ্যস্বামীর বিচার হইয়াছিল। ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৫) জয়তীর্থাচার্য—ইনি অক্ষোভ্যমুনির শিষ্য। আনুমানিক ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় ও ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ হয়। ইনি নব্যন্যায়ের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আচার্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ যথা—(ক) মধ্বাচার্যকৃত বেদান্ত সূত্রভাষ্যের উপর "তত্ত্ব প্রকাশিকা" টীকা (খ) মধ্বকৃত অনুভাষ্যের উপর 'ন্যায়সুধা" টীকা (গ) তত্ত্বোদ্যতটীকা (ঘ) তত্ত্বসংখ্যানটীকা (ঙ) তত্ত্ববিবেক টীকা (চ) প্রমাণলক্ষণটীকা (ছ) ঋগ্‌ভাষ্যটীকা (জ) প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানটীকা (ঝ) উপাধিখণ্ডনটীকা (ঞ) মায়াবাদখণ্ডনটীকা (ট) বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়টীকা (ঠ) ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্যটীকা (ড) প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্যটীকা (ঢ) গীতাতাৎপর্যনির্ণয়টীকা (ণ) প্রমাণ পদ্ধতি (ত) বাদাবলী। এই সব টীকাগ্রন্থগুলি মধ্বাচার্যকৃত মূল গ্রন্থেরই উপর। শঙ্করসম্প্রদায়ের যেমন আনন্দগিরি রামানুজ সম্প্রদায়ের যেমন বেদান্তদেশিক ইনিও মাধ্বসম্প্রদায়ের সেইরূপ টীকাগ্রন্থাদি রচনা করিয়া এই সম্প্রদায়ের মতবাদ যথেষ্ট প্রচার করিয়াছেন।

(৬-১০) বিদ্যাধিরাজ—ইনি জয়তীর্থের শিষ্য। রাজেন্দ্র—ইনি বিদ্যাধিরাজের শিষ্য। বিজয়ধ্বজ ইনি রাজেন্দ্রের শিষ্য। পুরুষোত্তম ইনি বিজয়ধ্বজের শিষ্য। সুব্রহ্মণ্য ইনি পুরুষোত্তমের শিষ্য। এই ৫ জন আচার্যকৃত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সব আচার্যপরম্পরার নাম মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে (শ্রীভারতী ২, ১০) উল্লিখিত হইয়াছে।

(১১) ব্যাসরায়াচার্য—ইনি সুব্রহ্মণ্যের শিষ্য। ইঁহার বিদ্যাগুরু ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থ। ইঁহার জন্মসময় আনুমানিক ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দ ও তিরোধান ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ। ইনি উদীপির মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি অদ্বৈতমত এত সূক্ষ্ম ও প্রচণ্ডভাবে খণ্ডন করেন যে তাহার তুলনা হয় না। ইঁহার রচিত ন্যায়ামৃত গ্রন্থ এক অপূর্ব অবদান, আর এই গ্রন্থেরই প্রত্যুত্তররূপে শঙ্করমতাবলম্বী মধুসূদন সরস্বতীকৃত বিখ্যাত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচিত হয়। ব্যাসরায়ের এই গ্রন্থে অদ্বৈতমতে যতপ্রকার আপত্তি হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহার একত্র সমাবেশ আছে। ইঁহার রচিত গ্রন্থ যথা—(ক) ন্যায়ামৃত (খ) জয়-তীর্থকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকার উপর তাৎপর্যচন্দ্রিকাবৃত্তি বা মাধ্বচন্দ্রিকা (গ) ভেদোজ্জীবন (ঘ) আনন্দতারতম্যবাদ (ঙ) মন্দারমঞ্জরী, ইহা মধ্বাচার্যকৃত কয়েকটী গ্রন্থের উপর টিপ্পনীর সমাবেশ (চ) তর্কতাণ্ডব—ইহাতে ন্যায়মত খণ্ডিত হইয়াছে।

(১২) ব্যাসরামস্বামী—ইনি ব্যাসরায়ের শিষ্য। ইনি ছদ্মবেশে কাশীধামে আসিয়া মধুসূদন সরস্বতীর নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করেন ও তারপরেই ব্যাসরায়কৃত ন্যায়ামৃতের উপর 'তরঙ্গিনী' নামক টীকা রচনা করিয়া 'অদ্বৈতসিদ্ধি' খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১) বাংলার দেশীয় ইতিহাস

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি.এল্

ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিল কমিশনের ষোড়শ সংখ্যক পুস্তকে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুঁথি সংগ্রহ আছে, তাহার মধ্যে ডাঃ মজুমদার 'রাজাবলী' নামে একটী হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধকার 'রাজাবলীর' কতকগুলি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয় শর্মা লিখিত 'রাজতরঙ্গ' নামক পুস্তকের ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত এই পুঁথির এত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে ডাঃ মজুমদার মনে করেন যে 'রাজতরঙ্গের' উপরই নির্ভর করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। আবুল ফজল যে আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সেন রাজগণের বিবরণ লিখিয়াছেন, বোধ হয় তিনি এই পুস্তকখানি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও তদানীন্তন সময়ে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। এইরূপ আরও কোনও পুস্তক আছে কিনা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই। পুস্তকখানির বর্তমান আকারে ৯টী পৃষ্ঠা আছে এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৫৫টী পুঙ্‌ক্তি আছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব আচার্য চৌধুরী কর্তৃক পুস্তকখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহার ক্রমিক সংখ্যা—৫৭৭ (ক)।

(২) কবীন্দ্র পরমানন্দ

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি.এল্.

ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিল কমিশনের যে ষোড়শ সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রাও বাহাদুর জি, এস্ সার্দেসাই লিখিত কবীন্দ্র পরমানন্দ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরমানন্দ 'অনুপুরাণ' নামক একটী কবিতা পুস্তকের রচয়িতা। ইহাতে বিশ্ববিশ্রুত মারাঠাবীর শিবাজীর জীবনী ও কার্যাবলীর বিষয় বর্ণিত আছে। এই কবিতাটী তাঞ্জোরের সরস্বতী মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় এবং বিশ বৎসর পূর্বে ইহা পুণাতে প্রকাশিত হয়। কবি পরমানন্দ শিবাজীর সমসাময়িক ছিলেন কি না কিংবা শিবাজীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল, সেই কারণ এতদিন পর্যন্ত এই কবিতা পুস্তকখানির ঐতিহাসিক মূল্য ঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই; বর্তমানে স্যর যদুনাথ সরকার কর্তৃক এই সন্দেহের নিরাকরণ হইয়াছে। তিনি জয়পুর রাজ্যের দলিলপত্রের মধ্যে কতকগুলি হিন্দি চিঠিপত্র আবিষ্কার করেন। এই পত্রগুলির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কবি পরমানন্দ খ্রীঃ ১৬৬৬ অব্দের গ্রীষ্মকালে শিবাজীর সহচর হিসাবে আগ্রা ও দিল্লীতে ঔরঙ্গজেবের রাজসভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিবাজীর সহিত যে কবি পরমানন্দের পরিচয় ছিল তাহা এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহাতে কবিতাটীর ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুপুরাণের দুই তৃতীয়াংশ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; যদি কবিতাটী সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে ইহা শিবাজীর জীবনী রচনার একটী বিশ্বাসযোগ্য উপাদানরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৩) চীনাধর্ম কি?

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি. এল্.

অধ্যাপক তান ইউন সান্ (Prof. Tan Yun-Shan) কলিকাতায় অনুষ্ঠিত Parliament of Religions এ "What is Chinese Religion ?" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন, 'খ্রীস্ট ধর্ম কি ও মুসলমান ধর্ম কি' এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যদি বলি যীশুখ্রীস্ট প্রবর্তিত ধর্মের নাম খ্রীস্টধর্ম ও হজরত মহম্মদ কর্তৃক স্থাপিত ধর্মের নাম মুসলমানধর্ম তাহা হইলে—কথাটার একটা অর্থ হইতে পারে। কিন্তু চীনাধর্মের সম্বন্ধে যদি বলি চীনদেশের ধর্মের নাম চীনাধর্ম; তাহা হইলে এই কথার কোন অর্থই হয় না। হিন্দুধর্মের ন্যায় চৈনিকধর্ম একজন মহাপুরুষ বা ঋষি কর্তৃক স্থাপিত ধর্ম নয়। চীনাদেশের প্রাচীন দেশীয় ধর্ম বলিতে এখন আমরা 'কন্‌ফিউসিয়াস' (Confucius) এবং 'লেওট্‌সী' (Laotse) কর্তৃক প্রবর্তিত ভাবধারা বুঝি। চীনে 'তাওধর্ম' নামে একটী ধর্মের কথা শুনা যায়—তাহার প্রবর্তনকারী যে কে, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। অনেক বলেন খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে Chang-Tao-Ling এর সহিত তাওধর্মের প্রবর্তন দেখা যায়। তাওধর্মে যে 'ডাইনী-বিদ্যা' 'যাদুবিদ্যা' প্রভৃতি কতকগুলি নিকৃষ্ট-স্তরের প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয় তাহার সঙ্গে প্রকৃত ধর্মের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এবং লেওট্‌সী প্রবর্তিত তাওধর্মের শিক্ষায় এই সমস্ত প্রক্রিয়ার কোন স্থান নাই।

ভারতের ন্যায় চীনের সভ্যতাও অতি প্রাচীন। ইহার ধর্মও তাহা হইলে অতি প্রাচীন। প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেখা যায় যে চীনের লোকেরা 'প্রকৃতি উপাসক'। স্বর্গ, মর্ত, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মেঘ, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারসমূহ ও পর্বত, নদী প্রভৃতি পার্থিব বস্তুসকল তাহাদের পূজার বস্তু ছিল। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, প্রজা সকলেই বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নৈসর্গিক ব্যাপার পূজা করিত। স্বর্গই তাহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা উচ্চ দেবতা ছিল, কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে পার্থিব সুখ, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ সমস্তই স্বর্গ কর্তৃক পৃথিবীতে সংঘটিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ধর্মগ্রন্থে নিজ নিজ বিশ্বাসানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা আছে। চীনধর্মেও সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা আছে। হিন্দুপুরাণাদিতে ব্রহ্মা কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির নানারূপ আখ্যান বর্ণিত আছে। চীনাধর্মেও আছে যে জগতের সৃষ্টিকর্তার নাম 'Pan-ku'। এই দেবতার সাত হাত ও আটপা এবং তাহার বয়স আঠার হাজার বৎসর। কিন্তু 'Pan-ku' এর আখ্যান চীনের প্রাচীন উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বোধহয়—জনপ্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মনোরম আখ্যানটী গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য ধর্মে যেমন দেখা যায় যে, সেই সেই ধর্মের কোন মহাপুরুষের জন্মের সহিত কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত, চীনধর্মেও এবিষয়ে নানারূপ কিংবদন্তীর অভাব নাই। Huang-Ti জন্মের পূর্বে তাঁহার

মাতা বিদ্যুৎদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ সান (Shun) জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে তাঁহার মাতা একটী সুন্দর রামধনু দেখিয়াছিলেন। দার্শনিক লেওট্সীর মাতা উল্কা পতন দেখিবার পরে তবে তাঁহার গর্ভে লেওটসীর জন্ম হয়। কনফিউসিয়সের জননীও তাঁহার পুত্রের জন্মের পূর্বে স্বপ্নে এক কৃষ্ণদেবতার দর্শন পান। এইরূপ অনেক সুন্দর গল্প আছে। কিন্তু এগুলি যে কতদূর সত্য সেসম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই সকল কাহিনী কিংবদন্তী ছাড়া কিছুই নহে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় অতি প্রাচীনকালে চীনধর্মের মধ্যেও দেখা যায় যে ধর্মযাজকগণ লোকের সুখদুঃখ সম্বন্ধে ভবিষদ্‌বাণী করিতেছেন। এই বিষয়টী চীনের প্রাচীনতম গ্রন্থ "Yi-ching"এ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীনকালের চীনাদের ধর্ম বলিলে আমরা মোটামুটি উপরিলিখিত বিষয়গুলি বুঝি। পরে কালেরগতিতে চীনে প্রকৃতি পূজার স্থলে 'বীরপূজা' এবং 'পিতৃপুরুষপূজা' প্রবর্তিত হইল। পূর্বে যে সমস্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে পূজা করা হইত তাহার নাম 'বীরপূজা' এবং অনেক সময় নিজের বংশের পূর্বপুরুষগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যেও পূজা করিতে দেখা যায় তাহাই পিতৃপুরুষ বা বাস্তুপুরুষ পূজা। পরে চীনে চাও বংশের রাজত্বের শেষ-দিকে (খ্রীঃ পূঃ ৭৭০-২৪৭) যখন লেওট্সী এবং কনফিউসিয়াস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন চীনের ধর্মে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটিল। লেওট্সীই প্রথমে স্বর্গ ইত্যাদি পূজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দার্শনিক কারণ নির্দেশ করিয়া 'প্রাকৃতিক দর্শন' নামে মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তিনি বলেন—পৃথিবী ও স্বর্গের সৃষ্টিরপূর্বে এমন একটি জিনিস ছিল যাহা আকারবিহীন, গোপনীয়, পরিবর্তনবিহীন এবং অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মাণ যাহাকে আমরা এই বিশ্বপ্রকৃতির জননী বলিতে পারি' ইহা যে কি, তাহা বলা যায় না—উপাধিবিহীন, ইহাকে আমরা 'Tao' বা মহতী প্রক্রিয়া (Great process) বলিতে পারি। ইহাই লেওট্সী প্রবর্তিত Taoismএর মূল ভিত্তি। তিনি বলেন, স্বর্গ ও মর্ত প্রভৃতি জগৎ সৃষ্টি প্রাকৃতিক ব্যাপার—এই মহতী প্রক্রিয়ার ফল। ইহাতে স্বর্গের বা ভগবানের কোনওরূপ ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পারে না। তাহা হইলে মানবের পক্ষে প্রকৃতির নিয়ম সকল অনুসরণ করাই প্রকৃষ্ট উপায়। প্রকৃতির তালে তাল মিলাইয়া যাইতে পারিলেই মানব সুখ শান্তি পায়। তাওধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের ইহা সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পরে Confucius আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত, প্রভৃতি নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক ব্যাপারে কোনওরূপ দৃষ্টি দিলেন না। মানবের দৈনন্দিন জীবনধারা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং সেইদিকেই তিনি তাঁহার দৃষ্টি প্রদান করিলেন। কনফিউসিয়াস প্রবর্তিত ধর্ম মানবতার ধর্ম। একবার তাঁহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ঈশ্বর সেবার উপায় কি? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—মানব সেবা কিরূপে করিতে হয় তাই যখন জাননা, তখন ঈশ্বরসেবার পন্থা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? আর এক শিষ্য এক সময়ে তাঁহাকে মৃত্যুসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—জীবন সম্বন্ধেই তোমার জ্ঞান যখন অল্প

তখন মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। মানবজীবনকে সার্থক করাই তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদের মুলতত্ত্ব। তা' বলিয়া তিনি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন তাহা নহে। কনফিউসিয়াসের মতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সুন্দরত্বের ও শিবত্বের অধিকারী হওয়া, সেইকারণ তিনি উপদেশ দিয়াছেন—মানব বিশ্বস্ত ও বিনীত হইবে, সর্বদা সত্যের আশ্রয় লইবে—পবিত্রতা রক্ষা করিবে এবং সর্বোপরি আত্মোৎকর্ষ সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সংক্ষেপতঃ ইহাই কনফিউসিয়াসের ধর্মমত এবং ইহাই চীনদেশের দেশীয় ধর্ম।

বর্তমানে অনেক বৈদিশিক ধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম, তাহার পর খ্রীস্টীয় ধর্ম এবং শেষে মুসলমান ধর্ম চীনদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছে। চীনের দেশীয় ধর্মও এই বৈদেশিক ধর্মগুলিকে বেশ সহজে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোথায় কোন মারামারি বা কাটাকাটি দেখা যায় না। এই তিনটি বৈদেশিক ধর্ম ছাড়া চীনের কোন কোন স্থানে জরথুশ্‌ত্র ধর্মের (zoroastrianism) প্রভাব দেখা যায়।

চীনধর্মের চারিটি মুলমন্ত্র :—

(১) মানবজীবনের উদ্দেশ্য সমগ্র সৌন্দর্যের ও শিবত্বের অধিকার লাভ।

(২) সৌন্দর্যও শিবত্বলাভের একমাত্র উপায় আত্মোৎকর্ষ সাধন,।

(৩) সমষ্টিগতভাবে একীভূত হওয়ার নামই মানবতা। মানবতার উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির কল্যান সাধন যাহাকে চীনদেশে Ta-Tung or Great Harmonization বলে।

(৪) সর্বশেষে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমানবতা। সমস্ত বিশ্ব ও সমস্ত জীবের মিলনই চৈনিক ধর্মের চরম লক্ষ্য। "First, all men are our brethren and all beings are our friends; then Heaven and Earth co-exist with men, and all beings are one"—ইহাই চীনা ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা।

বিবিধ সংবাদ

(১) পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি

সমগ্র মানব জাতিকে ৫টী প্রধান জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো, মালয়, আদিম্ আমেরিকান্। এই জাতি বিভাগ শরীরের বর্ণানুযায়ী যেমন—(১) ককেশীয় বা ভারত-ইউরোপীয় জাতি, সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। ভারতের ও ইউরোপের আর্যজাতি, পারস্যের, আফগানিস্থানের এবং উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী ও ইহুদী এই ককেশীয় জাতির অন্তর্গত। বর্তমানে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরাও এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

(২) মঙ্গোলীয় জাতি পীতবর্ণের—চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশীয়, তিব্বতীয় ও কোরিয়াদেশবাসী এই জাতির অন্তর্গত।

(৩) নিগ্রোজাতি পিঙ্গলবর্ণের—ইহারা আফ্রিকার আদিম অধিবাসী।

(৩) মালয়জাতি – পিঙ্গল ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত।

(৫) আদিম আমেরিকান্—ইহারা রক্তবর্ণের ও আমেরিকার আদিম অধিবাসী। নিম্নে পৃথিবীতে কোন জাতির কতসংখ্যা তাহার ১টী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

(১) ককেশীয় – এশিয়া ও ইউরোপে – ৭ কোটি ২৫ লক্ষ

(২) মঙ্গোলীয়—এশিয়াতে – ৬ কোটি ৮০ লক্ষ

(৩) নিগ্রো—উত্তর আফ্রিকায়—১ কোটী

(৪) মালয় – ওসানিয়া প্রভৃতিতে ১ কোটী ৪½ লক্ষ

(৫) আদিম আমেরিকান্—আমেরিকায় – ৩০ লক্ষ

এতদ্ব্যতীত উত্তর আমেরিকায় যে সেমিটিক জাতি আছে (যাহা হইতে ইহুদী প্রভৃতি উদ্ভূত) তাহাদের সংখ্যা ১ কোটী।

(২) মানব সভ্যতার স্তর

ভূতত্ত্ববিদেরা মানব সভ্যতার কয়েকটী স্তর বা যুগ নির্ধারণ করিয়াছেন যথা—

(১) পাথর যুগ—যে সময় মানুষ পাথরনির্মিত দ্রব্যাদি দ্বারা আত্মরক্ষাদি কার্য করিত। ইহা আবার ৩ ভাগে বিভক্ত, যথা—

(ক) ইওলিথিক্ যুগ (Eolithic Period) অর্থাৎ পাথর যুগের প্রথমাবস্থা ইহার আদি খৃঃ পূঃ ৬ লক্ষ বৎসর ধরা যাইতে পারে।

(খ) পাথরযুগের দ্বিতীয়াবস্থা (Palæolithic Period)–ইহার শেষ সময় প্রায় খৃঃ পূঃ ১০ হাজার বৎসর।

(গ) নূতন পাথর যুগ (Neolithic Period) ইহার শেষ সময় পরবর্তী আরও ৫ হাজার বৎসর ধরা যাইতে পারে।

(২) মৃত্তিকা যুগ – ইরাক ও প্রাচীন মিশর প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খননাদি দ্বারা যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা খৃঃ পূঃ ১০ হাজার শতাব্দীর ; এই সময়ে মানব কৃষি কার্যাদি আরম্ভ করে।

(৩) ব্রঞ্জযুগ (Bronze age)—যে সময় মানব তাম্রাদি হইতে যন্ত্রনির্মাণ আরম্ভ করে। ইহার সময় খ্রীঃ পূঃ ৫ হাজার হইতে ২ হাজার শতাব্দী।

(৪) লৌহযুগ (Iron age)–লৌহাদির ব্যবহার সে সময় মানব শিক্ষা করে। চীন, আসিরীয়া, মিশর প্রভৃতি স্থানে ইহার নিদর্শন ৪ হাজার খ্রীঃ পূঃ এ পাওয়া যায় এবং ইউরোপে ১ শত খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই যে মানব সভ্যতার স্তর বা যুগ ইহা কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র এক সময়ে নহে। সপ্তসিন্ধু বা প্রাচীন ভারতে সভ্যতার বিকাশ যে বহু সহস্র শতাব্দী পূর্বে হইয়াছে তাহার নিদর্শন ঋগ্বেদ সংহিতা। ভূতত্ত্ব-প্রমাণ দ্বারাই পাওয়া যায় যে বৈদিক সভ্যতার আদি অন্ততঃ ১০ হাজার খৃঃ পূঃ অব্দ।

আমাদের কথা

গতমাসে পুণার ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে মহীশূরের স্যর এম্. বিশ্বেশ্বরায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন উহা প্রণিধানযোগ্য। স্ত্রীলোকদিগের গৃহস্থালী বিদ্যাশিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অধ্যাপক ডি. কে. কার্ভে প্রতিষ্ঠিত এই একটী মাত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বর্তমানে শিক্ষাপ্রসারের যুগে এই প্রকার আরও কয়েকটী মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য যে মাতৃভাষা (ঐস্থানে গুজরাঠী ও মারাঠী ভাষা) দ্বারা শিক্ষা দান করা হয়। ইহাতে শিক্ষাদান যে কত শীঘ্র হয় তাহা বলা বাহুল্য।

*　　*　　*　　*

ভারতে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য হিন্দুমহাসভা আছে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ-এ মিঃ এম. এস. আনের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দু লীগের প্রথম বার্ষিক একটী অধিবেশন হয়। রাজনীতি-মূলক এইরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মূল প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কতকটা নষ্ট হয়। আমাদের দেশে একই বিষয়ে কয়েকটি করিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় অথচ জাতীয় উন্নতির জন্য এমন বহু বিষয় রহিয়াছে যাহা দেশের নেতাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অবশ্য কতকগুলি বিষয়ে, যেমন গ্রাম্য উন্নতিবিধান, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি এত অধিক কাজ করিবার আছে যাহা এক বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভবপর নয়। এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু যদি একটি করিয়া কেন্দ্রীয় সমিতি থাকে তবে কাজগুলি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা এক্ষেত্রে উপরিউক্ত হিন্দুলীগের বিষয় বিশেষ করে লক্ষ্য করিতেছি না—বক্তব্য এই যে এই কার্য হিন্দু মহাসভার দ্বারাও করিতে পারা যাইত।

*　　*　　*　　*

প্রাচীন হিন্দুজাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি এক সময়ে গ্রীস, ইতালী, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল এবং ঐ সব দেশের কৃষ্টি ভারতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়াছিল। ইহা পৃথিবীর পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চমনলাল-কৃত একখানি পুস্তক "হিন্দু আমেরিকা" প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন প্রাচীন আমেরিকা মহাদেশেও হিন্দুসভ্যতা বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পূর্বে কেদারনাথ বসুকৃত একখানি পুস্তকে "Hindu Civilisation in Ancient America" এই সব বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা আছে। আশাকরি ভবিষ্যতে গবেষণার দ্বারা এই বিষয়ে একটি স্থিরমত স্থাপিত হইবে।

*　　*　　*　　*

মাত্র ২ মাস পূর্বে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মাননীয়

লর্ড সিংহ কর্তৃক একটী আন্তর্জাতিক কৃষ্টি পরিষদ (International Federation of Culture) স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্যে অনেকেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। ইহার পরিচালিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকার India and the World—দুইটী সংখ্যা ইতিমধ্যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। এই পরিষদের উদ্যোগে আরও কয়েকটী একত্র সংশ্লিষ্ট পরিষদ স্থাপিত হইতেছে যথা—(ক) International Federation of Women (আন্তর্জাতিক মহিলা পরিষদ)—মাননীয় লেডি সিংহ ইহার সভানেত্রী মনোনীতা হইয়াছেন। পল্লীগ্রামস্থ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, কুটীরশিল্প প্রচার, স্বাস্থ্যনীতি প্রচার, সামাজিক কুসংস্কার বর্জন ইত্যাদি গঠনমূলক কার্য ইহার উদ্দেশ্য। (খ) International Social Service League (আন্তর্জাতিক সমাজসেবা পরিষদ) সমাজ ও জনহিতকর অনেক কার্যপদ্ধতি ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে। (গ) International Parliament of Religions (আন্তর্জাতিক ধর্ম পরিষদ) পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মূলনীতি অবলম্বন দ্বারা যাহাতে ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির বন্ধন হয় এবং ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ না হয় তাহাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর বর্তমান দুর্দিনে এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়কে—কৃষ্টি, ধর্ম, সমাজসেবা ইত্যাদি কেন্দ্র করিয়া আন্তর্জাতিক মহামিলনের এই সব প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে ইহাদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। আমরা ইহাদের সফলতা কামনা করি।

* * * *

বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে শ্রীভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত হইল। ভারতীয় জ্ঞান, কৃষ্টি, ও শাস্ত্রপ্রচার করাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে বর্তমান ভারত শুধু ধর্ম ও জ্ঞানে নহে পরন্তু শৌর্য, বীর্য ও অর্থসম্পদের দিক্ দিয়াও একটি মহাগৌরবান্বিত জাতিতে পরিণত হয় সেজন্য জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির পদ্ধতি বিষয়েও ইহাতে গৌণভাবে কিছু কিছু আলোচিত হয়। ইতিমধ্যে এই পত্রিকা শিক্ষিত সমাজের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আশা করি বাংলা ভাষাসেবী ও দেশসেবী সহৃদয় ব্যক্তিরই সহানুভূতি লাভ করিয়া ইহা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

* * * *

সম্প্রতি দানবীর শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা মহোদয় যাহাতে হিন্দী ভাষাতে ভারতের ধর্ম, জ্ঞান ও কৃষ্টি এবং গবেষণা প্রচারিত হয় তাহার জন্য ইন্‌স্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীলের নিকট একটী হিন্দী ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। বিরলাজী ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিবেন। আমরা এই প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দিত হইতেছি, কারণ এই প্রকার মাসিক পত্রিকা হিন্দীভাষায় একান্ত বিরল।

পুস্তক সমালোচনা

পঞ্চাঙ্গ-দর্পণ—শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম্.এ. প্রণীত; ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাঙ্ক :—১৷৹+৭২; মূল্য ১৷৹

আমরা এই পঞ্চাঙ্গদর্পণ নামক করণগ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকর্তা শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী পঞ্জিকা গণনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; তিনি আজ ৭।৮ বৎসর যাবৎ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনার পরিচালকভাবে কার্য করিতেছেন। বর্তমান গ্রন্থ পঞ্জিকা গণনা বিষয়কই বটে এবং ইহা গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই গণনা-সৌকর্যার্থে তিনি দেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিদ রামশর্মা-কৃত দিনকৌমুদী এবং রাঘবানন্দ-কৃত দিন চন্দ্রিকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

পঞ্জিকা বা পঞ্চাঙ্গ কোনও দিনের বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই ৫টী নির্দেশ করে। শ্রীযুত নির্মলবাবু তিথি গণনায় দিনকৌমুদীর ও নক্ষত্র গণনায় দিনচন্দ্রিকার পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া যোগের গণনায় নিজস্ব অভিনব পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। শুধু পঞ্চাঙ্গ ছাড়া রবি ও চন্দ্রের রাশি সংক্রমণ, দিনমান ইত্যাদি অন্য বিষয় যাহা রবি ও চন্দ্রের অবস্থিতি দ্বারা সিদ্ধ হয় তৎসমস্ত নিরূপণের পদ্ধতি দিয়াছেন। এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে দিনকৌমুদী ও দিনচন্দ্রিকা গ্রন্থদ্বয়ের ন্যায় বর্তমান গ্রন্থেও রবি ও চন্দ্রের স্পষ্টাবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় নাই, যদিও তাহা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।

তিথি নক্ষত্রাদি গণনায় বর্তমান গ্রন্থে সূর্যের একটী সংস্কার এবং চন্দ্রের ২৫।২৬টী সংস্কার গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সংস্কারগুলির সবই সম্পূর্ণ আধুনিক কালের জন্য পরিশুদ্ধ এবং Newcomb ও Brown নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কর্তৃক পরিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত। আমরা দেখিতেছি এই গ্রন্থমতে তিথ্যাদির গণনা সমস্ত বৎসর-ব্যাপী করিয়া গেলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কিছুই আসে না। আর ইচ্ছামত কোনও বৎসরের কোনও একদিনের পঞ্চাঙ্গ গণনা করিতে গেলে তারিখ বিষয়ে ১দিন অগ্রপশ্চাৎ আসিতে পারে; কিন্তু বার শুদ্ধরূপে আইসে বলিয়া অভীষ্ট দিবসের তারিখ পরিশুদ্ধ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপে ৫৫ পৃষ্ঠায় নক্ষত্র গণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দ্রে ২৫।২৬টী সংস্কার গৃহীত হইয়াছে বলিয়া তিথি, নক্ষত্রাদির স্থিতিকাল বিষয়ে ২।১ পলের অধিক ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। যে প্রকার শ্রমলাঘবের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই সামান্য অনৈক্য উপেক্ষা করা যাইতে পারে। ৺বেঙ্কটেশবাপুজী কেতকর মতে যে সকল পঞ্চাঙ্গ ইন্দোর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারিত হইতেছে তাহাতে চন্দ্রে মাত্র ৫টী সংস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা সেই পঞ্জিকায় (ভারতবিজয় পঞ্চাঙ্গ) তিথ্যাদির অন্তকালে ১৮।১৯ মিনিট ভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়াছি। এমতাবস্থায় শ্রীযুত নির্মল বাবু কর্তৃক পঞ্চাঙ্গ দর্পণ সর্বদাই ব্যবহারযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকার সংস্কার বিষয়ে যাহাদের উৎসাহ আছে,

তাহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে এই গ্রন্থখানি ব্যবহার করিয়া নূতন পরিশুদ্ধ পঞ্জিকার প্রচার করিবেন। যাঁহারা দিনকৌমুদী এবং দিনচন্দ্রিকা অবলম্বনে পঞ্চাঙ্গ প্রস্তুত করিতেছেন তাঁহাদের নিকট এই পদ্ধতি কিছু নূতন বলিয়া বোধ হইবে না; বিশেষতঃ নাবিক পঞ্জিকা এদেশে না আসিলেও যে ব্যবহারযোগ্য পরিশুদ্ধ পঞ্জিকার প্রণয়ন এতদিন অসম্ভব বলিয়া আশঙ্কা হইতেছিল বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশে তাহার নিরাকরণ হইল, ইহাই আমার বিশ্বাস। পঞ্জিকা সংস্কারের পক্ষপাতী আমরা এই গ্রন্থের বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকার গণনায় সর্বত্র ব্যবহার হইতেছে দেখিলেই আনন্দিত হইব। তাহাতেই গ্রন্থকারেরও শ্রম সফল হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থের মুদ্রণ এবং প্রকাশ বিষয়ে আমরা এস্থানে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল, এম্. এ., বি. এল্. এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

A Warning to the Hindus. By Savitri Devi. Published by Hindu Mission. Price Re. 1-4 Pages XXV+154.

আলোচ্য পুস্তকখানিতে হিন্দু সমাজের নানা সমস্যার আলোচনা আছে। খ্রীস্টীয় ও মুসলমান ধর্মের প্রচারের ফলে হিন্দু সমাজ যে ক্ষয়িষ্ণু তাহা বিশেষভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। অনেকে মোটামুটিভাবে হিন্দু সমাজের দুর্গতির কথা অবগত হইলেও ইহার পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ ও তাহার প্রতিকারের উপায় কি সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নহেন। গ্রন্থকর্ত্রী গ্রীস দেশের অতীতের সহিত ভারতের বিশেষতঃ বাঙলার বর্ত্তমান সময়ের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া ইহার স্বাভাবিক পরিণতি অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর কিরূপে দিনের পর দিন হিন্দু আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে ও অবশেষে "পর" হইয়া যাইতেছে গ্রন্থকর্ত্রী সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। লেখিকা খুব দরদ দিয়া বইখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা অতি সুন্দর। ভাবিবার কথাও অনেক আছে। গ্রন্থকর্ত্রী গ্রীকমহিলা হিন্দুধর্মে দীক্ষিতা। তাঁহার সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিতে হিন্দু জাতির জাগরণ হইলে হিন্দু সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীনলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। ময়মনসিংহ, গৌরীপুর হইতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+১২+১৪৪। তিনখানি চিত্র-সম্বলিত, তন্মধ্যে গ্রন্থসূচনায় একখানি চিত্র মিঞা তানসেনের। মূল্য এক টাকা মাত্র।

একজন বিশিষ্ট সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ হিসাবে গ্রন্থকার বীরেন্দ্র বাবুর প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা এবং সংগ্রহনিষ্ঠা বাঙলার শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নয়। আলোচ্য গ্রন্থখানির রচনা-ব্যাপারে তিনি যে যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে অত্যুক্তি করিবার কিছুই নাই। তানসেনের (বা তানসনীর) জীবনী এবং সেনী-সংস্কৃতির ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের

তথ্য পরিবেষণ করিতে হইলে যে পরিশ্রম ও সংগ্রহশীলতার প্রয়োজন তাহা গ্রন্থকারের পক্ষেই সম্ভব। বইখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া যেরূপ ধারণা হইল, তিনি বিশেষ পরিশ্রমসহকারেই ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন—মৌলিকতা ও তথ্যসম্ভারের দিক্ দিয়া বইখানি মূল্যবান্ হইয়াছে।

ভারতের সর্বত্র—আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলের মুখেই তানসেনের নাম শোনা যায়। এরূপ প্রসিদ্ধি ও লোকপ্রিয়তা ভারতের আর কোনও সঙ্গীত-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি লাভ করেন নাই। এই প্রসিদ্ধির মূল কারণ এই যে, ভারতীয় সঙ্গীত-প্রগতির আবর্তনে তিনি এমন একটা প্রবাহ আনিয়া দিয়াছেন যাহার ফলে স্তরে স্তরে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ চলিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতে তিনি এই নবযুগের স্রষ্টা। তাঁহার পূর্বে বা পরে বা তাঁহার সমসাময়িক আরও অনেক গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং যে প্রতিভার গুণে তিনি সঙ্গীতসাধনার 'রেনেসাঁ'র প্রবর্তন করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে সেরূপ আর দেখা যায় না। এই তানসেন সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের যথার্থই অভাব ছিল। গ্রন্থকার সেই অভাবপূরণেরই প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য তানসেনের ব্যক্তিগত জীবনচরিত ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তানসেন এবং তাঁহার বংশধর ও ঘরয়ানা হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যে প্রভাব আসিয়াছে তাহাই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে একটু ত্রুটি আছে। 'হিন্দুস্থানী' বলিতে গ্রন্থকার কি বোঝেন, তাহা পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তথাকথিত 'ক্লাসিক' সঙ্গীতকে তিনি হিন্দুস্থানী বলিয়াছেন বা সমগ্র ভারতীয় (অর্থাৎ, হিন্দুস্থানের) সঙ্গীত সংস্কৃতিকে বলিয়াছেন, তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা গেল না। আমরা জানি (গ্রন্থকারও যথেষ্ট সন্ধান দিয়াছেন), তানসেনের ঘরয়ানা হইতে যে সমুদয় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি সমগ্র ভারতেই আদৃত হইয়াছে; সঙ্গীত-কলা রাগরাগিনীর দিক্ দিয়া তাঁহার যে প্রভাব তাহা প্রায় সমগ্র ভারতেই অল্পবিস্তর বিস্তৃত হইয়াছে, এমন কি যেখানে 'ক্লাসিক' সঙ্গীতকে এড়াইয়া নূতন নূতন সঙ্গীতের ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানেও কিছু না কিছু প্রভাব আছে। অবশ্য গ্রন্থকার তাঁহার বিষয়বস্তুর মধ্যে তানসেন ও তাঁহার বংশধরদের প্রভাব ও দানের কথা বিশদভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং তাহাতে যে আদর্শ তিনি উদ্ঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত প্রভাবেরই মোটামুটি সমর্থন আছে; ছোটখাটো প্রভাবের দিকে নজর দেওয়া তিনি বোধহয় প্রয়োজন মনে করেন নাই।

মুসলমান-যুগের ইতিহাসের সন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে প্রধানতঃ সে-যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু সে গ্রন্থগুলি অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত ও পক্ষপাতদুষ্ট। সুতরাং সেই গ্রন্থগুলির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিতে গেলে ভুল বা ত্রুটি অজ্ঞাতসারেই আসিয়া পড়ে। সম্রাট্ আকবরের দরবারে বা তাঁহার পরবর্তী সম্রাট্‌দের সময়ে যে গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল সেগুলি এই ত্রৈটি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। সুতরাং সেগুলি হইতে তথ্য আহরণ করিতে গেলে তুলনামূলক

গবেষণার প্রয়োজন হয়। অবশ্য তাহাতে অসুবিধাও বেশ আছে। সেক্ষেত্রে যে পরিশ্রমের দরকার তাহা সহজসাধ্য নয়। এদিক্ দিয়া গ্রন্থকার ত্রুটি না রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তবে পরবর্তী সংস্করণে যাহাতে তিনি অধিকতর অগ্রসর হন, তাঁহার মত বিশিষ্ট গুণী ও অনুসন্ধানীর নিকট সেরূপ আশা করিবার দাবী করা যাইতে পারে। প্রকাশকও তাঁহার নিবেদনে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানিকে অধিকতর শোভনীয় ও সংস্কৃত করিবার আশা দিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে যে তাহা হইবে, এরূপ বিশ্বাসও আছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সাহিত্য-সমাজে যথাযোগ্য আসনলাভ করিবে এবং আশা করি, শিক্ষিত সাধারণ, সঙ্গীততত্ত্ববিৎ ও সঙ্গীতরসিকদের মধ্যে ইহা বিশেষ সমাদর পাইবে।

শ্রীঅজিত ঘোষ

নূতন গ্রন্থ-সংবাদ

প্রত্নতত্ত্ব

১। Annual Report of the Archæological Department, Baroda State for the year ending 31st July, 1938.

—Dr. Hirananda Sastri, M. A.—বরোদা।

ইতিহাস

২। Foreign Notices of South India : from Megasthenes to Ma Huan —Collected and edited by Mr. K. A. Nila-Kanta Sastri,— (Madras Uiversity Historical Ser. No. 14)—মান্দ্রাজ।

৩। Marwar—Ka Itihas—A History of Marwar. Vol I—By Visvesvarnatha Reu—যোধপুর।

৪। Dafter diwani o mal o mulki Sarkar i 'ali. Photographic plates reproducing specimens of old official documents of historical interest. Persian and Hindustani. হায়দরাবাদ।

ধর্ম ও দর্শন

৫। Contributions to the history of Brahmanical Asceticism (Samnyasa) (Poona Oriental Ser. No. 64) —Dr. H. D. Sharma. পুণা।

৬। The Message of Islam—by Mr. A. Yusuf Ali. লণ্ডন।

৭। The Gospel of Zoroaster—Mr. M. C. Parekh, রাজকোট

বিবিধ

৮। মহাভারতের কথা—স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা।

৯। Acārya Puspānjali Volume (in honour of Dr. D. R. Bhandarkar. M.A., Ph. D., F. R. A. S. B)—Edited by Dr. B. C. Law, M. A., B.L., Ph. D., F. R. A. S. B. and published by the Indian Research Institute, Calcutta.

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্. কর্তৃক সঙ্কলিত

Journal of Indian History, Vol. X. 1931

The Prince of Wales Museum Inscription of Jayakesi III, the Kadamba king of Goa—by B. C. S. Sharma, M. A.

উক্ত প্রবন্ধে কদম্বরাজ তৃতীয় জয়কেশীর উৎকীর্ণলিপির মূল ইংরেজী অক্ষরে লিখিত ও তাহার অনুবাদ আছে। এই উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধারের দ্বারা প্রবন্ধ লেখক কলিযুগের উৎপত্তির কালনির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

The Historical Origin of the Distinction between Svarthanuman and Pararthanuman—by Dr. Saileswar Sen (Annamalai University)—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা। Stcherbatskoiএর মতে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের প্রভেদজ্ঞান বৌদ্ধন্যায়দর্শন হইতে উদ্ভূত এবং এই মত Dr. A. B. Keith কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

The Arab Invasion of India—by Dr. R. C. Majumdar M. A. Ph D. মুসলমান কর্তৃক ভারত আক্রমণের দ্বারা ভারতের ইতিহাসে একটী চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। উক্ত প্রবন্ধে মুসলমান কর্তৃক্ ভারতাক্রমণের একটী বিস্তৃত আলোচনা আছে।

Half a Century of the Maratha Navy (Readership Lectures to the Calcutta University, 1931)—by Dr. Surendranath Sen, M.A., Ph.D., B. Lit—মরাঠা নৌ বহরের ইতিহাসের একটী অধ্যায়। শিবাজী মারাঠানৌবহরের প্রতিষ্ঠাতা।

A Puzzle in Indian Epigraphy—by Prof. K. M. Shembavnekar, M, A,—সম্বৎ অব্দ রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল কিনা সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা।

সাময়িক সাহিত্য—আষাঢ়, ১৩৪৭

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—বৈষ্ণব সাহিত্যে রস—শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, কাব্য-বেদ-পুরাণতীর্থ।

উদ্বোধন—জীবনের লক্ষ্য—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

,, —"যত মত তত পথ"—অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ।

সাহিত্য

প্রবাসী—পরশ পাথর—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

বঙ্গশ্রী—উত্ত . বঙ্গের কবি জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী।

উদ্বোধন—মানব—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্।

,, সমাজ-ধর্ম—শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

উদয়াচল—সংসার যোগ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন।

,, —আধুনিক সমাজ ও নারীপ্রগতি—শ্রীবিভূতি বসু।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—প্রাচীন বাঙলার বৌদ্ধবিদ্যানিকেতন—শ্রীকমলা রায়, এম্-এ

প্রবাসী—সমাজ বন্ধন—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

,, —বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন মঠ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

,, —আধুনিক মণিপুর—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ, এম্-এস্-সি।

বঙ্গশ্রী—যশোহর-পরিচিতি—শ্রীসুশীলকুমার বসু।

প্রত্নতত্ত্ব

বঙ্গশ্রী—বাংলার সংস্কৃতিতে পুতুল শিল্পের স্থান—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

,, —প্রাচীন বাঙলার ভাস্কর্যবিজ্ঞান ও তক্ষণ-শিল্প—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী।

বিবিধ

ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা—শ্রীসুশীলকুমার বসু।

,, —হিন্দি ও বিলিতি সুরের মিশ্রণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

,, —ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র—শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এম্-এস্-সি।

সাময়িক সংবাদ

গবর্ণরের গীতাভাষ্য—সিন্ধু প্রদেশের গবর্ণর স্যর ল্যান্সলট গ্রেহাম গীতার ইংরেজী অনুবাদ হইতে সিন্ধী ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। আগামী বৎসর গবর্ণর বাহাদুরের কার্যকাল শেষ হইবে। ইহার পর তাঁহার গীতা অনুবাদ কার্য শেষ হইবে এবং সিন্ধীদের মধ্যে বিনামূল্যে গীতা বিতরণ করিবেন।

রবীন্দ্র সম্বর্ধনা—গত ২২শে শ্রাবণ, বুধবার রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যাচার্য (D. Lit.) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসব সংঘটিত হয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গায়ার ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই কার্যের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈদিক মন্ত্রগীতিসহকারে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী—উনপঞ্চাশ বৎসর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাপ্রয়াণ করেন। সম্প্রতি কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থানে তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এবার বিদ্যাসাগর স্মৃতিপূজা উপলক্ষে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণ যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী করিয়াছিলেন, তাহা দর্শকমাত্রকেই সন্তোষ দান করিয়াছে। এইরূপ প্রদর্শনী দ্বারা সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ হয়।

কৃষি গবেষণা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিসম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রচারের উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন। বারাকপুরে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহাতে কৃষি সম্বন্ধীয় শিক্ষা ছাড়া গোপালন, পশুপালন, মৎস্যের চাষ, কুটীর শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

গ্রাম্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা—বাংলা সরকার গ্রাম্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বাংলার ৭টী মহকুমায় অবিলম্বে কার্য সুরু করিবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসক নিয়োগ করিয়া ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, বিদ্যালয় যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্যে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার আয়োজন হইয়াছে।

হলওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণ—হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিবৃতি দান করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বাংলা সরকার প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে মনুমেণ্টটি কলিকাতার কোনও গীর্জাপ্রাঙ্গণে অপসারিত করা হইবে।

अथ शरीर-ज्ञानार्थं स्वरविषयं वक्ष्यामः ॥१॥ तिस्रः प्रधाना नाड्यः ॥२॥ इड़ा पिङ्गला सुषुम्ना च ॥३॥ सव्ये इड़ा ॥४॥ दक्षिणे पिङ्गला ॥५॥ पृष्ठवंश-मध्ये सुषुम्ना ॥६॥

অনন্তর শরীর জ্ঞানের নিমিত্ত স্বরের বিষয় বলিব। (শরীরের মধ্যে) তিনটী প্রধান নাড়ী আছে। (যথা)—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। পৃষ্ঠবংশের অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না, (তাহার) বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা ॥ ১-৬ ॥

भ्रूमध्ये त्रिवेणी वाराणस्या अधः ॥७॥ नासापुटाभ्यां तिसृषु वायुः सतत्त्वश्चरति ॥८॥ प्रतिपदादि-तिथि- त्रितयेषु यथाक्रमं पुष्पवन्तौ ॥९॥ शुद्धे पूर्वं चन्द्रः ॥१०॥ कृष्णे रविः ॥११॥ सार्द्ध द्विघटिकान्तरं नाड़ीसंक्रमः ॥१२॥ चन्द्रसूर्य्ययोः परं अलक्ष्यगतिः सुषुम्नायाम् ॥१३॥ पञ्चदशपला ॥१४॥ पञ्च-पञ्च घटीभिर्मेषादिसंक्रमणम् ॥१५॥ विंशतिघट्यन्तरं गुणसंक्रमणम् ॥१६॥ सौम्ये शुभचन्द्रः ॥१७॥ क्रूरकार्य्ये रविः ॥१८॥ प्रस्तावतिलकधारणादि समस्ताप्य-कर्मसु चन्द्रः कार्य्यः ॥१९॥ भोजनशयनमैथुनादिसमस्ताग्नेय कर्मसु सूर्य्यः ॥२०॥

ভ্রূমধ্যে ত্রিবেণী বারাণসীর নিম্নে। নাসাপুটদ্বয়ের দ্বারা তিনটী ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ীপথে সতত্ত্ব বায়ু বিচরণ করিয়া থাকে। প্রতিপদাদি তিথি তিনটীতে যথাক্রমে পুষ্পবন্ত (?) হইয়া থাকে। প্রথম শুক্লপক্ষে চন্দ্র এবং কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য। সার্দ্ধদ্বিঘটিকান্তরে নাড়ী সংক্রমণ হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি অতীব অলক্ষিতভাবে সুষুম্নায় হইয়া থাকে। সেই গতি পঞ্চদশপলা। পঞ্চ পঞ্চ ঘটী দ্বারা মেষাদি রাশিতে সংক্রমণ হয়। বিংশতি ঘটীর পর গুণ-সংক্রমণ হয়। সৌম্যকার্য্যে চন্দ্র শুভ এবং ক্রূরকার্যে সূর্য। প্রস্তাব ও তিলকধারণাদি সমস্ত আপ্যকর্মে চন্দ্র প্রশস্ত এবং ভোজন, শয়ন ও মৈথুন প্রভৃতি আগ্নেয় কর্মে সূর্য প্রশস্ত ॥ ৭-২০ ॥

पृथिव्यादितत्त्वानां यथाक्रमं पञ्चचतुस्त्रिद्वि-एकमितेषु सशून्येषु पलेषु संक्रमणम् ॥२१॥ सुषुम्नायां अशून्येषु ॥२२॥ सुषुम्नायां न किञ्चिदपि कर्त्तव्यम् ॥२३॥ अन्यन्मोक्षविधायक-योगाभ्यासादिकर्मणः ॥२४॥ अन्यथा निष्फलत्वापत्तिः ॥२५॥ गुरुगम्यैकमार्गेण अखिलतत्त्वविद्भ्यः करुणार्णवेभ्यो विज्ञेयम् ॥२६॥

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের (ঈড়া ও পিঙ্গলাতে) যথাক্রমে ৫০, ৪০, ৩০, ২০ ও ১০ পলে সংক্রমণ হয় এবং সুষুম্নাতে যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২ ও ১ পলে (পঞ্চতত্ত্বের সংক্রমণ হয়)। সুষুম্নায় যখন সংক্রমণ হয়, তখন কিছুই করা উচিত নহে। তদ্ভিন্ন অন্যত্র সংক্রমণে মোক্ষসাধক যোগাভ্যাসাদিকর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে কর্ম নিষ্ফল হয়। এযাবৎ যে সকল কথা বলা হইল, এসকল অখিলতত্ত্ববিদ্ করুণাসাগর গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। গুরু তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত যে একটী উপায় নির্দেশ করেন, সেই উপায়েরই দ্বারা এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারা যায় ॥ ২১-২৬ ॥

निद्राक्षुधातृष्णाभयहर्षविषादवहानां नाड़ीनां तत्तत्कर्मणा समुद्रेकः ॥२७॥ समस्तयन्त्राणां प्रेरकः प्रमाता सूत्रधरः प्रारब्धकर्मेरितो वायुः कुण्डलीनिष्ठः ॥ २८ ॥ नाभ्यां समानेरितः पाचकाग्निसन्निधौ एको मणिमयः शिवलिङ्गः ॥ २९ ॥ तदास्ये मुखमाधाय सार्द्धत्रिवलयेन संवेष्ट्य सुप्तभुजगीव शङ्खावर्त्तवत् काव्यकलापहेतुभूता श्वासोच्छ्वासादिकारिणी स्थिता कुण्डली नाम्नी नाड़ी ॥ ३० ॥ मूलाख्यपृथ्वीचक्रस्थ-शिवोपरिस्थितेति केचित् ॥ ३१ ॥ तामुत्थाप्य सहस्रारस्थ-परमात्मनि संयोज्यैक-सामरस्यमनुभवन्ति योगिनः ॥ ३२ ॥ भिषजोऽपि केचित् ॥ ३३ ॥

নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, হর্ষ ও বিষাদ-বহা যে সকল নাড়ী আছে, তাহাদের ঐ সকল কর্মের দ্বারা সম্যক্ উদ্রেক হইয়া থাকে। (জীবশরীরে) যে সকল যন্ত্র আছে, যে সকল যন্ত্রের চালক বায়ু। বায়ুই সুখদুঃখাদির প্রমাতা অর্থাৎ অনুভূতির হেতু এবং সূত্রধর। এই বায়ু প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা চালিত হয়, উহা কুণ্ডলী-নিষ্ঠ অর্থাৎ নাভিমণ্ডলে বাস করে। ২৭-২৮।

নাভিদেহে সমানবায়ু দ্বারা চালিত যে পাচক অগ্নি আছে,—তাহার নিকটে একটী মণিময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গ আছে। তাহার মুখে মুখ দিয়া সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া শঙ্খের আবর্তের সদৃশ সুপ্তভুজগীর মত একটী নাড়ী আছে, উহা যাবতীয় কাব্যকলাপের হেতুভূত এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সম্পাদয়িত্রী, উহার নাম কুণ্ডলী (যাহাকে কুলকুণ্ডলিনী বলা হয়)। মূলাধার নামক পৃথ্বীচক্রে অবস্থিত শিবলিঙ্গের উপরে কুণ্ডলী বা কুলকুণ্ডলিনী নাড়ী অবস্থান করে—এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। সেই কুণ্ডলী নামক সুপ্তভুজগীসদৃশী নাড়ীকে প্রবুদ্ধ করিয়া সহস্রার-চক্রে অবস্থিত পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া যোগিগণ এবং কোন কোন ভিষক্‌ও একটী সামরস্য অনুভব করিয়া থাকেন অর্থাৎ সহস্রদলপদ্ম হইতে ক্ষরিত সুধা পান করিয়া থাকেন। ২৯-৩৩।

कुण्डल्या सह जीवात्मनो निरन्तरावस्थानं परमात्मसमाधिः ॥ ३४ ॥ मेध्यामनःसंयोगो निद्रा ॥ ३५ ॥ पुरीततीसंयोगः सुषुप्तिः ॥ ३६ ॥ तमोऽभिभूतेन मनसा जीवात्मनोमूढ़ावस्था सम्मोहः ॥३७॥ तस्मिन्नप्रतिक्रियमाणे तूर्णं प्राणापान-शृङ्खलनाशेन प्राणमोक्षः ॥ ३८ ॥ प्राणोत्क्रमणकाले यादृशी भावना तदनुरूपा-योनिः ॥ ३९ ॥ तस्मादनिशं ईश्वरचिन्तने यतितव्यम् ॥ ४० ॥ येनामृतत्व-प्राप्तिः ॥ ४१ ॥ दृश्यं सर्वं नश्वरं मत्वा सर्वज्ञः सर्वसाक्षी विभुर्ध्येयः ॥ ४२ ॥

इति प्राकृतिके प्राजापत्यसूत्रे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

কুণ্ডলীর সহিত জীবাত্মার নিরন্তর অবস্থানের নাম পরমাত্মসমাধি ॥ মেধ্যায় মনঃ-সংযোগে নিদ্রা এবং পুরীততীতে মনঃসংযোগে সুষুপ্তি। আর তমোগুণের দ্বারা অভিভূত মনের সহিত জীবাত্মার সংযোগে যে মূঢ়াবস্থা বা অভিভূত অবস্থার আবির্ভাব হয়—তাহার নাম সম্মোহ। সেই সম্মোহ অবস্থার প্রতিকার অতি শীঘ্র না করিতে পারিলে প্রাণ ও অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণের শৃঙ্খলানাশে প্রাণত্যাগ ঘটিয়া থাকে। প্রাণত্যাগ কালে যেরূপ ভাবনা বা চিন্তা হয়, তদনুরূপ (পরবর্তী কালে) জন্ম হয়। অতএব সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তার জন্য প্রযত্ন করা উচিত। যাহাতে অমরত্ব-লাভ হইতে পারে। এই বিশ্বে যাহা কিছু দেখা যায়—সবই নশ্বর মনে করিয়া সর্বজ্ঞ সর্বসাক্ষী বিভুর ধ্যান করা উচিত। ৩৪-৪২।

ইতি প্রাকৃতিক প্রাজাপত্যসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

अथ त्वगादिसंख्याभिधानं वक्ष्यामः ॥ १ ॥ त्वचः सप्त ॥ २ ॥ तासु प्रथमा अवभासिनीनाम। यवैकमिता रसधरा नाम ॥ ३ ॥ तस्यां रसजा व्याधयो विसर्पप्रभृतयश्च समुद्भवन्ति ॥ ४ ॥ द्वितीया असृग्धरा नाम यवार्द्धमिता ॥ ५ ॥ अस्यां रक्तजा व्याधयः कुष्ठविचर्चिकादयः ॥ ६ ॥ तृतीया मांसधराख्या ॥ ७ ॥ द्वियवमिता सर्वसिराधिष्ठाना मांसजा व्याधयोऽस्याम् ॥ ८ ॥ चतुर्थी मेदो-धराख्या ॥ ९ ॥ द्वियवमिता मेदोजा व्याधयोऽस्याम् ॥ १० ॥ पञ्चमी यवैक-मिताऽस्थिधरा नाम ॥ ११ ॥ तज्जा व्याधयोऽस्याम् ॥ षष्ठी मज्जधराख्या ॥ १२ ॥ मज्जरोगाधिष्ठाना यवैकमिता ॥ १३ ॥ सप्तमी शुक्रधरा ॥ १४ ॥ यवार्द्धमिता तज्जव्याध्यधिष्ठाना ॥ १५ ॥ इत्युक्ताः सप्त त्वचः। सर्वा एकैकं धातुमवष्टभ्य सर्वत्र सप्त वर्त्तन्ते ॥ १६ ॥

অতঃপর ত্বক্ প্রভৃতির সংখ্যা ও নাম বলা হইবে।১। সাতটী ত্বক্। তাহাদের মধ্যে প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী। ইহা একটী যবের মত স্থূল, ইহাকে রসধরা বলে, ইহাতে রসের বিকৃতিজন্য বিসর্প প্রভৃতি রোগ সকল জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয় ত্বকের নাম অসৃগ্‌ধরা। ইহা অর্ধ যবের মত স্থূল ইহাতে রক্তবিকৃতি জন্য কুষ্ঠ ও বিচর্চিকা প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় ত্বকের নাম মাংসধরা, ইহা দুইটী যবের মত স্থূল; শিরা সকল ইহাতে অবস্থান করে এবং মাংসের বিকৃতিজন্য রোগ সকল ইহাতে প্রকাশ পায়। চতুর্থ ত্বকের নাম মেদোধরা। ইহা দুইটী যবের মত স্থূল, মেদের বিকৃতিজন্য রোগসকল ইহাতে জন্মিয়া থাকে। পঞ্চম ত্বকের নাম অস্থিধরা, অস্থিজাত ব্যাধি সকল এখানে জন্মিয়া থাকে। ষষ্ঠ ত্বকের নাম মজ্জধরা। ইহা একটী যবের মত স্থূল, মজ্জাগত রোগের ক্ষেত্র। সপ্তম ত্বকের নাম শুক্রধরা। ইহা অর্দ্ধ যবের মত স্থূল। শুক্রগত রোগ সকল এখানে প্রকাশ পায়। ইহা সাতটী ত্বকের পরিচয়। ত্বক্ সকল এক একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া দেহের সর্বত্র অবস্থান করে॥ ২-১৬।

सप्तोत्तरं मर्म्मशतम् ॥ १७ ॥ जीवात्मा मर्म्मसु सुस्थितः ॥ १८ ॥ एकस्मिन्नपि निर्भिद्यमाने जीवनान्तः ॥ १९ ॥ हस्ते उत्कृत्यमानेऽपि जीवति कदाचित् ॥ २० ॥ किन्तु अङ्गुलि मध्यस्थित-मर्म्मसु निर्भिद्यमाने तत्क्षणादाक्षेपेण मृत्युः ॥ २१ ॥ तस्मादवश्यं विज्ञातव्यम् ॥ २२ ॥ सक्थ्नो वाह्वोश्चैकादशैकादश-मर्म्माणि ॥ २३ ॥ कोष्ठे त्रयः ॥ २४ ॥ उरसि नव ॥ २५ ॥ पृष्ठे चतुर्दश ॥ २६ ॥ जत्रूर्द्ध्वं सप्तत्रिंशत् ॥ २७ ॥ एवं सप्तोत्तरशतानि मर्म्माणि ॥ २८ ॥

(দেহের মধ্যে)—একশত সাতটী মর্মস্থান আছে। জীবাত্মা মর্মস্থানে সুখে অবস্থান করে। একটী মর্ম স্থান আহত হইলে জীবনান্তপ্রায় হয় (এমনও কতিপয় মর্ম স্থান আছে, যে সকল মর্ম স্থান আহত হইলে সত্যসত্যই জীবনান্ত হয়)। হস্তচ্ছেদ করিয়া দিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু অঙ্গুলির মধ্যে (দুইটী অঙ্গুলির মধ্যস্থলে) এমন কতকগুলি মর্ম স্থান আছে। সেই সকল মর্ম স্থান ভিন্ন হইলে যে আক্ষেপ হয়, তাহাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। অতএব মর্ম স্থান সকল বিশেষ করিয়া জানা উচিত। দুই পদ ও দুই বাহুতে দ্বাদশ ও দশটী মর্ম স্থান আছে। মর্ম স্থান কোষ্ঠে তিনটী, বক্ষঃস্থলে নয়টী, পৃষ্ঠে চৌদ্দটী এবং জত্রুর উর্দ্ধে অর্থাৎ কণ্ঠ-সন্ধি হইতে মস্তক পর্যন্ত স্থানে সাঁইত্রিশটি মর্ম আছে। এইরূপে একশত সাতটী মর্ম দেহ মধ্যে অবস্থান করে।১৭-২৮।

त्रीण्यस्थिशतानि सर्वस्मिन् देहे ॥२९॥ सन्धिसीमन्तास्थि-विभागोऽप्याना-

বস্থ্যকলাশোক্তঃ ॥ ৩০ ॥ অগ্রেঽনেকে রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ভবিষ্যন্তি প্রবক্তারঃ ॥৩১॥

সমস্ত দেহে তিনশত অস্থি আছে। সন্ধি ও সীমন্ত প্রভৃতি স্থানের অস্থি সকলের বিভাগ অনাবশ্যক-বোধে এখানে উল্লিখিত হইল না। অনেক রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি আবির্ভূত হইবেন,—তাহারই সেই সকল অস্থির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিবেন। ২৯-৩১।

চতুর্বিংশতিঃ প্রধানাঃ শিরাঃ ॥ ৩২ ॥ তাস্তু চক্রনাভাবরা ইব নাভিমূলাদুত্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ তাসাং দশদশোর্দ্ধাধোগাঃ ॥ ৩৪ ॥ চতস্রস্তু তির্য্যগ্গাঃ ॥৩৫॥ যা ঊর্দ্ধগাস্তা হৃদ্যাগত্য একৈকাস্তিস্রস্তিস্রঃ ॥ ৩৬ ॥ তাঃ সর্ব্বা বুদ্ধীন্দ্রিয়ধারিকাঃ শব্দাদি-তত্তন্মাত্রবহাঃ ॥ ৩৭ ॥ কথনহসনরোদনবমনক্ষথ্বাদি-কারিকাঃ ॥ ৩৮ ॥ কাশ্চিত্ সংজ্ঞাবহাশ্চ ॥ ৩৯ ॥ অধোগা অপি তদ্বত্ত্রিংশত্ ॥ ৪০ ॥ তাশ্চ গমন-ধাবন-মূত্রমলোত্সর্গাদি-সকলমধোনিষ্ঠং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ৪১ ॥ যাস্তু তির্য্যগ্গা পার্শ্বতো দ্বে দ্বে তাশ্চাসংখ্যেয়াঃ ॥ ৪২ ॥ শীর্ণাশ্বত্থদলগতসিরাবত্ সর্ব্বশরীরমভিব্যাপ্য একৈকরোমকূপমুখাঃ ॥ ৪৩ ॥ তাভিরভ্যঙ্গাত্ স্নেহাদিকমন্তঃ প্রবিশতি ॥ ৪৪ ॥ সর্ব্বা মিলিত্বা সস্থূলসূক্ষ্মাঃ সার্দ্ধত্রিকোটিমিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বাসামেব পরিণতির্নাভৌ হৃদয়ে চ মধ্যপরিণতিঃ কাসাঞ্চিত্ ॥ ৪৬ ॥ তাস্বেবান্ন-জলমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাণি তত্তদ্বারৈরিতানি নিঃসরন্তি ॥ ৪৭ ॥ বাতপিত্তকফ-রক্তাদি-দ্রুতধাতুবহা অপি কাশ্চিত্ ॥ ৪৮ ॥

প্রধান শিরা চব্বিশটি। তাহারা চক্রনাভি হইতে উদ্গত অর-সদৃশ (গাড়ীর চাকার নাভি হইতে বহির্গত পাখির মত) নাভিমূল হইতে উত্থিত হইয়াছে। নাভিমূল হইতে উত্থিত নাড়ী সকলের মধ্যে দশটী ঊর্দ্ধ ও দশটী অধোদেশে এবং চারিটী তির্য্যক্ভাবে গমন করিয়াছে। যে সকল নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়াছে,—তাহারা হৃদয়ে (মস্তিষ্কমধ্যে) আসিয়া এক একটীতে তিন তিনটী করিয়া শাখা-বিস্তার করিয়াছে। তাহারা সকলে বুদ্ধীন্দ্রিয়গণকে ধারণ করিয়া থাকে এবং শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থকে বহন করে। বাক্য, হাস্য, রোদন, বমন ও ক্ষবথু (হাঁচি) প্রভৃতি কার্য সেই সকল ঊর্দ্ধগ নাড়ীর কার্য এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংজ্ঞাকেও বহন করিয়া থাকে। সেইরূপ অধোগত নাড়ীও ত্রিশটী। তাহারা গমন, ধাবন (দৌড়ান) এবং মল মূত্রাদির বিসর্জন প্রভৃতি অধোনিষ্ঠ অর্থাৎ নিম্নগামী কর্ম সকল করিয়া থাকে। যে সকল নাড়ী তির্য্যগ-

ভাবে পার্শ্বদেশে দুইটী করিয়া গিয়াছে, তাহারা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া শীর্ণ অশ্বত্থ-পত্রের শিরা সকলের মত সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে। উহাদের প্রত্যেকের মুখ এক একটী রোমকূপের সহিত সম্বদ্ধ। এজন্য ঐ সকলের দ্বারা মর্দিত তৈলাদি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার মিলিত হইয়া সার্দ্ধ তিন কোটি নাড়ী সর্ব দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে। সকল নাড়ীরই পরিণতি (উৎপত্তি ?) নাভিমধ্যে এবং কতকগুলি নাড়ীর মধ্য-পরিণতি হৃদয়ে (মস্তিষ্কে)। এই সকল নাড়ীতে অবস্থিত বায়ু (গতিশক্তির) দ্বারা প্রেরিত হইয়া অন্ন ও জল প্রভৃতি কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করে এবং মল মূত্র ও শুক্র প্রভৃতি নির্গত হইয়া থাকে। নাড়ী সকলের মধ্যে এমন কতকগুলি নাড়ী আছে, যাহারা বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্তাদি গতিশীল দেহ-ধাতুকে বহন করিয়া থাকে। ৩২-৪৮।

प्रतिश्वासोच्छ्वासकाले रक्तादिकं सर्वाभिर्नाड़ीभिर्हृद्यागत्य निर्गच्छति च ॥ ४९ ॥ नाड़ीषु नैव नियमः ॥ ५० ॥ कदाचिद्वैषम्येन एकास्वन्यधातुप्रवृत्तिः ॥ ५१ ॥ ह्रासतो वृद्धितो निरुध्यन्ते नाड्यः ॥ ५२ ॥ यद्देशावयवस्था निरुध्यन्ते तत्र तत्तद्धानिः ॥ ५३ ॥

প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সময় রক্তাদি ধমনী,—সকল দ্বারা হৃদয়ে আসে ও নির্গত হইয়া যায়। নাড়ী সকলের নিয়ম নাই, (সেজন্য) কখন বৈষম্যবশতঃ একে অন্য ধাতুর প্রবৃত্তি হয়। হ্রাস ও বৃদ্ধি দ্বারা নাড়ী রুদ্ধ হয়। শরীরের যেস্থানে নাড়ী রুদ্ধ হয় ; সেই স্থানে তাদৃশ হানি বা ব্যাধি উপস্থিত হয়। ৪৯-৫৩।

अहोरात्रेषु त्वेकविंशतिसहस्रं श्वासप्रवृत्तिर्जीवानाम् ॥ ५४ ॥ रक्तस्थानेऽनिलचक्रे द्वे नाड्यौ हस्तपदवृद्धाङ्गुष्ठमूलमाश्रित्य प्रधानभूते स्थिते ॥ ५५ ॥ ताभ्यां रोगारोग्यज्ञानं प्रश्नतश्च ॥ ५६ ॥ शुक्रवहे च द्वे तत्स्थानादेवागते स्तनमूलाद्वृषणगते ॥ द्वयोः संयोगो नाभौ ॥ ५८ ॥

জীবের দিন ও রাত্রিতে মিলিয়া একুশ হাজার বার শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে। রক্তস্থানে বায়ুচক্রে (Heatr) দুইটী নাড়ী আছে, —তাহারা হস্ত ও পাদের বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠের মূলকে প্রধানভাবে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে (তাহাদের দ্বারা এবং প্রশ্ন দ্বারা রোগ ও আরোগ্যের জ্ঞান হয়। ৫৪-৫৬।

দুইটী শুক্রবহা নাড়ী আছে, তাহারা শুক্রস্থান হইতে আসিয়া স্তনমূলে হইতে বৃষণদ্বয়ে অবস্থান করে। সেই নাড়ীদ্বয়ের সংযোগ নাভিতে ॥ ৫৭ । ৫৮ ॥

বালদুর্বলানাং অধিকঃ শ্বাসাগমঃ ॥ ৫৯ ॥ কিঞ্চ উভয়োরপি সমা শ্বাস-প্রবৃত্তিঃ ॥ ৬০ ॥ তদিতরাণাং তু ভয়হর্ষশ্রমমৈথুনাদিনাধিকশ্বাসাগমঃ ॥ ৬১ ॥ শ্বাসৈকেন দ্বাত্রিংশদ্বারং নাড়ীগতিঃ ॥ ৬২ ॥ তথাচ সর্বদা গুণতত্ত্বাদি-হ্রাসবৃদ্ধি-গতিরনুসন্ধেয়া ॥ ৬৩ ॥

বালক ও দুর্বল ব্যক্তির শ্বাসপ্রবৃত্তি অধিক হয়, এমন কি উভয়ের সমান। তদ্ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিগণের ভয়, হর্ষ, পরিশ্রম ও মৈথুন প্রভৃতি কারণে শ্বাস-প্রবৃত্তি অধিক হয়। একবার শ্বাস গ্রহণের মধ্যে বত্রিশবার নাড়ীর গতি হয়। তদ্ভিন্ন সর্বদা গুণতত্ত্বাদি অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস বৃদ্ধির জন্যও নাড়ীর গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয়, জানিতে হইবে ॥ ৫৯-৬৩ ॥

শরীরেষু সত্ত্বাধিক্যাদধিকজাগরণম্ ॥ ৬৪ ॥ কিঞ্চ প্রকৃত্যা জাগ্রদবস্থা সত্ত্বস্য ॥ ৬৫ ॥ তথৈব নিদ্রা রজসঃ ॥ ৬৬ ॥ তমসস্তু সুষুপ্তিঃ ॥ ৬৭ ॥ আহারাদিনা তত্তদ্-হ্রাসবৃদ্ধিকারক-রসসংযোগাৎ তত্তদবস্থা-হানিঃ ॥ ৬৮ ॥ তস্মাৎ সর্বদা রসচিকিৎসা স্বীকর্ত্তব্যা ॥ ৬৯ ॥

শরীরে সত্ত্বগুণের আধিক্যে অধিক জাগরণ। এমন কি স্বাভাবিক অবস্থায় যে জীবগণের জাগরণ তাহারও হেতু সত্ত্ব। এইরূপ নিদ্রা রজোগুণের, এবং সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য। সত্ত্বাদিগুণের হ্রাসবৃদ্ধি আহারাদির রসের দ্বারা হয়, সেজন্য আহার্য দ্রব্যের রসসংযোগে সেই সকল অবস্থার হানি হয়। অতএব নিদ্রা ও জাগরণের জন্য সর্বদা রসচিকিৎসা স্বীকার করা উচিত অর্থাৎ আহার্য দ্রব্যের রসের উপর নিদ্রা ও জাগরণ প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৪-৭০ ॥

রসাদয়শ্চ সর্বে দেহস্থিতাঃ হ্রাসবৃদ্ধিগতা বিকৃতিহেতবঃ ॥ ৭১ ॥ শরীরেষু শুক্রগতং মধুররসম্ ॥ ৭২ ॥ পিত্তগতং রসদ্বিকং তিক্তমম্লঞ্চ ॥ ৭৩ ॥ কষায় কটুকৌ বাতগতৌ ॥ ৭৪ ॥ লবণঃ শ্লেষ্মণঃ ॥ ৭৫ ॥ এবং প্রকৃতিঃ ॥ ৭৬ ॥ বিকৃতি-রত ঊর্দ্ধম্ ॥ ৭৭ ॥

ভুক্তদ্রব্যের রস সকল দেহে গিয়া হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগ সকল উৎপন্ন হয় ।৭১। শরীরের মধ্যে মধুর রস শুক্রকে আশ্রয় করে অর্থাৎ মধুর রসের দ্বারা শুক্রবৃদ্ধি হয়। তিক্ত ও অম্ল

এই দুইটী রস পিত্তগত অর্থাৎ তিক্তরসে পিত্তের হ্রাস ও অম্লরসে পিত্তের বৃদ্ধি হয়। কষায় ও কটু-রস বায়ুগত। লবণ রস শ্লেষ্মার বর্দ্ধক। ইহাই রসের প্রকৃতি, এতদ্ব্যতীত বিকৃতি। ৭২-৭৭।

সর্বে রসা রক্তে ॥ ৭৮ ॥ অন্যত্র চৈকৈকপ্রধানদ্বিকাস্ত্রিকাশ্চতুষ্কাঃ পঞ্চকাঃ ষট্‌কাশ্চ ॥ ৭৯ ॥ তত্তদ্রসহ্রাসবৃদ্ধি-হেতুনা তত্তদ্ধাতু-বৃদ্ধি-হানিঃ ॥ ৮০ ॥

সকল রসই রক্তে অবস্থান করে অর্থাৎ সকল রস হইতেই রসের উৎপত্তি। রক্ত ব্যতীত অন্যান্য ধাতু সকলের মধ্যে কোথাও একটী, দুইটী, তিনটী, চারিটী, পাঁচটী বা ছয়টী রসেরই প্রাধান্য। যে ধাতুতে যে রসের প্রাধান্য, সে রসের দ্বারা সেই ধাতুর বৃদ্ধি ও হানি হয়, (অতিযোগে বৃদ্ধি এবং অযোগে হানি বা হ্রাস। ৭৮-৮০।

মুখ্যং হি প্রাণায়তনং নাভিমূলম্ ॥ ৮১ ॥ যতস্তন্মূলা এব প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ ॥৮২॥ শিরশ্চ শরীরেষূত্তমাঙ্গাখ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়-স্থানং পরমাত্মাধিষ্ঠানম্ ।৮৩। অগ্নিচক্রসহস্রারদুষ্টিং বিনা ন রোগোৎপত্তিঃ ॥ ৮৪ ॥ চক্রত্রিতয়মেব নাভিহৃচ্ছিরঃস্থং কুণ্ডলী জীবাত্মপরমাত্মাধিষ্ঠানং জীবনহেতুঃ ॥৮৫ ॥ ইতি প্রাকৃতিকে প্রাজাপত্যসূত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

(শরীরের মধ্যে যে সকল প্রাণায়তন আছে, তাহাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠ প্রাণায়তন নাভিমূল। যেহেতু নাভিমূলস্থিত প্রাণায়তনের স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের স্বাভাবিক অবস্থা এবং উহার বিকৃতিতে দেহের যাবতীয় বিকার বা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৮১-৮২।

শরীরের সকল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মস্তকের নাম উত্তমাঙ্গ। উহা বুদ্ধীন্দ্রিয়গণের নিবাস স্থান এবং পরমাত্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। সহস্রারস্থ অগ্নিচক্রের দোষ ব্যতিরেকে রোগের উৎপত্তি হয় না। নাভি, হৃদয় ও মস্তক এই তিনটী স্থানে যে তিনটী চক্র আছে, তাহাতে কুণ্ডলিনী-শক্তি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করে,—ইহারাই জীবনের হেতু। ৮৩-৮৫।

ইতি প্রাকৃতিক প্রাজাপত্য সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অথ চিকিৎসিতং বক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥ তচ্চ গুণভূতসাম্যকরণম্ ॥ ২ ॥ তে চ পরস্পরবিরুদ্ধ-হানিবৃদ্ধ্যা যান্তি সমতাম্ ॥ ৩ ॥ ঊর্দ্ধবিকৃতিকরণেন অধঃ-শমনম্ ॥ ৪ ॥ তদ্বৎ তদিতরত্র তদিতরৎ ॥ ৫ ॥ এবমেব ভূতেষু ॥ ৬ ॥ দ্রব্যাণি চ যদ্ভূত-প্রধানানি তদ্ধর্ম্মবন্তি ॥ ৭ ॥ গুরুত্বাদধোগমনম্ ॥ লঘুত্বাদূর্দ্ধগতিঃ ॥ ৯ ॥ তজ্জাস্তন্ময়াস্তৎপ্রধানাৎ ॥ ১০ ॥ কচিদ্ দ্বন্দ্বজা দ্বিকপ্রধানাৎ ॥ ১১ ॥ তত্রাপি মুখ্যঃ গুণধর্ম্মঃ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বমন্যৎ ভাক্তম্ ॥ ১৩ ॥

অতঃপর চিকিৎসার কথা বলা হইতেছে॥ শরীরের মধ্যে যে সকল গুণ এবং ভৌতিক উপাদান আছে, তাহাদের সমতাবিধানের নাম চিকিৎসা॥ শরীরে যে সকল গুণ আছে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ,—(যেমন লঘু ও গুরু ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে একটীর বৃদ্ধিতে তাহার বিপরীতটীর হানি বা হ্রাস হয়। অতএব)—যাহার হানি হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধি এবং যাহার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার হানি করিলে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধাতু সকলের সমতা-বিধান হয় এবং ঊর্দ্ধবিকৃতি কার্য্যের দ্বারা অধোবিকৃতির শমন হয় (যেমন, অত্যন্ত মল-প্রবৃত্তিতে তদ্‌বিপরীত সংগ্রাহক ঔষধ প্রযোজ্য) এইরূপ অন্যত্র (যেমন ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বিরেচন)। এইরূপ শরীরের ভৌতিক উপাদান সকলের বিষয়েও জানিতে হইবে॥

(জগতের যাবতীয় দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিক অতএব ভেষজ বা ঔষধ সকলও পাঞ্চভৌতিক। কিন্তু সকল ভেষজ-দ্রব্যে ভৌতিক উপাদান সকল সমান ভাবে থাকে না। সেজন্য)—যে-দ্রব্যে যাদৃশ ভৌতিক উপাদানের প্রাধান্য, সে-দ্রব্য তাদৃশ ধর্ম্মান্বিত হয়। (যেমন পার্থিব-উপাদান বহুল দ্রব্য সকল),—পার্থিব উপাদানের গুরুত্ববশতঃ অধোগমনশীল (বিরেচক) হয় (এবং তৈজস, বায়ব্য বা আকাশীয় উপাদান বহুল দ্রব্য সকল উপাদানের) লঘুতাবশতঃ ঊর্দ্ধগমনশীল (বমন-কারক) হয়॥ যে সকল রস যাদৃশ উপাদান সমবায়ে জাত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন, সে সকল রসের গুণ সকলও তন্ময় হইয়া থাকে। যেহেতু তাদৃশ রসে সেই সকল উপাদানেরই প্রাধান্য। কোন দ্রব্যে যে দুইটী গুণের সমাবেশ দেখা যায়,—তাহার হেতু, সেই দ্রব্যে দ্বিবিধ গুণসাধক উপাদানের প্রাধান্য। (যদিও দ্রব্য বা রসে উপাদানে প্রাধান্য) তথাপি গুণের ধর্ম্মই প্রধান হয় এবং অন্য সকল গৌণ॥ ১-১৩॥

সর্ব্বদা সুখকরাভ্যাং আহারবিহারাভ্যামুপভোক্তব্যম্ ॥ ১৪ ॥ তত্রাপি

केचित् जगतोऽग्नीषोमीयत्वात् द्विविधमेव वर्णयन्ति ॥ १५ ॥ तेनैव तेषां कार्य्य-निष्पत्तिः ॥ १६ ॥ तन्त्रेऽस्मिन्नधिकारः कृतविद्यानामायुर्वेदपारगानाम् ॥ १७ ॥ नत्वन्येषाम् ॥ १८ ॥ अत्र तु केवलमेवाधिकारो योगिनाम् ॥ १९ ॥ यतः पृथिव्यादि-चक्रशोधनेनारोग्यकरणम् ॥ २० ॥ नान्योऽत्र वक्तव्यविषयः ॥ २१ ॥ तथाप्य-शून्यतार्थं क्वचित् क्वचिदन्येषां विषयाणामप्युपादानम् ॥ २२ ॥ व्रणादीना-मनुद्घाटनमत्र चिकित्सितम् ॥ २३ ॥ यदत्रानुपात्तं तत्सर्वं कालान्तरेण विष्णोर-वतारो वक्ष्यति ॥ २४ ॥

इति प्राकृतिके प्राजापत्यसूत्रे तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

সর্বদা সুখকর আহার ও বিহারের উপভোগ করা উচিত। (যদিও জগতের দ্রব্য সকল পাঞ্চভৌতিক উপাদান সংযোগে জাত বলিয়া উহাদিগকে পাঞ্চভৌতিক বলা হয়) তথাপি কেহ কেহ জগতের নিয়ামক অগ্নিসদৃশ সূর্য ও সোম অর্থাৎ চন্দ্রমা বলিয়া জগতের দ্রব্য-সকলকে সৌম্য ও আগ্নেয়,—এই দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য তদনুসারে নিষ্পন্ন হয় ॥ ১৪-১৬ ॥

এই তন্ত্রে অর্থাৎ আয়ুর্বেদে কৃতবিদ্য আয়ুর্বেদ-পারগ ব্যক্তিগণেরই অধিকার, অন্য কাহারও নহে। আর এই প্রাজাপত্য-সূত্রে বর্ণিত চিকিৎসাক্ষেত্রে কেবল যোগিগণের অধিকার। যেহেতু এখানে শরীরস্থ পৃথিব্যাদি-চক্রের শোধনের দ্বারা আরোগ্যের বিধান করা হইয়াছে। এখানে অন্য বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। তথাপি গ্রন্থের অশূন্যতা অর্থাৎ সম্পূর্ণতার জন্য কোথাও কোথাও যৌগিক উপায় ব্যতীত অন্য বিষয় সকলেরও গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে শস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া ব্রণাদির চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ব্রণাদি চিকিৎসায় এখানে বর্ণিত উপায় ব্যতীত অন্য যাহা কিছু কর্তব্য অর্থাৎ শস্ত্রাদির প্রয়োগ,—সে সকল কালান্তরে বিষ্ণুর অবতার (ভগবান্ ধন্বন্তরি) বলিবেন ॥ ১৭-২৪ ॥

ইতি প্রাকৃতিক প্রাজাপত্য-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ ॥

(প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ গ্রন্থ এইখানেই সমাপ্ত হইল)।

শ্রীরাখালদাস সেন

শ্রীভারতী-গ্রন্থমালা—৫

परमात्म-सन्दर्भः

(পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ)

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত
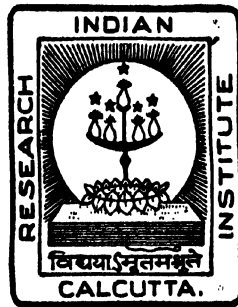
PUBLISHED BY
S. C. SEAL, M.A., B.L.
HONY. GENERAL SECRETARY,
THE INDIAN RESEARCH INSTITUTE
170, MANIKTALA STREET, Calcutta

परमात्म-सन्दर्भः

मूल। श्रीकृष्णचैतन्यदेवो जयति।

तौ सन्तोषयता सन्तौ श्रीलरूपसनातनौ।
दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद्विविच्यते॥ (क)

अनुवादकर्तुर्मङ्गलाचरणम्

श्रीनदीयाविनोदाय गुरवे भक्तिदायिने।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः॥
श्रीमन्मदनगोपालो राधालिङ्गितविग्रहः।
सीतानाथस्य यः प्राणाः स मेऽनन्यगतेर्गतिः॥
परमात्माख्यसन्दर्भव्याख्यानं वङ्गभाषया।
क्रियतेऽद्वैतवंश्येन राधारमणशर्मणा॥

অনুবাদ—পরমাত্মসন্দর্ভ = পরমাত্মা প্রতিপাদক সন্দর্ভ।

তাৎপর্য—যাহাতে গূঢ়ার্থের প্রকাশ ও উক্তির সারবত্তা, শ্রেষ্ঠতা, নানার্থের সমাবেশ এবং বেদ্যত্ব অর্থাৎ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রাচুর্য বর্তমান থাকে পণ্ডিতগণ তাহাকে সন্দর্ভ বলেন।

গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় বলদেববিদ্যাভূষণ এই পারিভাষিক লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন।

সেই সুপ্রসিদ্ধ সাধু শ্রীল রূপসনাতনের সন্তোষবিধানকারী দক্ষিণ-দেশোদ্ভব ভট্ট (শ্রীগোপাল ভট্ট) পুনর্বার অর্থাৎ তত্ত্ব-ও ভগবৎ-সন্দর্ভ বিচার করিবার পর এই গ্রন্থ (পরমাত্ম-সন্দর্ভ) বিচার করিতেছেন। (ক)

মূল। তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্।
পর্যালোচ্যাথ পর্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥ (খ)

অনুবাদ – শ্রীগোপাল ভট্টের প্রথম লিখিত গ্রন্থ কোথাও ক্রমানুসারে ও কোথাও ক্রমভঙ্গে কোথাও বা খণ্ডিতভাবে (বিচ্ছিন্নভাবে) ছিল। জীব নামক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে তাহার আলোচনা করিয়া ক্রমানুসারে উহাকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

তাৎপর্য—মূলে জীবকপদের উল্লেখ আছে তাহা জীবশব্দের উত্তর অল্পার্থে কপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এস্থলে আপনাকে ক্ষুদ্রজীবরূপে উপস্থাপিত করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

অথবা "জীবক" এই শব্দ দ্বারা বাগ্‌দেবী তাঁহার প্রশংসাই ধ্বনিত করিয়াছেন বুঝা যায়; কারণ, সরস্বতী ভগবান্ ও ভক্তের অপকর্ষ সহ্য করেন না। স্তুতিপক্ষে—'জীবয়তি সর্বজীবান্ ভাগবতসিদ্ধান্তদানেন' অর্থাৎ ভাগবতসিদ্ধান্তদানে জীবকে সঞ্জীবিত করেন।

'লিখামি' এই উত্তম পুরুষের প্রয়োগ না করিয়া জীব লিখিতেছে এই প্রথম পুরুষের প্রয়োগে নিজের অভিমানশূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে। আমি লিখিতেছি এই প্রকার লিখিলে অহমিকা-দোষ হইত। তদ্ব্যতীত প্রাচীন আচার্যগণের অনুসৃত রীতিতেও দেখা যায়, তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে প্রথম পুরুষের বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে এ-প্রসিদ্ধি আছে—'আচার্যাণামিয়ং শৈলী যৎ স্বাভিধেয়মপি পরাভিধেয়মিব বর্ণয়ন্তি॥ (খ)

মূল। অথ পরমাত্মা বিব্রিয়তে।
* তত্র তং জীবনিরূপণপূর্বকং
† নিরূপয়তি দ্বাভ্যাং—

অনুবাদ—অনন্তর পরমাত্মা বিবৃত হইতেছেন।

সেই বিষয়ে (পরমাত্মবিষয়ে) শ্রীমদ্‌ভাগবতের দুইটী শ্লোক দ্বারা জীব নিরূপণ পূর্বক পরমাত্মার নিরূপণ করিতেছেন।

তাৎপর্য—এ স্থলে অথশব্দের অর্থ অনন্তর। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং" তত্ত্ববিদ্‌গণ যাহা অদ্বয় জ্ঞান তাহাকে তত্ত্ব বলেন এই শ্রীভাগবতের ১।২।১১ পদ্যে একই অদ্বয়জ্ঞানই যে তত্ত্ব নামে অভিহিত তাহা দেখাইয়া সেই অদ্বয়জ্ঞানই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ নামে কথিত হইয়া থাকেন। তদনুসারে তত্ত্বসন্দর্ভে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভগবৎসন্দর্ভে ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া এই পরমাত্ম-সন্দর্ভে পরমাত্মার নির্ণয় করিতেছেন।

*যদ্যপি পরমাত্মত্বং বৈকুণ্ঠেঽপি প্রাভীরপি তদপি চ ভগবত্তাঙ্গং তৎ স্যাদিত্থং জগৎগতং বাচ্যং ইতি বহরমপুরমুদ্রিত, পুস্তকে অধিকপাঠঃ।

‡ ভগবদ্‌গতজীবনিরূপণপূর্বকং ইতি মুদ্রিতপুস্তকে পাঠঃ।

যে দুই শ্লোকের দ্বারা জীব ও পরমাত্মা নিপপিত হইয়াছে সেই দুইটী শ্রীভাগবতের ৫ম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের ১২শ ও ১৩শ শ্লোক। গ্রন্থকার নিজেই শ্লোকদুইটীর উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই দুইটী শ্লোকের প্রথম শ্লোকে (১২) জীব ও দ্বিতীয় শ্লোকে (১৩) পরমাত্মা বিবৃত হইয়াছেন।

মূল। ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
জীবস্য মায়া রচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ,
শুদ্ধোবিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্তুঃ॥

অনুবাদ—শ্রীভাগবতে ৫।১১।১২ শ্লোকে জড়ভরত রহূগণ নামক রাজাকে বলিয়াছিলেন—যিনি মায়াতীত হইয়াও মায়াদ্বারা কল্পিত ও জীবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, অতএব ভাবদ্ বহির্মুখ কার্যকারী অন্তঃকরণের নিত্য (অনাদিবকাল হইতে) অনুগত হইলেও কখনও (জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থায়) আবির্ভূত, ও কখনও (সুষুপ্তিকালে) তিরোহিত এই সকল বিভূতি (বৃত্তি) বিশেষরূপে দর্শন করিয়া যিনি তাহাতে আবিষ্ট হন তিনি জীব নামক ক্ষেত্রজ্ঞ।

তাৎপর্য—এখানে বভূিতি শব্দের উল্লেখ আছে। এই শব্দ বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকের আলোচনা করা আবশ্যক। যথা—

একাদশাসন্ মনসো হি বৃত্তয়,
আকুতয়ঃ পঞ্চ ধিয়োঽভিমানঃ।
মাত্রাণি কর্মাণি পুরঞ্চ তাসাং
বদন্তি হৈকাদশ বীরভূমীঃ॥

রাহুগণ রাজাকে জড়ভরত ইতঃপূর্বে বলিয়াছেন যে মন যখন গুণকর্মে অনুবিদ্ধ হয় তখনই নানাবৃত্তি আশ্রয় করে। তাহাই কথিত শ্লোকে দেখাইতেছেন—হে বীর, মানববৃত্তি একাদশ প্রকার, তাহার মধ্যে পাঁচটী ক্রিয়াকার আর পাঁচটী জ্ঞানাকার, অপর একটী অভিমান। এই একাদশ প্রকার বৃত্তি সকলের বিষয়ও একাদশ প্রকার। পণ্ডিতগণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ে হইতেছে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিসর্গ, রতি (সম্ভোগ) আর্তি (গত) অভিজল্প (কথন) শিল্প এই পাঁচটী বিষয়। অপর অভিমানের বিষয় দেহ দেহাদি। অর্থাৎ দেহ গেহ আমার ইত্যাকার অভিমান হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। এই জীবাত্মা আবার দুই প্রকার, এক বদ্ধ, অপর মুক্ত। এস্থানে বদ্ধজীবেরই কথা বলিতেছেন। জীব স্বরূপতঃ মুক্ত হইলেও মায়াকল্পিত

মনের বৃত্তি সকল বিশেষভাবে দর্শন করিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়। এই বৃত্তি সকল কখন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাতে ও স্বপ্নাবস্থাতে প্রকাশ পায় এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে তিরোহিত থাকে।

জাগ্রদবস্থা—ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরণম্।

যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থের (object এর) উপলব্ধি (জ্ঞান) হয় তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলে।

স্বপ্নাবস্থা—করণেষূপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ।

ইন্দ্রিয় সকল উপসংহৃত হইলে জাগরণের সংস্কারজন্য বিষয়যুক্ত যে প্রতীতি তাহাকে স্বপ্ন (dream) বলে।

সুষুপ্তি— সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে,
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।

সুষুপ্তিকালে (অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রাসময়ে) জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থানিবন্ধী বিষয়জ্ঞানসকল বিলীন হইলে, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়া "ন কিঞ্চিদবেদিষং" 'সুখে নিদ্রা হইয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই' ইত্যাকার জ্ঞান অনুভব করে। ইহাতে বলা হইল যে তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের ন্যায় বিষয়ের স্ফূর্তি হয় না।

মূল। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ,
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃপরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ,
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীভাবগতের ৫ম স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক শ্রীজড়ভরত রহূগণ রাজার নিকট পরমাত্মরূপী ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলিতেছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, আত্মা অর্থাৎ ব্যাপক জগতের কারণভূত, পুরুষাকার, স্বপ্রকাশ জন্মাদিশূন্য ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, নারায়ণ (কারণার্ণবশায়ী) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্যাদি অংশবিশিষ্ট), বাসুদেব (সর্বভূতের আশ্রয়) নিজমায়া দ্বারা আত্মাতে (জীবে) অবস্থাপ্যমান অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তৃস্বরূপে বিদ্যমান॥

তাৎপর্য—পর পর এই দুইটী শ্লোকে যথাক্রমে জীবের ও পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

মূল। যঃ শুদ্ধোঽপি মায়াতঃ পরোপি মায়ারচিতস্য বক্ষ্যমাণস্য সর্বক্ষেত্রজ্ঞস্য মায়য়াকল্পিতস্য মনসোঽন্তঃকরণস্যৈতাঃ প্রসিদ্ধা বিভূতীর্বৃত্তী বিচষ্টে বিশেষেণ পশ্যতি পশ্যংস্তত্রাবিষ্টো ভবতি। স খল্বসৌ জীবনামা স্বশরীর-স্থূলক্ষণক্ষেত্রস্য জ্ঞাতৃত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ॥

অনুবাদ—সন্দর্ভকার নিজেই ক্ষেত্রজ্ঞত্রতা মনসো বিভূতীঃ এই শ্রীভাগবতের ৫।১১।১২ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। যিনি শুদ্ধ=মায়ার অতীত হইয়াও মায়ারচিত অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সকল ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) মায়াদ্বারা কল্পিত মনের প্রসিদ্ধ বৃত্তি সকলকে বিশেষরূপে দর্শন করিতেছেন এবং দেখিতে দেখিতে আবিষ্ট হইতেছেন তিনি এই জীবনামক নিজের শরীরদ্বয়ের জ্ঞাতা ও নিমিত্ত এবং তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন।

তাৎপর্য—ক্ষেত্র বলিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই শরীরকে বুঝায়। পাঞ্চভৌতিক পরিদৃশ্যমান এই দেহ স্থূলশরীর।

আর অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে সপ্তদশাবয়বাত্মক যে দেহ তাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলে। এই সূক্ষ্মশরীরই স্বর্গ-নরকাদি ভোগের সাধন।

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥

পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ ও কর্মেন্দ্রিয়ের পাঁচ মিলিত এই সপ্তদশ অবয়ব অপঞ্চীকৃতভূতজাত সূক্ষ্মাঙ্গ, সেই সূক্ষ্মাঙ্গ (লিঙ্গশরীর) ভোগের (স্বর্গনরকাদি ভোগের) সাধন।

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পাঁচটী প্রাণ। উর্ধ্বগমনশীল নাসাগ্র স্থানবর্তী বায়ুর নাম প্রাণ। অধোগমনশীল গুহ্যাদিস্থানবর্তী বায়ু অপান। অখিল শরীরস্থায়ী সর্বনাড়ী গমনশীল বায়ু ব্যান।

উর্ধ্বে উৎক্রমণশীল কণ্ঠস্থায়ী বায়ু উদান। শরীরমধ্যগত অন্নরসাদির পরিচালক রস-রুধিরাদির করণ বায়ুকে সমান বলে।

সংকল্পবিকল্পাত্মিকান্তরঃকরণবৃত্তির্মনঃ।

সংকল্পবিকল্পাত্মিকা অর্থাৎ আমি চৈতন্যরূপী অথবা দেহ ইত্যাকার সংশয়াপন্ন চিত্তবৃত্তিকে মন বলে।

নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তির্বুদ্ধিঃ।

যে অন্তঃকরণের বৃত্তি দ্বারা নিশ্চয় হয় যে আমিই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাংশ, সেই নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তির নামই বুদ্ধি।

চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, জিহ্বা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।
বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয়।

অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে (আকাশাদি হইতে) এই লিঙ্গশরীর (সূক্ষ্মশরীর) হয়।

পঞ্চীকরণ—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া স্বকীয় দ্বিতীয়ার্ধ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারি-ভূতের দ্বিতীয়ার্ধ ভাগের সহিত মিশ্রিত করণকে পঞ্চীকরণ বলে। অর্থাৎ আকাশ অর্ধেক আর বায়ু প্রভৃতির প্রত্যেক দুই আনার অংশে আট আনা পূরণ হইলে তাহাকে স্থূল আকাশ, এই

প্রকার বায়ুর অর্দ্ধেক এবং অন্যান্য আকাশাদির প্রত্যেকের দুই আনা করিয়া অর্দ্ধেক আট আনা পূরণ হইলে তাহাকে স্থূল বায়ু বলে। এই প্রকার স্থূল অগ্নি প্রভৃতি স্থলেও বুঝিতে হইবে।

সূক্ষ্মশরীর অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে জাত বলিয়া পঞ্চীকৃত ভূত হইতে জাত এই চক্ষুঃ দ্বারা দৃষ্ট হয় না।

পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা—

দ্বিধাবিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥

প্রত্যেক পঞ্চভূতকে সমান দুই ভাগ করিয়া প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রথম ভাগকে চারি অংশ করিয়া স্বকীয়ের ইতর পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রথমাংশে সেই চারি অংশের একাংশ করিয়া যোগ করিলে পঞ্চীকরণ হইবে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলশরীরে কার্য হয়। আর স্বপ্নাবস্থায় লিঙ্গ শরীরের কার্য হয় এই কারণেই স্থূলদেহের ইন্দ্রিয়াদি স্বপ্নাবস্থাতে সেই সেই বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। স্বপ্নাবস্থাতে চক্ষুঃ মুদ্রিত আছে অথচ স্বপ্নে চক্ষু দিয়া যে সুন্দর রূপ দেখিতেছে এটী লিঙ্গ শরীরস্থ চক্ষুঃ দ্বারাই দৃষ্ট হইতেছে বুঝিতে হইবে।

तदुक्तं "यया सम्मोहितो जीव" इत्यादि। तस्य मनसः कीदृशतया मायारचितस्य तत्राह जीवोपाधितया जीवतादात्म्येन रचितस्य ततश्च तत्तयोपचर्यमाणस्येत्यर्थः। ततश्च कीदृशस्याविशुद्धं भगवद्बहिर्मुखं कर्म करोतीति तादृशस्य ॥

অনুবাদ—তাহাই শ্রীভাগবতে ১।৭।৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—যে (মায়াতীত হইয়াও) মায়ায় সম্মোহিত জীব ইত্যাদি।

(পূর্বে বলা হইয়াছে মনের দ্বারা বৃত্তি সকল দর্শন করে) মন কি প্রকার, না, মায়ারচিত; সেই বিষয় বলিতেছেন—জীবোপাধিতাহেতুক অর্থাৎ জীবতাদাত্ম্য দ্বারা রচিত। অতএব মায়াদ্বারা উহা উপচর্যমাণ অর্থাৎ আরোপিত। আবার বলিতেছেন—সেই মন কেমন, না, অবিশুদ্ধ অর্থাৎ ভগবদ্ বহির্মুখকার্য করে।

তাৎপর্য—জীব শুদ্ধ কিন্তু অনাদি বহির্মুখতা-নিবন্ধন মায়াসম্বন্ধ হওয়ায় অনর্থ প্রাপ্ত হয়; এবং মায়াসম্মোহিত জীবের সহিত মন তাদাত্ম্য (একরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্‌বহির্মুখ কার্যের অনুষ্ঠান করে।

कीदृशी विभूतीर्नित्या अनादित एवानुगताः तत्र च कीदृशीरित्यपेक्षायामाह जाग्रत् स्वप्नयोराविर्भूताः सुषुप्तौ तिरोहिताश्चेति ॥

অনুবাদ—কেমন বিভূতি, না, নিত্য অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই (মনের) অনুগত। সেখানে ঐ বিভূতিসকল কি প্রকার, তদুত্তরে বলিতেছেন—জাগ্রদ্দশায় ও স্বপ্নে আবির্ভূত, সুষুপ্তিকালে তিরোহিত।

তাৎপর্য—সন্দর্ভকার জীব নিরূপণ জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ৫. ১১. ১২ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই শ্লোকে বিভূতির (বৃত্তির) উল্লেখ আছে, উক্ত বিভূতি শব্দের তিনটী বিশেষণ আছে। যথা—নিত্যা, কোথাও আবির্ভূতা, এবং কোথাও তিরোহিতা। সন্দর্ভকার এই তিনটী বিশেষণের নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন—নিত্য অর্থাৎ আজ বলিয়া নয় অনাদিকাল হইতেই মনের অনুগত। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে আবির্ভূত এবং সুষুপ্তিকালে তিরোহিত থাকে।

यस्तु पुराणो जगत्कारणभूतः पुरुष "आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य" इत्यादिना द्वितीयादौ प्रसिद्धः साक्षादेव स्वयं ज्योतिः स्वप्रकाशो न तु जीववदन्यापेक्षया। अजो जन्मादिशून्यः परेषां ब्रह्मादीनामपीश्वरः। नारं जीवसमूहः स नियम्यत्वेन अयनं यस्य सः। भगवान् ऐश्वर्य्याद्यंशवान् भगवदंशत्वात्। वासुदेवः सर्वभूतानामाश्रयः स्वमायया स्व-स्वरूपया शक्त्या आत्मनि स्वस्वरूपे अवधीयमानः अवस्थाप्यमानः कर्मकर्तृप्रयोगः। मायायां मायिकेऽप्यन्तर्यामित्वेन प्रविष्टोऽपि स्वरूपशक्त्या स्वरूपस्थ एव न तु संसक्त इत्यर्थः। वासुदेवत्वेन सर्वक्षेत्रज्ञातृत्वात् क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मेति। तदेवमपि मुख्यं क्षेत्रज्ञत्वं परमात्मन्येव॥

অনুবাদ—পরন্তু যিনি পুরাণ অর্থাৎ জগতের কারণ-রূপী পুরুষ তিনিই পরমাত্মা। এই "পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য পুরুষ" এই শ্রীভাগবতের (২. ৬. ৪০ শ্লোকে) দ্বিতীয় স্কন্ধাদিতে কীর্তিত হইয়াছে যে তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, জীবের ন্যায় অন্যের অপেক্ষা করেন না। তিনি অজ=জন্মাদিশূন্য, পরম যে ব্রহ্মাদি তাহাদেরও ঈশ্বর। নার শব্দের অর্থ জীবসকল, সেই জীবসকল তাঁহার নিয়ম্য অর্থাৎ নিয়মাধীন হইয়া তাঁহার আশ্রিত। ভগবান্ অর্থে ঐশ্বর্যাদি অংশবিশিষ্ট। যেহেতু সেই আদ্যপুরুষ ভগবানের অংশ-স্বরূপ। বাসুদেব অর্থে সকল ভূতের আশ্রয়। (সেই আদি পুরুষ) নিজমায়াদ্বারা অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপশক্তি দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবধীয়মান=অবস্থাপ্যমান হইয়াছেন। এস্থলে কর্মকর্তৃ বাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ তিনি মায়াতে ও মায়িক বস্তুতে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও স্বরূপ শক্তি দ্বারা স্বরূপস্থই আছেন, কিন্তু মায়িকবস্তুতে আসক্ত নহেন। তিনি

বাসুদেব বলিয়া সকলক্ষেত্রের জ্ঞাতা অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ এবং আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। এই প্রকার হইলে পরমাত্মাতেই মুখ্যক্ষেত্রজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

তাৎপর্য—সন্দর্ভকার শ্রীমদ্ভাগবতের ৫. ১১. ১২ শ্লোক উল্লেখ করিয়া জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তৎপর শ্রীভাগবতের ৫. ১১. ১৩ শ্লোক পরমাত্মা নিরূপণের জন্য "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ" এই শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—এস্থানে যে পুরুষের কথা বলা হইল তিনি পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, তিনি জীবের ন্যায় অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হন না। জন্মাদিশূন্য বলিতে জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ এই ষড়্‌ভাববিকার বর্জিত। মায়িক দেহাদির জন্ম হয়, উহা কিছুকাল থাকে, তাহার বৃদ্ধি হয় বিপরিণাম হয়, এবং ক্ষয় ও নাশ হয়। কিন্তু আদ্য পুরুষের ঐ ষড়্‌ভাববিকার নাই এবং তিনি সর্বজীবের আশ্রয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ১. ৫. ৭০ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে—

আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব অবতার বীজ সর্বাশ্রয় ধাম ॥

ইনি ভগবান্—সন্দর্ভকার এই ভগবৎ শব্দের অর্থ করিলেন যে "ঐশ্বর্যাদ্যংশবান্" অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি অংশযুক্ত। ভগবান্ বলিতে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে বুঝায় কিন্তু এখানে ভাগবতের ৫.১১.১৩ শ্লোকে আদ্য পুরুষেরও ভগবান্ বিশেষণ দিয়াছেন। তাহাতেই সন্দর্ভকার অর্থ করিলেন যে এই পুরুষ যখন শ্রীভগবানের অংশ তখন ষড়ৈশ্বর্যাদি ইহাতে পূর্ণরূপে থাকিতে পারে না। সুতরাং এখানে ভগবান্ বলিতে ঐশ্বর্যাদি অংশযুক্তই বুঝিতে হইবে। সেই পুরুষ নিজের স্বরূপ শক্তি দ্বারা নিজ স্বরূপে অবধীয়মান অর্থাৎ অবস্থাপ্যমান—এখানে সন্দর্ভকার বলিলেন কর্মকর্তৃ প্রয়োগ।

ক্রিয়মাণন্তু যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্বিদুঃ ॥

ক্রিয়মাণ যে কর্ম কর্তার সুকর অর্থাৎ স্বীয় গুণের দ্বারা স্বয়ংই প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয়, তাহাকে কর্ম কর্তা বলে। যেমন কাষ্ঠ নিজেই ভেদপ্রাপ্ত হইতেছে। এস্থলে সেই আদি পুরুষ নিজেই অবস্থাপ্যমান, অন্যের দ্বারা নহে। ইনি মায়িক বস্তুতে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও মায়াতে আসক্ত নহেন, যেহেতু স্বরূপশক্তি দ্বারা নিজরূপেই বিদ্যমান আছেন। যদিও জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ তথাপি মুখ্যরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে পরমাত্মাকেই বুঝায়।

যদুক্তং—

"সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো
ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ইতি।

অনুবাদ—(শ্রীভাগবতে ৬. ৪. ২০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—পুরুষ অর্থাৎ জীব সমস্ত জানে এবং গুণ সকলও জানে। জীব এই প্রকার জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিতে পারে না সেই অনন্তরূপী সর্বজ্ঞ ভগবান্‌কে স্তব করি।

তাৎপর্য—দক্ষপ্রজাপতি মনের দ্বারা দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করেন কিন্তু ঐ প্রজাসৃষ্টি বর্দ্ধিত না হওয়ায় বিন্ধ্যাচল পর্বতের নিকট একটী ক্ষুদ্র পর্বতে, তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। হংসগুহ্য নামক স্তোত্র দ্বারা ভগবান্‌কে স্তব করেন। সেই স্তবে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়াছেন—'যিনি পরমাত্মা, যাহার চিৎশক্তি সত্য ও যিনি জীব ও মায়ার নিয়ামক তাঁহাকে জীব জানিতে পারে না। সেই অনন্তরূপী ভগবান্‌কে স্তব করি।' এই ২০ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ই যে পরমাত্মা তাহা বিবৃত হইল।

তথাশ্রীগীতোপনিষৎসু।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ইতি॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদ্‌গীতায় ১৩. ১. ২ শ্লোকেও ঐরূপ কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিলেন হে কুন্তীনন্দন (অর্জুন) এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে এই ক্ষেত্রকে (শরীরকে) যে জানে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেচনাশীল ব্যক্তিগণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। হে ভরতবংশোদ্ভব, সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ সকল শরীরে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহা আমার সম্মত।

তাৎপর্য—গীতায় ১৩শ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সকল তত্ত্ব আমি জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীভগবান্ সেই সকল তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন।—এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ক্ষেত্রকে জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ এক এক শরীরে জীবাত্মরূপ এক একটী ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন। তদ্রূপ সকল ক্ষেত্রে পরমাত্মরূপে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। শরীরের সহিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই আমার সম্মত। আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।—গীতায় শ্রীভগবানের এই উক্তিতে পরমাত্মাই যে মুখ্যরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অত্র খলু ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীতি সর্বেষ্বপি ক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি ন

तु जीवमिव स्वस्वक्षेत्र एवेतेरवार्थं वहति। न च जीवेशयोः सामानाधिकरण्येन निर्विशेषचिद्वस्त्वेव ज्ञेयतया निर्दिशति सर्वक्षेत्रेष्वित्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामीत्यादिना, सर्वतः पाणिपादं तदित्यादिना ज्ञानस्य च तथोपदेक्ष्यमाणत्वात्। किञ्च क्षेत्रज्ञञ्चापीत्यत्र तत्त्वमसीतिवत् सामानाधिकरण्येन तन्निर्विशेषज्ञाने विवक्षिते क्षेत्रज्ञेश्वरयो र्ज्ञानमित्येवानूद्येत न तु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानमिति। किन्तु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरित्यस्यायमर्थः। द्विविधयोरपि क्षेत्रक्षेत্রज्ञयोर्यज्ज्ञानं तन्ममैव ज्ञानं मतम्॥

অনুবাদ—এস্থলে 'আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান' এই বাক্যে সকল ক্ষেত্রে (শরীরে) আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান এই অর্থ জানিতে হইবে। জীবের ন্যায় আপন আপন শরীরের জ্ঞাতা নহে এই অর্থই আসিতেছে। জীব ও ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্যর দ্বারা নির্বিশেষচিদ্বস্তুকে জ্ঞেয়রূপে নির্দেশ করিলেন না। অন্যথা 'সকল ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিবে' শ্রীভগবানের এই উক্তি বৃথা হইত। যেহেতু শ্রীগীতার ১৩শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে 'যাহা জ্ঞেয় তাহা আমি বলিব; এবং ঐ অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে 'সকল দিকেই হস্ত পাদ' ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি দ্বারা সবিশেষেরই নির্দেশ করা হইবে। এবং ঐ শ্রীভগবদ্গীতার ৮ম শ্লোকে 'অমানিত্ব' ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানেরও উপদেশ দেওয়া হইবে। অপর আমাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও' এই গীতার ১৩.২ শ্লোকে তত্ত্বমসি বাক্যের ন্যায় সামান্যাধিকরণ্য দ্বারা নির্বেশেস জ্ঞানের কথা বলা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের জ্ঞান ইহারই উল্লেখ করিতেন কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান এরূপ বলিতেন না। কিন্তু ঐ অধ্যায়ের ২. ৩ শ্লোকের ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ইহার অর্থ—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধের যে জ্ঞান তাহাই আমার জ্ঞান বলিয়া সম্মত।

তাৎপর্য—শ্রীভগবদ্গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ১.২ শ্লোকের উক্তি অনুসারে জীব নিজ শরীরের জ্ঞাতা আর ঈশ্বর সকল শরীরের জ্ঞাতা। যদি কেহ বলেন যে গীতার ১৩.১.২ শ্লোকে জীব ও ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্য হেতু নির্বিশেষ চিদ্বস্তুই জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সন্দর্ভকার সেই সন্দেহ নিরাস করিয়া বলিতেছেন যে, তাহা নহে, অর্থাৎ নির্বিশেষ চিদ্বস্তু জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। জীব ও ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে না।

ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাম্ শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।

যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের নিমিত্ত এক নহে সেই সকল শব্দের যে কোন একমাত্র বিষয়ে প্রয়োগ—তাহাকেই সামানাধিকরণ্য বলে। অর্থাৎ দুই বা তদতিরিক্ত পদসকল এক বিভক্তি যোগে যখন বিশেষ্য বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় তখনই সামানাধিকরণ্য বলা যায়। সামানাধিকরণ্যে পদসকল মিলিতভাবে এক বিশেষ্যের অনুগামী

হইলেও উহার প্রত্যেক পদের অর্থগত কিছু পার্থক্য বা বিশিষ্টতা থাকে। ইহাকে ভিন্নপ্রবৃত্তি নিমিত্ত বলা যায়। যথা—নীলোৎপল বলিতে নীলপদের নীলত্ব ও উৎপলপদের উৎপলত্ব এই দুইটী পৃথক্ হইয়াও এক বস্তু অর্থাৎ নীলাভিন্নোৎপলকে (নীলগুণবিশিষ্ট উৎপলকে) বুঝাইল। যেস্থলে ঐ প্রকার প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ নাই সেইস্থলে সামানাধিকরণ্য হয় না। যেমন গৌঃ গৌঃ এই দুইটী পদে একই গোত্বধর্ম অভিন্ন রহিয়াছে। সুতরাং সামানাধিকরণ্য হইল না। আবার রাজপুরুষ এই শব্দে যদিও রাজা ও পুরুষ শব্দে ভিন্নপ্রবৃত্তি নিমিত্ততা রহিয়াছে কিন্তু 'রাজত্ব' ও 'পুরুষত্ব' একই আধারে (common substratumএ) নাই, অতএব সমানাধিকরণ্য হইল না। জীব ও পরমাত্মারও তদ্রূপ ঐকাধিকরণ্য নাই। অবশ্য অদ্বৈতবাদিগণ জীব ও ঈশ্বরের একত্ব স্থাপনজন্য সামানাধিকরণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদি এবং "সর্বতঃ পাণিপাদং" এই দুইটী শ্রীভগবদ্‌-গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ১২-১৩ শ্লোক, সন্দর্ভকার সম্পূর্ণ শ্লোকের উল্লেখ করে নাই তজ্জন্য ঐ দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

—গীতা ১৩. ১২-১৩।

শ্রীভগবান্ বলিলেন যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি অর্থাৎ ইতঃপূর্বে ক্ষেত্র বলিতে শরীর, ও সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়াছি। এক্ষণে বিজ্ঞানদ্বারা যে তত্ত্ব জ্ঞেয় তাহা বলিব; যাহা জ্ঞাত হইলে জীব অমৃত লাভ করে সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি। তিনি মদাশ্রিত সৎ ও অসতের অতীত পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন।

অপর, সর্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্বত্র তাঁহার নেত্র, মস্তক ও মুখ, এবং সর্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় বিদ্যমান ও তিনি সমস্ত অচেতন পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

এই সব প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়তত্ত্ববস্তু যে সবিশেষ অর্থাৎ হস্তপদাদিযুক্ত সাকার তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সন্দর্ভকার "অমানিত্বম্" শ্লোকের একাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।—গীতা ১৩. ৮।

অমানিত্ব (মানহীনতা) অদম্ভিত্ব (দম্ভশূন্যতা) অর্থাৎ নিজের ধার্মিকত্বের অকথন, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কাহারও হিংসা না করা, ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমতাসত্ত্বেও অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, সরলতা অর্থাৎ ভিতরে ও বাহিরে কোন প্রকারে কুটিল ব্যবহার না করা। আচার্যের উপাসনা

অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ (আন্তর ও বাহ্য পবিত্রতা), স্থৈর্য অর্থাৎ মনের চঞ্চলতার গতিরোধ, আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ দেহও ইন্দ্রিয়াদিকে ভক্তির প্রতিকূলে গতি নিরোধ করিয়া তাহার অনুকূলে রাখা—এই বৃত্তিনিচয়ই জ্ঞেয়বস্তুর সাধনজ্ঞানের নিমিত্তক। ঐখানে যে শৌচের কথা বলা হইয়াছে এই শৌচ দ্বিবিধ। যথা—

শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥

শৌচ দুই প্রকার বাহ্য এবং আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্য শৌচ সাধিত হয় ও ভাবশুদ্ধি আভ্যন্তর শৌচ বলিয়া নিরূপিত হয়।

গীতায় বলিয়াছেন 'আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ' অর্থাৎ আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, এস্থানে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ন্যায় সামানাধিকারণ্য নহে। শ্রীপাদ শঙ্করমতাবলম্বী বৈদান্তিকগণ 'তত্ত্বমসি' এইবাক্যে সামাধিকারণ্য স্বীকার করেন। সামানাধিকারণ্য পূর্বে বলা হইয়াছে। বৈদান্তিকগণ বলেন যেমন 'সোঽয়ং-দেবদত্তঃ" অর্থাৎ 'সেই এই দেবদত্ত' এই বাক্যে পূর্বকালে দৃষ্ট 'সেই' শব্দ এবং বর্তমানকালে দৃষ্ট 'এই' শব্দ এই উভয় শব্দেরই এক-দেবদত্ত ব্যক্তিতে তাৎপর্য সম্বন্ধ হইতেছে। তদ্রূপ "তৎ ত্বম সি" এই বাক্যে অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য-বোধক 'তৎ'পদ এবং প্রত্যক্ষ চৈতন্যবোধক 'ত্বং' পদ এই উভয়েরই এক চৈতন্যে তাৎপর্যরূপ সম্বন্ধ। এই প্রকারে সামানাধিকরণ্যরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে।

সন্দর্ভকার বলিলেন তত্ত্বমসি বাক্যের ন্যায় যদি নির্বিশেষ জ্ঞান বলাই অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে অভিন্ন যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বর—তদ্বিষয়ক জ্ঞান ইহাই অনুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ করিতেন, কিন্তু এস্থানে তাহা না বলিয়া ঐকাধিকরণ্যরহিত ভিন্নবৃত্তিক ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ইহাই বলিয়াছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান সম্বন্ধে ব্যাখ্যাও করিলেন—দুই প্রকার যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান তাহাই আমার জ্ঞান বলিয়া সম্মত।

अन्यार्थस्तु परामर्श इति न्यायेन मज्ज्ञानक तात्पर्य्यकमित्यर्थः, ज्ञेय-स्यैक त्वेनैव निर्दिष्टत्वात् योग्यत्वाच्च। न च निरीश्वरसांख्यवत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञमात्र-विभागादत्रज्ञानं मत मामित्यनेनेश्वरस्यापेक्षितत्वात्। न च विवर्त-वादवदीश्वरस्यापि भ्रममात्रप्रतीतपुरुषत्वं। तद्वचनलक्षणवेदगीतादिशास्त्राणाम प्रामाण्याद्बौद्धवादापत्तेः। तस्यां सत्यां बौद्धानामिव विवर्त्तवादिनां तद्व्याखाना-युक्तेः। न च तस्य सत्पुरुषत्वेऽपि निर्विशेषज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति तदीय शास्त्रान्तरतः समाहार्य्यम्॥

অনুবাদ—অন্যার্থ পরামর্শ (বেদান্তদর্শন ১,৩, ১৯ সূত্র) -এই ন্যায় অনুসারে আমার জ্ঞানেরই তাৎপর্য হইতেছে। জ্ঞেয়বস্তুর একত্বরূপে নির্দেশ থাকায় ও যোগ্যতাহেতু আমার জ্ঞানেই ইহার তাৎপর্য। নিরীশ্বর সাংখ্যের ন্যায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ হেতু যে জ্ঞান তাহা এস্থলে সম্মত হয় নাই। কারণ গীতার ১৩,৩ শ্লোকে 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্' ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও এই শ্রীভগবানের উক্তিতে আমি শব্দে ঈশ্বরেরই পরামর্শ হইতেছে।

এস্থলে বিবর্তবাদের (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির) ন্যায় ইহা ঈশ্বরের ভ্রমমাত্র প্রতীত পুরুষত্ব নহে। কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের বচনস্বরূপ বেদগীতাদি শাস্ত্র অপ্রামাণ্য হয় ও বৌদ্ধবাদের ন্যায় আপত্তি উপস্থিত হয়। তাহা হইলে বৌদ্ধগণের ন্যায় বিবর্তবাদিগণেরও সেই ব্যাখ্যা অনুপযুক্ত। সেই ঈশ্বর সত্য পুরুষ হইলেও নির্বিশেষ জ্ঞানই যে একমাত্র মুক্তির সাধন নহে—ইহা (ঈশ্বর সম্বন্ধীয়) শাস্ত্রান্তর হইতে সম্যক্ প্রকারে সংগ্রহ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—(অন্যার্থস্তুপরামর্শঃ) এইটী বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৯ সূত্র। ইহা দহরাধিকরণে উক্ত হইয়াছে। সূত্রার্থ—অন্যার্থঃ (অন্য উদ্দেশে) পরামর্শঃ (সম্বন্ধ.)। জীব শরীর হইতে সমুত্থানের পরে পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়। এতদর্থক শ্রুতিবাক্যে দহরাকাশরূপে ব্রহ্মের উপাসনাতে জীবের স্বরূপাবির্ভাব হয়। ইহাই সম্পাদনের নিমিত্ত জীবের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত নহে। এই সূত্র অনুসারে 'আমার জ্ঞানই' তাৎপর্যে আসিতেছে। অর্থাৎ এই বেদান্ত-দর্শনের সূত্রে যেমন জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে নহে, কেবল স্বরূপাবির্ভাবের নিমিত্ত জীবের উল্লেখ, এস্থলে (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানস্থলে) ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে জীব বুঝাইলেও আমার (পরমাত্মার) জ্ঞানই ইহার তাৎপর্যে আসিল। আরও সন্দর্ভকার বলিলেন—

জ্ঞেয়স্যৈকত্বেনৈব নির্দিষ্টত্বাৎ যোগ্যত্বাচ্চ।

অর্থাৎ জ্ঞেয়বস্তুর একত্ব নির্দেশ থাকায় যোগ্যতা হেতু পরমাত্মজ্ঞানেই তাৎপর্য। শ্রীভগবদ্ গীতার ১৩।১৩ শ্লোকে "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদি স্থলে জ্ঞেয়বস্তু এক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদি জীব জ্ঞেয় হইত বহু বলিয়া নির্দেশ করিতেন। তদ্ব্যতীত যখন একজ্ঞানে নিখিল বস্তুর জ্ঞান হয় তখন ইহা পরমাত্ম জ্ঞানেরই বোধক। 'যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি—যাহা জানিলে সকলই জ্ঞাত হয়।

'নিরীশ্বরসাংখ্যবৎ' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। নিরীশ্বর সাংখ্যকারগণের মত—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

সাংখ্যকারিকা।

সাংখ্যের চতুর্বিংশ তত্ত্ব যথা—

মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান পদার্থ, অবিকৃতি বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য, অবিকৃতি শব্দে কাহারও কার্য নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মহৎ আদি লইয়া সাতটী পদার্থ (মহৎ, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র

ও পঞ্চতন্মাত্র বলিতে—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রকে বুঝায়) ইহারা প্রকৃতিও বটে বিকৃতিও বটে অর্থাৎ কার্যকারণ উভয়স্বরূপ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মন ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শটী পদার্থ কেবলই বিকার বা কার্যস্বরূপ কিন্তু পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূত। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। ইহারা ও মনঃ এই ষোলটী পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক। কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন অতএব সে কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে। এই কারণে পুরুষ নির্গুণ কেবল চৈতন্যমাত্রাত্মক, নিত্য নিষ্ক্রিয়, সর্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্। নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় হেতুই আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না। এই প্রকার তত্ত্ব নির্ণীত হইলেও পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ সর্বদা একত্র থাকায় পুরুষের চৈতন্য অচেতন প্রকৃতিতে আরোপিত হওয়ায় স্ফটিক মণিতে জবাপুষ্পের লৌহিত্যের ন্যায় প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব ধর্ম (ক্রিয়াশীলতা) পুরুষে আরোপিত হয়। তাহাতেই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'আমি কর্তা ভোক্তা' এইরূপ মনে করে। এই প্রকার অজ্ঞানে বিষয়াদির ভোগ, এবং তত্ত্বজ্ঞানে পরম মুক্তি হয়।

ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥

সাংখ্যকারিকা। ১৪।

যেহেতু প্রকৃতির চৈতন্য নাই ও পুরুষেরও কর্তৃত্ব নাই, অথচ আমি কর্তা ও চেতন ইত্যাদি প্রকারে কর্তৃত্ব ও চৈতন্যের একাধিকরণে ব্যবহার আপামর পর্যন্ত প্রসিদ্ধ, সুতরাং বুঝিতে হইবে অগ্নির সান্নিধ্যবশতঃ যেমন লৌহে অগ্নির ধর্ম দাহপ্রকাশাদি আরোপিত হয়, তদ্রূপ পরস্পরের সংযোগ জন্য অচেতন প্রকৃতি (প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি) চেতনের ন্যায় এবং অকর্তা, উদাসীন (অভোক্তা) পুরুষও কর্তার ন্যায় প্রতীত হয়। অর্থাৎ পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে আর প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে আরোপিত হয়। ইহাই হইতেছে অবিবেক এবং সংসার বন্ধের কারণ। আর ইহার পার্থক্যোপলব্ধিই বিবেক জ্ঞান এবং ইহাই মুক্তির কারণ।

ইহাই হইল নিরীশ্বর সাংখ্যমত। পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার বলিলেন যে নিরীশ্বর সাংখ্যমতাবলম্বিগণ যেমন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ নির্ণীত করিয়াছেন এখানে তদ্রূপ হইবে না। অর্থাৎ 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং' গীতার এই শ্লোকে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান' বলাতে আপাততঃ দৃষ্টিতে উভয়ের বিভাগ দেখান হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা নহে। কারণ গীতাতেই ১৩।২ শ্লোকে পূর্বেই বলিলেন "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" অর্থাৎ আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; এস্থলে আমাকে বলিতে শ্রীভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে কেননা ইহার বক্তা

শ্রীভগবান্, সুতরাং আমাকে বলিতে ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার বলিয়াছেন বিবর্তবাদীর ন্যায় ঈশ্বরের ভ্রমমাত্র পুরুষত্বের প্রতীতি নহে। ইহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ বিবর্তবাদ কি তাহা বুঝা উচিত।

বিবর্তবাদ—যে বস্তুর যে স্বভাব তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, অথচ তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পায় তাহাকে বিবর্ত বলে। বিকারে বস্তুর স্বভাবের পরিবর্তন হয়, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি—এখানে দুগ্ধের তরলাদি স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া (ঘন) দধি হইল। বিবর্তে তাহা হয় না, বস্তু সেই প্রকারই থাকে, কেবল দেখিতে অন্যরূপ দেখায়, যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। রজ্জু সেই প্রকারই আছে কিন্তু তাহাতে সর্পভ্রান্তি হয়।

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ॥

বিবর্তবাদিগণ বলেন—সর্বপ্রকার ভেদরহিত নির্বিশেষে একমাত্র চিৎস্বরূপ কূটস্থ নিত্য জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানস্বরূপ নানাপ্রকার বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয়।

ইহাই বিবর্তবাদিগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সন্দর্ভকারের মত তাহা নহে। কারণ এ স্থলে (গীতায়) পুরুষের ভ্রমমাত্র প্রতীতত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। যদি পুরুষের (ক্ষেত্রজ্ঞের) ভ্রমমাত্র প্রতীতত্ব এস্থলে প্রতিপাদিত হইত তাহা হইলে ঈশ্বরের নিজের উক্তি যে বেদ-গীতাদি শাস্ত্র তাহা বৃথা হইত, ও বেদশাস্ত্রাদি না মানিলে নাস্তিক বৌদ্ধবাদই উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও কথিত হইয়াছে—'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক। অতএব বৌদ্ধবাদিগণের ন্যায় বিবর্তবাদিগণের সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক। (নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান)

আর নির্বিশেষ জ্ঞানই যে মুক্তির সাধন নহে তাহাও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে বুঝিতে হইবে। সন্দর্ভকারাদৃত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে ইহাই বলা যায় যে বেদান্তের অভেদবাদ (monism) ও সাংখ্যের ভেদবাদ (dualism) নিরাশ করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই স্থাপিত হইল।

"एवं सततयुक्ता ये" इत्यादि पूर्वाध्याये निर्विशेषज्ञानस्य हेयत्वेन विवक्षितत्वात्। तत्रैव च। "ये तु सर्वाणि कर्माणी" त्यादिनाऽनन्यभक्तानुद्दिश्य "तेषामहं समुद्धर्त्ता मृत्युसंसारसागरादि"त्यनेन तज्ज्ञानापेक्षापि नादृतेति।

অনুবাদ—এই প্রকার সতত যুক্ত (সমাহিত) যে সকল ব্যক্তি (তোমাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করে) গীতার এই পূর্ব অধ্যায় গত (১২ অঃ) অর্জুনোক্তি জ্ঞানের হেয়ত্বই প্রতিপাদন করিয়াছে, এবং সেই ১২ অধ্যায়েই 'যাহারা সকল কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া উপাসনা করে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা (অনন্য ভক্তগণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীভগবান বলিয়াছেন)—'তাহা-দিগকে মৃত্যুরূপী সংসারসাগর হইতে সম্যক্ প্রকারে উদ্ধার করি'। এখানেও সেই নির্বিশেষ জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞান অপেক্ষা সমাদৃত হয় নাই।

তাৎপর্য—এখানে পূর্বাধ্যায় বলিতে শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ই বুঝিতে হইবে, কারণ "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদি ১৩ অধ্যায়ের শ্লোক। পূজ্যপাদ শ্রীসন্দর্ভকার "এবং সততযুক্তা যে" এই শ্লোকের একাংশ ধরিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ গীতা ১২।১।

গীতার ১১ অধ্যায়ের শেষ ৫৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ 'মৎকর্মকৃৎ মৎপর' ইত্যাদি স্থানে পুনঃ পুনঃ মৎশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; এই 'আমার' পদে শ্রীভগবানের নিরাকার নির্গুণ স্বরূপ বা সাকার সগুণ স্বরূপ লক্ষিত হইতেছে এই সংশয় অর্জুনের উপস্থিত হইল। কারণ

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ গীতা ৭।১৯।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহুজন্মের পর সমস্তজগতই বাসুদেবরূপ এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন, তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্লভ।

এই শ্লোকে 'মৎ' শব্দে নিরাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন 'নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ গীতা ১১।৫৩।

হে অর্জুন! তুমি যে আমার বিশ্বরূপ দেখিলে উহা বেদাধ্যয়ন দ্বারা তপস্যা বা দানের দ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কেহ দর্শন করিতে পারে না ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিতে 'মৎ' শব্দ দ্বারা সাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব শ্রীভগবানকে সাকার সগুণরূপে বা নির্গুণ নিরাকাররূপে উপাসনা করা উচিত এই বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—

হে ভগবন্ যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক একাগ্রচিত্তে সবিশেষ রূপে সগুণ শ্যামসুন্দরাকাররূপে তোমাকে সম্যক্ উপাসনা করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্ত নির্বিশেষরূপে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে এই উভয়ের মধ্যে কে যোগবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা? গীতা ১২।১

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ দিয়াছেন

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ গীতা ১২।২

হে অর্জুন! যাহারা একাগ্রচিত্তে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার (সগুণ স্বরূপের) আরাধনা করে, আমার মতে তাহারাই যোগবিত্তম অর্থাৎ যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি উক্তি দ্বারা নির্বিশেষ (নির্গুণ) জ্ঞান তুচ্ছরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগীতার ১২।৬-৭ শ্লোকে জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রদ্ধার প্রয়োজন তাহাই দেখাইয়াছেন। যথা—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭ ॥

যাঁহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য সমাধি যোগ দ্বারা আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক স্বাভাবিক সমস্ত কর্মই শ্রীভগবান্ বাসুদেবে ন্যাস করিয়া ভক্তি পূর্বক তাঁহারই শরণাগত হন, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে একমাত্র ভগবানই যাঁহাদের অবলম্বন, ভগবানকে ভুলিয়া ক্ষণার্ধকালও বাঁচিয়া থাকা যাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি সকলকে শীঘ্রই মৃত্যুরূপী সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

পূজ্যপাদ শ্রী সন্দর্ভকার বলিলেন শ্রীভগবানের মুখনির্গত বাক্য দ্বারা জ্ঞানের আদর করা হয় নাই এবং অনন্য ভক্তগণকে ভগবান্ মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব এস্থলে ভক্তিরই প্রাধান্য বোধ হইতেছে।

तदुक्तमेकादशे स्वयं भगवता "यत्कर्मभिर्यत्तपसे"त्यादि। मोक्षधर्मे च।

या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये।
तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः॥ इति॥

अत्रत्य पूर्वाध्याये विश्लाघितं तदेवान्यथाकर्तुं सविशेषतया निर्दिश्य
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः।
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते

इत्यनेन भक्तिसम्वलिततया सुकरार्थप्रायं कृतम्। अतएव व्यष्टिक्षेत्रज्ञ एव भक्तत्वेन निर्दिष्टसमष्टिक्षेत्रज्ञस्तु ज्ञेयत्वेनेति क्षेत्रक्षेत्रज्ञानाभ्यां सह ज्ञेयस्य पाठादनुस्मार्य्यं तदनन्तरञ्च तस्य तस्य जीवत्वमीश्वरत्वञ्च क्षरं नेति दर्शितम्॥

অনুবাদ—ইহা শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২০।৩২ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—যাহা কর্ম সকলের দ্বারা এবং তপস্যা দ্বারা (লাভ হয় আমার ভক্ত ভক্তিযোগে সেই সকল লাভ করে) ইত্যাদি।

এবং মোক্ষধর্মেও কথিত হইয়াছে—

'ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থে যে সাধনসম্পত্তি অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রাপ্তির জন্য যে সাধন করা প্রয়োজন নারায়ণাশ্রিত ব্যক্তি সেই সাধন সকল ব্যতীতও ওই চারি পুরুষার্থ লাভ করে।'

অত্রত্য পূর্বাধ্যায়ে (গীতার ১২ অধ্যায়ে) বিশেষরূপে প্রশংসিত যে (সবিশেষ) জ্ঞান তাহাই অবুথা (সত্যরূপে স্থাপিত)করিবার নিমিত্ত সবিশেষরূপে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন— 'সংক্ষেপরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কথিত হইল, আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব অর্থাৎ সমানৈশ্বর্য লাভের উপযুক্ত হয়। [গীতা। ১৩।১৮।] এই শেষ প্রমাণ দ্বারা সেই জ্ঞান ভক্তি-সম্বলিত হইলে যে অনায়াস লভ্য হয় তাহাই স্পষ্টরূপে স্থাপিত হইল। অতএব এস্থলে ব্যক্তিক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ এক দেহস্থিত আত্মা ভক্তরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। আর সমষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ যিনি সর্বান্তর্যামী তিনি জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর পাঠ হেতু অনুস্মরণ করাইয়া অতঃপর সেই সেই বস্তুর জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব দেখান হইল, কিন্তু ক্ষরত্ব (বিনাশিত্ব) দেখান হয় নাই।

তাৎপর্য—নির্বিশেষজ্ঞানের হেয়ত্ব দেখাইয়া এই নির্বিশেষজ্ঞানের যে কোন প্রয়োজন নাই তাহাই শ্রীভাগবতের ১১।২।৩২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

যৎকর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা॥

কর্মসমূহ তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য যোগ, ও দানধর্মদ্বারা এবং তীর্থযাত্রা ব্রতাদি অন্য মোক্ষসাধন দ্বারা যাহা কিছু পাওয়া যায় আমার ভক্ত ভক্তিযোগে সেই সকল অনায়াসে লাভ করে।

শ্রীভগবানের এই উক্তি দ্বারা ভক্তিযোগে জ্ঞানের অপেক্ষা রহিল না, ভক্তি নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এবং মোক্ষধর্মের যে বচন (সাধন মুক্তি ইত্যাদি) তাহাতে দেখা গেল ভক্তি কাহাকেও অপেক্ষা করে না। এবং গীতার ১২ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে 'যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমার ধ্যান করিয়া উপাসনা করে' ইত্যাদি স্থানে সবিশেষ জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে। আবার গীতার ১৩।১৮ শ্লোকে ক্ষেত্র, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় এই ত্রিবিধতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন 'আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার সমানৈশ্বর্য লাভ করে'। এই প্রমাণ দ্বারা ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞানই যে সুখকর হয় ইহাই দেখান হইয়াছে। এস্থলে একদেহস্থিত ভক্তরূপে ব্যষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ, আর সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সমষ্টিরূপে জ্ঞেয়। একটি দলবদ্ধ সমস্ত বস্তুকে সমষ্টি বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক একটীকে ব্যষ্টি বলে। যেমন বন হইল বৃক্ষের সমষ্টি এবং সেই বনের এক একটী বৃক্ষ হইল ব্যষ্টি। এস্থলে এক এক দেহস্থিত আত্মা ব্যষ্টি, আর সকলের অন্তর্যামীরূপে সমষ্টি।

ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সহিত একত্র জ্ঞেয় বস্তুর কথা বলিয়াছেন,—ইহাতে ক্ষেত্রজ্ঞের জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব আসিল অর্থাৎ ব্যষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ জীব আর সমষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর। কিন্তু গীতার ১৩।১৮ শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ যে ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী তাহা বলা হয় নাই।

যতঃ

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু ॥ ইতি ॥
জীবস্য প্রকৃতিস্থত্বং নির্দিশ্য স্বতস্তস্যা
প্রাকৃতত্বদর্শনয়া স্ফুটমেবাক্ষরত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥

অনুবাদ—যেহেতু পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি জাত গুণসমূহ (শোকমোহাদি) ভোগ করে এবং উহার গুণ সঙ্গই সৎ ও অসদ্ যোনিতে জন্মের প্রতি কারণ। এই শ্রীভগবদ্ গীতার ১৩।২১ শ্লোকের উক্তি দ্বারা জীবের প্রকৃতস্থতা নির্দেশ করিয়া স্বভাবতই ঈশ্বরের অপ্রাকৃতত্ব (প্রকৃতি সম্বন্ধ শূন্যতা) দর্শনে স্পষ্টরূপেই তাহার অক্ষরত্ব জানাইয়াছেন।

তাৎপর্য—প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের (জীবের) স্বতঃ কোন সংসার নাই, মায়ার সঙ্গে তাদাত্ম্য নিবন্ধন সে সংসারের সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে এবং দেব পশু ও নর প্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ সত্ত্বগুণাধিকারে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকারে মানব যোনিতে, তমোগুণাধিকারে পশ্বাদি যোনিতে জন্মে। ইহাদ্বারা জীব প্রকৃতিতে (মায়াতে) অবস্থিত—ইহাই দেখাইয়া ঈশ্বরের অবিনাশিত্বও জানাইয়াছেন। পরের বাক্যে এ বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইতেছে।

'উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥'
ইতি জীবাৎ পরত্বেন নির্দিষ্টস্য পরমাত্মাখ্য-
পুরুষস্য তু কৈমুত্যেনৈব তদ্দর্শিতম্ ॥

অনুবাদ—এই দেহে পরম পুরুষ ভগবান্ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [গীতা ১৩।২২] এই শ্লোকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠরূপে নির্দিষ্ট পরমাত্মা নামক পুরুষের কৈমুত্য ন্যায় দ্বারাই অক্ষরত্ব (অবিনাশিত্ব) দেখান হইয়াছে।

তাৎপর্য—কৈমুত্য ন্যায় অর্থাৎ যে ভাব দুর্বল ব্যক্তি বহন করিতে পারে সে ভার বলবান্ ব্যক্তি অবশ্যই বহন করিতে সমর্থ এই প্রকার অবস্থাকে কৈমুত্য ন্যায় বলে। এস্থলে বুঝিতে হইবে স্বতঃ জীব অক্ষর (অবিনাশী) সুতরাং জীব হইতে শ্রেষ্ঠরূপে কথিত যে পরমাত্মা অক্ষর তাহাতে আর বলিবার কি আছে ?

'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥'

इत्यत्र जीवस्याप्यक्षरत्वं कण्ठोक्तमेव। तत्र उपद्रष्टा परमसाक्षी अनुमन्ता तत्तत्कर्मानुरूपप्रवर्त्तकः। भर्ता पोषकः भोक्ता पालयिता, महेश्वरः सर्वाधिकर्ता, परमात्मा सर्वान्तर्यामीति व्याख्येयम्। उत्तरपद्ययोस्तु कूटस्थ एकरूपतया तु यः कालव्यापी स कूटस्थ इत्यमरकोषादवगतार्थः।

অনুবাদ—শ্রীভগবদ্‌গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১৬।১৭ শ্লোকে ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত ভূতসকল ক্ষর (বিনাশী) আর যিনি কূটস্থ অর্থাৎ দেহ বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট না হইয়া অবস্থান করেন তিনি অক্ষর। ক্ষর ও অক্ষর ভিন্ন আর একটী পুরুষ আছেন—ইনিই পরমাত্মা যিনি নির্বিকার নিয়ন্তৃরূপে লোকত্রয়ের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন।

এস্থলে জীবেরও অক্ষরত্ব (অবিনাশিত্ব) তাৎপর্যার্থে আসিল।

(শ্রীল পূজ্যপাদ শ্রীসন্দর্ভকার গীতার ১৩।২২ উপদ্রষ্টা ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজে করিতেছেন) উপদ্রষ্টা=পরম সাক্ষী, অনুমন্তা=সেই সেই কর্মের অনুরূপ প্রবর্তক, ভর্তা=পোষক, ভোক্তা=কাময়িতা, মহেশ্বর=সকলের উপরে কর্তা, পরমাত্মা=সকলের অন্তর্যামী এই প্রকার ব্যাখ্যা কর্তব্য।

দুইটী পদ্যে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১৬-১৭ শ্লোকে যে কূটস্থ শব্দ আছে তাহার অর্থ—একরূপে যিনি কালব্যাপী তাহাকেই কূটস্থ বলে ইহা অমরকোষ অভিধান [বিশেষ্য নিঘ্নবর্গ ৭৩ শ্লোক] হইতে অবগত।

তাৎপর্য—তিনি নির্বিকার সর্বকালে সর্ব অবস্থায় একরূপ, কোনও কালে কোনও অবস্থায় যাহার ভাবান্তর হয় না, চিরকাল একরূপেই বিদ্যমান তাহাকে কূটস্থ বলে। পঞ্চদশীকারও বলিয়াছেন—কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে। যে কূটের ন্যায় নির্বিকার থাকে তাহাকে কূটস্থ বলে। কূট শব্দের অর্থ লৌহপিণ্ড তাহার ন্যায় যাহার স্থিতি। (কর্মকার) লোহার লৌহপিণ্ডের (নেহাই) উপর রাখিয়া লৌহদ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করে কিন্তু নীচস্থ লৌহপিণ্ড অবিকৃতভাবেই থাকে তাহার কোনও পরিবর্তন হয় না। এই নিম্নস্থ লৌহপিণ্ডকেই কূট বলে, তাহার ন্যায় অবিকৃতভাবে যাহার স্থিতি সেই কূটস্থ।

असौ शुद्धजीव एव, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य इत्युत्तरात्। तदेवमत्रापि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञसर्वक्षेत्रज्ञा उक्ताः। तत्र चोत्तरयोरन्य इत्यनेन मिथोभिन्नयोरेव सतोरक्ष रयोर्नतत्तद्रूपतापरित्यागः सम्भवेदिति न कदाचिदपि निर्विशेषरूपेणावस्थिति-रिति दर्शितम्।

অনুবাদ—এই শুদ্ধজীবই কূটস্থ, যেহেতু উত্তর বাক্যে (গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১৬-১৭ শ্লোকে) উত্তমপুরুষ অন্য অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এখানেও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সর্বক্ষেত্রজ্ঞ উক্ত হইয়াছে। সেইস্থলে অর্থাৎ গীতার ১৫ অধ্যায়ে ১৬-১৭ শ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য—এই বাক্যদ্বারা পরস্পর ভিন্ন যে অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও পরমাত্মা, তাহাদের অক্ষররূপতা পরিত্যাগের কখনই সম্ভাবনা নাই। ওই কারণে তাহাদের নির্বিশেষরূপে (একরূপে) অবস্থান কখনই হইতে পারেনা—ইহা দেখান হইল।

তাৎপর্য—গীতার ১৫ অধ্যায়ের ১৬-১৭ শ্লোকে শুদ্ধজীব ও পরমাত্মা এই উভয়ই অক্ষর-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই উভয় অক্ষররূপতা পরিত্যাগ করিয়া নির্বিশেষরূপে থাকিতে পারেনা অর্থাৎ উভয়ের ঐক্য হইতে পারে না।

তস্মা"ন্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইতি যদুক্তং তদপি তৎসার্ষ্টিমাপ্তিতাৎপর্য্যকং।

অনুবাদ—এতএব আমার ভাবলাভের উপযুক্ত হয়—(গীতা ১৩।১৯ শ্লোকে) এই উক্তি। ইহার তাৎপর্য—আমার সমানৈশ্বর্য প্রাপ্তির যোগ্য হয়।

তাৎপর্য—গীতার ১৩।১৯ সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

'হে অর্জুন! তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। আমার ভক্ত এই ক্ষেত্রাদি পদার্থত্রয় বিদিত হইয়া আমার ভাবলাভের যোগ্য হয়'। কিন্তু সাযুজ্য লাভের উপযুক্ত হয় এই প্রকার অর্থে নির্বিশেষতাই আসিত—তাহাতেই শ্রীপাদসন্দর্ভকার বলিলেন যে (মদ্ভাবায়) আমার ভাবলাভের অর্থাৎ আমার সার্ষ্টি (সমানৈশ্বর্য) লাভের যোগ্য হয়—ইহাই তাৎপর্য কিন্তু মদ্ভাব বলিতে সাযুজ্য লাভ নহে।

তদেবং দ্বয়োরক্ষরত্বেন সাম্যেঽপি জীবস্য হীনশক্তিত্বাৎ প্রকৃত্যাবিষ্টস্য তন্নিবৃত্ত্যর্থমীশ্বর এব ভজনীয়ত্বেন জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ—এই প্রকার উভয়ের অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও পরমাত্মার অক্ষরস্বরূপে (অবিনাশিস্ব-রূপে) সাম্য হইলেও হীনশক্তি হেতু মায়াবিষ্ট জীবের মায়া নিবৃত্তির জন্য ঈশ্বরই ভজনীয় ইহা জানিতে হইবে।

তাৎপর্য—ইতঃপূর্বে আলোচনা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে শুদ্ধ জীব ও ঈশ্বর উভয়েই

অবিনাশী—যদিও অবিনাশিত্ব অংশে উভয়ে সমান তথাপি জীব মায়ার অধীন আর ঈশ্বর মায়ার অধীশ—মায়া তাঁহার অধীনে থাকে সুতরাং মায়া নিবৃত্তির জন্য মায়াধীশ ঈশ্বরের উপাসনা মায়াধীন জীবের কর্তব্য।

तस्मा'दिद' शरीरमि'त्यादिक'
पुनरित्थ' विवेचनीयमिदमिति
स्वस्वापरोक्षमित्यर्थः।

অনুবাদ—এতএব (গীতার ১৩।১ শ্লোকে ইদং শরীরম্) 'এই শরীর ক্ষেত্র' ইত্যাদি বাক্যের পুনরায় এই প্রকার বিবেচনা করিতে হইবে। ইদম্ অর্থাৎ 'এই' পদের দ্বারা নিজ নিজ অপরোক্ষ (পরিদৃশ্যমান) শরীরকে বুঝিতে হইবে। ইহাই অর্থ।

তাৎপর্য— ইদম্ প্রত্যক্ষরূপং,
সমীপতরবর্তি চৈতদোরূপম্।
অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে
তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ॥

ইদম্ শব্দে প্রত্যক্ষ বস্তুকে, এতৎ শব্দে সমীপতরবর্তি বস্তুকে, অদস্ শব্দে দূরস্থ বস্তুকে এবং তৎ শব্দে পরোক্ষ বস্তুকে বুঝায়। এই নিয়ম এই স্থলে অর্থাৎ 'এই শরীর ক্ষেত্র'—এখানে ইদং শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান নিজ নিজ শরীরকেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ দৃশ্যমান শরীরই ক্ষেত্র।

शरीरक्षेत्रज्ञयोरेकैकत्वेन ग्रहणमत्र व्यक्तिपर्यवसानेन जातिपुरस्कारेणैवेति गम्यते "सर्वक्षेत्रेष्वि"ति बहुवचनेनानुवादात्।

অনুবাদ—শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞের এক এক রূপে (অর্থাৎ একবচন দ্বারা) যে গ্রহণ তাহা ব্যক্তিতে পর্য্যবসান হেতু জাতি পুরস্কারেই বুঝিতে হইবে, যেহেতু (গীতা ১৩.৩ শ্লোকে) সকল ক্ষেত্রে (আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও)—এখানে ক্ষেত্র সকল এই বহুবচনের অনুবাদ (পশ্চাৎ কথন)।

তাৎপর্য—শ্রীভাগবদ্গীতা ১৩।২ শ্লোকে বলা হইয়াছে—এই শরীর ক্ষেত্র এবং ইহাকে যে জানে সে ক্ষেত্রজ্ঞ। এস্থলে ক্ষেত্র শব্দে ও ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে একবচনের প্রয়োগ আছে। ইহাতে ক্ষেত্র এক এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এক—ইহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে হইবে না। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের উত্তর একবচন থাকিলেও জাতিত্ব পুরস্কারেই ইহাদের অর্থ বুঝিতে

হইবে। যেমন মানুষ বলিলে মনুষ্য জাতিকেই বুঝায় তদ্রূপ এখানে ক্ষেত্র বলিতে এক ক্ষেত্রকে না বুঝাইয়া ক্ষেত্র সকলকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে এক ক্ষেত্রজ্ঞ না বুঝাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ সকলকেই বুঝিতে হইবে। যেহেতু পরের শ্লোকে (১৩.৩) (ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব-ক্ষেত্রেষু)—সকলক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে—এইস্থানে ক্ষেত্রসকল—এই বহুবচনের উল্লেখ আছে। সুতরাং পূর্বশ্লোকে (১৩.২) ক্ষেত্র একবচনান্ত থাকিলেও জাতি পুরস্কারে বহু ক্ষেত্রই বুঝিতে হইবে। ব্যক্তি বলিতে একজনকে এবং জাতি বলিতে বহুজনকে বুঝায়।

জাতি---নিত্য অনেক সমবেত ধর্ম। একজাতীয় যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম। যে ধর্ম সেই জাতীয় পদার্থেই থাকে, তদ্‌ভিন্ন জাতীয় পদার্থে দেখা যায় না তাহাকে জাতি বলে। যেমন ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণ বলিলে সমস্ত ব্রাহ্মণকে বুঝায় এবং উক্ত ব্রাহ্মণত্ব শূদ্রাদিতে নাই। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি করে---এখানে এক ব্রাহ্মণের (ব্যক্তির) উল্লেখ হইলেও সকল ব্রাহ্মণই যে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে তাহাই বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ এস্থলে এক ক্ষেত্র ও এক ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে সমস্ত ক্ষেত্র ও সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ বুঝাইল।

"एतद्‌ यो वेत्ती" त्यत्र "देहोऽसवोऽक्षा मनव" इत्यादौ "सर्वं पुमान्‌ वेद गुणांश्च तज्ज्ञ" इत्युक्तदिशा "क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतीरि"त्युक्तदिशा च जानाती-त्यर्थः। "क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धी"त्यत्र मां स्वयं भगवन्तमेव सर्वेष्वपि समष्टिव्यष्टि-रूपेषु क्षेत्रेषु नतु पूर्वक्षेत्रज्ञवन्निजनिजक्षेत्र एव क्षेत्रज्ञञ्च विद्धीति।

অনুবাদ---(গীতার ১৩.২ শ্লোকে) এই শরীরকে যিনি জানেন (তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ) (শ্রীভাগবতে ৬.৪.২৫) 'দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণ' ইত্যাদি শ্লোকে 'পুরুষ (জীব) এই সকলকে ও গুণনিচয়কে জানেন' এই উক্তি বশতঃ এবং (শ্রীভাগবতের ৫.১১.১২ শ্লোকে) 'ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) মনের বিভূতি' ইত্যাদি বলিতে জানেন ইহাই অর্থ। (শ্রীভগবদ্‌ গীতার ১৩.৩ শ্লোকে) 'ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া আমাকে জান' এস্থলে আমাকেই অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌কেই সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ ক্ষেত্র সকলে জান, কিন্তু পূর্বের ন্যায় (গীতা ১৩.২ শ্লোকের ন্যায়) মাত্র নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিওনা।

তাৎপর্য—গীতার ১৩. ২ শ্লোকে এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে এবং ইহাকে যে জানে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। পরবর্তী ১৩।৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন 'হে ভরত বংশোদ্ভব অর্জুন, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান'। শ্রীপাদসন্দর্ভকার ইহার ব্যখ্যা করিলেন 'আমাকে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌ যে 'আমি' আমাকেই সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান।' কিন্তু ইহার পূর্ব শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে জীবই বোঝায়—এই কারণে শ্রীসন্দর্ভকার বলিলেন পূর্বের ন্যায় শ্রীভগবান কেবলমাত্র একক্ষেত্রজ্ঞাতা জীব নহে।

তদুক্তং—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি"তি। যত্র গত্যন্তরং ন বিদ্যতে তত্রৈব লক্ষণাময়কষ্টমাশ্রিয়তে। তথাপি তেন সামান্যাধিকরণ্যং যদি বিবক্ষিতং স্যাত্তর্হি ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মাং বিদ্ধীত্যেতাবদেব তঞ্চ মাং বিদ্ধীত্যেতাবদেব বা প্রোচ্যেত। কিন্তু "ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতীরি"ত্যাদিবৎ ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়মপি বক্তব্যমেব স্যাৎ।

অনুবাদ---(গীতার ১০.৪২ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কর্তৃক) উক্ত হইয়াছে; যথা --'হে অর্জুন! আমি একাংশে এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপিয়া আছি।' (এই বাক্য দ্বারা সর্বক্ষেত্রে এই যে আমার স্থিতি এবং আমিই যে সর্বক্ষেত্রজ্ঞ---ইহা প্রতিপাদিত হইল)। যে স্থলে (অর্থ করিতে গিয়া) অন্য গতি না থাকে সেই স্থলেই লক্ষণারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তথাপি 'তাহার' সহিত সামান্যাধিকরণ্য বলিতে যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইত তাহা হইলে (গীতার ১৩.৩ শ্লোকে) ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকে জান—কেবল ইহাই অথবা---আমাকে (জীবকে) আমি বলিয়া জান---এই প্রকার বলিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া (শ্রীভাগবতের ৫.১১. ১২-১৩ শ্লোকে) ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয় বক্তব্য হইল অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই ক্ষেত্রজ্ঞ।

ব্যাখ্যা—শ্রীপূজ্যপাদ সন্দর্ভকার বলিলেন—যেখানে অন্য উপায় না থাকে সেই স্থলে লক্ষণাস্বীকার করিতে হয়।

শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তিতে প্রসিদ্ধ অর্থ জানা যায় তাহাকে বৃত্তি বা প্রধানশক্তি বলে। সেই শক্তিলভ্য অর্থের নাম মুখ্যার্থ। যে স্থলে এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তার তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষা হয় না সেস্থলে তাৎপর্যের অবিরুদ্ধ অন্য একটী তদ্যুক্ত অর্থ যেশক্তি দ্বারা বুঝায়, তাহাকে লক্ষণা বলে। যেমন—(গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি)—গঙ্গাতে ঘোষ বাস করিতেছে বলিলে গঙ্গাজল মধ্যে ঘোষ পল্লী বাস করিতে পারে না—এই হেতু শৈত্য-পাবনাদিজন্য লক্ষণাদ্বারা গঙ্গা শব্দে তাহার নিকটস্থ তীরভূমি বুঝিতে হইল। অর্থাৎ গঙ্গাবাস শব্দে গঙ্গাতীরে বাস বুঝাইল। কিন্তু যেখানে মুখ্যার্থের সম্ভাবনা থাকে সেখানে লক্ষণা স্বীকার করা উচিত নহে।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য মতে "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই সেই দেবদত্ত বলিতে লক্ষণা ব্যতীত এই বাক্যের অর্থ সঙ্গতি হয় না। যেহেতু (সঃ) তৎশব্দের সাধারণ অর্থ অতীতকালীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর একটী পদার্থ। আর (অয়ম্) ইদম্ শব্দের সাধারণ অর্থ বিদ্যমান এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ। যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্তমান উপস্থিত—এরূপ হইতে পারে না—চক্ষুর অগোচর হইয়াও চক্ষুর গোচর হইতে পারে না সুতরাং সামানাধিকরণ্য (একত্ব) বিরুদ্ধ হয়। বিরুদ্ধ বলিয়াই 'সঃ' এবং অয়ং পদের মুখ্য অর্থ পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেবদত্ত

রূপ একমাত্র বিশেষ্য অর্থে লক্ষণা করিতে হয়। কাজেই তখন বিরুদ্ধ বিশেষ ভাসমান অর্থ পরিত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য দেবদত্তকে বুঝাইতেছে বলিয়া (সোঽয়ম্) "সেই এই" এই পদদ্বয়ের বিরোধ থাকে না। সেইরূপ "তত্ত্বমসি"—তৎ ত্বং পদের বিরুদ্ধাংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া নির্বিশেষ এক চৈতন্য আত্মাকে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়। এই প্রকার লক্ষণাকে কেহ ভাগলক্ষণা বা অজহৎস্বার্থ লক্ষণা বলে।

কিন্তু শ্রীপূজ্যপাদ সন্দর্ভকারের অভিপ্রায়—বিষ্ট্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। আমি সমস্ত জগতে ব্যাপিয়া আছি ইত্যাদি বাক্যে এবং ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকে জানিও—ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব হইতে পারে না। যদি বল যে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও—ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্য জীব ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদক, তাহাতেই শ্রীপাদসন্দর্ভকার বলিতেছেন,—তথাপি (তাহা হইলেও) যদি জীবের সহিত ঈশ্বরের সামানাধিকরণ্য (একত্ব) বলিতে ইচ্ছা হইত তাহা হইলে গীতার ১৩।৩ শ্লোকে সকলক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও—শ্রীভগবান এই প্রকার বলিতেন অথবা জীবকে আমি বলিয়া জান—এই প্রকারই বলিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রীভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ১১. ১২-১৩ শ্লোকের ন্যায় দুই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর প্রতিপাদিত হইয়াছেন। গীতার ১৩।২ শ্লোকে প্রথমতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে তাহা বলিলেন। তাহার পরশ্লোকে (১৩।৩ শ্লোকে) বলিলেন—সকল ক্ষেত্রে (সকল শরীরে) আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। যদি দুই ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের ও পরমাত্মার) একত্ব বলা শ্রীভগবানের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দুই ক্ষেত্রজ্ঞ নির্দিষ্ট হইত না।

তথাচ ব্রহ্মসূত্রং—
"গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাদি"তি ॥

অনুবাদ—এবিষয়ে ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন ১ অধ্যায়ে ২য়পাদে ১১ সূত্র) যথা—জীব ও পরমাত্মাই গুহাতে (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট, যেহেতু অন্যত্রও এইপ্রকারই দেখা যায়।

তাৎপর্য—ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে—জগতে তাহারা উভয়ে কর্মফল ভোক্তা সর্বোত্তম গুহাতে প্রবিষ্ট—এস্থলে গুহাপ্রবিষ্ট কথায় জীব ও পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। কারণ অন্যত্রও (গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং) 'গুহাপ্রবিষ্ট গহ্বরস্থ আত্মাকে দর্শন করিয়া হর্ষ শোক ত্যাগ করেন' ইত্যাদি কঠশ্রুতিতে (১।২।১২) পরমাত্মারও গুহা প্রবেশের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব জীব ও পরমাত্মাই গুহা প্রবিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে যে জীবাত্মার কর্মফল ভোগ সম্ভব হইলেও পরমাত্মার কর্মফল ভোগের সম্ভাবনা হইতে পারে না। কেন না, শ্রুতিতে দেখা যায় (অনশ্নন্

অন্যঃ অভিচাকশীতি) 'অন্য পরমাত্মা ভোগ না করিয়া পক্ষিরূপে দেখিতেছেন।' এই শ্রুতিতে পরমাত্মার কর্মফল ভোগ নিষিদ্ধ হইতেছে। 'কিন্তু ঋতং পিবন্তৌ' জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে কর্মফল ভোগ করে—এখানে "পিবন্তৌ" এই দ্বিবচন থাকায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই কর্মফল ভোক্তৃত্ব আসিতেছে।

অবশ্য শ্রীরামানুজাচার্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে ছত্রী ন্যায়ের উল্লেখ করিয়া ইহার সমাধান করিয়াছেন। ছত্রী ন্যায় যথা—একসঙ্গে বহুলোক যাইতেছে, তন্মধ্যে অনেকের ছত্র আছে আর কতকগুলি লোকের ছত্র নাই—তথাপি লোকে বলে (ছত্রিণো গচ্ছন্তি) ছত্রধারিগণ যাইতেছে। ইহা দ্বারা ছত্রধারী ও যাহাদের ছত্র নাই তাহাদিগকেও একসঙ্গে ছত্রধারী বলিয়া নির্দেশ করা হইল। এখানেও তদ্রূপ জীবই কর্মফল ভোক্তা কিন্তু পরমাত্মা কর্মফল ভোক্তা নহেন। তথাপি জীবের কর্তৃত্ব লইয়াই একসঙ্গে উভয়কে কর্মফল ভোক্তা বলা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা কর্মফল ভোক্তা নহেন।

तद्द्वैविध्यमेव चोपसंहृतं 'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि"त्यादिना। तस्मादुपक्रमार्थस्योपसंहाराधीनत्वादेष एवार्थः समञ्जसः। यथोक्तं ब्रह्मसूत्रकृद्भिः। 'असद्व्यपदेशादितिचेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषादि'ति।

অনুবাদ—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ (জীব)---ইত্যাদি (গীতার ১৩।২২ শ্লোক প্রভৃতি) দ্বারা তাহার অর্থাৎ জীবের ও পরমাত্মার দ্বিবিধত্ব উপসংহৃত হইয়াছে। অতএব উপক্রম (আরম্ভ) অর্থ উপসংহারের (শেষের) অধীন বলিয়া এই অর্থই সঙ্গত অর্থাৎ এখানে ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বিবিধত্বই সমীচীন।

উপক্রমার্থ যে উপসংহারের অধীন তাহা ব্রহ্মসূত্রের কর্তা (বেদব্যাসও বেদান্তদর্শনে ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ১৮ সূত্রে) বলিয়াছেন—যথা

'অসৎ বলিয়া উল্লেখ হওয়ায় জগৎ অসৎ ইহা বলিতে পারনা। কারণ ধর্মান্তরে বাক্যশেষ হইয়াছে।'

তাৎপর্য—শ্রীভগবদ্গীতার ১৩।২২ শ্লোকে পুরুষ (শুদ্ধ জীব) মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া শোক মোহাদি ভোগ করে---ইহা বলিয়া পরের শ্লোকে (১৩।২৩ শ্লোকে) পরমাত্মার বিষয় বলিয়াছেন—এই দেহে উপদ্রষ্টা অনুমন্তা মহেশ্বর যে পুরুষ আছেন তাঁহাকে পরমাত্মা বলে। এস্থলে প্রথম শ্লোকে জীবনিরূপণ করিয়া শেষ শ্লোকে পরমাত্মা নিরূপণ করিলেন। অতএব উপক্রমার্থ উপসংহারের অধীন হেতু ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বিবিধত্ব।

উপক্রমার্থ যে উপসংহারের অধীন তাহা বেদান্ত দর্শনের সূত্রের দ্বারাও দেখাইলেন। 'অসদ্ব্যপদেশাদিতিচেন্ন ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ---এই সূত্রের ব্যাখ্যা—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উক্ত হয় (৬।২।১) অসদেবেদমগ্র আসীৎ। সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই ছিল। কিন্তু তাহা নহে, কারণ ধর্মান্তরে বাক্যশেষ হইয়াছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ৬। ২। ২ উক্ত হয়--- "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"---হে সৌম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সৎই ছিল---এই ধর্মান্তরে বাক্যশেষ হওয়ায় অর্থাৎ অগ্রে বলিলেন সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ, পরে বলিলেন সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সৎ ছিল—এই উভয় বাক্যের মধ্যে শেষ বাক্যে ধর্মান্তর অর্থাৎ অসৎ হইতে অন্যরূপে (সৎরূপে) নির্দেশ হেতু সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সৎই ছিল বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বে যে সৃষ্টির পূর্বে অসৎ ছিল বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে সৃষ্টির পূর্বে নাম রূপের অভিব্যক্তি না থাকায় অসৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই স্থূলপদার্থকেই লোকে সৎ বলে, সূক্ষ্মপদার্থকে অসৎ বলে। অতএব সৃষ্টির পূর্বে জগতের অনভিব্যক্তি থাকায় উহা অসৎ; আর তাহাই নামরূপে অভিব্যক্ত হওয়ায় তাহাকে সৎ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অসৎ নহে। ছান্দোগ্যপনিষদের উপক্রমে (প্রারম্ভে) জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে; কিন্তু উপসংহার অনুসারেই অর্থ করিতে হইল যে জগতের নামরূপ প্রকাশ না থাকাতেই উহাকে অসৎ বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সৎ।

তদ্রূপ গীতার ১৩।২ শ্লোকে 'এই শরীরকে যে জানে সে ক্ষেত্রজ্ঞ' আর পরের (১৩.৩) শ্লোকে 'সকল ক্ষেত্রে আমাকে (শ্রীভগবানকে) ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও" এই উপক্রমে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে এককেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু গীতার ১৩।২২-২৩ শ্লোকে উপসংহারে স্পষ্টরূপে জীব ও পরমাত্মা পৃথক্‌রূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বিবিধত্ব হইল।

অথ "ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানমি"ত্যত্র যৎ ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয়গতং চেতনাগতঞ্চ জ্ঞানং দর্শয়িষ্যতে। যচ্চ পূর্বত্র ক্ষেত্রজ্ঞে নিজনিজক্ষেত্রজ্ঞানং দর্শিতং তত্তন্মজ্জ্ঞানাংশস্য ক্ষেত্রেষু ছায়ারূপত্বাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞেষু যৎ কিঞ্চিদংশাংশতয়া প্রবেশান্মম এব জ্ঞানং মতমিতি। তস্মাৎ সাধূক্তং মুখ্যং ক্ষেত্রজ্ঞত্বং পরমাত্মন্যেবেতি।

অনুবাদ—অনন্তর 'ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান' এই (গীতার ১৩।৩) শ্লোকে ক্ষেত্রে (শরীরে) জ্ঞানেন্দ্রিয়গত ও চেতনাগত যে জ্ঞান দেখান হইবে এবং পূর্বে (গীতা ১৩।২ শ্লোকে) ক্ষেত্রজ্ঞে (জীবে) যে নিজ নিজ ক্ষেত্রজ্ঞান দর্শিত হইয়াছে সেই সেই জ্ঞান ক্ষেত্র বা শরীরে আমার (শ্রীভগবানের) জ্ঞানাংশের ছায়ারূপে থাকায় ক্ষেত্রজ্ঞ সকলে (জীবসমূহে) অংশাংশ দ্বারা প্রবেশহেতু আমারই (শ্রীভগবানেরই) জ্ঞান বলিয়া সম্মত। অতএব মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞত্ব যে পরমাত্মাতেই—ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে।

তাৎপর্য—শরীরে জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির জ্ঞান ও জীবের নিজ নিজ ক্ষেত্রজ্ঞান বলা হইয়াছে। কিন্তু জীবের স্বতঃ কোন জ্ঞান নাই। শ্রীভগবানের জ্ঞানাংশই ইন্দ্রিয়াদিতে ছায়ারূপে পতিত হয়, আর জীবে শ্রীভগবানের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানাংশের প্রবেশহেতু জীবের ক্ষেত্র জ্ঞান হয়। অতএব পরমাত্মাই মুখ্যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ।

অত্র শ্রীভাগবতঃ পরমাত্মরূপেণাবির্ভাবোঽপি "অজনি চ যন্ময়ং তদ-বিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ"ইত্যেকদিশা শক্তিবিশেষালিঙ্গিতাদ্ যস্মাদংশাজ্জীবানামা-বির্ভাবস্তেনৈবেতি জ্ঞেয়ং। তদুক্তং তত্রৈব 'বিষ্টভ্যাহমি'ত্যাদি।

অনুবাদ---এস্থলে শ্রীভগবানের পরমাত্মরূপে আবির্ভাবও বুঝিতে হইবে। যেহেতু 'ঔপাধিকরূপে বিকারময় জীব উৎপন্ন হইয়া অনুস্যূতভাবে কারণতা পরিত্যাগ না করিয়া নিয়ন্তা হয়'---এই (শ্রীভাগবতের ১০।৮৭।২৬ শ্লোকোক্ত) দিগ্‌দর্শন দ্বারা আলিঙ্গিত যে অংশ হইতে জীবগণের আবির্ভাব হয় সেই শক্তি বিশেষের সহিত (আলিঙ্গিত জীব)–ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই (গীতার ১০।৪২ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে '(হে অর্জুন আমি একাংশে অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষরূপে জগতে) ব্যাপ্ত হইয়া আছি' ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা—শ্রীভাগবতের সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

অপরিমিতাধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব। নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥

প্রলয়কালে যোগনিদ্রায় শয়ান পরমেশ্বরকে সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রথম নিঃশ্বাসোৎপন্ন শ্রুতি যে সকল শ্লোক উচ্চারণে জাগরিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন, হে ধ্রুব। (নিত্য) যদি অসংখ্য জীব সকল নিত্য সর্বগত হয় তাহা হইলে (তোমার সহিত সমতা হেতু) জীব যে ঈশ্বরের শাসনাধীন এই শাস্ত্রের নিয়ম থাকে না। কিন্তু অন্যরূপ হইলে অর্থাৎ জীব ব্যাপক না হইয়া সূক্ষ্ম ব্যাপ্য রূপ হইলে উক্ত নিয়মের হানি হয় না। আর যাহার বিকাররূপে কার্য উৎপন্ন হয়, কারণরূপে কার্যে বিদ্যমান থাকিয়াও যাহা সেই কার্যের নিয়ামক (শাসক) হয়, সেই প্রকার ঈশ্বর হইতে জীব উৎপন্ন হয় বলিয়া ঈশ্বর উহার নিয়ন্তা এবং জীব নিয়ম্য বা শাসনাধীন। যাহারা উভয়কে সমান মনে করে তাহাদের মত বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া দূষিত।

এই শ্লোকে দেখান হইল, প্রপঞ্চ গত জীব সংখ্যাতে অপরিমিত এবং নিত্য শ্রীভগবানের অংশ। চিৎকণ বলিয়া তাহারাও নিত্য; কিন্তু শ্রীভগবানের ন্যায় সেই জীব যদি বিভু বা

সর্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে জীব ঈশ্বরের শাসনাধীনে থাকিবে না। তাই শাস্ত্রকার বলিতেছেন—জীব ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরই জীবের নিয়ন্তা। যদি জীব সর্বগত না হয়, তাহা হইলে জীবের শাস্তা যে ঈশ্বর—শাস্ত্রকারগণের এই উক্তি সার্থক হয়। বাস্তবিকপক্ষে জীব বিভু বা ব্যাপক হইতে পারে না। জীব সূক্ষ্ম ঈশ্বরের শাসনীয়। আরও বিশেষ কথা যে—যাহার বিকাররূপে কোন কার্যের উৎপত্তি হয়, সেই কারণকে পরিত্যাগ না করায় উহাই সেই কার্যের নিয়ামক হয়। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গাদি জন্মে, তাহার কর্তা অগ্নি, আর স্ফুলিঙ্গাদি তাহার কার্য। অতএব স্ফুলিঙ্গাদির কারণ যে অগ্নি তাহা স্ফুলিঙ্গাদর সর্বাংশে ব্যাপিয়া থাকে ও তাহার নিয়ামক হয়। তদ্রূপ ঈশ্বর রূপ কারণ হইতে জীবের উৎপত্তি, সুতরাং ঈশ্বরই জীবের নিয়ামক। ঈশ্বরের শাসকত্ব হেতু জীব সর্বগত বা ব্যাপক হইতে পারে না। যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরে সমজ্ঞান করেন তাঁহাদের মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া দূষিত।

"শক্তিবিশেষণালিঙ্গিতাৎ" অংশে দেখাইলেন শক্তিবিশেষের মিলিত যে অংশ হইতে জীবগণের আবির্ভাব সেই শক্তিবিশেষ দ্বারা পরমাত্মরূপে সকল জীবে ভগবান্ সর্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিত। এই শক্তিবিশেষের বিশেষ পরিচয় সন্দর্ভকার পরে দেখাইবেন। গীতার ১০।৪২ শ্লোকেও তাহাই নির্ণীত হইয়াছে।

श्रीविष्णुपुराणे च।

'यस्यायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता।
परब्रह्मस्वरूपस्य प्रणमाम तमव्ययम्' ।। इति।

पूर्णशुद्धशक्तिस्तु 'कलाकाष्ठादी'त्यनेन दर्शिता।

तथाच नारदपञ्चरात्रे।

श्रीनारद उवाच।

'शुद्धसर्गमहं देव ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः।
सर्गद्वयस्य चैवास्य यः परत्वेन वर्त्तते ।।'

अत्रैतत्पूर्वोक्तः प्राधानिकः शाक्तश्चेत्येतत्सर्गद्वयस्येति ज्ञेयम्।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১. ৯. ৫২ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—যে পরব্রহ্মস্বরূপের অযুত অংশের অংশে এই বিশ্বরচনা শক্তি বিদ্যমান, সেই অব্যয় পুরুষকে আমরা প্রণাম করি। 'কলা-কাষ্ঠা'—ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ণ শুদ্ধ শক্তিও দর্শিত হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রেও তদ্রূপ উক্ত হয়। নারদের উক্তি যথা—'দ্বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যমান, হে দেব, আমি সেই

শুদ্ধ সৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি'। এখানে সৃষ্টিদ্বয় বলিতে পূর্বোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি কৃত সৃষ্টি আর শক্তিকৃত সৃষ্টি—এই দুই প্রকার বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্য—দেবগণ অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হ'ন্। ব্রহ্মা দেবগণ সহ ক্ষীর সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিয়া শ্রীহরিকে যে সকল শ্লোক দ্বারা স্তব করেন সেই শ্লোকের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোক অন্যতম। ব্রহ্মা বলিলেন—অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তি যাঁহার সেই পরব্রহ্মের অযুতের অংশাংশ অর্থাৎ মায়াশক্তির লেশ মাত্র অংশ যে রজোগুণ, সেই রজো-গুণে এই বিশ্বের রচনা শক্তি আছে—এখানে পরব্রহ্মের বিশ্ব সৃষ্টি শক্তির কথাই বলা হইল।

'কলাকাষ্ঠানিমেষাদি'—এই শ্লোক বিষ্ণুপুরাণের ১. ৯. ৪৪ শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে।
যস্য শক্তির্ণ শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরিঃ॥

অর্থাৎ—'যে শুদ্ধসত্ত্ব হরির শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠানিমেষাদির গোচর হ'ন্ না, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।'

জগতের চেষ্টার নিয়ামকত্ব হেতু কলাকাষ্ঠা নিমেষাদি কালই সূত্রের ন্যায় সকল বস্তুকে গ্রথিত রাখে। কলাকাষ্ঠাদিতে জগতের চেষ্টা আবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত। শ্রীহরির শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী কলাকাষ্ঠাদির বিষয় হন না, যেহেতু শুদ্ধসত্ত্ব হরির স্বরূপ হইতে ওই শক্তি অভিন্ন। অতএব উহা যে নিত্য ও পূর্ণ শুদ্ধ শক্তি তাহাই দেখান হইল। এই শ্লোকটী শ্রীভগবৎসন্দর্ভেও ধৃত হইয়াছে।

কলাকাষ্ঠাদি—চক্ষুর নিমেষ যে সময় মধ্যে পতিত হয় তাহার নাম নিমেষ। ১৫ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা। ৩০ কলায় এক ঘটিকা অর্থাৎ দণ্ড, দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। যথা—

কাষ্ঠাঃ পঞ্চদশাখ্যাতা নিমেষা মুনিসত্তম।
কাষ্ঠাস্ত্রিংশকলাস্তাস্ত ত্রিংশদ্ মৌহূর্তিকো বিধিঃ॥

[বিষ্ণুপুরাণ ১. ৩. ৭]

श्रीभगवानुवाच।

यः सर्वव्यापको देवः परं ब्रह्म च शाश्वतं।
चित्सामान्यं जगत्यस्मिन् परमानन्दलक्षणम्॥
वासुदेवादभिन्नन्तु वह्न्यर्केन्दुशतप्रभं।
वासुदेवोऽपि भगवान् तद्धर्मा परमेश्वरः॥
स्वां दीप्तिं क्षोभयत्येव तेजसा तेन वै युतं।
प्रकाशरूपो भगवानच्युतं चासृजद्द्विज॥

सोऽच्युतोऽच्युततेजाश्च स्वरूपं वितनोति वै।
आश्रित्य वासुदेवञ्च खस्थो मेघो जलं यथा ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'যিনি সর্বব্যাপক, দেব অর্থাৎ প্রকাশদ্যুতিমান্, পরব্রহ্ম, নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ এবং এই জগতে পরমানন্দময় বাসুদেব হইতে অভিন্ন, শত শত বহ্নি, সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, সেই ভগবান্ বাসুদেবও তদ্ধর্ম বিশিষ্ট পরমেশ্বর হইয়া নিজদীপ্তিকে সঞ্চালিত করেন। হে দ্বিজ! প্রকাশরূপ ভগবান্ সেই তেজোময় অচ্যুতকে সৃষ্টি করেন। যাঁহার তেজ কখনও চ্যুত হয় না এমন যে অচ্যুত তিনি মেঘ যেমন আকাশস্থ হইয়া জল বিস্তার করে তদ্রূপ বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া স্বরূপকে বিস্তার করেন।

क्षोभयित्वा स्वमात्मानं सत्यभास्वरविग्रहं।
उत्पादयामास तदा समुद्रोर्मिर्जलं यथा ॥
स चिन्मयः प्रकाशात्मा उत्पाद्यात्मनमात्मना।
पुरुषाख्यमनन्तञ्च प्रकाशप्रसरं महत् ॥

অনুবাদ—সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন জল উৎপাদন করে তদ্রূপ অচ্যুত আত্মাকে ক্ষোভিত করিয়া সত্য ও দীপ্তিশালী বিগ্রহ (শরীর) উৎপাদন করিয়াছিলেন। তৎপর প্রকাশ স্বরূপ চিন্ময় পুরুষ আপনাকে আপনিই উৎপাদন করিয়া মহৎ প্রকাশশালী অনন্ত পুরুষনামক রূপ ধারণ করেন।

তাৎপর্য—পুরুষ কাহাকে বলে তাহার লক্ষণ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পুরুষাবতার প্রকরণে উক্ত হয়, যথা—

পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥

'পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধানগুণসম্বন্ধের ন্যায় প্রকৃত ও প্রাকৃতের (সংকল্পমাত্র) বীক্ষণাদি করিতে সমর্থ এবং যাহা হইতে বহুপ্রকার অবতারের প্রকাশ হয় তাহাকেই পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।'

स च वै सर्वजीवानामाश्रयः परमेश्वरः।
अन्तर्यामी स तेषां वै तारकाणामिवाम्वरम् ॥
सेन्धनः पावको यद्वत् स्फुलिङ्गनिचयं द्विज।
अनिच्छातः प्रेरयति तद्वदेष परः प्रभुः ॥

प्राग्वासनानिवन्धानां वद्धानाञ्च विमुक्तये।
तस्माद्विद्धि तदंशान्तान् सर्वांशं तमजं प्रभुम् ॥ इति।

অনুবাদ—'আকাশ যেমন নক্ষত্র সকলের আশ্রয় তদ্রূপ ঐ পরমেশ্বর সকল জীবের আশ্রয় ও তাহাদের অন্তর্যামী। হে দ্বিজ! কাষ্ঠযুক্ত অগ্নি যেমন ইচ্ছা না করিয়াও স্ফুলিঙ্গ নিচয়কে প্রেরণ করে, তদ্রূপ প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ) পরমেশ্বর পূর্ববাসনা নিবদ্ধ বদ্ধজীব সকলের বিমুক্তির নিমিত্ত (নানা অবতার প্রেরণ করেন)। এই কারণে জীব সকলকে তাঁহার অংশ বলিয়া, ও অজ সেই প্রভুকে অংশী বলিয়া জানিও।'

তাৎপর্য—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপমায় বুঝিতে হইবে এই স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ—তদ্রূপ ভগবান্ বদ্ধজীবের মুক্তির জন্য স্বতঃই তাঁহার অংশের ন্যায় অংশাবতার প্রেরণ করেন।

अतएव यत्तु ब्रह्मादौ प्रद्युम्नस्य मन्वादौ श्रीविष्णो रुद्रादौ श्रीसङ्कर्षणस्यान्तर्यामित्वं श्रूयते, तन्नानांशमादावतीर्णस्य तस्यैव तत्तदंशेन तत्तदन्तर्यामित्वमिति मन्तव्यम्। अतएव रुद्रस्य सङ्कर्षणप्रकृतित्वं पुरुषप्रकृतित्वञ्चेत्युभयमपि आम्नातं। "प्रकृतिमात्मानः सङ्कर्षणसंज्ञां भव उपधावती"त्यादौ "आदावभूच्छतधृतिरि"त्यादौ च "एष एव भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवानात्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थित" इत्यादौ विवृतः।

অনুবাদ—অতএব ব্রহ্মাদিতে প্রদ্যুম্নের, মনুপ্রভৃতিতে শ্রীবিষ্ণুর এবং রুদ্রাদিতে শ্রীসঙ্কর্ষণের যে অন্তর্যামিত্ব তাহা নানা অংশ গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ সেই পুরুষেরই সেই সেই অংশে তাহাদের (ব্রহ্মাদির) অন্তর্যামিত্ব মানিতে হইবে। অতএব রুদ্রের সঙ্কর্ষণ প্রকৃতিত্ব ও পুরুষ প্রকৃতিত্ব এই দুই প্রকারই কথিত হয়। (শ্রীভাগবতে ৫. ১৭. ১৭ গদ্যাংশে) যথা—'যে নিজের প্রকৃতি (কারণ) স্বরূপ এবং যাহার নাম সঙ্কর্ষণ তাহার প্রতি রুদ্র ধাবিত হইতেছেন।'

(শ্রীভাগবত ১১. ৪. ৪ শ্লোক) 'যাঁহার (রজোগুণ দ্বারা) আদিতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন'—ইত্যাদি স্থলেও রুদ্র সঙ্কর্ষণপ্রকৃতি।

অপর 'ভূতস্বরূপ, ইন্দ্রিয় স্বরূপ, প্রধান স্বরূপ এবং আত্মা ও পরমাত্মা—এক আপনিই পঞ্চপ্রকারে স্থিত' ইত্যাদি প্রমাণেও উহা বিবৃত হইয়াছে।

তাৎপর্য—এস্থলে দেখাইলেন যে গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি ব্রহ্মা রুদ্রাদির কারণ। ইহারই প্রমাণের জন্য শ্রীভাগবতের কতক অংশ শ্রীসন্দর্ভকার ধরিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু॥ [ভা. ১১. ৪.৪]

নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীদ্রবিড় যোগীন্দ্র নিমিরাজকে বলিয়াছিলেন—'হে মহারাজ! এই জগতের সৃষ্টি কার্যের নিমিত্ত যাঁহার রজোগুণদ্বারা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন্, এবং ইহা পালনের জন্য যাঁহার সত্ত্বগুণে যজ্ঞফলদাতা দ্বিজ ও তাহাদের ধর্মের পালক শ্রীবিষ্ণু সম্ভূত হন্ এবং ইহার নাশের নিমিত্ত তমোগুণ দ্বারা রুদ্র আবির্ভূত হন্—যাহা হইতে এই প্রজাবর্গের সর্বদা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, তিনি আদ্যপুরুষ। এই আদ্যপুরুষই ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির কারণ।

तस्मात् सर्वान्तर्यामी पुरुष एव ब्रह्मेति परमात्मेत्यादौ परमात्मत्वेन निर्दिष्ट इति स्थितं।

व्याख्यातञ्च स्वामिना।
'तस्मै नमो भगवते ब्रह्मणे परमात्मने'
इत्यत्र वरुणस्तुतौ 'परमात्मने सर्वजीवनियन्त्रे' इति।

অনুবাদ—অতএব সকলের অন্তর্যামী পুরুষই (শ্রীভাগবতে ১।২।১১ শ্লোকে) পরমাত্মরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন—ইহাই স্থির।

(শ্রীভাগবতের ১০।২৯।৫ শ্লোকে) বরুণদেব স্তবে শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—'আপনি ভগবান্ (নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী), ব্রহ্ম (পূর্ণ স্বরূপ) ও পরমাত্মা—আপনাকে নমস্কার করি।' এস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পরমাত্মা অর্থে সর্বজীব নিয়ন্তা।

तदुक्तं वैष्णव एव परमेश्वरं नमस्कृत्य*—

नान्तोऽस्ति यस्य न च यस्य समुद्भवोऽस्ति
वृद्धिर्न यस्य परिणामविवर्जितस्य।
नापक्षयञ्च समुपैत्यविकल्पवस्तु
यस्तं नतोऽस्मि पुरुषोत्तममाद्यमीड्यम्॥
तस्यैव योऽनुगुणभुग्बहुधैक एव
शुद्धोऽप्यशुद्ध इव मूर्तिविभागभेदैः।

---

* "পরমেশ্বরং নমস্কৃত্য" ইতিপাঠো মুদ্রিতপুস্তকে নাস্তি।

জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা
যস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায় ।। ইতি ।

অনুবাদ—(এই পরমাত্মা যে মায়ার নিয়ামক তাহা বিষ্ণু পুরাণে ৬।৮।৫৮ শ্লোকে) পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কথিত হইয়াছে—'যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার জন্ম নাই, যাঁহার বৃদ্ধি বা পরিণাম নাই, যিনি অপক্ষয় শূন্য, বিকার রহিত ও বিকল্পশূন্য সেই আদ্য স্তবনীয় পুরুষকে আমি প্রণাম করি।'

(বিষ্ণুপুরাণের ৬।৮।৫৯ শ্লোক যথা) 'সেই পরমেশ্বরের অবতার পুরুষ যিনি এক হইয়াও ব্রহ্মাদিবহুরূপে প্রকৃতির গুণকে ভজন করিয়া শুদ্ধ হইয়াও মূর্তিবিভাগ দ্বারা অর্থাৎ দক্ষ মনু প্রভৃতি রূপভেদের দ্বারা অশুদ্ধের ন্যায় সৃষ্ট্যাদিকার্যে আসক্ত, এবং যিনি জ্ঞানমূর্তি ও সকল প্রাণিগণের বিস্তার কর্তা, সেই অব্যয় পুরুষকে সর্বদা প্রণাম করি।'

তাৎপর্য—এই বাক্যে পরমেশ্বর যে ষড়্ ভাব বিকার বর্জিত তাহাই দেখান হইল। ষড়্ভাব বিকার যথা—বস্তুমাত্রেরই (১) জন্ম, (২) অবস্থান, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব, (৫) অপক্ষয় ও (৬) নাশ। ইহাকেই ষড়্ভাব বিকার বলে।

तस्यैवानु पूर्वोक्तात् परमेश्वरात् समनन्तरं। बहुधा ब्रह्मादिरूपेण। अशुद्ध इव सृष्ट्यादिष्वासक्त इव मूर्त्तिविभागानां दक्षादिरूपाणां भेदैः सर्व-सत्त्वानां विभूतिकर्ता विस्तारकृदिति स्वामी। अत्र गुणभुगिति षाड़्गुण्यानन्द-भोक्तेत्यर्थः।

यत्तत्सूक्ष्ममविज्ञेयमव्यक्तमचलं ध्रुवं।
इन्द्रियैरिन्द्रियार्थैश्च सर्वभूतैश्च वर्जितम्।।
स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते।
त्रिगुणव्यतिरिक्तो वै पुरुषश्चेतिकल्पितः।। इति।

मोक्षधर्मेऽपि नारायणीयोपाख्याने।

অনুবাদ—'তাঁহারই অনুগুণ হইয়া বা গুণ ভজন করিয়া'—(বিষ্ণু পুরাণের ৬।৮।৫৯ শ্লোকাংশের) অর্থ—পূর্বোক্ত অর্থাৎ (বিষ্ণুপুরাণের ৬।৮।৫৮ শ্লোকোক্ত ষড়্ভাববিকার বর্জিত) পরমেশ্বরের অনন্তর 'বহু প্রকারে' অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরূপে, "অশুদ্ধের ন্যায়' অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতিতে আসক্তের ন্যায় 'মূর্তিবিভাগ' অর্থাৎ দক্ষাদিরূপ ভেদ—তদ্দ্বারা প্রাণিগণের বিভূতিকর্তা

অর্থাৎ বিস্তারকর্তা—ইহাই শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে 'গুণভুক্' শব্দ আছে—তাহার অর্থ ষড়্গুণ আনন্দের ভোক্তা।

নারায়ণীয় উপাখ্যানে মোক্ষ ধর্মেও উক্ত হয়—যিনি সূক্ষ্মের ন্যায় অবিজ্ঞেয়, অপ্রকাশ, অচল ও ধ্রুব (নিত্য), ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থশব্দাদি ও আকাশাদি সর্বভূতবর্জিত, তিনি প্রাণিসকলের অন্তরাত্মা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত, এবং ত্রিগুণ ব্যতিরিক্ত পুরুষ বলিয়া কল্পিত।

তাৎপর্য—ষড়্গুণ যথা—

'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ [বিষ্ণুপুরাণ ৬. ৫. ৭৯]

যাহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ—এই ছয়টী গুণ বর্তমান এবং ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান, অশক্তি ইত্যাদির সম্পূর্ণ অভাব তিনিই ভগবৎ শব্দের বাচ্য।

'एकोदेवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च॥
अजामेकां लोहितकृष्णशुक्लां
बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः' इत्याद्याः।

तस्मात् साधु व्याख्यातं क्षेत्रज्ञ एता इत्यादि पद्यद्वयं। ५॥११॥ श्रीब्राह्मणो रहूगणम्॥

অনুবাদ—(শ্রুতিতে উক্ত হয়)—'একদেব সমস্তভূতে গূঢ় হইয়া সর্বব্যাপী ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতে অধিষ্ঠিত, সাক্ষী এবং চৈতন্যস্বরূপ, কেবল ও নির্গুণ।' (মহানারায়ণোপনিষদ্ ১০।৫)

নিজের অনুরূপ বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী লোহিত শুক্ল কৃষ্ণবর্ণাত্মিকা অর্থাৎ রজঃসত্ত্ব-তমোগুণাত্মিকা জন্মরহিত এক অজাকে (প্রকৃতিকে) অজ অর্থাৎ আত্মা প্রীতিপূর্বক অনুসরণ করে এবং অন্য অজ বা মুক্ত আত্মা ইহাকে যথাযথ ভাবে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।' —ইত্যাদি (শ্রুতিবাক্যে জীব ও পরমাত্মা নির্দিষ্ট হইল।) অতএব 'ক্ষেত্রজ্ঞ এই বিভূতিনিচয়কে জানে'—ইত্যাদি পদ্য দুইটিতে ঠিকই উক্ত হইয়াছে। ইতি। শ্রীভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায় (১২-১৩ এই দুই শ্লোকে) রহূগণের প্রতি ব্রাহ্মণ জড়ভরতের উক্তি।

अथास्याविर्भावे योग्यता प्रागुक्तैरेव ज्ञेया । १ ॥

आविर्भावस्तु त्रिधा यथा नारदीयतन्त्रे—

'विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः ।

प्रथमं महतः स्रष्टृ द्वितीयं त्वण्डसंस्थितं ।

तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥' इति ।

तत्र प्रथमो यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति "स ऐक्षते"त्यादुक्ता महासमष्टिजीवप्रकृत्योरेकतापन्नयोर्द्रष्टेत्येक एव । अयमेव सङ्कर्षण इति महाविष्णुरिति च ।

অনুবাদ—এই পরমাত্মার আবির্ভাব বিষয়ে যোগ্যতা পূর্ব উক্তি হইতেই জানিতে হইবে। ১ ॥

আবির্ভাব তিন প্রকার। নারদীয় তন্ত্রে যথা—'বিষ্ণু অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণের পুরুষ নামক তিনটি রূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে যিনি মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলে। আর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমষ্টির অন্তর্যামী তাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ বলে। এবং যিনি সর্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী তাঁহাকে তৃতীয় পুরুষ বলে, এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিতে পারিলে সংসার নিবৃত্তি হয়।'

তন্মধ্যে প্রথম পুরুষের কথা বলিতেছেন—অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বে গমন করে তদ্রূপ 'তিনি ঈক্ষণ করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি কথিত একভাবাপন্ন মহাসমষ্টি ভাবেও প্রকৃতির দ্রষ্টা ইনিই একমাত্র (প্রথম) পুরুষ—ইনিই সঙ্কর্ষণ ও মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়াছেন।

তাৎপর্য—প্রথম পুরুষকে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে প্রলয়কালে সমস্ত জীব সঙ্কর্ষণের শরীরে লীন হইয়া থাকে, তাহাদের উপাধি সৃষ্টির নিমিত্ত সেই পুরুষ যখন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন তখন প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওয়ায় মহৎ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই কারণে প্রথম পুরুষকে মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা বলা হইয়াছে। এই মহৎ তত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম ও বিশ্বের অঙ্কুর স্বরূপ। এই প্রকৃতির বীক্ষণ কর্তা পুরুষকেই প্রথম পুরুষ বলে। ইনিই সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী ও মহাবিষ্ণু।

অণ্ডস্থিত জীবসমষ্টির বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামীকে দ্বিতীয় পুরুষ বলে। ইঁহারই নাম গর্ভোদকশায়ী ও প্রদ্যুম্ন। ইঁহারই নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম।

সর্বভূতস্থ ব্যষ্টি জীবের অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রত্যেক দেহের অন্তর্যামী পুরুষকে তৃতীয় পুরুষ বলে। ইঁহারই নাম ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও অনিরুদ্ধ।

'পুর' শব্দের অর্থ শরীর, ঐ শরীরের নিয়ামকরূপে যিনি বাস করেন তাঁহাকেই পুরুষ বলে। ইহাই হইল পুরুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

ब्रह्मसंहितायां यथा।

तल्लिङ्गं भगवान् शम्भुर्ज्योतीरूपं सनातनम्।
तस्मिन्नाविरभूल्लिङ्गे महाविष्णुर्जगत्पतिः॥

'सहस्रशीर्षा पुरुष' इत्यारभ्य

नारायणः स भगवानापस्तस्मात् सनातनात्।
आविरासन् कारणार्णो निधिः सङ्कर्षणात्मकः॥
योगनिद्रां गतस्तस्मिन् सहस्रांशः स्वयं महान्।
तद्रोमविलजालेषु वीजं सङ्कर्षणस्य च॥
हैमान्यण्डानि जातानीत्यादि।

অনুবাদ—ব্রহ্মসংহিতাতে (৫.৮ শ্লোকে) যথা জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন (নিত্য) ভগবান্ শম্ভু তাঁহার লিঙ্গ এবং সেই লিঙ্গে অর্থাৎ অঙ্গভেদে[১] জগৎপতি মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মসংহিতা ৫। ১১ শ্লোক) 'যে পুরুষ সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি হইতে (১৩ শ্লোক পর্যন্ত)—'সেই ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণ হইতে প্রথমতঃ জলের উৎপত্তি হয়, সেই জলকে কারণ সমুদ্র এবং সংকর্ষণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সঙ্কর্ষণাত্মক বলে। সহস্রাংশ অর্থাৎ যাঁহার প্রদ্যুম্ন রূপ হইতে অসংখ্য অংশ নির্গত হয়, সেই স্বয়ং মহান্ মহাবিষ্ণু সেই কারণার্ণবে যোগ নিদ্রা অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ আনন্দসমাধি প্রাপ্ত হন্। কারণজলে ভাসমান সেই সঙ্কর্ষণ নামক আদি পুরুষের প্রত্যেক লোমকূপে সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ স্বর্ণবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডসকল উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি (বিবরণ দৃষ্ট হয়)।

তাৎপর্য—এখানে যে আদিপুরুষ নারায়ণের কথা বলা হইল, ব্রহ্মসংহিতাতে কথিত গোলোকের আবরণরূপে যিনি চতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণ বলিয়া খ্যাত, এই নারায়ণ তাঁহারই অংশ।

এই সঙ্কর্ষণ নামক আদিপুরুষের প্রত্যেক লোমকূপে জগতের বীজস্বরূপে চিৎপরমাণু-সমূহ বিলীন থাকে। তিনি সেই সকল চিৎপরমাণু প্রকৃতিতে স্থাপন করেন। তারপর অপঞ্চীকৃত মহাভূত দ্বারা স্বর্ণবর্ণ ব্রহ্মাণ্ডাবলীর উৎপত্তি হয়।

প্রথমপুরুষ সঙ্কর্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলে তাহার গুণ ক্ষোভ হয়; তাহাতে

১ শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীকৃষ্ণামৃতের পুরুষপ্রকরণে লিঙ্গ শব্দের অর্থ করিয়াছেন·

'লিঙ্গমত্র স্বয়ং রূপস্যাঙ্গভেদ উদীরিতঃ'।

অর্থাৎ লিঙ্গ শব্দে স্বয়ং ভগবানের অঙ্গ ভেদ বলিয়া কথিত।

প্রথমতঃ মহৎ তত্ত্বের, তাহা হইতে অহঙ্কারের এবং তাহার সাত্বিকাংশ দ্বারা মনঃ, রাজসাংশ দ্বারা দশপ্রকার বাহ্যেন্দ্রিয়ের এবং তামসাংশ দ্বারা পঞ্চতন্মাত্র সহায়ে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। এই মহৎ তত্ত্বাদি তত্ত্বসমূহই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্রষ্টা প্রথম পুরুষ।

लिङ्गमिति 'यस्यायुतायुतांशे विश्वशक्तिरियं स्थिते'त्यनुसारेण तस्य महाभगवतः श्रीगोविन्दस्य पुरुषोत्पादकत्वात् लिङ्गमिव लिङ्गं यः खल्वंशविशेष-देवस्तं शम्भुशब्दस्य मुख्याया वृत्तेराश्रय इत्यर्थः। लिङ्गे भगवत एवाङ्गविशेष इति तत्प्रकरणलब्धम्।

অনুবাদ—যাঁহার অযুত অযুতের অংশের অংশে এই বিশ্বশক্তি অবস্থিতি করিতেছে—(বিষ্ণুপুরাণ ১, ৯. ৫২) এই বচনানুসারে সেই মহাভগবান্ শ্রীগোবিন্দের পুরুষোৎপাদকত্ব হেতু লিঙ্গের ন্যায় লিঙ্গ, যে অংশ বিশেষ, তাহাই শম্ভু, শম্ভু শব্দের মুখ্যবৃত্তির আশ্রয়—ইহাই অর্থ। লিঙ্গে অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গ বিশেষে—ইহা প্রকরণ হইতে প্রাপ্ত।

তাৎপর্য—শব্দের মুখ্যা ও গৌণী—এই দুই প্রকার বৃত্তি। মুখ্যবৃত্তি=অভিধাবৃত্তি, সাক্ষাৎরূপে সেই অভিধেয় বস্তুকে যে বৃত্তিদ্বারা বুঝা যায় তাহাকে মুখ্যবৃত্তি বলে। আর মুখ্যরূপে প্রতিপাদ্য অর্থকে না বুঝাইয়া যেখানে তাৎপর্য দ্বারা তাহাকে বুঝা যায় তাহাকে গৌণবৃত্তি বলে। ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ পুরুষের উৎপাদক অর্থাৎ তাঁহা হইতে পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং এখানে লিঙ্গ শব্দে ভগবানের অংশ বিশেষকেই বুঝিতে হইবে—তাহারই নাম শম্ভু। আরও ব্রহ্ম-সংহিতাতে বর্ণনা করিয়াছেন—রমাশক্তি জগতের যোনিরূপা (জগৎসৃষ্টির আধার স্বরূপা), আর লিঙ্গ (জগৎকারণ) শম্ভু।

अथ द्वितीयः पुरुषस्तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदित्याद्युक्तः समष्टिजीवान्त-र्यामी तेषां ब्रह्माण्डात्मकानां बहुभेदाद्बहुभेदः। तत्रैव सूक्ष्मान्तर्यामी प्रद्युम्नः स्थूलान्तर्यामी अनिरुद्ध इति क्वचित्। अनेन महावैकुण्ठस्थाः सङ्कर्षणादयस्त-दंशिनः। ये तु चित्ताद्यधिष्ठातारो वासुदेवादयस्ते तदंशा एवेत्यादि विवेचनीयम्।

অনুবাদ—অনন্তর দ্বিতীয় পুরুষ (নির্ণীত হইতেছেন)—'সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায়ে পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়াছেন' ইত্যাদি শ্রুতি কথিত সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ। ব্রহ্মাণ্ডাত্মক সেই জীবগণের বহু ভেদ হেতু দ্বিতীয় পুরুষেরও বহুভেদ। সেই ব্রহ্মাণ্ডেই কোথাও সূক্ষ্মরূপে অন্তর্য্যামী প্রদ্যুম্ন এবং স্থূলরূপে অন্তর্য্যামী অনিরুদ্ধ—ইহা দ্বারা (বুঝা গেল)

যে মহাবৈকুণ্ঠে স্থিত যে সঙ্কর্ষণাদি, তাঁহারা ইহাদের অংশী, চিত্ত প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা যে বাসুদেবাদি তাঁহারাও মহাবৈকুণ্ঠে স্থিত সঙ্কর্ষণাদির অংশ।

তাৎপর্য—এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ, এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ডও বহু, সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিজীবের অন্তর্যামীও বহু। এক অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদ চারিটী—নাম, যথা—চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম মন। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি। স্মরণাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত, গর্বাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম অহঙ্কার। চিত্তের বাসুদেব, অহঙ্কারের সঙ্কর্ষণ, বুদ্ধির প্রদ্যুম্ন ও মনের অনিরুদ্ধ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। ইঁহারাও মহাবৈকুণ্ঠে স্থিত সঙ্কর্ষণাদির অংশ।

তৃতীয়োঽপি পুরুষঃ।

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরশ্নন্নভিচাকশি॥' ইত্যাদ্যুক্তৌ

ব্যষ্ট্যন্তর্যামী। তেষাং ভেদাদ্বহুভেদাঃ।

অনুবাদ—তৃতীয় পুরুষ (নির্ণীত হইতেছেন)। (মুণ্ডকোপনিষদে ৩।১।১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)—'দুইটী পক্ষী (জীব ও পরমাত্মা) একটী বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে। তাহারা সহচর ও সখা অর্থাৎ উভয়েই চিৎস্বরূপ সুতরাং সমানস্বভাব। এই দুইয়ের মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) দেহজনিত পরিপক্ব (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্পল (কর্মফল) ভোগ করে। আর অপর পক্ষী (পরমাত্মা) দেহজনিত কর্মফল ভোগ করেন না, কেবল দর্শন করেন অর্থাৎ কর্মফলের সাক্ষিরূপে প্রকাশ পান।'—ইত্যাদিশ্রুতি-কথিত প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী (ক্ষীরোদশায়ী) তৃতীয়পুরুষ। সেই জীব সকলের বহুভেদ, সুতরাং তৃতীয় পুরুষের বহুভেদ বুঝিতে হইবে।

তত্র প্রথমস্যাবির্ভাবো যথা।

'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যে'তি॥ ২॥

টীকা চ—পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ। যস্য সহস্রশীর্ষেত্যাদ্যুক্তৌ লীলাবিগ্রহঃ। স আদ্যোঽবতার ইত্যেষা।

অত্র চান্যত্র চাবতারত্বং নাম একপাদবিভূত্যাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম্। ২ ॥ ৬ শ্রীব্রহ্মা নারদম্।

অনুবাদ—তাহার মধ্যে প্রথম পুরুষের আবির্ভাব যথা—(শ্রীভাগবতে ২।৬।৪০ শ্লোকে শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি)—প্রকৃতির প্রবর্ত্তক অর্থাৎ প্রকৃতির বীক্ষণকর্তা যে পুরুষ তিনি পরের (পরমেশ্বরের) আদ্য অবতার ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকা করিয়াছেন—পর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। পুরুষ অর্থে প্রকৃতির প্রবর্ত্তক। যাহার 'সহস্র শীর্ষ' (সহস্র মস্তক)—ইত্যাদি শ্রুতি কথিত নানা বিগ্রহ তিনি আদ্য অবতার। এই স্থানে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরুষস্থানে) বা অন্যত্র যে অবতার তাহা একপাদ বিভূতির আবির্ভাব বুঝিতে হইবে।

তাৎপর্য—যদিও অবতরণকেই (উচ্চ হইতে নিম্নে আসাকে) অবতার ক্রিয়া বলে তথাপি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে অবতার প্রকরণে অবতারের লক্ষণ—

পূর্বোক্তা বিশ্বকার্যার্থমপূর্বা ইতি চেৎস্বয়ম্।
দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥

পূর্বে উক্ত যে স্বয়ংরূপাদি তাহা যখন জগতের কার্যের নিমিত্ত স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরে নূতনের ন্যায় আবির্ভূত হয় তখন তাহাকে অবতার বলে। এস্থলে প্রথম পুরুষাদি একপাদ বিভূতির আবির্ভাব। সমগ্র মায়িক ঐশ্বর্যকে একপাদ বিভূতি বলে। লঘুভাগবতা- মৃতে ৫। ২৮৬ শ্লোকে—

ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥

ত্রিপাদ্ বিভূতির (ঐশ্বর্যের) আশ্রয় বলিয়া সেই পরব্যোম ধাম ত্রিপাদ্‌ভূত। যেহেতু সমগ্র মায়িক ঐশ্বর্য্যকে একপাদ বিভূতি বলে এই মায়িক ঐশ্বর্য্য পরব্যোমে নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ২। ২১। ৪১ পয়ার যথা—

চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।
মায়িক বিভূতি একপাদ অভিধান ॥

এস্থলে প্রথমপুরুষাদি মায়িক হইলেও ইঁহারা মায়ার অধীন নহেন, ইঁহারা মায়াধীশ অর্থাৎ মায়া ইঁহাদের অধীন এবং ইঁহারা মায়ার নিয়ামক।

দ্বিতীয়স্য যথা।

'কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভিঃ
প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-
মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্বম্ ॥

मृणालगौरायतशेषभोग-
पर्य्यङ्क एकं पुरुषं शयानमि'त्यादि ॥ ३ ॥

अयं गर्भोदकस्थः सहस्रशीर्षानिरुद्ध एव। पुरुषायुषा वत्सरशतेन। योगो भक्तियोगः। एतदग्रेऽप्यव्यक्तमूलमित्यत्राव्यक्तं प्रधानं मूलमधोभागो यस्येत्यर्थः। भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रमिति। भुवनानि चतुर्दश तद्रूपा अङ्घ्रिपास्तेषामिन्द्रं तन्नियन्तृत्वेन वर्तमानमित्यर्थः। ३॥८। श्रीमैत्रेयो विदुरम्।

অনুবাদ—দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে যথা শ্রীভাগবতে ৩।৮।২৩, শ্লোকার্দ্ধে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের উক্তি—('গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া আপনার জনকে ও অন্যান্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—) 'সেই ব্রহ্মা পুরুষের আয়ুঃ পরিমিত কাল (শত বৎসর) গত হইলে সুসম্পন্ন যোগ (ভক্তিযোগ) দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে পূর্বে অন্বেষণ করিয়াও যাহাকে দেখিতে পান নাই, তাহাকে হৃদয়মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান দেখিতে পাইলেন। (কেমন মূর্তি দেখিলেন তাহাই বলিতেছেন)—জলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ, এবং বিস্তীর্ণ অনন্ত নাগের শরীররূপ শয্যাতে যেন একটী পুরুষ শয়ান হইয়া আছেন' ॥ ৩ ॥

ইনি গর্ভোদকস্থ সহস্রশীর্ষা অনিরুদ্ধই। পুরুষের আয়ুঃ পরিমিত কাল শত বৎসর। যোগ অর্থাৎ ভক্তিযোগ। ইহার অগ্রেও অর্থাৎ শ্রীভাগবতে ৩।৮। ৩০ শ্লোকে এই শয়ান পুরুষের বিশেষণ দিয়াছেন, 'অব্যক্তমূল'—তাহার—অর্থ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) মূল অর্থাৎ অধোভাগ যাহার। আরও একটী বিশেষণ আছে—"ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্রম্"—চতুর্দ্দশ ভুবন, সেই চতুর্দ্দশ ভুবন রূপ যে অঙ্ঘ্রিপ (বৃক্ষ), তাহার ইন্দ্র অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে বিদ্যমান।

তাৎপর্য—এখানে চতুর্দ্দশ ভুবন বলা হইয়াছে ; চতুর্দ্দশ ভুবন যথা—ভূর্ভুবঃ স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল, এই সপ্ত অধোলোক। এই সহস্রশীর্ষা পুরুষ চতুর্দ্দশভুবনের নিয়ামক।

तृतीयस्याविर्भावो यथा।

केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे
प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्।
चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख-
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ इत्यादि ॥ ४ ॥

प्रादेशस्तर्जन्यङ्गुष्ठयोर्विस्तारस्तत्प्रमाणम् ।
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वादितिन्यायेन । २ ॥ २ । श्रीशुकः ।

অনুবাদ—তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাব বিষয়ে যথা—(শ্রীভাগবতে ২।২।৮ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)। 'কতকগুলি লোকে নিজ নিজ দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় রূপ অবকাশ আছে তাহাতে চতুর্ভুজ ও ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিরাজিত এমন এক প্রাদেশমাত্র পরিমিত পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহারই প্রতি মনের ধারণা করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকে' ॥ ৪ ॥

তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর যে বিস্তার তাহাক প্রাদেশ বলে। এইস্থলে যে হৃদয়কে প্রাদেশ প্রমাণ বলা হইয়াছে তাহা মনুষ্যের হৃদয়ই বুঝিতে হইবে। (বেদান্তদর্শনের ১।৩।২৪ সূত্রে উপাসনা-বিধায়ক শাস্ত্রসকল) মনুষ্যের পক্ষেই প্রযুক্ত—এই ন্যায় রহিয়াছে।

তাৎপর্য্য—তৃতীয় পুরুষ (ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

एवं पुरुषस्यानेकविधत्वेऽपि दृष्टान्तेनैक्यमुपपादयति ।

यथानिलः स्थावरजङ्गमाना-
मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत् ।
एवं परो भगवान् वासुदेवः
क्षेत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः ॥ ५ ॥

आत्मस्वरूपेण प्राणरूपेण निविष्ट ईशेत् ईशेत नियमयति इदं विश्वम् । श्रुतिश्च ।

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ इति काठके ।५॥ ११ । श्रीब्राह्मणो रहूगणम् ।

অনুবাদ—এই প্রকারে পুরুষ অনেক প্রকার হইলেও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার একতা উপপাদন করিতেছেন। শ্রীভাগবতে ৫। ১১। ১৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ জড়ভরত রহূগণ রাজাকে বলিয়াছিলেন—'হে রাজন্, যেমন বায়ু অখিল প্রাণরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকলের প্রভুত্ব করে সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেব জগতে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করেন'। ৫ ॥

বায়ু আত্ম স্বরূপে অর্থাৎ প্রাণরূপে প্রবিষ্ট হইয়া এই বিশ্বকে নিয়মিত করেন।

কাঠক শ্রুতিতে (৫ বল্লীর ১০ অঙ্কেও কথিত হইয়াছে)—যেমন এক বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকারে নানারূপ ধারণ করে, সেই প্রকার এক সকল ভূতের অন্তরাত্মা বহুরূপে ভিন্নরূপ হইয়া বাহিরেও আছেন।

तथा

एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामिह देहिनाम्।
नानेव गृह्यते मूढ़ैर्यथा ज्योतिर्यथा नभः॥ ६॥

देहिनां जीवानामात्मा परमात्मा। १०॥ ५४। श्रीबलदेवः रुक्मिणीम्।

অনুবাদ—সেই প্রকার শ্রীভাগবতে ১০।৫৪।২৬ শ্লোকে শ্রীবলদেব শ্রীরুক্মিণী দেবীকে বলিয়াছেন—সকল জীবেরই একমাত্র বিশুদ্ধ পরমাত্মা, অথচ মূঢ় ব্যক্তিগণ যেমন জলে সূর্য চন্দ্রাদি ও ঘটাদিতে আকাশ—সেই প্রকার আত্মাকে নানা মনে করিয়া গ্রহণ করে॥ ৬॥

দেহিগণ=জীবসকল। আত্মা=পরমাত্মা।

তাৎপর্য—জলে সূর্যচন্দ্রাদি প্রতিবিম্বিত হয়, লোকে প্রতিবিম্বিত সূর্য চন্দ্রকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করে; বাস্তবিক তাহা পৃথক্ নহে, একই চন্দ্র বা সূর্য জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হয়, সূর্য ও চন্দ্র, নানা নহে। এবং ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদি স্থলে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ও মঠাবচ্ছিন্ন আকাশকে লোকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করে; প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। আকাশ একই—আকাশ নানা নহে। ঘটে যে আকাশ মঠেও সেই আকাশ। এখানেও পরমাত্মা তদ্রূপ; সকল জীবেই তিনি এক।

एवम्।

एक एव परमात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः।
यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च॥ ७॥

भूतेषु जीवेषु एक एव पर आत्मा नत्वसौ जीववत्तत्र तत्र लिप्तो भवतीत्याह आत्मनि स्वरूप एवावस्थितः। भूतानि जीवदेहा अपि येन कारणरूपेण एकात्मकानीति। ११॥ १८। श्रीभगवानुद्धवम्।

অনুবাদ—আরও শ্রীভাগবতে ১১।১৮।৩১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—নানা জল পাত্রে প্রতিবিম্বিত একচন্দ্রের ন্যায় সকল জীবে ও আত্মাতে (স্বরূপে) অবস্থিত পরমাত্মা একমাত্র। ভূতসকল একাত্মক অর্থাৎ কারণরূপে সকল জীবদেহই একস্বরূপ॥ ৭॥

(শ্রীসন্দর্ভকার অর্থ করিতেছেন) ভূত সকল অর্থে জীব সকল। একমাত্র পরমাত্মা অর্থাৎ ইনি জীবের ন্যায় সেই সেই ভূতসমূহে লিপ্ত নহেন। এই কারণেই বলিলেন ইনি (পরমাত্মা) আত্মাতে অর্থাৎ নিজরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন। ভূতসকল অর্থাৎ জীবদেহ সকলও কারণরূপে একাত্মক (একস্বরূপ)।

তাৎপর্য—এস্থানে জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের দৃষ্টান্তে কেহ প্রতিবিম্ববাদ মনে করিবেন না। অতঃপর প্রতিবিম্ববাদ বিশেষ রূপে নিরাকৃত হইবে। এখানে যে প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত, এটী সর্বাংশে নহে, কেবল বৈভব অংশে, অর্থাৎ পরমাত্মার এম্নি বৈভব যে তিনি এক হইয়াও জলস্থ প্রতিবিম্বিত চন্দ্রসূর্যাদির ন্যায় সকল জাবে অবস্থিত ॥ ৭॥

एवमेकस्य पुरुषस्य नानात्वमुपपाद्य तस्य पुनरंशा विव्रियन्ते। तत्र द्विविधा अंशाः। स्वांशा विभिन्नांशाश्च। विभिन्नांशास्तटस्थशक्त्यात्मका जीवा इति वक्ष्यते। स्वांशास्तु गुणलीलाद्यवतारभेदेन विविधाः। तत्र लीलाद्यवताराः प्रसङ्गसङ्गत्या श्रीकृष्णसन्दर्भे वक्ष्यन्ते।

অনুবাদ—এক পুরুষের নানাত্ব উপপাদন করিয়া পুনরায় তাহার অংশ সকল বিবৃত করিতেছেন। তন্মধ্যে অংশ দুই প্রকার। স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ। তটস্থশক্ত্যাত্মক জীবসমূহ বিভিন্নাংশ। ইহা পরে বলা হইবে। স্বাংশ সকল গুণলীলাদি অবতারভেদে নানাপ্রকার। তন্মধ্যে লীলাদি-অবতার-প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলা হইবে।

ব্যাখ্যা— স্বাংশের লক্ষণ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতে ১৭ কারিকা যথা।

তাদৃশো ন্যূনশক্তিস্তং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।
সঙ্কর্ষণাদৈর্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎ স্বধামসু ॥

তাদৃশ অর্থাৎ বিলাসের ন্যায় স্বয়ংরূপে অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প পরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, বলিয়া তাঁহাকে স্বাংশ বলে। যেমন নিজ নিজ ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদি লীলা অবতারগণ।

বিলাস কি তাহা বুঝিবার জন্য বিলাসের লক্ষণ ঐ শ্রীলঘু ভাগবতামৃতে ১৫—১৬ কারিকা যথা।

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাশতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে। ১৫।
পরব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ।
পরব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥ ১৬।

স্বয়ং প্রভুর যে অন্যাদৃশ স্বরূপ নানা বিশেষ হেতু প্রতিভাত হয় কিন্তু শক্তিপ্রকাশে তাহারই সমান থাকে তাহাকে বিলাস বলে। যেমন গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, এবং পরম ব্যোমনাথের বিলাস আদিব্যূহ বাসুদেব।

गुणावतारा यथा।

आदावभूच्छतधृती रजसास्य सर्गे
विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतुः।
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य
इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु ॥ ८ ॥

स युगपद्गुणाधिष्ठाता आद्यः पुरुषः पृथक् पृथगपि तत्तद्गुणाधिष्ठान-लीलयैवादौ रजसा अस्य जगतः सर्गे विसर्गे कार्ये शतधृतिर्ब्रह्माभूत्। स्थितौ विष्णुः सत्त्वेनेति शेषः। अत्र साक्षाद्गुणानुक्तिश्च तस्यातिरोहितस्वरूपतया तत्सम्बन्धोपचारस्याप्युट्टङ्कनमयुक्तमित्यभिप्रायेण पालनकर्तृत्वेन क्रतुपतिस्तत्-फलदाता। यज्ञरूपस्तु लीलावतारमध्य एव श्रीब्रह्मणा द्वितीये गणितः। द्विजानां धर्माणाञ्च सेतुः पालक इत्यर्थः। तमसा त्वप्ययाय रुद्रोऽभूदित्यनेन प্রकारेण उद्भवस्थितिलया भवन्तीति।

অনুবাদ—(ভাগবতে ১১. ৪. ৫ শ্লোকে নবযোগীন্দ্রের অন্যতম দ্রবিড় নামক যোগীন্দ্র নিমিরাজকে) গুণাবতার বিষয়ে বলিয়াছিলেন; যথা—এই জগতের সৃষ্টি কার্য্যের নিমিত্ত আদিতে রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, এই জগতের পালনের নিমিত্ত যাহার সত্বগুণ হইতে যজ্ঞফলদাতা এবং দ্বিজ ও ধর্মের রক্ষক বিষ্ণু, আর এই জগতের নাশের নিমিত্ত যাহার তমোগুণ দ্বারা রুদ্র আবির্ভূত হন্—এই প্রকার যাহা হইতে জীবজগতে সর্বদা সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয় তিনি আদ্যপুরুষ ॥ ৮ ॥

এককালীন গুণের অধিষ্ঠাতা সেই আদ্যপুরুষ পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও সেই সেই গুণের অধিষ্ঠান নানা বলিয়াই প্রথমে রজোগুণ দ্বারা এই জগতের বিশেষ সৃষ্টিকার্যে শতধৃতি (ব্রহ্মা) হইয়াছেন, সেই প্রকার সত্বগুণদ্বারা বিষ্ণু—ইহাই বুঝিতে হইবে। এস্থলে (শ্রীভাগবতে ১১। ৪। ৫ শ্লোকে) সত্ব গুণের কথা বলা হয় নাই,—তাহার অভিপ্রায় এই যে তাঁহার অর্থাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ অতিরোহিত বলিয়া তাহার (সত্বগুণের) উপচারের উল্লেখ অযুক্ত। পালনকর্তা বলিয়া তিনি ক্রতুপতি অর্থাৎ যজ্ঞের ফলদাতা। যজ্ঞরূপ অবতার লীলাবতার মধ্যে শ্রীব্রহ্মাকর্তৃক (শ্রীভাগবতে) দ্বিতীয় স্কন্ধে পরিগণিত হইয়াছেন। দ্বিজগণের ধর্মসকলের সেতু

অর্থে পালক। তমোগুণ দ্বারা এই জগতের বিনাশের নিমিত্ত তিনি রুদ্র হইয়াছিলেন। এই প্রকারে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে।

তাৎপর্য—রজোগুণাদিতে ব্রহ্মা প্রভৃতি আবির্ভূত হন্—ইহাতে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব যে ঐ গুণাদির অধীন —এ প্রকার বুঝিতে হইবে না। কিন্তু তত্তৎ গুণের অধিষ্ঠাতারূপে তাঁহারা প্রকাশ পান—ইহাই বুঝিতে হইবে। সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, রজোগুণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতা রুদ্র—এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশ পান।

শ্রীভাগবতে ১১।৪।৫ শ্লোকে বলিলেন—রজোগুণে ব্রহ্মা, আর তমোগুণে রুদ্র এবং বিষ্ণু শাসনকর্ত্তা—বিষ্ণুর উল্লেখপ্রসঙ্গে সত্ত্বগুণের উল্লেখ নাই। তাহাতেই শ্রীসন্দর্ভকার বলিলেন অতিরোহিত স্বরূপত্বপ্রযুক্ত সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ বলা হয় নাই। আদ্য পুরুষই রজোগুণে ব্রহ্মা, ও তমোগুণে রুদ্র হন্ অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের তিরোধান হয়। কিন্তু বিষ্ণু সংকল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণের পরিচালক। সুতরাং ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই। রজোগুণে ব্রহ্মরূপে ও তমোগুণে রুদ্ররূপে প্রকাশিত হন্—আর সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে (নিজ রূপেই) থাকেন। অতএব এখানে স্পষ্টরূপে সত্ত্বগুণে যে বিষ্ণু—একথা বলা হয় নাই।

শ্রীসন্দর্ভকার বলিলেন যজ্ঞরূপ যে অবতার তাহা শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই বলিলেন; কিন্তু প্রমাণরূপে শ্লোকাদির উল্লেখ করেন নাই। শ্রীভাগবতের ২।৭।২ শ্লোক এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা—

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ
আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়ণম্।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্ যদার্ত্তিং
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনূক্তঃ॥

অর্থাৎ (ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন)—শ্রীভগবান্ বিষ্ণু রুচিনামক প্রজাপতির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর নিজের পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রভৃতি দেবগণকে উৎপন্ন করেন। এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া ত্রিলোকের মহৎ দুঃখ হরণ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার নাম সুযজ্ঞ ছিল, তথাপি পরে মাতামহ স্বায়ম্ভব মনু তাঁহার নাম (দুঃখহরণ হেতু) হরি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

अत्र ब्रह्मरुद्रयोरवतारावसरः मोक्षधर्मे विविक्तोऽस्ति। यथा।

ब्राह्मे रात्रिक्षये प्राप्ते तस्य ह्यमिततेजसः।
प्रसादात् प्रादुरभवत् पद्मं पद्मनिभेक्षण॥
ततो ब्रह्मा समभवत् स तस्यैव प्रसादजः।

अह्नः क्षये ललाटाच्च तथा देवस्य वै तथा।
क्रोधाविष्टस्य संजज्ञे रुद्रः संहारकारकः॥

इति।

অনুবাদ—এস্থলে ব্রহ্মা ও রুদ্রের যে অবতারের প্রস্তাব তাহা মোক্ষধর্মে নির্ণীত আছে। যথা।

'হে পদ্মনেত্র! বাহ্মরাত্রির অর্থাৎ ব্রহ্মার পরিমিত রাত্রির ক্ষয় হইলে সেই অমিততেজা পুরুষের প্রসন্নতা হেতু একটী পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়। তারপর তাঁহারই প্রসাদ হইতে জাত ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তারপর ব্রহ্মদিনের অবসানে কোপান্বিত সেই দেবের ললাট হইতে সংহার কর্তা রুদ্র জন্মগ্রহণ করেন।'

তাৎপর্য—ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চতুর্যুগকে দিব্যযুগ বলে। একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ একাত্তর বার অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে তাহাকে এক মন্বন্তর বলে—(এই প্রকার হইলে এক মন্বন্তরে ৭১টী সত্যযুগ, ৭১টী ত্রেতাযুগ, ৭১টী দ্বাপর যুগ ও ৭১টী কলিযুগ বিদ্যমান)। একাত্তর চতুর্যুগ পর্যন্ত এক মনুর অধিকার। তাহাকেই এক মন্বন্তর বলে। এই প্রকার চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। তাহা হইলে ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে ৯৯৪টী সত্য যুগ, ৯৯৪টী ত্রেতাযুগ, ৯৯৪টী দ্বাপর যুগ, ও ৯৯৪টী কলিযুগ আছে। দিনের সমান রাত্রি।

বিষ্ণুপুরাণের মতে একহাজার সত্য, এক হাজার ত্রেতা, একহাজার দ্বাপর ও এক হাজার কলিযুগে ব্রহ্মার একদিন। মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০ বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর ও কলিযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০০ বৎসর। অতএব একদিব্য যুগের পরিমাণ হইলে মনুষ্যমানে ৪৩২০০০০ বৎসর। এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর। বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০০০০ বৎসর।

श्रीविष्णोस्तु तृतीये दृश्यते।
तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः
प्रावीविशत् सर्वगुणावभासम्।
तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता
स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्॥ इति।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে (ভা. ৩. ৮. ১৬) তৃতীয় স্কন্ধে দৃষ্ট হয় যথা—যাহাতে জীবের ভোগ্য বস্তুসকল নিহিত আছে, সেই লোকাত্মক পদ্মে গর্ভোদকশায়ী

বিষ্ণুরূপী হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া মুনিগণ কীর্তন করেন সেই বেদময় বিধাতা (ব্রহ্মা) সেই পদ্মে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন।

তাৎপর্য্য—এখানে ব্রহ্মাকে বেদময় বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মা অধ্যয়ন ব্যতীত স্বয়ং বেদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং জনক দৃষ্ট না হওয়ায় তিনি স্বয়ম্ভু।

পূর্বকল্পের অন্তে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের সহিত নিদ্রায় (স্বরূপানন্দসমাধিতে) একীভূত হইয়াছিলেন। নারায়ণ জাগরিত হইলে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মাও নারায়ণ হইতে পদ্মে অভিব্যক্ত হইলেন।

अस्यार्थः। तल्लोकात्मकं पद्मं सर्वगुणान् जीवभोग्यानर्थान् अवभासयतीति तथा यद्यस्माज्जातम्। श्रीनारायणाख्यः पुरुष एव विष्णुसंज्ञः सन् स्थापनरूपान्तर्यामितार्थं प्रावीविशत् प्रकर्षेणालुप्तशक्तितयैवावीविशत् स्वार्थे णिच्।

तस्मिन् श्रीविष्णुनालब्धस्थितौ पद्मे पुनः सृष्ट्यर्थं स्वयमेव ब्रह्माभूत्। स्थितस्यैव मृदादेर्घटादितया सृष्टेः। अतएव स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञा इत्यत्रापि। ११ ॥ ४। श्रीद्रविड़ो निमिम्।

অনুবাদ—ইহার ব্যাখ্যা যথা—সর্বগুণ অর্থাৎ জীবের ভোগ্য অর্থসকলকে যে লোকাত্মক পদ্ম প্রকাশ করিতেছে—অর্থাৎ জীবের ভোগ্য স্বর্গনরকাদি প্রকাশ করে, যাহা হইতে পদ্ম জাত হইয়াছে সেই নারায়ণ নামক পুরুষই বিষ্ণুসংজ্ঞালাভ করিয়া স্থাপন (পালন) রূপ অন্তর্যামিত্ব নিমিত্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে অবিলুপ্তশক্তি রূপেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। পদ্মে প্রবেশ করাতে তাহার শক্তির কোন লোপ হয় নাই। এস্থলে স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয়।

বিষ্ণু সেই পদ্মে স্থিতিলাভ করিলে, অর্থাৎ পদ্মে প্রবেশ করিলে পুনর্বার সৃষ্টির নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণুই ব্রহ্মা হইলেন। যেহেতু স্থিত মৃত্তিকাদিরই ঘটাদিরূপে সৃষ্টি হয়। এই কারণে হরি, বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) ও হরসংজ্ঞা এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা শ্রীদ্রবিড়যোগীন্দ্র নিমিরাজকে বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ "আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসা এই শ্লোকটী ভা. ১১. ৪. ৫. শ্লোকে নিমিরাজের প্রতি শ্রীদ্রবিড়যোগীন্দ্রের উক্তি।

তাৎপর্য—লোকাত্মকপদ্ম বলিতে কি বুঝিব, তাহা এই শ্লোকের পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) বলিয়াছেন। এই বিশ্ব প্রলয়কালে পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল। শ্রীভগবান্ শ্রীনারায়ণ অনন্ত শয্যাতে সেই সময় স্বরূপানন্দ সমাধিরূপ নিদ্রাতে শয়ন করেন্। তখন তাঁহার শরীরে দেব ও মনুষ্যাদির সূক্ষ্ম শরীর বহির্মুখভাবে তাঁহাতেই বর্তমান থাকে। পুনরায় সৃষ্টির নিমিত্ত শ্রীনারায়ণ কালরূপা শক্তিকে নিযুক্ত করেন। সৃষ্টির পূর্বেই দেবমনুষ্যাদির নিজ নিজ কর্মানুসারে সেই সকল

সূক্ষ্মশরীরের (নিজ দেহ হইতে) নিষ্কাশনের ইচ্ছায় সূক্ষ্ম অর্থ নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইল। জীবগণের অদৃষ্ট প্রতিবোধক কাল অনুসারে ওই অর্থই পদ্মকোষ আকারে পরিণত হইল।

ব্যাকরণে স্বার্থে ও প্রেরণার্থে ণিচ্ প্রত্যয় হয়। স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয়ে ধাতুর অর্থই প্রকাশ পায়। আর প্রেরণার্থে ণিচ প্রত্যয়ে প্রযোজ্য ও প্রযোজক—এই দুই কর্তা থাকে। যেমন রাম শ্যামকে গ্রামে গমন করাইতেছে—(রামঃ শ্যামং গ্রামং গময়তি)—এখানে রাম প্রযোজক, ও শ্যাম প্রযোজ্যকর্তা, গমনার্থ ধাতুর যোগে প্রযোজ্য কর্তাতে দ্বিতীয়া হইল। প্রাবীবিশৎ—এখানে প্রেরণার্থে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া লুঙ্ বিভক্তির প্রথম পুরুষের এক বচনের অর্থ হইতে বুঝা যায় 'অন্য কেহ প্রবেশ করাইয়াছিলেন'। কিন্তু এখানে তাহা নহে, কারণ স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয় হওয়াতে বুঝা গেল যে বিষ্ণু নিজেই পদ্মে প্রবেশ করিয়াছেন, ইঁহার প্রযোজক কর্তা আর কেহ নাই।

স্বয়ং বিষ্ণুই ব্রহ্মা হইলেন—ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীসন্দর্ভকার বলিলেন যে স্থিত মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদি জন্মে; সুতরাং ঘটের সত্তা পৃথক্ নহে, মৃত্তিকাই ঘটরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ বিষ্ণুই সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মারূপে প্রকাশ পাইলেন, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা পৃথক্ নহেন।

শ্রীভাগবতে ১২।২।২৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে এক পরম পুরুষই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি, ও হর এই তিন নাম ধারণ করেন্। সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মা পালনে হরি, লয়ে হর।

एवं 'यो वा अहञ्च गिरिशश्च विभुः स्वयञ्चे'त्यादौ। त्रिपादिति ॥ ९ ॥

टीका च। यो वै एकस्त्रिपात् त्रयो ब्रह्मादयः पादाः स्कन्धा यस्येतेषा। वृक्षरूपत्वेन तद्वर्णनादेषां स्कन्धत्वम्। ३ ॥ ९। ब्रह्मा श्रीगर्भोदशायिनम्।

অনুবাদ—এবং 'যে এক (বৃক্ষ) আমি (ব্রহ্মা) গিরিশ স্বয়ং কিন্তু (বিষ্ণু)' ইত্যাদি স্থলে ত্রিপাদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সে বৃক্ষের স্কন্ধরূপে বিদ্যমান ॥ ৯ ॥

যিনি এক, 'ত্রিপাৎ' অর্থাৎ তিন ব্রহ্মাদি পাদ অর্থাৎ স্কন্ধ হইয়াছে যাহার—ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা। বৃক্ষরূপত্ব হেতু ইহাদের (ব্রহ্মাদির) স্কন্ধত্ব বর্ণিত হইল। এই শ্লোকটী ব্রহ্মা শ্রীভাগবতে ৩।৯।২৬ অঙ্কে শ্রীগর্ভোদকশায়ীকে বলিয়াছিলেন।

তাৎপর্য—শ্রীসন্দর্ভকার এই শ্লোকটী সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোক না হইলে ইহার তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় না; তজ্জন্য সম্পূর্ণ শ্লোক দেওয়া হইল—

যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভাগবতে ভুবনদ্রুমায়॥ ভা ৩।৯।১৬

ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়ী শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কেনই বা আমার উৎপত্তি; ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই প্রকারে তাঁহার শতবৎসর অতীত হইল। তাহার পর নিজের অধিষ্ঠান পদ্মে উপবিষ্ট হইয়া অন্তর্মুখ বৃত্তিদ্বারা নিঃশ্বাস জয় পূর্বক সমাধি অবলম্বনে স্থির হইয়া রহিলেন্। শত বৎসরকাল সমাধি অবলম্বনে তাঁহার যোগ সুসম্পন্ন হইল। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও যাঁহার দর্শন পান নাই তাহাকে হৃদয়মধ্যে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ বিস্তীর্ণ নাগের শরীরশয্যায় শয়ান পরম রমণীয় একটী পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে (গর্ভোদকশায়ীকে) স্তব করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটী সেই স্তবের মধ্যে কথিত হইয়াছে।

'হে ভগবন্, তুমি ভুবনাকার বৃক্ষ, এক তুমি স্বয়ং এই বৃক্ষের মুল অর্থাৎ এই বৃক্ষের মুল স্বরূপা যে প্রকৃতি, তাহার তুমি অধিষ্ঠান। এই মুলস্বরূপা প্রকৃতিকে, সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ তিন গুণে বিভাগ করিয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত আমি (ব্রহ্মা), শিব ও বিষ্ণু—আমাদের এই তিনজনকে তিনটীপাদ (স্কন্ধ) স্বরূপে ধারণ করিয়া ত্রিপাদ্ হইয়া বৃদ্ধিশীল হইয়াছি। এই ভুবনাকার বৃক্ষের প্রত্যেক পাদে (স্কন্ধে) মরিচী প্রভৃতি মুনি এবং মনুগণ বহুশাখা ও প্রশাখারূপে বিদ্যমান। হে প্রভো! ভুবনাকার বৃক্ষস্বরূপ যে তুমি, তোমাকে নমস্কার।'

এক নারায়ণই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে প্রকাশিত—এই শ্লোকে তাহাই ব্যক্ত হইল।

তেষামাবির্ভাবো যথা।

তপ্যমানং ত্রিভুবনং প্রাণায়ামৈধসাগ্নিনা।
নির্গতেন মুনের্মূর্দ্ধ্নঃ সমীক্ষ্য প্রভবস্ত্রয়ঃ॥
অপ্সরোমুনিগন্ধর্বসিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ।
বিতায়মানযশসস্তদাশ্রমপদং যযুঃ॥ ইত্যাদি॥ ১০॥

মুনরত্রেঃ। ৪॥ ১। শ্রীমৈত্রেয়ঃ।

অনুবাদ—সেই সকল ব্রহ্মাদির আবির্ভাব যথা।—(শ্রীভাগবতে ৪।১।১৬-১৭ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মার আদেশে প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত অত্রি ঋষি কুল-পর্বতে শত বৎসরকাল ঈশ্বর তুল্য পুত্র লাভের ইচ্ছায় এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করেন।)—এই প্রকার তপস্যা করিতে করিতে অত্রি ঋষির মস্তক হইতে অগ্নি বহির্গত হইল; প্রাণায়ামরূপ কাষ্ঠদ্বারা সেই অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই অগ্নিতে ত্রিভুবন দহ্যমান অবলোকন করিয়া তিন জন প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র অপসরা, মুনি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ-

বিদ্যাধর ও উরগগণ কর্তৃক যাঁহার যশ বিস্তৃত হইতেছে, সেই ঋষির (অত্রির) আশ্রমস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

মুনির অর্থাৎ অত্রির।

যথা বা।

सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषयः सत्रमासते।

वितर्कः समभूत्तेषां त्रिष्वधीशेषु को महान् ॥ इत्यादिरितिहासः ॥ ११ ॥

अत्र श्रीविष्णोः स्थानञ्च क्षीरोदादिकं पाद्मोत्तरखण्डादौ जगत्पालन-निमित्तकनिवेदनार्थं ब्रह्मादयस्तत्र मुहुर्गच्छन्तीति प्रसिद्धेः विष्णुलोकतया प्रसिद्धेश्च। वृहत्सहस्रनाम्नि क्षीराब्धिनिलय इति तन्नामगणे पठ्यते। श्वेत-द्वीपपतेः क्वचिदनिरुद्धतया ख्यातिश्च तस्य साक्षादेवाविर्भाव इत्यपेक्षयेति। १० ॥

৮৯। श्रीशुकः।

অনুবাদ—যথা শ্রীভাগবতে ১০।৮৯।১ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক-দেবের উক্তি—'হে মহারাজ! সরস্বতী নদীতীরে ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহাদের বিতর্ক উপস্থিত হইল, যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।' উক্ত ইতিহাস (এ বিষয়ে পর্যালোচনীয়) ॥১১ ॥

এস্থলে যে বিষ্ণুর স্থানের কথার উল্লেখ হইল, (অর্থাৎ ভৃগু যে বিষ্ণুর স্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন,) সেই বিষ্ণুর স্থান ক্ষীরোদসমুদ্রাদি বুঝিতে হইবে। জগৎপালনের নিমিত্ত নিবেদন করার জন্য ব্রহ্মাদিদেবগণ পুনঃ পুনঃ সেইস্থানে (ক্ষীরসমুদ্রতীরে) গমন করেন্। ইহা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রসিদ্ধি আছে। বিষ্ণুর বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্রে ক্ষীরাব্ধিনিলয় (ক্ষীরসমুদ্র যাহার বাসস্থান)—এইরূপ বলিয়া বিষ্ণুর 'ক্ষীরাব্ধিনিলয় নাম' তাঁহার নামগণন মধ্যে পঠিত হইয়াছে। কোনস্থলে শ্বেতদ্বীপপতির অনিরুদ্ধ বলিয়া খ্যাতিও আছে, অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপপতিই যে অনিরুদ্ধ—এই প্রকার নির্দেশ আছে। সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে শ্বেতদ্বীপপতির সাক্ষাৎ আবির্ভাব যে অনিরুদ্ধ—এই অপেক্ষাতেই শ্বেতদ্বীপপতিকে অনিরুদ্ধ বলে।

তাৎপর্য্য—ইতিহাস যথা—তিন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—ইহাই স্থির করিবার জন্য ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে প্রেরণ করা হইল। ভৃগু ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া সত্ত্বগুণ পরীক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে স্তবপ্রণামাদি করিলেন না। তাহাতে ব্রহ্মা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু পুত্রের প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে—এই বিবেচনায় ব্রহ্মা শান্ত হইলেন। তারপর ভৃগু কৈলাসধামে গমন করিলেন। মহেশ্বর সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন।

এখানে সত্ত্বগুণ পরীক্ষার নিমিত্ত ভৃগু মহাদেবকে উল্লাসগামী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। তাহাতে মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য শূল উদ্যত করিলেন। দেবী ভগবতী মহাদেবের চরণে পতিতা হইয়া সান্ত্বনা দান করায় মহাদেব শান্ত হইলেন। তারপর ভৃগু বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সেস্থলে নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ছিলেন। ভৃগু উপস্থিত হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। নারায়ণ তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ঋষিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—আপনার আগমন আমরা জানিতে পারি নাই, আপনি এই আসনে উপবেশন করুন, আমাকে ক্ষমা করুন্। আপনার পদচিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে বিভূতিরূপে বিদ্যমান থাকিল।—ভৃগু নারায়ণের এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্বক ঋষিগণের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তথায় স্থির হইল যে যাঁহার নিকট হইতে শান্তি ও অভয় প্রবর্তিত হইয়া থাকে সেই বিষ্ণুই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

एवं परीक्षया[१] तत्र त्रिदेव्यास्तारतम्यमपि स्फुटम्। तथा चान्यत्र द्वयेनाह।

सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै-
र्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते।
स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेतिसंज्ञाः
श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः॥ १२॥

इह यद्यपि एक एव परः पुमानस्य विश्वस्य स्थित्यादये स्थितिसृष्टि-लयार्थं तैः सत्त्वादिभिर्युक्तः पृथक् पृथक् तत्तदधिष्ठाता सन् हरिविरिञ्चिहरेति-संज्ञा भिन्ना धत्ते तत्तद्रूपेणाविर्भवतीत्यर्थः। तथापि तत्र तेषां मध्ये श्रेयांसि धर्मार्थ-काममोक्षभक्त्याख्यानि शुभफलानि सत्त्वतनोः सत्त्वशक्तेः श्रीविष्णोरेव स्युः। अयम्भावः। उपाधिदृष्ट्या तौ द्वौ सेवमाने रजस्तमसोर्घोरमूढत्वाद्भवन्तोऽपि धर्मार्थ-कामा नातिसुखदा भवन्ति। तथोपाधित्यागेन सेवमाने भवन्नपि मोक्षो न साक्षान्न च झटिति किन्तु परमात्मांश एवायमित्यनुसन्धानाभ्यासेनैव परमात्मन एव भवति। तत्र तत्र साक्षात् परमात्माकारेणाप्रकाशात्। तस्मात् ताभ्यां श्रेयांसि न भवन्तीति। अथोपाधिदृष्ट्यापि श्रीविष्णुं सेवमाने सत्त्वस्य शान्तत्वाद्द धर्मार्थकामा अपि सुखदाः। तत्र निष्कामत्वेन तु तं सेवमाने 'सत्त्वात् संजायते ज्ञानमि'ति। 'कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानमि'ति चोक्तेर्मोक्षश्च साक्षात्।

---

१ परीक्षायामिति मुद्रितपुस्तकपाठः।

অনুবাদ—এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সেই স্থানে তিন দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) তারতম্যও স্পষ্টরূপে আছে। তাহা অন্যত্রের দুই শ্লোকে অর্থাৎ শ্রীভাগবতের ১।২।২৩—২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন। (২৩ শ্লোক যথা)—যদিও এক পরম পুরুষ (গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ) এই বিশ্বের স্থিতি (পালন), সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তাহাদের অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি, বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) ও হর—এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি জীবের কল্যাণ সত্ত্বতনু হরি হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

(শ্রীসন্দর্ভকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন)—এস্থলে যদ্যপি একই পরম পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত সেই সত্ত্বাদি গুণযুক্ত (অর্থাৎ) পৃথক্ সেই সেই গুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি, বিরিঞ্চি, হর—এই ভিন্ন সংজ্ঞা (নাম) ধারণ করেন অর্থাৎ সেই রূপে আবির্ভূত হন তথাপি তাহাদের (হরিবিরিঞ্চিহরের) মধ্যে শ্রেয়ঃসকল (অর্থাৎ) ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ভক্তি নামক শুভরূপ সকল সত্ত্বতনু অর্থাৎ সত্ত্বশক্তি শ্রীবিষ্ণু হইতেই হয়। ইহার ভাব (তাৎপর্য) এই যে উপাধি দৃষ্টিতে সেই দুই জনকে অর্থাৎ ব্রহ্মা ও শিবকে সেবা করিলে, রজঃ ও তমোগুণের ঘোরতা ও বিমূঢ়ত্ব হেতু ধর্মার্থকাম সিদ্ধ হইলেও উহা অত্যন্ত সুখপ্রদ হয় না; এবং উপাধি পরিত্যাগে সেবা করিলে অর্থাৎ রজস্তনু ব্রহ্মা ও তমস্তনু শিব,—এই রজস্তমঃ পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিলে, সেবকের যদিও মোক্ষ হয় তথাপি তাহা (মোক্ষ) সাক্ষাৎ ও শীঘ্র লাভ হয় না। কিন্তু ইনি পরমাত্মারই কথঞ্চিৎ অংশ—এই প্রকার অনুসন্ধানের অভ্যাস দ্বারা পরমাত্মা হইতেই মোক্ষ হয়। যেহেতু ব্রহ্মা ও শিবে পরমাত্মাকারে অপ্রকাশ। অতএব সেই দুই (ব্রহ্মা ও শিব) হইতে মঙ্গল সফল হয় না। উপাধি দৃষ্টিতে বিষ্ণুকে সেবা করিলে অর্থাৎ সত্ত্বগুণযুক্ত বিষ্ণু—এই প্রকারে গুণযুক্ত বুদ্ধিতে সেবা করিলেও সত্ত্বগুণের শান্তত্ব হেতু সেবকের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সুখদ হয়। আবার নিষ্কামরূপে সেই (বিষ্ণুকে) সেবা করিলে 'সত্ত্ব হইতে জ্ঞান হয়' (গীতা ১৪।১৭)—(এই উক্তিতে তাহার জ্ঞান)—এবং 'দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক'—এই (ভাগবত ১১।২৫।২৩) উক্তি হেতু সাক্ষাৎ মোক্ষও হয়।

তাৎপর্য—শ্রীসন্দর্ভকার বলিলেন উপাধি দৃষ্টিতে ব্রহ্মা রুদ্রকে সেবা করিলে মোক্ষ হয় না—সাধারণ ভেদ বা ধর্মকে উপাধি বলে। অর্থাৎ একই বস্তু অন্য ধর্মযুক্ত হইলে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হয়, এবং যে ধর্মদ্বারা পৃথক্ হয় তাহাকে উপাধি বলে।

রজস্তমোগুণের ঘোরতা ও মূঢ়ত্ব বলিয়াছেন—এবিষয় শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীভাগবতে ১০।৮৮।৫ শ্লোকের টীকাতে বলিয়াছেন—

গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ শান্তঘোরমূঢ়াঃ স্বভাবতঃ।

সত্ত্বাদি গুণশান্ত, ঘোর ও মূঢ়স্বভাব।

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ শান্ত, রজোগুণ ঘোর, তমোগুণ মূঢ়।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তত্ত্বকৌমুদীতে সত্ত্বাদিগুণের স্বভাব বর্ণনা করিয়াছেন—

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব—প্রকাশ শব্দে তেজ ও জ্ঞান উভয়ই জানিতে হইবে, রজো-গুণ উপষ্টম্ভক শক্তিসাধ্য কার্য করে এবং সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া রাখে ও চল (ক্রিয়াশীল); আর তমোগুণ গুরু, ইহাতেই তামস পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়। অন্ধকারের ন্যায় অন্য পদার্থ-আবরক। এই কারণে তামস লোকের জ্ঞানশক্তি অস্পষ্ট থাকে। তৈলবর্তী (শল্তা) ও অগ্নিযুক্ত প্রদীপ যেমন অন্ধকারনাশ এবং আলোকদানে একমত, তদ্রূপ পরস্পর বিরোধী তিনটীগুণ স্ব স্ব কার্যে একমত হইয়া কার্য করে।

সত্ত্বতনু একমাত্র বিষ্ণুর সেবাতেই ধর্মার্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি শুভফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু রজস্তমস্তনু ব্রহ্মা ও রুদ্রের সেবাতে ধর্মার্থ কাম হইলেও ফলপ্রদ হয় না। কেননা রজোগুণের ঘোর বৃত্তি, আর তমোগুণের মূঢ় বৃত্তি। তবে কেহ যদি—ব্রহ্মা ও রুদ্র পরমাত্মার অংশ—এই বুদ্ধিতে সেবা করেন তাহা হইলে যে মোক্ষ হয় তাহা বুঝিতে হইবে পরমাত্মার অনুসন্ধান বশতই মোক্ষ হইল, ব্রহ্মরুদ্রের সেবাতে মোক্ষ হয় নাই।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে রজস্তমোগুণযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রের সেবাতে শুভফল হয় না, সত্ত্বগুণযুক্ত বিষ্ণুর সেবাতেই বা মোক্ষ হইবে কেন, যেহেতু বিষ্ণুও সত্ত্বগুণযুক্ত। কিন্তু এ আপত্তি চলিতে পারে না। কারণ সত্ত্বগুণের শান্তবৃত্তিহেতু সেবকের ধর্মকামাদি ধর্ম-অর্থাদি সুখ হইয়া থাকে।

'সত্ত্বং রজস্তম' এই শ্রীভাগবতের ১।২।২৩ শ্লোকে সত্ত্বগুণযুক্ত বিষ্ণু, রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা, তমোগুণযুক্ত রুদ্র বলা হইয়াছে। গুণযুক্ত বলায় তাঁহারা গুণের অধীন এ প্রকার বুঝিতে হইবে না। হরি, বিরিঞ্চি, হর ঐ সকল গুণের নিয়ামক অর্থাৎ পরিচালনকারী। তাঁহারা (বিষ্ণুব্রহ্মাদি) যেভাবে গুণসকলকে পরিচালিত করেন, গুণসকল সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। রজোগুণ ও তমোগুণের সংযোগসম্বন্ধযোগে পুরুষ ব্রহ্মা ও রুদ্র হন, অতএব তাঁহারা সগুণ। আর সত্ত্বগুণ সামীপ্যসম্বন্ধযোগে সেই পুরুষই বিষ্ণু হন, অতএব তিনি নির্গুণ। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্নিধ্যমাত্রে রজঃ ও তমোগুণের পরিচালক। বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক।

যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে।
অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্তবং ॥
[লঘুভাগবতামৃতের গুণাবতার প্রকরণে কারিকা]

নিয়ামকতারূপে গুণের সহিত সম্বন্ধকে যোগ বলে। অতএব সেই পুরুষ কখনই গুণের সহিত মিলিত হন না। বিশেষতঃ তন্মধ্যে যিনি স্বয়ং প্রভুর স্বীয় অংশ বিষ্ণু, তিনি কোনপ্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না।

अत उक्तं स्कान्दे ।

बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोक्षकः ।

कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णरेव सनातनः ।। इति ।

उपाधिपरित्यागेन तु पञ्चमः पुरुषार्थो भक्तिरेव भवति तस्य परमात्माकारेणैव प्रकाशात् । तस्मात् श्रीविष्णोरेव श्रेयांसि स्युरिति । अत्र तु यत्त्रयाणामभेदवाक्येनोपजग्ममतयो विवदन्ते तत्रेदं ब्रूमः ।

यद्यपि तारतम्यमिदमधिष्ठानगतमेव अधिष्ठाता तु परः पुरुष एक एवेति भेदासंभवात् सत्यमेवाभेदवाक्यम् । तथापि तस्य तत्र तत्र साक्षात्वासाक्षात्वभेदेन प्रकाशेन तारतम्यं दुर्निवारमेवेति सदृष्टान्तमेवाह ।

অনুবাদ—অতএব স্কন্দে উক্ত হইয়াছে—পরব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই ভবপাশদ্বারা বন্ধক, ভবপাশ হইতে মোচক, এবং মোক্ষপ্রদ।

উপাধিপরিত্যাগে বিষ্ণুকে ভজনা করিলে সেবকের পঞ্চপুরুষার্থ ভক্তিই হয়, যেহেতু তাঁহার পরমাত্মাকারেই প্রকাশ।

বিষ্ণু হইতেই সর্বপ্রকার কল্যাণ হয়। এস্থলে তিনের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের) অভেদ বাক্যদ্বারা উপজগ্নমতি অর্থাৎ তিনের অভেদদর্শি জনসকল যে বিবাদ করে, সে বিষয়ে আমরা ইহাই বলি।

যদ্যপি অধিষ্ঠানগতই তারতম্য, অধিষ্ঠাতা পরম পুরুষ একই অর্থাৎ একই পরমপুরুষ হরি বিরিঞ্চি হরসংজ্ঞাধারণ করিয়াছেন; কেবলমাত্র অধিষ্ঠানের (স্থানের সত্বরজ, তমোগুণের) পার্থক্য, অতএব ভেদের কোন সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অভেদ বাক্যই সত্য; তথাপি (তাহা হইলেও) সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ ভেদপ্রকাশদ্বারা তারতম্য দুর্নিবারই হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মা ও রুদ্রে পরম পুরুষের অসাক্ষাৎ প্রকাশ, বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ প্রকাশ—ইহা দৃষ্টান্তসহ বলিয়াছেন।

তাৎপর্য—সত্ত্বগুণ হইলে বিষ্ণুর উপাধি সত্ত্বগুণে জ্ঞান জন্মে, সেই সত্ত্বগুণাংশ ত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মরূপে বিষ্ণুকে ভজন করিলে ভক্তি লাভ হয়।

पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः।
तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् ॥ १२ ॥

पार्थिवात्तु धूमवदंशेनाग्नेयात् तत एव वेदोक्तकर्मणः साक्षात् प्रवृत्ति-प्रकाशरहिताद् दारुणः यज्ञीयान्मथनकाष्ठात् सकाशादंशेनाग्नेयो धूमस्त्रयीमयः पूर्वापेक्षया वेदोक्तकर्माधिक्यविर्भावास्पदम्। तस्मादपि स्वयमग्निस्त्रयीमयः साक्षात् तदुक्तकर्माविर्भावास्पदम्। एवं काष्ठस्थानीयात् सत्त्वगुणविदूरात् तमसः सकाशाद् धूमस्थानीयं किञ्चित् सत्त्वसन्निहितं रजो ब्रह्मदर्शनम्। वेदोक्तकर्मस्थानीयस्य तत्तदवतारिणः पुरुषस्य प्रकाशद्वारम्[१]। यदग्निस्थानीयं सत्त्वं तत् साक्षाद्ब्रह्म-दर्शनम्। साक्षादेव सम्यग्गुणरूपाविर्भावद्वारं शान्तस्वच्छस्वभावात्मकत्वात्। अतो ब्रह्मरुद्रयोर्द्वयोरसाक्षात्त्वं श्रीविष्णौ तु साक्षात्त्वं सिद्धमिति भावः।

অনুবাদ—(শ্রীভাগবতে ১।২।২৪ শ্লোকে দৃষ্টান্তের দ্বারা শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট সত্ত্বগুণযুক্ত বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীসূত বলিয়াছেন)—পার্থিব বিকার কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, ত্রয়ীময় অগ্নি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ), তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ (শ্রেষ্ঠ)—যেহেতু সত্ত্বগুণ ব্রহ্মদর্শক।

পার্থিব (পৃথিবী সম্বন্ধীয় কাষ্ঠ) হইতে কিন্তু ধূমের ন্যায় আগ্নেয় অংশ হইতে নহে, অর্থাৎ ধূম অগ্নি হইতে উত্থিত হয়, তাহাতে অগ্নির অংশ থাকে, কাষ্ঠে তাহা নাই। তাহা অপেক্ষা (কাষ্ঠ অপেক্ষা) বেদোক্ত কর্মের সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি (চলন) ও প্রকাশরহিত যে কাষ্ঠ অর্থাৎ যজ্ঞীয় মন্থনকাষ্ঠ তাহা হইতে অংশের দ্বারা অগ্নি সম্বন্ধীয় বেদময় ধূম শ্রেষ্ঠ, কেননা পূর্বাপেক্ষায় (কাষ্ঠ অপেক্ষায়) বেদোক্ত কর্মাধিক্যের আবির্ভাবের আস্পদ ঐ ধূম হইতেও স্বয়ং ত্রয়ীময় (বেদময়) অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদোক্ত কর্মের আবির্ভাবের আস্পদ (স্থান)। (অর্থাৎ কাষ্ঠে বেদোক্ত কোন

---

১ तु यत्नेन क्षयात्मकात् तमसः सकाशाद्रजसः सोपाधिकप्रकाशत्वेन ईषत् सद्गुणाच्छविप्रादुर्भावरूपं किञ्चित् ब्रह्मदर्शनं प्रत्यासत्तिमात्रमुक्तं न तु सर्वथा विक्षेपकत्वात् ।—मुद्रित पुस्तके अधिकः पाठः।

কর্মাধিক্যের আবির্ভাব নাই, কিন্তু অগ্নি হইতে উত্থিত যজ্ঞীয় ত্রয়ীময় স্বয়ং অগ্নি (আগ্নেয় অংশ নহে, সাক্ষাৎ বেদোক্ত কর্মের আবির্ভাব স্থান।)—এই প্রকার সত্ত্বগুণ হইতে দূরবর্ত্তী কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণ হইতে ধূমস্থানীয় কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের সন্নিহিত রজোগুণ ব্রহ্মদর্শক, অর্থাৎ বেদোক্ত কর্মস্থানীয় সেই সেই অবতারী পুরুষের প্রকাশের দ্বার। অগ্নিস্থানীয় যে সত্ত্বগুণ তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক (অর্থাৎ) সাক্ষাৎই (পরম্পর নহে) সম্যক্ প্রকার গুণ ও রূপের আবির্ভাবদ্বার—যেহেতু (সত্ত্বগুণ) শান্ত ও স্বচ্ছস্বভাব। অতএব ব্রহ্মাতে ও রুদ্রে (ব্রহ্মদর্শনের) অসাক্ষাত্ব কিন্তু বিষ্ণুতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শনত্ব সিদ্ধ হইল—ইহাই তাৎপর্য।

তাৎপর্য—পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, কেননা ধূমে প্রকাশশক্তি না থাকিলেও প্রবৃত্তি (চলন) শক্তি আছে। কাষ্ঠে চলনশক্তি ও প্রকাশশক্তি এই দুইয়েরই অভাব। আবার ঐ ধূম অপেক্ষা ত্রয়ীময় অর্থাৎ বেদোক্তযজ্ঞাদিসাধক অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ অগ্নিতে চলনশক্তি ও প্রকাশশক্তি উভয়ই বিদ্যমান। (লয়াত্মক) তমোগুণ অপেক্ষা (বিক্ষেপক) রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ—কেননা সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক।

কাষ্ঠ হইতে ধূমের শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা অগ্নির শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, এবং তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। অতএব তত্তদ্-গুণোপাধি হরি বিরিঞ্চি হর প্রভৃতিরও বিশিষ্টতা। অর্থাৎ লয়াত্মক তমোগুণোপাধি হর অপেক্ষা বিক্ষেপাত্মক রজোগুণোপাধি ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণোপাধি হরির শ্রেষ্ঠত্ব।

तथा च श्रीवामनपुराणे।

ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाणि त्रीणि विष्णोर्महात्मनः।
ब्रह्माणि ब्रह्मरूपः स शिवरूपः शिवे स्थितः।
पृथगेव स्थितो देवोविष्णुरूपी जनार्दनः॥ इति।

तदुक्तं ब्रह्मसंहितायाम्।

भास्वान् यथाश्मसकलेषु निजेषु तेजः
स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि यद्वदत्र।
ब्रह्मा य एव जगदण्डविधानकर्त्ता
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥

क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात्
सञ्जायते नतु ततः पृथगस्ति हेतोः।
यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्य्याद्
गोविन्दमादिपुरुषमि'ति।
'दीपार्च्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य
दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा।
यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति
गोविन्दमि'त्यादि।

অনুবাদ—শ্রীবামনপুরাণে তাহা উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনটী মহাত্মা বিষ্ণুর রূপ; সেই বিষ্ণু ব্রহ্মাতে ব্রহ্মরূপে ও শিবে শিবরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও বিষ্ণুরূপী জনার্দন পৃথক্‌রূপে অবস্থিত হইয়া আছেন।

ব্রহ্ম সংহিতাতে (৫ম অ. ৪৯।৪৫।৪৬) শ্লোকে তাহা উক্ত হইয়াছে।—প্রভাশালী সূর্য যেমন স্বীয় প্রস্তর খণ্ড সমূহে (সূর্যকান্তমণি প্রভৃতিতে) কিঞ্চিৎ নিজ তেজঃ প্রকটিত করে অর্থাৎ প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা দাহ করে, সেই প্রকার যিনি ব্রহ্মাতে স্বীয় সৃষ্টিশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টিচরনা করেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। [ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৯ শ্লোক]

(৪৫ শ্লোকে শিবের বর্ণনা) বিকারবিশেষ (অম্ল) যোগে দুগ্ধ যেমন দধি হয়, কিন্তু ঐ দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে কভু পৃথক নহে, কেবল দুগ্ধের পরিণাম মাত্র; তদ্রূপ যিনি কার্যবশতঃ অর্থাৎ সংহারাদিকার্যের নিমিত্ত শম্ভুতা (শম্ভুভাব) ধারণ করিয়া থাকেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

(৪৬ শ্লোকে বিষ্ণুর বিষয় বর্ণন যথা—) যেমন প্রদীপের শিখা দশান্তর অর্থাৎ অন্যবর্তিকে (শলতাকে) লাভ করিয়া পূর্বদীপের (মূল দীপের) ন্যায় সম্যক্ প্রজ্বলিত হয় কিন্তু উভয় দীপেরই যে সমান ধর্ম—তাহার অন্যথা হয় না, তদ্রূপ যিনি (গর্ভোদকশায়ী) বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তিনিও তাঁহারই (গোবিন্দের) সদৃশ এবং সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তাৎপর্য—এস্থলে শ্রীসন্দর্ভকার ব্রহ্মসংহিতার ৫।৪৯, ৪৫ ও ৪৬—এই তিনটী শ্লোক ধরিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু' এই শ্লোকটি ব্রহ্মার বিষয়। আর ৪৫ শ্লোক শম্ভুর, ও ৪৬ শ্লোক বিষ্ণুর বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে (৪৯ শ্লোকে) সূর্য ও সূর্যকান্তমণির সঙ্গে গোবিন্দ ও ব্রহ্মার উপমা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে সূর্যকান্তমণির দাহিকা শক্তি নাই, সূর্যের রশ্মি সূর্যকান্তমণিতে পতিত হইলে সে দাহ করে, সুতরাং সূর্যের কিরণেরই দাহিকাশক্তি। গোবিন্দ হইয়াছেন সূর্যস্থানীয়, আর ব্রহ্মা হইলেন সূর্যকান্তমণিস্থানীয়। সূর্য যেমন সূর্যকান্তমণির তেজঃ সঞ্চার করে, শ্রীগোবিন্দও যোগ্যজীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন সেইরূপ। সূর্যতেজে তেজস্বী হইয়া সূর্যকান্তমণি যেমন দাহ করিতে পারে, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের সৃষ্টিশক্তি ধারণ করিয়া যোগ্যজীব ও ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা নাম ধারণ করেন।

তাহাই শ্রীচরিতামৃতে ২।২০।২৫৯—২৬০ পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়িদ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥

কোনকল্পে যদি যোগ্যজীব না পাওয়া যায়, সেই কল্পে ভগবান নিজেরই অংশে ব্রহ্মা হইয়া ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি করেন।

কোনকল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্ম হয়॥

চৈতন্যচরিতামৃত ২।২০।২৬১ পয়ার।

অতএব ব্রহ্মা দুইপ্রকার—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। কোনও জীব ব্রহ্মা হইলে তাহাকে জীবকোটী, আর ভগবান নিজ অংশে ব্রহ্মা হইলে তাহাকে ঈশ্বরকোটি বলে।

পরবর্তী এই শ্লোকে কার্যকারণ ভাবমাত্রের প্রকাশ হইল। দধির কারণ দুগ্ধ, দধি হইল দুগ্ধের কার্য; তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দ হইলেন শম্ভুর কারণ, শম্ভু হইলেন তাঁহার কার্য। প্রকৃত পক্ষে শিব ও গোবিন্দ এক নহেন। শিব গুণসংবৃত, গোবিন্দ নির্গুণ। এখানে উপমা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দুগ্ধ অম্লাদি যোগে যেমন দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি আর নিজের কারণ (দুগ্ধ) হইতে পারেনা; তদ্রূপ গোবিন্দ হইতে শিব, কিন্তু সেই শিব আর গোবিন্দ হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ২। ২০। ২২-৬৪ পয়ার্দে—

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গকরি।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥
মায়াসঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্নরূপ।
জীবতত্ত্ব নহে নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধি রূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হইতে নারে॥
শিবমায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।

একত্রে দীপের শিখা অন্য সলিতার সহিত মিলিত হইলে পূর্ব দীপের ন্যায় দাহাদি-কার্য উভয় দীপের সমান ধর্ম। কিন্তু দ্বিতীয় দীপের কারণ প্রথম দীপ। এই উপমাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে শ্রীগোবিন্দ হইতে বিষ্ণুর প্রকাশ, গোবিন্দ অংশী এবং বিষ্ণু অংশ। মায়ার অতীত তত্ত্বাংশে শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ-ঐশ্বর্যাদি যেমন মায়াতীত, শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ ও ঐশ্বর্যাদিও মায়াতীত। কিন্তু ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদির প্রকাশ শ্রীবিষ্ণু অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দে অনেক বেশী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ২।২০ পরিচ্ছেদে যথা—

মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥ ২৬৫।
পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দ্রষ্টা, তাতে গুণমায়াসার॥ ২৬৬॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য পূর্ণ কৃষ্ণ সমপ্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥ ২৬৭॥

ন চ দধিদৃষ্টান্তেন বিকারিত্বমায়াতি তস্য শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়েন মুহুঃ পরিহৃতত্বাৎ। যথোক্তং—'যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ' ইতি। দৃষ্টান্তত্রয়েণ তু ক্রমেণেদং লভ্যতে, সূর্য্যকান্তস্থানীয়ে ব্রহ্মোপাধৌ সূর্য্যস্যেব তস্য কিঞ্চিৎপ্রকাশঃ। দধিস্থানীয়ে শম্ভূপাধৌ ক্ষীরস্থানীয়স্য ন তাদৃগপি প্রকাশঃ। দশান্তরস্থানীয়ে বিষ্ণূপাধৌ তু পূর্ণ এব প্রকাশ ইতি। ১॥ ২। শ্রীসূতঃ।

অনুবাদ—দধিদৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহার (গোবিন্দের) বিকারিত্ব আসেনা। যেহেতু 'শ্রুতির শব্দমূলত্ব হেতু' (এই বেদান্ত দর্শনের ২।১।২৭ সূত্রদ্বারা)—পুনঃপুনঃ সেই দোষ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অনুবাদ—এ বিষয়ে (শ্রীভাগবতে ১০।৭৮।১৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—যেমন বিকৃত ঘটাদির মৃত্তিকাতে উদয় (প্রকট) ও অস্ত, তদ্রূপ অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উদয় ও অস্ত।

(ব্রহ্ম-সংহিতার কথিত সূর্য, দুগ্ধ ও দীপ এই) তিনটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে সূর্যকান্তমণি স্থানীয় ব্রহ্মোপাধিতে সূর্যের ন্যায় কিঞ্চিৎ প্রকাশ, কিন্তু দধিস্থানীয় শম্ভু-উপাধিতে দুগ্ধস্থানীয় ভগবানের সেরূপ প্রকাশ নাই, কিন্তু দশান্তর-(অন্য শলতা) স্থানীয় বিষ্ণু-উপাধিতে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতে ১।২।২৪ পার্থিবাদ্দারুণোধূমঃ—এই শ্লোকটী শ্রীসূত বলিয়াছেন।

তাৎপর্য—ক্ষীর দধি হয়—এই কথা বলাতে দুগ্ধের বিকার যেমন দধি, তদ্রূপ গোবিন্দই ব্রহ্মতা ও শম্ভুতা প্রাপ্ত হন বলাতে গোবিন্দের বিকার ব্রহ্মা ও শম্ভু এ প্রকার বুঝিতে হইবে না। তজ্জন্য শ্রীসন্দর্ভকার বেদান্ত-দর্শনের 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া বিকারিত্ব দোষ খণ্ডন করিলেন। এই সূত্রের মর্মার্থ এই—ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা। ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেও তাহাতে বিকারিত্ব হয় না; কেননা শ্রুতি প্রমাণ হেতু শব্দই ইহার মূল। ব্রহ্মপদার্থ সমস্ত পদার্থ হইতে বিজাতীয়, একমাত্র শব্দ-প্রমাণগম্য, সুতরাং শব্দগম্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি সম্বন্ধবিরুদ্ধ নহে। তিনি জগতের বা ব্রহ্মাদির কারণ হইয়াও অবিকৃতভাবে স্ব-স্ব-রূপে বিদ্যমান আছেন।

দুগ্ধের বিকার দধির দৃষ্টান্তানুসারে গোবিন্দের বিকারিত্ব আসিতে পারেনা। কারণ গোবিন্দের বিষয় সামান্যতঃ দৃষ্ট নিয়মানুসারে নির্দ্ধারিত হয় না, অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি ব্রহ্মাদির কারণ হইয়াও অবিকৃত থাকেন।

এখানে সর্বাংশে উপমা নহে, কেবল উদয় ও নাশ সম্বন্ধে উপমা। চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলিলে চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে মুখও তেম্‌নি আকাশে থাকিবে এবং গোলাকার হইবে—তাহা বুঝায় না, চন্দ্র দেখিলে যেমন আনন্দ হয় মুখ দেখিলেও সেই প্রকার আনন্দ হয়—এই আনন্দাংশে উপমা। এখানেও বিকারপ্রাপ্ত মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদির উৎপত্তি হয়, ও তাহাতে লয় হয়। কিন্তু ব্রহ্মের কোন বিকার হয় না অথচ তাহা হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উৎপত্তি ও নাশ হয়। অচিন্ত্য শক্তিতে ব্রহ্ম অবিকৃতভাবেই থাকেন।

एवमेवाह त्रिभिः।

शिवः शक्तियुतः शश्वत्त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः।
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा॥
ततो विकारा अभवन् षोड़शामीषु किञ्चन।
उपाधावन् विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम्॥

हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः।
स सर्वदृगुपद्रष्टा तं भजन्निर्गुणो भवेत्॥ १४॥

शश्वच्छक्तियुतः प्रथमतस्तावन्नित्यमेव शक्त्या गुणसाम्यावस्थप्रकृतिरूपोपाधिना युक्तः, गुणक्षोभे सति त्रिलिङ्गो गुणत्रयोपाधिः प्रकटैश्च सद्भिस्तैर्गुणैः संवृतश्च। ननु तमउपाधित्वमेव तस्य श्रूयते, कथं तत्तदुपाधित्वं तत्राह वैकारिक इति। अहं अहंतत्त्वं हि तत्तद्रूपेण त्रिधा। स च तदधिष्ठातेत्यर्थः। मुख्यतया नास्तां नामान्यद्गुणद्वयं गौणतया त्वास्त एवेत्यर्थः। ततस्तेन भगवत्प्रतिनिधिरूपेणाधिष्ठितादहंतत्त्वात् षोड़श विकारा ये अभवन्, अमीषु विकारेषु मध्ये सर्वासां विभूतीना सम्बन्धि किञ्चन उपाधावन् तदुपाधिकत्वेन तमुपासीनो गतिं प्राप्यं फलं लभते। हि प्रसिद्धौ हेतौ वा। हरिस्तु प्रकृतेरुपाधितः परस्तद्धर्मैरस्पृष्टः। अतएव निर्गुणोऽपि कुतस्त्रिलिङ्गतादिकमिति भावः। अत्र हेतुः साक्षादेव पुरुष ईश्वरः नतु प्रतिविम्बवद्व्यवधानेनेत्यर्थः।

অনুবাদ—এই প্রকারই তিন শ্লোকের দ্বারা (শ্রীভাগবতে ১০।৮৮।৩, ৪, ৫ শ্লোক দ্বারা শ্রীশুকদেব) বলিয়াছেন। 'শিব সর্বদা শক্তিযুক্ত, ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে গুণত্রয়ের উপাধিযুক্ত এবং গুণসংবৃত অর্থাৎ তিনগুণের (সত্ত্বরজস্তমের) দ্বারা (দূর হইতে) সম্যক্‌রূপে বৃত। যেহেতু বৈকারিক (সাত্ত্বিক) তৈজস (রাজসিক) ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া তিনি ত্রিলিঙ্গ।

তাঁহা হইতে (অর্থাৎ ভগবানের প্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত অহংতত্ত্ব হইতে) চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; ক্ষিত্যপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত ও মন—এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে যে কোন বিকারোপাধিকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা যে দেবতাসকল আছেন তাঁহাদের কাহাকেও ভজন করিলে সকল বিভূতির (উপাধির অনুরূপ) গতি (ফল) প্রাপ্ত হয়।

শ্রীহরি সাক্ষাৎ নির্গুণ (মায়িকগুণস্পর্শশূন্য) পুরুষ (পরমেশ্বর), প্রকৃতির (মায়ার) অতীত সর্বদর্শী ও সকলের সাক্ষী—তাঁহাকে ভজন করিলে নির্গুণ হওয়া যায়॥ ১৪॥

(শ্রীসন্দর্ভকার প্রথমতঃ দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন)—শিব শশ্বচ্ছক্তিযুত প্রথমতঃ নিত্য গুণসাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতিরূপ উপাধি দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে যখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা থাকে তখনও শিব সেই সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতিরই উপাধির সহিত যুক্ত থাকেন। (দ্বিতীয়তঃ) গুণ-ক্ষোভ হইলে ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ গুণত্রয়োপাধিক অর্থাৎ যে

সময়ে পুরুষের শক্তিতে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয় সেই সময় গুণত্রয়-উপাধিযুক্ত হইয়া ত্রিলিঙ্গ হন্। গুণত্রয়োপাধির প্রকটনে বিদ্যমান সেই সকল গুণদ্বারা তিনি সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছন্ন হয়েন্।

(আশঙ্কা করিতেছেন) আচ্ছা শিবের তম-উপাধিত্বই শুনা যায়, কেমন করিয়া সেই সেই উপাধিযুক্ত, অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের সহিত যুক্ত হন? সেই বিষয় বলিতেছেন, 'বৈকারিক' ইত্যাদি—এই বাক্যদ্বারা অহঙ্কারতত্ত্ব সেই সেই রূপে তিন প্রকার; অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শিব। অন্য গুণদ্বয় মুখ্যরূপে তাহাতে নাই, গৌণরূপে আছে। অতএব শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত সেই অহংতত্ত্ব হইতে যে ষোড়শ বিকার (ইন্দ্রিয়াদি) উদ্ভব হইয়াছে, এই বিকারসকলের মধ্যে সকল বিভূতির সম্বন্ধে কাহাকেও ভজনা করিলে অর্থাৎ সেই সেই উপাধিত্বরূপে তাহাকে উপাসনা করিলে গতি অর্থাৎ প্রাপ্যফল লাভ হয়। হিশব্দের অর্থ প্রসিদ্ধি বা হেতু।

হরি কিন্তু প্রকৃতির উপাধি হইতে অতীত—তাহার ধর্মসকলের দ্বারা অস্পৃষ্ট অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম তাহাকে স্পর্শ করে না। অতএব যিনি নির্গুণ তাঁহার ত্রিলিঙ্গত্বাদি হইতে পারে না। এ বিষয়ে হেতু এই যে তিনি সাক্ষাৎই পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর, কিন্তু প্রতিবিম্বের ন্যায় ব্যবধান দ্বারা (ঈশ্বর) নহেন।

তাৎপর্য—শ্রীভাগবতে ১০।৮৮।১ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন যে ভোগ-ত্যাগী শিবকে ভজন করিলে লোকে ভোগশালী (ধনী) হয়। আর লক্ষ্মীপতি হরির ভজনে তাহা হয় না—ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে শিব গুণময়, সম্পৎসকলও ত্রিগুণময়; অতএব শিবের ভজনে লোকের সম্পৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। [ভা ১০. ৮৮. ৪ দ্রষ্টব্য]

ভা. ১০.৮৮-৫ শ্লোকে শ্রীশিব অপেক্ষা শ্রীহরির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। শিব মায়া গুণযুক্ত, শ্রীহরি নির্গুণ অর্থাৎ মায়িক গুণের স্পর্শমাত্র তাহাতে নাই। শিব মায়োপাধিযুক্ত, শ্রীহরি মায়াতীত, শ্রীহরি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, শ্রীশিব শ্রীহরির অবতার বলিয়া পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর, শ্রীহরি সর্বদর্শী (শিবাদিরও দ্রষ্টা), শ্রীহরি গুণস্পর্শশূন্যহেতু উদাসীনভাবে সর্বসাক্ষী, অতএব শ্রীহরির ভজনে গুণোপাধি দূরে যায়।

ইন্দ্রিয়াদিবিকার সকলের এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাহাদের মধ্যে এক এক জনকে ভজন করিলে সেই সেই ফল লাভ হয়।

প্রতিবিম্ব যাহাতে পতিত হয় তাহার গুণ প্রতিবিম্বে প্রকাশ পায়; যেমন মলিন জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে জলের ব্যবধান হেতু প্রতিবিম্বও মলিন হয়। হরি সম্বন্ধে তাহা নহে। আকাশস্থ সূর্যবিম্ব জলে পতিত হইলে জলের মলিনতার জন্য উহা সম্যক্ প্রকাশ পায় না, কিন্তু আকাশস্থ সূর্য সর্বদাই একরূপে প্রকাশ পান—তদ্রূপ ব্রহ্মরুদ্রাদিগুণযোগ হেতু সম্পূর্ণ ঈশ্বর নহেন, বরং বিষ্ণুই রজস্তমোগুণ যোগে ব্রহ্মা ও রুদ্র—সুতরাং বিষ্ণুই পরমেশ্বর।

শ্রীধরস্বামিপাদ "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ" এই শ্রীভাগবতের ১০।৮৮।৫ শ্লোকের টীকায় বিম্বপ্রতিবিম্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বস্তুনো গুণসম্বন্ধে রূপদ্বয়মিহেষ্যতে।
তদ্ধর্মাযোগযোগাভ্যাং বিম্ববৎ প্রতিবিম্ববৎ ॥
গুণাঃ সত্বাদয়ঃ শান্তিঘোরমূঢ়াঃ স্বভাবতঃ।
বিষ্ণুব্রহ্মশিবানাঞ্চ গুণযন্তৃস্বরূপিণাম্॥
নাতিভেদো ভবেদ্ ভেদো গুণধর্মৈরিহাংশতঃ।
সত্বস্ত শান্ত্যা নো জাতু বিষ্ণোর্বিক্ষেপমূঢ়তা ॥
রজস্তমোগুণাভ্যাস্তু ভবেতাং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
গুণোপমর্দ্দতো ভূয়স্তদংশানাঞ্চ ভিন্নতা ॥
অতঃ সমগ্রসত্বস্য বিষ্ণোর্মোক্ষকরী মতিঃ।
অংশতো ভূতিহেতুশ্চ তথানন্দময়ী স্বতঃ ॥
অংশতস্তারতম্যেন ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিনাম্।
বিভূতয়ো ভবন্ত্যেব শনৈর্মোক্ষোঽপ্যনংশতঃ ॥
ইদমেবাভিপ্রেত্য তত্র তত্রোচ্যতে
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোর্নৃণাং স্যুরিতি।

বস্তুর গুণসম্বন্ধ এইস্থলে হইতেছে দুইরূপ। তাহার (গুণের) ধর্মের অযোগ, ও যোগ এই দুই প্রকার বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ন্যায় অর্থাৎ বিম্বে সেই ধর্মে অযোগ আর প্রতিবিম্বে সেই ধর্মের যোগ—তদ্রূপ সত্ব, রজস্তমঃ এই তিনটী গুণ স্বভাবতঃ শান্ত ঘোর ও মূঢ় অর্থাৎ সত্বগুণ শান্ত, রজোগুণ ঘোর, আর তমোগুণ মূঢ়স্বভাব। গুণের নিয়ন্তাস্বরূপ বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিবের অত্যন্ত ভেদ নাই, কিন্তু গুণধর্মের দ্বারা অংশভেদ। সত্বগুণ শান্ত, সুতরাং সত্ব-তনুতে বিক্ষেপমূঢ়তা কখনই নাই। রজস্তমোগুণে ব্রহ্মা ও রুদ্রের বিক্ষেপ ও মূঢ়তা আছে। গুণের উপমর্দ্দে পুনর্বার বিষ্ণুর অংশসকলের ভিন্নতা। অর্থাৎ যদিও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র একই—তাহাদের কোন ভেদ নাই, তথাপি গুণের উপমর্দ্দ হেতু (তারতম্যহেতু) তাহার (বিষ্ণুর) অংশসকলের ভিন্নতা। অতএব সম্পূর্ণ সত্বগুণ বিষ্ণুর মতি মোক্ষকরী। অংশ হইতে ভূতির কারণ হয়, স্বয়ং বিষ্ণু হইতে আনন্দময়ী (মতি) হয়। অংশের তারতম্য হেতু ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি সেবকগণের বিভূতিসকল ক্রমেই হয়। অংশহীন (অংশী) বিষ্ণু হইতে মোক্ষ হয়ই।

এই অভিপ্রায়েই সেই সেইস্থানে (ভাগবতে ১।২।২৩ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে সত্ব-তনু বিষ্ণু হইতে মনুষ্যগণের মঙ্গলসকল হয় ইতি।

अतो "विद्याविद्ये मम तनू" इतिवत् तनुशब्दोपादानात् कुत्रचित् सत्व-

शक्तित्वश्रवणमपि प्रेक्षामात्रेणोपकारित्वादितिभावः। अतएव सर्वेषां शिवब्रह्मादीनां दृग्ज्ञानं यस्मात् तथाभूतः सन् उपद्रष्टा तदादिसाक्षी भवति। अतस्तं भजन्निर्गुणो भवेद् गुणातीतफलभाग् भवतीति। १० ॥ ८८। श्रीशुकः।

অনুবাদ—অতএব (শ্রীভাগবতে ১১।১১।৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন)—(হে উদ্ধব)! বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার তনু (শক্তি)। ইহার ন্যায় কোথাও সত্ত্বশক্তিত্বও শোনা যায়,—তাহার তাৎপর্য-দৃষ্টিমাত্র তাহার (সত্ত্বশক্তির) উপকারক। অতএব শিব ও ব্রহ্মাদি সকলের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান যাহা হইতে হয় সেই প্রকার উপদ্রষ্টা (অর্থাৎ) তাহাদের সাক্ষী হন্। অতএব তাহাকে (হরিকে) ভজন করিয়া নির্গুণ হয় (অর্থাৎ) গুণাতীত-ফলভাগী হয়। এই শ্লোক শ্রীভাগবতে ১০। ৮৮ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন।

তাৎপর্য—হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ—এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে আছে "স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ" —

শ্রীসন্দর্ভকার ইহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন—।

ব্রহ্মার রজোগুণ এবং শিবের তমোগুণের ন্যায় বিষ্ণুর সত্ত্বগুণ শুনা যায়। সুতরাং বিষ্ণু নির্গুণ কিসে হইলেন—এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—"প্রেক্ষামাত্রেণোপকারিত্বাৎ" অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক কিন্তু বিষ্ণু সত্ত্বগুণের অধীন নহেন।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণদ্রষ্টা, তাতে গুণমায়া পার ॥
[চৈ. চ. ২. ২০. ২৬৬]

अतएव श्रीविष्णोरेव परमपुरुषेण साक्षादभेदोक्तिमाह।

सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः।
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् ॥ १५ ॥

अहं ब्रह्मा।

श्रुतिश्चात्र 'स ब्रह्मणा सृजति, स रुद्रेण विलापयति। सोऽनुत्पत्तिरलय एव हरिः परः परमानन्द' इति महोपनिषदि। २ ॥ १। श्रीब्रह्मा श्रीनारदम्।

অনুবাদ—অতএব শ্রীবিষ্ণুরই পরমপুরুষের সহিত অভেদোক্তি (শ্রীভাগবতে ২।৬।৩০ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে) বলিয়াছেন—

তাঁহারই নিয়োগে আমি এই বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্রও তাঁহার অধীন হইয়া এই বিশ্বের

সংহার করেন। তিনি পুরুষরূপে (বিষ্ণুরূপে) ত্রিগুণ মায়াশক্তিকে ধারণ করিয়া এই বিশ্বের পালন করেন ॥ ১৫ ॥

এস্থলে আমি বলিতে ব্রহ্মাকেই বুঝাইতেছে।

এ বিষয়ে মহোপনিষৎ শ্রুতিতেও আছে—তিনি ব্রহ্মদ্বারা (ব্রহ্মরূপে) সৃষ্টি ও রুদ্ররূপে সংহার করিতেছেন, তাঁহার উৎপত্তি ও লয় নাই। সেই হরি পরমানন্দস্বরূপ। (সৃজামি এই শ্লোকটী) ভা. ২. ১ অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন।

তাৎপর্য—ত্রিগুণ মায়াশক্তিকে ধারণ করিয়াছেন—একথার অভিপ্রায় হইতেছে, যিনি ত্রিগুণমায়াশক্তির নিয়ন্তা তিনি মায়ার অধীন নহেন।

तथैवाह।

अत्रानुवर्ण्यतेऽभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः।
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः॥ १६॥

अत्र विष्णुर्न कथित इति तेन साक्षादभेद एव इत्यायाम्। तदुक्तम्। स उ एव विष्णुरिति। श्रुतिश्च।

पुरुषो हवै नारायणोऽकामत, अथ नारायणादजोऽजायत यतः प्रजा. सर्वाणि भूतानि नारायणः परं ब्रह्म नारायणः तत्त्वं, नारायणः परं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलमिति।

एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा न च शङ्करः।
स मुनिर्भूत्वा समचिन्तयत्तत एव व्यजायन्त।
विश्वा हिरण्यगर्भाग्नियमवरुणरुद्रेन्द्रा इति।

तस्मात् तस्यैव वर्णनीयत्वमपि युक्तम्। १२॥५। श्रीसूतः।

অনুবাদ—সেই প্রকারই (শ্রীভাগবতে ১২।৫।১ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব) বলিয়াছেন—যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা ও কোপে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিশ্বের আত্মা ভগবান্ হরি এই গ্রন্থে (শ্রীভাগবতে) পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

এস্থলে বিষ্ণু কথিত হন্ নাই, (অর্থাৎ ব্রহ্মাও রুদ্রের কথা বলা হইল, কিন্তু বিষ্ণুর কথা বলা হয় নাই)—অতএব তাঁহার (ভগবানের) সহিত বিষ্ণুর অভেদই আসিল।

(শ্রীভাগবতে ৩।৮।১৬ শ্লোকে মৈত্রেয় ঋষি কর্তৃক বিদুরের প্রতি) উক্ত হইয়াছে—সেই (লোকাত্মক পদ্মে গর্ভোদকশায়ী) বিষ্ণু প্রবেশ করিলেন। এবিষয়ে শ্রুতিও (আছে)।

পুরুষরূপী নারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন, তারপর নারায়ণ হইতে অজ (ব্রহ্মা) জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম হইতে প্রজাসকল ও সর্বভূত জাত হইয়াছে। নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ তত্ত্ব, নারায়ণ সত্য পরব্রহ্ম, পুরুষ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ।

সৃষ্টির পূর্বে এক নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা শঙ্কর কেহই ছিলেন না। সেই নারায়ণ মুনি হইয়া (মননশীল হইয়া) চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহা হইতে বিশ্ব সকল হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, বরুণ, রুদ্র এবং ইন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

সেই হেতু তাঁহারই (শ্রীভগবানেরই) বর্ণনা করা উচিত।

ननु "त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति व भिदाम्"
तथा "न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामन्वपि चक्षते"
इत्यादावभेद एव श्रूयते।
पुराणान्तरे च विष्णुतस्तयोर्भेदे नरकं श्रूयते।

অনুবাদ—(ভাগবতে ৪।৭।৫১ শ্লোকে ভগবান্ দক্ষকে বলিয়াছিলেন) আমাদের তিনজনের (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের) একই স্বরূপ, * * * যে ব্যক্তি আমাদের তিনজনের অমণুাত্র ভেদ না দেখে (সে শান্তি প্রাপ্ত হয়)।

আরও (ভাগবত ১২।১০।১৭ শ্লোকে মহাদেব মার্কণ্ডেয়কে বলিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মন্) তোমাতে আমাতে বিষ্ণুতে ও ব্রহ্মাতে অণুমাত্রও ভেদ দৃষ্ট হয় না।—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের অভেদই শুনা যায়। এবং অন্য পুরাণেও বিষ্ণু হইতে শিবব্রহ্মার ভেদজ্ঞানে নরক হয়—এই প্রকার শুনা যায়।

सत्यं वयमपि भेदं न ब्रूमः परमपुरुषस्यैव तत्तद्रूपमित्येकात्मत्वेनैवोपक्रान्तत्वात्। शिवो ब्रह्मा च भिन्नस्वभावादितया दृश्यमानोऽपि प्रलये सृष्टौ च तस्मात् स्वतन्त्र एवान्य ईश्वर इति न मन्तव्यम्। किन्तु विष्ण्वात्मक एव स स इति तत्रार्थः। तदुक्तं "ब्रह्मणि ब्रह्मरूप" इत्यादि। न च प्रकाशस्य साक्षादसाक्षाद्रूपत्वादितारतम्यं वयं कल्पयामः। परन्तु शास्त्रमेव वदति।

অনুবাদ—(বিষ্ণু হইতে শিব ও ব্রহ্মার ভেদমনন উচিত নহে—এই যে পূর্বপক্ষ তাহার উত্তর দিতেছেন)—অভেদ সত্য, আমরাও ভেদ বলি না। যেহেতু ব্রহ্মা ও শিব পরম পুরুষেরই সেই সেইরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুই ব্রহ্মা ও শিবরূপ হইয়াছেন। যেহেতু তিনি একাত্মরূপে উপক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছেন। শিব ও ব্রহ্মা ভিন্নস্বভাবাদি হেতু অর্থাৎ ব্রহ্মা রজোগুণোপাধি ও শিব তমোগুণোপাধি,—এই কারণে প্রলয়ে ও সৃষ্টিতে যে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র অন্য ঈশ্বর ইহা বিবেচনা করিও না, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুস্বরূপই—ইহাই সেস্থলে অর্থ করিতে হইবে।

(বামনপুরাণে) উক্ত হইয়াছে—সেই ভগবান্ ব্রহ্মাতে ব্রহ্মরূপ ইত্যাদি।

প্রকাশের সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ রূপত্বাদির তারতম্য আমরা কল্পনা করি না, কিন্তু শাস্ত্রই এই প্রকার বলিতেছেন।

তাৎপর্য—ঈশ্বরত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশক বিষ্ণু; কিন্তু ব্রহ্মাতে ও শিবে ঈশ্বরত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশকত্ব নাই,—এই কারণে যে তারতম্য তাহা কেবল আমাদের কথা নহে, শাস্ত্রও বলেন।

शास्त्रं दर्शितम्।

एवं भगवदवतारानुक्रमणिकासु त्रयाणां भेदमङ्गीकृत्यैव केवलस्य श्रीदत्तस्य गणना सोमदुर्वाससो तत्त्वगणना।

किञ्च, ब्राह्मे ब्रह्मवैवर्त्ते ब्रह्मवाक्यम्।

नाहं शिवो नचान्ये च तच्छक्त्येकांशभागिनः।
बालः क्रीड़नकैर्यद्वत् क्रीड़तेऽस्माभिरच्युतः॥ इति।

अतएव श्रुतौ।

'यं कामयेत तमुग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधामित्युक्त्वा मम योनिरप्स्वन्तरि'ति शक्तिवचनम्। अप्स्वन्तरितकारणोदकशायी सूच्यते। 'आपो-नारा इति प्रोक्ता' इत्यादेः। योनिः कारणम्।

অনুবাদ—শাস্ত্র দর্শিত হইয়াছে (১৪ অঙ্কে)।

এইরূপ ভগবানের অবতারের অনুক্রমণিকায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—এই তিনের ভেদ অঙ্গীকার করিয়াই কেবল শ্রীদত্তাত্রেয় ধৃত গণনা, সোম ও দুর্বাসার অবতার মধ্যে উহার গণনা হয় নাই।

অপর ব্রাহ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মার বাক্য—আমি (ব্রহ্মা), শিব ও অন্যান্য সকলে সেই বিষ্ণুর একাংশের ভাগী নহি। বালক যেমন ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করে তদ্রূপ অচ্যুত আমাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন্।

অতএব শ্রুতিতে উক্ত হয়—'সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত যাহাকে কামনা করিয়া সেই উগ্র-মূর্তিকে (শম্ভুকে), ব্রহ্মাকে, ঋষিকে ও সুমেধাকে সৃষ্টি করিয়াছি' ইহা বলিয়া 'আমার যোনি (উৎপত্তিস্থান) জলের অন্তর'—এই শক্তিবচন অর্থাৎ দেবীসূক্তের বাক্য। জলের অন্তরিত—ইহার দ্বারা কারণোদকশায়ী সূচিত হইতেছেন। যেহেতু জল নারনামে কথিত—ইত্যাদি উক্তি আছে। যোনি অর্থাৎ কারণ।

তাৎপর্য—'আপোনারা' এইটুকু মাত্র শ্রীসন্দর্ভকার ধরিয়াছেন, সম্পূর্ণ শ্লোক যথা—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১. ৪. ৬.

নারায়ণ শব্দের অর্থ করিতেছেন,—অপ্ বা জল শব্দে নারকে বুঝায়, জলই নরসূনু। যেহেতু সেই জলই তাঁহার পূর্ব স্থান, সেই হেতু নারায়ণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।—ইত্যাদি বাক্যে কারণার্ণবশায়ী নারায়ণই কথিত হইয়াছেন।

एवमेव स्कन्दपुराणे।

ब्रह्मेशानादिभिर्देवैर्यत्प्राप्तुं नैव शक्यते।
तद्‌ यत्स्वभावः कैवल्यं स भवान् केवलो हरिः॥ इति।

तथा विष्णुसामान्यदर्शिनां दोषश्च श्रूयते। यथा वैष्णवतन्त्रे

न लभेयुः पुनर्भक्तिं हरेरैकान्तिकीं जडाः।
एकाग्रमनसश्चापि विष्णुसामान्यदर्शिनः॥

अन्यत्र

यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः।
समत्वेनैव वीक्ष्येत स पाषण्डी भवेद्ध्रुवम्॥ इति।

तथाच मन्त्रवर्णः।

'मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासत' इति। ननु क्वचिदन्यशास्त्रे शिवस्यैव परमदेवत्वमुच्यते। सत्यम्। तथापि शास्त्रस्य सारासारत्वविवेकेन तद्बाधितमिति।

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে এই প্রকারই কথিত হইয়াছে। 'ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণ যাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হননা, সেই কৈবল্য (মুক্তি) যাঁহার স্বভাব, কেবল সেই হরি আপনি।'

সেই প্রকার, ব্রহ্মা ও শিবের সহিত যাঁহারা বিষ্ণুকে সমানরূপে দর্শন করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও দোষ শুনা যাইতেছে। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

'যে মূর্খগণ ব্রহ্মাদির সহিত বিষ্ণুকে সমান দর্শন করে, তাহারা একাগ্র অন্তঃকরণ হইলেও হরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না।' অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

'যে ব্যক্তি ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণ দেবকে সমানরূপে দেখে সে নিশ্চয় পাষণ্ডী হয়।'

সেই প্রকার মন্ত্রবর্ণগ্রন্থে (বর্ণিত হইয়াছে)—'দেবতা সকলের মধ্যস্থানে উপবিষ্ট বামন দেবকে বিশ্বদেবগণ উপাসনা করেন।'

আচ্ছা অন্যশাস্ত্রে শিবেরই ত' পরম দেবত্ব কথিত হইয়াছে। ইহা সত্য কিন্তু তাহা হইলেও শাস্ত্রের সার ও অসারত্ব বিবেচনা দ্বারা তাহা বাধিত হইয়াছে।

তাৎপর্য—এই সমস্ত বচন প্রমাণ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হয়। যদিও কোন শাস্ত্রে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সেই শাস্ত্র অসার। সারশাস্ত্রদ্বারা সেই অসার শাস্ত্রের বাধা হইল, সুতরাং অসারশাস্ত্র প্রতিপাদিত বিষয় গ্রহণীয় নহে।

तथाच पाद्मशैवयोरुमां प्रति श्रीशिवेन श्रीविष्णुवाक्यमनुक्तम् ।

त्वामाराध्य यथा शम्भो ग्रहीष्यामि वरं सदा ।

द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु ॥

स्वागमैः कल्पितैस्त्वन्तु जनान् मद्विमुखान् कुरु ।

मां च गोपय येन स्यात् सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा ॥

অনুবাদ—সেই প্রকার (শিব শাস্ত্রের অসারত্ব প্রতিপাদক) পদ্মপুরাণ এবং শিবপুরাণে উমার প্রতি শ্রীশিব কর্তৃক শ্রীবিষ্ণুর বাক্য অনুক্ত হইয়াছে। শিব বলিলেন— (হে শঙ্করি !) বিষ্ণু আমাকে বলিয়াছেন—হে শম্ভো ! আমি সর্বদা তোমাকে আরাধনা করিয়া সেইরূপ বর গ্রহণ করিব, যাহাতে তুমি দ্বাপরাদিযুগে অংশে মানুষ মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কল্পিত-আগমশাস্ত্র দ্বারা জনসকলকে আমা হইতে বিমুখ কর। এবং আমাকে গোপন কর, যাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর (প্রবাহরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে)।

वाराहे च ।

एष मोहं सृजाम्याशु यो जनान् मोहयिष्यति ।

त्वञ्च रुद्र महावाहो मोहशास्त्राणि कारय ॥

अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज ।

प्रकाशं कुरु चात्मानमप्रकाशञ्च मां कुरु ॥ इति ।

पुराणानां च मध्ये यद्र यत्सात्त्विककल्पकथामयं तत्तत्श्रीविष्ण

महिमपरं यद्द यत्तामसादिकल्पकथामयं तत्तच्छिवादिमहिमपरमिति श्रीविष्णुप्रति-पादकपुराणस्यैव सम्यग्ज्ञानप्रदत्वं, सत्त्वात् संजायते ज्ञानमितिदर्शनात्।

तथाच मात्स्ये।

सात्त्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः।
राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः।
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च।
सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितॄणाञ्च निगद्यते॥ इति।

অনুবাদ—অপর বরাহপুরাণে যথা—

হে মহাবাহো! রুদ্র! আমি শীঘ্র মোহকে সৃষ্টি করিতেছি,—যে মোহ লোক সকলকে মোহিত করিবে। তুমিও মোহশাস্ত্র সমূহকে প্রকাশ কর। হে মহাভুজ! মিথ্যা কাল্পনিক শাস্ত্র সকল প্রদর্শন করাও, এবং নিজকে প্রকাশ কর, ও আমাকে গোপন কর।

পুরাণ সকলের মধ্যে যে যে পুরাণ সাত্ত্বিককল্প কথাবহুল সেই সেই পুরাণ শ্রীবিষ্ণুর মহিমাপর, আর যে যে পুরাণ তামসাদি কল্পকথাময় সেই সেই পুরাণ শিবাদিমহিমাপর। শ্রীবিষ্ণুপ্রতিপাদক পুরাণেরই সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানপ্রদত্ব বুঝিতে হইবে। যেহেতু (শ্রীগীতা ১৪।১৭ শ্লোকে) দেখা যায়—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান হয়।

মৎস্যপুরাণে (কথিত হইয়াছে)—সাত্ত্বিকশাস্ত্র সমূহে হরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজসশাস্ত্র-সকলে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজোমিশ্রিত শাস্ত্র সকলে সরস্বতী ও পিতৃ-লোকের মাহাত্ম্য অধিকরূপে কথিত হইয়াছে।

अत उक्तं स्कान्दे षन्मुखं प्रति श्रीशिवेन।

शिवशास्त्रेषु तद्ग्राह्यं भगवच्छास्त्रयोगि यत्॥
परमो विष्णुरेवैकस्तज्ज्ञानं मोक्षसाधनम्।
शास्त्राणां निर्णयस्त्वेषस्तदन्यन्मोहनाय हि॥ इति।

तथैव च दृष्टं मोक्षधर्मे नारायणीयोपाख्याने।

वैशम्पायन उवाच।

सांख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा।
ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि वै॥

सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते।
हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः॥
अपान्तरतमाश्चैव वेदाचार्यः स उच्यते।
प्राचीनगर्भं तमृषिं प्रवदन्ति च केचन॥
उमापतिर्भूतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः।
उक्तवानिदमव्यग्रो ज्ञानं पाशुपतं शिवः॥
पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता तु भगवान् स्वयम्।
सर्वेषु च नृपश्रेष्ठ ज्ञातेष्वेतेषु दृश्यते॥
यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रभुः।
नचैनमेनं जानन्ति तमोभूता विशां पते॥
तमेव शास्त्रकर्त्तारः प्रवदन्ति मनीषिणः।
निष्ठां नारायणमृषिं नान्योऽस्तीति वचो मम॥
निःसंशयेषु सर्वेषु नित्यं वसति वै हरिः।
ससंशयाद्धेतुवलान्नाध्यावसति माधवः॥
पञ्चरात्रविदो ये तु यथाक्रमपरा नृप।
एकान्तभावोपगतास्ते हरिं प्रविशन्ति वै॥

सांख्यश्च योगश्च सनातने द्वे
वेदाश्च सर्वे निखिलेषु राजन्।
सर्वैः समस्तै ऋषिभिर्निरुक्तो
नारायणो विश्वमिदं पुराणम्॥ इति।

অনুবাদ—অতএব ষড়াননের (কার্তিকেয়ের) প্রতি শ্রীমহাদেব কর্তৃক কথিত হইয়াছে—শিবশাস্ত্রের মধ্যে যাহা ভগবৎ শাস্ত্রের উপযোগী তাহাই গ্রাহ্য, যে হেতু এক বিষ্ণুই পরম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার জ্ঞান মোক্ষের সাধন। ইহাই শাস্ত্র সকলের নির্ণয়; তাহা ব্যতীত অন্তশাস্ত্রসকল মোহের নিমিত্ত জানিতে হইবে।

মোক্ষধর্মে নারায়নীয়োপাখ্যানে (সেই প্রকারই দৃষ্ট হইয়াছে):—

বৈশম্পাপায়ন বলিলেন—

হে রাজর্ষে! সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, বেদ এবং পাশুপত শাস্ত্র,—এই সকল শাস্ত্রকে জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া জানিবে। এই সকল শাস্ত্রে নানা প্রকার মত আছে। সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা যে কপিলদেব, তিনি পরম ঋষি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যোগের বেত্তা হিরণ্যগর্ভ, তাঁহা হইতে অন্য কেহ প্রাচীন নাই। অপান্তরতমা বেদের আচার্য বলিয়া কথিত হন্। কেহ কেহ এই ঋষিকে প্রাচীনগর্ভও বলিয়া থাকেন্। ব্রহ্মার পুত্র উমাপতি, ভূতপতি, শ্রীকণ্ঠ ও শিব অব্যগ্র (স্থিরচিত্ত) হইয়া এই পাশুপাত জ্ঞান বলিয়াছিলেন। অপর, স্বয়ং ভগবান্ সম্পূর্ণ পঞ্চরাত্রের বক্তা। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আগম ও জ্ঞানানুসারে এই সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞাত হইলে, প্রভু যে নারায়ণ—তৎস্বরূপ নিষ্ঠা হয়। হে নরপতে! তামসব্যক্তিগণ ইহাকে এ প্রকার জানেনা। শাস্ত্রকর্তা মনীষিগণ সেই নারায়ণকেই (নিজ নিজ শাস্ত্রে) নিষ্ঠা বলিয়া থাকেন, ইহা ব্যতীত অন্য আর কেহ নাই—ইহা আমার কথা। সন্দেহরহিত সকল শাস্ত্রে হরি নিত্য বাস করিতেছেন, আর সন্দেহযুক্ত ও হেতুবলযুক্ত শাস্ত্রে মাধব বাস করেন না। হে নৃপ! যাঁহারা পঞ্চরাত্রজ্ঞ যথাক্রমপরায়ণ এবং (ভগবানে) একান্তভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই হরিতে প্রবেশ করেন্।

হে মহারাজ! সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগ—এই দুই নিত্য ও সমস্ত নিত্য শাস্ত্র মধ্যে বেদ সকলও নিত্য। ঐ সমস্তশাস্ত্রে সকল ঋষি কর্তৃক পুরাণ-পুরুষ নারায়ণ যে এই বিশ্বরূপী—ইহাই স্থির হইয়াছে।

তাৎপর্য—এস্থানে সংশয়যুক্ত শাস্ত্র ও কেবল হেতুবাদের শাস্ত্র সকলে মাধবের সহিত সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ওই সকল শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত গ্রহনীয় নহে। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ১ম বিলাসে উপেক্ষ্য শিষ্য প্রকরণে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের বচন যথা—

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এবচ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা ন তেভ্যস্তন্ত্রং দাপয়েৎ॥

জৈমিনি, সুগত (বৌদ্ধ), নাস্তিক, নগ্ন, কপিল ও অক্ষপাদ (গৌতম)—এই ছয়জন হেতুবাদী, যে সকল নরাধম ইহাদের মতানুসারে চলে তাহারাও হেতুবাদী। অতএব তাহাদিগকে মন্ত্রদান করিবেনা।

ইহা দ্বারা বলা হইল জৈমিনি প্রভৃতি ও তাহাদের মতানুবর্ত্তী লোক সকল হেতুবাদী। তাহারা শাস্ত্রবাক্য মুখ্যরূপে গ্রহণ করেন না; কেবল অনুমানাদি হেতু দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করেন। সুতরাং তাঁহাদের মত গ্রহনীয় নহে।

অত্র অপান্তরতমা ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নস্যৈব জন্মান্তরনামবিশেষ ইতি

तत्रैव ज्ञेयम्। अत्रैवं व्याख्येयं पञ्चरात्रसम्मतं श्रीनारायणमेव सर्वोत्तमत्वेन वक्तुं नानामतं दर्शयति सांख्यमिति।

अत्र पञ्चरात्रमेव गरिष्ठमाचष्टे पञ्चरात्रस्येत्यादौ भगवान् स्वयमिति।

'द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव चे'ति श्रीगीतासु श्रूयते।

यदेवं तानि नानामतानीत्युक्तं तत्तु आसुरप्रकृत्यनुसारेणेत्येव ज्ञेयम्; दैवप्रकृतयस्त्वतत्तत्सर्वावलोकनेन पञ्चरात्रप्रतिपाद्ये श्रीनारायण एव पर्यवस्यन्ती-त्याह सर्वेष्वेति आसुरांश्च निन्दति न चैनमिति।

অনুবাদ—এস্থানে যে 'অপান্তরতমা' বলা হইয়াছে—তাহা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই (বেদ-ব্যাসের) জন্মান্তরীয় নাম জানিতে হইবে।

এস্থলে এই প্রকার ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য—পঞ্চরাত্রসম্মত শ্রীনারায়ণকে সর্বোত্তম বলিবার জন্য সাংখ্য ইত্যাদি শ্লোকে নানামত দেখাইতেছেন।

এস্থলে পঞ্চরাত্রকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। 'পঞ্চরাত্রস্য'—এস্থলে পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্।

এই জগতে দৈব ও আসুর—এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি—ইহা শ্রীগীতাতে (১৬. ৬ শ্লোকে) শ্রুত হইতেছে।

আর যে নানামত বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা আসুর প্রকৃতির অনুসারে বুঝিতে হইবে। অপর, দৈবপ্রকৃতি সকল সেই সেই শাস্ত্রের দৃষ্টিদ্বারা পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীনারায়ণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাই 'সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ' – এই বচনে বলিয়াছেন। আর 'নচৈনমেনং জানন্তি'—এই বচনদ্বারা আসুর প্রকৃতির নিন্দা করিয়াছেন।

तदुक्तं विष्णुधर्माग्निपुराणयोः।

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च।

विष्णुभक्तिपरो दैव आसुरस्तद्विपर्ययः॥ इति।

ननु तत्र तत्र नानामतय एव दृश्यन्ते तत्राह तमेवेति।

पञ्चरात्रेतरशास्त्रकृतो हि द्विविधाः। किञ्चिज्ज्ञाः सर्वज्ञाश्च।

तत्र आद्या यथा स्वस्वज्ञानानुसारेण[१] यत्किञ्चित्तत्त्वैकदेशं वदन्ति;

[১] यथाज्ञानमिति मुद्रितपुस्तके पाठः।

तत्तु समुद्रैकदेशवर्णनं समुद्र इव पूर्णतत्त्वे श्रीनारायण एव पर्य्यवस्यतीति, ते तमेव वदन्ति। ये तु सर्व्वज्ञास्ते चैवमभिप्रयन्ति, नास्माभिरसुराणां मोहनार्थमेव कृतानि शास्त्राणि। किन्तु दैवानां व्यतिरेकेण बोधनार्थम्। ते हि रजस्तमः-शवलस्य खण्डस्य च तत्त्वस्य तथा क्लेशबहुलस्य साधनस्य प्रतिपादकान्येतानि दृष्ट्वा वेदांश्च दुर्गमान् दृष्ट्वा च निर्व्विद्य सर्व्ववेदार्थसारस्य शुद्धाखण्डतत्त्वश्रीनारायणस्य सुखमयतदाराधनस्य च सुष्ठु प्रतिपादके पञ्चरात्र एव गाढ़ं प्रवेक्ष्यन्तीति तदेतदाह 'निःसंशयेष्वि'ति।

অনুবাদ—তাহা (দৈব ও আসুরপ্রকৃতি) বিষ্ণুধর্ম্মে ও অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে—এই লোকে সৃষ্টি দ্বিবিধ, এক দৈব, ও অপর আসুর। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দৈব আর তাহার বিপর্য্য় অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিরহিত জন আসুর।

আচ্ছা সেই সেই শাস্ত্রে নানামত দৃষ্ট হইতেছে—অতএব বলিলেন (শাস্ত্রকর্তা মনীষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে) তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করেন।

পঞ্চরাত্র ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রকর্তা সকল দুই প্রকার। কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ, এবং সর্ব্বজ্ঞ।

তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে যৎকিঞ্চিৎতত্ত্বের একদেশ বলেন, তাহা সমুদ্রের একদেশ বর্ণনের ন্যায় সমুদ্রতুল্য পূর্ণতত্ত্ব শ্রীনারায়ণেই পর্য্যবসিত হয়। অতএব তাঁহারা (কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ ব্যক্তিগণ) তাঁহারই বর্ণনা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারা এই প্রকার অভিপ্রায় করেন যে আসুর-প্রকৃতি ব্যক্তি সকলের মোহনের নিমিত্ত শাস্ত্রসকল তাঁহারা প্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু দৈবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের ব্যতিরেক দ্বারা বোধনের নিমিত্ত। অর্থাৎ দৈবপ্রকৃতি ভিন্ন যে সকল আসুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের বোধের নিমিত্তই সর্ব্বজ্ঞগণ শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন।

সেই সর্ব্বজ্ঞগণ রজস্তমোগুণে মলিন তত্ত্ব খণ্ডের এবং ক্লেশবহুল সাধনের প্রতিপাদক এই শাস্ত্র সকল দেখিয়া এবং বেদসকলও দুর্গম দেখিয়া নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া সকল বেদার্থের সার শুদ্ধ অখণ্ডতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের এবং সুখময় তাঁহার আরাধনের সম্যক্ প্রতিপাদক পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেই গাঢ়রূপে প্রবেশ করিবেন। 'নিঃসংশয় সকলশাস্ত্রে (হরি নিত্য বাস করেন)'—এই উক্তি রহিয়াছে।

তাৎপর্য—কেহ বস্তুর বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু সেই বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান তাহার নাই ; মাত্র কিছু কিছু তিনি জানেন ; যদিও তিনি সম্পূর্ণরূপে সে বিষয় জানেন না তথাপি সেই সম্বন্ধে যতটুকু তাঁহার জ্ঞান আছে তাহা বর্ণনা করিলেও অবশ্য সেই বস্তু বিষয়েরই বর্ণনা বুঝা যায়। তদ্রূপ যাহারা কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ তাহারা শ্রীনারায়ণের সম্পূর্ণ বর্ণনা না করিলেও সামান্য যাহা কিছু বর্ণনা করেন তাহা দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই বর্ণনা হয় বুঝিতে হইবে।

সকল শাস্ত্রেই শ্রীনারায়ণ প্রতিপন্ন হইয়াছেন। কেবল তমোগুণ সম্পন্ন মনুষ্য সকল তাঁহাকে জানেনা। কিন্তু বিজ্ঞ শাস্ত্রকর্তাগণ শ্রীনারায়ণকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

तस्माद् झटिति वेदार्थप्रतिपत्तये पञ्चरात्रमेवाध्येतव्यमित्याह पञ्च-रात्रेति। यत एवं तत उपसंहरति सांख्यञ्च योगश्चेति। तदेवं पञ्चरात्रप्रतिपाद्य-रूपस्य श्रीभगवत एवमुत्कर्षे स्थिते 'आत्मारामाश्च मुनय' इत्याद्यसकृदपूर्वमुपदिशता श्रीभागवतेन प्रतिपाद्यरूपस्य तस्य किमुतेत्यपि विवेचनीयम्।

तदेतदुक्तानुसारेन सदाशिवेश्वरत्रिदेवीरूपव्यूहो निरस्तः। तस्मादेव श्रीभगवत्पुरुषयोरेव शैवागमे सदाशिवादिसंज्ञे तन्महिमख्यापनाय धृते इति गम्यते। सर्वशास्त्रशिरमणौ श्रीभागवते तु त्रिदेव्यामेव तत्तारतम्यजिज्ञासा पुरुष-भगवतोस्तु तत्प्रसङ्ग एव नास्ति।

অনুবাদ—অতএব শীঘ্র বেদার্থের বোধনিমিত্ত পঞ্চরাত্রই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। এই কারণেই বলিয়াছেন—যাঁহারা পঞ্চরাত্রজ্ঞ (তাঁহারা হরিতে প্রবেশ করেন)। সেই হেতু 'সাংখ্য ও যোগ' ইত্যাদি পদ্যে নারায়ণই উপসংহার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

অতএব এই প্রকার পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্যরূপ শ্রীভগবানের উৎকর্ষ স্থির হইলে (ভা- ১. ৭ অধ্যায়ে) 'আত্মারাম মুনিগণ শ্রীহরিতে অহেতুকীভক্তি করেন'—ইত্যাদি ১০ম শ্লোকে পুনঃপুনঃ অপূর্ব উপদেষ্টা শ্রীভাগবত কর্তৃক প্রতিপাদ্য সেই শ্রীভগবানের উৎকর্ষের কথা আর কি বলিব—ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে। এই উক্তি অনুসারে সদাশিবেশ্বরের ত্রিদেবী ব্যূহ নিরস্ত হইল। পাশুপত শাস্ত্রাদিতে সদাশিব পরমেশ্বর, তাঁহার ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিদেব ব্যূহ, সুতরাং সদাশিবই যে শ্রেষ্ঠ এই মতের নিরাস হইল। সেই হেতু শ্রীভগবান ও পুরুষের সদাশিব কৃত আগমশাস্ত্রে তাহার মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত সদাশিবাদি সংজ্ঞা ধৃত হইয়াছে।—ইহাই জানা যাইতেছে।

সকল শাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ শ্রীভাগবতে তিন দেবতার তারতম্য জিজ্ঞাসা আছে, পুরুষ ও ভগবানের তৎপ্রসঙ্গ (তারতম্য জিজ্ঞাসা) নাই।

তাৎপর্য—বেদার্থ অত্যন্ত গূঢ়, তাহার শীঘ্র বোধের নিমিত্ত পঞ্চরাত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, পঞ্চরাত্রজ্ঞ হরিতে প্রবেশ করেন—ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও পঞ্চরাত্রের বিশেষ প্রয়োজন। সেই পঞ্চরাত্রে অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রীভগবানেরই উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও পুনঃপুনঃ শ্রীভগবানেরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে।